

প্রবোধ কুমার সান্যালের রচনাবলী

প্রবোধকুমার সান্যালের

রচনাবলী

চতুর্থ খণ্ড

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক :
ভবানী মুখোপাধ্যায়/মনীষী বসু

চতুর্থ খণ্ডের সূচী

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
অজিত কুমার সামই
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১/১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

দাম : কুড়ি টাকা

ভূমিকা

বিগত পঞ্চাশ বছর কালের মধ্যে যে সব উপন্যাস বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে তার যে কোনো একখানি হাতে তুলে নিয়ে তারই সমতুল কোনো উপন্যাস যা পঞ্চাশ বছর পূর্বে রচিত হয়েছে তার সঙ্গে যদি তুলনা করতে বসি, তাহলে শুধুমাত্র বিষয়বস্তু নয়, আঙ্গিক, বক্তব্য এবং আধুনিক লিপি-কৌশল বা টেকনিকের জটিলতায় আগের দিনের উপন্যাস নিছক ছেলেখেলা মনে হতে পারে। আগের কালের উপন্যাসে ঘটনার ওপর জোর দেওয়া হত, বার বার করে এক কথা বলা হত এবং পাপ-পুণ্য ইত্যাদির কথাও অনেকটা অংশ জুড়ে থাকত। অতীতের এই অতীতত্ব বিষয়ে আমরা সমধিক সচেতন, তার তুলনায় একালের একেবারে সোজাসুজি স্পষ্ট করে গল্প বলার রীতির সঙ্গে আমরা মনকে খাপ খাইয়ে নিয়েছি। প্রথম পরিচ্ছেদই আমাদের কৌতূহলের সলিতাটুকু প্রজ্বলিত করে দেয় এবং ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই উপন্যাসের কাহিনী বা প্লট সমাপ্তি বা সমাধানের দিকে এগিয়ে চলে সেটাই তার একমাত্র লক্ষ্য, এই ভঙ্গীটাই আমাদের চিত্তবিনোদন করে। আধুনিক কালের উপন্যাসে 'সময়' তাই একটা মুখ্যবস্তু। এই সময় অর্থে কালও বলা যায়। কাল নিয়ত পরিবর্তনশীল, কাল যা ছিল আজ তা নেই, আজি তা সম্পূর্ণভাবে অতীতের বস্তু, কিন্তু গতকাল তা অতিশয় প্রবলভাবেই সত্য ছিল। এই সময়টুকুকেই ধরে রাখা, ক্যামেরায় যেমন রাখা যায় একটি বিশেষ মুহূর্তের মূর্তি, আধুনিক কালের লেখকের একটা প্রধান দায়িত্ব।

এত কথা বলার প্রয়োজন হত না, যদি না প্রবোধকুমার সান্যালের 'হাসুবানু' আরেক বার পড়তে বসতাম। 'হাসুবানু প্রবোধকুমারের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসবলীর অন্যতম। একদা তিনি লিখেছিলেন 'প্রিয় বান্ধবী'—সেখানে বন্ধুতার এক মোহময় আবেশে গড়ে উঠেছে দুটি নর-নারীর সম্পর্ক। শেষ পর্যন্ত শ্রীমতী হল ব্রহ্মচারিনী আর জহর বাউণ্ডুলে বাউল। আর সংলাপ সে উপন্যাসের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। তারপর ১৯৩৮-এর রচনা 'আঁকা-বাঁকা', এই উপন্যাসেও আছে এক বলিষ্ঠ বক্তব্য। কঙ্করকুমার আর মীনাক্ষী—চিরন্তন পুরুষ আর চিরন্তনী নারী। তারপর এসেছে 'জল আর আগুন', সে উপন্যাসের 'রাণু আর বীরু' দুজনে 'কাজিন'। ভাই-বোনের মধ্যে যৌন-সংযোগ—সে ধারা অনেক দিনের। এ উপন্যাসও প্রবোধকুমারের দুঃসাহসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক।

(প্রবোধ রচনাবলী)

'হাসুবানু' এর অনেক কাল পরে প্রকাশিত হয়েছে, ১৩৫৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশকালে 'হাসবানু' পাঠক সমাজে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকাটুকু এই উপন্যাস বিচারে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে আবার নতুন করে ঢাকা এবং তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বত্র হিন্দু-দলন দাঙ্গা শুরু হয়, এবং তার ফলে যাঁরা মনে করেছিলেন দেশ-বিভাগ হলেও দেশের মাটি আঁকড়ে থাকব, তাঁরা মোহমুক্ত হন, অনেককে শুধু ধন-মান নয়, প্রাণটুকুও বিসর্জন দিতে হয়। যাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল তাঁরা কোনোক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে পশ্চিমবঙ্গের উদার আশ্রয়টুকু গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন। এমনই এক বিষাদময় কালের বিষণ্ণ ইতিহাস এই 'হাসুবানু'। হাসুবানু উপন্যাসের মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয়ত্ব আছে, আর বোধকরি সেই কারণেই এখানে-ওখানে সৌখীন সম্প্রদায় প্রায় উনত্রিশ বার এই উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনয় করেছেন।

সেই সময় দৈনিক যুগান্তরের সম্পাদক ছিলেন সর্বজনখ্যাত শক্তিশালী সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। বিবেকানন্দবাবুর সাহিত্য-জ্ঞান সুপরিচিত। তিনি একাধিক সাহিত্য-গ্রন্থ বিষয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন যুগান্তরের পৃষ্ঠায়। 'হাসুবানু'ও তাঁর নজব এড়িয়ে যায় নি। যুগান্তরে তিনি একটি প্রবন্ধে 'হাসুবানু'-র প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন একথা আমার স্মরণে আছে। দুঃখের বিষয় সেই প্রবন্ধ আমার হাতের কাছে নেই, তাহলে 'হাসুবানু' সম্পর্কে একটা আশ্চর্য মন্তব্য পাঠকবর্গকে উপহার দিতে পারতাম।

এই উপন্যাসে প্রবোধকুমার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ভাবগত সংহতি, বাঙালীর সঙ্গে বাঙালীর ভালোবাসা—এইসব অতিপরিচিত বক্তব্য তুলে ধরেছেন। কিন্তু শুধু কি তাই, শুধু কি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর ভাবগত সংহতি? শুনেছি অনেক কাল পরে লেখক যখন বাংলাদেশ পযটনে গিয়েছিলেন তখন স্বয়ং মুজিবুর রহমন এবং বাংলাদেশের আরো অনেক বুদ্ধিজীবী তাঁকে এই উপন্যাসের কথা উল্লেখ করে অভিনন্দিত করেন। 'হাসুবানু' কিন্তু শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক মিলনের সদিচ্ছা-প্রকাশক উপন্যাস মাত্র নয়, এ উপন্যাসটির মধ্যে দেশ-বিভাগের নিদারুণ অবিচারে কয়েকটি মানুষের ভাগ্যচক্র কি নিদারুণভাবে রূপান্তরিত হয়েছিল তারই কাহিনী। লেখক গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন দুজন সাধু সজ্জন বাঙালী মুসলমানের উদ্দেশ্যে।" এঁরা হলেন প্রখ্যাত দেশকর্মী ও সমাজসেবক মরহুম লিয়াকত হোসেন এবং মরহুম জনাব সোফিয়ার রহমন। এই উৎসর্গপত্রটুকুর উল্লেখ প্রয়োজন কারণ এই

উপন্যাসের কাহিনী অংশের মধ্যে লেখকের যে মনোভঙ্গী প্রকাশিত তার মধ্যে এঁদের মহান চরিত্রের প্রভাব পরিস্ফুট। এক বিবাহের রাত্রে গ্রামের বাড়িতে অগ্নি ও হত্যাকাণ্ড সুরু হয়ে গেল, যে যার প্রাণ নিয়ে পালালো। সেই বিবাহ বাসরের নায়ক অর্থাৎ পাত্র হিরণ এই উপন্যাসের নায়ক। সে একদা গ্রাম্য জমিদারের অনুগ্রহে কলকাতায় বসে লেখাপড়া করেছিল। বিহাহ হচ্ছিল তারই কন্যা মীরার সঙ্গে। জিতেন্দ্রনারায়ণরা আরো অনেক ছিন্নমূল পাকিস্তানি নাগরিকের মত এই কলকাতা শহরে এসে পড়েছিলেন। বিমলাক্ষ ডাক্তারকে তাঁরা সুসময়ে পনেরো হাজার টাকা দিয়েছিলেন। সেই টাকার কিছু অংশ চেয়ে তাঁরা ডাক্তারকে চিঠি দিয়েছিলেন। সেই সূত্রে হিরণ তাঁদের সংবাদ ও ঠিকানা পেয়ে গেল। তারপর সুরু হল এক বিচিত্র জীবন-নাট্যের বিভিন্ন অঙ্ক। এই নাটকে পাত্র-পাত্রী অনেক। কিন্তু সবাইকে ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে মহিয়সী নারী হাসুবানু, সে এক অদ্ভুত চরিত্র। এ মেয়েটি জিতেন্দ্রনারায়ণের সেরেস্তার কর্মচারী এমদাদ আলীর মেয়ে হাসুবানু, জিতেন্দ্রনারায়ণকে জ্যেঠামশাই বলে। সেই মেয়ে জুড়ে আছে এ উপন্যাস। আশ্চর্য বাঙালিনী এই মেয়ে। এ চরিত্র হয়ত অনেকের কাছে অপরিচিত, তবে অনেকের কাছে আবার পরিচিত। যে মহিলাটির আদর্শে এ চরিত্র আঁকা হয়েছে বাস্তব জীবনেও তিনি তেমনই সাহসিকা এবং মহান চরিত্রের মানবী। প্রবোধকুমারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, কিন্তু সে সব ছাড়িয়ে ফুটে উঠেছে এক আশ্চর্য রমনীর ছবি, যাকে অতি পরিচিত আপনজন বলে মনে হয়, আবার কখনো মনে হয় ধরা ছোঁযার বাইরে এক মায়াবিনী ছায়া। এখানেই লেখক হিসাবে প্রবোধকুমার অসামন্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রবোধকুমার এক জাযগায বলেছিলেন—"আমি প্রণয় কাহিনী ভাবতেই পারতুম না। আমার ভালো লাগত ভাই, বোন, বন্ধু। আদর্শবাদী, স্বার্থত্যাগী—ওতেই আমি আনন্দ পেতুম। একটা আদর্শ, একটা ব্যঞ্জনা, একটা কোনো দুরূহ ভাবনার পথ—এ যদি সব গল্পের মধ্যে না থাকে, তবে গল্প লিখে লাভ কি ?"

এই তার মনের ইচ্ছা, এবং এই রীতি তিনি মেনে এসেছেন বলে মনে হয়, কিন্তু এই ভেবে স্বস্তি বোধ করা যায় যে তিনি কাহিনী লিখতে বসে হিতোপদেশ শোনান নি, উদ্দেশ্যকে প্রধান লক্ষ্য করে হৃদয়াবেগকে অবদমিত করেন নি। সাহিত্য হিসাবে তাই 'হাসুবানু' এ যুগের এক সার্থক উপন্যাস একথা অন্য সমালোচকদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলা যায়।

'বসন্তবাহার' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৭৪-এর নবকল্লোলের শারদ সংখ্যায় এবং সেই বছরই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাস আয়তনে অপেক্ষাকৃত ছোট হলেও এর বক্তব্য কিন্তু সামান্য নয়। ফটিকচাঁদ জুয়েলার্স নাগ কোম্পানীর পরম বিচক্ষণ মালিক রামধন নাগের পাকা-পোক্ত পুত্র। বাপের উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের জন্য সে উদ্বিগ্ন। তায় আবার দীর্ঘজীবীর বংশ, অতএব ভবিষ্যৎ তাড়াতাড়ি উজ্জ্বল হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প। এলাহাবাদ যাত্রাপথে ট্রেন সংঘর্ষের ফলে ফটিকচাঁদ একটা ইমারজেনসী ক্যাম্পে আরও দুজন আহতদের সঙ্গে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে। মুন্না বা মোতীবাঈ খানদানি ঘরের মেয়ে। ইংরাজীতে এম. এ পাশ করেছে তবে ফার্স্টক্লাস পায়নি। অর্থের অভাব নেই। তবু সে ভিখারিনী। অন্তরে সে উদাসিনী মীরাবাঈ। বঙ্গ-সন্তান ফটিক তার সেই আরমান ভরা দিলের কাছে হার মানে, তবু তার গৃহস্থ মন তার রক্ষাকবচ। সে মজেছিল কিন্তু মরতে পারেনি। তার ব্যবসা, ঘরের বউ আর নিছক বাঙালী মধ্যবিত্তের সংস্কার তাকে বাঁচিয়েছে বার বার। শেষ পর্যন্ত উন্মাদিনী মোতীবাঈ-এর আকুলতা অন্তরে চমক লাগায়।

'বসন্তবাহার' যথাযথ বিচারে একটি বড় গল্প মাত্র, এর মধ্যেও নাটক আছে এবং উপাদান আছে সুবৃহৎ উপন্যাসের। লেখক কিন্তু আত্মহারা হয়ে লিখে গেছেন, যেন এক বসন্ত রজনীর আকুলতাভরা গান, যার মধ্যে আছে অন্তর আর সব পেয়েও সব হারানোর দুঃখ।

ভবানী মুখোপাধ্যায়

হাসুবানু

(উপন্যাস)

রচনাকাল : ১৯৫২

উৎসর্গ

প্রাতঃস্মরণীয় দেশকর্মী ও সমাজসেবক

স্বর্গত জনাব লিয়াকত হোসেন

ও

অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয় বন্ধু

স্বর্গত জনাব সোফিযার রহমনের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

১

কপালে সিন্দুরের রেখা না টানলে বিবাহ সম্পূর্ণ সিদ্ধ নয়, এই হোলো নাকি শাস্ত্রীয় বিধি। সিন্দুরের আগে সম্প্রদান। সেখানে মোট কথাটা স্বীকার করে নিতে হবে এই যে, কন্যাদান আমি গ্রহণ করিলাম—এবং আজ থেকে উভয়ের হৃদয় একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেল।

সম্প্রদানের ব্যাপারটা মোটামুটি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শেষ হ'তে পারতো; কিন্তু ঠিক সন্ধ্যার সময় সমগ্র গ্রাম আক্রান্ত হয়, এখানে-ওখানে আগুন জ্বলে ওঠে, এবং খুন-জখম আরম্ভ হয়ে যায়। চেষ্টা ছিল কোনো মতে সম্প্রদানের মন্ত্রগুলি উভয়পক্ষকে দিয়ে উচ্চারণ করিয়ে নেওয়া। কিন্তু প্রাণভয়ে পুরোহিতগণ এবং উভয়পক্ষের যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা আসর ভেঙ্গে দিয়ে নানাদিকে ছুটে পালালেন। সমস্ত ব্যাপারটা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

এর পরে গ্রামের অবস্থা কি প্রকার দাঁড়িয়েছিল তার আনুপূর্বিক কাহিনী কারো জানা নেই। প্রায় বছর খানেক পরে এই নাটকের যবনিকা উঠলো কলকাতায়। গ্রামের সেই অগ্নিকাণ্ড ও হত্যা-হানাহানির মধ্যে কেবল এইটুকু জানা গিয়েছিল, পাত্রী হলেন জমিদারের একমাত্র কন্যা, এবং যিনি পাত্র—তিনি গ্রামের পুরোহিত বংশের ছেলে ও পাত্রীর পিতার অন্নেই প্রতিপালিত। অতএব রাজকন্যার সঙ্গে রাজত্বটাও একদিন ওই পুরোহিতের ছেলের হাতে এসে যেতো। ছেলেটা যতই সুশ্রী আর সচ্চরিত্র হোক, আসলে বোধহয় ভাগ্যবান নয়। লেখাপড়া জানে বটে, তবে রুপোর চামচে মুখ নিয়ে জন্মায়নি।

বন্ধুরা বলে, ভাগ্যবান হতে পারতিস তুই, যদি ঘণ্টাখানেক সে-রাত্রে ভালোয় ভালোয় কেটে যেতো।

হিরণ হাসিমুখে বলে, পুরুত বংশের ছেলে আমি—রাজত্ব করাটা কপালে সইবে কেন?

চায়ের দোকানে ব'সে কেউ বলে, বেশ ত, কলকাতায় এসে বিয়েটা হতে পারতো!

হিরণের বন্ধু নীরেন বলে, কিন্তু রাজত্ব বাদ দিলে রাজকন্যার কতটুকু অংশ কাজে লাগে?

চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে অপর একজন বলে, যতটুকু অংশ সে কেবলমাত্র কন্যা।

নীরেন শেষ কথাটা জুগিয়ে দেয়,—অর্থাৎ এই বাজারে বউ ঘাড়ে নিয়ে কলকাতার পথে ঘুরে বেড়ানো। রাজত্ব ছাড়া রাজকন্যের ওজন বড়ই বেশি।

মেয়েটি কিন্তু খুব সুশ্রী। মানিয়ে যেতো হিরণের সঙ্গে।

হিরণ পুনরায় সহাস্যে বললে, এ আলোচনার কোনো দাম আছে ?

নিশ্চয়ই আছে,—হেরম্ব চেঁচিয়ে উঠলো, তোকে এই সেদিনও বলেছি, তুই না জমিদার মশাইকে কাকাবাবু বলে ডাকতিস ? তুই না তাঁর খরচে লেখা-পড়া শিখেছিস ? তোর কলকাতার বড়মানুষি ছিল কা'র টাকায় রে ? তোর এখন একটা কর্তব্য নেই তাঁদের প্রতি ?

হিরণ বললে, তাঁরা ঠিক এখন কোথায়, আমার জানা নেই। সে-রাত্রে গ্রাম ছেড়ে সবাই পালিয়েছিল যার যেদিকে সুবিধে। শুনেছি তাঁরা গিয়েছিলেন আগরতলার দিকে।

কলকাতার তাঁদের কোনো আত্মীয় নেই ?

আমি যতদূর জানি—নেই।

নীরেন বললে, বিমলাক্ষ ডাক্তারের ওখানেও কোন খোঁজখবর আসেনি ? তিনিও ত' তোর কাকাবাবুর ভাত খেয়ে ডাক্তারী পড়েছিলেন !

হিরণ বললে, বিমলাক্ষও কোনো খবর জানে না।

কোন এক সন্ধ্যায় এক পার্কে ব'সে আবার এই আলোচনাটাই উঠলো। হেরম্ব বললে, তোর কোনো আশা নেই হিরণ। লাখখানেক টাকার জমিদারী পাবি, আর পাঁচজন ভদ্রলোকের মতন বন্ধুবান্ধব নিয়ে টাকা ওড়াবি, কিংবা ঘরে বউকে রেখে সিনেমা কোম্পানী করতে ছুটবি,—কিন্তু তোর কপাল মন্দ ! এক ফুঁয়ে উড়ে গেল লাখোটাকার স্বপ্ন !

এবার নামো জীবনসংগ্রামে !

অর্থাৎ সদাগরী আপিসে মোটা ভাত-কাপড়ের চাকরি নাও, আর কোনো কেরানীকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করো।

হিরণ হেসে বললে, অঙ্কের নির্ভুল পরিণতি—কেমন ?

সবাই হাসলো। একজন বললে, তারপর ?

তারপর ! তারপর প্রবল বন্যার মতন পুত্রকন্যার আবির্ভাব। স্বাধীন ভারতে প্রাণপণে নাগরিকের সংখ্যা বাড়াও, এবং রেশন অপিসে গিয়ে এক-মুঠো চালের জন্য সারবন্দী হয়ে দাঁড়াও !

নীরেন বললে, তোর জমিদারীও গেল, জাতব্যবসাও রইলো না।

ঠিক এমনি একটা মানসিক অবস্থায় বিমলাক্ষ ডাক্তার হিরণকে ডেকে

পাঠালো। হিরণ গিয়ে হাজির হলো ভবানীপুরের এক পাড়ায় বিমলাক্ষের বাড়িতে। তখন মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ।

বিমলাক্ষ এখানে সপরিবারে বাস করে। তা'র নাম-ডাক আছে। পসার প্রতিপত্তি ভালো। হিরণের সঙ্গে এককালে তার যোগাযোগ ছিল গ্রামসূবাদে। অবশ্য উভয়ের অন্নবস্ত্রের ভাণ্ডার ছিল একই স্থানে। তারপর বিমলাক্ষ ডাক্তারী পাশ করে চলে গিয়েছে নিজের ভাগ্য অন্বেষণে—জমীদারী জীবেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে সম্পর্কটাও বিছিন্ন হযে গেছে। অনেকে বলতে পারে বিমলাক্ষ অকৃতজ্ঞ, —কেননা অন্নদাতার প্রতি যে-ঋণ থাকে, যে-নৈতিক বন্ধন স্বীকার করতে হয়, সেটা বিমলাক্ষ ভুলে গেছে।

হিরণকে ঘরে বসিয়ে বিমলাক্ষ বললে, তোমাকে ভাই ডেকেছিলুম একটা বিশেষ কারণে। জীবেন্দ্রবাবুরা হোলেন গ্রাম্য জমিদার, কলকাতায় ওঁরা অপরিচিত। অনেক জমিদারের বাড়িঘর, ব্যাঙ্কের জমা টাকা, একটা অপিস, কিছু-বা কাজ-কারবার—এসব কলকাতায় থাকে। ওঁরা মেঠো জমিদার কিনা—তাই ধান চাল নিয়ে থাকতেন গাঁয়ে,—কলকাতায় ওঁরা এই প্রথম।

হিবণ বললে, আপনি কি কোনো খবর পেয়েছেন?

হ্যাঁ পেয়েছি। ভয় পেযেছি সেজন্যে। কেননা আমার নিজের সময় বড়ই কম। দেখাশুনা করা কিংবা কোনো দাযিত্ব বহন করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

হিরণ উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, তাঁরা আছেন কোথায?

বিমলাক্ষ বললে, প্রায় এক বছর হলো তাঁরা কলকাতাতেই আছেন। এক তুমি আর আমি ছাড়া আর তাঁদের কোনো চেনা লোক এখানে নেই।

বিমলাক্ষ একখানা চিঠি বা'র ক'রে পুনরায় বললে, আমার চিঠি আমি পড়েছি, এ চিঠি তোমার। এ চিঠি প'ডে তুমি তোমার কর্তব্য বুঝে নিয়ো, ভাই।

চিঠিখানা না খুলেই হিরণ তা'র পকেটে রেখে দিল। পরে বললে, আপনি ঠিক কি বলতে চান আমি বুঝতে পারছিনে! তাঁরা কি আপনার কাছে সাহায্য চেয়েছেন?

বিমলাক্ষ হো হো ক'রে হাসলো। পরে বললে, শোনো ভাই, আমরা দু'জন বলতে গেলে একই ক্যাম্পের লোক। কিন্তু একদিন তাঁদের চারটি ভাত খেয়েছি বলে'ই যে চিরদিন তাঁদের বোঝা বইবো, এই শাস্তির থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দাও।

হিরণ পুনরুক্তি ক'রে বললে, আমাকে স্পষ্ট বলুন, তাঁরা কি আপনার সাহায্য চেয়েছেন ?

এখনো ঠিক চাননি, তবে চাইতে পারেন ত' ?

তাঁরা যাতে আপনার কোনো সাহায্য না চান, ··আমি সেদিকে লক্ষ্য রাখবো—এই ব'লে হিরণ উঠে দাঁড়ালো।

বিমলাক্ষ বললে, তোমাকে ধন্যবাদ। আর কিছু না, তবে কি জানো, আমি সম্প্রতি একখানা নতুন বাড়ি করেছি বালীগঞ্জে—এখন আমার পক্ষে কারো কোনো সাহায্যে আসা একেবারেই অসম্ভব।

হিরণ বললে, কিন্তু আপনিই ত' বললেন, ওঁরা কোনো সাহায্য চাননি।

না, চাননি—ঠিকই। তাঁরা হয়ত কখনো কারো কাছে হাত পাতবেন না তাও সত্যি—কিন্তু তাঁদের অবস্থা দেখে আমার মনে যদি দোলা লাগে। সেখানে আমার না যাওয়াটাই মনে হচ্ছে উভয় পক্ষের মঙ্গল।

বিমলাক্ষর স্ত্রী পর্দার ওপাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। বিমলাক্ষর সঙ্গে এক একক্ষণে তাঁব দৃষ্টি বিনিময় হচ্ছিল। বুঝতে পারা যায় বিমলাক্ষর বাক্-চাতুর্যের প্রতি তাঁর নিঃশব্দ সম্মতি ছিল।

হিরণ বললে, আপনার চিঠিতে কি তাঁরা কিছু লিখেছেন ?

বিমলাক্ষ বললে, চিঠিতে আর কি লিখবেন। অবিশ্যি আমার সঙ্গে দেখা হলে তাঁরা সুখীই হন। তবে কিনা—

হিরণ তাকিয়েই ছিল ডাক্তারের দিকে। বিমলাক্ষ পুনরায় বললে তোমাকে বলতে আমার বাধা নেই, ভাই। সে-বছর বিলেতে যাবার আগে আমি ওঁদের ওখানে গিয়ে নগদ 'হাজার পনেরো টাকা এনেছিলুম। ওঁরা দান করতেই চাইলেন, কিন্তু আমি ধার ব'লেই নিয়েছিলুম। চিঠিতে ওঁবা জানিয়েছেন সেই টাকার সামান্য অংশ এখন আমি দিতে পারি কিনা। প্রথমত, এখন আমাব পক্ষে কিছু দেওয়া অসম্ভব, দ্বিতীয়ত কবে যে পারবো তাও বলতে পারিনে। ও টাকাটা তাঁরা ভুলে গেলেই আমি খুশি হতুম, ভাই।

হিরণ বললে, লেখাপড়া কিছু ছিল কি ?

লেখাপড়া জীবেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে ?—বিমলাক্ষ হো হো ক'রে আবার হেসে উঠলো,—লোকটার দিল্ ছিল দরাজ, দুহাতে লোককে দিতে পারতো। আর লেখাপড়া থাকলে হাত-পা ত' আমার বাঁধাই থাকতো, তখন কি আর পালাতে পারতুম ? তা নয় হে, তা নয়। এ টাকাটা চেয়েছে ওর মেয়ে মীরা। মেয়েটি অবশ্যি আমাকে কোনদিন ভালো চক্ষে দেখেনি। আমার সাইকো-এনালিসিস পড়া ছিল ; আজ আমার স্ত্রীর কর্ণগোচরেই বলছি—মীরাকে

আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলুম অর্থাৎ যদি ওর মন পাই। কিন্তু আমার প্রস্তাব কানে ওঠামাত্র মেয়েটি প্রত্যাখ্যান করে। যাক্ সে অনেক কথা। আচ্ছা ভাই তোমাকে যেতে হবে অনেক দূর। বেলা অনেক হয়ে গেল—

হিরণ দুই পা এগিয়ে যেতেই বিমলাক্ষ গলা বাড়িয়ে বললে, কই এক পেয়ালা চাও খেয়ে গেলে না, হিরণ?

হিরণ মুখ ফিরিয়ে বললে, আমি দোকানে চা খাই, ভদ্রলোকের বাড়িতে খাইনে!

আকণ্ঠ ঘৃণা বীতরাগ নিয়ে হিরণ বেরিয়ে চ'লে গেল। মীরাকে মনে মনে সে ধন্যবাদ জানালো, ওই লোকটাকে সে চিনতে পেরেছিল অনেক কাল আগে। কিন্তু থাক্ সে-কথা। চিঠিখানা যে .স হাতে পেয়েছে এজন্যে ওই শয়তানকে একটি ধন্যবাদ দেওয়া চলে বৈ-কি। অবশ্য এটা দায়িত্ব এড়ানোর ফন্দি সন্দেহ নেই। তবু যে-নৈরাশ্য হিরণকে পেয়ে বসেছিল, তার থেকে মুক্তি। যে উদ্বেগ ছিল তা'র মনে, তা'র থেকে স্বস্তি। চিঠিখানা হাতে নিয়ে হিরণ নিরিবিলি এক জায়গায় এসে খুললো। হাত দুখানা কাঁপছিল।

চিঠিখানা মী.ার হাতেব লেখা সন্দেহ নেই। প্রথম সম্ভাষণ হোলো, সবিনয় নিবেদন। ভাষাটা অত্যন্ত নৈর্ব্যক্তিক। অর্থাৎ, বাবার ইচ্ছামতো আপনাকে জানাই, আপনাব সঙ্গে দেখা হলে তিনি সুখী হবেন। এখানে সকলেই আছেন। প্রায় এক বছব হোলো বাবা এখানে ভাডা আছেন। ইতি—ইতির পরে কোনো নামসই নেই।

নামটা মুদ্রিত হয় মনে। নামের সঙ্গে থাকে স্বপ্ন, থাকে মোহ, হয়ত বা কিছু আবেশ। মীবা নাম সই কবতে চায়নি, কেননা ওর মধ্যে ঘনিষ্ঠতার সংবাদ প্রচ্ছন্ন থাকে। তাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল, এবং সে-ঘনিষ্ঠতা সম্পূর্ণই পারিবারিক। একসঙ্গে তারা মানুষ, এবং একই সঙ্গে তৈরী হয়ে ওঠা। সুতবাং উভয়ের সম্পর্কটার মধ্যে ভালোবাসা অপেক্ষা আত্মীয়তাটাই বড়। অতএব বহুকাল পূর্বেকার ব্যবস্থানুযায়ী হঠাৎ একদিন বব ব'সে গেল বিয়ে করতে। বসেছিল সেই অভিশপ্ত সম্প্রদানেব আসরে! শঙ্খধ্বনি আর হুলুরবের মধ্যে সমগ্র অবস্থাটা পযালোচনা কবার সময়ও পাওযা যায়নি। কিন্তু সেই মুহূর্তে এলো ঝঞ্ঝা, এলো তাণ্ডব, এলো যুগান্তের অভিসম্পাতের বজ্রদণ্ড। সমস্তটা ছারখার ক'বে দিয়ে পালাতে হোলো দিগ্বিদিকে। সেই ভয়ানক দুঃস্বপ্নের কথা মনে করলে আজও হিরণেব গা শিউরে ওঠে।

অপরাহ্নের দিকে হিরণ এসে পৌছলো বেলেঘাটার এক বস্তির ধারে। এক সরু গলি চ'লে গেছে উত্তর দিকে। এপাশে আবর্জনার স্তূপ, ওপাশে

আঁস্তাকুড়। তার মনে একটু সন্দেহ হোলো। ঠিকানাটা খুলে একবার প'ড়ে নিয়ে সে বুঝতে পারলো, পথ তা'র ভুল হয়নি। বাইশ নম্বরটা ভিতর দিকেই হবে।

বাড়িখানা পুরাতন, নিচের তলাটা তা'র চেয়েও প্রাচীন। সামনের দিকে বালুর ধ্বস নেমেছে। মাঝখানে গোটা তিনেক কাঠের গরাদ-দেওয়া জানালা। ভিতরে ঢুকতেই সামনে মস্ত চওড়া নর্দমা,—তার পাশে এক ঝাড় সন্ধ্যামণির ঝোপ। হিরণ সন্তর্পণে ভিতরে গিয়ে ঢুকলো।

গুহার ভিতর থেকে যেমন হঠাৎ জন্তু বেরিয়ে আসে, তেমনি ক'রে বেরিয়ে এলো একজন ঝি। বললে, ওমা উটকো লোক দেখছি, কে গা তুমি।

হিরণ বললে, জীবেন্দ্রবাবু থাকেন এখানে?

জীবেন্দ্রবাবু? ওই যে ছাপাখানায় কাজ করে?

না, তিনি জমিদার!

জমিদার! পোড়াকপাল! তালপুকুরে ঘটি ডোবে না। জমিদার অমন সবাই। যারাই পালিয়ে আসে এদেশে, তাদেরই মুখে রাজাউজীরের গল্প।

হিরণ একেবারে হতবাক। ঝিয়ের কর্কশ কণ্ঠ ক্রমশ ঝনঝনিয়ে উঠলো। পুনরায় বললে, জমিদার! ঠিকে-ঝির মাইনে দেয় না দেড়মাস, বাড়িওয়ালার ঝাঁটা খাচ্ছে দিন রাত! পালিয়ে আসার সময় মনে ছিল না কল্‌কাতার খরচ? তা'র চেয়ে মান বাঁচিয়ে এখনও নিজেদের রাজত্বে ফিরে যাও না কেন!

হিরণ এবার একটু সামলে নিয়ে বললে, তুমি কি চেনো তাদের?

ঝি বললে, চিনিনে? একশোবার চিনি! আমি বাবা দাশু কৈবর্তর মেয়ে! গরীবের টাকা মেরে যে রাতারাতি পালাবে তার জো রাখিনি। আমিও চোখ রেখেছি চারিদিকে। তোমরা বাছা বরের মাসি, কনের পিসি। চাঁদপানা মুখ দেখে গলে যাই—মতলব কিছু ঠাওরাতে পারিনে।

হিরণ বিরক্ত হয়ে ভিতরের দিকে পা বাড়ালো, ঠিকে-ঝি চ'লে গেল আপন মনে গরগরিয়ে।

বাইরে রোদ রয়েছে, কিন্তু ভিতরটা এরই মধ্যে অন্ধকার। প্রথমেই পুরনো বাড়ির স্যাঁতাপড়া গন্ধ নাকে আসে। ভিতরে অসংখ্য লোকের চাপা কলরব। সম্ভবত অনেকগুলি ভাড়াটে একটি বাড়িতে থাকে। হিরণ কয়েক পা এগিয়ে বাঁ-হাতি বেঁকতেই এক বিধবা মহিলার মুখোমুখি হোলো।

হিরণ মুখ তুলে তাকিয়েই চমকে উঠলো। বললে, এ কি, এ কি চেহারা আপনার ছোটখুড়িমা।

সুমিত্রা বললেন, এসো হিরণ এসো—তোমার ছোটকাকাবাবু মারা গেছেন।

মারা গেছেন? কবে মারা গেলেন?

প্রায় মাস ছয়েক হোলো,—এই বাড়িতেই।—ভেতরে যাও, তোমার কাকাবাবু শুয়ে আছেন।

সুমিত্রার পায়ের ধুলো নিয়ে হিরণ এগিয়ে গিয়ে একটি ঘরে ঢুকলো। জীবেন্দ্রনারায়ণের শিয়রে ব'সে পাখার বাতাস করছিল মীরা। হিরণকে ঘরে ঢুকতে দেখে মীরা উঠে নতমুখে পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। জীবেন্দ্র এতক্ষণ চোখ বুজে ছিলেন।

হিরণের কণ্ঠরোধ হয়ে এসেছিল। যত দুরবস্থাই হোক, এমন ঘর এবং আসবাব-সজ্জা সে কল্পনাও করেনি। হাজিপুরের রাজবাড়িটা ভাসছিল তার চোখের সামনে। উপরতলাকার কক্ষে যেখানে ছোটখুড়ির স্বামী রামেন্দ্রনারায়ণ থাকতেন, সেই কক্ষে হাতির দাঁতের আসবাব-সজ্জাই ছিল প্রধান। পূর্ণিমার রাত্রে দেউড়িতে বাজতো রসুনচৌকি। শিবমন্দিরের কোলে বাহান্ন বিঘার দিঘি, সেটাকে ঘিরে ছিল পুষ্পবীথিকা—সেটা ছিল মেয়ে-মহলের নিজস্ব। এ ছাড়া দোলমঞ্চ, নাট-মন্দির, টোল, ছেলেমেয়েদের স্কুল, একপাশে অতিথিশালা। এত বড় যুদ্ধ-বিগ্রহ গেল, টের পায়নি কেউ। অভাব ছিল না কারো। হিরণ স্তব্ধ হতবাক হয়ে চেয়ে রইলো জীবেন্দ্রের দিকে।

পাখার বাতাস থেমে যেতেই জীবেন্দ্র চোখ খুললেন। সম্ভবত তিনি ডুব দিয়েছিলেন নিজের মধ্যে। চোখ খুলতেই দেখলেন সামনে হিরণ ব'সে রয়েছে। হাত বাড়িয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে হিরণ বললে, ছোটকাকাবাবু মারা গেছেন বিশ্বাস করা যায় না।—পাখাটা তুলে সে নিজের হাতে বাতাস করতে লাগলো।

জীবেন্দ্র ঈষৎ স্মিতমুখে শান্তকণ্ঠে বললেন, মারা গেছেন, কি বেঁচে গেছেন বলা কঠিন। তবে বুড়ো বয়সে বিয়ে ক'রে আমার কাঁধে চাপিয়ে গেল। তুমি কোথায় আছ, হিরণ? কোথায় ছিলে এই ক'মাস?

আমি থাকি ঠন্ঠনের কাছে।—হিরণের গলা যেন বন্ধ হ'য়ে আসছিল।

জানিনে কোথায় ঠনঠনে। বেলেঘাটার বাইরেও কলকাতা আছে, একথা আজও জানতে পারিনি। কি করো সেখানে?

এক ভদ্রলোকের বাড়িতে দুটি ছেলেকে পড়াই। সেখানেই নিচের তলায় ঘরে থাকি।

জীবেন্দ্র বললেন, সেই এক রাত্রে তোমাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। আমাদের দলে ছিল প্রায় একশোজন, কিন্তু কে যে কোন্‌দিকে গেল—বুঝতে পারিনি। হাসুবানুকে আমি বরাবর সঙ্গে রেখেছিলুম। কিন্তু আগরতলায় ঢোকবার

আগে সে হঠাৎ বললে, জ্যাঠামশাই, নিজের মাটি ছেড়ে কোথাও যাবো না, তোমাকেও যেতে দেবো না। আমি বললুম, আমার সঙ্গে থাকলে যদি তোকে মারে, হাসনু? হাসনু জিদ ধ'রে বললে যদি মারেই তবে সেই রক্ত ঝ'রে পড়ুক আমার নিজের মাটিতে।—আমার মনে হয় কি জানো, হিরণ? মেয়েটা এতদিন বোধহয় পাগল হয়ে গেছে। কোনোদিন হাসনুকে ভুলতে পারবো না।

হিরণ বললে, আপনি কি গ্রামের আর কোনো খোঁজ নেননি?

নিয়েছি বৈ-কি—জীবেন্দ্র বললেন, সাতদিন ধ'রে নাকি সব ছারখার হয়েছে,—এখন সেখানে মরুভূমি। কিন্তু হিরণ তোমাকে সত্যই বলছি, আমার কোন দুঃখ নেই।

এ কি বলছেন, কাকাবাবু?

না, দুঃখ নেই। যাদেরই হাতে সৃষ্টি, তাদেরই হাতে ধ্বংস। যাদের হাত থেকে অমৃত নিয়েছি বংশপরম্পরায়, আজ তাদের হাত থেকে এক পাত্র গরল নিতে হাত কাঁপবে কেন?

হিরণ বললে, কিন্তু, তারা ত' আপনার মান রাখলো না?

জীবেন্দ্র একটু উত্তেজিত হলেন। বললেন, তা'রা কি তোমার হাত থেকে সম্মান পেয়ে এসেছে কোনোদিন?

হিরণ চুপ ক'রে রইলো। ময়লা বালিশের মধ্যে মুখ ফিরিয়ে জীবেন্দ্র এক সময় বললেন, যাক্ গে ওসব কথা।—আমার নিজের পরিচয়টা ভুলে গেছি এক বছরে, এ আমার পরম শান্তি।

হিরণ চুপ করে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে মুখ তুলে বললে, আপনার শরীর কি অসুস্থ?

অসুস্থ হলে খুশি থাকি। কেননা ঘুমোবার ওষুধ হোল রোগ।—তোমরা গেলে আসামের দিকে, আমরা এখানে এসে নামলুম স্টেশনে। দিন দুই বাদে এক ভদ্রলোক আমাদের এ বাড়িতে এনে তুললেন। এখানকার ভাড়া হোলো চল্লিশ টাকা। বৌমা আর মীরা কেমন ক'রে যে ঘরকন্না চালাচ্ছেন বুঝতেই পারিনি। সঙ্গে কিছু জিনিসপত্র আর টাকাকড়ি ছিল কিন্তু ঘৃণা করলো সেগুলো আনতে। ভাবলাম নিয়ে যাবার অধিকার একটুও আমার নেই!

হিরণ বললে, কেন আনবেন না? সবই ত' আপনার।

জীবেন্দ্র হাসিমুখে বললেন, এতকাল তাই ভাবতুম বটে। কিন্তু আনবার সময় মনে হোলো, যা যা লুকিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তা আমার জিনিস নয়। নিজের কাছে তাই মাথা হেঁট হতে দিইনি। গোড়ার কথাটা তোমরা ভুলে

যেয়ো না হিরণ,—কেড়ে নিলেই অপরাধ হয় না! হাত তুলে যারা দেয়নি এতদিন, তাদেরই মাথা হেঁট হয়েছে আজ সবচেয়ে বেশি! থাক গে সে অনেক কথা। আমাদের এখানকার চিঠি পেয়ে তুমি যে এসেছ, এজন্য আমি খুবই আনন্দ পেলুম।

হিরণ বললে, আমি কোনোমতেই আপনাদের খোঁজ পাইনি। পেলেই যে ছুটে আসবো, এত' বলাই বাহুল্য।

খবর পেলেও আসে না এমন লোকও আছে হিরণ!

হঠাৎ ঘরে এসে দাঁড়ালো মীরা! বললে, বাবা—?

কেন রে?

আপনি একজনের কাছে আর একজনের সমালোচনা করচেন, এইটিই আপনার দুর্গতি।

আমি ত' কারো নাম করিনি, মীরা।

নাম না করলেও বিমলাক্ষবাবুর কথা ওঁর মনে পড়বে।

হিরণ এবার একটু ব্যস্ত হয়ে বললে, না না, বিমলাক্ষবাবু শীঘ্রই আসবেন, তিনি ঠিক খবর নেবেন। রোগীদের নিয়ে তিনি আজকাল খুব ব্যস্ত কিনা—মানে, আমি তার সঙ্গে কথা বলে দেখেছি।

তিনি না এলেও বাবা খুব ব্যস্ত হবেন না।—এই বলে মীরা আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। জীবেন্দ্র বললেন, তোমার সম্বন্ধে আমি অনেকদিন ভেবেছি হিরণ, কিন্তু কোনো কূলকিনারা পাইনি। আগেকার ব্যবস্থাটা দাঁড়িয়ে থাকলে তোমার জীবনটা অন্যরকম হতে পারতো। তোমার মা-বাপ ভাই-বোন কেউ নেই, তোমার বাবার মৃত্যুকালে আমি একটা কথা দিয়েছিলাম, সেই কথাটার শেষরক্ষা হোলো কিনা আমি নিজেও বুঝতে পারলুম না। তুমি এখন কি করবে ভাবচো?

হিরণের কণ্ঠে উত্তেজনা দেখা দিল। বললে, আপনার মুখের দিকে চেয়ে আপনার অন্নবস্ত্রে আমি মানুষ হয়েছি। তার ফল হয়েছে এই, কোনো কাজেই আমার যোগ্যতা নেই। আপনার খরচে কলকাতায় থাকতুম, ইউনিভারসিটিতে পড়তুম, টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতুম, মোটর গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াতুম,—আর বন্ধুরা ভাবতো আমি নাকি রাজবাড়ীর পায়ো। এর উল্টো দিকটা ভাবিনি, আমি এমনই নির্বোধ। ফলে আজ আমার দাঁড়াবার কোনো উপায় নেই। সুখে আর সম্পদে মানুষ হয়েছি ব'লেই আমি নষ্ট হয়ে গেছি। এদেশের অনেক অকর্মণ্য জীব এম-এ পাস করে, ওতে বাহাদুরী কিছু নেই।

হিরণ চুপ ক'রে গেল। জীবেন্দ্র এবার শান্তকণ্ঠে বললেন, তোমার নালিশের অনেকখানি মিথ্যে নয়, এ আমি জানি। কিন্তু দেশের অবস্থা এমন দাঁড়াবে, কে জানতো? কে জানতো, দেশের স্বাধীনতাই হবে আমাদের জীবনে ভোজবাজীর খেলা? আমাদের ওলোট-পালটের ওপর ইতিহাসের পাতা ওল্‌টাবে, একথা আগে জানলে অন্য ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতুম!

হিরণ উঠে দাঁড়িয়ে বললো আজকের মতন যাই, কাকাবাবু।

নিজের সন্তানের মতন ক'রে যাকে মানুষ করেছেন, তাকে এত সহজে ছেড়ে দিতে জীবেন্দ্রর মন উঠছিল না। কিন্তু আর একটু পরেই হয়ত আলো জ্বালার কথা উঠবে, হয়ত কেরোসিন কিংবা মোমবাতির অভাবটা চোখে পড়বে, অথবা রাত্রির আহার্য আয়োজনের প্রশ্ন দেখা দেবে,—অতএব তিনি চুপ করে থেকেই এক প্রকার সম্মতি দিলেন। হিরণ আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

বারান্দার ধার দিয়ে পেরোবার সময় সে দেখলো, ওরই মধ্যে একটুখানি কোণের দিকে সদ্য বিধবা সুমিত্রা আচমন ক'রে জপে বসেছেন। শান্ত বন্ধ দুটি চোখ। সামনে বোধকরি গঙ্গা জলের পাত্র, গলায় আঁচল দেওয়া। রাজবাড়ির ছোট বধূরাণী ছিলেন সুমিত্রা, বয়স ত্রিশ-বত্রিশের বেশি নয়। বেশ মনে পড়েছে, ছোটকাকাবাবু প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে ওঁকে বিয়ে ক'রে এনেছিলেন। সে আজ প্রায় বছর চোদ্দ আগেকার কথা। হিরণ তখন ক্লাস নাইনে। মীরা এবং হাসনু তখন ক্লাশ সেভেনে। কিছু ভাবতে গেলেই হাসুবানুর কথা মনে আসে। হাসনু কারোকে পরোয়া করতো না। কোনো ব্যক্তিকে তুমি ছাড়া কখনো আপনি বলেনি সে। কাকাবাবুর মতন রাশভারী লোককে সে মুখের ওপর তামাশা করতো। বলতো, জ্যাঠামশাই, তুমি যেমন চমৎকার শুদ্ধ বাংলায় কথা বলো, ওতে তোমার পাকাদাড়ি রাখা উচিত ছিল!

কাকাবাবু বলতেন, কেন রে?

রবিঠাকুরকে লোকে এত মানতো কেন, জানো না?

দূর পোড়ামুখি!

নয়ত কি? ভেবে দেখো ব্রজেন শীল, পি. সি রায়, দাদাভাই নারোজী, লিয়াকৎ হোসেন, অম্বিকা মজুমদার, মহর্ষি দেবেন্দ্র—আর বলবো?

ওর সঙ্গে কাকাবাবুও ছেলেমানুষ হতেন। বলতেন, তোর তালিকার বাকি অংশটা আমি ভরিয়ে দিই। রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, গান্ধী, নেহরু, সুভাষ,—এদের মস্ত মস্ত দাড়ি দেখিসনি ছবিতে?

নাটমন্দিরে সকলের মধ্যে হাসির রোল প'ড়ে যেতো। ছোট বৌমা পর্যন্ত লুটোপুটি—কাকাবাবু আর সেখানে দাঁড়াতেন না। হাসন্থ হোতো জব্দ।

বারান্দা পেরিয়ে যাতায়াতের পথটায় পৌঁছতেই মীরা তাকে ডাকলো, একটু দাঁড়ান—

হিরণ ফিরে দাঁড়ালো। মীরা বললে, একটি অনুরোধ আপনাকে করা দরকার। আমারই আগ্রহে আপনাকে চিঠি দিয়ে ডাকা হয়েছে।

কি বলুন?

বাবার অবস্থা দেখে গিয়ে আপনি যেন তাড়াতাড়ি কোনো উপকার করবার চেষ্টা করবেন না, এই আমাদের অনুরোধ।

মীরার গলার আওয়াজ অকম্প। হিরণ বললে, আপনার কথা আরেকটু আমাকে বুঝিয়ে বলুন।

মীরা বললে, আমরা পথে এসে দাঁড়িয়েছি বটে, কিন্তু তাই ব'লে কারো কাছে বাধ্যবাধকতা স্বীকার করবো না।

হিরণ হাসিমুখে বললে, গায়ে প'ড়ে লোকের উপকার করা বিড়ম্বনা, আমি জানি। বেশ, আপনার কথা আমি মনে রাখবো। আর কিছু বলবেন?

নতমুখে মীরা বললে, একটা বিশেষ ঘটনার কথা হয়ত আপনার মনে থাকতে পারে। সেটা কিছু ভেবেছেন?

হ্যাঁ, ভেবেছি।

আপনি কি মনে কবেন আমার বিয়ে সেদিন হয়েছিল?

হিরণ বললে, সংস্কৃত ভাষায় চিরকালই আমি কাঁচা—আপনারা জানেন। টোপর মাথায় দিয়ে ব'সে গোটাকয়েক মাত্র মন্ত্র আরম্ভ কর হয়েছিল, সেগুলোর বাংলা আমার জানা নেই। আপনি বসেছিলেন সামনে সিঁথিমৌর মাথায় দিয়ে। কাকাবাবু তখন সবেমাত্র আপনার আর আমার হাত দুখানা নিয়ে ধরেছিলেন,—এমন সময় বাড়ি আক্রমণ, আগুন জ্বলে উঠলো, খামারে সেরেস্তায় একটা খুনও হয়ে গেল। আমাদের পুরুত পালালো, কাকাবাবু আপনাকে তুলে নিয়ে গেলেন অন্দরমহলের মন্দিরের দিকে, আর বর-বেশে আমি কোথায় যে গা ঢাকা দেবো বুঝতে পারলুম না।

হিরণের বিবরণে কিছু কৌতুকবোধ ছিল। কিন্তু মীরা তা'র অক্ষুণ্ণ গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললে, আপনি আসল কথাটার জবাব দিন।

আমাকে তবে আরো দিন তিনেকের সময় দিতে হবে।

আপনি কি এক বছরেও একথাটা ভাবেননি?

হিরণ বললে, সত্যি কথাটা বলাই ভালো। আমি সময় পাইনি। মোট কথাটা এই, বুড়ো বয়সে দুজনের বিয়ে হচ্ছিল—ঘটনাচক্রে ফেঁসে গেল!

মীরা নতমুখেই দৃঢ়কণ্ঠে বললে, আমি সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট ক'রেই ভেবেছি। আমার বিয়ে হয়নি, এই কথাই আমি বিশ্বাস করি। আমার কোনো বন্ধন, কোনো বাধ্যবাধকতাই আমি স্বীকার করবো না। এ নিয়ে কোনো আলোচনাও আমি সইবো না!

হিরণ বললে, দাঁড়ান, আমার নিজেরই বিয়ে কি হয়েছিল আপনি মনে করেন?

এটা তামাশার সময় নয়। মীরা চ'লে যাবার জন্য পা বাড়ালো।

আচ্ছা, আরেকটু দাঁড়ান্—হিরণ একবারটি বাধা দিল। বললে, আমি তবে মোটামুটি জেনেই যাই যে, রাজত্বের সঙ্গে রাজকন্যাও ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে গেল!

মীরা বললে, রাজকন্যার চেয়ে রাজত্বের প্রতি লোভ ছিল আপনার কে না জানে! কিন্তু রাজত্ব যদি বা কোনোদিন ফেরে রাজকন্যে আর ফিরবে না,—এ আমি জানিয়ে দিচ্ছি।

হিরণ সহাস্যে বললে, মনে হচ্ছে, আমরা দুজনেই মস্ত বিপদ থেকে বেঁচে গেছি। কিন্তু আপনি আমার আসল কথাটার জবাব দিলেন না। বিয়ে কি হয়েছিল আমার?

মীরা মুখ তুলে বললে, সংস্কৃত ভাষায় আমিও কাঁচা—সবাই জানে! সে আর দাঁড়ালো না, মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেল।

একা একাই দাঁড়িয়ে হিরণের একমুখ হাসি দেখা দিল। ওধার থেকে ছোট-খুড়ীর মৃদু স্তবমন্ত্রটা কানে আসছিল। কিন্তু সেও আর দাঁড়ালো না, হাসি মুখেই বেরিয়ে এলো বাইরে।

নর্দমার পাশ ঘেঁষে সন্ধ্যামণির ঝোপটা পেরিয়ে সে পথে নামতেই দেখলো বছর বারো বয়সের একটি ছেলে এসে ভিতরে ঢুকছে। হিরণ হাসিমুখে তার হাতখানা ধরে বললে, অত্রি, চিনতে পারিস?

আচমকা নূতন মানুষের দিকে অত্রি মুখ তুলে তাকালো। হাসিমুখে বললে, জামাইবাবু, তুমি যে—?

ছেলেটির গলা ধ'রে আদর ক'রে হিরণ বললে, না রে, জামাইবাবু আর নই,—আবার তোর বড়দা হয়েছি! ওটা ব'লে আর ডাকিসনে।—তুই এখানে কোন্ ইস্কুলে পড়ছিস?

ইস্কুলে এখনো ভর্তি হইনি!

কেন ?

বই কিনে দেবে কে ? মাইনে কে দেবে ?

হিরণ চুপ ক'রে গেল। একটু পরেই অত্রি বললে, বেল্লিকমশাই বলেছেন, আসছে মাসে আমি ইস্কুলে ভর্তি হবো।

বেল্লিকমশাই ! তিনি আবার কে রে।

অত্রি বললে, এ বাড়িটা তাঁর, তিনি ত' বাড়িভাড়া নেন না ? ঠিক তোমার মতন দেখতে তিনি।

তিনি কি আসেন এখানে ?—হিরণ কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

হ্যাঁ, রোজ আসেন। এসেই টাকা দেন।

হিরণ সহাস্যে বললে, বাড়িভাড়া নেন না, আবার টাকাও দেন ? এমন দাতাকর্ণ কলকাতায় আর কজন আছে ? টাকাটা তো জ্যাঠামশাইয়ের হাতে দিয়ে যান বুঝি ?

অত্রি বললে, না, আমার হাতে দেন।

হিরণ বললে, আমি আবার আসবো, কেমন ? আজ যাই—

আসবে ত ঠিক ? আমাকে কিন্তু চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেতে হবে !—অত্রি গলা বাড়িয়ে তার দাবিটা জানিয়ে রাখলো।

বেশ ত', ঠিক নিয়ে যাবো।

হিরণ হন্ হন্ ক'রে চ'লে গেল ! অত্রি ভিতরে ঢুকে সোজা চ'লে এলো যে জায়গায় রান্নাবান্না হয়। ডাকলো, মা ?

সুমিত্রা জবাব দিলেন, কেন রে ?

তুমি যে বললে সন্ধ্যেবেলা ফিরলেই খেতে দেব ?

মীরা সহাস্যে বললে, সন্ধ্যেবেলার মানে কি আগে বল্ ?

অত্রি বললে, যখন সবাই আলো জ্বালে।

আমাদের আলো কি জ্বলছে এখন ?

বা রে আমাদের কি তেল আছে, না মোমবাতি আছে ?

মীরা তাকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, আস্তে বল্ রে ভাই—তোর জ্যাঠামশায়ের কানে গেলেই তাঁর অসুখ বাড়বে।

সুমিত্রা চারটি মুড়ি বা'র ক'রে দিলেন অত্রির হাতে।

সমস্ত ঘরকন্নাটাই মন্থরগতি। এর কারণ হোলো স্বাভাবিক অবসাদ। দ্রুততার জন্য কোনো দায় নেই। এর মধ্যে অনেকখানি অংশ অবাস্তব। অনেকটা দিনাতিপাত, যাকে বলে কোনোমতে জীবন ধারণ। এর বাইরে কোন্ জীবন-সম্ভাবনা আছে, জীবেন্দ্র জানেন না : এর ভিতরে ভবিষ্যতের

কোন্ আশ্বাস আছে, সুমিত্রা জানেন না। কিন্তু প্রতিবাদ আছে সুমিত্রার মনে, পরিকল্পনা আছে মীরার চালচলনে। সুমিত্রার ভিতরে জেগে ওঠে বিক্ষোভ, মীরার মধ্যে জাগতে থাকে দুর্বার মুক্তির একটা ক্ষুধা। সেই মুক্তি তাকে পেতে হবে।

মীরা বললে, ছোটখুড়ি, এবেলা রান্না হবে না?

সুমিত্রা বললেন, ভাত সেদ্ধটাকে রান্না বলে না, মীরা!

হাসিমুখে মীরা বললে, তা হলে মনে হচ্ছে তোমার ভাঁড়ারে অন্তত চাল আছে চারটি।

সুমিত্রার মুখের অপরূপ লাবণ্যের উপর যেন চাপা ঝঙ্কার আভাস দেখা গেল। বললে, হ্যাঁ, আজকের মতন আছে বৈ-কি। কাল থেকে বোধ হয় রাস্তায় দাঁড়াতে হবে আঁচল পেতে।

তাঁর কণ্ঠের গাম্ভীর্য দেখে মীরার মুখে আবার এক ঝলক হাসি দেখা দিল। বললে, কি জানো ছোটখুড়ি, এই এক বছরে বদ্‌অভ্যাসটা এখনও যায়নি। খাবার সময় হ'লেই ক্ষিদে পায়। তুমি-আমি রাস্তায় দাঁড়ালে আঁচল ভরেও উঠতে পারে।

সুমিত্রা বললেন, রাস্তায় দাঁড়িয়েই ত' আছি। তবে ভাতের সঙ্গে নুন পেলেই তুমি দেখছি গদগদ হ'য়ে ওঠো! ধন্য রুচি তোমার!

এটা নতুন রুচি, মন্দ কি। হিরণ ঠিকই বলে গেছে, সুখ আমাদের নষ্ট করেছে। ভাত আর নুনের পথটা তুমি-আমি জানতুম না। কিন্তু নুন-ভাতও যাদের জোটে না, যাদের কথা পড়তুম খবরের কাগজে,—তাদের সঙ্গে একাকার হওয়া মন্দ কি?

সুমিত্রা বললেন, ও কথায় সান্ত্বনা আছে, অবস্থার প্রতিকার আছে কি? চোদ্দ বছর আগে কি এই কথা ছিল যে, বারো বছরের ছেলেটার হাত ধ'রে হাজিপুরের ছোট বৌরাণী এসে পথে দাঁড়াবে? যারা আগুন নিয়ে খেলা করেছে এতদিন, তা'রা আগে থেকে সাবধান হ'তে পারতো না?

মীরা বললে, কাদের কথা বলছ তুমি, ছোটখুড়ি?

যারা আমার বিয়ে দিয়ে এনেছিল, আমাকে বিয়ে ক'রে এনেছিল।

কিন্তু চিরস্থায়ী ব্যবস্থাটা তারা নিজের হাতে ত' ভাঙেনি!

সে আমার জানবার কথা নয়, মীরা।

বোঝবার কথা ত' বটে!

সুমিত্রা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আমি বি-এ পাশ করিনি, মীরা। মিথ্যে তর্কে আমি আনন্দ পাইনে। ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিলে বিধবার কি

পরিণাম ঘটে জানিনে, কিন্তু আজ ছেলেটাকে দাঁড় করিয়ে তুলবো কেমন ক'রে বলতে পারো? তুমি কি বলতে চাও, ওই বেল্লিকের হাত থেকে ভিক্ষে নিয়ে অত্রির পেট ভরাতে হবে চিরকাল?

সুমিত্রার চোখ দুটো জ্বালা ক'রে জল এলো।

মীরা বললে, তা বলিনি ছোটখুড়ি, তর্ক আমিও করতে চাইনে। বেশ ত' এই প্রতিজ্ঞাই আমাদের থাক্ অত্রিকে না খাইয়েই বড় ক'রে তুলবো! কাকা গেছেন, বাবাও যাবেন আমি জানি। থাকবো তুমি আর আমি। পারবো না এ প্রতিজ্ঞা রাখতে?

আমাদের দাম কতটুকু মীরা? তার চেয়ে বরং এই অপমানের থেকে বেরিয়ে পড়াই ভালো। বছরখানেক ত' কেটে গেছে, এবার বড়ঠাকুরকে নিয়ে হাজিপুরে গিয়ে দাঁড়ালে মন্দ কি?

মীরা বললে, বাবাকে নিয়ে তুমি যদি যাও আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু আমি নিজে আর ফিরবো না। সন্তানকে ছেড়ে মা প্রাণভয়ে পালায় না, কেননা সেখানে বত্রিশ নাড়ীর বাঁধন। আমরা প্রাণভয়ে আমাদের চোদ্দ-পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে এসেছি! এর কারণ কি জানো? কঠিন করে আমরা ভালোবাসিনি, ধারালো দাঁত দিয়ে নিজের মাটি আমরা কামড়ে থাকিনি,—চ'লে আসতে হয়েছে সেইজন্য। তোমরা যাও ছোটখুড়ি, আমি যাবো না। বাবার কথা আমি মানি। যা কেড়ে নিয়েছে তা আমাদের নয়। লজ্জা আর অপমান মুখে মেখে আমি নিজে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারবো না।

সুমিত্রা বললেন, তুমি যদি না যাও বড়ঠাকুর যাবেন কার ভরসায়?

মীরা বললে, বাবা যাবেন ব'লে আমি মনে করিনে, কেননা ওঁর মন আর জোড়া লাগবে না। তা ছাড়া যে অসুখ ওঁকে ধরেছে, ওঁর পক্ষে নতুন জীবন এখন আর অসম্ভব। তুমি একা যাও ছোটখুড়ি,—যদি সেখানে গিয়ে দাঁড়াও,—তবে দেওয়ান-নায়েব-গোমস্তা লোক-লস্কর সকলেই তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে। আমাদের কপালে যাই থাক, অত্রির জীবনটা নষ্ট হবে না।

বাইরে পায়ের শব্দ হোলো। তারপর দুটি লোক গলার আওয়াজ দিয়ে ভিতরের দিকে এলো। বেল্লিকমশাইয়ের আবির্ভাবে মীরা আর সুমিত্রা একটু আড়ষ্টভাবে এক পাশে স'রে গেল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি ডাক্তার, বুঝতে পারা যায়। বেল্লিকমশাই বললেন, না সোজা চ'লে আসুন—এ নিজের বাড়ির মতন। আমি এঁদের কেউই নই, তবু যখন-তখন আসি যাই।

দুজনে জীবেন্দ্রবাবুর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

জীবেন্দ্র চোখ বুজে শুয়েছিলেন। জ্বর সামান্যই, কিন্তু আজ সমস্ত দিন ছাড়েনি। তিনি চোখ বুজে রয়েছেন। সেটা নিদ্রা অথবা তন্দ্রা কোনোটাই নয়, সে কেবল জীবিত থাকা মাত্র। তবু ডাক্তার যখন হাতখানা ধরে নাড়ী পরীক্ষা করতে লাগলেন, জীবেন্দ্র বললেন, বেণু মল্লিক থেকে যিনি বেল্লিক রেখেছিলেন, তিনি রসিক লোক সন্দেহ নেই। কি বলো ভাই বেল্লিক?

বেণুবাবু বললেন, নিজের সুখ্যাতি আর কেমন ক'রে করি বলুন? ও নামটা আমিই রেখেছি মা-বাপের উপর টেক্কা দিয়ে!

বাইরে ব'সে সুমিত্রার মুখে পর্যন্ত হাসির রেখা দেখা দিল। মীরা সেই হাস্যে যোগ না দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে যাতায়াতের পথের দিকে তাকালো। ঠিক সেই সময়ে একটি ছোকরা মাথায় মস্ত একটি ঝুড়ি নিয়ে ভিতরে এসে তাড়াতাড়ি নামালো। ঝুড়ির মধ্যে রাশি পরিমাণ খাদ্যসম্ভার।

এ সব কি রে, ভণ্ডুল?

এসব আপনাদের জন্যে। ভাঁড়ারের জিনিসপত্তর, ময়রার দোকানের জিনিস, বেনেমশলা,—সব। বাবু এখনো আসেনি?

হ্যাঁ, এসেছেন। ভেতরে আছেন।

এত ফল-পাকড় মিষ্টিমালাই কেন রে? সুমিত্রা প্রশ্ন করলেন।

বা, আজ যে একাদশী,—কাল সকালে এসব লাগবে।

মীরা পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। ঘৃণা ও চিত্তগ্লানি পলকের মধ্যে তার সমগ্র সত্তাকে যেন জর্জরিত করেছে। দানটা গৌরবের যখন সেটা দেওয়া যায়, কিন্তু দানটা হয়ে ওঠে ঘৃণ্য যখন ওটা হাতে ক'রে নিতে হয়। এর চেয়ে মৃত্যু হোক, এর থেকে মুক্তি হোক।

সুমিত্রা কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললেন, বেল্লিকমশাইয়ের কাছে এই দেনা আমরা শোধ করবো কেমন ক'রে?

মীরা কোনো কথার জবাব দিল না—।

২

রাজত্ব এবং রাজকন্যার উল্লেখ ক'রে মীরা যে তীব্র বিদ্রূপ করলো, ওতে হিরণ আহত হয়নি। দরিদ্র পুরোহিত বংশের ছেলে সে, এটা সে কোনো-কালেই উপলব্ধি করেনি, কেননা জীবেন্দ্রনারায়ণের ঐশ্বর্যের মধ্যে সে লালিত। কামনার আগেই যে কাম্যবস্তু পায়, তার পক্ষে লোভ করার প্রয়োজন নেই।

লোভ ছিল না বলেই নৈরাশ্যও তা'র নেই। রাজত্ব পায়নি ব'লে সে ক্ষুব্ধ নয়, রাজত্বটা তাকে মানুষ হ'তে দেয়নি ব'লেই সে তিক্ত। রাজকন্যার প্রতি তা'র লোভ ছিল না, ছিল রাজত্বটার উপর—মীরার এই উক্তি হাস্যকর। এটা মীরার মার-খাওয়া মনের খেদোক্তি। সবাই জানে মীরা তা'র স্ত্রী। সম্প্রদানের অনুষ্ঠান লণ্ডভণ্ড হোক, দীর্ঘকালের বিচ্ছেদ ঘটুক, উভয়ে উভয়ের কাছ থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যাক্—তবু মীরার স্বামী তাকে হতেই হবে, এই নির্ভুল সত্যটা রয়ে গেছে সকলের মনে। এটা প্রণয়কাহিনী নয়, রসকল্পনা নয়, বন্ধুবান্ধব মহলে হাসিতামাশার বিষয়বস্তু নয়—এটা সম্পূর্ণ পারিবারিক ব্যাপার। মীরা যদি আজ একথা বিশ্বাস করে, বিবাহ তার হয়নি, বন্ধনদশা ঘটেনি কিংবা বৈবাহিক বাধ্য-বাধকতার প্রশ্ন আসেনি,—তা'তে ক'রে উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটে না, কারণ মীরা জানে হিরণ ছাড়া অপর কারোকে স্বামী ভাবা সম্ভব নয়, হিরণও জানে মীরা ছাড়া স্ত্রী হয় না। এ নিয়ে নিন্দা রটেনি গ্রামে, কানাকানি রটেনি কর্মচারী মহলে, আত্মীয়বন্ধু সমাজে এ নিয়ে সমালোচনাও ওঠেনি। তা'রা দু'জনে একই গ্রামের ছেলে মেয়ে, কিন্তু বাল্যকাল থেকে হিরণ তার নিজের গ্রামেই জামাই ব'লে পরিচিত। পাঠশালার গুরুমহাশয়ের কাছেও সে জামাই, জেলে আর জোলাদের আড্ডাতেও সে জামাই। আজ যদি মীরা অথবা সে—এই নিশ্চিত সম্পর্কটাকে অস্বীকার ক'রে বিচ্ছিন্ন হয়ে চ'লে যায়, তবে এই আঘাতে পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক সমাজটাই শিউরে উঠবে, এবং হয়ত এই আঘাত জীবেন্দ্রনারায়ণও সহ্য করতে পারবেন না। সেই শোচনীয় পরিণামটা কি প্রকার হ'তে পারে সেটা ভয়ের কথা।

একটা বিশেষ জীবন-ব্যবস্থার সঙ্গে হিরণ পরিচিত, কিন্তু গত এক বছর থেকে সে ব্যবস্থাটা লোপ পেয়েছে। ওপর তলাটা তার জন্য ছিল, কিন্তু নীচের তলাটায় যে তার ভিত্তি, সেটা আগে চোখ পড়েনি। মানুষের দুঃখ অভাব হতাশা ব্যর্থতা—এসব আছে বৈ-কি, কিন্তু নিজের জীবনে এদের প্রকাশ হতে পারে, এটি অভিনব। জীবেন্দ্রর বিছানার পাশে ব'সে সে যে ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে এসেছে, সেটি তার অন্তরের। সম্পদের থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে এ দুঃখ তা'র নেই, কিন্তু বিলাসের মধ্যে থেকে সে মানুষ হয়েছে—এজন্য আন্তরিক বিরক্তি তার এসেছে। সমস্যাটা হোলো এই, নিজের পুরোনো ছাঁচটাকে সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলে নতুন ক'রে নিজের হাতেই আবার নিজেকে গ'ড়ে তুলতে হবে—ওদিকে মীরার মনেও এই কথাটাই আছে। বিয়ে হয়নি ব'লে সে বিশ্বাস করতে চায়, কেননা বিয়ে হ'লে নিজেকে ভাঙবার স্বাধীনতা নিজের হাতে থাকে না, নিজেকে গড়বার স্বাধীনতাও সম্পূর্ণ একক হলেই

তবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থটা বুঝতে পারা যায়। মীরা মুক্তি চাইছে অত্যন্ত চিন্তাধারার থেকে, একটা স্বতঃসিদ্ধ পরিণামের থেকে। মীরার মধ্যে একটা প্রাণশক্তির দুর্বার বেগ আছে ব'লেই সে সমস্ত কিছু অস্বীকার করার জন্য প্রতিজ্ঞা নিতে চাইছে। কিছুকাল সে নিঃসঙ্গ থাকুক, নিজের পথটা সে আবিষ্কার করুক।

হিরণকে কাছে ডেকে বন্ধুরা বলে, যা হোক ক'রে একটা চাকরি নে, নৈলে দাঁড়াবি কেমন ক'রে? দুবেলা দুমুঠো ভাত আর দশ টাকা হাতখরচে ছেলে পড়িয়ে জীবন কাটাবি?

কেউ বলে, এম-এ পাস করেছিস, কোনো কলেজে মাস্টারি নে না।

হিরণ বলে, পড়াশুনো করা সহজ, মাস্টারি করাব ধাত আলাদা। শিক্ষিত হলেই শিক্ষক হয় না।

তা হলে অন্য চাকরি?

পেলে করি বৈ কি। হিরণ জবাব দেয়।

এই প্রকার অগোছালো মনের অবস্থাব মধ্যে একটা কথা অন্তত ভুলতে পারা যায় না যে জীবেন্দ্রনারায়ণের পরিবারের প্রতি তা'র একটা কর্তব্য আছে। তিনি সরকারী সাহায্যেব জন্য কখনও আবেদন করবেন না, এ নিশ্চিত। তিনি হাত পাতবেন না কোথাও। অভাবের জন্য কাঁদবেন না কারো কাছে। অত্যন্ত ভদ্র মন তাঁর, কিন্তু অতিশয় আত্মাভিমানী। তাঁর সেই পর্বতপ্রমাণ আত্মাভিমানের কাছে ছেলেমেয়েদের অভাব অভিযোগ নগণ্য। তিনি মুখ বুজে মৃত্যুবরণ করবেন সে ভালো, কিন্তু মুখ তুলে কখনও দাবি জানাবেন না। মীরা তা'র পিতার আদর্শে প্রতিপালিত। সেইজন্য প্রথম দিনই হিরণকে সে জানিয়েছে যে, কোনো সাহায্যে তাদের প্রয়োজন নেই। অনুগৃহীতের কাছে অনুগ্রহ নেওয়াটা তার সম্মানে বাধে। হিরণ যে তাদেরই অন্নে মানুষ।

এমনি এলোমেলো চিন্তাধারার মাঝখানে হঠাৎ একদিন দুপুরবেলায় বাধা পড়লো। বাইরে কে যেন কড়া নাড়ছে। ছাত্রটি স্কুলে গেছে, বাড়ির কর্তারা বেরিয়েছেন, ঝি-চাকরের কোনো সাড়াশব্দ নেই,—মেয়েরা অন্দরমহলে রয়েছেন অনেকটা দূরে। আহার ও বাসস্থান ছাড়া হিরণের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নেই।

আবার মৃদু কড়া নাড়ার শব্দ।

হিরণের ঘরের দরজাটা বাইরের দিকে খোলা যায়, সেটা রাস্তার ওপর। ভিতর থেকে যখন কেউ সাড়া দিল না, তখন সে উঠে গিয়ে রাস্তার দিককার

দরজাটা খুললো। সেটা চওড়া গলিপথ, গলি দিয়ে মিশেছে বড় রাস্তায়। দরজা খুলে সে মুখ বাড়ালো। মুখ বাড়িয়ে সে স্তব্ধ হয়ে গেল।

বিশ্বাস করা কঠিন। এ যুগে মানুষ মার খেয়েছে, কিন্তু মানবতা মার খেয়েছে অনেক বেশি। কেন না সব চেয়ে আপন যে মানুষ, জাতিবিচ্ছেদের ফলে সব চেয়ে বেশি দূরে সে সরে গেছে। বিশ্বাস করা কঠিন এই জন্য যে, যার সঙ্গে কোনোকালেই আর দেখাশোনা হবার কথা নয়, এবং যার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখা কিছুতেই আর চলে না,—সে এসে দাঁড়িয়েছে চোখের সামনে। হাসনু এসে বড় দড়জাটার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে হাসিমুখে।

হিরণের সর্বশরীরে কেমন একটা কাঁপন লেগেছে,—সেটা আনন্দের, বেদনার, উত্তেজনার,— কিসের, বলা কঠিন। হাসনু এগিয়ে এসে তার ঘরে ঢুকলো। বললে, এতদিন পরে দেখা, পায়ের ধুলো নেবো কি?

হিরণ শান্তভাবে বললে, দাঁড়াও, আগে সবটা ভেবে নিই। কিন্তু এ আমি ভাবতেও পারিনি, হাসনু।

হাসনুর চোখের তারা দুটো পলকের জন্য যেন দপ্ করে উঠলো। বললে, ভাবতে পেরেছিলে কখনো যে, বাংলা দেশ ভাগ হবে? ভাবতে পেরেছিলে, স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সর্বস্বান্ত হবে—থাক্, বসো—অনেক কথা আছে। আজ আমাকে খুব নতুন মনে হচ্ছে, না?

হিরণ বললে, ঝড়ের পাখি হঠাৎ ছুটে এলো মুঠোর মধ্যে,—চমক লাগে বৈ-কি!

হাসনু বললে, তাই বুঝি আমাকে দেখে তোমার চোখের পাতা ভিজে উঠেছে? তুমি না পুরুষমানুষ? আমি কিন্তু কাঁদতে আসিনি তোমাদের কাছে। ঝড়ের পাখি কাঁদে না,—কাঁপে!

হিরণ তার বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে অনেকটা সময় নিল। তারপর বললে, কবে এলে হাজিপুর থেকে?

দিন তিনেক।

আমার ঠিকানা দিল কে?

হাসনু বললে, সাগর ছেঁচলে মানিক ওঠে, আর কলকাতা খুঁজলে তোমার ঠিকানাটা পাবো না বলতে চাও? বিমলাক্ষ ডাক্তারের কাছে একখানা চিঠি ছুঁড়েছিলাম দেশ থেকে, আর জবাবে পেলুম তোমার ঠিকানা। এখানে নাকি তুমি ছেলে পড়াও? এই ছিল তোমার কপালে? হাসনু একবার এদিক-ওদিকে তাকিয়ে পুনরায় বললে, এখানে কেউ কিছু বলবে না ত'? কেমন লোক এরা? মুসলমানের মেয়ে শুনলে মারতে আসবে না?

হিরণ বললে, তুমিত' ভয় পাবার মেয়ে নও!

প্রাণভয় নয়, মান হারাবার ভয়। আর প্রাণভয়ই বা কম কি? আসবার সময় দেখে এলুম ঠন্‌ঠনের কালীর সামনে হাড়িকাঠ, জাপটে ধ'রে বলি দিয়ে দুবার বন্দেমাতরম্‌ বললেই হোলো। বাধা দিলেই বলবে, দেশের শত্রু! বলবে, ঘরের শত্রু!

হাসনু হাসলো, হিরণ হাসতে পারলো না। একটু পরে হিরণ বললে, এখানে কোথায় এসে উঠেছ?

হাসনু বললে, কেন, একি ভিন্‌ দেশ? এখানে আমার বাড়ি নেই? ঘর নেই? আপন মানুষ নেই?

হিরণ হাসিমুখে বললে, তোমার এত আছে এখানে জানলে আগে থেকে ত' ভালোই হতো? অন্ন আর আশ্রয়ের জন্যে আমাকে এত ঘুরতে হোতো না।

হাসনু ঘরের মধ্যে একবার চঞ্চলভাবে পায়চারি ক'রে নিল। পরে বললে পরের মন খুঁজতে জানলে পরের ঘরও খুঁজে পেতে। তোমাদের চোখ ছিল নিজের দিকে, পরের জন্য দৃষ্টি ছিল না।—যাক গে, জ্যাঠামশাইয়ের খবর কি আগে বলো ত'? মীরা? ছোটখুড়ি? অত্রি?—কেমন আছে সবাই? আছে কোথায়?

হিরণ বললে, যাদের অন্নে আমরা মানুষ, তাদের দুর্গতি নিয়ে নাই-বা আলোচনা করলুম।

হাসনু তার মুখের দিকে তাকালো। চোখ দুটো বড়-বড়, নীচের দিকে একটু সুর্মার আভা। শান্ত মৃদুকণ্ঠে বললে, দুর্গতি? কেন?

প্রাণ নিয়ে পালালে লোকে সঙ্গে নিতে পারে কতটুকু?

তবে এই যে সেখানকার লোকেরা সবাই বলে জ্যাঠামশাই নাকি মালখানা থেকে সমস্ত সোনারুপো হীরেমুক্তো আর নগদ টাকা সঙ্গে এনেছেন?

হিরণ বললে, তাদের এসে ওই বেলেঘাটার বস্তির মধ্যে ঢুকতে বলো—যেখানকার এঁদো গর্তে শুয়ে তোমার জ্যাঠামশাই বিনা চিকিৎসায় মরতে বসেছেন, আর মীরা একখানা ভালো কাপড়ের অভাবে বাপের জন্যে ডাক্তার ডাকতে পারে না।

ভাঙা গলায় হাসনু বললে, তারপর?

তারপর আর কি! অত্রি একমুঠো মুড়ি পেলে খুশি, ওরা ভাতের সঙ্গে নুন পেলে খুশি।

কি বলছ তুমি হিরণ?

থাক, আর না শুনলেও চলবে।—হিরণ থামলো।

অনেকক্ষণ পরে হাসনু নিঃশ্বাস ফেললো। তারপর বললে, মীরা সিঁদুর পরেছে কপালে?

না।

সে কি? কেন? তোমরা থাকোনি একসঙ্গে?

না।

অধিকতরো বিস্ময়ে হাসনু প্রশ্ন করলো, কি জন্যে? বনিবনা হয়নি বুঝি?

হিরণ বললে, আমাদের ধারণা, বিয়ে আমাদের হয়নি।

কিন্তু সকলেরই যে ধারণা, তোমরা স্বামী-স্ত্রী? মানে ঝগড়া-ঝাঁটি কিছু করেছ নাকি? সত্যি বলো ত'?

হিরণ হাসিমুখে বললে, তুমি ছাড়া আর কারো সঙ্গে কখনো ঝগড়া করেছি?

হাসনু প্রশ্ন করলো, ছোটকাকার খবর কি? তেমনি নেশাভাং ক'রে পড়ে থাকেন নাকি?

বেঁচে থাকলে নেশাভাঙের পয়সা অবিশ্যি জুটতো না!

অ্যাঁ? কি বললে?

ছোটকাকা পটল তুলেছেন মাস ছয়েক আগে!

হাসনু স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে চোখ দুটো তা'র জলে ভ'রে উঠেছে। হঠাৎ এক সময় মুখ তুলে বললে, আমরা থাকতে জ্যাঠামশায়ের এই অবস্থা হোলো? তুমিও কিছু করতে পারলে না?

হিরণ বললে, আমি এক বছর পরে তাঁদের দেখতে পেলুম এই সেদিন।

কেন? একসঙ্গে ছিলে না?

তাঁরা চলে গিয়েছিলেন আগরতলায়। আমি পালিয়েছিলুম আসামে। আর কিছু জানতে চাও?

হাসনু চুপ ক'রে রইলো। অনেকক্ষণ পরে নিজেকেই ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, চলো। চলো যাই—

কোথা যাবো?

চলো আমার সঙ্গে। জানতে চেয়ো না কিছু। তোমার এখানে থাকা হবে না। ছাইভস্ম যা আছে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এসো।

হিরণ একটু থতিয়ে বললে, কি বলছো? এ বাড়িতে যে ছেলে পড়াই? খেতে পাই?

অপমানের ভাত আর খেতে হবে না। এক্ষুণি চলো। এ আমি সইবো না হিরণ।

হাসনু হিরণকে উত্তেজিত ক'রে তুললো। কিন্তু হিরণ বললে, এদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা আছে যে? না ব'লে চলে যাওয়া কি ভালো হবে?

হাসনু বললে, চিঠি দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ো। দেড় পয়সার মাস্টারি নিয়ে এত মাথা না ঘামালেও চলবে। নাও, আর দেরী করো না। বেলাবেলি বেরিয়ে পড়ি।

তুমি নিয়ে যাবে কোথায়?

চুলোয়। নাও, ওঠো শিগ্‌গির।—হাসনু তাড়া দিল।

অগত্যা হিরণকে উঠতে হোলো। ছোট একটা ফুল-কাটা টিনের বাক্স ছিল তা'র সম্বল—তাইতে দু'তিনটে জামা-কাপড় গুছিয়ে নিলো। হাসনু বললে, মীরার কাণ্ডজ্ঞান আছে। ভাগ্যি তোমার মুখ চেয়ে কপালে সিঁদুর তোলেনি। এ-ঘরে বউ এনে রাখতে কোথায়, শুনি?

হিরণ বললে, দরকার হ'লে মাথায় রাখতুম।

মাথার বড়াই আর কোরো না, হিরণ। নিজের মাথায় লাঠি যারা মারে, তাদের মাথায় কতটুকু ভার সয় জানা আছে! এসো বেরিয়ে পড়ি।

বাইরের দরজা দিয়েই ওরা বেরিয়ে নামলো গলিপথে। গলির থেকে বড় রাস্তায় পড়ে এক সময়ে হিরণ বললে, আমার রাঁধা অন্ন নষ্ট করলে এ বাজারে, মনে রেখো।

হাসনু চলতে চলতে বললে, রাঁধা অন্ন ব'সে ব'সে খায় কা'রা জানো? যারা খোঁটায় বাঁধা থাকে। এখন বুঝতে পারি তুমি কোনোদিন মানুষ হবার চেষ্টা করোনি, শুধু ঘর-জামাই হ'তে চেয়েছিলে। তোমার ওপর এই কারণেই মীরার বিরক্তি এসেছে। বুদ্ধিহীন সততা মেয়েদের দু'চোখের বিষ।

হিরণ বললে, আমি কি হাত পেতে কিছু চেয়েছিলুম?

কিছু চাইবার দরকার হয়নি! না চাইতেই পেয়েছ, তাই অভাবের চেহারাটা বুঝতে শেখোনি—আচ্ছা, নিজের চেহারাটা ভালো ক'রে একবার দেখেছ? সেই রূপ তোমার মিলিয়ে গেল কোথায়? কেমন ক'রে নিজের চেহারা নষ্ট করলে?

হিরণ এবার হেসে উঠলো। বললে, দুপুরবেলায় একটি ছেলেকে ঘর থেকে বা'র করে এনে কোনো মেয়ে যদি তার রূপের আলোচনা করে—স্তবে ব্যাপারটা দাঁড়ায় কেমন।

হাসনু বললে, একটু রহস্যজনক দাঁড়ায়, সন্দেহ নেই। কিন্তু নোংরা কল্পনার বাইরেও রসের কল্পনা আছে, মানো ত'? আমার নিজের রূপ নেই, কিন্তু প্রাণ আছে। তোমার রূপ ছিল, প্রাণ ছিল না। তোমাকে যদি আমার

রূপবান ক'রে তুলতে পারি, তবে পুতুল খেলাতেও আনন্দ পাবো, সেটা কম নয়। এবার বলো ত, সেই বিলেত-ফেরতা পাষণ্ডর খবর কি?

কে?

সেই যে বিমলাক্ষ ডাক্তার। আমার চিঠির জবাব দিয়েছে, কিন্তু তোমাদের কথা একবর্ণ লেখেনি। জ্যাঠামশায়ের খবর জানতে চেয়েছিলুম, এক লাইন উল্লেখও করেনি। ও কি কিছু সাহায্য করেছে?

হিরণ বললে, এক তিলও না।

দেনার টাকা দিয়েছে?

তুমি ওকে আজও চিনতে পারোনি?

বটে!—এই যে বাস এসেছে, এসো উঠি।

হিরণকে নিয়ে হাসনু বাসে উঠলো। সামনের দিকে গিয়ে একটা সীটে দুজনে পাশাপাশি বসলো। হাসনুর পরনে কালাপাড় শাড়ি, গলায় একগাছা লাল পলার মালা, হাতে পাতলা দুগাছি সোনার চুড়ি। মাঝখানে সে সামান্য একটু ঘোমটা টানার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ভরা দুপুরের হাওয়ায় সেই ঘোমটা উড়ে গেল। হাসনুর চেহারায় আজও সেই আগেকার সাঁওতালি অভ্যাসটা রয়ে গেছে। রংটা শ্যামবর্ণ, কিন্তু স্বাস্থ্যের আশ্চর্য বাঁধুনির জন্য রংটা আর চোখে পড়ে না।

মোটর-বাস ভবানীপুরের দিকে ছুটে চললো।

বিমলাক্ষর বাড়ির দরজা খোলা ছিল। হাসনু কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে ভিতরে ঢুকে এগিয়ে চললো। হিরণ স্যুটকেস হাতে নিয়ে চললো পিছু পিছু।

সিঁড়ি বেয়ে সোজা উপরের বারান্দায় উঠে হাসনু ডাকলো, বিমলদা?

ডাক্তাররা দুপুরবেলাটায় ঘুমায়; ভালো ডাক্তাররা চিকিৎসা সংক্রান্ত বিলেতী অথবা মার্কিন কাগজ ওলটায়। বিমলাক্ষ জেগেই ছিল। সাড়া দিয়ে বললে, কি?

হাসনু সোজা গিয়ে ঢুকলো বিমলাক্ষর ঘরে। ওরা অবাক? ডাক্তারের স্ত্রী বিছানায় ঘুমোচ্ছিলেন। তিনি ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলেন। বিমলাক্ষ সহাস্যে বললে, আরে, তাড়কারাক্ষসী যে? কবে এলে? বসো বসো—হিরণ, এসো ভাই।

চেয়ার টানাটানি আর বসাবসির পর ডাক্তারের স্ত্রী সুষমা বললেন, তুমি ত' সেই হুজুগে-মেয়েই আছ, কই একটুও ত' ঠাণ্ডা হওনি?

হাসন্থ বললে, অসময়ে ঘুম ভাঙালে একটু রাগ হয়, না বৌদি? কি করবো বলো, তোমাদের চিঠিতে কোনো খবর না পেয়ে নিজের গরজেই ছুটে এসেছি।

বিমলাক্ষ বললে, গরজটা কিসের?

গরজটা হোলো জ্যাঠামশাইয়ের শেষ বয়সের ভালো মন্দ। আমি ত' তাঁর খবর পেয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারিনে বিমলদা।

সুষমা ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, তোমার ক্ষমতা কতটুকু? তুমি কি ডুবো নৌকো টেনে তুলতে পারবে?

হাসন্থ বললে, নৌকো এখনও ডোবেনি, বৌদি। তোমরা যদি সাহায্য করো জ্যাঠামশাইকে টেনে তোলা যায় বৈ-কি।

বিমলাক্ষ বললে, কোন্ সাহায্যের কথা বলছ?

হাসন্থ বললে, আর্থিক! কায়িক! সাংসারিক!

সুষমা বললেন, আমাদের কথা যদি বলো তা হ'লে তোমার ভুল হবে। ডাক্তারদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে আজকাল কত সময় লাগে জানো ত'?

হাসন্থর কণ্ঠে ঈষৎ উত্তাপ দেখা গেল। বললে, বিমলদা, বৌদির মুখে কি তোমার বক্তব্যটাই শুনছি?

বিমলাক্ষ বললে, তর্কে লাভ নেই। খুব ভালো হতো যদি হিরণ এর মধ্যে মোটা টাকার একটা চাকরি পেয়ে যেতো।

হিরণ?—হাসন্থ উত্তেজিত হয়ে বললে, ওকে মানুষ ব'লে মনে করো কেন? ও বসে ছিল রাজত্ব আর রাজকন্যের আশায়,—হঠাৎ দুটোই গেল ফসকে। ও চাকরি ক'রে খাওয়াবে সবাইকে? পোড়া কপাল! যেদিন দেখলুম, আড়ালে ব'সে ও কবিতা লেখে, সেদিনই জানলুম, ওর ভবিষ্যৎ একেবারে ফর্সা!

বিমলাক্ষ বললে, তুমি কবিতা লেখো নাকি, হিরণ?

হিরণ বললে, এখন ভাবলে লজ্জা পাই।

হাসন্থ বললে, শোনো বিমলদা, তুমিও শোনো বৌদি—তুমি, আমি, হিরণ—আমরা সবাই জ্যাঠামশায়ের খেয়ে মানুষ। তার আজ দুর্দিন, দুর্গতি, অন্ন জোটে না! যদি এসময়ে আমরা কিছু করতে না পারি তবে মুখ দেখাতে পারবো না কোথাও। ধরো, তোমার আজ এই যে উন্নতি,—এর মূলে জ্যাঠামশাই, মানো ত'?

বিমলাক্ষ বললে, বলো না কি বলতে চাও?

পড়াশুনোর খরচ, হস্টেলে থাকার খরচ, যা কিছু খরচ তোমার—সবই তিনি যুগিয়ে এসেছেন—

তোমরাও নিয়েছ! আমি একা দোহন করিনি!

সবাই নিয়েছি, দু'হাত ভ'রেই নিয়েছি। তবুও তোমার সঙ্গে আজ ঝগড়া করতে এসেছি, বিমলদা। কেন জানো?

কেন বলো?

হাসন্থ বললে, জ্যাঠামশাইয়ের হাত থেকে তুমি নিয়েছ সব চেয়ে বেশি। কেননা নগদ টাকা তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দেন নি।

বিমলাক্ষ বললে, তিনি ত' আর কাউকে পাঠাননি!

সুষমা বললে, নিয়েছে সবাই, কিন্তু উনিই ধরা পড়েছেন।

বৌদি, তোমার কপালের সিঁদুরের বয়স আড়াই বছরের বেশি নয়। স্বামী কি তোমার কাছে এর মধ্যে সব গল্প করেছে?

বিমলাক্ষ বললে, পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ কি, তাড়কা?

কাসুন্দি ঘাঁটতে আমি আসিনি—হাসন্থ বললে, আমি এসেছি মনুষ্যত্বের নামে দাবি জানাতে তোমাদের কাছে। কেউ জানে না বিমলদা, আমি কিন্তু জানি—দেড় বছর আগে তুমি নগদ পঁচিশ হাজার টাকা জ্যাঠামশাইয়ের কাছ থেকে এনেছো।

বিমলাক্ষ উত্তেজিত হয়ে বললে, উনি বুঝি তাই এখানে রটিয়ে বেড়াচ্ছেন?

হাসন্থ বললে, ছি, উনি এত ছোট নন্! কিন্তু তুমি কি জানতে যে, ওঁর সিন্দুকের চাবি থাকতো আমার কাছে? সেই এক রাত্তিরে তোমরা নৌকায় ওঠবার আগে জ্যাঠামশাই আমাকে ডেকে তুলে বললেন, হাসন্থ চাবিটা দাও, মা। বিমল শুধু হাতে ফিরতে চাইছে না!—জ্যাঠামশাই চাবি নিয়ে গেলেন। কয়েকদিন পরে মীরার কাছে জানলুম, অঙ্কটা পঁচিশ হাজার। কথাটা কি মিথ্যে, বিমলদা? সবসুদ্ধ যোগ করলে কি লাখখানেক টাকা হবে না? বৌদিদি হয়ত জানে, অনেকখানিই তোমার রোজগারের টাকা,—কিন্তু আমি ত' জানি, তোমার ওই বাগানবাড়িটা হচ্ছে জ্যাঠামশাইয়ের টাকায়।

হিরণ বললে, তুমি কি ঝগড়া করতে এলে, হাসন্থ?

সুষমা বললে, ঝগড়া নয়,—ও এসেছে আমাদের কাঠগড়ায় তুলতে!

হাসন্থ বললে, এ তোমার ভুল বৌদি। টাকা নেবার সময় বিমলদা কাঁচা কাজ করেনি। কোনো সাক্ষীসাবুদ প্রমাণ দস্তখত—কিচ্ছু রেখে আসেনি। ও যদি আমাকে আজ শুধু হাতে ফিরিয়ে দেয়, আমার বলবার কিছু থাকবে না।

বিমলাক্ষ ফস ক'রে বললে, তুমি টাকাকড়ি নেবার মতলবে এসেছ?

নিশ্চয়ই! হাসন্থ সহাস্যে বললে, তুমি তো জানো আমি জেদী মেয়ে। জ্যাঠামশাইয়ের জন্যে এসেছি, তাই ত' এত জোর!

তা হলে তোমার জ্যাঠামশাইকেই ডেকে নিয়ে এসো। তিনি যদি চান, আমার সাধ্যমতো দেবো।

হাসমু এবার খুব হেসে উঠলো। বললে, অর্থাৎ তিনিও আসবেন না, আর তোমাকেও দিতে হবে না—এইত'? এ কৌশল থাক, বিমলদা। তুমি বুদ্ধিমান লোক, রোজগার করবে জীবনে অনেক। আজকে অন্তত হাজার খানেক টাকা তোমার হাত থেকে না নিয়ে আমি উঠতে পারবো না ভাই।

এ তুমি কি বলছ, তাড়কা?

এটা জিদের কথা, ভিক্ষের কথা নয়!

সুষমা বললে, টাকা এখন উনি কোথায় পাবেন ভাই!

হাসমু বললে, তোমার হাতের ওই চুড়ির সেটটা পেলেই ত' হাজার দুই টাকা হয়, বৌদি।

এ আমার বাবার দেওয়া, এ তোমাদের জ্যাঠামশাইয়ের টাকায় হয়নি।

হাসিমুখে হাসমু বললে, বিলেত-ফেরত বড়লোকের হাতে তিনি মেয়ে দিয়েছেন, দামী চুড়ি দেবেন বৈ-কি। তিনি কি আর জানতেন, তাঁর এই ডাকসাইটে জামাই হলো গাঁয়ের এক অনাথা বিধবার সন্তান? মেয়ের বিয়ে দেবার সময় একথা কি তাঁর জানা ছিল যে, জমিদারর বাড়ির বাটনা বেটে আর কুটনো কেটে বেয়ানকে ছেলে মানুষ করতে হয়েছিল?

বিমলাক্ষ হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। বললে, খামোকা দুপুরবেলা ঘরে ঢুকে আমার স্ত্রীর কানে এসব কথা তোলার মানে কি, হাসমু?

হাসমু বললে, টাকা পেতে দেরী হচ্ছে যে, সেই কারণে।

সোজা হয়ে বসলো বিমলাক্ষ। বললে, এসব কি তোমার বাড়াবাড়ি হচ্ছে না?

একেবারেই না বিমলদা। তুমি যদি একটা পরিবারকে না খাইয়ে রাখতে পারো আমি দুটো কথা বলতে পারিনে?

কিন্তু টাকা যদি তোমাকে না দিই?

হাসমু বললে, কেন দেবে না বলো?

তুমি কে যে, তোমার কথায় টাকা দেবো?

আমি কে—একথা বুঝি বৌদিকে আজও জানাওনি? তাহলে আমাকে এখানে ব'সে আরও কিছু গল্প শোনাতে হয়!

সুষমা বললেন, তোমার গল্প কতখানি বিশ্বাসযোগ্য?

সবটাই! এই যে সাক্ষী—শ্রীমান হিরণ! তোমার স্বামীকে তুমি কতটুকু জানো, বৌদি?

বিমলাক্ষ বললে, হিরণ—আমার সঙ্গে এরকম শত্রুতা করার কি কারণ ছিল তোমাদের বলতে পারো? এংরেজিতে একে বলে, ব্ল্যাক-মেইল করা!

হাসনু আবার হাসলে ছুরির ফলার মতো। বললে, বাংলায় বলে, বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুল! অবশ্যি তোমার সম্পর্কে অন্য গল্প আমি বলতে চাইনে, কেননা তার সঙ্গে আমারও যোগ আছে। সেটার নৈতিক চেহারা খুব ভালো নয়!

সুষমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। বললে, কি বললে তুমি?

যা মুখে আসা উচিত নয়, তাই বলছি বৌদি!

স্ত্রীর সামনে স্বামীকে অপমান করা,—এ শিক্ষা বোধ হয় তোমাদের সমাজেই চলে!

হাসনুর চোখ দুটো এবার দপ্ ক'রে জ্বলে উঠলো। বললে, তুমি কি আমাকে খুঁচিয়ে আগাগোড়া সব জানতে চাও?

বিমলাক্ষ উঠে দাঁড়ালো। বললে, তুমি এত নীচে নামবে আমি জানতুম না হাসনু। আচ্ছা, টাকা নিয়ে নাও। হাজার টাকাই নাও। আমিও ব'লে রাখছি—যত দিনে পারি তোমাদের জ্যাঠামশায়ের টাকা শোধ করবো।

বিমলাক্ষ দ্রুতপদে পাশের ঘরে চলে গেল। মুখ ফিরিয়ে গলা বাড়িয়ে সুষমা বললে, বাজে কথায় ভয় পেয়ে টাকা দিলে তোমার চলবে?

মিনিট পাঁচেক বাদে বিমলাক্ষ এঘরে এলো। এক তাড়া নোট হাসনুর সামনে ফেলে দিয়ে বললে, ভদ্রলোক মাত্রেই মেয়েছেলেকে ভয় করে কেন, আজ বুঝতে পারছি।

টাকাটা তুলে নিয়ে হাসনু বললে, আবার কবে আসবো, বিমলদা?

হিরণকে আমি জানাবো।

না, তুমি আমাকেই জানাবে। ভয় পেয়ো না, তোমার চিঠি পেলে হিরণকেই আমি পাঠিয়ে দেবো। আচ্ছা, আজ তবে উঠি।

এসো।

সুটকেসটা হাতে নিয়ে হিরণ আগেভাগে এগিয়ে গেছে। হাসনু কয়েক পা গিয়ে একবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, দেখো, আমরা যাবার পর স্বামী-স্ত্রীতে যেন ঝগড়া বাধিয়ো না, ভাই।

সুষমা ততক্ষণে চোখের সামনে থেকে স'রে গেছে। হাসনুর কথার জবাবে বিমলাক্ষ চাপা তিক্তকণ্ঠে বললে, তোমাদের সঙ্গে মেলামেশা বোধ হয় এই আমার শেষ।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হাসনুর হাসির শব্দ শোনা গেল।

পথে নেমে হিরণ বললে, ও ব্যাপারটা কি হাসনু ? মানে তোমার সঙ্গে বিমলাক্ষর যোগাযোগটা ?

হাসনু পথের মাঝখানেই আবার হেসে উঠলো। বললে, ওর হাতের লেখা চিঠিগুলো রেখে দিয়েছি আমি। তাই আমাকে দেখলেই ও আঁৎকে ওঠে।

কী আছে চিঠিতে ?

রসগদগদ প্রণয়-প্রার্থনা—তোমার কবিতার খোরাক।

হিরণ বললে, তোমার সঙ্গে মেলামেশা তা'হলে বিপজ্জনক বলো ?

হাসনু বললে, কুড়ি বছর একসঙ্গে থেকে যদি এই তোমার ধারণা হয়, তবে তাই ! কিন্তু তুমি কি ভুলে গেছ বিমলাক্ষকে ? জ্যাঠামশাইয়ের কানে কি রকম বিষ ঢালতো, মনে নেই ? মনে নেই, মীরা ওকে ঘেন্না করতো কি জন্যে ?

তোমার সঙ্গে ওর ব্যাপারটা কি ?

ব্যাপারটা কিছুই নয়। আমি ওকে প্রায়ই তামাসা করতুম, আর ওটাকেই ও ভাবতো প্রণয়। ওই চতুর লোক—কিন্তু আমার কাছে এসে দাঁড়ালেই বোকা ব'নে যেতো। তোমার মনে আছে, যেদিন আমার বি-এ পাশের খবর বেরোয়—জ্যাঠামশাই সেদিন মস্ত ভোজ দিয়েছিলেন ? বিমলাক্ষ সেদিন এসেছিল টাকা নিতে। টাকা নিয়ে যাবার সময় সন্ধ্যাবেলা ভাবলো উপরি পাওনাটা নিয়ে গেলে মন্দ কি ? আমাকে ডেকে নিয়ে গেল ঠাকুর-দীঘির ওপারে নিরিবিলিতে। সেখানে হঠাৎ আমাকে জাপটে ধ'রে বললে, আমি নাকি ওকে পাগল করেছি ! আমি বললুম, বেশ ত', পাগল যদি ক'রেই থাকি তবে পাগলা-গারদে যাও ? বিমলাক্ষ বললে, আমি তোমায় ভালবাসি। আমি বললুম, এই সামান্য কথাটা বলবার জন্যে বাঁশঝাড়ের পাশে টেনে আনলে কেন ? যাই হোক, ওর মতলব ভালো ছিল না। বললুম আজকের মতন নৌকোয় ওঠোগে। এরপর জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে আলোচনা ক'রে তোমার ভালোবাসার জবাব দেবো।—লোকটা ভয় পেয়ে সেদিন পালিয়েছিল। যাবার সময় চিঠিগুলো ফেরত চেয়েছিল, আমি বললুম—সেগুলো মীরার কাছে রেখেছি। মীরার কাছ থেকে চেয়ে নিও।

হিরণ খুব হেসে উঠলো।

মোটর বাসে উঠে ওরা এলো তালতলার মোড়ে। সেখান থেকে গলি ঘুঁজি পেরিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে এক বাড়িতে এসে উঠলো। হাসনু বললে, এসো আমার ঘরে—সুটকেসটা রাখো।

হিরণ বললে, তুমি কি এখানে থাকো ?

তুমিও থাকবে এখানে।

এ কা'দের বাড়ি?

সম্পর্কে আমার মামা।

কিন্তু আমি থাকবো কেমন ক'রে?

হাসনু বিরক্ত হয়ে বললে, তোমাকে পুরুষ ব'লে মনে করলে থাকতে বলতুম না। এসো, সময় নেই। এক্ষুনি বেরোতে হবে। মুখ হাত ধুয়ে নাও। খাবে কিছু?

হিরণ বললে, মোটেই না।

হাসনু তা'র পায়ের দিকে তাকিয়ে বললে, ওই কি জুতোর ছিরি? ঘরজামাই না হতে পারলে বুঝি নতুন জুতো কিনবে না।

হিরণ বললে, যারা ছেলে পড়ায় তাদের জুতো এর চেয়ে ভালো হয় না। এখন কোথায় যাবে, তাই বলো।

বিমলাক্ষর টাকাটা জ্যাঠামশাইকে পৌঁছে দিতে হবে না? কতদিন তাঁকে দেখিনি বলো ত? বুঝতে পারো না সমস্ত মন প'ড়ে রয়েছে তাঁর পায়ের তলায়?

হাসনুর বড় বড় দুই চোখে বাষ্প জমে উঠলো। হিরণ আর কিছু বললে না,—মুখ হাত ধুয়ে তৈরী হয়ে এসে বললে, চলো।

দাঁড়াও, ভেতরে একটিবার ব'লে আসি।—

মিনিট দুয়েকের জন্য ছুটে একবার ভিতরে গিয়ে হাসনু আবার বেরিয়ে এসে বললে, চলো।

দুজনে এক হোটেলে ঢুকে চা খেলো, তারপর গিয়ে উঠলো এক জুতোর দোকানে। প্রতিবাদ করা চলবে না,—হাসনু জন্মগ্রহণ করেছে শাসন করার জন্য। লোকে বলবে, ও মেয়েটা নায়িকা,—কিন্তু হিরণ ওকে জানে অধিনায়িকা। ওর দম্ভটা অনেক সময় আক্রমণশীল, কিন্তু তা'র প্রকাশটা সুন্দর। ওকে আঘাত করো সইবে, কিন্তু অবহেলা ক'রে এড়িয়ে গেলে সইবে না।

নতুন জুতো কিনে হাসনু হিরণের পায়ে পরালো। বললে, মেয়েমহলে তোমার আদর কেন জানো?

হিরণ বললে, আছে কিনা তাই ভাবছি।

এখনো আছে। কিন্তু সে তোমার নির্বোধ সরলতার জন্যে নয়, তোমার চেহারাটার জন্যে।

সরল মানেই বোকা। তোমাকে দেখলেই আমি বোকা বনে যাই!

হাসনু পথের মাঝখানেই হেসে উঠলো।

নানাপথ পেরিয়ে তা'রা এসে পৌছলো বেলেঘাটার বস্তির সেই নোংরা গলির মোড়ে। তখনও সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব আছে। কিন্তু গলির চেহারা দেখে হাসনুর যেন পা সরছিল না। চোখ দুটো জ্বালা করছে। এমন একটা গ্লানি, যার ভাষা নেই; এমন বেদনা যার সঙ্গী নেই। তবু যেতে হোলো এগিয়ে। হিরণের হাতখানা একবার ধ'রে সে যেন কি বলতে গেল। কিন্তু থাক্ এখন। বলতে গেলে কান্না আসতে পারে।

বাড়ির ভিতরে ঢুকতে গিয়ে সামনেই পড়ল মীরা। হিরণ ছিল হাসনুর পিছনে। হঠাৎ বিস্ময়ে মীরা থমকে দাঁড়ালো। তারপর বললে, এদেশে যে তুমি?

হাসনু গিয়ে মীরার হাত ধরলে। বললে, এ আমারই দেশ, মীরাদি।

দেখতে এলে আমরা বেঁচে আছি কিনা?

সম্ভাষণটা উগ্র অভিমানে ভরা। কিন্তু পরক্ষণেই হাসনু শক্ত পায়ে দাঁড়ালো। বললে, বাঁচতে জানলে মরবে কেন, ভাই?

মীরা বললে, আমরা বাঁচবো, কিন্তু যাঁকে বাঁচানো যাবে না তাঁকে শেষবার দেখে নাও?

হাসনু ডুকরে উঠলো, জ্যাঠামশাই! কেমন আছেন জ্যাঠামশাই?

মীরা মুখ ফিরিয়ে সরে গেল। হিরণের সঙ্গে সঙ্গে হাসনু ছুটে গেল পাশের ঘরে।

জীবেন্দ্র শুয়ে রয়েছেন মেঝের বিছানায়। ঔষধপত্রাদি রয়েছে মাথার শিয়রে। কোনো পাত্রে ঢাকা জলীয় খাদ্য,—এক-আধটি ফলমূল। তাঁর বিছানা ঘিরে ব'সে রয়েছেন চার পাঁচটি লোক। ওদের মধ্যে আছেন দুইজন ডাক্তার।

সুন্দরবনের হরিণী ছুটে এসে দাঁড়ালো ঘরের একেবারে মাঝখানে। দাঁড়ালো যেন ঝড়। একঘর লোক অচেনা—কিছু এসে যায় না। হাসনু দপদপ করছে অগ্নিশিখার তেজে। জীবেন্দ্র প'ড়ে আছেন আচ্ছন্নের মতো। কে যেন ওষুধ দেবার চেষ্টা করছিল তাঁর মুখে। হাসনু চেঁচিয়ে বললে, ওষুধ থাক্, কে আপনি?

লোকটি মুখ তুলে বললে, আমি! আমি বেল্লিক!

সরে যান্—ওষুধ ওঁর চাইনে। ওষুধ ওঁর চিরকাল ঘৃণ্য!

কিন্তু—কিন্তু ওঁর যে শক্ত ব্যামো!—বেল্লিক আবেদন জানালেন।

হাসনু বললে, এমন বাঁচার চেয়ে ওঁর মৃত্যু হোক—সে মৃত্যু সম্মানের।

ওঁর ওষুধ এখানে কারো জানা নেই! ওঁর ওষুধ আছে হাজিপুরের সেই কাজলতলায়, মধুমতী নদীর হাওয়ায়, ঠাকুরদীঘির ধারের শিবমন্দিরে—

জীবেন্দ্রের আচ্ছন্ন তন্দ্রা কেটে গেল। ধীরে ধীরে তিনি বললেন, কে!

হাসনু চেঁচিয়ে উঠলো একদল হতবুদ্ধি লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে,—বললে আমি ·····আমি ·····আমি, জ্যাঠামশাই!

কে তুমি?

হাসনু আবার ডুকরে উঠলো, চিনতে পারোনি জ্যাঠামশাই? আমি হাসনুবানু—তোমার সেরেস্তার জমাননবিশ এমদাদ আলীর মেয়ে!

আকস্মিক উত্তেজনায় জীবেন্দ্র উঠে বসবার চেষ্টা করলেন, বললেন, কই তোকে ত' ডাকিনি?

হ্যাঁ, ডেকেছ তুমি! তোমার ডাক যদি শুনতেই না পাবো তবে তোমার মা হয়েছিলুম কেন? কেন ভাত খেয়েছিলুম তোমার!

আর্তস্বরে জীবেন্দ্র উচ্চারণ করলেন, হাসনু!

হাসনু ম'রে গেছে তোমার এ দুর্গতি দেখার আগে। যদি তোমারও মৃত্যু হয় জ্যাঠামশাই, তবে তোমার মায়ের এই কোলেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলে যাও।

হাসনু বসে প'ড়ে জীবেন্দ্রর মাথা কোলে তুলে নিল! ঝরঝরিয়ে নামলো তা'র চোখ দিয়ে অশ্রুর বিন্দু! মীরা ও হিরণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়েছিল।

৩

হৃদয়াবেগ দীর্ঘস্থায়ী হয় না ব'লেই ওর মূল্য। হাসনুর কোলে মাথা রেখে জীবেন্দ্র চুপ ক'রে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর একটু যেন সুস্থ কণ্ঠে বললেন, বেল্লিক মশাই—?

পাড়ার দুটি লোক এবং ডাক্তার দুজনের পাশে বেল্লিক মশাই হতবাক হয়ে এতক্ষণ বসেছিলেন, জীবেন্দ্রর ডাকে সাড়া দিয়ে বললেন, আজ্ঞে বলুন?

আমার নামের পরিচয় পেয়েছো কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, পেলুম বৈ কি। আপনার সেরেস্তার কর্মচারী এমদাদ আলীর মেয়ে উনি! আপনার ভাতে মানুষ, তাও ওঁর মুখ থেকে শুনলুম।

জীবেন্দ্র ব্যস্ত হয়ে ধীরে ধীরে বললেন, ছি ছি—ওটা মিথ্যে। ওদের ভাত ওরাই খেয়েছে! কিন্তু ওটা ওর আসল পরিচয় নয়। ও এসে আমার ওষুধ খাওয়া যে বন্ধ করলে, এতেই ওকে চিনে নাও।

হাসনু বললে, জ্যাঠামশাই, তুমি চুপ করো। লোকে তোমার কথায় ভুল বুঝতে পারে!

জীবেন্দ্র বললেন, আমার কোন্ ওষুধের দরকার হাসনু জানে। ডাক্তারের ওষুধ যে আমার জন্যে নয়, এ কথা ও ছাড়া আর কেউ বলতে সাহস করতো না। আমার বাঁচার চেয়ে মরা ভালো, একথা শুধু হাসনুই বলতে পারে বেল্লিক। এই ওর পরিচয়।

বেল্লিক মশাই খুশী হলেন না। এখানে এ মেয়ের এমন আধিপত্য, এটা তাঁর পছন্দসই নয়। আর যাই হোক, এটা তার অভিজ্ঞতার বাইরে বৈ কি। কে জানে এ মেয়েটির অভিসন্ধি কি প্রকার! তাঁর মনে যেন কিছু খটকা লেগে গেল। মুসলমান এবং পাকিস্থান—সন্দেহ করাব পক্ষে এইটুকুই কি যথেষ্ট নয়।

এক সময় তিনি বললেন, তা হলে ডাক্তারবাবুকে আর বোধ হয় আসতে হবে না?

হিরণ একবার তাকালো মীরাব দিকে। সুমিত্রা এসে দাঁড়িয়েছিলেন এক পাশে। তিনি হাসনুর দিকে একবার চেয়ে মৃদু কণ্ঠে বললেন, ডাক্তারবাবুর কি না-এলে চলবে হাসনু?

চোখ মুখে হাসনু এবার শান্ত কণ্ঠে বললে, চলবে ছোটখুড়ি, ঠিকই চলবে। ওষুধে অসুখ হয়ত সারে, কিন্তু ভাঙ্গা মন জোড়া লাগে কি?—হ্যাঁ, আপনারই নাম বুঝি বেল্লিক মশাই? এঁদেব জন্যে আপনি অনেক কবেছেন,—আপনি আমার নমস্য।

হিরণ বললে, উনিই এ বাড়ির মালিক। খুব দুঃসময়ে উনি এঁদের জায়গা দিয়েছিলেন। এমন কি—

মীরা বললে, ওঁর কাছে আমাদের অনেক ঋণ।

পাড়ার লোক দুটি এবং ডাক্তাব দু'জন যেন একটু অস্বস্তি বোধ ক'রে বললেন, আমাদের এবাব ছুটি দিন।

বেল্লিক মশাই বললেন, হ্যাঁ চলুন, আমিও এবার উঠবো। তা বেশ—দেশ গাঁয়ের ছেলেমেয়েরাই ত' আপন হয়! এঁরা যদি এবার থেকে আপনাদের উপকারে লাগেন তবে ত' সুখের কথা। আচ্ছা, আজ আমরা উঠি তবে।

হাসনু বললে, আসুন—

ওঁরা সবাই একে একে বাইরে চ'লে গেলেন। বেল্লিক মশাই যাবার আগে হিরণের দিকে চেয়ে বললেন, এঁকে ত' ঠিক চিনতে পারলুম না?

হাসনু বললে, উনি? আমাদের রাজবাড়ির জামাই!

বেল্লিক মশাই হঠাৎ উল্লসিত হয়ে বললেন, তবে আর কি, বড়বাবু—আপনার আর ভাবনা রইলো না—নতুন মেয়ে এলো, জামাই এলো এবার একটু সুরাহা হবে বৈ কি?

বেল্লিক মশাই বেরিয়ে গেলেন। খুব খুশি হয়ে যে গেলেন না, এটা তাঁর ভঙ্গিতেই প্রমাণ পাওয়া গেল। তাঁর হাসির স্বরের কৃত্রিমতা সকলেরই কানে ঠেকলো।

হাসনু ডাকলো, জ্যাঠামশাই? তোমার কী অসুখ বলো ত'?

জীবেন্দ্র সাড়া দিয়ে বললেন, অসুখ আমার নেই, মা।

তবে ওরা ওষুধ খাওয়ায় কেন?

ডাক্তার বলে, নাকি কঠিন রোগ।

আমার সঙ্গে যাবে তুমি?—হাসনু ঝুঁকে পড়লো তাঁর ওপর।

কোথায় যাবো, মা? এদেশে ত' আমাদের আশ্রয় নেই।

চলো না, যাই এক জায়গায়। যেখানে গেলে তোমার কোনো অসুখ থাকবে না।

সে জায়গা কোথায় হাসনু?—জীবেন্দ্র উৎসুক হ'য়ে উঠলেন।

হাসনু চপ ক'রে রইলো। মীরা এসে বসলো একপাশে। এপাশে বসেছিল হিরণ। হিরণ বললে, এ বাড়িতে থাকলে ওঁর শরীর ভালো থাকবে না। যেমন ক'রে হোক জায়গা বদল করা দরকার।

হাসনু বললে, জ্যাঠামশাই, এ বাড়ি ছাড়তে কি তোমার আপত্তি আছে? চলো না, আরেক বাড়িতে যাই যেখানে ওষুধ দেয় না?

বেল্লিকের কাছে দেনা যে অনেক, মা?

দেনা শোধ করতে তোমার ত' সময় লাগবে না। শোনো, তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবো, জ্যাঠামশাই। আমার সেই মামার বাড়িটা খালি প'ড়ে আছে,—সেখানেই তুমি যাবে। সেইখানে থাকবে।

মীরা বললে, কার ভরসায় সেখানে নিয়ে যাবে?

হাসনু বললে, আমার নিজের জোর কিছু আছে বৈ কি, মীরাদি!

মীরা হাসিমুখে বললে, বাবার ভার কি তোর ওপর সইবে?

নিশ্চয় সইবে। ওঁর শক্তি পেয়েছি ব'লেই ওঁর ভার নিতে পারবো, মীরাদি।

সুমিত্রা ঘরে আলো দিয়ে গেলেন। বালিশের ওপর সযত্নে জীবেন্দ্রর মাথাটি নামিয়ে রেখে হাসনু একবার বাইরে উঠে এলো। রান্নার জায়গাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাসনু বললে, ছোটখুড়ি, এই পরিণামকে কি তোমরা বরদাস্ত ক'রে নিতে চাও?

সুমিত্রা বললেন, বড়ঠাকুরকে তুমি বুঝিয়ে বলো। নিজেদের যথাসর্বস্ব ছেড়ে এখানে প'ড়ে থাকলে কতদিন আমাদের চলবে?

আচ্ছা, আমি বলবো বুঝিয়ে। কিন্তু এই নোংরা পল্লী তোমরা ছেড়ে চলো। কালকেই তোমাদের নিয়ে যাবো। এ বাড়ির ভাড়া কত?

বেল্লিকমশাই ভাড়া নেন না।

তোমাদের খরচ চালায় কে? দু'জনের গায়ে যা টুমটাম ছিল সব বুঝি গেছে?

সুমিত্রা বললেন, আট দশ মাস ধ'রে বেল্লিকমশাই সবই চালাচ্ছেন, অবস্থাটা বুঝতেই পারো।

হাসনু বললে, কিন্তু লোকটাকে দেখে কই আমার খুব ভক্তি হোলো না ত'? অত্রি কোথায়, ছোটখুড়ি?

সুমিত্রা বললেন, বেল্লিক মশায়ের ওখানে মাস্টার আসে, সেখানে পড়তে যায় এই সময়। বেল্লিক মশাই ওকে খুবই ভালবাসেন।

মীরা এসে দাঁড়ালো পাশে। বললে, আমার চ'লে আসার পর তোমরা নিশ্চয় খুব ভালো আছ, হাসনু?

হাসনু বললে, ভালো আছি কিনা তুমি ত' চোখে দেখে আসোনি? কিন্তু ক্ষতি যা ক'রে এসেছ তার প্রতিকার হবে না কোনদিন, মীরাদি! মুসলমান না হ'য়ে জন্মালে সে ক্ষতি বোঝাও যায় না।

মীরা বললে, ক্ষতি! ক্ষতি বলছ কেন? তোমাদের লাভ হয়নি?

লাভ! লাভ হয়েছে শেয়াল-কুকুরের, আমাদের নয়। লাভ করেছে চামচিকে আর বাদুড়ের দল।

তুমি যে হঠাৎ এলে এদেশে? কি মনে ক'রে?

হাসনু বললে, নিজের দেশ ব'লেই আসতে পেরেছি,—কেবলমাত্র তোমাদের দেশ হ'লে আসতুম না!

মীরা বললে, আসবার উদ্দেশ্যটা কি শুনি? যারা সর্বস্বান্ত হ'য়ে চ'লে এসেছে, তারা একেবারে ধ্বংস হয়েছে কি না, এটিই বুঝি দেখে যেতে চাও? উদ্দেশ্যটা মন্দ নয়!

হাসনু হাসলো। বললে, কথাটা মিথ্যে বলোনি, মীরাদি। ভয় দেখলেই যারা পালায়, তাঁরা মানুষ নয়, জন্তু। হিংসাও আছে তাদের, কিন্তু তার চেয়ে বেশি আছে প্রাণভয়। শেয়াল-কুকুরের কামড়ের ভয়ে যারা চিরকালের ভিটে-মাটি ছেড়ে পালায়, তাদের ধ্বংস তারাই আনে।

মীরা উষ্ণকণ্ঠে বললে, আগুনের ছ্যাঁকা লাগলে তুমি হাত সরিয়ে নাও না, হাসনু?

এটা তর্কের কথা নয়, মীরাদি। তুমি-আমি এক হাঁড়িতে মানুষ, একই গাঁয়ের মেয়ে। কোন কালে কোনও বিরোধ নেই তোমার সঙ্গে আমার। কিন্তু উন্মত্ত হিংসার কাছ থেকে প্রাণভয়ে যারা পালিয়ে আসে,—তারা দেশের অগৌরব। তোমরা আগুন দেখে পালিয়েছিলে, কিন্তু আগুন নেবাতে চাওনি। দুষ্টশক্তির সামনে মারমুখী হ'য়ে দাঁড়ালে না কোথাও—এ কথা চিরকাল লেখা থাকবে ইতিহাসে। তোমরা নাকি শক্তির পূজা করো! পোড়া কপাল!

মীরা বললে, তুমি কি বলতে চাও, সেই রাত্রে দু'হাজার খুনে ডাকাতের সামনে আমরা দাঁড়াতে পারতুম?

হাসনু বললে, মরতে! মরতে ক্ষতি ছিল না। পথে ঘাটে মাঠে ক্যাম্পে—আজ কা'রা মরচে? কা'রা মরছে আজ না খেয়ে? কা'রা মরছে ওলাওঠায়, আর যক্ষ্মায়? শেয়াল-কুকুরের ভয়ে বেলেঘাটার এই নোংরা বস্তির অন্ধ খোঁয়াড়ে এসে উঠেছো এই পশুরাজ সিংহকে নিয়ে! ওর চেয়ে সে-মৃত্যু গৌরবের ছিল না? কেশর ফুলিয়ে ওই পশুরাজ সেদিন দাঁড়াতে পারতো না? গর্তয় ঢুকে বাঁচতে শিখেছ, আর যুদ্ধক্ষেত্রে মরতে শেখোনি? ছি ছি, ধিক তোমাদের!

মীরা বললে, মেয়েরা মান খোয়াতো, সতীত্ব ডোবাতো—সে বোধ হয় তোমাদের গায়ে লাগতো না?

হাসনু বললে, সতীত্ব বাঁচলো, মান বাঁচলো না, মীরাদি। এর চেয়ে বীরত্ব প্রকাশ করলে যুগের ইতিহাস যেতো বদলে। রাণী লক্ষীবাঈ তলোয়ার হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন শত্রুর মাঝখানে,—ইতিহাসের সেইটিই গৌরব। বীরত্বটাই বড়—সতীত্বের চেয়েও বড়।

সুমিত্রা এসে হাসনুর হাত ধ'রে টানলেন। বললেন, সাত-সমুদ্দুর পেরিয়ে বোনের সঙ্গে ঝগড়া করতে এলি, কেমন? থাক্ এখন ওসব বাজে কথা। তোর মতলবটা কি বল্ ত'? কাল কোথায় নিয়ে যাবি আমাদের?

মীরাও শান্ত হ'য়ে গেল। তিনজনে মিলে এবার অনেকদিন পরে একটু আড়ালে এসে বসলো। হাসনু বললে, ছোটখুড়ি, সকালে সেই দু'টি খেয়ে বেরিয়েছি, দাও না কিছু?

কি খাবি বল?

এক কণা শাকান্ন! তাই দাও। ব'লে যাবো, তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট। দাও না ছাই ভস্ম কি আছে!

মীরা হাসিমুখে বললে, বেল্লিকের ভাত আমরাই খাই, তুই কি খাবি ?

হিরণ উঠে এলো ওঘর থেকে। হাসনু তা'র ভ্যানিটি ব্যাগটা হিরণের হাতে দিয়ে বললে, কিছু খাবার আনো ত' ঘরজামাই।

হিরণ বললে, পূর্ব-পশ্চিম—কোন্ বঙ্গের ঘরজামাই না জানালে আমি কিছু আনতে পারবো না !

মীরা তা'র হাসিমুখ ফিরিয়ে নিল। হাসনু আর সুমিত্রাও হেসে উঠলেন। সুমিত্রা বললেন, ঘর পেলেই ঘরজামাই হবে হিরণ, ভাবনা নেই !

হিরণ নতুন জুতো প'রে বেরিয়ে চ'লে গেল।

হাসনু বললে, কাল দুপুরে তোমরা যাবে এখান থেকে। সকাল বেলায় বেল্লিক মশাইকে ব'লে রেখো ?

ছোটখুড়ি বললেন, টাকা ?

সে আমি বুঝবো জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে। তোমাদের হাতে কিছু টাকা দিয়ে যাবো। তোমাদের নিজেদেরই টাকা।

নিজের টাকা মানে ?—মীরা প্রশ্ন করলো।

হাসনু গলা নামিয়ে বললে, জ্যাঠামশাই শুনতে না পান, বিমলদার কাছে হাজার খানেক টাকা আদায় করেছি আজ।

দিলে ? পারলি আদায় করতে ?—মীরা সবিস্ময়ে তাকালো।

পারলুম বৈ কি। ওর বউয়ের সামনে আগেকার সেই সব কথা ফাঁস করবো ভয় দেখালুম।

সুমিত্রার সঙ্গে মীরাও হেসে উঠলো। হাসনু বললে, ওর কাছ থেকে এখনও অনেক টাকা আদায় করবো। যাবে কোথায় ? কিন্তু তোমাদের আক্কেলটা ? হিরণকে দূরে সরিয়ে দিয়েছ কেন, ছোটখুড়ি ?

মীরা বললে, আমিই বলেছি দূরে থাকতে।

কেন ?

আমি এ-বিয়ে স্বীকার করিনে।

হাসনু বললে, বেশ ত', কোন একটি দিন আর লগ্ন দেখে বাকি মন্তর ক'টা প'ড়ে নাও !

মীরা বললে, ও-কথা থাক ভাই এখন।

তাই ব'লে হিরণ এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াবে ?

কেন, জাত-ব্যবসা ধরুক, বামুন-পণ্ডিতের কাজ করুক। আমি আর পায়ে শেকল জড়াবো না, হাসনু।

তুমি কি নিয়ে থাকবে ?—হাসনু জানতে চাইলো।

মীরা রুক্ষকণ্ঠে বললে, পুতুলখেলা ছাড়াও মানুষের অন্য কাজ আছে, হাসনু।

হাসনু বললে, তা'হলে তুমি আর ছোটখুড়ি—একই সঙ্গে চাকরি করতে বেরোও? আমি থাকি জ্যাঠামশাই আর অত্রিকে নিয়ে?

সুমিত্রা বললেন, তোমার স্বামী রাজী হবেন কেন, হাসনু।

হাসনু প্রশ্ন করলো, কোন্ স্বামীর কথা বলছেন?

ফৈজুদ্দির কথা বলছি। ডিংরের জোতদার।

ফৈজুদ্দিকে ছেড়েছি মাস ছয়েক আগে। শুনলুম, আমার কাছ থেকে গিয়ে ও আরেকটা নিকে করেছে।

মীরা বললে, বোধ হয় সেই আমিনাকে—না?

হাসনু বললে, হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই খাসের জমি বিলি করলেন নুরনগরের তালুকদারকে। আমিনাই হোলো তালুকদারের মামাতো বোন। তারও স্বামী ছিল, কিন্তু ফকিরি নিয়ে চ'লে গেছে বছর তিনেক আগে। ওরা সুখে থাক্, ভালো থাক্।

মীরা বললে, তা'হ'লে আর ঘরকন্না করবিনে?

হাসনু বললে, তুমি একটিও ঘরকন্না না ক'রে যদি শান্তিতে থাকো আমি পারবো না কেন? তা'ছাড়া আমার ওসব ভালো লাগে না।

কি?

না কিছু না—একটু থেমে হাসনু বললে, জ্যাঠামশায়ের কাছে মানুষ হ'য়ে মুস্কিল কি হয়েছে জানো? মেজাজ মর্জি উঁচু হ'য়ে গেছে। নীচে নামতে ইচ্ছে করে না।

মীরা বললে, কি নিয়ে থাকবি?

হাসনু বললে, তুমি যখন মাস্টার মশাইয়ের মতন প্রশ্ন করেছ, আমিও তখন মুখস্থ বুলি আউড়ে যাই! আমি ঘরের বাইরে এসে কাজ করবো।

অত্রিকে সঙ্গে নিয়ে এবার হিরণ এসে ঢুকলো। হাসনুকে সামনে দেখেই অত্রি গিয়ে তা'র গায়ের উপর ঝাঁপ দিল। বললে, এতদিন আসোনি কেন, ছোড়দি?

অত্রিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে হাসনু বললে, তোর চিঠি কি পেয়েছিলুম যে আসবো? ঠিকানা দিয়েছিলি?

তোমরা যে আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করেছ?

দূর বোকা! ভাই-বোনে ঝগড়া থাকে নাকি? আমি তবে নিজের থেকে এলুম কেন? যাবি আমার সঙ্গে?

যাবো। কবে যাবে বলো ?

যদি কালকে যাই ?—হাসনু আদর ক'রে বললে।

কালকে না, আজকেই চলো। এখানে আমার ভালো লাগে না। এ পাড়া একটুও ভালো নয়! অত্রি তা'র আঁচলের মধ্যে মুখ লুকালো।

হাসনু বললে, বেশ, তবে তৈরী হয়ে নে, যাবি আমার সঙ্গে!

আহার্য পরিবেশন করে দিয়ে সুমিত্রা আহ্নিক শেষ করতে যাচ্ছিলেন, হাসনু বললে, ঘরজামাইয়ের ভাগটা যেন একটু বেশি হোলো, ছোটখুড়ি ?

হিরণ বললে, একটা হোলো জামাইযেব ভাগ, আরেকটা হোল পারিশ্রমিকের। খুড়িমা ভুল করেন নি।

মীরা বললে, তাহলে জামাইয়ের অংশটা আমাব পাতে দিন।

দাঁড়ান—হিরণ বললে, আমাব ছোঁওয়া আপনি খাবেন কেন ? তার চেয়ে আগে হাসনুর সুপারিশ নিয়ে চাকরিতে ঢুকি, তা'র মোটা অংশটা দেবো

হাসনু বললে, কোন্ সুবাদে দেবে ?

হিরণ জবাব দিল, প্রায় অর্ধেক মন্ত্র পড়া হয়েছিল, সেই সুবাদে দেবো। তারই জোর কি কম ? এ বাবা হিন্দুশাস্ত্র, নারায়ণ সাক্ষী। তিন বার তালাক্ বললেই আর সত্যিটা মিথ্যে হয়ে যায় না!

মীরা বললে, সর্বনাশ, আপনি বুঝি তাই ভেবে ব'সে আছেন ? ও দুর্বুদ্ধি আজই ত্যাগ করুন, দোহাই আপনার!

সুমিত্রা হাসিমুখে আহ্নিকেব ঘরে গেলেন।

হাসনু হাসছিল, কিন্তু তাকে সামনে পেযে হিরণ আজ একটু উৎসাহ সঞ্চয় করেছিল। হিবণ বললে, এটা যদি দুর্বুদ্ধি হয়, তবে সে দুর্বুদ্ধি কাকাবাবুর, এত কালের সামাজিক চক্রান্তের। শাস্ত্রধর্ম যদি স্বীকাব করা যায়, তবে তা'র নির্দেশটাও মানতে হয়! শুধু ত' মন্ত্র নয়, তা'র পেছনে আনুষ্ঠানিক সম্মতিও ছিল। তাকে আপনি এড়িয়ে যান্ কেমন ক'রে ?

মীরা বললে, আমি বাঁধন আর স্বীকার করবো না।

কিসের বাঁধন ?

বিয়ের!

বিয়ের বাঁধন ত' মানসিক। যাকে বলে আত্মিক। কে আপনার পায়ে দড়ি বেঁধে টানছে ? যেদিন মস্ত বড়লোক ছিলেন সেদিন বাঁধনটা ভালো লাগছিল,—আর আজ যখন পথে বসেছেন তখন আর বিয়ের বাঁধন ভালো লাগছে না। এই ত' ?

আপনার যা খুশি ভাবুন।

ভাবছি, বিয়ের সঙ্গে ধনবিলাস আপনার ভালো লাগে,—কিন্তু দারিদ্র্য, সংগ্রাম এবং ভবিষ্যতের ভয় যখন এসে দাঁড়ায়,—তখন বিয়েটাকেও আপনারা অস্বীকার করতে প্রস্তুত। এই ত' ?

মীরা সবিনয়ে বললে, হাসনু,—একথা ওঠে নি। কথা হোলো এই, যে ভাঙন ভেঙেছে আমাদের মনে, চিন্তায় আর অবস্থায় তাকে ভালো ক'রে দেখতে চাই আমি। আগুন সামনে রেখে বিয়েও হয়, বিপ্লবও হয়। এটা বিপ্লবের কাল। হাজিপুরে যেদিন আগুন জ্বললো, আমরা বিয়ের আসর ছেড়ে পালিয়ে এলুম বটে, কিন্তু সেই আগুনকে সামনে রেখে আমিও প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি যে, আর নয়। এবার আমার বাইরে পা বাড়াবার সুবিধে হোলো। ঘরে আর ঢুকবো না। এবার বাইরেটাকে দেখবো ভালো ক'রে।

হাসনু বললে, এখন কি করবে তুমি ?

মীরা বললে, বাবাকে সুস্থ ক'রে তুলবো, তারপর নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা পাবো।

হিরণ কি করবে ? তার দায়িত্ব এতকাল যে তোমাদের হাতে ছিল ?

মীরা বললে, সেকথা বাবা জানেন, বাবাই বলতে পারেন।

হিরণ এবার একটু হাসলো। বললে, আমি এখন ছেলে মানুষ নই যে, কোনো নৈতিক দাবি জানাবো। হাজিপুর থেকে বেরিয়ে আমারও পথ আলাদা হয়ে গেছে, সন্দেহ নেই। যদি আপনি আজ মনে করেন আমাদের দুজনের যখন তখন দেখাশোনা হওয়াও আর উচিৎ নয়, আমি আপনার সেই অনুরোধও মেনে চলতে রাজি আছি।

মীরা বললে, কুড়ি বছর ধরে' আমরা তিনজনে একসঙ্গে থেকেছি, পড়েছি, খেয়েছি—মানুষও হয়েছি। আজ আপনাকে দূরেই বা স'রে যেতে বলবো কেন ? আপনি দূরে গেলেই বা আমাদের চলবে কেন ?—বিয়ের সম্পর্ক ছাড়া আর কোন সম্পর্ক আপনারা ভাবতে পারেন না ?

হাসনু বললে, বন্ধুত্বের সম্পর্ক বলছ ?

মীরা বললে, গত কুড়ি বছর ধরে কোন্ সম্পর্ক নিয়ে একই গ্রামে একই বাড়িতে ছিলুম ?

হিরণ বললে, সেই গ্রাম আর সেই বাড়ি শূন্যে মিলিয়ে গেলে সেই সম্পর্কটা থাকে কি ?

মীরা জবাব দিল, বটে ? বন্ধুত্বটা কি বিষয়-সম্পত্তির সঙ্গে ছিল ? রাজত্বটা না পেলে কি রাজকন্যের দামও ফুরিয়ে যায় ?

হাসনু বললে, রাজত্বটা বাদ দিলে রাজকন্যার বদলে শুধু থাকে কন্যা !

তুমি এখন মেয়ে, আর ও হোলো পুরুষ। আর সত্যি বলতে কি, তোমাদের দুজনের মধ্যে বাপু কোনো প্রণয় ছিল না, ছিল পারিবারিক বোঝাপড়া। এখন সেই বোঝাপড়াটা গেছে ভেঙে। বালাই গেছে।

মীরা হেসে উঠলো। হাসনু মুখ ফিরিয়ে বললে, জামাই, আগেকার ধুয়ো আর চলবে না, ভাই। যদি উৎসাহ কিছু থাকে তবে আবার নতুন করে আরম্ভ করো। পুরনো কবিতা যদি কিছু লেখা থাকে তবে ছিঁড়ে ফেলে দাও, এবার নতুন স্টাইলে অমিল ছন্দে গদ্য-কবিতা লেখো। নাম দাও, পুনশ্চ।

সুমিত্রা বেরিয়ে এলেন।

হাসনু পুনরায় বললে, ছোটখুড়ি, আমার সব বিশ্বাসই ভাঙলো। মেয়ে-পুরুষে প্রণয় না থাকলে বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু রসকস না থাকলে একেবারেই অসহ্য।

হিরণ হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালো। বললে, পাগলের কথা কানে নেবেন না, খুড়িমা। চলো উঠি আজ।

অত্রি তৈরী হয়ে এসে দাঁড়ালো। সুমিত্রা বললেন, ও কি যাবে তোর সঙ্গে, হাসনু?

হাসনু বললে, যাবে কিন্তু জাত যাবে না ত'?

সবাই মিলে স্বচ্ছ হাসি হেসে উঠলো! অত্রি বললে, না, জাত যাবে না, চলো তুমি।

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে এক হাজার টাকা বা'র করে হাসনু বললে, এই টাকায় বেল্লিকের দেনাটা দিয়ে দিয়ো, ছোটখুড়ি। কাল হিরণ তোমাদের নিতে আসবে, ওর সঙ্গে আর কিছু টাকা আমি পাঠাবো।

হাসনু একবার ছুটে ওঘরে গেল জ্যাঠামশাইকে প্রণাম করতে—কিন্তু তিনি এতক্ষণ ওদের ভিতরকার তর্ক-বিতর্ক শুনতে শুনতে কোন্ সময়ে যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁকে আর জাগানো উচিত হবে না। হাসনু ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। চৌকাঠে মাথা হেঁট ক'রে প্রণাম জানালো তাঁর উদ্দেশে। এতক্ষণকার সমস্ত চটুলতা, সমস্ত তর্ক-বিতর্ক, আর হাসিতামাসা সমস্তটা যেন শ্রদ্ধা নিবিড় ভক্তিতে এবার শান্ত হয়ে আসে। আশৈশবের এই প্রতিপালকের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতায় সহসা যেন তার চোখ দুটো বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

বিদায় নিয়ে আসার সময় হাসনু বললে, ছোটখুড়ি, একটা কথা ভালো ক'রে না জেনে গেলে ত' আমার চলবে না?

সুমিত্রা বললেন, কি রে?

হাসনু বললে, ছোট কাকা থাকলে হয়ত সেকথা উঠতো না, কিন্তু এক

বাড়িতে থেকে অজ্ঞানের বশে বিধবার শুদ্ধাচার যদি ক্ষুণ্ণ হয়, ছোটখুড়ি, সেই পাপ কি আমার সইবে?

সুমিত্রা বললেন, সে-কথা আগেই ভেবে রেখেছি হাসনু, সে-ব্যবস্থা আমার হাতেই ছেড়ে দে তুই।

মীরা বললে, বাবাকে ভালো করে তুলতে পারবি তুই?

আমার অহঙ্কার কিছু নেই, মীরাদি! জ্যাঠামশাই নিজের পায়ের জোরে উঠে দাঁড়াবেন, আমরা সবাই এই কামনা করবো। অত্রি আয় ভাই। এসো হিরণ।

পথে নেমে দেখা গেল রাত কম হয়নি। হাসনু অত্রির হাতখানা নিজের হাতে জড়িয়ে বললে, গাড়ি চ'ড়ে যাবি, না হেঁটে?

অত্রি বললে, ট্যাক্সি চড়ে যাবো।

ট্যাক্সি? একেবারে চড়া সুর? তাহ'লে আগে খানিকটা হেঁটে চল্।

অত্রি বললে, তুমি কলকাতার সব জায়গা চেনো, ছোড়দি?

ওমা তা আর চিনবো না? কলকাতাটা যে আমাদের ঘরোয়া শহর রে! সব চিনি!

হিরণ চুপ ক'রে হাঁটছে পাশে পাশে। হাসনু তা'কে ডাকলো এক সময়ে, জামাই?

হিরণ বললে, কেন?

হাসনু বললে, জাত আর ধর্ম দুটোই খুব বড, কি বলো।

যে মানে তার কাছে বড়!

তুমি মানো!

হিরণ বললে, ভূতকে ভয় করিনে বললেও ভূতের ভয় যায় না।

গ্যাসের আলো জলছে পথের দুই পাশে। পথটা অনেকখানি নির্জন। হাসনু বললে, জাত ধর্মের চেয়ে মানুষ কি বড় নয়?

হিরণ বললে, খবরের কাগজে এই রকম লেখা হয় বটে! কিন্তু এর সিদ্ধান্ত মানুষ আগেই নিয়ে থাকে।

হাসনু বললে, এই সংস্কারের বাইরে যাওয়া যায় না?

চল্‌তি সভ্যতা উঠেছে একদিন এই সংস্কারে। এর বাইরে যাওয়া খুব সহজ নয়! জাত আর ধর্ম—এরাই বাইরে গড়েছে সভ্যতা, ভিতরে গড়েছে সমাজ। এদের বাসা হোলো রক্তের ধারায় বংশ-পরম্পরায়। তুমি-আমি প্রতিবাদ জানালেও এরা থাকে। আঘাত করলেও থাকে।

হাসনু চুপ ক'রে চলতে লাগলো। কিয়ৎক্ষণ পরে মুখ তুলে সে বললে, কিন্তু মানুষের পরিচয় কি এদেরকে ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি?

না।

উত্তেজিত হয়ে হাসনু বললে, তবে আশু মাস্টারকে বাঁচাতে গিয়ে আমাদের সেই জয়নাল ডাকাতের হাতে প্রাণ দিলে কেন ?

হিরণ বললে, ওটা উদাহরণ নয়, ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম নিয়ে তারিফ করা চলে, আলোচনা চলে না।

তোমাকে আরো উদাহরণ দেবো, জামাই ?

হিরণ হাসলো, বললে, না, শুনতে চাইনে। মুসলমান প্রাণ দিয়েছে হিন্দুকে বাঁচাবার জন্যে, কিংবা হিন্দু মরেছে মুসলমানকে বাঁচাতে—এর হিসেব-নিকেশ আসে ভেদবুদ্ধির থেকে। আসল কথা, মানুষের জন্য মানুষের আত্মাহুতি আছে কিনা।

হাসনু প্রশ্ন করলো, মানে ?

একটি বর্বরের প্রাণরক্ষা করতে গিয়ে যদি একটি মহৎ জীবন নষ্ট হয়— আমি বরদাস্ত করবো না !

মহতের আত্মত্যাগটাকে বড় বলবে তুমি ?

ওটাকে আত্মত্যাগ বলে না, ওটাকে বলে নির্বোধের আত্মনাশ। মহতের জন্য যদি কোথাও জীবন-বলি ঘটে, তবে সেখানেই হবে পুণ্যের প্রকাশ। মানুষ সেখানে দেবত্বলাভ করে।

একখানা চলন্ত ট্যাক্সিকে হাত বাড়িয়ে হাসনু ডাকলো। গাড়িখানা এসে থামলে অত্রিকে সে আগে তুললো, তারপর নিজে উঠে গিয়ে এপাশে হিরণের জায়গা ক'রে দিল।

হিরণ উঠবার পর ট্যাক্সি ছুটলো। হাসনু বলে দিল, তালতলা—কেমন অত্রি, এবার খুশী ত' ? শোন্ বড় হয়ে তুই যদি আমাকে একখানা মোটর কিনে দিস তবে রোজ তোকে মোটর চড়াবো। বল্ কিনে দিবি ?

অত্রি বললে, বারে তার চেয়ে নিজে চড়বো ?

দূর বোকা, নিজের জিনিস নিজে ব্যবহার করলে লোকে নিন্দে করে ! তোরটা আমার, আমারটা তোর— বুঝলিনে—?

অত্রি বললে, আমাকে হাজিপুরে নিয়ে চলো, তোমাকে ঠিক মোটর কিনে দেবো।

ঠিক দিবি ত' ? কথা দিচ্ছিস ?

ঠিক দেবো, দেখে নিয়ো !

হাসনু ডান হাতখানা দিয়ে অত্রির গলা জড়িয়ে ধরলো। এই ছেলেটার সঙ্গে কথা বলতে গেলেই তা'র পোড়া দুই চোখে বাষ্প জমে ওঠে।

ট্যাক্সিতে দশ মিনিটও নয়। তালতলার বাড়ীর দরজায় এসে গাড়ি থেকে তা'রা নামলো। হাসনু ট্যাক্সিভাড়া চুকিয়ে অত্রির হাত ধরে ভিতরে ঢুকলো। তুপুরবেলায় হিরণ এসেছিল এ বাড়ি—সুতরাং সদর ও অন্দরের পথ তার অজানা নয়। বাড়িখানা পুরনো আমলের হলেও আভিজাত্যের ছাপটা রয়ে গেছে। এবা সম্পর্কে হাসনুর মামা—কিন্তু কি প্রকার মামা সে অনুপর্ব না জানলেও চলবে। হাসনুর মা ম'রে গিয়েছিল তার ছোটবেলায়, কিন্তু ওর বাবা এমদাদ আলীও মারা গেলেন, ওর বয়স তখন পাঁচ বছর। এমদাদ আলী ছিলেন সেরেস্তার একজন সুযোগ্য কর্মচারী, সুতরাং মেয়েটার প্রতি জীবেন্দ্রর নৈতিক কর্তব্য একটা ছিল। তিনি নিজে গিয়ে মেয়েটাকে কাঁধে করে নিজেব বাড়িতে আনলেন। হিরণের বয়স তখন আট, মীরার ছয়। গ্রামে কথা উঠলো, মুসলমানের মেয়ে এ বাড়িতে মানুষ হবে কেমন করে? জীবেন্দ্র তার উত্তরে জানালেন, মুসলমান চাষীব অন্ন রয়েছে আমাদেব পেটে, আর মুসলমান একটি মেয়ে আমাদের কোলে মানুষ হবে না কেন?

সেই থেকে হাসনুব ছাড়পত্র ছিল অবাধিত। মেয়েটার উপরে শাসন ছিল না, বিধি-নিষেধ ছিল না। তা'ব গতি ছিল সর্বত্র। জীবেন্দ্রনারায়ণের শোবার ঘরে তা'ব খেলাঘর, এবং তাঁব কাছে ব'সেই তাব বিদ্যারম্ভ। পাছে তা'ব শিক্ষাদীক্ষাব পবে কোনো অবিচার ঘটে, এজন্য একজন শিক্ষিত মৌলভীকে নিযুক্ত কবা হয়েছিল। কিছু বড হ'লে তাকে ঢাকার এক মুসলমান বালিকা বিদ্যালযে দেওয়া হয়—সেখান থেকে অবশেষে কলকাতা।

ম্যাট্রিক পাস কবার পর মৈতুস্তি থানাব দাবোগা জলিলুদ্দির বড ছেলে আনোয়াবের সঙ্গে তা'ব বিয়ে হয়। সেই বিযেতে জীবেন্দ্র প্রায় পনেরো হাজার টাকা খরচ করেন। কিন্তু বছর তুই পরে ফিবে এসে হাসনু বলে জ্যাঠামশাই, তোমাব টাকাই জলে গেল। তোমাব জামাই নিজের হাতেই আমার কপালের সিঁতুর মুছিয়ে ছেড়ে ছিল।

জীবেন্দ্র প্রশ্ন করলেন, সে কি হাসনু? ছেড়ে দিল কেন?

বনিবনা হোলো না, জ্যাঠামশাই।

তাই ব'লে ছাড়াছাড়ি হোলো?

কেন হবে না? তোমার জামাই আগেই যে একটা বিয়ে ক'রে লুকিয়ে বেখেছিল, তুমি কি জানতে?

নাই-বা জানলুম। শুনেছি চারটে বিয়ে পর্যন্ত করা চলে?

একপাল বাঁদীও রাখা চলে, জ্যাঠামশাই।—এই ব'লে হাসনু অন্দরমহলে চ'লে গিয়েছিল। জীবেন্দ্র আর কিছু বলেন নি।

দ্বিতীয়বার বিয়ে হোলো কৈজুদ্দির সঙ্গে। সে-বিয়েতেও জ্যাঠামশাই অনেক টাকা খরচ করেছিলেন, তা'র সঙ্গে যৌতুক দিয়াছিলেন একখণ্ড ধানজমি! কিন্তু সে-বিয়েও সার্থক হোলো না। হাসনুর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই, সে নাকি আবরু মানে না, বশ্যতা স্বীকার করে না, লেখাপড়ার চর্চা ছাড়ে না,—এবং কানাকানিতে আরো যে শোনা গেল, তা'র মোটা কথাটা এই, স্বামী নিয়ে গৃহস্থালী করাটা তা'র কপালে নেই। দিনানুদৈনিক চর্বিত-চর্বণ নাকি হাসনুর রুচিতে ভয়ানক বাধে।

দুইবার দুই স্বামীর সঙ্গে তা'র ছাড়াছাড়ি হোলো। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই, দুইবারই সে উন্নততর স্বাস্থ্য ও উজ্জ্বলতর প্রাণশক্তি নিয়ে ঘরে ফিরে এলো। অগত্যা জ্যাঠামশাই বললেন, আর আমি কি করতে পারি বল্। এবার থেকে আমার মালখানা আর সিন্দুকের চাবি রাখ তোর কাছে। ভাঁড়ার ঘরের দায়িত্বও তুই নে।

হাসনু তা'র কলহাস্যে আবার চারিদিক মুখর ক'রে তুললো। সত্যি বলতে কি, মীরাও কিশোর বয়সে তা'র প্রতি একটু ঈর্ষান্বিত ছিল। হাসনু এক মিনিটের মধ্যে লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব জমিয়ে তুলতে পারতো, মীরার সেখানে ছিল স্বাভাবিক লাজুকতা। হাসনুকে গান শেখায়নি কেউ কোনোদিন, কিন্তু তা'র কণ্ঠে লালন ফকিরের বাউল গানের মূর্চ্ছনা শুনে নদীর ওপারে মাঝি মাল্লারা নৌকা থামিয়ে দিত। তা'র কণ্ঠে কণ্ঠে লেগে থাকতো নিধুবাবুর টপ্পা। চৈত্রের দুপুরে সেই দেহতত্ত্বের আর্তকাতর সুরের আবেদন আজুরীর হাট পেরিয়ে গাজন-তলা ছাড়িয়ে ফসল কাটা মাঠের উপর দিয়ে যেন ভেসে চ'লে যেতো গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। গানের শেষে সবাই যখন তাকে তারিফ করতো, তখন হয়ত একান্ত অন্তরালে কোথাও ব'সে জীবেন্দ্রনারায়ণের চক্ষে জল দেখা দিয়েছে, আবিষ্কার করা যেতো। একা একা একসময়ে কোন ঘরে ঢুকে হাসনু ঘাঘরা পরে নাচ শিখতো। সেই নাচের ভঙ্গি তা'র নিজের সৃষ্টি। হঠাৎ হয়ত গিয়ে হাজির হতো মীরা। মীরা সেই ঘরের মস্ত বড় সোনালী ফ্রেমের আয়নায় হাসনুর প্রতিফলিত সর্বনাশা চেহারা দেখে চেঁচিয়ে উঠতো, হতভাগি, তোর একটুও লজ্জা-সরম নেই?—এই ব'লে মীরা নিজেই পালিয়ে যেতো সেই তল্লাট ছেড়ে।

হাসনু এসে ঘরে ঢুকলো। হিরণকে ওইভাবে নিশ্চল ব'সে থাকতে দেখে সে বললে, পরের বাড়িতে ঢুকে হাত পা আসছে না, এইত?'

হিরণ হাসিমুখে বললে, কথাটা সত্যি হোলো না। ব'সে ব'সে ভাবছিলুম

তোমার সেই নাচগানের কথা। ভাবছিলুম, কোনো ঘরেই তোমার মন বসলো না, এর রহস্য কি?

হাসনু এসে বসলো হিরণের পাশে। একটু থেমে বললে সত্যি কথা বলবো, ঘরে আমাকে ধরে না।

তার মানে কি।

মানে, ঘরের লোভ আমার নেই!

কিন্তু স্বামী সংসার—

হাসনু হেসে উঠলো, তোমার মুখে এই কৌতূহল বেমানান, হিরণ?

কেন?—হিরণ প্রশ্ন করলো।

তোমার মনে নেই, তোমার কবিতা আমাকে চঞ্চল ক'রে তুলতো? তার ভিতরকার বিষয়বস্তুটা কি থাকতো? সে কি ঘরে থাকতে দিয়েছে কোনদিন? শুক্লপক্ষের রাত্তিরে কেন তোমাদের টেনে নিয়ে যেতুম নদীতে সাঁতার কাটতে?

কিন্তু মেয়েমানুষ বাসা না বেঁধে থাকতে পারে? ওটার জন্যে যে প্রকৃতির তাড়না আছে।

আছে বলেই ত' দুবার বিয়ে, একবার নিকে!

হিরণ সবিস্ময়ে বলে, নিকে! সে আবার কবে?

হাসনু বললে, সে এক ভারি মজার গল্প! আমাদের গাঁয়ে মাঝে মাঝে আসতো সেই সাপুড়ে শেখ—তোমার মনে আছে? সেই যে ধানকুড়ির মেজকর্তাকে সাপের কামড় থেকে বাঁচিয়েছিল

হিরণ বললে, হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

হাসিমুখে হাসনু বললে, আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীকে লুকিয়ে ওর কাছে যেতুম সাপের মন্তর শিখতে। সাপ খেলানোটা লাগতো বেশ। একদিন লোকটা আমাকে ঘরে ঢুকিয়ে হঠাৎ দস্যুর মতন বললে, যদি আমার প্রস্তাবে রাজী না হও তবে সাপ লেলিয়ে দেবো। আমি তার মতলব বুঝলুম; কিন্তু ভয় না পেয়ে বললুম, বেশ, তুমি সাপ লেলিয়ে দাও!—কিন্তু আমি যদি তোমার সাপকে বশ করতে পারি তুমি আমার একটা প্রস্তাবে রাজী হবে?

শেখ তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে সাপটা আমার দিকে লেলিয়ে দিল। দেখে খুশী হলুম সেটা মস্ত গোখ্‌বো সাপ। মুখের শব্দ ক'রে ফণা তুলে দাঁড়ালো আমার সামনে। ততক্ষণে চেঁচিয়ে গান ধরেছি আমি,—আমার গলার শিরা উপশিরায় যেখানে যত মধু সংগ্রহ করা ছিল, আমি ঢেলে দিলুম আমার সুরে। সাপটা শান্ত হয়ে দাঁড়ালো। নিশ্চিত মৃত্যুর ভাবনায় অস্থির হয়ে আমিও গান থামালুম না।

হিরণ বললে, তারপর ?

গান গেয়ে-গেয়ে গোখ্‌রোর মুখের সামনে হাত নেড়ে আরতি করতে লাগলুম। সাপটা ধীরে ধীরে গিয়ে ঢুকলো হাঁড়িতে। হাঁড়ির মুখে চাপা দিয়ে এবার আমি বললুম, মিঞা, মেয়েছেলে জন্মায় কেন, জানো ?

সাপুড়ে বললে, কেন ?

আমি বললুম, সাপ খেলাবার জন্যে। গোখ্‌রো কামড়ালে এখনই মরতুম, তুমি কামড়ালে তিল তিল ক'রে মরবো চিরকাল !

হিরণ প্রশ্ন করলো, শেখ কি বললে ?

বললে, বেগম, আমারে ক্ষ্যামা দাও ! –বললুম, শোনো মিঞা, সাপ খেলানো আমি জানি, কিন্তু সাপের মন্তরটা যদি আমাকে শেখাও তবে তোমাকে আমি আস্কারা দেবো।—লোকটা বললে, এক্ষুনি শেখাবো।—বললুম, বেশ, আমিও এক্ষুনি তোমার নিকে হবো।

হিরণ বললে, মন্তর শিখলে ?

দাঁড়াও, হাসনু সোৎসাহে বললে, সে মন্তর শিখতে মাস তিনেক লেগেছিল। কী বোকা তোমার সেই সাপুড়ে ! আমি রোজই যাই, আর সেও মন্তর পড়ে। লোকটার মাথা খারাপ হবার উপক্রম। দেখতে পাচ্ছি বাসনার আগুনে সে পুড়ছে ! আমাকে পাবার উপায় নেই, কেন-না আল্লার নামে সে শপথ নিয়েছে। একদিন ছিমন্ত জেলের সাহায্যে আমি ধানক্ষেত থেকে কেউটে সাপ ধ'রে আনলুম। তাই দেখে মিঞা আঁৎকে উঠলো। বললুম, মিঞা, ওই সাপ যদি তোমাকে না কামড়ায় তবেই আমি তোমার ঘরে শোবো। তিনমাস তোমার নিকে হয়ে রইলুম, কিন্তু কই, আমার সাধ-আহ্লাদ ত' তুমি মেটালে না, মিঞা ?—পরদিন গিয়ে দেখি সাপুড়ে শেখ দেশ ছেড়ে পালিয়েছে !

হিরণ এবার খুব হেসে উঠলো।

৪

হাসনুর মামা হোসেন সাহেব সপরিবারে গিয়েছেন চট্টগ্রাম—সেখানে সরকারী পূর্তবিভাগে কাজ নিয়ে। তাঁর দূর সম্পর্কের ভগ্নিপতির মা-বাপ-মরা মেয়েটা যে এ বাড়িতে কোন দিন এসে উঠবে, এ তিনি কল্পনা ক'রে যাননি। তিনি যে শীঘ্র ফিরবেন, এমনও মনে হয় না। সুতরাং এ বাড়ির ভার ছিল পাড়ার লোকের ওপর। তাদেরই দলের কোনো কোনো লোক নিচের তলার

একখানা ঘর দখল ক'রে ছিল। হাসনু এসে তাদেরকে সরিয়ে দিয়েছে। শূন্যঘর পেলেই চামচিকারা বাসা বাঁধে, - অন্যায় কিছু নয়।

জ্যাঠামশায়ের জন্য হাসনু ব্যবস্থা করেছিল দক্ষিণের বড় ঘরখানায়। সেখানে পালঙ্ক আর অন্যান্য আসবাব-সজ্জা ছিল। সুমিত্রার ঘর উত্তর-পূর্ব কোণে। ভোরবেলায় লোক পাঠিয়ে সে গঙ্গাজল আনিয়েছে সুমিত্রার জন্য। বসন্ত নামধারী এক চাকরকে সে মোতায়েন করেছে আজ সকালে। বিধবার শুদ্ধাচারের কথা তা'র অবিদিত নেই—সুতরাং সুমিত্রার ব্যবস্থার চেহারাটা হোলো সম্পূর্ণ আলাদা। মীরা আর সে দুজনে থাকবে মায়ের ঘরে। বাইরের দিকে হিরণ।

বসন্তের সঙ্গে নিজে গিয়ে হাসনু বাজার থেকে সর্বপ্রকার সামগ্রী কিনে এনেছে। উৎকৃষ্ট চাউল, আটা আর চিনি প্রচুর পরিমাণে আনালো ব্ল্যাক্ মার্কেট্ থেকে। খাঁটি দুধের বন্দোবস্ত হোলো জ্যাঠামশায়ের জন্য।

হিরণ ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে এসে পৌঁছলো বেলা তখন দশটা। হাসনু এসে সকলের আগে জ্যাঠামশাইকে ধ'রে-ধ'রে নিয়ে গেল তাঁর ঘরে। সযত্নে শুইয়ে দিল নতুন বিছানা-পাতা পালঙ্কে। ওদের সঙ্গে জিনিসপত্র নেই বললেই হয়। কিছু শয্যাদ্রব্য ও বাসন কালক্রমে জুটে গিয়েছিল—এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। হাসনুর হাতের এই সর্বাঙ্গীন আয়োজন দেখে সুমিত্রা ও মীরা একেবারেই হতবাক। সুমিত্রা নিজের ঘরে গিয়ে দেখলেন, সমস্ত উপকরণ নিখুঁতভাবে সাজানো। অত্রি বললে, মা, বসন্ত ছাড়া আর কেউ কিছুতে হাত দেয়নি। ওই দেখো, তোমার জন্যে নতুন পেতলের ঘড়ায় গঙ্গাজল, ওঘরে তোমার পূজোর জায়গা। মা, ছোর্ডদি কিন্তু তোমার এ মহলে আসবে না বলেছে।

সুমিত্রা বললেন, বটে, আচ্ছা আমিই যাচ্ছি। পোড়ারমুখীর গলা টিপে আনছি—দাঁড়া।

মীরা রান্নাঘরের দিকে এসে দেখলো, এক গোছা পৈতা গলায় দিয়ে এক রাঢী ব্রাহ্মণসন্তান ব'সে গেছে রান্নাঘরের কাজে। রাগ ক'রে সে বললে, হাসনু, তুই বুঝি আমাদের ভেল্কী দেখাতে এনেছিস্?

হাসনু বললে, ঘরকন্না গোছানোটা ভেল্কী নয়, মীরাদি।

মীরা বললে, তোর কাছে এই দেনা বাবা কি শোধ করতে পারবেন কোনোদিন? এত খরচ কেন করেছিস?

হাসনু বললে, আমাকে অত নির্বোধ মনে করো কেন? আমি পয়সা পাবো কোথায়? আমার আছে কিছু?

তবে এত টাকা পেলি কোত্থেকে? কোন পক্ষের বর তোকে দিলে শুনি?

হাসনু উষ্ণ কণ্ঠে বললে, ছোটবেলা থেকে বোধ হয় পাঁচ-সাতটা বয়েরই পয়সাতেই নবাবী ক'রে এসেছি ?

মীরা বললে, বাবার কথা বলছিস্ ? তিনি ত' এখন পথের ভিখারী !

জ্যাঠামশাই না হয় পথের ভিখারী। তাঁর মালখানার চাবি ছিল কা'র কাছে ? কা'র জিম্মায় ছিল তাঁর সিন্দুক ?

কিন্তু সে সব ত' লুটপাট হয়ে গেছে !

হাসনু বললে, মাঠ থেকে ধান তুলে নিয়ে গেলেও মাঠে ধান প'ড়ে থাকে, মীরাদি। সেগুলো খেয়ে যায় বুলবুলিতে !

মীরা গলা নামিয়ে বললে, কিন্তু একথা বাবার কানে উঠলে তিনি ভয়ানক দুঃখ পাবেন, হাসনু।

সে আমি জানি, মীরাদি। তাঁর কানে নাই-বা তুললুম।

জানতে তিনি চাইবেন। তুই কি জবাব দিবি ?

হাসনু বললে, ছোটবেলা থেকে এত মিছে কথা ব'লে এসেছি, আর আজকে একটা বানিয়ে বলতে পারবো না ?

মীরা বললে, কত টাকা এনেছিস ?

হাসনু বললে, শুধু কি টাকাই ছিল হাজিপুরের বাড়িতে ?

মীরা শিউরে উঠে বললে, তবে ? সত্যি করে বল্ শুনি !

হাসনু একমুখ হেসে বললে, কাল রাত্তিরে গুনগুন ক'রে হিরণের কানে কানে সেকথা বলেছি, কিন্তু তোমাকে বলবো না।

হিরণ কি তোর এতই আপন !

তোমার চেয়ে আপন, এতেই আমি খুশী।

আমাকে বলবিনে ?

হাসনু আবার হাসলো। বললে, তোমাকে যদি বলি তুমি এক্ষুণি গিয়ে হয়ত হিরণের গলায় মালা দিয়ে বসবে !

মীরা তীব্রকণ্ঠে বললে, যদি বা দিতুম কখনো,—আর দেবো না !—এই ব'লে সে বেরিয়ে গেল।

হাসনু খিলখিল ক'রে হেসে লুটিয়ে পড়লো।

হাসির শব্দটা গেল অনেক দূর। সুমিত্রা এঘরে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, কি হয়েছে রে ?

হাসনু বললে, তোমার ভাসুরঝির পাগলামী, ছোটখুড়ি।

সুমিত্রা বললেন, সে যেমন শান্ত, তেমনি গম্ভীর। কিন্তু তোকে দেখে মনে হচ্ছে, তোরই পাগলামী আগাগোড়া ! বলি, ব্যাপারটা কি ?

তুমি ত' জানো ছোটখুড়ি, আমি একটু-আধটু মিছে কথা বলি!

হাসিমুখে সুমিত্রা বললেন, হাঁ জানি, চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত তুই এক আধবার সত্যি কথা বল্‌তিস।

হাসনু বললে, তোমাদের ধারণা এবাড়িতে সব খরচই আমি করেছি। এ ধারণা ভুল। এখানে আসবার আগে খাজনার কিস্তি আদায় ক'রে এনেছি হাজার কয়েক টাকা,—মীরাদিকে বলেছি অন্য কথা।

সুমিত্রা বললেন, এতেই রাগ করলো মীরা!

আর একটা কারণ আছে, সেটা হিরণ সম্পর্কে, তুমি খুড়ি হয়ে সেকথা আর নাই-বা শুনলে!

পোড়ারমুখি, তোর মতলব আমি সব জানি। বলতে বলতে সুমিত্রা আবার বেরিয়ে গেলেন।

বাইরে গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। হিরণের সঙ্গে ভিতরে এসে ঢুকলেন এক ডাক্তার। হাসনু নমস্কার জানিয়ে বললে, আসুন।

জীবেন্দ্র শান্তভাবে পালঙ্কে শুয়েছিলেন। ওরা তিনজন গিয়ে দাঁড়ালো বিছানার পাশে। ডাক্তার হলেন হৃদ্‌রোগের একজন বিশেষজ্ঞ। জীবেন্দ্র অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, আসুন।

ডাক্তার অল্প কয়েকটি প্রশ্নের পর নাড়ী পরীক্ষা করলেন। বললেন, এমনি এর শরীর সুস্থ, ওষুধপত্র খাবার দরকার নেই। অনেককাল আগে সম্ভবত আপনার বেরিবেরি হয়েছিল।

জীবেন্দ্র বললেন, হ্যাঁ, বছর কুড়ি আগে।

আপনার চোখ খারাপ হয়েছিল কি?

হয়েছিল কিছুদিনের জন্য।

ডাক্তার হাসিমুখে বললেন, মনে উত্তেজনা এলে আপনি একটু কষ্ট পান, সুতরাং একটুখানি সতর্ক থাকবেন। আমার দেখা হয়ে গেছে, আজ আমি উঠি। আমি কেবল লিভারের জন্য একটা ওষুধ পাঠিয়ে দেবো।

হিরণের সঙ্গে ডাক্তার আবার বেরিয়ে গেলেন।

হাসনু জীবেন্দ্রের মাথায় তার নরম হাতখানা বুলিয়ে বললে, জ্যাঠামশাই?

কেন মা?

সত্যি কথা বলবো? আমাকে দেখার পর থেকেই তুমি একটু ভালো আছ।

জীবেন্দ্র হেসে বললেন, কেমন ক'রে জানলি?

তুমি যে বলতে আমি তোমার ছেলে,—আমি এসে দাঁড়ালে তুমি সাহস পাও?

জীবেন্দ্র চোখ বুজলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, আচ্ছা হাসনু!

কি, জ্যাঠামশাই?

লোকে যে বলে আমি তোকে মুসলমান সমাজে যেতে দিইনি একথা কি সত্যি?

হাসনু কিছুক্ষণ থামলো। তারপর বললে, তোমার মনে কোনো উত্তেজনা এলে ক্ষতি হবে। এসব আলোচনা এখন থাক, জ্যাঠামশাই।

জীবেন্দ্র শান্তকণ্ঠে বললেন, তুই আমাকে আজ তুলে এনেছিস পঙ্ককুণ্ডের থেকে। কিন্তু একথার জবাব না পেলে আমার শরীর কি সুস্থ হবে?

হাসনু বললে, আমি জানি এক-একটা কথা তোমাকে এক-এক সময়ে পেয়ে বসে। তবে আগে তুমি আমার কথার জবাব দাও, জ্যাঠামশাই।

কি বল?

আমাদের দেশে হিন্দু আর মুসলমান নামক দুটো সমাজ আছে,—একথা আগে তুমি কি আমাকে জানতে দিয়েছিলে? তুমি কি শিখিয়েছিলে যে, এদুটো আলাদা?

জীবেন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। পরে বললেন, কিন্তু তুই সব ছেড়ে নিজের জীবনটা নষ্ট করতে বসলি কেন?

নষ্ট বলছ কা'কে?

কোনো ঘরেই তুই স্থির থাকতে পারলিনে, এর কারণ কি?

হাসনু একেবারে নিঃসঙ্কোচে প্রশ্নটার জবাব দিয়ে বসলো! বললে, তোমার ঘরে মানুষ হবার জন্যে কোনো ঘরেই আমার মন বসে না, জ্যাঠামশাই।

কিন্তু স্বামী!

স্বামীর চেয়ে মানুষ অনেক বড়।

জীবেন্দ্র হাসলেন। মৃদুকণ্ঠে বললেন, কাঁচা মাটির তালকে ছাঁচে ঢেলে পোড়ালে তবেই সে পুতুল হয় মা! মনে পড়ে, তোমার প্রথম বিয়ের সময় কত মোল্লা আর মৌলভীদের ডেকে আনা হয়েছিল? নূরনগর থেকে হাজী সাহেব পর্যন্ত এসেছিলেন, মনে পড়ে?

হাসনু বললে, হ্যাঁ, পড়ে।

তাঁরাই তোমার বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের চেনা পাত্রের সঙ্গে।

চেনা পাত্র নিশ্চয়ই!—হাসনু ঈষৎ তপ্তকণ্ঠে বললে, চার পায়ে যার হেঁটে আসা উচিৎ ছিল, সে বিয়ে করতে এলো দুই পায়ে হেঁটে। জ্যাঠামশাই, কাঁচা মাটি হলে হয়ত আমার ছাঁচে ঢালতে পারতুম, কিন্তু বনমানুষকে বদলে

বানানো যায় না। ওদিক দিয়ে আমার জীবন নষ্ট হয়নি, জ্যাঠামশাই,—কিন্তু এবার বোধ হয় সত্যিই নষ্ট হ'তে বসলো।

জীবেন্দ্র বললেন, কেন?

তাঁর কপালে হাত বুলিয়ে হাসনু শান্ত কণ্ঠে বললে, আজ তুমি সে-কথা শুনতে চেয়ো না, জ্যাঠামশাই।

না শুনলে অসুখ যে বাড়বে মা!

শুনলে যদি অসুখ আরো বাড়ে?

তুই ত' বলেছিস্ আমার কোনো অসুখ নেই! আর তুই আছিস আমার পাশে! ভয় কি আমার?

হাসনু গলা পরিষ্কার ক'রে বললে, তোমার হাতে আলো ছিল, তাই অত অন্ধকারেও আমরা আলো দেখতে পেতুম। সেই আলো তুমি নিজের হাতেই নিবিয়ে এলে, জ্যাঠামশাই।

জীবেন্দ্র বললেন, আমি?

হ্যাঁ, তুমি। তোমার ছিল আদর্শবাদ, তা'র ছায়াতেই আমরা মানুষ। আমরা দাঁড়িয়েছিলুম সেই খুঁটি আঁকড়ে। বন্যায় দুর্ভিক্ষে মড়কে রাষ্ট্রবিপ্লবে সেই খুঁটি ছিল শক্ত। তুমি আলো দেখাতে, আমরা পথ চিনে নিতুম। কিন্তু সেই আদর্শের অগ্নিপরীক্ষার দিন যেদিন এলো,—তুমি পালিয়ে গেলে সবাইকে ছেড়ে। সেই অগ্নিকাণ্ডের রাত্রে তুমি যদি পেছন ফিরে দেখতে,—দেখতে পেতে কা'রা বসে কাঁদছিল সেই অন্ধকারে। সেই বুড়ো মোতাহার, তোমার বন্ধু আবু মোড়ল, মনিরুদ্দিন মোওার, ফুলবানুর দাদী,—তা'রা কাঁদছিল লুটিয়ে লুটিয়ে। তুমি কি জেনে এসেছ তোমার বাড়ির আগুন নেবাতে গিয়ে হারুনিঞার ছেলে আবুল পুড়ে মরেছে?—জ্যাঠামশাই, তুমি আমাদের সর্বনাশ ক'রে এসেছ! তুমি নষ্ট ক'রে এসেছ আমাদের বিশ্বাস, আমাদের শক্তি, আমাদের সমস্ত জীবন।

বলতে বলতে হাসনুর গলা ধ'রে এলো। কিন্তু সে শক্ত মেয়ে, কিছুতেই চোখে জল আসতে দিল না।

জীবেন্দ্র শান্তভাবে উপর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। চোখ দুটো তাঁর শান্ত স্থির। কোনো জবাব দেবার চেষ্টাও তিনি করলেন না।

হাসনু বললে, জ্যাঠামশাই, তুমিই বলতে—ভালোবাসার থেকেই আঘাত আসে, এমন কি হনন-বুদ্ধিও আসে। তা'রা অর্জুন বোরেগীকে মারতে ছোটেনি, দাশু সাঁতরার ওপর তাদের রাগ নেই—তা'রা আক্রমন করলো তোমাকে! কিন্তু আমি জানি এর কারণ। তারা মুখ চেয়ে ছিল চিরকাল।

পাঠান এসেছে, মোগল এসেছে, ইংরেজ এসেছে,—কিন্তু তা'রা শুধু তোমাকেই জানে। তা'রা ভালোবেসেছে,—তা'র বদলে তুমি করেছ দয়া। যত অবহেলা তুমি তাদেরকে ক'রে এসেছ এতকাল, ঠিক তত ঘৃণাই তা'রা ফিরিয়ে দিচ্ছে তোমাকে, জ্যাঠামশাই!

জীবেন্দ্র ডাকলেন, মা?

কাছে মুখ এনে হাসনু বললে, কেন, জ্যাঠামশাই?

আমার বাড়িতে আগুন দিলে কি এর প্রতিকার হবে মা?

হবে জ্যাঠামশাই, তোমার বাড়িতেই আগুন দেওয়া দরকার। নিরপরাধ আদর্শবাদীর অপমৃত্যু ঘটলে তবেই মানুষের বুকের ভেতর টন-টন ক'রে ওঠে। ওরা তোমার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেখতে চাইলো, ওদের বুকের আগুনের ভয়ানক চেহারাটা! ওদের কোনো জাত নেই, জ্যাঠামশাই,—কোনো ধর্মের বালাই নেই।

হাসনু?—জীবেন্দ্র আবার ডাকলেন।

হাসনু বললে, কি জ্যাঠামশাই?

জাত ধর্মের ওপর কি আজ জোর দেওয়া হচ্ছে না?

মৃদুমধুর কণ্ঠে হাসনু বললে, হোক না! যারা অজ্ঞান তাদের কাছে এই দুটোই ত' সম্বল! জোর দেওয়া হচ্ছে সুবিধের জন্যে, জ্যাঠামশাই। আজ জাতের চেয়ে দাম বেশি জাতিভেদেব, ধর্মের চেয়ে দাম ধর্মান্ধতার। ধর্ম যদি আজ বিদ্বেষকে জাগিয়ে রাখে, তার লভ্যাংশ অনেক, জাতের নামে যদি স্বজাতি পায় রাজ্যপাট, তবে সেই ত' কাম্য! তুমি ওদেরকে দয়াই করলে, কিন্তু দীক্ষা দিলে না। তোমরা যখন ইংরেজদের হাত থেকে মুক্তি চাইছিলে, ওরা তখন তোমাদের হাত থেকে মুক্তি খুঁজছিল। একশো বছর আগে যে ইংরেজ ওদেরকে লাথি মেরে তক্ত-তাউস কেড়ে নিয়েছিল, ওরা গায়ে পড়ে সেই ইংরেজের সঙ্গে ভাব করলো শুধু তোমাদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে।

হাসনু হঠাৎ কি ভেবে যেন চুপ ক'রে গেল। তারপর বললে, জ্যাঠামশাই, আমার কি কোন ভুল থেকে যাচ্ছে?

জীবেন্দ্র বললেন, নিজের ওপর সন্দেহ কেন, মা?

অবিচার হচ্ছে না তোমার ওপর? হাসনুর চোখে এবার অশ্রু দেখা গেল।

অবিচার কি করেছিস তুই কোনোদিন?

হাসনু বললে, তুমি সব ছেড়ে এসেছ। এসেছ অচেনা দেশে, জায়গা নিয়েছ অজানা ঘরে—সহায় সম্বল তোমার কিছু নেই, বিছানায় শুয়ে পড়েছ অসুস্থশরীরে,—এই সময়ে আমার এই স্পর্ধা তুমি ক্ষমা করো, জ্যাঠামশাই।

ওকথা বলতে নেই, হাসনু—জীবেন্দ্র বললেন, তোর মুখ বন্ধ হলে নিজের কথাও হারাবো। তোর মুখ দিয়ে একালের কথা শুনতে চাই, মা।

তুমি একটু বেড়াতে যাবে, জ্যাঠামশাই?

কোথায় যাবো মা? অনেককাল আগে এক-আধবার কলকাতায় এসেছি, এখন আর কিছু মনে নেই।

হাসনু বললে, গাড়ি করে তোমায় নিয়ে যাবো। বাইরে হাওয়ায় তুমি একটু ভালোই থাকবে?

চলো।—

নতুন চাকর হলেও বসন্তর কিছু মাত্রাজ্ঞান ছিল। বাইরের ঘরে ঢুকে সে দেখলো হিরণ মেঝের ওপর গুছিয়ে ব'সে তা'র নতুন জুতো জোড়াটা মোছামুছি করতে লেগেছে। চোখ কপালে তুলে বসন্ত বললে, বাবু এ কি করছেন আপনি? মেমসাহেব দেখলে আমার নতুন চাকরি চ'লে যাবে।

তুই কত মাইনে পাবি রে, বসন্ত?—হিরণ প্রশ্ন করলো।

আজ্ঞে বাবু, পঁচিশ টাকা।

পঁচিশ টাকায় জুতো পর্যন্ত পালিশ করবি?

আজ্ঞে হঁ্যা, বাবু।

মেমসাহেব ত' এখানে দুজন। কা'র কথা বলছিস? ফর্সা, না কালো? হিরণ একবার ভুরু কুঁচকে তাকালো।

বসন্ত বললে, দুজনের কথাই বলছি, বাবু।

হিরণ নিশ্চিন্তভাবে জুতো মুছছিল। বললে, আচ্ছা বসন্ত, তোর কোনো পুরুষে কেউ ঘরজামাই ছিল রে?

আজ্ঞে, আমার জানা নেই!

তুই কখনো মেয়েদের মন রাখার কাজে হাত পাকিয়েছিস?

কী যে বলেন বাবু—নিন্,—নিন্, সরুন।

হিরণ বললে, থাম্ হতভাগা,—আচ্ছা, সত্যি বল তো—তুই কখনো থেয়েটারে নেমেছিস?

না।

কখনো নির্বোধের ভূমিকায় অভিনয় করেছিস?

পিছন থেকে মীরা এসে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার বললে, বসন্ত, তুই এঘর থেকে যা।

বসন্ত পালালো। মীরা কর্কশ কণ্ঠে বললে, ঘরজামাই হবার সব গুণই আছে আপনার! এমন কি বাড়ির চাকরটাকে প্রথম থেকেই বন্ধু জুটিয়েছেন!

নির্বিকার ঔদাসীন্যের সঙ্গে হিরণ বললে, ঘরজামায়ের এসব গুণ আপনি জানলেন কি ক'রে?

জানতে হয় না, তারাই জানিয়ে দেয়। জুতো বুরুশ পর্যন্ত নেমেছে, এবার বোধ হয় পায়ে ধরেই থাকবেন!

হিরণ বললে, পায়ের মতন পা পেলে পায়ে ধ'রেও আনন্দ!

মীরা বললে, বরং পায়ে ধরা ভালো, কিন্তু পায়ে-পায়ে ঘুরলে মানসম্ভ্রম খোয়াতে হয়, তা জানেন?

জুতো জোড়াটা সযত্নে রেখে হিরণ বললে এ বাড়ি থেকে আমি চ'লে গেলে আপনি কি খুশি হন?

খুব দুঃখিত হইনে!

কেন বলুন ত'?

মান খুইয়ে থাকার চেয়ে মানে-মানে দূরে থাকাই ভালো।

হিরণ বললে, কিন্তু মান ভাঙ্গিয়ে যদি কাছাকাছি থাকা যায়, মন্দ কি?

মীরা বললে, কার মান ভাঙ্গাবেন?

যিনি নিত্য মান খোয়াবার ভয়ে ভীত!

কে তিনি!

মানের দায়ে মন ভাঙ্গে যাঁর কথায় কথায়!

মীরা বললে, আপনার কি এখনো আশা আছে যে, রাজত্ব আর রাজকন্যা দুটোই মিলবে?

হিরণ মুখ ফিরিয়ে বললে, রাজত্ব খোয়াবার পর রাজকন্যার দাম অনেকটা ক'মে গেছে এ আমি জানি। তবে কিনা এখনও দুটোর একটা মিললে অন্তত সান্ত্বনা পাই!

মীরা বললে, না, কোনোটাই পাবেন না। ও দুটো মিলে এক,—একটাকে বাদ দিলে আরেকটাও বাদ পড়ে।

কেন? শুধু রাজত্বটা পেলেও মন্দ কি?

কোন্ অধিকারে পাবেন?—মীরা ভুরু বাঁকিয়ে দাঁড়ালো।

যে-অধিকারে রাখালের ছেলে হঠাৎ রাজা হয়। ধরুন, কাকাবাবু তাঁর সম্পত্তিটা আমাকে যৌতুক দিলেন বিয়ের দিন, এবং পরদিন ভাগ্যক্রমে হঠাৎ আপনার মৃত্যু ঘটলো—

মীরা বললে, ভাগ্যক্রমে ? মানে, আপনি আমার মৃত্যু কামনা করেন ?

হিরণ বললে, ঠিক তা' করিনে—তবে কি জানেন, এটা অদ্বৈতবাদের দেশ ! পদ্মের পাপড়ির ওপর জলের ফোঁটাটা টল্‌টল্ করছে ! কোন্ মুহূর্তে ঝ'রে পড়তে পারে, বলা কি যায় ?

সম্পত্তিটা হাতে পেলে আপনি কি করতেন ?

হিরণ বললে, বলা বাহুল্য, হাসমুকে প্রাইভেট সেক্রেটারী করতুম —ও থাকতো নাচগান নিয়ে, আর ইরাণী নর্তকীর ঘাঘরা উড়িয়ে আমার গোপন-সচিবের কাজ করতো !

আর আপনি ?

আমি ? আলটপকা লক্ষপতি হ'লে আর পাঁচটা ভদ্রসন্তান সোমরসের আনন্দে মশগুল হয়ে যেমন চরণে-চরণে নূপুরের মতন বেজে বেড়ায়, আমিও তেমনি বেড়াতুম ?

মীরা বললে, হুঁ, রবিঠাকুরের কবিতাটা মুখস্ত করে রেখেছেন দেখছি ! আজকাল বুঝি আপনি মন দেয়া-নেয়ার মহৎ কাজে খুব ব্যস্ত ?

হিরণ এবার একটু হাসলো। বললে, রাজত্বটার সঙ্গে আপনাকেও খুইয়ে বছর খানেক যাবৎ একটু হাঁপ ছেড়েছিলুম, কিন্তু আবার যেন হঠাৎ মুরুব্বিয়ানার গন্ধ পাচ্ছি। মেয়েছেলে যদি পুরুষের চরিত্ররক্ষার ভার নেয়, তবে বড়ই বিপদ, মীরাদেবী।

মীরা বললে, এতক্ষণ জুতো পালিশ কর্‌ছিলেন কেন ?

মানে—হিরণ সবিস্ময়ে বললে, আমার জুতো কি আপনাকে দিয়ে পালিশ করাবো ? ব্যাপারটা বুঝলুম এতক্ষণে ! বেশ ত', আগে বললেই হোতো ! হাসমুকে নিয়ে আজ সিনেমায় যাবো, ভাল ছবি এসেছে।

একা যেতে পারতেন না ?—রাগে মীরা ফুঁসিয়ে উঠলো।

একা ? ও আমি ভাবতেও পারিনে ! ভালো ছবিও ভালো লাগে না বান্ধবী পাশে না থাকলে !

মীরার চোখ দুটো দপদপ ক'রে উঠলো। বললো এর আগে হাসমুকে নিয়ে কতবার ছবি দেখতে গেছেন ?

হিরণ বললে, যে-রকম প্রশ্ন করছেন, তাতে মনে হচ্ছে—এখনও আপনার রাজত্বেই বাস করছি ! বাস্তবিক আপনার কপালে সিঁদুর উঠলে কী দুর্দশাই হোতো আমার !

আপনাকে বাদ দিয়েও আমার কপালে সিঁদুর উঠতে পারে। একথা মনে রাখবেন।

উল্লসিত হয়ে হিরণ ব'লে উঠলো, সোবানাল্লা! এমন সুবুদ্ধি কি আপনার হবে কোনোদিন?

মীরা রুক্ষকণ্ঠে বললে, আমার আসল কথাটার জবাব চাইছি। হাসনুকে নিয়ে কতবার সিনেমায় গেছেন?

সে কি আর মনে আছে? আপনি ত' বরাবরই হাজিপুরে–! বড় জোর পরীক্ষা দিতে আসতেন ঢাকায়। হাসনু কলকাতার হস্টেল থেকে বেরিয়ে আসতো মামার বাড়ির দিকে, আর আমি বেরিয়ে পড়তুম হোস্টেল থেকে মস্ত কাজ নিয়ে! কার্জন পার্কের মোড়ে দেখা হোতো দুজনে,—এবং ঠিক তার সামনেই পেতুম মেট্রো! ফেরবার পথে হয়ত বর্ষা নামতো,—কাছাকাছি পাওয়া যেতো কালো তেরপল-ঢাকা ফীটন গাড়ি। আধঘণ্টার পথটাকে আড়াই ঘণ্টার বানিয়ে নিতুম। হাজিপুরের জমিদারীর টাকা থেকে দশটা টাকা গাড়োয়ানকে বকশিস দিতে কিছুই গায়ে লাগতো না। ছবিখানির বিষয়বস্তুটা আমাদের ওই নৈশ অভিযানেরও বেশ উৎসাহ যুগিয়ে দিত।

মীরা ভ্রুকুঞ্চন ক'রে বললে, হাসনু কি বলতো?

হিরণ সহাস্যে বললে, চারিদিক-ঢাকা ফীটন্ গাড়ির মধ্যে ব'সে পোড়ার-মুখীরা পুরুষের কানে-কানে চিরকাল গলগলিয়ে যা বলে, হাসনুও তাই বলতো? পাখির মধুর কাকলীর কোনো নির্দিষ্ট ভাষা আছে?

মীরা কাঁপছিল। বললে, আমাকে এসব কথা আগে জানতে দেন'নি কেন?

জানলে আপনি কি করতেন?

সজাগ থাকতুম! বাবার কানে কথাটা পৌছে দিতুম!

কোন্ কথাটা?

আপনাদের দুজনের এই বেহায়াপনার খবরটা?

হিরণ বললে, অদ্ভুত আপনার বিচারবুদ্ধি! দুটি ছেলে-মেয়ে বেড়িয়ে বেড়ায় হয়ত নির্জন বাগানে, কিংবা নদীর ধারে, কিংবা এখানে ওখানে। বড় জোর দুচারদিন সিনেমায়। হাসি-তামাসায় মুখর দুজনে, অথবা একটু রস গদগদ, নির্ভাবনায় অন্নবস্ত্র জোটে তাদের, হাতখরচের ভাবনা নেই নয়ত-গান আর কবিতায় তা'রা ভেসে বেড়ায়, নয়ত হেসে বেড়ায় পথে-ঘাটে! এমন মনোহর দৃশ্যটাকে আপনি বেহায়াপনা বলছেন কেন? হাসনুর বদলে আপনি আমার সঙ্গে ওই ফীটন গাড়িতে থাকলে কি রুদ্রাক্ষের মালা জপ করতেন? নাকি চোখ বুজে পরমেশ্বরের অসীম করুণার কথা স্মরণ করে প্রার্থনায় বসতেন?

মীরা বললে, তা হলে বলুন আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করবার জন্যই আপনি তৈরি হচ্ছিলেন ?

আপনার ভবিষ্যৎ কিসের নষ্ট হোতো ? হিরণ জিজ্ঞাসা করলো।

কাপুরুষের পাল্লায় পড়লে মেয়েদের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল হয় না !

হিরণ হাসিমুখে বললে, একটা ছিঁচকাঁদুনে মেয়ের পায়ের তলায় চিরকালের জন্যে যদি একটি ভদ্র ছেলে দাসখৎ লিখে প'ড়ে থাকে, সে বোধ হয় আপনার চোখে বীর পুরুষ ?

মীরা বললে, থাক্ অনেক হয়েছে, আর নয়। আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে কিনা আমি আজও বুঝতে পারিনি, কিন্তু আপনার সঙ্গে যে আমাকে বসবাস করতে হয়নি, এই আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু নতুন জুতোটা পায়ে পরবেন কেন, মাথায় করে সিনেমায় নিয়ে যান।

মীরা চ'লে যাচ্ছিল, হিরণ ডাকলো—দাঁড়ান, এরপরে এ বাড়িতে আমি থাকবো, না চ'লে যাবো ?

এ বাড়ি আমার নয়।

হিরণ বললে, কিন্তু অন্নবস্ত্রটা যে আপনাদের !

মীরা বললে, যারা মানুষ হবার চেষ্টা করে না, তা'রা এ বাড়িতে থাকবে কেমন ক'রে ?

আমি মানুষ নই, আমি ঘরজামাই !

তা হলে এ বাড়িতে ভিক্ষে মিলবে না, গেরস্থের হাত জোড়া,—আপনি বরং অন্য বাড়ি যান।

হিরণ বললে, তথাস্তু।

মীরা পিছন ফিরতেই হঠাৎ হাসনু তা'র পথ রোধ ক'রে দাঁড়ালো। বললে, বা রে, অমনি পালালেই হলো, না ?

মীরা বললে, পথ ছেড়ে দাও ভাই, আমার সব ভুল ভেঙ্গেছে !

না, এ তোমার ভুল !

কি ভুল ?

হাসনু বললে, সব ভুল তোমার এখনো ভাঙেনি, এখনও একটা বাকি।

মীরা বললে, তোমাদের দুজনের আনুপূর্বিক কাহিনী আমি সব শুনেছি, তা জানো ?

হাসনু হিরণের দিকে তাকিয়ে একবার হাসলো। পরে বললে, তোমাদের দুজনের আনুপূর্বিক আলাপ আমি আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ শুনলুম, তা জানো ? এবার শোনো সত্যি কথাটা।

মীরা বললে, তোমার সত্যি কথায় আর আমার বিশ্বাস নেই, হাসনু। তোমার সত্যি তোমারই থাক, আমাকে ছাড়ো।

হাসনু বললে, ছাড়ছি দাঁড়াও। সত্যি কথাটা শুনতে চাও না, অথচ কেচ্ছাটায় বিশ্বাস করলে, এ কেমন?

হিরণ পাশের ঘরে চ'লে গেল। হাসনু পুনরায় বললে, আচ্ছা বলো ত' হিরণকে তুমি বিশ্বাস করো কিনা?

মীরা দীপ্তকণ্ঠে বললে, না, করিনে—কোনো দিন করবোও না।

হাসনু হেসে উঠে বললে, তা হলে ওর গল্প বিশ্বাস করতে গেলে কেন? ওটা সত্যি নাও হ'তে পারে।

ওটা সত্যি হওয়া সম্ভব ব'লেই বিশ্বাস করি!

তুমি উপন্যাস পড়েছ অনেক, কোন্‌টা তা'র সত্যি কাহিনী? মিথ্যে কাহিনী পড়ে কেন কাঁদো, কেন হাসো, কেনই-বা রাগ করো—বলতে পারো?

হিরণ ঘরে এসে আবার দাঁড়ালে। বললে, আমার কিন্তু কাপড়-জামা পরা হয়ে গেছে! কই হাসনু, তুমি যে আমার জন্যে সেই এসেন্সের শিশি লুকিয়ে রেখেছিলে, সেটা দাও।

হাসনু একটু ইতস্ততঃ করলো। তৎক্ষণাৎ মীরা ব'লে উঠলো, কই এসেন্স, বার করে দাও হাসনু? নিজেও মাখো খানিকটা?

হাসনু আর হিরণ উচ্চ কলহাস্যে ঘর মুখর করে তুললো। সেই হাসির স্রোতে মীরা ভেসে চ'লে গেল পাশের ঘরে।

বিবাদের মূল চেহারাটা যে অলীক, সেটা প্রমাণিত হতে দেরী হোলো না। হাসনুর কাঁধে হাত রেখে জীবেন্দ্র বেরিয়ে এলেন। মাঝপথে দাঁড়িয়ে ছিল মীরা। তার মুখে চোখে কৌতূহল লক্ষ্য ক'রে হাসনু বললে, জ্যাঠা-মশাইকে একটু বেড়িয়ে আনবো। তুমি চলো আমাদের সঙ্গে, মীরাদি?

চলো যাই।—মীরা প্রস্তুত হ'য়েই ছিল। সিনেমায় যাওয়ার ব্যাপারটা যে হিরণ ও হাসনুর একটা মিথ্যা ষড়যন্ত্র—একথা এতক্ষণ পরে সে জানতে পারলো।

বাইরের দরজায় গাড়ি প্রস্তুত ছিল। দেখা গেল সেখানে আগে ভাগে অত্রি গিয়ে উঠে বসেছে। জীবেন্দ্র গাড়িতে উঠে অত্রির পাশে ব'সে পড়লেন। অত্রি বললে, জ্যাঠামশাই, তোমাকে আজ কলকাতা শহর দেখাবো।

জীবেন্দ্র বললেন, তোর চোখ দিয়ে সব দেখতে পারলে ভালোই হোতো রে!—আচ্ছা, হিরণকে দেখছিনে কেন? সে গেল কোথায়?

হাসন্তু বললে, সে কোথায় গেল কিছু বললে না।

তা'র কি এ বাড়িতে ভালো লাগছে না?

ভালো না লাগারই কথা, জ্যাঠামশাই।—হাসন্তু বললে, আমি অবিশ্যি তাকে ধ'রে এনেছি এ বাড়িতে, কিন্তু তার এখানে থাকা পছন্দসই কিনা বলা কঠিন। সে একটা কাজ নিয়ে বাইরে চ'লে যেতে চায়।

জ্যাঠামশাই বললেন, সে কি নিজে খুবই দুঃখিত?

হাসন্তু হাসিমুখে বললে, শোক দুঃখ তার গায়ে খুব লাগে না।

সবাই গুছিয়ে বসবার পর গাড়ি ছেড়ে দিল। ট্যাক্সিখানার সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছে এই যে, দৈনিক ঘণ্টা দুই মাইল পনেরো পর্যন্ত সে ঘোরাবে, কোথাও-বা সে অপেক্ষা করবে,—এবং প্রতি সাত দিনে নেবে পারিশ্রমিক। বন্দোবস্তটা হাসন্তুর সঙ্গে হয়েছে। গাড়িখানা ছাড়বার পরেও সুমিত্রা দাঁড়িয়ে ছিলেন বসন্তর পিছনে। রামেন্দ্রনারায়ণ কলকাতায় এসে একখানা মোটর কিনেছিলেন কোনো এক বিলাসিনীর খেয়াল চরিতার্থের জন্য। আজ স্বামীর মৃত্যু হয়েছে বটে, কিন্তু বিগত চৌদ্দ পনেরো বছরের ইতিহাসটা খুব গৌরবের নয়। সেই ইতিহাসে কিছু অশ্রু, কিছু অনাদর, কিছু বা অনাচার র'য়ে গেছে বৈ কি।

বসন্ত বললে, খুড়িমা দরজা বন্ধ ক'রে দিই?

দে।—ব'লে সুমিত্রা ভিতরে এলেন।

সন্ধ্যাহ্নিকের সময় হয়েছিল। কিন্তু চোখ বুজে পুজায় বসলে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। সেই অন্ধকারের থেকে ক্রমশঃ উঠে দাঁড়ায় হাজিপুর। মাত্র ছ'মাস আগে স্বামী মারা গেছেন এবং মৃত্যুকালে তিনি কাছেও ছিলেন না। সুতরাং আহ্নিকে বসলে স্বামীর মৃত্যুকালীন মুখের ছবিটাও কল্পনায় ঝাপসা হ'য়ে থাকে। শোনা গেছে, স্বামীর শেষের দিনগুলি নাকি শোচনীয় অবস্থায় কাটে। শোচনীয় অবস্থাটা কেমন, তা সুমিত্রার জানা নেই। চৌদ্দ বছর স্বামী জীবিত ছিলেন, কিন্তু বয়সের এত বেশি পার্থক্য ছিল যে, দুজনের মধ্যে অন্তরঙ্গ আলাপের অবকাশ ছিল কম। একটা বয়স আসে, যখন স্বামীর সকল কাজের সমালোচনা করার স্বাভাবিক অধিকার জন্মায়। কিন্তু সে-বয়সে পৌঁছবার আগেই সুমিত্রাকে বৈধব্য বরণ করতে হয়েছে।

হাজিপুর এগিয়ে আসে চোখের সামনে ছবির মতো। সুমিত্রা ছিলেন ছোটরাণী, তাঁর মহল আলাদা। মীরার মা ছিলেন বউরাণী —তিনি সুমিত্রার মায়ের বয়সী। তিনিই জোর ক'রে দেবরের বিয়ে দিয়ে সুমিত্রাকে ঘরে

আনেন। কিন্তু তিন মাসের মধ্যে মীরার মায়ের মৃত্যু হয়। সংসারের দায়িত্ব সুমিত্রার ওপর এসে পড়ে। রামেন্দ্র অধিকাংশ সময়ে থাকতেন কলকাতায়। কোন্ কোন্ আকর্ষণ তাঁকে কলকাতার এক শৌখীন পল্লীতে ধ'রে রাখতো সে আলোচনা এখন আর তুলে কাজ নেই। মোটামুটি জানা যেতো যে, ইংরেজী মদ, ইংরেজী কাব্য, ইংরেজী আহার এবং ইংরেজী মেয়ে,—এ ছাড়া তাঁর আর কিছু প্রিয় ছিল না। বিবাহ দিয়ে মীরার মা তাঁকে শোধন করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সুন্দরী সুমিত্রা বিলেতী সমাজে জন্মগ্রহণ না করার জন্য তাঁর সে-চেষ্টা ফলবতী হয়নি, এবং অত্রির জন্মগ্রহণের আগেই রামেন্দ্র তাঁর পুরনো অভ্যাসের সূত্রটাকে আবার তুলে নিয়েছিলেন। ঘরে ছিল তাঁর শৌখীন আসবাবসজ্জা, ছিল সুমিত্রার জন্য বিলাসের উপকরণ। জড়োয়া জহরতের অলঙ্কার, আভরণ সজ্জা, অপরিমেয় অর্থ, অব্যাহত অধিকার। সেখানে সুমিত্রার ক্ষতিপূরণ ছিল বৈ কি। সেখানে অত্রির ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত ছিল। রাণী হবার সমস্ত লক্ষণ নিয়ে সুমিত্রা এসেছিলেন রায় পরিবারের বধূ হয়ে, কিন্তু রাণী হবার আগেই দুর্ভাগ্যের চক্রান্ত তাঁকে টেনে এনে ফেললো কলকাতার এক বস্তিপল্লীর আঁস্তাকুড়ে। হাসনু আজ তাঁর জন্যে যত আয়োজনই করুক না কেন, সমস্তটাই তাঁর কাছে উপহাসের মতো মনে হয়। হাসনু আজও বুঝতে পারেনি, গভীর অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে চলেছে তাঁর মনে মনে। এই কষ্টক্লিষ্ট পরাশ্রিত জীবনের বাইরে পা বাড়ানো যায় কিনা এটা তাঁকে জানতে হবে।

বাইরে কে যেন কড়া নাড়লো। বামুনঠাকুর ব্যস্ত ছিল রান্নাঘরে,—সাড়া দিয়ে বললে, কে?

জবাব পাওয়া গেল না। সুমিত্রা ডাকলেন, বসন্ত? বাইরে দেখ্ ত', হিরণ এসেছে বোধ হয়।

দেখছি খুড়িমা—ব'লে বসন্ত বাইরের দিকে চ'লে গেল।

একটু পরেই বসন্ত ফিরে এলো। বললে, একজন ভদ্রলোক ডাকছেন।

কিন্তু বাড়িতে ত' কেউ নেই?

বসন্ত বললে, সে কথা আমি বলেছি। তিনি বললেন, ছোটরাণীর সঙ্গে দেখা হলেও চলবে।

ছোটরাণী! দু-পা এগিয়ে এসে সুমিত্রা বললেন. কোথা থেকে আসছেন জিজ্ঞেস করো ত'?

বসন্ত আবার গেল। কিন্তু সে ভদ্রলোক ততক্ষণে ভিতরে এসেছেন। গলা বাড়িয়ে বললেন, আমি বেণু!

ও, আপনি!—সুমিত্রা কপালের সামনে একটু ঘোমটা টেনে বললেন,. ওঁরা সবাই বেরিয়েছেন। বসন্ত, বসবার জায়গা দে।' ভাসুরঠাকুর, হিরণ—তাঁরা কেউ বাড়ি নেই। মেয়েরাও গেছে সঙ্গে।

বেল্লিকমশাই খুশিমুখে এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, বেশ বাড়িতে এবার এসেছেন আপনারা। আমার ওখানে কষ্টই পেয়ে এসেছেন। একবারটি দেখতে এলুম—বেশ ভালো জায়গা হয়েছে এবার।

সুমিত্রা বললেন, বড় দুঃসময়ে আপনার বাড়িতে আমরা আশ্রয় পেয়েছিলুম!

না, না—সে আর কতটুকু! আপনারা বড় ঘরের বউ, ওখানে কি আপনাদের মানায়? ঠিকানাটা আপনি রেখে এসেছিলেন, তাই খুঁজে বা'র করতে পারলুম।—হ্যাঁ, আপনাদের টাকার হিসেবে কিছু ভুল ছিল। হিসেব আমি করেছি খুঁটিয়ে। আমার মাত্র বারো শো টাকা পাওনা হয়েছিল, কিন্তু আপনাদের হিরণবাবু আমাকে দিয়ে এলেন দেড় হাজার টাকা।

সুমিত্রা বললেন, কিন্তু আপনার উপকারেব ঋণ ত' শোধ করা যাবে না! ওটাকা সবই আপনি নিন্।

বেণুবাবু একবার এদিক ওদিক তাকালেন। পরে বললেন, না, তা নিতে পারবো না। পাওনার বেশি নিয়ে বাখবো কোথায়? তা হবে না। বরং এ টাকা আপনি নিজের হাতখরচেব জন্যে রাখুন।

বেল্লিক মশাই টাকা বা'র ক'রে দিলেন। একটু গলা নামিয়ে পুনরায় বললেন, আপনার সম্মান আলদা। আপনি কথায় কথায় ওই মোছলমানের মেয়েটার কাছে হাত পাতবেন, একথা আমি ভাবতেও পারিনে। আজ যদি আপনি নিজের রাজ্যে গিয়ে দাঁড়াতেন, তবে বনের পশুও বশ হোতো। হীরের টুকরো যদি কাদায় প'ড়ে থাকে তবে হীরের দাম কমে না।—নিন্, টাকা তুলে নিন্। নতুন চাকরটা আবার না নজব দেয়।

সুমিত্রা তাঁর আড়ষ্ট ডান হাতখানা বাড়িয়ে তিনশো টাকা তুলে নিলেন। পরে বললেন, আমার নিজের এখানে থাকার ইচ্ছে নাই। ভাসুর ঠাকুরের সঙ্গে গোলমাল বেধেছে প্রজাদের, হয়ত উনি আর সেখানে ফিরবেন না। কিন্তু আমার প্রজারাও আছে সেখানে। তারা আমাকে অমান্য করে না আমি জানি।

বেল্লিক কিছুক্ষণ পরে মিষ্টকণ্ঠে বললেন, দেখুন আমার সঙ্গে আপনাদের জানাশোনা দুদিনের। দুদিন পরেই আমাকে ভুলে যাবেন। একথা জানি, মীরা দেবী আমার ওপর প্রসন্ন নন্; কর্তামশাই আমাকে নিয়ে তামাসা

করেন, বেল্লিক বলে ডাকেন। আপনাদের ওই ঘরজামাইটি আমার দিকে কটমট ক'রে তাকায়। 'ওই মোছলমানের মেয়েটা প্রথম আলাপেই আমাকে যেন মারতে উঠলো। কিন্তু আমি যে নিঃস্বার্থভাবে কাজটুকু করেছি, সে কেবল অত্রির মুখ চেয়ে। এমন সুশ্রী, এমন লাবণ্য, এমন রূপ কখনো চোখে দেখিনি। ওকেই বলে রাজপুত্র। আপনারই যোগ্য সন্তান হয়েছে, একথা সকলেই বলবে!

সুমিত্রা আর মুখ তুলে তাকাতে পারলেন না। তাঁর আয়ত চক্ষের নীচে সমস্তটাই রক্তাভ হয়ে উঠলো।

দেখুন—বেল্লিক বললেন, ছেলেটিকে খুব সাবধানে রাখবেন।—ওর একদিকে হোলো জ্ঞাতিগুষ্টি, আর একদিকে হোলো ওই মোছলমানের মেয়েটা,—যদি আপনার কোনো হানি হয়, মুখে কিছু বলতে পারবেন না। থাকুন না আপনার ভাসুরঠাকুর—তিনি ত' শরিক ছাড়া আর কিছু নয়। মেয়েটার বিয়ে দিতে পারলেই ত' তাঁর ছুটি—বিষয়-সম্পত্তি ত্যাগ করলে তার ত' কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু আপনার দশা? অত্রির ভবিষ্যৎ? সে কি ওই পাকিস্তানী গোয়েন্দা মেয়েটার হাতেই ছেড়ে দেবেন?

সুমিত্রা কেমন যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। বললেন, এমন ক'রে আগে আমাকে কেউ বলেনি। আপনার কথা আমি ভেবে দেখবো, বেণুবাবু।

বেণুবাবু বললেন, ধরুন আপনার এই সামন্য বয়েস। স্বামীই না হয় গেছেন! কিন্তু সমস্ত জীবনটা? অত্রি যদি আজ আপনার কোল আলো ক'রে না থাকতো, তবে বলতে পারতুম, লক্ষ লক্ষ মেয়ের মতন আর একটি বিধবা মেয়ের জীবনও যদি মরুভূমি হয়ে যায়, ক্ষতি নেই কারো! আর যে-কেউ আপনাকে ছোট ব'লে ভাবুক, আপনি নিজের কাছে ত' আর সামান্য নন।

সুমিত্রা বললেন, আমার বলতে ভরসা হয় না, হয়ত আপনাকে আমি বিব্রতই করবো। কিন্তু—

কি বলুন? আমার কাছে আপনি কোনো সঙ্কোচ করবেন না—ওহে তোমার নাম কি যেন? হ্যাঁ—বসন্ত! বেণুবাবু বললেন, বাইরে আমার গাড়িখানার কাছে একটু দাঁড়াও গে ত'? আজকাল গাড়ি থেকে বড্ড জিনিস চুরি হচ্ছে!

সুমিত্রা একটু গলা নামিয়ে বললেন, যদি আপনার কোনো সাহায্য কোনোদিন চাই তা হ'লে কি পাবো?

বছর চল্লিশের কাছাকাছি বয়স হলেও বেণুবাবুর মুখে-চোখে তখনও

কিছু তারুণ্য ছিল। তিনি সুমিত্রার দিকে চেয়ে হাসলেন। তাঁর সেই হাসি নিজের মুখে-চোখে একটা স্বাস্থ্যের আভা এনে দিল; পরে বললেন আমি মল্লিক বংশের ছেলে। কেউ সাহায্য চাইবার আগেই আমরা আমাদের কর্তব্য ক'রে থাকি: আর আপনি সাহায্য চাইলে পাবেন না, এ কি কখনো হয়? আপনার জন্য আমার গাড়ি রইলো, বাড়ি রইলো, এমন কি ব্যাঙ্কের খাতাখানাও রইলো!

সুমিত্রা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আপনাকে একটু চা ক'রে দেবো?

বেণু হাসলেন। বললেন, চা খেতে গেলেই গল্প নিয়ে ব'সে যেতে হবে। আপনার অভিভাবকেরা এসে পড়লে হয়ত তাঁরা এটা পছন্দ করবেন না!

সুমিত্রা বললেন, আমার অভিভাবক আমি নিজে, বেণুবাবু।

বেণুবাবু বললেন, যেদিন আমি সত্যি সত্যি জানতে পারবো আপনি নিজেই নিজের অভিভাবক,—সেদিন আমিও নিজে এসে আপনার হাতের চা খেয়ে যাবো। আজ আমি ছুটি নিচ্ছি।

সুমিত্রা বললেন, আমার অনুরোধ মনে থাকবে ত'?

অনুরোধ নয়, হুকুম! সে আমার ইষ্টমন্ত্র হয়ে রইলো।—বলতে বলতে মল্লিক মশাই কেউ আসবার আগেই দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

৫

কড়ানাড়ার শব্দে দরজা খুলে চাকর সামনে এসে দাঁড়াল।—কাকে চান?

মীরা বললে, বিমলাক্ষবাবু আছেন?

চাকর বললে, দুপুরবেলা তিনি রুগী দেখেন না। আপনি বিকেল পাঁচটায় আসবেন।

মীরা বললে, তিনি আছেন কিনা আমি জানতে চাই।

চাকর একবার আপাদমস্তক তার দিকে তাকালো। খররৌদ্রে মীরার সুন্দর মুখখানা রক্তিম। কপালের চুলের গোছার ভিতর থেকে ঘামের ফোঁটা নেমে এসেছে। চাকর বললে, হ্যাঁ তিনি আছেন, খেতে বসেছেন।

তাঁকে একবার খবর দাও।

চাকর একটু ইতস্ততঃ করলো। পরে বললে, দেখুন, মা বলে রেখেছেন—দুপুরবেলা কোনো মেয়েছেলে যদি ডাক্তারবাবুর কাছে আসে তবে—

মীরা প্রশ্ন করলো, তবে কি?

ভেতরে নিয়ে যেতে তাঁর মানা।

কেন?

চাকর বললে, কিছুদিন আগে একজন মুসলমানের মেয়ে এসে ভয় দেখিয়ে অনেক টাকা নিয়ে গেছে। সেই জন্যে

মীরা বললে, তোমার মাকে গিয়ে বলো, এবার এসেছে হিন্দু মেয়ে, পাওনা আদায় করতে যারা ভয় পায়!

মা গেছেন শিবপুরে বাপের বাড়িতে। আপনি দাঁড়ান, আমি বলিগে ডাক্তারবাবুকে।

কিছুক্ষণ পরেই বিমলাক্ষ এলো। হঠাৎ সামনে অপ্রত্যাশিত মীরাকে দেখে সে উল্লসিত হয়ে উঠলো। বললে, একি সৌভাগ্য আমার? এসো, এসো এত রোদ্দুরে এসেছ? হেঁটে এসেছ মনে হচ্ছে!

মীরা বললে, ভয় পাওনি ত' বিমলদা?

ভয়! তোমাকে? সঙ্গে কেউ এসেছে নাকি? কি জানো, হাসুবানুকে দেখলে আমি আজও একটু ভয় পাই।

পাবার কথা! কিন্তু আমি তোমাকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে আসিনি, বিমলদা।

বিমলাক্ষ বললে, ছি, তোমাদের জন্যেই আজ আমি দাঁড়াতে পেরেছি মীরা। অনেক টাকা নিয়েছি তোমাদের হাত থেকে একদিন। আজ সব রকমে তোমাদের সাহায্য করতে পারলে আমি কৃতার্থই হতুম। একথা মনে করো না, হাসনু সেদিন আমাকে ভয় দেখিয়ে টাকা নিয়ে গেছে। একথা ভুল। ভয় পেয়ে টাকা বা র করার লোক আমি নই। ওটাকা জ্যাঠামশাইকে আমি প্রণামী পাঠিয়েছি, ঋণ শোধ করেছি এমন কথা কখনও আমার মনে হয়নি।—ওরে ঝণ্টু, সরবৎ নিয়ে আয়।

মীরা বললে, থাক বিমলদা। সরবৎ খেলেও আমার তেষ্টা যাবে না। আমি এসেছি অন্য কাজে।

বলো, কি কাজে? আমার যথাসাধ্য আমি করবো।

মীরা বললে, আমার একটু উপকার করবে?

বিমলাক্ষ উৎসাহিত হয়ে বললে, শুধু শুকনো উপকার! একদিন তুমি একটি আঙুল নাড়া দিলে নিজের জীবনটাকেই ওলোট-পালট ক'রে দিতে পারতুম! মনে নেই তোমার?

এবার মীরা একটু হাসলো। বললে, তোমার স্ত্রী বাড়িতে থাকলে তুমি কি এ উল্লাস প্রকাশ করতে পারতে?

ব'লো না মীরা একথা। তোমাদের তিনি আজও চোখে দেখেন নি বটে, কিন্তু তোমাদের সব কাহিনী তাঁকে বলেছি। গরীবের মেয়ে হয়ে তিনি আমাকে ধ'রে যে আজ উঁচুতে উঠেছেন, এর গোড়ায় তোমাদের সাহায্যটাই সকলের বড়; একথা তিনি যদি না বোঝেন তবে বুঝবো তিনি ছোটঘরের মেয়ে।

মীরা বললে, তোমার স্ত্রীকে আমি দেখিনি, তবে শুনেছি তাঁর কথা।

বিমলাক্ষ তা'র বাঁকা চোখ ফিরিয়ে আপ্লুত কণ্ঠে বললে, তুমি আমার সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে কথা বলো, মীরা। যদি সত্যই টাকার জন্যে এসে থাকো, তবে অবশ্যই তোমাকে এখনই টাকা দেবো।—এসো, আমরা বরং ভেতরে গিয়ে ব'সে গল্প করি।

মীরা শক্ত হয়েই এসেছিল, কেন না তা'র ভাবনা ছিল পাছে সে বিমলাক্ষর বাক্যস্রোতে ভেসে যায়। বললে, না, আজ থাক, অন্য দিন গল্প হবে। প্রথমেই বলি, টাকা চাইতে আমি আসিনি। টাকা দিলেও আমি ফিরিয়ে দেবো।

বিমলাক্ষ বললে, কিন্তু টাকা না নিলে তোমাদের চলবে কেমন করে? সেদিন হাসনু আমার হাত থেকে নিয়ে গেছে হাজার টাকা, কিন্তু তোমাদের নতুন ক'রে সংসার পত্তনের পক্ষে সে-টাকা কতটুকু?

মীরা বললে, টাকা গছিয়ে দেবাব জন্যে তোমার এই আগ্রহটা কিন্তু একটু নতুন ধরনের মনে হচ্ছে, বিমলদা।

বিমলাক্ষ বললে, আমাকে ভুল বুঝো না, মীরা। হাজিপুরের জমিদারেব মেয়ে মীরা, আর এই দুপুর-রোদ্দুরে পায়ে-হাঁটা মীরা—দুজনের মধ্যে তফাৎ অনেক। সেখানে তোমাদের রাজত্ব, এখানে তোমরা নিঃসম্বল। আমি সেই বিবেচনা করেই বলছি।

মীরা বললে, দয়া করবে, না দান করবে?

কোনোটাই নয়। বরং বলতে পারো ঋণ পরিশোধের চেষ্টা।

গলা পরিষ্কার করে এবার মীরা বললে, আমাদের অবস্থা-বিপর্যয়ের কথা শুনেও তুমি চিঠিখানার জবাব দাওনি—ঋণ পবিশোধের চেষ্টা ত' দূরের কথা। কিন্তু হাসনু যখন এসে তোমার স্ত্রীর সামনে তোমার আগেকার কাহিনী প্রকাশ করার ভয় দেখালো, তুমি তখনই টাকা বার করলে!

বিমলাক্ষ উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, বহুদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা, মীরা। তোমাকে উপযুক্ত সমাদর করতে পারছিনে এ আমার অতি দুর্ভাগ্য। কিন্তু হাসনুর কথা আর তুলো না। তার এই বিজাতীয় বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্যে আমার স্ত্রীর কাছে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেছে।

ছি, বিমলদা।—মীরা বললে, তোমার আগেকার বদ্ অভ্যাসগুলো এখনও আছে দেখছি। বিজাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা ব'লে হাসমুকে তুমি অপমান করলে, কিন্তু কই, নিজের নোংরামির কথা তুমি ত' ভাবলে না। তুমি ত' শুধু কতকগুলো বিশ্রী চিঠি লিখেই ক্ষান্ত হওনি,—এতদূরে তুমি হাসমুকে নিয়ে এগিয়েছিলে যে, ভাবলেও ভয় করে!

বিমলাক্ষ বললে, পুরুষকে সে কি লুব্ধ করেনি বলতে চাও?

মীরা সোজা তাকালো বিমলাক্ষর দিকে। স্পষ্টকণ্ঠে বললে, বোধহয় আমিও তোমাকে লুব্ধ করেছিলুম? নৈলে তুমি আমাকেই বা ওইসব চিঠি লিখতে কেমন করে? বোধহয় ভুলে গেছ, কোন্ কোন্ প্রস্তাব তোমার চিঠিতে থাকতো।

তোমার সঙ্গে তার তুলনা হয় না, মীরা!

হয়। তোমার লোভের কাছে আমরা দু'জনেই সমান ছিলুম, বিমলদা। আজ তোমার স্ত্রী উপস্থিত নেই ব'লেই এসব কথা বলতে পাচ্ছি, তিনি থাকলে কাজের কথা ব'লেই চ'লে যেতুম। আবার বলছি, ভয় নেই তোমার। আমার মুখ দিয়ে কখনও এমন কথা বেরোবে না, যাতে তোমার স্ত্রীর কাছে তোমার মানহানি হয়।

বিমলাক্ষ বললে, মানহানি যেটুকু হবার হয়ে গেছে। যত বড় বিখ্যাত ডাক্তারই আমি হই না কেন, স্ত্রীর কাছে আমি অসচ্চরিত্র ছাড়া আর কিছু নই।

মীরা বললে, এতেও তুমি ভয় পেয়ো না। স্বামীর সত্য পরিচয় স্ত্রীর পক্ষে জানা ভালো। তিনি তোমাকে কখনও বিশ্বাস ক'রে ভুল করবেন না, আর তুমিও নিজেকে কেবলই সংশোধন করবার চেষ্টা পাবে। কিন্তু একটা কথা আমি বলি। হাসমু কখনো তোমাকে লুব্ধ করেনি, হাসি তামাসা করলে লোভ প্রকাশ করা হয় না। তার নাচগান তোমার প্রিয় ছিল, আমাদেরও প্রিয় ছিল, কিন্তু নাচগান ক'রে সে কি তোমাকে টানতে চাইতো? বিমলদা, তুমি ত' সেদিন নাবালক ছিলে না! হাসমু তোমাকে ত' এক-আধবার সতর্কও ক'রে দিয়েছিল?

বিমলাক্ষ বললে, আমি যদি তোমাদের এতই অনাদরের পাত্র ছিলুম, তবে তোমরা আজো আমার সেই চিঠিগুলো রেখে দিয়েছ কেন?

মীরা হাসলো। বললে, তার জন্য তোমার ভয় আছে বুঝি?

ভয় না থাক, আড়ষ্টতা আছে কিছু।

তুমি ভাবছো যদি তোমার স্ত্রীর হাতে আমার সেই চিঠিগুলো এনে দিয়ে যাই, এই না?

বিমলাক্ষ বললে, তোমাকে সত্যিই বলি, মীরা। সেদিন হাসনুর মেজাজ দেখে আমি একটু ভাবনাতেই পড়েছিলুম। সে সব চিঠি যদি কোনদিন আমার স্ত্রীর হাতে পড়ে তবে আমার আত্মহত্যা করা ছাড়া আর অন্য উপায় থাকবে না। আর এও জেনে রেখে দিও আমি আত্মহত্যা করলে তোমাদের গৌরব বাড়বে না।

মীরার ভিতরে চাপা উল্লাস জমে উঠেছিল। কিন্তু কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব শান্ত রেখে সে বললে, হাসনুকে ত' জানো, তার সঞ্চয় ব'লে কিছু নেই। সেজন্য আমার কাছেই চিঠিগুলো সে দিয়ে দিয়েছে।

তোমার কাছে? সব চিঠি গুলোই তোমার কাছে?—দপ্ দপ্ ক'রে বিমলাক্ষর চোখ দুটো জ্বলতে লাগলো।

মীরা বললে, হ্যাঁ, তা সবগুলোই আমার কাছে। ভাবছি এবার চিঠিগুলো তোমার হাতে ফিরিয়ে দেবো।

দেবে মীরা? সত্যি দেবে?

হ্যাঁ, দেবো।—মীরা হাসলো, তোমার পাগলামির চিঠিপত্র তুমিই ফিরিয়ে নিয়ো।

বিমলাক্ষ অপরিসীম কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললে, আমি বরাবরই জানি, তোমার হাতে কখনও আমার অমঙ্গল ঘটবে না। এও জানতুম, আমি নিজে যত ছোটই হই, তুমি অন্তত কখনও নীচে নামবে না। চিঠিগুলো কি শীঘ্রই পাবো আমি?

বিমলাক্ষর অধীর আগ্রহ ভিতরে ভিতরে উত্তাল হয়ে উঠেছিল।

মীরা বললে, হ্যাঁ, শীঘ্রই পাবে। কিন্তু একটি শর্তে।

বলো কী শর্তে? বলা বাহুল্য, তোমার যে-কোন শর্তেই আমি রাজী হবো।—বিমলাক্ষ আবেগ আন্দোলিত হয়ে বললে, মীরা, ও চিঠিগুলো হাতে না পেলে চিরকালের জন্য আমার সামাজিক সম্ভ্রম, শ্বশুরবাড়ির সমাদর, পসার-প্রতিপত্তি, স্ত্রীর কাছে আত্মসমান,—আমার প্রতিষ্ঠা, আমার ভবিষ্যৎ—সমস্তই অন্যের হাতে বিপন্ন থেকে যাবে—এ আমি অকপটেই স্বীকার করছি! মীরা, বলো তোমার কী শর্ত?

মীরা মনে মনে আবার হাসলো। বললে, আমার শর্ত সামান্যই। তুমি ত' জানো বিমলদা—কলকাতায় কেউ নেই আমাদের! এও জানো বাবার দানের হাত ছিল কতখানি? তাঁর সিন্দুকের টাকার বাণ্ডিলগুলো কখনও কোন ব্যাঙ্কে ওঠেনি। ফলে আজ এই দশা!

বিমলাক্ষ বললে, এও জানি তাঁর সব সিন্দুকের চাবিই থাকতো হাসনুর কাছে।

কথাটায় একটা হীন সন্দেহ ছিল। মীরা তৎক্ষণাৎ বললে, তার কারণ, হাসনুই ছিল আমাদের ঘরের লক্ষ্মী!

বিমলাক্ষ আত্মসংবরণ ক'রে বললে, থাকগে, তার পর? তোমার শর্ত কি বলো শুনি!

বলছি ত' শর্ত আমার সামান্যই। বাবার ছেলে নেই, সুতরাং আমাকেই দেখতে হবে সব। আমাকে যেমন ক'রে হোক নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

বিমলাক্ষ বললে, তুমি বি-এ পাশ করেছ, তোমার ভাবনা কি?

মীরা বললে, একালে বি-এ পাসের দাম কতটুকু?

মেয়েদের পক্ষে এখনও দাম আছে বৈ কি!

মেয়ে ইস্কুলে মাস্টারীর কথা বলছ? সে আমি পারবো না। শুনলুম, সরকারী মহলে তোমার আনাগোনা আছে, অনেকের বাড়িতে তুমি ডাক্তারীও ক'রে থাকো—

বিমলাক্ষ হাসলো। বললে, কথাটা মিথ্যে শোনোনি।—কোনো কোনো বড়কর্তা লুকিয়ে আমার কাছে আসেন নোংরা অসুখ সারাতে! অনেক ডাকসাইটে লোকের প্রণয়-কলঙ্কও আমাকে ঘোচাতে হয়!- হ্যাঁ—তুমি বোধ-হয় একটা ভালো চাকরি চাও, না মীরা?

মীরা বললে, ভালো চাকরি কি জুটবে কপালে?

বিমলাক্ষ একবার তাকালো মীরার দিকে। সেই চক্ষের ভাষা কেবল মেয়েরাই বোঝে। মীরা মুখ নত ক'রে নিল। বিমলাক্ষ চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, আশা করছি ভালো কাজ তোমাকে জুটিয়ে দিতে পারবো। কিন্তু আমারও একটা শর্ত আছে, মীরা।

কি বলো?

বিমলাক্ষ হাসলো। বললে, শুনেছি সিনেমার ছবির কোন পরিচালকের তাঁবে যদি সুশ্রী অভিনেত্রী একজন থাকে, তবে নানা কোম্পানীতে নাকি সেই পরিচালকের বরাত খোলে। আগে তুমি কথা দাও, আমার অবাধ্য হবে না কোনদিন?

কথা দিচ্ছি, বিমলদা?

কথা দাও যে, আমার সাহায্যে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পরে অপরের তাঁবুতে গিয়ে ঢুকবে না?

হঠাৎ হিরণের কথাটা মীরার মনে এলো। কিন্তু জোর ক'রে সেটা মন থেকে তাড়িয়ে মীরা বললে, কথা দিলুম।

বিমলাক্ষ বললে, তোমার কপালে সিঁদুর কই, মীরা?

সিঁদুর ! —মীরা বিব্রত হয়ে বললে, সিঁদুর আমার কপালে ওঠেনি !

মানে ? তোমার স্বামী হিরণ ?

মীরা বললে, আধঘণ্টা সময় পাওয়া যায়নি ব'লে তিনি আমার সম্পূর্ণ স্বামী হয়ে উঠতে পারেন নি।

বুঝলুম, আগুনের ভয়ে বিয়ের আসর ছেড়ে সবাই পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু হিরণ তার কর্তব্য পালন করবে না ?

মীরা বললে, কপালে সিঁদুর থাকলে তাঁর কর্তব্য তিনি নিশ্চয় পালন করতেন। বুঝতে পারছি তুমি সব কথাই আগে থেকে জেনে নিতে চাও। কিন্তু হিরণের কর্তব্যের কথা তুলো না। যে-ব্যক্তি কবিতা লিখে আর সাহিত্য নিয়ে চিরকাল কাটালো, তা'র কর্তব্যের আশা আমার নেই। তা'কে কবি ব'লে মনে করি, মানুষ মনে করিনে।

কিন্তু তোমার ওপর তা'র দাবি আছে, মীরা। তুমি যদি তাকে স্বামী ব'লে স্বীকার না করো তবে জ্যাঠামশাইয়ের সামাজিক সম্ভ্রম নষ্ট হবে।

এসব কথা থাক্, বিমলদা—মীরা বললে, আমি কাজে নামতে চাই, দাঁড়াতে চাই ঘরের বাইরে এসে, আমি ভুলতে চাই আমি জমিদারের মেয়ে। দুঃখে যাদের দিন কাটে, সকাল-সন্ধ্যে লড়াই ক'রে যাদের অন্ন জোটে—আমি তাদেব দলে মিলতে চাই। তুমি আমাকে সেই সুযোগ দেবে ত' ?

বিমলাক্ষ বললে, আমি তোমার চাকরি ক'রে দেবো, মীরা। অল্পদিনের মধ্যেই দেবো।

আচ্ছা, তবে আজ আমি উঠি। কবে আমার তোমার সঙ্গে দেখা হবে ? —মীরা জানতে চাইলো।

চাকরটা একটু দূরে ছিল। সেইদিকে একবার তাকিয়ে বিমলাক্ষ ইংরেজি ভাষায় বললে, আমার বাড়িতে আমার সঙ্গে তোমার না দেখা হওয়াই ভালো। আমার ধর্মতলার চেম্বারে আমি থাকি সকাল দশটা থেকে এগারোটা, আর সন্ধ্যা ছটা থেকে আটটা।

মীরা বললে, কতবার সেখানে গিয়ে আমাকে উমেদারি করতে হবে ?

বিমলাক্ষ হেসে বললে, প্রতিজ্ঞা করছি পনেরো দিনের বেশি সময় নেবো না। দিন আষ্টেক পরে তুমি একবার ওখানে খবর নিয়ো।

দুজনে বাইরে বেরিয়ে এলো। মীরা বললে, তুমি কি বলতে চাও, তোমার স্ত্রী আমার এখানে আসা-যাওয়া পছন্দ করবেন না ?

বিমলাক্ষ হেসে উঠলো। তামাসা ক'রে এবার সে মনের কথাটা ব'লে

ফেললো, স্বামি যাকে দেখলে আজও চঞ্চল হয়, স্ত্রীও তা'কে দেখলে চঞ্চল হ'তে পারে। তবে কিনা দুই চাঞ্চল্যের চেহারা আলাদা! এই নাও।

বিমলাক্ষ পকেট থেকে তার চেম্বারের নাম-ঠিকানাযুক্ত একখানা কার্ড বার ক'রে মীরার হাতে দিল। মীরা সেখানা নাড়াচাড়া ক'রে বললে, ঘরের বাইরে এসে কাজে নামলে আমার কোনো বিপদ হবে না ত বিমলদা?

কোন্ বিপদের কথা বলছ?

মীরা বললে, কোন্ বিপদের কথা মেয়েমানুষের মনে আগে আসে?

বিমলাক্ষ আবার হেসে উঠলো। মীরা পথে নেমে গেল। সেই পথের দিকে বিমলাক্ষ চেয়ে রইলো। ললিত লাবণ্যের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি ছিল তা'র। এ সেই সেদিনকার নবাব-নন্দিনী—যার আত্মাভিমান ছিল আকাশ ছোঁয়া। এ সেই অপ্সরী—যার বিদ্রূপ কটাক্ষ পদে পদে বিমলাক্ষকে হতমান করতো। এ মেয়ে সেই প্রাসাদশিখরবাসিনী সাম্রাজ্ঞী—যার চরণোপ্রান্তে পৌছতে গেলে অসংখ্য দ্বাররক্ষীকে কুর্নিশ জানিয়ে ছাড়পত্র নিতে হতো। বিমলাক্ষর হাসির উপরে বিজয়গর্বের ছায়া ঝলমল করতে লাগলো।

মীরা পিছন ফিরলো না। নতুন পায়ে হাঁটা পথে চলতে লাগলো যেদিকে তার খুশি। মনে পড়ছে, হাজিপুরের ঠাকুরদীঘির ধার দিয়ে চ'লে গেছে পুষ্পবীথিকা। জরির-কাজ-করা মখমলের পাদুকা থাকতো তা'র পায়ে। শিবের মন্দিরে প্রহরে ঘণ্টা বেজে যেতো। সেই ঘণ্টার ধ্বনি গানের মূর্ছনার মতো কেঁপে কেঁপে চলে যেতো বিশাল শস্যপ্রান্তর পেরিয়ে দিগন্ত ছাড়িয়ে—যেদিক থেকে শ্বেতহংসের দল শুক্লপক্ষ বিস্তার ক'রে ছুটে আসতো। ওর বাইরে পৃথিবী ছিল না, ওর বাইরে ছিল না সভ্যতার সংবাদ। মানুষের দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে, জীবনের বেদনা আছে, প্রাণের কোনো গভীর ক্ষুধা আছে, খাদ্যপুষ্টির অভাবে মানুষের সমাজে দুরারোগ্য ব্যাধি আছে—এসব সংবাদ তা'র জানা ছিল না। বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধের আতঙ্ক, সাম্প্রদায়িক বিসম্বাদ, স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে দেশচ্ছেদন,—সমস্তগুলোই ছিল তাদের কাছে গল্পের মতন। হাজিপুর রাজবাড়ির অন্দরমহলের যে জীবন, তা'র সঙ্গে ওদের কোনো বাস্তব যোগ ছিল না।

সেই রূপলোক থেকে ছিটকে এই জীবনে এসে পড়া—এটা কি মন্দ? এটা কি বেদনাদায়ক? অপ্সরী-কিন্নরীর দল মিলে ঘুমন্ত চিত্রলেখাকে সোনার পালঙ্কে চড়িয়ে শূন্যলোকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছিল স্বপ্নমধুর জ্যোৎস্নারাত্রে। হঠাৎ ঘুমন্ত চিত্রলেখা সেই স্বপ্নলোক থেকে ঝ'রে পড়লো ভূপৃষ্ঠে, কঠিন কর্কশ কলকাতার পাথর-মাড়ানো রাজপথে!

মীরা ভাবলো, হোক না কেন, তবু জীবনের স্বচ্ছতা এখানে কম নয়। এও সে জানে, এখানে আছে জনতা—ব্যক্তি নেই। এখানে পসার-প্রতিপত্তির মান বেশি, আত্মমর্যাদা রক্ষার দায় কম। অসংখ্য মেয়ে চলেছে পথ দিয়ে, সঙ্কোচ-কুণ্ঠা কারো মুখে চোখে নেই। পথ এখানে অবারিত এবং মানুষের পরিকল্পনা কোথাও বাধা পেয়ে ফিরে আসে না। এখানে মন্দ কি। মীরা নিজের মনে চলতে চলতে এক সময় বিমলাক্ষকে উদ্দেশ ক'রে বললে, কাপুরুষ!

ওর মুখে চোখে মীরা দেখে এসেছে উল্লাস। দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, অনুগ্রহ ভিক্ষা করেছে, ওর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে,—এই ওর উল্লাস! অপ্রত্যাশিত পথ দিয়ে এসেছে আবাল্যের কাম্য—এই ওর উল্লাস! মানী তা'র মান হারিয়েছে ক্ষুদ্রের কাছে, ইতরের পায়ে আভিজাত্য এসে আত্ম সমর্পণ করেছে—এটাও ওর উল্লাস বৈ কি! সিংহশাবক প্রাণভিক্ষা চাইছে শৃগালের দরবারে। রাজহংস গিয়ে দাঁড়িয়েছে শকুনের দরজায় অনুগ্রহ লাভের আশায়। উল্লাস বৈ কি!

হাসনু কখনো এই অসম্মান বরদাস্ত করতো না। আজকের এই সংবাদ যেন কোনদিন হাসনুর কানে না ওঠে।

বার দুই পথ হারিয়ে মীরা যখন বাড়ি এসে পৌছলো তখনও সন্ধ্যার বিলম্ব আছে। পুরুষ পথ হারালে নিরুদ্দেশে চ'লে যায়, মেয়েরা পথ হারালেও এক সময়ে ঘরে ফিরে আসে। ঘর বানায় পুরুষ, ঘর সাজায় মেয়ে। মেয়েদের নাম ঘরনী, পুরুষদের নাম ঘরামী। এ হোলো অন্তর্মুখী, ও হোলো বহির্মুখী। একজন বাহির থেকে ঘরে উঠে এসে হাতে কাঁকন পরে, আর একজন ঘর থেকে বাহিরে যাবার সময় পায়ের বাঁধন খুলে যায়। মীরাকে আজ এর বিপরীত হতে হবে, নৈলে তার চলবে না। আজ তাকে কাঁকনজোড়া তুলে রেখে এবং বাঁধনজোড়া খুলে রেখে বেরোতে হচ্ছে।

দরজায় উঠে ভিতরে ঢুকবার পথেই দেখা গেল, একখানা মাদুর পেতে হিরণ একেবারে ধ্যানস্থ। এমন হতে পারে, কোনো এক কবিতার দুটি চরণের নূপুর-নিক্কনধ্বনি তা'র মনে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। হঠাৎ এসে দাঁড়ালো মীরা। হিরণ মুখ তুলে তাকালো। রূপের সঙ্গে এমন কর্কশ কাঠিন্য সহসা চোখে পড়ে না।

মীরা বললে, আপনার মুখ দেখে বেরোলে হয়ত আমার কাজ হোতো না! তবে আপনার মুখ দেখে বাড়ি ঢুকছি—হয়ত কাজ মিলতে পারে।

হিরণ বললে, মেয়েরা উপার্জন ক'রে খাওয়ালে এ-যুগে অনেক সমস্যার মীমাংসা হয়ে যায়। আমরা কিছুকাল বিশ্রাম নিতে পারি।

ভিতরে যাবার আগে মীরা বললে, আপনি বুঝি ঘর ছেড়ে কোথাও বেরোতে চান না ?

কেমন ক'রে যাবো ? এই ত' দারোয়ানী করতে হচ্ছে ! হাসন্থর সঙ্গে কাকাবাবু গেছেন সন্ধ্যাভ্রমণে, সঙ্গে গেছেন খুড়িমা অত্রিকে নিয়ে, ঠাকুর গিয়েছে বাজারে। হাসন্থর হুকুম, নড়বার যো নেই।

বসন্ত কোথায় ?

হিরণ বললে, সে ত' আর ঘরজামাই নয়, সেও গেছে বেড়াতে। বসন্ত আবার আধুনিক যুগের চাকর। ডাইং ক্লিনিংয়ে কাপড় কাচায়, আবার সিনেমাও দেখে।

হুঁ। ব'লে মীরা ভিতরে চ'লে গেল।

মিনিট দশেক পরে মীরা আবার বেরিয়ে এলো। বললে, অনাদর ত' আপনার বেশ সয় !

হিরণ বললে, আপনারও সইবে, তা'র আর দেরি নেই !

মীরা চমকে উঠলো। বললে, এ আপনি কেমন ক'রে জানলেন ?

হাত গুণে ! কথায় বলে, স্বদেশের ঠাকুর, বিদেশের কুকুর।—হিরণ বললে, আপনার কি ধারণা, কলকাতায় আপনি প্রচুর সমাদর পেয়ে থাকেন ?

মীরা বললে, এখন আর সমাদর চাইনে, এখন প্রতিষ্ঠা পেলেই আমার চলে যাবে।

হিরণ হাসলো। বললে, প্রতিষ্ঠার জন্যে যদি মান খোয়াতে হয় ?

মীরা আবার একটু থতমত খেয়ে গেল। মনে পড়লো বিমলাক্ষর মুখে ক্রুর উল্লাসের ছায়া। বললে, আপনার মনে এই সন্দেহ কেন ?

হিরণ বললে, আপনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার আর কোনো সন্দেহই নেই। জলের মতো পরিষ্কার। তবে যাবার আগে আপনার প্রতিষ্ঠার চেহারাটা দেখে যেতে পারলে খুশী হতুম।

আপনি যাচ্ছেন নাকি কোথাও ?

যাচ্ছি বৈ কি।

কোথায় যাচ্ছেন ?

হিরণ বললে, যে-বলদ গাড়ি টানতে পারে না, তা'র ঠাঁই খোঁয়াড় পিঁজরাপোলে !

মীরা একটু উত্তেজিত হয়ে বললে, সে-গৌরবও আপনার পাওনা নেই, কেননা গাড়ি আপনি কোনোদিনই টানেন নি।

কথাটা সত্যি। কিন্তু দোষটা কার? গাড়ি টানতে দেয়নি কারা?—হিরণ মুখ তুলে তাকালো।

মীরা আজ প্রস্তুত হয়েই ছিল। বললে, এটা অক্ষমের অভিযোগ। লোকে এম-এ পাশ ক'রে মানুষ হবার চেষ্টা করে, আপনি এম-এ পাশ ক'রে ঘরজামাই হবার জন্যে বসে ছিলেন।

আমি বসে ছিলুম, না একটি পরমাসুন্দরী পাতালকন্যার সাহায্যে আমাকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল।

মীরা বললে, পাতালকন্যা! আমাকে এ রকম বিদ্রূপ করার মানে?

বিদ্রূপ নয়।—হিরণ বললে, আজ যে আমি তলিয়ে যাচ্ছি সে ওই পাতালকন্যার অন্ধ আকর্ষণেরই জন্যে। মানুষ হয়ত আমি হতে পারতুম, কিন্তু পথ জুড়ে বসেছিল পর্বতপ্রমাণ লোভ।

মীরা বললে, সেই লোভের থেকে বিমলাক্ষ মুক্তি নেয়নি? তা'র আচরণে যত নোংরামিই থাক, তার কৃতিত্বের বাহাদুরী নিশ্চয় স্বীকার করতে হবে।

হিরণ হাসলো! বললে, বিমলাক্ষকে যদি ছোটবেলা থেকে বলা হতো যে, তোমাকে হাজিপুরের ঘরজামাই হ'তে হবে,—তবে তারও ইহকাল পরকাল ঝরঝরে হয়ে যেতো! আমি বলি, এ আলোচনা থাক। আমার বিশ্বাস, হাজিপুরের সেই নবাবী ব্যবস্থার মধ্যে আবার যদি সবাই ফিরে গিয়ে বসতেও পারি, তবুও এ সমস্যার মীমাংসা হবে না।

মীরা বললে, যদি আপনাকে রাজত্বটা দেওয়া যায়?

নেবো না।

রাজকন্যা?

তাও নেবো না।

রাজকন্যার ওপর আপনার এ অরুচি কেন?

হিরণ বললে, ওটা মিথ্যে ব'লেই অরুচি। আসলে রাজকন্যা মেয়ে ছাড়া আর কিছু নয়। রাজকন্যা শব্দটা হোলো মেয়ের মুখোস। ওটা বিয়ে-বাড়ির মেয়েমহলের কানাকানির কাজে লাগে, পুরুষের কাজে লাগে না।

মীরা বললে, আপনি তবে এই অরুচি নিয়েই চ'লে যাচ্ছেন?

নিশ্চয়ই।

কিন্তু ভুল ধারণা নিয়ে যাবেন না যেন! আপনার সঙ্গে কোনোদিন কোনো সম্পর্কই হয় নি, এই কথাই জেনে যাবেন।

হিরণ ঘাড় ফিরিয়ে বললে, মনে হচ্ছে আপনি যেন একখানা ছাড়পত্র চান!

মীরা বললে, ছাড়পত্র থাকলে আপনারও সুবিধে!

যথা ?

আপনি অন্য জায়গায় বিয়েও করতে পারেন।

হিরণ বললে, আপনার কি ধারণা, বিয়ে করতে না পারলে আমি বানপ্রস্থ নিয়ে বনে যাবো ?

এমন সৌভাগ্য কি হবে আমাদের—এই ব'লে মীরা হাসিমুখে ভিতরে চ'লে গেল।

গলা বাড়িয়ে হিরণ বললে, আমিও কিন্তু ব'লে রাখি, আমি যাচ্ছি ! বন্ধুরাও জানে, যাবাব সব ব্যবস্থা আমাব হয়ে গেছে।

মীবা আবার হাসিমুখে ফিরে এলো। বললে, যারা গলা উঁচিয়ে পাড়াসুদ্ধ লোককে জানিয়ে যায়, তা'রা আবার শিগগিরই ফিরে আসে।

হিরণ এবার শান্তকণ্ঠে বললে, আপনি কি চান আমি কোনোদিনই আর ফিরে না আসি ?

মীরা একটু থামলো। তারপর ধীরে ধীরে বললে, আপনি চোখের সামনে থাকলে আমি দাঁড়াবার শক্তি খুঁজে পাবো না।

আমি কি আপনার পথেব বাধা ?

হ্যাঁ, এত বড় বাধা মেয়েমানুষের জীবনে আর কিছু নেই।

একথা কাকাবাবুকে এতকাল আপনি জানান নি কেন ?

মীরা বললে, জানাবার দরকার হয় নি,—পৃথিবী সেদিন অনেক ছোট ছিল। সোনার শেকলে তিনি আমাকে বেঁধে রেখেছিলেন,—আপনাকেও। আজ শেকল গেছে ছিঁড়ে। সমস্ত জীবন এবার অন্নের দানা খুঁজে বেড়াতে হবে।

হিরণ বললে, আমার নিজেব এতটুকু দুঃখ নেই সেজন্যে। কিন্তু এই শাস্তি আপনাদের পাওনা ছিল।

আমাদের অপরাধ ?

আছে বৈ কি। অন্ধের মতন ভোগ করেছেন, কিন্তু উপকরণ যারা সাজিয়ে দিত তাদের দিকে চোখ পড়েনি। প্রাপ্যর চেয়ে বহুগুণ বেশি পেয়ে এসেছেন,—পেছন ফিরে তাকাননি কা'রা আপনাদের ভাণ্ডার ভ'রে ছিল। নিশ্চিন্ত অন্ন মানুষকে যে কতখানি মূঢ় বানিয়ে তোলে একবার কি একথা ভেবেছিলেন ?

মীরা বললে, বাবার বিরুদ্ধেও কি আপনার এই নালিশ ?

হিরণ বললে, এখানে বাবার কথা হচ্ছে না, হচ্ছে জমিদারের কথা। কখনও শুনেছেন একজন জমিদার খেতে না পেয়ে ম'রে গেছে ? অথচ একথা নিশ্চয়

কানে শুনেছেন, ধানক্ষেতেই যাদের জীবন কাটে, একমুঠো ভাতের জন্তে তাদের অনেকেই প্রাণ হারায়! আমাদের চোখ নীচের দিকে ছিল না, আপনাদের পায়ে কখনও কাদামাটির দাগ লাগেনি,—এই জন্তেই আজ আপনাদের লাঞ্ছনা। আপনাদের জ্ঞানের পাশে ছিল মূঢ়তা, বিত্মার সঙ্গে মিশে ছিল স্বার্থবুদ্ধি, দয়ার নীচে ছিল অবহেলা, দানের সঙ্গে ছিল অহঙ্কার। সকলের মুখে শুনি একই কথা,—আমরা প্রেম বিতরণ করি, কিন্তু ওরা ভয় দেখায়। আমরা বিরোধ করিনে, তবু ওরা বিবাদ বাধায়। আমরা ভদ্রজীবন যাপন ক'রবার চেষ্টা করি, ওরা কিন্তু তিষ্ঠতে দেয় না। এই না আপনাদের অভিযোগ?

মীরা বললে, এসব চুলকেরা তর্কের কথা!

কে বললে তর্ক। এইটিই ত' ঘটনা। দেড়শো দুশো বছর আগে কা'রা ইংরেজের সঙ্গে কানাকানি করে স্বার্থচক্রান্তকে সৃষ্টি করেছিল? ব্যবস্থাটাকে কায়েম রেখেছিল কা'রা? নীচের লোকের কাঁধে পা দিয়ে কারা মাথা উঁচু রেখেছিল? আজকে যদি তার প্রতিফল পেয়ে থাকেন, তবে কান্নাকাটিটা বেমানান। আপনারা পালিয়ে এসেছেন হাজারে হাজারে লক্ষে লক্ষে। কিন্তু যারা ভদ্রলোক নয়, বড়লোক নয়, মধ্যবিত্ত নয়, শিক্ষিত নয়,—উচ্চাভিলাষী নয়,—তারা পালায়নি কেন? তাদেরকে কেন ফেলে এলেন? তারা কেন রইলো নিজের মাটি কামড়ে? এর কোনো কারণ কাকাবাবু ভেবেছেন কি?

আপনি কি ভেবেছেন?

হ্যাঁ ভেবেছি,—হিরণ বললে, শ্রেণী পালিয়ে এসেছে, জাত পালায়নি। এ সেই শ্রেণী—ইংরেজের সঙ্গে ভাব করে যারা বৃহত্তর বাঙ্গালীজাতকে নিজেদের শিক্ষা-দীক্ষার গণ্ডীর বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল! উনিশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীরা নাকি জ্ঞানে বিত্মায় সাহিত্যে সংস্কৃতিতে ভারতের মুখোজ্জ্বল করেছিল? ভেবে দেখেছেন কি যে, বাঙ্গালীর উন্নতি হয়নি, হয়েছিল এক শ্রেণীর লেখাপড়া জানা লোকের। তারা ইংরেজের আকর্ষণে গ্রাম ভেঙ্গে সমগ্র জাতকে ভাসিয়ে দূরে এসে শহর বানিয়েছিল। তাদের হাতে সমস্ত জাতটার কল্যাণ হয়নি, হয়েছিল শ্রেণীর কল্যাণ। সেই শ্রেণীর নাম শিক্ষিত সম্প্রদায়, তাদের নাম সম্ভ্রান্ত, তাদের নাম ভদ্র সমাজ। তাদের হাতে ছিল বিশ্ববিত্মালয়, ছাপাখানা, আইন-আদালত, চাকরি-বাকরি,—তারাই এদেশে ইংরেজকে সাহায্য ক'রে সদাগরী আপিস-গুলো ভ'রে তুলেছিল। কিন্তু জাত কোথায়? কোথায় সেই কোটি কোটি জনসাধারণ? এই সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর থেকে বেরিয়ে কোনো বড় ডাক্তার কি

অন্ধকার গ্রামে গিয়ে বসেছে কোনোদিন? কোনো বড় পণ্ডিত গিয়ে কি কখনো বসেছে দুঃখী দরিদ্র চাষীর পর্ণকুটীরে? একথা কি কখনো শুনেছেন, অমুক বিচারপতি, কি অমুক রায় বাহাদুর গিয়ে কোনো এক সামান্য গ্রামে মূঢ় সাধারণের মাঝখানে ব'সে জ্ঞান বিতরণ করেছেন?

মীরা বললে, পাল-পার্বণে সমস্ত গ্রামে অন্নবস্ত্র বিলানো হয় আপনি জানেন না?

হিরণ বললে, জানি, সে দৃশ্য কদর্য! কেননা সেটা অহঙ্কারের পরিচয়। ক্ষুধার্ত কুকুরের মুখে মাংসখণ্ড ছুঁড়ে দিয়ে বলা চলবে না, আপনি দাতাকর্ণ! ওটা নিজের সমারোহকে প্রচার করা, সম্পদের আত্মাভিমানকে লোকসমাজে জানানো। এই বদান্যতা আসে কুৎসিত মনোবৃত্তি থেকে। মধ্যবিত্তের, এরই নাম হোলো বড়মানুষী ফলিয়ে দরিদ্রদের বিষয়কে জাগিয়ে রাখা। সত্য কথা শুনুন, যাদের নাম ভদ্রসমাজ, তাদের সঙ্গে দেশের মাটির যোগ ছিল না। তা'রা জ্ঞান বিতরণ করেছে নিজেদের মধ্যে, শিক্ষাব্যবস্থা রেখেছে নিজেদের সুবিধার জন্য, ইংরেজের সাহায্যে আইন গড়েছে নিজেদের স্বার্থব্যবস্থা কায়েম রাখার জন্য। কিন্তু পিছন থেকে রসদ যুগিয়েছে কা'রা—খোঁজ রেখেছেন তা'র? কা'রা যুগিয়ে এসেছে বিলাসের উপকরণ? দেখে এসেছেন কি তাদের জীবনযাত্রা? তা'রা যদি দু'শো বছরের দুঃখের পর মাথা তুলে দাঁড়ায়, সেটা কি তাদের মস্ত অপরাধ? জমিদারের দল আর ভদ্রসমাজ—এরা নিজের মাটি ছেড়ে আসার আগে একবারও কি থমকে দাঁড়াতে পারলো না? একবারও কি এই কথাটা উচ্চারণ করতে পারলো না যে, এতকাল ধ'রে তোদের নিয়েছি,—আজ এইখানে দাঁড়িয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছি সব? ধনে মানে জ্ঞানে, বিদ্যায়, ঐশ্বর্যে—এতকাল ধরে তোদেরকে বঞ্চিত রেখেছিলুম—আজ তা'র জন্যে নতজানু হয়ে তোদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি! একটি বারও কি একথাটা বলতে পারলো না? বহু কালের অপরাধবোধ যাদের মেরুদণ্ডের মধ্যে ঘুণ ধরিয়ে রেখেছে,—আজ বড় আঘাতের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি তাদের কোথায়? মানুষের সঙ্গে মানুষের হাত মেলাতে পারিনি ব'লেই কি মানুষকে আজ বর্বর ব'লে গাল দেবো?

বাইরে অত্রির গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। ওরা এসে পড়েছে। কখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে, দুজনের মনে নেই। ঠাকুর এসে রান্না চড়িয়েছে, সমস্ত আলো জেলে দিয়ে গেছে—তাও এদের হুঁস ছিল না। হাসুবাবুর চড়া কণ্ঠস্বর শুনে ওরা দুজনেই থেমে গেল।

অত্রি এলো ছুটতে ছুটতে। সুমিত্রা আগেই এসে নিজের ঘরের দিকে

গেলেন। জ্যাঠামশায়ের একখানা হাত ধরে হাসনু আস্তে আস্তে ভিতরে এসে তাঁর ঘরে পৌঁছে দিয়ে এলো।

মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে হাসনু দুজনের মুখের দিকে একবার তাকালো। তারপর বললে, তোমাদের হয়েছে কি? মুখে-চোখে বন্ধুত্বের চিহ্নও নেই। ব্যাপার কি শুনি?

হিরণ বললে, তোমার ভূমিকায় অভিনয় করছিলুম, হাসনু।

হাসনু বললে, এমদাদ আলীর মেয়ের ভূমিকা কঠিন, জামাই!—শোনো এঘরে এসো। বিশেষ কথা আছে।

ওদের দুজনকে দুহাতে ধ'রে হাসনু বাইরের ঘরের দিকে টেনে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখলো, অত্রির গৃহশিক্ষক এসে হাজির। হাসনু বললে, আপনি দয়া ক'রে পাশের ঘরে গিয়ে বসুন, মাস্টারমশাই। বসন্ত, অত্রিকে ওঘরে বসিয়ে দে।

মাস্টারমশাই পাশের ঘরে গেলেন। হাসনুর উপরে কথা চলে না। তা'র সামনে কারো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথাও ওঠে না। ওরা তিনজনে বসলো একখানা তক্তায়। হাসনু মাঝখানে।

মীরা বললে, আজ কতদূর গিয়েছিলি রে?

হাসনু বললে, ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়লের বাগানে। কিন্তু জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে আলাপের দৌড় ছিল অনেকদূর। আচ্ছা বলো ত', খুড়িমার মন পাওয়া যাও না কেন? ওঁর হয়েছে কি?

হিরণ বললে, আমরা যে-আলোচনা সাবধানে এড়িয়ে চলি, তুমি সেটা খুঁচিয়ে জাগাও কেন?

মানে?

মীরা বললে, খুড়িমার মনে শান্তি নেই!

হাসনু বললে, শান্তি কি আমাদের আছে?

অত্রির ভবিষ্যৎ নিয়ে ওঁর বিশেষ দুর্ভাবনা রয়েছে।

হাসনু গলা নামিয়ে বললে, কিন্তু আমাকে মধ্যস্থ ক'রে উনি জ্যাঠামশাইকে যা শোনালেন, তা'তে আর যাই থাক্‌, অত্রির ভবিষ্যতের নাম গন্ধও নেই!

ব্যাপারটা মীরার জানা ছিল, সেজন্য সে চুপ ক'রে রইলো। সুমিত্রার মনের প্রবল অসন্তোষের ছিটে-ফোঁটা সম্প্রতি প্রকাশ পাচ্ছে। স্বামীর অনাচার তিনি সহ্য ক'রে এসেছেন, ভাসুরের অবিচার বরদাস্ত করতে তিনি প্রস্তুত নন। তাঁর আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, আশ্বাস আছে। শ্বশুর-বাড়ির ওপর যে স্বাভাবিক দাবি এবং বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে তাঁর ন্যায়সঙ্গত

অধিকার—সে সব ছেড়ে-ছুড়ে তিনি পালিয়ে বেড়াতে একেবারেই রাজী নন্। তিনি ফিরে গিয়ে হাজিপুরের বাড়িতে তাঁর নিজের মহলে বসতে চান। এবং তিনি গিয়ে পৌঁছলেই তাঁর প্রজারা তাঁকে মাথায় ক'রে রাখবে।

হিরণ বললে, মন্দ কি! খুড়িমা চলুন, আমিও যাই সঙ্গে। চাই কি আমার কপালে নায়েবীটা জুটতে পারে।

হাসনু বললে, সে গুড়ে বালি। তিনি বার বার শুনিয়েছেন যে হাজিপুরে তিনি একাই যেতে চান।

বেশ ত', আমি যদি সেখানকার মন্দিরের পূজারী হই? অন্তত ওটা ত' আমার জাতব্যবসা।

হাসনু বললে, অত্রি ছাড়া তিনি কাউকে সঙ্গে নেবেন না। তোমরা হ'লে ভিন্ন দলের লোক।

মীরা চুপ ক'রে শুনছিল এতক্ষণ। এবার বললে, বাবার মতামত জানতে পারলে কিছু?

জ্যাঠামশাই? হাসনু বললে, তিনি যথারীতি আমার দিকে তাঁর আঙুল দেখিয়ে বললেন, চিরকৌমার্যব্রতধারিণী মহীয়সী হাস্নু বানুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যদি হাজিপুরে ফিরে যাবার কথা স্থির করো, তবে আমার কোনো আপত্তি নেই, বৌমা।

বাবার কি নিজেরও ফিরে যাবার ইচ্ছে?

হাসনু বললে, পাগল আর কি। চন্দ্র সূর্য যতদিন—অন্তত ততদিন পর্যন্ত নিশ্চয় নয়।

দাঁড়াও—হিরণ ভুরু কুঁচকে বললে, মহীয়সী হাস্নুবানুর বাঁ-দিকে যে দাঁতভাঙা শব্দটা বসালে, ওটা কি কাকাবাবুরই উক্তি?

হাসনু হাসলো। বললে, পাঁচজন স্বামী সত্ত্বেও যদি দ্রৌপদী সতীসাধ্বী ব'লে পরিচিত হন, আমি আড়াইবার আড়াইজন স্বামী ত্যাগ ক'রে চিরকুমারী হ'য়ে থাকতে পারিনে কেন?

মীরা বললে, বাজে বকিস্‌নে হাসনু। সতীসাধ্বীর আদর্শ কি তোর কাছে তামাসার বস্তু?

হাসনু বললে, আমার কাছে নয়, মীরাদি। হাজার হাজার মেয়ের কাছে,—যারা তার মহিমা বুঝতে না পেরে অন্য সমাজে আশ্রয় নিয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়েছে!

এমন সময় ঠাকুর চা আনলো! হিরণ খুশী হয়ে বললে, হাসনুর মজা এই যে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ তুলে মারে।

৬

তোমার পায়ে পড়ি জ্যাঠামশাই, কথাটা সহজ ক'রে বলতে দাও।—স্বার্থের সঙ্গে লড়াই স্বার্থপরতার, বর্বরতার সঙ্গে বিদ্বেষের। বিদ্যার আসরে ওদের টেনে নাওনি, আনন্দের মেলায় ওদের জায়গা দাওনি, জ্ঞানের প্রদীপ ওদের সামনে তুলে ধরোনি। তোমাদের ঘৃণার মধ্যে আছে ভয়, ওদের ঘৃণার মধ্যে আছে শ্রদ্ধা। দস্যু ইংরেজ দুশো বছর ধরে তোমাদের ওপর ডাকাতি ক'রে গেল তবু তা রা তোমাদের অনুরাগ হারায় নি। আর এরা? এরা এসেছিল নিরন্ন নিঃসম্বল ভিখারীর দল, এরা এসেছিল তোমাদেরকে ভালোবাসতে, তোমাদেব আশ্রয়ে তোমাদের মাটিতে জায়গা নিতে। ওরা মাটি খুঁড়েছে, নৌকার হাল ধরেছে, তাঁত বুনেছে, ঘর বেঁধে দিয়েছে, কিন্তু তোমাদের মন পায়নি! জ্ঞান আর বিদ্যা লাভের জন্য ইংরেজের হাতেব লাঞ্ছনা আর অ''মান সহ্য করেছিলে,—কিন্তু এবা তোমাব মুখে অন্ন যুগি তোমার আস্তাকুঁড়ে বসে জ্ঞান ভিক্ষা করেছিল, তোমরা ঘৃণা ক'রে ওদেরকে দূরে ঠেলে দিয়েছিলে। জ্যাঠামশাই, আজ তবে তোমার মুখে এই অভিমান কেন?

মোটর চলেছে দ্রুতগতিতে। দক্ষিণ কলিকাতা পার হয়ে আরও দক্ষিণে চলেছে। বেলা পড়ে আসতে তখনও কিছু বাকি। ড্রাইভারের পাশে বসেছে হিরণ, পিছনের সীটে মাঝখানে বসেছে হাসনু, আর দুই পাশে জীবেন্দ্রনাবায়ণ ও মীরা। মীরা বসেছিল বাইরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। ড্রাইভারের পাশে হিরণ বসে রয়েছে হাসনুর কথার দিকে কান পেতে। পথের দুই পাশে বন, বাগান, গ্রাম—ছবির মত পিছন দিকে স'রে যাচ্ছিল। অবেলার রঙীন রৌদ্র পড়েছে হিরণেব তাম্রাভ এলোমেলো ঘনচুলের গোছার মধ্যে। একপাশ থেকে দেখা যায় তা'র চোখের বড় বড় পল্লব, জুলপী নেমে এসেছে গালের কাছাকাছি, মুখখানা পরিচ্ছন্নভাবে কামানো। সন্দেহ নেই, হিরণ হোলো জ্যাঠামশায়ের হাতে-গড়া পুতুল। যেমন বং, তেমন স্বাস্থ্য, তেমন রূপ। মীরা রাগ ক'রে বলতো, পুতুল বটে, কিন্তু কাঁচকড়ার! না আছে প্রাণ, না আছে ওজন। আলমারীতে সাজিয়ে রাখলে দেখতে ভালো, কিন্তু হাস্যকর। বিয়ের উপহারে চলে, প্রাত্যহিক ব্যবহারে চলে না। লোকসমাজে ওকে বা'র করাও যায়, সবাই মিলে ওর রূপের তারিফ করাও যায়, কিন্তু কর্মজগতে ওর দাম কম। গোলাপী রংযের কাঁচকড়ার পুতুল।

মোটর চলেছে দ্রুতগতি। জীবেন্দ্র শান্তভাবে হাসন্থর এতক্ষণকার কথাগুলি শুনে যাচ্ছিলেন। এবার ডাকলেন, মা?

কেন জ্যাঠামশাই?

তুই তখন আমার বিরুদ্ধে নালিশ জানাচ্ছিলি, কিন্তু মনের চেহারা যতদূর বুঝতে পারি, অভিমান ত' আমার নেই!

হাসিমুখে হাসন্থ বললে, আছে জ্যাঠামশাই—নিজের মনের রহস্য তোমার জানা আছে কি? তোমার মন তোমার চেয়েও আমি বেশি জানি। জ্যাঠামশাই, তুমি হয়ত প্রাণ নিয়ে ভীরুর মতন পালাতে না, কিন্তু আত্মাভিমানই তোমাকে সব ছেড়ে আসবার জন্য প্ররোচনা যুগিয়েছে। জ্যাঠামশাই, বড় বড় সেনাপতিরা হোলো বড় বড় বর্বর—মানুষ মারাই তাদের কাজ। ডাকাতরা মানুষ মারতে আসে না, তারা আসে লুট করতে। লুটের কাজে বাধা পেলেই তারা খুন করে। কিন্তু লুট করে কা'রা? লুট করে কেন? চেয়ে দেখো, দুইদলে যতবার দাঙ্গা বেধেছে, একপক্ষ তার লুট করেছে! অভাব থেকে ঈর্ষা, ঈর্ষা থেকে হিংস্রতা! তোমাদের লুট করতেও হয়নি, মারধর করতেও হয়নি। শশাঙ্ক গুপ্ত থেকে কেদার রায় আর বারো ভুঁইয়ার দেশে তোমাদের ছিল প্রচুর,—অভাব ছিল না, লুটের লোভও ছিল না! কিন্তু ওদের লুট করা চাই, জ্যাঠামশাই! তুমি যখন নগরের রাজপথে গান গেয়ে চলছো—'সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা—' ওরা ভুগছে তখন দারিদ্র্যে, রোগে, দুঃখে, ওরা মরছে ম্যালেরিয়ায় আর পাইক-পেয়াদার উৎপীড়নে, ওরা মরছে মহাজনের জুতোর তলায়। তোমার গানের অর্থ ওদের কাছে ছিল না, তোমার জগদ্ধাত্রী দুর্গার ষড়ৈশ্বর্যশালিনী মূর্তি ওদের চোখে পড়েনি, তোমার বিশ্বজোড়া বিদ্যা আর পাণ্ডিত্য ছিল ওদের কাছে হাসির বস্তু। রাগ ক'রো না, জ্যাঠামশাই—বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ব'লে যে বস্তুটা আজ বিশ্বের দরবারে চলে, সেটা বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতি, না বাঙ্গলার এ্যাংলো-হিন্দু কালচার? বাঙ্গালীজাতি বললে নিশ্চয় তুমি কয়েক লক্ষ লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোককে মনে করো না? তা'রা যে জাত নয়, একটা শিক্ষিত সম্প্রদায় মাত্র—এ তুমি নিশ্চয় জানো! বাঙ্গালীজাতি অনেক বড়, তোমাদের শিক্ষিত ভদ্রসমাজের চেয়েও বড়, তোমার ওই দরজা-জানালা-বন্ধ-করা বিশ্ববিদ্যার চেয়েও বড়—একথা কি তুমি স্বীকার করবে না, জ্যাঠামশাই? তোমার আত্মাভিমান নিয়ে দূরে পালিয়ে থাকবে, তবু ওদের ওই হিংস্র বর্বরতার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলবে না যে, তোরা আমার সব নে? আমার ধন সম্পদ ঐশ্বর্য বিদ্যা—আমার যা কিছু শ্রেষ্ঠ, যা কিছু মহৎ—তোরা নিয়ে নে? তোরা বড় না

হলে আমি ছোট হয়ে যাবো, তোরা মানুষ না হলে আমার মনুষ্যত্বের দাম নেই!

হাসনু!—জ্যাঠামশাই কম্পিতকণ্ঠে বললেন, তুই মুসলমানের মেয়ে। তুই সত্যি ক'রে বল্, আমি কি কখনো কায়মনোবাক্যে তোদের ওপর অবিচার করেছি? লজ্জা পাসনে, মা—তুই নিঃসঙ্কোচে বল্। এই ব'লে তিনি হাসনুর একখানা হাত ধরলেন। মীরা ও হিরণ উৎকর্ণ হয়ে উঠলো।

স্নিগ্ধমধুর কণ্ঠে হাসনু বললে, হ্যাঁ, অবিচার করেছ, জ্যাঠামশাই!

করেছি?

হ্যাঁ, করেছ! তোমার মতন নিষ্পাপ, তোমার মতন দেবচরিত্র মানুষও ওদের ওপর অবিচার করেছে! মুসলিম গণসংযোগ নাম দিয়ে তোমরা একটা ধুয়ো তুলেছিলে,—সেটা তোমাদের ভেদনীতিরই আর একটা চেহারা। কোনো এক ফাঁকিতে মুসলমানদের বড় অংশটাকে টানলে তোমাদের ক্ষমতা-লাভের সুবিধে হোতো! খিলাফৎ আন্দোলনের ফলে যে মিলিত সদ্ভাব গ'ড়ে উঠছিল সেটা ভাঙ্গলো কা'রা জ্যাঠামশাই? ওদের তোমরা দলে ডেকেছিলে, ঘরে ডাকোনি। বড় জোর চায়ের টেবিলে বসতে দিয়েছিলে, ভোজের আসরে জায়গা দাওনি! বাহির-বাড়ির বৈঠকখানায় ওদেরকে চোখ টিপে ডেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে চেয়েছিলে, কিন্তু হৃদয়ের গভীর সুরে ডেকে ওদেরকে আত্মীয় ব'লে স্বীকার করোনি।

সবাই চুপ। হাসুবানু আবার ডাকলো,—জ্যাঠামশাই, বলো ত', এই সেদিন বাঙ্গলার বুকে ছুরি বসিয়ে দুখানা ক'রে কাটলো কারা? কা'রা ভোট দিয়ে ইংরেজী কূটনীতিকে সাহায্য করলো? কা'রা ওদেরকে জব্দ করার জন্য হাজার হাজার সরকারী আর বেসরকারী কর্মচারীদের ইসারা ক'রে চাকরি ছাড়িয়ে আনলো? আঁতুড়-ঘরেই ওদেই নবজাত রাষ্ট্রের অপমৃত্যু হোক,—এই মিথ্যে আশা কা'রা মনে মনে পোষণ করেছিল, জ্যাঠামশাই? কিন্তু তুমি—তুমি তোমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সেই প্রায়শ্চিত্ত করতে পারতে! তোমাকে ঘিরে হাজার হাজার লোকের প্রত্যাশা দাঁড়িয়ে উঠেছিল, তা'রা মুখ চেয়েছিল তোমার? তারা জানতে চেয়েছিল নবজাত রাষ্ট্রকে গ'ড়ে তুলতে হবে কেমন করে! তারা বুঝতে চেয়েছিল নবলব্ধ স্বাধীনতার তাৎপর্য কি, ভবিষ্যৎ কি, আশ্বাস কি! তা'রা ইচ্ছার জোরে রাষ্ট্র আদায় করেছে, কিন্তু শক্তির জোরে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে—এই তাদের স্বপ্ন! সেই শক্তি কি তুমি যুগিয়ে দিতে পারতে না? জাত ধর্ম শিক্ষা সংস্কার সংসার স্বার্থ—সমস্ত ভুলে ওদের আনন্দে কি তুমি আত্মহারা হ'তে

পারতে না? কোথায় গেল তোমাদের দর্শন, পুরাণ, মহাকাব্য? কেমন ক'রে হারালে তোমরা ভগবান বুদ্ধকে, মহাপ্রভু চৈতন্যকে, মহাত্মা গান্ধীকে? সমস্ত ত্যাগ ক'রে দেশে উন্নতির মহৎ লক্ষ্য নিয়ে সর্বহারা সন্ন্যাসীর মতো ওদের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে বলতে পারলে না যে, ক্ষমা কর্ আমাদের? লুট করিস্নে তোরা, আগুন জ্বালাস্নে, হত্যা করিস্নে, মায়ের জাতিকে অপমান করিসনে! বলতে পারলে না যে, তোদের সেবা করতে এসেছি! যতদিন না তোরা বিশ্বের দরবারে মানবতার মহান্ আদর্শ নিয়ে সগৌরবে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে পাববি, আমরা ততদিন পর্যন্ত তোদের এই চালাঘরের দরজায় নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার ক'রে নিলুম? কই, পারলে না বলতে?

হাসনু—!

থামতে বলো না, জ্যাঠামশাই। চল্‌তি অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে ভয় পেয়েছ, কিন্তু এই দেশের চল্লিশ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র একটি মানুষ একথা স্বীকার করতে ভয় পায়নি। সে-মানুষ কোনো দেশের, কোনো জাতির, কোনো ধর্মের, কোনে সমাজের নয়। হত্যা লুণ্ঠন বর্বরতা হিংস্রতা বিপ্লব রক্তস্রোত—কিছুতেই সেই মানুষটি ভয় পায়নি, ধৈর্য হারায়নি, নির্ভুল সত্য ভোলেনি। সেই মানুষ তা'র অন্তিম জীবনে কোরাণ-বাইবেল-গীতা সমস্ত-গুলো হাতে নিয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে! তিরিশ কোটি হিন্দুর বিরক্তি আর আক্রোশের দিকে চেয়ে তাকে এই গানটি গাইতে হয়েছিল, "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে!" তাঁকে এই মন্ত্র নিতে হয়েছিল, "নিভয় করো প্রভু রাজারাম।" কিন্তু জ্যাঠামশাই তোমরা? তোমরা ক্ষমতালাভের স্বপ্নে যাকে একদিন মহাত্মা ব'লে ডেকে মাথায় তুলেছিলে, ক্ষমতালাভেব পরে সেই ব্যক্তির সত্যপালনেব ভয়ে তোমরা তাকে কাপুরুষেব মতো গুলি ক'রে মারলে।

জীবেন্দ্র প্রসন্ন স্নেহমুখ নিয়েই ব'সে রইলেন, হাসনুর কথাব জবাব দিলেন না।

মোটর এসে থামলো এক মাঠের ধারে। আগে নামলো মীরা, পরে নেমে এলো হিরণ। জীবেন্দ্রর হাতখানা সযত্নে ধ'রে হাসনু নেমে এলো পিছনে পিছনে। কিছু উদ্দীপনার আভাস হাসনুর মুখে-চোখে ছায়া ফেলে যাচ্ছিল, কিন্তু জ্যাঠামশাইয়ের শরীরটা আজ কিছু দুর্বল,—সেই জন্য কিছুমাত্র উত্তেজনা আজ প্রকাশ করাটা সমীচীন হবে না। সহাস্য মুখে হাসনু চুপ ক'রেই গিয়েছিল।

খোলামাঠে কিছুদূর তারা এগিয়ে চললো। এক সময় একটু থেমে জীবেন্দ্র প্রশ্ন করলেন, কই মীরা, আজ অত্রিকে সঙ্গে দেখছি নে?

মীরা বললে, অত্রি আসতে চেয়েছিল, কিন্তু খুড়িমার ইচ্ছে, সে পড়াশুনো নিয়ে বাড়িতেই থাকে।

শুনলুম হাসনু নাকি ওর জন্য মাস্টার রেখেছে?

মীরার হ'য়ে হাসনু নিজেই জবাব দিল, এর পড়াশুনোর ব্যাপারটা নিয়ে খুড়িমাকে খুবই ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে।

জীবেন্দ্র হাসনুর দিকে চেয়ে বললেন, তা হ'লে তোর সংসারটা বেশ বড়ই হয়ে উঠেছে, কেমন?

হাসনু সহাস্যে বললে, হবে না কেন? উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে যে!

কিন্তু কতদিন এইভাবে চালাবি মা?

যতদিন তোমার মন ফেরে, জ্যাঠামশাই!

তার বলার ভঙ্গীর গুণে উপস্থিত সবাই হেসে উঠলো। হাসনু পুনরায় বললে, তোমার দায়িত্বের ভার তুমি নিলেই আমার ছুটি।

জীবেন্দ্র বললেন, তোর ছুটি? ছুটি কি পাবি মা? কোথা যাবি ছুটি নিয়ে?

হাসনু চট্ করে তার পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিল। তারপর বললে, তোমার কাছ থেকে কোনদিন ছুটি চাইনে, জ্যাঠামশাই!

হিরণ এবার বললে, আপনার মুখ চোখ দেখে মনে হয় আগের চেয়ে একটু ভালোই আছেন।

জীবেন্দ্র বললেন, আর কিছু নয়, বেল্লিকের ওখানে প্রায় ন'মাস ছিলুম—প্রত্যেক দিনই আমার মনে হোতো, খুবই অসুখ আমার। সে অবস্থাটা গেছে।

মীরা বললে, বেল্লিকমশায়ের মনে ভয় ছিল, তাই আপনাকে বার বার কড়া ওষুধ খেতে হয়েছে, বাবা!

হাসনু বললে, কড়া ওষুধে হয়ত অসুখ সারে, কিন্তু অন্য অসুখের জন্ম হয়। আপনার ওষুধ বন্ধ হয়েছে বলেই আপনি ভালো আছেন।

জীবেন্দ্র বললেন, আমাকে ভালো করে তোলার মধ্যে তোর আর কি মতলব আছে, হাসনু?

হাসনু বললে, আছে আর একটা মতলব জ্যাঠামশাই।

বলতে বাধা আছে?

হাসনু একবার মীরার দিকে চেয়ে একটু হাসলো। তারপর বললে, না বাধা নেই। বললুম যে, তুমি এত ক'রে আমাদের লেখাপড়া শেখালে, কিন্তু আমাদের কি কিছু করবার নেই?

তোমরা কি করতে চাও? কিছু ভেবেছ?

আমাদের ত' ভাববার কথা নয়, জ্যাঠামশাই?

জীবেন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে বললেন, পুরানো একটা ব্যবস্থা ছিল সেটা ভেঙ্গে পড়লো! শুধু ঘর ভাঙ্গলো না, আমাদের মনও ভাঙ্গলো! এটা ভাঙ্গনেরই যুগ! অভ্যাস, বিশ্বাস, ছাঁচ, চল্‌তি নিয়ম, — একটির পর একটি ভাঙ্গলো। চৌষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত যা ভেবে এলুম, জেনে এলুম রাতারাতি সেগুলো মিথ্যে হয়ে গেল। বোধ হয় এরই নাম ভাববিপ্লব! মানে হচ্ছে, নতুন ক'রে কিছু ভাবতে গেলে নতুন বয়স পাওয়া দরকার। সেটা আমি পাই কেমন করে বলো ত'?

হিরণ এতক্ষণ চুপ করেই ছিল। এবার বললে, কাকাবাবু, নতুন বয়স, না নতুন চোখ!

বেশ, না হয় তাই হোলো, হিরণ। এতকাল ধরে দেখে-দেখে যার চোখে ঘোলাটে জরার ছায়া পড়েছে, তার পক্ষে নতুন চোখও পাওয়া দরকার বৈ কি।

কিন্তু আমরা কি কেবল চামড়ার চোখ দিয়ে সব দেখি, কাকাবাবু? আমরা কি মন দিয়ে দেখিনে? বুদ্ধি দিয়ে দেখিনে?

জীবেন্দ্র বললেন, তোমার একথাও মেনে নিলুম হিরণ। কিন্তু মন আর বুদ্ধির অসাড়তা কি আসে না বার্দ্ধক্যে?

হিরণ বললে, কেমন করে মানবো? চুল পাকে বলেই ত বিচারবুদ্ধি বাড়ে! আইনশাস্ত্র যারা তৈরি করে তারা বৃদ্ধ; দেশ শাসন যারা করে তারা প্রায়ই বৃদ্ধ; বিচারপতিদের পরিপক্কতা প্রকাশ করার জন্যেই ত বৃদ্ধের পাকা পরচুলো পরানো হয়ে থাকে। পাকাচুল দাড়িওলা বৃদ্ধ ছাড়া আমরা মুনি ঋষিদের ভাবতেই পারিনে। সমাজপতি, দেশনেতা, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রবিশারদ, বড় বড় সেনাপতি, ধনপতি, ব্যবসায়ী,—এরা কে বৃদ্ধ নয়, কাকাবাবু? পৃথিবীর সব দেশের কর্তারাই ত' বৃদ্ধ!

জীবেন্দ্র হিরণের দিকে চেয়ে স্নেহের হাসি হাসলেন। পরে বললেন, বৃদ্ধ আর বার্ধক্য কি এক বস্তু, হিরণ? আমি বৃদ্ধ হলে খুশী হতুম, কিন্তু বৃদ্ধ হবার আগেই বার্ধক্যে নুইয়ে পড়লুম।

হিরণ চুপ ক'রে গেল। জীবেন্দ্র পুনরায় বললে, একরাত্রে মাথার চুল সাদা হয়ে যায় আগে বিশ্বাস করতুম না। একদিনে ঈশ্বরের বিধান বদলায়, একটি পলকের ভূমিকম্পে সৃষ্টি ওলোট-পালট হয়,—একি আগে দেখেছি চোখে? মন আর বুদ্ধির অসাড়তা কখন আসে? সাধুভাষায় তুমি ত'

শুনে এসেছ, অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতার প্রচণ্ড আঘাত মানুষকে বোবা বানিয়ে দেয়, কিংবা পাগল করে, কিংবা মৃত্যু আনে। মন আর বুদ্ধির তারুণ্য আমার সেদিনও ছিল, কিন্তু আজ কেন নেই ?

হাসনু মীরাকে নিয়ে দুপা এগিয়ে পায়চারি করছিল। এবার দুজনেই কাছে এসে দাঁড়ালো। বেলা পড়ে এসেছে, এবার ফিরতে হবে।

হিরণ বললে, আচ্ছা কাকাবাবু—পুরনো ছাঁচটা যদি ভেঙেই গিয়ে থাকে, নতুন ছাঁচ গড়ে নেওয়া যায় না ?

জীবেন্দ্র বললেন, নতুন হঠাৎ আসে না! নতুনের জন্ম প্রাচীনের থেকেই, হিরণ। হঠাৎ নতুনটা হল ভুঁইফোঁড়, চিন্তাশীলদের কাছে সেটা অশ্রদ্ধেয়। নতুন ছাঁচ কাকে বলো ?

মীরা এক জায়গায় বসলো। হাসনু বসলো তার পাশে। হাসনুর চোখে মুখে উদ্দাম কৌতূহল দেখা যাচ্ছিল। মীরা আড়ষ্ট হয়ে রইলো। হিরণ বললে, যাদের ভেঙ্গে গেছে সব, যারা হারিয়েছে সমস্ত—তাদেরকে আবার বাঁচতে হবে ত ?

জীবেন্দ্র বললেন, প্রার্থনা করি তারা বাঁচুক, তারা নিজের পায়ে দাঁড়াক, গভর্ণমেণ্টের ছিটেফোঁটা দাক্ষিণ্যের থেকে মুখ ফিরিয়ে তারা নিজের উন্নতি করুক।

হিরণ বললে, আপনি কি সেটাকে নতুন ছাঁচ বলবেন না, কাকাবাবু ?

তোমরা বললেই আমি খুশী থাকবো, হিরণ। কোনোমতে প্রাণ ধারণ করাটাকে যদি নতুন ছাঁচ বলে আমাকে মানতে হয়, তবে চিড়িয়াখানাকেই অরণ্যভূমি বলতে বাধা কি ? পশু আর পাখিরা সেখানে অনেক যত্নে থাকে, অনেক গানও গায়, অনেক পাখি বাসাও বাঁধে !

হিরণ এবার একটু উৎসাহ বোধ করলো। বললে, তবে যে আপনি বলছিলেন, জমিদারী সম্পত্তি আর ঘর সংসার ছেড়ে এসে আপনার একটুও বেদনাবোধ নেই ?

জীবেন্দ্র বললেন, না নেই। আজও বলছি—নেই। ওগুলো কৃত্রিম, ওগুলো হাতের তৈরী, ওগুলো উপকরণের বাহুল্য। কিন্তু যা হারিয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ পৃথিবীর কোন রাজভাণ্ডারে নেই, হিরণ। সে হোলো আমার ওই গ্রামের পবিত্র মাটি, আর ওই মাটির ওপর কান পেতে শুয়ে থাকতো আমার যে মন! চিরকালের মাটি—যা আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না, যা হারায় না—যা আমার জননীর হৃদয়ের চেয়েও নরম! আর আমার মন ? সে-মন কি তৈরী হয়েছিল ওই হাসনুর বাবা এমদাদ আলীর

সেরেস্তায়! সে মনের খোরাক জুটতো কি আমার রাজবাড়িতে, না আমার মালখানায়? হিরণ, ছেড়ে আসার জন্ম এতটুকু ব্যথা নেই, ব্যথা হোলো আমার বিশ্বাসবান হৃদয়ের অপমৃত্যুর জন্মে!

হঠাৎ থেমে জীবেন্দ্র একবার নিশ্বাস টেনে নিলেন। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, রাজবাড়ি লুট হয়েছে! বেশত তাদের জিনিস তারাই নিয়েছে। আমাকে উৎপাত করে তারা যদি খুশী হয়ে থাকে, তবে আমার কিছু বলবার নেই। বুঝে নেবো, যে আমার পালা শেষ হয়ে ছিল। আজ দূরে বসে তাদের কাজের সমালোচনা করে কখনো নিজের কাছে ছোট হবো না।

হাসনু এবার ডাকলো, জ্যাঠামশাই?

কেন মা?

বর্বরদলের কাছে আপনার এই হৃদয়ের কি কোনো দাম আছে?

জীবেন্দ্র বললেন, তারা যে বর্বর নয়, একথা তুমি আমাকে শিখিয়েছ। কিন্তু তাদের কাছে কোন প্রত্যাশা রেখে যাব না। নাই বা দিলে দান! নাই বা পেলুম পাওনা! সম্পদ হারানোর জন্মে দুঃখ নেই, এ তুমি বিশ্বাস কারো, হাসনু। তা'রা অনেক দিয়েছে আমাকে, তাদের পরিশ্রমের ফল অনেককাল ধরে ভোগ করেছি,—এবার তাদের পাওনা যদি তারা বুঝে নেয় দুঃখ নেই কিছু।

হাসনু বললে, কিন্তু তোমার কথায় যদি তারা অবিশ্বাস করে, জ্যাঠামশাই? যদি তারা সন্দেহ করে বলে, তুমি পালিয়ে এসেছ বলেই একথা বলছ! যদি তারা বলাবলি করে, তোমার এই মায়াবাদী সন্ন্যাসের জন্ম হয়েছে বঞ্চিত চিত্তক্ষোভ থেকে? যদি তারা কানাকানি করে, মাটিকে তুমি ভালোবাসো নি, নৈলে ওই মাটি তুমি কামড়ে পড়ে থাকতে। তুমি ধনরত্ন আর প্রাসাদকেই ভালোবেসেছিলে,—আর সেগুলো হাতছাড়া হয়েছে বলেই তুমি আর বরদাস্ত করতে পারোনি!

জীবেন্দ্র বললেন, আমার ব্যক্তিগত জীবনে কি এই মনোবৃত্তির পরিচয় ছিল, মা?

না, ছিল না!—হাসনু এবার উদ্‌গ্রীব হয়ে বললে, তাই তোমাকে ফিরে যেতে বলছি, জ্যাঠামশাই। তুমি সেখানে গিয়ে এবার দাঁড়াবে চলো দরিদ্রের চেহারায়। ওদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলবে যে, সব অধিকার ছেড়ে দিলুম! জনতার অধিকারের কাছে ব্যক্তির অধিকার বিসর্জন দিতে এলুম। তোরা সবাই মিলে ভাগ করে নে! বলতে পারবে না, জ্যাঠামশাই।

পারবো!—জ্যাঠামশাই বললেন, কিন্তু ওরা যদি বলে আমার এ-কথার জন্ম আমার প্রাণভয়ের থেকে?

প্রাণভয় ত' তোমার নেই।

তা'রা কি বিশ্বাস করবে?

হাসনু একটু থামল। নতমুখী মীরার দিকে সে একবার তাকালো। হিরণ দূরে স'রে গিয়ে নিজের মনে ব'সে রয়েছে। হাসনু সেদিকেও একবার ঘাড় ফিরিয়ে জীবেন্দ্রের দিকে তাকালো। তারপর বললে, হ্যাঁ জানি—বিশ্বাস করবে না তারা, জ্যাঠামশাই। তার অনেক ঠকেছে, অনেক মার খেয়েছে, অনেক উৎপীড়ন সয়েছে! হয়ত আর তারা বিশ্বাস করতে চাইবে না। হয়ত তারা চাইবে তোমার প্রাণ, তোমার মান, তোমার জাত, তোমার ধর্ম। হয়ত তারা চাইবে তোমাদের মেদ মজ্জা রক্ত মাংস। একযুগে তারা তোমাদের হাত থেকে কিছু চায়নি—চেয়েছিল শুধু ভালোবাসা! আজকের যুগে তোমাদের হাত থেকে সব কেড়ে নেবে, শুধু চাইবে না ভালোবাসা! জ্যাঠামশাই, দুই নতুন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রথম চুক্তি তোমার মনে আছে ত'? সে-চুক্তির প্রথম শর্ত হোলো এই যে, উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে পুনর্মিলনের কথা তোলা হবে বে-আইনী। ভালোবাসলে অপমানিত হতে হবে, মিলনের কথা বলতে গেলে উৎপীড়ন সইতে হবে! এক বাড়িতে থেকে দুই ভাইয়ের মধ্যে মনোমালিন্য! ছোটভাই গোঁয়ার অশিক্ষিত বর্বর; বড় ভাই বিষকুম্ভ পয়োমুখম্, কূটনীতিপরায়ণ। বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করে বড় ভাই, টাকা পয়সা রাখে, নাড়ে—আর ছোটভাই খেটে মরে। খেতে পায় আধপেটা, গায়ে তার জোর বাড়ে না। কথায় কথায় গায়ে হাত তোলে ওই ছোটভাই, আর বড়ভাই পাড়ার লোক ডেকে আনে। তারা এসে ছোটভাইয়ের আক্রমণটাই দেখে! অবশেষে ভাগ-বাটোয়ারার কথা উঠলো। মধ্যস্থ হয়ে এসে দাঁড়ালো চতুর ইংরেজ; ভাবলে, মূর্খের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করলে ভবিষ্যতে আমি কাজ গোছাতে পারবো, তাই পাঁচখানা ঘরের মধ্যে সাড়ে তিনখানা ঘর দিলে ছোটভাইকে,—কেননা তার ঘরে লোক বেশি। এদিকে দুই ভায়ে ঝগড়া, কিন্তু দুইপক্ষের লোকের হাহুতোশ। বড়ভাইয়ের এলাকা দিয়ে না গেলে হাটতলায় যাওয়া যায় না; ছোটভাইয়ের এলাকায় হোলো পুকুর-ঘাট, আর ধানের গোলা। দুজনের একই কুটুম্ব আত্মীয়-গোষ্ঠী—কিন্তু মাঝখানে বেড়া দিয়ে গেল ইংরেজ যাবার সময়। বেড়ার এধারে বিদ্বেষ, ওধারে ঘৃণা! অথচ একই রক্ত, একই জাত, একই স্বার্থ, একই সংস্কৃতি।

মীরা হাসিমুখে এবার বললে, তোমার গল্পটা ত' মন্দ জমেনি হাসনু? কিন্তু তারপর?

হাসনুও হাসলো। হেসে বললে, তারপর! বড়ভাই এখন আগাগোড়া

নিজের আচরণের কথা ভেবে অনুতাপ করছে মনে। আর প্রাণের দায়ে ভাবছে পুনর্মিলনের কথা!

আর ছোটভাই!

ওই ঝগড়াটে গোঁয়ার গোবিন্দটা! ও এখন ভাগে পেয়েছে বেশি—অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল! ওর বদমেজাজ দেখে জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর অনেকে সরে গেছে নিজের দখল ছেড়ে। সুতরাং ও এখন আর মনোমালিন্য মেটাতে চায় না। ঝগড়া এখন মিটলেই ত' ওর ক্ষতি! পাছে জ্ঞানবুদ্ধি বাড়ে, মানুষের মতন মানুষ হয়—এজন্য লেখাপড়া শিখতেও চায় না!

জীবেন্দ্র অবধি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। এক সময়ে বললেন, কিন্তু গল্পের শেষটা?

হাসনু বললে, শেষ ত' এখনও হয়নি জ্যাঠামশাই, অনেক বাকি!

মীরা বললে, কেমন করে শেষ হ'লে তুমি খুশি হও?

হাসনু জবাব দিল, গল্প তা'র নিজের স্বভাব ধ'রেই চলবে, আমার খুশির ওপর সে নির্ভর ক'রে নেই। কিন্তু এই বিদ্বেষ আর ঘৃণার শেষ পরিণাম ভয়াবহও হ'তে পারে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা হয়ত লালকালিতেই ছাপা হবে কে-জানে!

মোটরের হর্ন বাজলো। এবার যাবার সময় হয়েছে। দক্ষিণের জলা-বিলের দিক থেকে শিকারী পাখির দল উড়ে চলেছে পশ্চিম দিগন্তের লাল আভার দিকে। সন্ধ্যা আসন্ন।

হিরণ এসে দাঁড়ালো সামনে। হাসনুর হাত ধ'রে এগিয়ে চললেন জীবেন্দ্র। মীরা চললো পিছনে পিছনে। হিরণ চললো পাশে পাশে। এক সময় মীরা বললে, আপনাদের দুজনের তর্কের জ্বালায় আমার আসল কথাটা বলা হোলো না।

হিরণ বললে, আমার আসল কথাটাও যে বাকি রয়ে গেল।

আপনি ত' চাকরি নিয়ে চ'লে যাওয়া স্থির করেছেন। আবার আসল কথাটা কি?—মীরা তাকালো আয়ত দুই বড় বড় চোখে।

হিরণ বললে, কিন্তু অনুমতি পাওয়াটাই ত' আসল।

মীরা বললে, আপনার ইচ্ছায় কি বাবা বাধা দেবেন বলতে চান্?

হিরণ বললে, হুঁ, তা বটে। কিন্তু আপনার আসল কথাটি কি?

আমিও চাকরি করবো তাই বাবাকে জানাতুম!

ওটা ওঁকে জানিয়ে আঘাত করতে চান কেন?

মীরা বললে, ওঁকে না জানিয়ে কোন্ সাহসে কাজ নোবো?

আলোচনাটা অসমাপ্ত রেখেই গাড়িতে উঠতে হোলো। আগেকার ব্যবস্থা অনুযায়ী সবাই নিজেদের জায়গায় গুছিয়ে বসলো। গাড়ি ছেড়ে দিল। হঠাৎ হাসনু মুখ ফিরিয়ে বললে, জ্যাঠামশাই, তোমাকে আজ বেশি কথা বলানো হয়েছে। তুমি যে ক্লান্ত হচ্ছিলে, আমি বুঝতে পারিনি। বাড়ি গিয়ে তোমাকে শান্তিতে শুইয়ে দিতে পারলে বাঁচি।

জীবেন্দ্র জোরে নিশ্বাস টেনে বললেন, তোর এত ভয় কেন' মা ?

হাসনু সশ্রদ্ধকণ্ঠে বললে, তুমি বনস্পতি, আমরা হলুম পাখি। তোমার শাখায়-শাখায় আমরা বাসা বেঁধেছি। তোমার শরীরের ব্যতিক্রম ঘটলে আমাদের বাসা দুলতে থাকে। তাই ভয় পাই।

মীরা তা'র বাবার দিকে একবার তাকালো, তারপর ড্রাইভারকে সতর্ক ক'রে বললে, একটু আস্তে চালাও!

হাসনু একটু উৎকণ্ঠিত হয়ে বললে, আজ একটু বেশিক্ষণ বাইরে থাকা হয়েছে। কথায়-কথায় দেরী হয়ে গেল।

জীবেন্দ্র আস্তে আস্তে পা ছড়িয়ে পিছন দিকে হেলান দিয়ে বললেন, না, কিছু না—বেশ যাচ্ছি আমি। না হয় আরেকটু জোরে যেতে বলো!

মীরা বললে, জোরে গেলে আপনার মাথা ঘুরতে পারে।

জীবেন্দ্র আবার বড় একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, তবে আস্তেই চলুক।

হিরণ বললে, মাইল দশেক পথত' বটেই!

দশ মাইল!—জীবেন্দ্র বললেন, অনেক দূর!—তিনি শান্তভাবে চোখ বুজলেন। হাসনু তাঁর মাথার চুলের মধ্যে নরম আঙুলগুলি সঞ্চালন করতে লাগলো। মোটর বেশ দ্রুতগতিতেই ছুটে চলেছে!

জীবেন্দ্রর শরীর-গতিকের কথা আজকে আর কারোই মনে ছিল না। অল্পবিস্তর সকলেই সেজন্য অনুশোচনা করতে লাগলো। বাবার দিকে তাকিয়ে মীরা এবার যেন একটু আড়ষ্ট হয়ে রইলো।

সবাই মুখ চেয়ে রয়েছে এই মানুষটির। এঁর আয়ুষ্কালের ওপর নির্ভর করে ওদের সমস্যার প্রতিকার। হাসনুর ভাষায় বলা যেতে পারে, বনস্পতির শাখায়-শাখায় নতুন কালের পাখির বাসা। একথা জানা আছে, তা'রা কেন্দ্রচ্যুত; জানা আছে; এর পর সবাইকে খাবার খুঁটে এনে পেট ভরাতে হবে; জানা আছে ওদের জীবন-সমস্যার প্রতিকার বাস্তবিকই জীবেন্দ্রর জীবন-মৃত্যুর ওপরে দাঁড়িয়ে নেই। যার পাখায় যত জোর আছে, সে তত বেশি ভাগ্যের আকাশে পরিক্রমা ক'রে আসতে পারবে। যার যত প্রাণশক্তি, ঝড়ের সামনে সে দাঁড়াতে পারবে তত বেশি।

তবু জীবেন্দ্র হলেন ওদের সকলের ভিতরকার যোগসূত্র। তিনি আছেন তাই সকলের মধ্যে পারস্পরিক সংহতি; একের সহিত অপরের ভাগ্য বিজড়িত। একজনকে টানলে অন্য জনের উপরে টান পড়ে। প্রতিটি ফুল আলাদা, কিন্তু একটি সূত্রে মালা গাঁথা। সূত্র ছিন্ন হলে প্রত্যেকটি ফুল বিচ্ছিন্ন!

মীরা! মীরা তাঁর একমাত্র সন্তান। কিন্তু সকলের থেকে মীরা আলাদা নয়। তাঁর কাছে মীরার প্রাধান্য হাসনুর চেয়ে বেশি নয়। হাসনুর প্রাধান্য হিরণের চেয়ে কম নয়। আছেন সুমিত্রা, আছে অত্রি। অত্রির সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করে ছিল তাঁর ব্যবস্থাপনার ওপরে। অত্রিকে তৈরি ক'রে তোলার ভার ছিল হাসনু মীরা আর হিরণের কাঁধে। এগুলো হোলো পারিবারিক গ্রন্থি,—এ গ্রন্থির বন্ধন ও মোচন জীবেন্দ্রর নিজেরই হাতে ছিল। এখানে অপর কোনো ব্যক্তি আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করেনি। প্রত্যেকটি নদী যখন সমুদ্রে এসে মেলে তখন কা'রো স্বকীয়তা থাকে না।

দশ মাইল পথ ফুরোতে প্রায় লাগলো আধঘণ্টা। মোটরের পক্ষে আধঘণ্টা দীর্ঘকাল। দ্রুতগতি ছিল বলেই দ্রুততর গতির দিকে ঝোঁক ছিল। গাড়ি এসে থামলো বাড়ির দরজায়। কিন্তু জীবেন্দ্রকে নামাতে গিয়ে হাসনুর মনে খট্‌কা লাগলো। হঠাৎ সে ডাকলো, জ্যাঠামশাই?

জীবেন্দ্র সহসা সাড়া দিলেন না। হিরণ ও মীরা এপাশ দিয়ে ঘুরে এসে দাঁড়ালো। গলার আওয়াজ পেয়ে সুমিত্রা এসে দাঁড়ালেন।

মীরা ডাকলো, বাবা?

কাকাবাবু।—ডাকলো হিরণ।

হাসনু এবার ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে ব'লে উঠলো, জ্যাঠামশাই অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন!

অবশেষে ড্রাইভারের সাহায্যে হিরণ তাঁকে ধরাধরি ক'রে ভিতরে এনে দক্ষিণ-পূর্বের ঘরের বিছানায় শুইয়ে দিল। পরে হাসনুর নির্দেশে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ছুটলো ডাক্তারের ওখানে।

মীরার ভয়কাতর দুই চোখে জলের আভাস দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু হাসনুর দৃষ্টি ছিল প্রখর, কোনো রকম ভাবাবেগ প্রকাশ করা চলবে না। হিরণ বললে, বরফ এনে দেবো, হাসনু?

হাসনু কম্পিত কণ্ঠে বললে, আগে ডাক্তার আসুক।

তালতলা থেকে বৌবাজার মোটরের পক্ষে দূর নয়। মিনিট পনেরোর মধ্যে ডাক্তার এসে পৌছলেন। রোগীকে পরীক্ষা ক'রে বললেন, ঠিক অজ্ঞান

নয়, অনেকটা কোমার মতন। এটা আগেও হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এখনই কোনো ভয় নেই। শীঘ্রই জ্ঞান ফিরবে।

নিঃশ্বাসের ছন্দটা ধীরে ধীরে ফিরে এলো একটি ইন্‌জেকশন্ দেবার মিনিট পাঁচেক পর। নাড়ী অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। ডাক্তার ব'সে রইলেন। অসুখটা মস্তিষ্কের তথা হৃদলোকের।

অত্রি এসে আস্তে আস্তে হাসনুর পাশে দাঁড়ালো। তারপর চুপিচুপি ডাকলো, ছোড়দি?

কেন রে?

চাটগাঁ থেকে ওঁরা এসেছেন। তোমাকে ডাকছেন।

হাসনু চাপা গলায় বললে, কে এসেছে?

চলো না দেখবে।

গলা নামিয়ে হাসনু পুনরায় বললে, কোথায় তা'রা?

ওপরে।—অত্রি জবাব দিল।

ওপরে? আয় দেখি—

ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই সুমিত্রা হাসনুকে ডাকলেন। বললেন, তোমরা যাবার ঘণ্টাখানেক পরেই ওরা এসেছে। ব্যাপারটা আমার ভালো মনে হয় না হাসনু। এ বাড়ি আমাদের ছেড়ে দিতে হবে।

হঠাৎ হাসনুর মুখ কঠিন হয়ে এলো। বললে, কেন?

সুমিত্রা বললেন, তুমি গিয়ে কথাবার্তা বলগে। ওরা এসে উঠেছে ওপর-তলায়। তোরই জন্যে অপেক্ষা করছে।

হাসনু বললে, তুমি জানো ছোটখুড়ি, জ্যাঠামশাইয়ের এই অবস্থায় ওসব কিছুই আমার ভালো লাগে না?

আমি কি করবো, তুই যা না ওপরে?

বাড়িখানা বড় বৈ কি। দোতলার পাশের মহলটা খালিই রয়েছে। হাসনুরা যে-অংশে আছে, সেটায় জায়গা বেশ সচ্ছল। কিন্তু সিঁড়িটা সাধারণের। হাসনু সিঁড়ি দিয়ে সোজা উঠে গেল দোতলায়। উপরে উঠে ডানহাতি প্রথম ঘরখানায় মানুষের আওয়াজ পাওয়া গেল। এরই মধ্যে দরজার সামনে পর্দাও ঝোলানো হয়েছে।

পর্দা সরাতেই দেখা গেল, হোসেন সাহেবের এক শ্যালকের পুত্র আফজল বসে রয়েছে এবং তা'র পাশাপাশি একটি তরুণী। মেয়েটি অপরিচিত। মেঝের উপরে উবু হয়ে বসে রয়েছে লুঙ্গিপরা একটি কালো লোক,—সম্ভবত

চাকর। তিনজনেই চাপাকণ্ঠে কি যেন আলোচনা করছিল, হাসনুকে ঢুকতে দেখেই তিনজনে চুপ ক'রে গেল।

একি আফজলদা, কখন এলে? অনেককাল খবর নেই! ভালো আছো?

এই যে, এসো হাসনু। আমরা এসেছি বিকালের গাড়িতে।

হঠাৎ? কি মনে ক'রে?

আফজল বললে, পিসেমশাই পাঠিয়েছে। তোমার সঙ্গে জরুরী দরকার।

বেশ ত', কথা বলবো। এ মেয়েটি কে?

একে কি তুমি চিনবে? এ হোলো আমিনার ননদ—কুলসুম!

হাসনু হাস্যমুখে বললে, ও, তাই নাকি? বিয়ে হয়নি বুঝি? তোমার সঙ্গে এলো যে?

আফজল বললে, আর বলো কেন? আসবার সময় কুলসুম আবদার ধ'রে বসলো, কলকাতা দেখবে? ছেলেমানুষী আর কি!

বয়সটা ঠিক ছেলেমানুষের নয়।—হাসনু আবার হাসলো, এবং পুনরায় বললে, তাছাড়া তোমার সঙ্গে কলকাতা দেখতে এলে একটা মানে দাঁড়ায় বৈ কি। এ ব্যক্তি কে?

ও, রহমান,—আমাদের বাড়িতে কাজ করে।

নাকে নোলকপরা কুলসুম এবার কথা বললো। স্বাভাবিক গলাটাই তা'র কর্কশ। বললে, আপনি ত' হিন্দুদের খুব বন্ধু। এখানে আমাদের কোনো ভয় নেই ত'?

কিসের ভয়?

স্পষ্ট সহজ প্রশ্নটাই কঠিন। কুলসুম একটু থতমত খেয়ে গেল। বললে, চাটগাঁয়ে ব'সে এখানকার কত বিশ্রী গল্প শুনি। তাই জিজ্ঞেস করছি, আমাদের কোনো ভয় নেই ত'? কেউ বাড়ি চড়াও হবে না?

হাসনু বললে, কেমন করে জানাবো, কুলসুম?

আফজল বললে, ওর বড্ড ভয়। একটু সাড়াশব্দ পেলেই পাখির মতন কাঁপে। শিয়ালদা স্টেশনে নামবার সময় ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছিল। বাড়িতে ঢুকে আর নড়তে চাইছে না! কী যে করি ওকে নিয়ে!

কুলসুম বললে, আপনি আমাকে একটু সাহস দিন!

হাসনু বললে, আমি ত' ভাই হিন্দুদের দালাল নই যে, আমি তোমাকে সাহস দেবো? তুমি যার সঙ্গে এসেছ সে এই কলকাতায় আমারই মতন মানুষ হয়েছে। সেই তোমাকে সাহস যোগাক। রহমান, তুমি বাইরে গিয়ে বসোগে। আফজলদা, তোমাদের জন্যে কিছু খাবার পাঠিয়ে দেবো কি?

রহমান বেগতিক দেখে উঠে বাইরে চ'লে গেল।

আফজল বললে, আমরা স্টার হোটেলে গিয়ে খেয়ে-দেয়ে আসবো ভাবছিলুম। কিন্তু কুলসুম এক পাও নড়তে চায় না।

কুলসুম বললে, ভয় করে না বুঝি? এখানে যখন-তখন দাঙ্গা বাধে যে! ওরা কি মেয়েদের ইজ্জৎ রাখে?—হাসনুদি, নীচে যারা থাকে তারা কেমন লোক? সিঁড়ির দরজা বন্ধ করা যায় ত'?

ওঁরা রেফুজি!—হাসনু জবাব দিল।

রেফুজি?—কুলসুম আঁৎকে উঠলো। ওদেরই ত' রাগ বেশি! ওরা না পারে এমন কাজ নেই! এ বাড়ি ত' ওরা গায়ের জোরে দখল করেছে।

হাসনু জীবেন্দ্রর জন্য মনে মনে অধীর ছিল। তা'র এতটুকু অবসর নেই। এবার বললে, খাবার কি পাঠিয়ে দেবো, আফজলদা?

আফজল বললে, তোমার কোনো অসুবিধে হবে না?

না, অসুবিধে কিছু নেই। তবে আমি এখন যাচ্ছি, আবার আসবো। জ্যাঠামশায়ের অসুখ নিয়ে আমি খুব ব্যস্ত আছি।

নীচে এসে ঠাকুরকে খাবার তৈরি করতে ব'লে হাসনু দ্রুতপদে জীবেন্দ্রর ঘরের দিকে চ'লে গেল।

ওইটুকুর মধ্যেই আফজল লক্ষ্য করেছে, হাসনুর চরিত্র ও চেহারার দৃঢ়তা। বুঝতে পেরেছে হাসনুকে অন্তরঙ্গভাবে দলে টানা কঠিন। যে-কাজ নিয়ে এসেছে, সেটাতে কতখানি তার সাফল্যলাভ ঘটবে তাও অনিশ্চিত। এ বাড়ি তাদের নিজেদের, এখানে তাদের এতকালের পৈতৃক বাস ছিল,—কিন্তু এখন নাকি এর আশেপাশে নেমেছে আতঙ্কের ছায়া। এ বাড়ি নাকি এখন ভয়ের বাসা! কলকাতার কোনো কিছুতেই এখন আর আফজলের বিশ্বাস নেই। একালের সমস্ত রাজনীতির অন্তরালে যে আতঙ্ক সৃষ্টির প্রচেষ্টা আছে, আফজল হোলো সেই প্রচেষ্টারই ক্রীড়নক।

কুলসুম বললে, জ্যাঠামশাই কে? সেই হাজিপুরের জমিদারটা বুঝি?

একটা সিগারেট ধরিয়ে আফজল শুধু বললে, হ্যাঁ—

তুমি ত' বললে কলকাতায় এখন ভয় নেই, তবে আমার ভয় করছে কেন?

কুলসুমের পিঠের উপর হাত ঠুকে সান্ত্বনা দিয়ে আফজল বললে, বেশ ত', হঠাৎ যদি গোলমাল বাধে, আমরা চ'লে যাবো বাড়ি ছেড়ে।

কুলসুম কেঁদে উঠে আফজলের গায়ে গায়ে সরে বসলো। বললে, গোলমাল বাধলে পালাবো কেমন ক'রে? কলকাতার দাঙ্গা ত' ছুঁচো-বাজির মতন

ছড়িয়ে পড়ে! কই, তুমি ত' আগে দাঙ্গার কথা বলোনি? তুমি বুঝি নিজেও ভয় পেয়েছ?

আমি! পাগল! এই ব'লে আফজল উঠলো। তারপর গিয়ে ঘরের ও বারান্দার সব জানালাগুলো বন্ধ ক'রে দিয়ে এলো—যাতে রাস্তার থেকে কেউ না এদিকে দেখতে পায়।

রহমান এগিয়ে এসে বললে, আমি কিন্তু খুব ভালো মনে করিনে জনাব।

আফজল একবার সন্দিগ্ধ চক্ষে এদিকে-ওদিকে এবং সিঁড়ির দিকে তাকালো। তারপর গম্ভীর মুখে বললে, আর কিছু নয়, কিন্তু আমার ওপর এপাড়ার লোকের খুব রাগ আছে!

কুলসুম বললে, রাগ। কেন? কই, আসবার আগে তুমি ত বলোনি একথা? তবে এলে কেন? কেমন ক'রে পালাবে? কেন তবে আমাকে তুমি নিয়ে এলে, আফজল?

আফজল বললে, তুমি সিঁড়ির কাছে পাহারা দিতে পারবে, রহমান?

হাঁ হুজুর—রহমান বললে, আপকো ওয়াস্তে হাম জান্ দে দেগা! হাপনি দিখে লেবিন!

কুলসুম রহমানের দিকে চোখ পাকিয়ে বললে, তবে সেদিন চাটগাঁর মারামারির দিনে তুমি বাবুকে ছেড়ে কাঠকয়লার ঘরে গিয়ে বস্তার মধ্যে লুকিয়েছিলে কেন?

রহমান বললে, হামি? হাপনি দেখি লেবিন, হামি আজ জান দিয়ে যাবো।

কুলসুম কিছুমাত্র সাহস পেলো না। বললে, আফজল, তুমি ওকে বিশ্বাস করো না,—ও মেড়োর দেশের লোক! দেখছ না কথায় কথায় প্রাণ দেবার কথা বলে। ও ঠিক নিজের প্রাণ নিয়ে পালাবে।

রহমান নিজের জিব কেটে আড়ালে স'রে গেল। বিপদের কালে আত্মরক্ষা ক'রে পালানোটা যেন তা'র কাছে মস্ত পাপ।

আফজল কী যেন মনে ক'রে একবার উঠে গেল, কোণের কাছে গিয়ে বড় স্যুটকেসটা খুলে কিছু একটা গোপনীয় সামগ্রী পরীক্ষা করলে, তারপর ফিরে এসে বললে, যদি আক্রমণ করতে আসে কেউ, তবে দুচারজনকে ঠিকই ঘায়েল করতে পারবো, কুলসুম, বুঝলে?

তোমার কি গায়ে অত জোর আছে?

গায়ের জোরটাই একমাত্র জোর নয়, কুলসুম। হিন্দুপুলিশ দুষমনি করবে না, কিন্তু পাড়ার লোক আমাকে চেনে। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় আমার কাছে মার খেয়েছে কিনা। রাগ এখনো পড়েনি।

কুলসুম বললে, আচ্ছা, তোমাদের ওই হাসনু হিন্দুদের সঙ্গে অত মাখামাখি করে কেন?

আফজল বললে, ও যে হিন্দুর ঘরে মানুষ। হিন্দুর নিমক খেয়েছে। মুসলমান কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না, কুলসুম!

কুলসুম বললে, আমি কিন্তু ব'লে রাখছি, ওকে নিশ্চয় ওরা ঘুষ খাওয়ায়। এরা হিন্দুর খেয়ে পাকিস্তানে গোয়েন্দাগিরি করতে যায়। যতই বলো, আমি ওকে বিশ্বাস করিনে। ওই জমিদার ওকে রেখেছে হাজিপুরের মুসলমান চাষীদের মন ভোলাবার জন্যে,—ওকে দিয়ে খাজনা আদায় করায়।

আফজল বললে, সেকথা আমি জানি, কুলসুম। বাবাও জানেন। ওই জমিদারকে খতম্ ক'রে দিত আগুন লাগিয়ে কিন্তু হাসনু তাদের পালাবার সুবিধে ক'রে দিয়েছিল!—কে?

সিঁড়িতে কা'র যেন পায়ের শব্দ হবামাত্র রহমান লাফিয়ে উঠে নিজের পেটের কাপড়ের কাছে হাত ঢোকালো, কুলসুম ছুটে গিয়ে ঘরে লুকোলো, এবং আফজল পলকের ভিতরে সুটকেশের মধ্যে হাতখানা প্রবেশ করিয়ে দিল।

হাসনু নিজের হাতে খাবার নিয়ে উঠে এলো। বললে, কই, আফজলদা, কুলসুম,—কোথায় তোমরা?

কুলসুম রুদ্ধশ্বাসটা এবার আস্তে আস্তে ছেড়ে ঘরের থেকে বেরিয়ে এলো। মুখখানার উপরে ছিল প্রাণভয়ের প্রবল উত্তেজনা। এবার চেষ্টাকৃত হাসি হেসে বললে, আপনি। আমি মনে করি কি যেন—!

আফজল চট ক'রে সুটকেশ বন্ধ ক'রে বেরিয়ে এলো। হাসনু রহমানের দিকে চেয়ে বললে, এই—টেবল্ পরিষ্কার ক'রে দে—

রহমান তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল করলো। হাসনু টেবিলের ওপর খাবার সাজিয়ে দিয়ে বললে, তোমাদের বান্দাটাকে বাইরে গিয়ে খেয়ে আসতে বলো,—কাছেই দোকান আছে। তোমরা ব'সে যাও।

আফজল বললে, এ বুঝি তোমারই হাতের রান্না, হাসনু?

ভয় নেই আফজলদা, এতে বিষ মেশানো নেই। নির্ভয়ে খাও।—তুমি কোথায় শোবে ভাই, কুলসুম?

কুলসুম খেতে ব'সে বললে, আমি—হ্যাঁ, তাই ত'—মানে—

অত্যন্ত স্পষ্ট প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব দেওয়া চাই। কিন্তু থতমত খেয়ে আফজল বললে, হ্যাঁ, ঠিকই,—ভাবতে হয় বৈ কি। কুলসুম আবার একটু ভয়কাতুরে কিনা—। মনে করেছিলুম এবাড়িতে কোনো হিন্দু নেই, হয়ত তুমি একলাই আছো।

হাসনু গলা বাড়িয়ে ডাকলো, বসন্ত ?

আজ্ঞে যাই।—ব'লে বসন্ত খাবার জলের সোরাই, গেলাস এবং আর এক বালতি জল নিয়ে নীচের থেকে উঠে এলো।

হাসনু বললে, বসন্ত, আমি আর বড়দি যে ঘরে শোবো, সেখানে আর একটা শোবার জায়গা করে রাখগে। জ্যাঠামশাইকে দুধ খাওয়ানো হয়েছে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।—ব'লে বসন্ত খাবার জল ও বালতি রাখলো।

হাসনু বললে, আচ্ছা—যা তুই।

শাসন করার জন্য হাসনুর জন্ম। সে ভাঙবে, কিন্তু নুইবে না। ব্যাপারটা ভারি বিশ্রী অস্বস্তিতে ভ'রে উঠলো। কুলসুম দুদিন ট্রেনে এসে আজ রাতটা একটু স্নেহের আশ্রয়ে ঘুমোবার কল্পনা করেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা বেগতিক দেখে এক সময়ে কুলসুম মুখ তুলে বললে, এ বাড়িতে ত' জেনানা দেখছিনে, হাসনুদি ?

এটা ত' ভাই আগ্রার দুর্গ নয় যে, হারেম-জেনানা থাকবে।

কিন্তু ভাই যেখানে-সেখানে শু'লে আমার কি ঘুম হবে ?

হাসনু বললে, আমি মীরাদি কি যেখানে-সেখানে শুই ?

কুলসুম বললে, তা বলছিনে, তবে কিনা হিন্দুর ছোঁয়া বিছানা, কাফেরের পাশে শোয়া,—কোরাণে নিষেধ।

কোরাণ পড়েছ তুমি ?

শুনেছি !

তুমি ত' শুনে এসেছ কলকাতায় এসে নামলেই বাঘে খায়, কথাটা কি সত্যি ?—কই, খাও আফজলদা ?

এই যে খাই !—হ্যাঁ, যেজন্য আমি এসেছি এখানে—

হাসনু বললে, বলতে হবে না, মামা সাহেবের চিঠি আজই পেয়েছি। তাঁকে বলো, তাঁর বাড়ি যারা জোর ক'রে দখল করেছে, তা'রা হিন্দু নয়, তারা তাঁর ভাগ্নি। প্রতিমাসে আড়াইশো টাকা ভাড়া তিনি পাবেন। তুমি আর কি কাজে এসেছ, বলো ?

আফজল বললে, এইজন্যেই এসেছিলুম। ব্যাপারটা মিটমাট হলেই ভালো। হাসনু বললে, এই সামান্য ব্যাপারটা চিঠিপত্রেই ফয়সালা হতে পারতো, তোমরা এলে বেফয়দা !

আফজল বললে, আমাদের বেড়িয়ে যাওয়াটা হোলো !

কিছু মনে করো না, আফজলদা,—হাসনু বললে, ওইটেই হোলো তোমাদের আসল কথা। কুলসুম কলকাতার চিড়িয়াখানা দেখবে—এই ত' ?

তুমি দুবার বিয়ে করেছ এর আগে,—আবার কেন নতুন মেয়ে কুলসুমকে চিড়িয়াখানা দেখাতে আনলে ?

কুলসুম বললে, আপনি কি বলছেন, আমি কিছু বুঝতে পারছিনে ! আপনার কথা শুনলে কী যে লজ্জা করে !

হাসনু মুখ ফিরিয়ে বললে, এই রহমান,—এঁটো থালা নিয়ে সাবান দিয়ে ধুয়ে নীচে রেখে আয় ।—হ্যাঁ, লজ্জা করে বৈ কি, আমার মতন ত' আর এখনো দু'তিনবার বিয়ে করোনি ! আচ্ছা, কুলসুম, তুমি বাড়িতে ব'লে এসেছ ?

আফজল কুলসুমের হয়ে জবাব দিল। বললে, হ্যাঁ, তা—তারা জানতে পেরেছে বৈ কি ! আর এ ত' জানবারই কথা !

হাসনু বললে, কিন্তু আমাকে মামা জানিয়েছেন অন্য কথা !—সে যাক্ গে। শোনো কুলসুম, তুমি এখনো কুমারী মেয়ে আছো কিনা আমার জানা নেই, তবে কিনা মামাসাহেবের আর একখানা চিঠি না পেলে তোমাদের দুজনকে এক ঘরে শুতে দিতে পারিনে, ভাই। বেয়াদপি মাপ করো।—মাথা হেঁট করলে কেন, আফজলদা ? খাওয়া হয়ে গেছে, এবার আঁচাওগে ?

এই যাই।—আফজল উঠলো।

হাসনু পুনরায় বললে, তোমার এভাবে আসা ভালো হয়নি, কুলসুম। আফজলের কীর্তিকলাপ এ পাড়ায় এখনো অনেকে জানে। বাঙ্গালী মুসলমানের মেয়েদের কিছুমাত্র আত্মসম্ভ্রমবোধ নেই,—এই অপবাদটা যত কমানো যায় ততই ভালো, ভাই। আমি এখন যাচ্ছি। তোমার জন্য বিছানা পেতে অপেক্ষা ক'রে থাকবো।

আফজল বললে, আমার ওপর তুমি বেয়াদপি ক'রে গেলে, হাসনু। বাবার কানে একথা উঠবে।

হাসনু দাঁড়ালো। একবার তাকালো কুলসুমের মুখের দিকে। তারপর বললে, আমার কাছাকাছি থাকলে আরো বেয়াদপি সহ্য করতে হবে, আফজলদা।

কুলসুম বললে, আপনি ওর ওপর বড্ড অবিচার করছেন, হাসনুদি।

কেন করছি,—কত কাহিনী ওর জানি,—আর তারপরেও আমার কাছে মুখ দেখাতে আসে—এই আশ্চর্য ! আফজলদা, কুলসুমকে কিছু গল্প শুনিয়ে দেবো ?

আফজল ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, তোমরা ঘরের দুষমন ! এখন বিশ্বাস করি তুমি আগাগোড়া হিন্দুদের হাত থেকে ঘুষ খেয়ে এসেছো !

হাসনু উচ্চকণ্ঠে সোল্লাসে হেসে উঠলো সমস্ত বাড়িখানা কাঁপিয়ে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল এলায়িত ভঙ্গীতে।

এরপর বিছানা সাজিয়ে হাসনু বসেছিল ঘণ্টা তিনেক। কিন্তু মাঝরাত্রে হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল দোতলা শূন্য! না আছে আফজল, না কুলসুম, না বা রহমান! হাসনুর হাত থেকে ওরা অবশেষে পালিয়ে বাঁচালো।

৭

জীবেন্দ্রনারায়ণ তাঁর মানসিক অবসাদের থেকে উঠে দাঁড়াতে পারলেন না। নৈরাশ্য তাকে পঙ্গু করেছিল, একথা কতখানি সত্য বলা কঠিন। বুঝতে পারা যেতো, শেষের দিকে নিজের সম্বন্ধে তাঁর মন সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল। চিন্তাসমস্যায় জটিল হয়ে এলো তাঁর শেষের জীবন, মাঝে মাঝে কেমন একটা ভয়াবহ পরিণামেব কথা কল্পনা ক'রে তিনি শিউরে উঠতে লাগলেন। নিজের কর্ম্মজীবন সম্পর্কে কখনও কোথাও তিনি আত্মপ্রচারের অহমিকা প্রকাশ করেন নি, কিন্তু শেষের দিকে তাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন। দেশের লোক জানে হাজিপুর গ্রামখানি একপ্রকার তাঁর নিজের হাতে সৃষ্টি। তাঁর হাতে গড়া টোল আর মক্তব, সমবায় সমিতি, চুরুণীর হাটতলা, বারোয়ারী নাটমন্দির হাসপাতাল। ইতু-সংক্রান্তির দিনে মেলা বসাতেন তিনি গত পনেরো বছর ধ'রে,—হাজাব হাজার লোক সেখানে জড়ো হোতো। মহাজনের গদিতে তিনি নিজে গিয়ে ধান আর পাটের দর বেঁধে দিয়ে আসতেন—যাতে গ্রামবাসী চাষীদের সুবিধা হয়। তাঁর তালুকগুলিতে যত প্রজা ছিল—চৈত্র কিস্তিব কালে তিনি খাসের খরচে তাদের ঘর ছেয়ে দিতেন।—রেল কোম্পানীর সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে এ গ্রাম থেকে তিনি মাছের চালান দিতেন,—জেলেরা ওতে প্রচুর লাভবান হোতো। যাদের জমি ছিল না, তাদের দিয়ে তিনি শাকসব্জি ফলাতেন সারাবছর—তাদেরকে কোনো অভাব বুঝতে দেন নি। আশ-পাশের অন্তত চল্লিশখানা গ্রামে লোক পাঠিয়ে তিনি নলকূপ বসিয়েছিলেন, এজন্য বাইরের জোতদাররা তাঁকে অনেক সময় নির্বোধ মনে ক'রে পরিহাস করতো। বর্ষার আগে পর্যন্ত পাছে কচুরীর দাম এসে নদী আর বিলে ঢুকে নৌকা চালানো বন্ধ করে, এজন্য তিনি বহু জলপথে বাঁশবন্দীর ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর জন্য হাজিপুরে মড়ক লাগেনি কোনোদিন; তাঁর জন্য পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষটা হাজিপুরের লোকেরা টের পায়নি। সমিতিকে কেন্দ্র ক'রে যে অর্থভাণ্ডার তিনি প্রস্তুত করেছিলেন, তা'র জন্য কোন খাতককে কখনও

কোন মহাজনের দ্বারস্থ হতে হয়নি। এজন্য তিনি উভয় সম্প্রদায়ের অনেক লোকের বিদ্বেষভাজন হয়েছিলেন।

আত্মপ্রচার আত্মহত্যার সমান, কে না জানে। যারা নিজের হাতে নিজের যশ কুড়োতে থাকে, তা'রা বড় দরিদ্র, এও জানে সবাই। এতকাল ধ'রে জীবেন্দ্র গ্রামের কাজ ক'রে এসেছেন অলক্ষ্যে। তিনি জানতেন, দারিদ্র্যের থেকে অসন্তোষ, অসন্তোষের থেকে বিদ্বেষ। জাতিবিদ্বেষ, শ্রেণী-বিদ্বেষ—এদের মূল কারণ কি জানতেন তিনি। কাজের ক্ষমতা তাঁর হাতে ছিল, কেননা তিনি জমিদার—সেই ক্ষমতার সুষ্ঠু প্রয়োগ তিনি জানতেন। তাঁর টাকা ছিল এবং পরিকল্পনা ছিল,—সুতরাং টাকার সদ্ব্যয় তাঁর জানা ছিল। যাদের টাকা আছে, অথচ কোনো কাজ গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা নেই—তা'রা লোকসমাজের বন্ধু নয়, একটা তাঁর চেয়ে আর কে বেশি জানতো? তাই তাঁর জীবনে ছিল চড়া সুর। মন্ত্রের সাধন করতে গিয়ে তিনি শরীর পতনই করেছিলেন। তাঁব জীবনের এই চড়া সুর এতই স্বকীয় ছিল যে, রাজধানী কলকাতার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ তিনি রাখেন নি। সেইজন্য লোকে তাঁকে বলতো 'ভুয়ে' জমিদার!

শেষের কয়েকদিন জীবেন্দ্রর মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল, অন্তত হাসনুর তাই অভিমত। হাসনু কখনো জ্যাঠামশাইকে আত্মকৃত সমাজ-কল্যাণকর্মের কথা নিজের মুখে বলতে শোনেনি। একবার গ্রামবাসীরা তাঁর জন্য এক অভিনন্দন সভার আয়োজন করে। সেই সংবাদ পেয়ে জ্যাঠামশাই হাসনুকে ডেকে বলেছিলেন, জীবনে এই প্রথম ঘৃণা করলুম নিজেকে। নিজের গ্রামে ব'সে নিজের গ্রামবাসীর হাত থেকে অভিনন্দন নেবো এর চেযে অপমৃত্যু আর কি হ'তে পারে? হাসনু বলেছিল, ওরা যে সবাই তোমাকে ভালোবাসে, জ্যাঠামশাই? জ্যাঠামশাই বলেছিলেন, ওরা কা'রা? ওরা যে ঘরের লোক, ওরা যে পরমাত্মীয়, ওদের থেকে ত' আমি আলাদা নই, মা? আজ এই হীনতার কাছে কেন আমি আত্মসমর্পণ করবো? ওরা যখন সবাই আমাকে বলবে বড়, তখন ওদের মাঝখানে দাঁড়িযে কিছুতেই বড় হ'তে পারবো না, একথা কি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে?

এই আদর্শের পরিমণ্ডলের মধ্যে মানুষ হয়েছে হাসনু আর মীরা, হিরণ এবং আর সবাই। সহোদর ছোট ভাই রামেন্দ্রর সঙ্গে তিনি মামলা বাধিয়ে তুলতে পিছপাও হননি। রামেন্দ্র কলকাতায় গিয়ে কিন্নরী আর অপ্সরীদের নিয়ে বিলাসের স্রোতে গা ভাসাতেন। তাঁর চরিত্রকে শোধন করা কঠিন ছিল। জ্যাঠামশাই চীৎকার ক'রে এক একবার বলতেন,

অপব্যয়ের অধিকার তোমাকে দেবো না, রামেন্দ্র, তুমি মৃত্যুর বীজ বুনে যাচ্ছ, তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি। তুমি সমস্ত মানুষের সমাজকে অপমান ক'রে যাচ্ছ, তোমার প্রত্যেকটি অন্নদাতার ঘরে অসন্তোষের আগুন জালিয়ে যাচ্ছ।—রামেন্দ্র ভয়ে ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতেন, কিন্তু তাঁর চরিত্রের সংশোধন হোত না। সন্ধ্যার আলো জেলে একা ঘরে শুয়ে ছোট খুড়ী কেঁদে ভাসাতো।

জ্যাঠামশায়ের অন্তিম শয্যার চারপাশে দাঁড়িয়ে আর সবাই কেঁদে আকুল। অত্রি, সুমিত্রা, মীরা, হিরণ—সবাই। হাসনু শান্ত, হাসনু অচঞ্চল, হাসনুর দুই চক্ষে অশ্রুর আভাসও নেই। কারো গেল অভিভাবক, কারো গেল পিতা, কারো গেল প্রতিপালক। কিন্তু হাসনুর? চক্ষের সামনে থেকে সরে গেল আদর্শ, সরে গেল তাদের সেই অন্ধকার গ্রামের আলোকস্তম্ভটা। হাসনু একটা আইডিয়াকে হারালো, হারালো সব চেয়ে প্রধান পরিকল্পনার কেন্দ্রটা। হাসনু সর্বহারা হয়ে ব'সে রইলো। তা'র চোখে এক ফোঁটাও জল নেই।

মনে পড়ে জ্যাঠাইমা যেদিন মারা গেলেন। মায়ের মৃত্যুদৃশ্য দেখে মীরা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল জ্যাঠামশাইয়ের কোলের কাছে ব'সে, কিন্তু হাসনু? মাটিতে লুটোপুটি ক'রে হাসনুর কী কান্না! জ্যাঠাইমার কোলে সে মানুষ, যেমন মানুষ মীরা। সেদিন বর্ষাকাল, ছিল গুরু গুরু মেঘের ডাক, ছিল আষাঢ়ের ধারার সঙ্গে দুরন্ত বায়ুর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না,—সেই কান্না চলেছে প্রান্তর পেরিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে—যেদিকে যমুনার ধারা গিয়ে মিলেছে মধুমতীর কোলে। সেই শোকশয্যা থেকে হাসনু উঠেছিল অনেক দিনের পর।

জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর দিন—এ আরেক যুগ। আর সব মৃত্যুর মতো এটা পারিবারিক বিয়োগ নয়,—এ মৃত্যু হোলো সামাজিক, এ মৃত্যু হোলো দেশের রাষ্ট্রবিপ্লবের অন্যতম পরিণাম। এ মৃত্যুর মধ্যে রইলো ভগ্নপ্রাণ, সংশয়াচ্ছন্ন যুগযন্ত্রণা, দিগদিগন্তব্যাপী জাতীয় নৈরাশ্যের আচ্ছন্নতা। হাসনু জানে, জ্যাঠামশাই বহন ক'রে নিয়ে গেলেন স্বাধীনতার অভিশাপ, ভেদনীতির চরম কলঙ্ক, উদ্‌ভ্রান্ত নেতৃত্বের অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত। এই মৃত্যুর পরে শ্মশানচিতায় যে লেলিহান শিখা জলে উঠলো, সেখানেও হাসনু একপাশে গিয়ে দাঁড়ালো। শবযাত্রায় যারা যোগ দিয়েছিল তাদের কেউ জানতো না, হাসনু আসবে তাদের পিছু পিছু। যেমন বৎসহারা বাঘিনী অরণ্যের সমস্ত বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে সেই পথে ছোটে—যে-পথে গেছে তার শাবক, তেমনি ক'রে গিয়েছিল হাসনু শবদেহের পিছু পিছু, অলক্ষ্যে—সঙ্গোপনে। মুখের ভিতর থেকে একটা আওয়াজ নিঃসৃত হচ্ছিল,—সেটা কি তা'র

আর্তকণ্ঠের অশ্রুজড়িত বিলাপ? সেটা কি কোনো ভবিষ্যৎ প্রতিজ্ঞার বীজ-মন্ত্র?

অগ্নিশিখার থেকে অদূরে হাসনু দাঁড়িয়েছিল, তা'র সেই একাগ্র স্বপ্নাতুর শান্ত দৃষ্টি জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-শোক—সমস্তর থেকে বাইরে। আগুন উঠছে অনেক উঁচুতে,—আশা, আশ্বাস, সান্ত্বনা,—তাদের চেয়েও উঁচুতে। ওই শিখার অদূরে দাঁড়িয়ে পোড়ালো সে নিজেকে—নিজের প্রাণ, মন, আত্মা সমস্তগুলোকে। পুড়িয়ে পুড়িয়ে সে নিজেকে লকলকে ঝকঝকে ইস্পাতে পরিণত করলো। সে বলতো, জ্যাঠামশাই, আমি ত' সচল জীব। কিন্তু আমি যদি জড়পদার্থ হতুম। আমি হতুম তরবারি—শান দিতুম নিজেকে, যতক্ষণ না আগুনের মতন গরম হোতো। জ্যাঠামশাই হেসে প্রশ্ন করতেন, তরবারি হবার সাধ কেন, মা? হাসনু বলতো, ওটা সাধ নয় জ্যাঠামশাই, ওটাই আমার নিয়তি। আমার জন্ম বাঙ্গালায়, আমি হলুম শক্ত। পৃথিবীতে সবচেয়ে নরম হোলো বাঙ্গালার মাটি আর বাঙ্গালার মেয়ে। কিন্তু সবচেয়ে কঠিন সাধনা হোলো তাদের শক্তির সাধনা! হাসনু বলতো, শক্তিসাধনা হিন্দু মেয়ের একচেটে, এটা কি তোমাদর শাস্ত্রে লেখা আছে? দেখাও ত'? তোমাদের কোনো শাস্ত্রে ত' হিন্দু শব্দটাই নেই! আমার আর কোনো জাত আছে স্বীকার করিনে জ্যাঠামশাই,—আমা'র একটিমাত্র জাত, আমি বাঙ্গালী, আমার সাধনা হোলো শক্তির সাধনা! আমি তরবারি নিয়ে ছুটতে চাই বিভীষিকার মতো। তরবারি চালনা করবো দুইধারে সমান শক্তিতে। ভয়, কুসংস্কার, জড়তা, অশিক্ষা, বিদ্বেষ, কলঙ্ক সমস্তর উপরে আমার তরবারি হানবো। আমাকে বলো না তুমি অহিংসার কথা, আমাকে বলো না মুখ বুজে মার খাওয়ার কথা। আমাকে অজেয় শক্তি দাও, প্রচণ্ড প্রাণ দাও, প্রবল অহঙ্কার দাও, আমরা মধ্যে দাহিকাশক্তি এনে দাও, জ্যাঠামশাই। জ্যাঠামশাই বলতেন, তরবারি চালনার গুণে যুদ্ধে জয়ও হয়, আবার আত্মঘাত করাও চলে, হাসনু। শক্তির অপচয়ই হোলো অপমৃত্যুর কারণ। যদি শক্তির সঙ্গে সংযম না থাকে, তবে সেই শক্তি ধ্বংসাত্মক হয়। হাসনু বলতো, জ্যাঠামশাই, বলো না নীতির কথা। আমি চাই গতি, আমি চাই শক্তি। তেজ, সাহস, বীর্য, এ আমার চাই। আমার কণ্ঠের প্রচণ্ড ঝঙ্কারে যেন দিগদিগন্ত কেঁপে ওঠে, আমার তরবারির প্রখর ঝলকে যেন সবার চক্ষে ধাঁধা লাগে—আমাকে দাও সেই মন্ত্রশক্তি! যারা ভয় দেখায়, দুর্গতি আনে, পরস্বাপহরণ করে, কূটচক্রের দ্বারা ভদ্রসমাজে অভিশাপ আনে, দুর্বলকে যারা উৎপীড়ন করে, অন্যায় আর অপমানকে যারা কপট সত্যের দ্বারা প্রশ্রয়

দেয়—তাদেরকে যেন ক্ষমা না করি। আমি যেন ওই তরবারি হাতে নিয়ে তাদের মাঝখানে ঝাঁপ দিতে পারি; যেন অন্ধ মূঢ় বধির আর অজ্ঞানের মাঝখানে গিয়ে ওই অসির ঝনঝনা রব তুলতে পারি। জ্যাঠামশাই, আমি কি শুধুই মুসলমানের মেয়ে? বাঙ্গালী নই? আমার শিরায় শক, হুন, মোগল, তাতার, দ্রাবিড়, মোঙ্গল, আর্য,—এদের রক্ত কি নেই? সাতটা সুর মিলিয়ে আমার মধ্যে কি ঝঙ্কার ঝনঝনা ওঠে না বলতে চাও? এ ঝনঝনা যে বিদ্রোহিনী! এ ঝঙ্কার যে শক্তি-স্বাধিকার, জ্যাঠামশাই।

কতক্ষণ—কতক্ষণ মনে নেই। চিতার উপরে অগ্নিশিখা দেখতে দেখতে স্তিমিত হয়ে এলো। অবশেষে এক সময় অবসাদ ঘুচিয়ে এগিয়ে যাও, কলসের জল ঢালো, শান্ত করো ওই চিতা। ওখান থেকে জ্যাঠামশাইয়ের পুণ্যাত্মা অনন্ত আত্মার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হোক। তারপর ওই পরিপূর্ণ জীবনের ভরা কলসটি ভেঙ্গে দিয়ে আবার ফিরে চলো। তার আগে একবার অবগাহন করে নাও গঙ্গার পুণ্য সলিলে। ওই অবগাহনে তোমাদের নব-চেতনালাভ ঘটুক। ঘুচে যাক মৃত্যুভয়, শোক, শ্মশানবৈরাগ্য, ধুয়ে যাক যত লজ্জা, কলঙ্ক, মালিন্য যা—কিছু। তারপর ফিরে চলো আবার নব-জীবনের দিকে! আবার চলো ঘরে!

ঘরে! হাসনু থমকে দাঁড়ালো গঙ্গার তীরে সকলের অলক্ষ্যে। কোথা তার ঘর? তার সব আছে, কিন্তু কই—ঘর ত' নেই! এই রাত্রিশেষের অন্ধকারে গঙ্গা চলেছে কতদূরে—আছে কি এর কোনো ঘর? রজনীর তারা কোথায় গিয়ে তার শেষ আশ্রয় লাভ করে? জীবনের সান্ত্বনার কোথা শান্তি-নিকেতন? ঘর ত' হাসনুর নেই! ঘর তার জ্বলে পুড়ে গেল ওই চিতাশয্যার সঙ্গে! ঘর তার ভেসে গেল এই রাত্রে ওই গঙ্গার প্রবাহে জ্যাঠামশায়ের নাভিকুণ্ডলীর সঙ্গে! না, ঘর তার নেই, ঘর তার জন্য নয়, ঘরের মায়া তাকে ভোলায় না, ঘরের আনন্দ তাকে ইশারায় ডাকে না। সে একা, সে অদ্বিতীয়, সে অবিশ্রান্ত, সে অব্যাহত!

জীবেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর মাস-দুই পরে দেখা যাচ্ছে, তালতলার বাড়ির একটা মোটামুটি স্পষ্ট চেহারা দাঁড়ালো। সুমিত্রা থাকেন নিজের মহলে। অত্রিকে তিনি রাখেন সঙ্গে। সকাল সন্ধ্যা অত্রির মাস্টার এসে তাকে পড়িয়ে যায়। সুমিত্রা যেন এরই মধ্যে সকলের থেকে সরে গেছেন। তাঁকে অনেক সময়ে যেন বোঝা যাচ্ছে না। বসন্ত কাজ করছে, তা'র মাইনে পঁচিশ টাকাই আছে। বামুন ঠাকুর এসে সকাল বিকাল রাঁধে, আর বাজার হাট করে। খরচপত্রের টাকা হাসনু দেয় সুমিত্রার হাতে। মাঝখানে হাসনু তা'র মামা

হোসেন সাহেবের নামে শ' পাঁচেক টাকা বাড়িভাড়ার নাম ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছে জ্যাঠামশায়ের বকলমে। মামা পরিতুষ্ট হয়েছেন। পুনরায় টাকা পাঠাবার আশ্বাস তাঁকে দেওয়া হয়েছে। মীরা চুপ ক'রে গিয়েছে, কিন্তু ব'সে নেই। সে কাজ নিয়েছে বাইরে, অর্থাৎ বি-এ পাশটা কাজে লাগিয়েছে। মীরা সকাল দশটায় বেরোয়, আর ফেরে সেই সন্ধ্যার পর। তা'র চলাফেরায় একটা স্বাচ্ছন্দ্য দেখা যাচ্ছে। কলকাতার অনেক পথ-ঘাট আর কায়দা কানুন সে জেনেছে। এবার রইলো হিরণ। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর থেকে এ বাড়িতে আনাগোনা করতে গিয়ে তা'র আর পায়ের শব্দ হয় না। এ বাড়িতে সে নেই, তা'র গতিবিধি অনেকটা রহস্যময়। মাঝে মাঝে হঠাৎ আসে অসময়ে, হয়ত-বা রান্নাঘরে পাত পেড়ে বসে যায়, আর নয়ত বাইরের ঘরে ব'সে কবিতা লিখতে লিখতে ঘুমিয়ে পড়ে। জীবনসমস্যা ক্রমশ যত জটিলতরোই হোক না কেন, হিরণের স্বাস্থ্যশ্রী দিনদিনই উন্নতি লাভ ক'রে চলেছে। তা'র দায় নেই ব'লেই অশান্তি নেই।

মৃত্যুশোকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে, কেননা ওটাই মহাকালের নিয়ম। হঠাৎ সর্বহারা হয়েছে যে, তা'কেও সব ভুলতে হয়। তা'কেও আরম্ভ করতে হয় আবার নতুন জীবন। শোকের আঘাতে যদি একা ব'সে তুমি কাঁদো, তুমিই কাঁদবে—পৃথিবী চলবে নিজের নিয়মে। মানুষ চলবে তা'র নিজের পথে। কাঁদলে একাই কাঁদবে তুমি—কিন্তু হাসো যদি, পৃথিবী হাস্যমুখর হবে তোমার সঙ্গে। আর যাই হোক, বিচ্ছেদের বেদনা নিয়ে ব'সে থাকে না কেউ।

হাসনু কয়েকদিনের জন্য গিয়েছিল পূর্ববঙ্গে—তাদের গ্রাম হাজিপুরের মাঠে নেমে গিয়েছিল, বোধ হয় কেঁদেছিল সে মাঠে মাঠে ঘুরে। হয়ত গিয়েছিল সে গ্রামবাসীর ঘরে ঘরে। পুরনো প্রিয়বন্ধুর মতো এক-একখানি ঘর চেয়ে ছিল তা'র দিকে। দেখে এসেছিল বনের ধার—যেখানকার আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে মেয়েরা যায় জ্বালানিকাষ্ঠ সংগ্রহ করতে। বোধ হয় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল নদীর তীরে—যেখানে বর্ষার জল এখনও এসে নদীর চরকে ডোবায়নি, যেখানে জেলেরা জাল শুকোচ্ছে বাঁশবন্দী নদীর ওপর। ওখানকার হাওয়ায় আছে জ্যাঠামশায়ের নিঃশ্বাস, ওখানকার মাটি তাঁর স্নেহে আজও সিক্ত হয়ে রয়েছে। হাসনু দেখে এলো সেই মুজিবর মোল্লার ঘরখানা—যে-ঘরে এই সেইদিনও 'সিন্ধুবধ' যাত্রা হয়ে গেছে। শ্যাম ঘোষের ডাক্তারখানা দেখে এলো সে,—আজও সেখানে আর্ত রোগীরা আসে। হাসনু দেখে এলো ধানের গোলাগুলি ভরা—মাঠে মাঠে পাটের গাছ আর আউসের ধান উঁচু

হয়েছে। বাগানে বাগানে মৌসুমী সজি। শঙ্খচিলরা ডেকে যায় অঙ্গনের উপর দিয়ে, মাছরাঙা ডুব দেয় নদীতে, গ্রামের দু' তিনটি কুকুর এখনও তাকে দেখে ছুটে আসে। ঠাকুরদীঘির আশেপাশে ঝোপজঙ্গল বেড়ে উঠেছে, ফুলের ছোট ছোট গাছগুলি শুকিয়ে গেছে, আর তাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে পরিত্যক্ত শূন্য প্রাসাদ! দুর্গম গ্রামের মধ্যে এত বড় বাড়ি দখল করবার জন্য আজও কোনো কর্মচারী এসে পৌছয়নি। বাড়িখানার দিকে চোখ মেলে তাকাতে গেলে কান্না আসে!

কয়েকদিন ভ্রমণ ক'রে হাসনু আবার কলিকাতায় এলো। তাকে দেখে হিরণ বললে, ফিরে এলে যে?

হাসনু বললে, থাকার জায়গা পেলুম না।

সে কি!—হিরণ একেবারে অবাক। বললে, তোমার দু' তিনটে শ্বশুর-বাড়ি, থাকার জায়গার অভাব কি?

হাসনু হাসলো। অনেকদিন পরে নিজের হাসি দেখে নিজেই সে চমকে উঠলো। হাসিমুখে বললে, কোন একটা শ্বশুরবাড়ি খুঁজতে গিয়েছিলুম, কিন্তু পাওয়া গেল না।

হিরণ বললে, বারে বারে চেষ্টা করো, পেয়ে যাবে।—এই ব'লে সে বেরিয়ে চলে গেল।

সুমিত্রা বেরিয়ে এলেন। বললেন, কোথাও তোর মন বসছে না, কেন রে?

হাসনু বললে, কারণটা অস্পষ্ট নয়, ছোটখুড়ি।

যা হবার তা ত' হয়েই গেছে, এ বাড়িতে এমন ভাবে আর কতদিন চলবে, বল্ ত'?

তুমি কিছু ভেবেছ?

ভেবেছি একটা কথা।—ছোটখুড়ি বললে, কিন্তু সে কথা কি তোমাদের পছন্দ হবে? তোমাদের সকলের দয়ার ওপর আমি আব এভাবে কতদিন থাকবো বলো ত'?

হাসনু বললে, দয়ার দান কেন বলছ, খুড়িমা?

তা নয়ত কি, হাসনু? আমার খরচপত্রের জন্যে কি তোমাদের মুখ চেয়ে থাকতে হয় না? আমার অভাব-অভিযোগ, পালাপার্বণ, এটা-ওটা—সবই ত' তোমাদের মুখ চাওয়া!

তোমাদের যে অভাব ঘটেছে, আমি জানতে পারিনি ছোটখুড়ি, আমাকে তুমি ক্ষমা করো। আমি আজ থেকেই এর ব্যবস্থা করবো। কিন্তু এটাকে দয়ার দান বলো না,—টাকাকড়ি যা-কিছু সবই তোমাদের। আমার ওপর যে

দায়িত্ব, জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। আমিই এবার ছুটি নেবো তোমাদের কাছে।

ছোটখুড়ি বললেন, এমন কথা আমি কিন্তু বলিনি, হাসনু—এটা তোমার অভিমানের কথা। আমি বলছি যে, এভাবে থাকা আমার পক্ষে সুবিধে হবে না। ভাড়াটে বাড়ির নিচের তলাকার ঘরে অত্রিকে নিয়ে চিরকাল আমি কাটাতে পারবো না, হাসনু। আমাকে এবার নতুন পথ খুঁজে নিতে হবে। ধরো, মীরা নিজে একটা কাজ নিয়েছে, হয়ত কাজটা স্থায়ী হবে! তা'র নিজের পথ সে বেছে নিয়েছে—এ বাড়ি ছেড়ে যেখানে খুশি সে চ'লে যেতে পারে। এমন কি একদিন হয়ত নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় সে বিয়েও করতে পারে—।

মাঝপথে হাসনু বললে, ও কি হিরণকে স্বামী ব'লে স্বীকার করতে চায় না?

সুমিত্রা বললেন, আমি জানিনে, হাসনু। মীরার আশা অনেক, মীরা অল্পে তুষ্ট নয়। হিরণের দ্বারা কোনোদিন তা'র অভাব ঘুচবে না, এই তা'র ধারণা। হিরণও তেমনি। বড় হবার কোনো চেষ্টা-চরিত্র তা'র নেই।

তাহলে বলো, ছোটখুড়ি,—ওদের বিয়ে সত্যই হয়নি?

তুমি নিজে সেকথা সবচেয়ে ভালো জানো, হাসনু?

হাসনু বললে, ওদের দুজনের মধ্যে যে এতকালের ভালোবাসা!

সুমিত্রা বললেন, ভালোবাসা! আমি ত' দেখি তর্ক আর ঝগড়া। ভালো বাসা কোথায়? এক বাড়িতে রইলে চিরকাল, একবার ছোঁয়াছুঁয়িও ত' দেখলুম না। ওদের হাড়পাঁজরাও শুকনো!

হাসনু চুপ ক'রে রইলো। হিরণ আর মীরা দুজনকেই সে জানে। মৃত্যুকালে জ্যাঠামশাই উভয়ের ব্যাপারে কোনো নির্দেশও দিয়ে যান নি।

সুমিত্রা বললেন, তাই আমি বলছিলুম, এসব রাগের কথা নয়, হাসনু—এসব বিবেচনার কথা। আমি এভাবে থাকতে পারিনে, এভাবে অত্রির ভবিষ্যতও গ'ড়ে উঠবে না। তোকেও ব'লে রাখছি, এভাবে তোকেও আমি বেঁধে রাখতে পারবো না। দেশ থেকে তুই টাকা এনে যোগাবি, আর ঘরকন্না চলবে এইভাবে চিরকাল,—এ কেমন? বিষয়-সম্পত্তির ওপর দখল যদি না থাকে, তবে তা'র থেকে টাকা নিতে যাবো কোন্ অধিকারে? কোন্ অধিকারে বলতে যাবো, হাসনু, তুই কেবল টাকা যুগিয়ে যা? এ কি হয়?

হাসনু বললে, তুমি কি স্থির করেছ বলো?

সুমিত্রা একটু থেমে বললেন, আমি ফিরে যেতে চাই, হাসনু।

কোথায়?

কেন, আমার দেশে? হাজিপুরে?

তুমি গিয়ে ভাঙা-ঘর জোড়া লাগাতে পারবে, ছোটখুড়ি?

নিজের ঘর সামলাতে পারবো না কেন?

হাসনু বললে, তোমাকে দেখবে কে?

সুমিত্রা বললে, আমার প্রজারা নেই সেখানে? তা'রা ত' আর একা ভাসুর ঠাকুরের প্রজা ছিল না!

তোমার সঙ্গে তাদের কোনো পরিচয় ঘটেনি, ছোটখুড়ি।

আমি যদি গিয়ে তাদের মাঝখানে দাঁড়াই, পরিচয় হবে না?

হাসনু একবার সুমিত্রার দিকে তাকালো। ছোটখুড়ির স্বাস্থ্যশ্রী দেখলে এখনও তা'র গায়ে কাঁটা দেয়। জ্যাঠামশাই একদিন তিনটে জেলা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেছিলেন একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে পাবার জন্য—কেননা তিনি জানতেন রামেন্দ্র কলকাতার শৌখীন সমাজে আনাগোনা করেন, তাঁর রুচি ও পছন্দ যেমন-তেমন সুন্দরী মেয়েকে সহ্য করবে না। একবার হেসে তিনি বলেছিলেন, এমন মেয়ে এনে দেবো রামেন্দ্রর জন্য যে, কনে এসে দাঁড়ালে রাজবাড়িতে আলো জ্বালতে হবে না। রামেন্দ্র যেদিন বিয়ে ক'রে সুমিত্রাকে ঘরে আনলেন, জ্যাঠামশাই বুক ঠুকে বলেছিলেন—এবার আমার প্রতিজ্ঞার সঙ্গে তোমরা কনেকে মিলিয়ে নাও। বাস্তবিকই, চৌদ্দ বছর আগে সেদিন সুমিত্রা সকলের চোখেই বিস্ময়ের বস্তু ছিলেন।

হাসনু হেসে বললে, পরিচয় হয়ত হবে, কিন্তু তোমাকে নিয়ে আবার দাঙ্গা বাধবে না ত' ছোটখুড়ি?

সুমিত্রা বললেন, কেন রে?

কেন? অনেকদিন বুঝি আয়নার সামনে দাঁড়াওনি? ওই সর্বনেশে চেহারা নিয়ে কোন্ চুলোয় গিয়ে শান্তি পাবে?

সুমিত্রা হেসে উঠলেন। বললেন, চুপ কর পোড়ারমুখি, ছেলেটা যে পাশে রয়েছে!

হাসনু বললে, কে, অত্রি? থাক্ না কেন। ওর ভবিষ্যতও ফর্সা! তুমি বেঁচে থাকতে ও যেন বিয়ে না করে, ছোটখুড়ি।

সুমিত্রা সহাস্যে বললেন, কেন?

তোমার ওই রূপের পাশে কোন্ বউ এসে দাঁড়াতে সাহস করবে? কা'র এমন বুকের পাটা? এই জন্যেই ত' তোমার সঙ্গে আমি আর মীরা যেতুম না কোথাও!

সুমিত্রা খিলখিল ক'রে হেসে উঠলেন। কিন্তু হাসির সঙ্গে সঙ্গে ফস ক'রে একটা বেফাঁস কথাও ব'লে ফেললেন। বললেন, এই জন্যেই বুঝি সবাই মিলে আমাকে এখানে এই কোণের ঘরে পুরে রেখেছিস? কলকাতায় এসেছি এতদিন, কই আমাকে নিয়ে তোরা একদিন বেরোলিনি ত'? নিশ্চয় একটা কথা ছিল তোমাদের মনে।

হাসনু বললে, কী বলছ, ছোটখুড়ি?

ভুল বলছি কি? তিরিশ বছরের মধ্যে দেখলুম কি, পেলুমই বা কি? যার হাতে পড়েছিলুম সে কি মানুষ ছিল? সে কি আমার কোনো মান রেখে গিয়েছে?—সুমিত্রার মুখখানা দেখতে দেখতে লালাভ হ'য়ে এলো।

হাসনু বললে, তোমার কোলে যে ওই চাঁদের টুকরো?

সুমিত্রার কণ্ঠে উত্তেজনা এলো। বললেন, হ্যাঁ, আমার পথের কাঁটা রেখে গিয়েছে। পদে পদে বিঁধবে! এতটুকু স্বাধীনতা আমি পাবো না কোনোদিন, এই ত'?

হাসনু বললে, সন্তান কি পথের কাঁটা, ছোটখুড়ি?

সন্তান ত' সব নয়, হাসনু! সন্তান হোলো একটা অংশ। আমি না হয় মা, কিন্তু আমি কি আর কিছু নই? আমার কি আর কোনো কাজ নেই? আর কোনো চেহারা নিযে কি আমার দাঁড়াবার অধিকার নেই?

হাসনু কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে গেল। তারপর বললে, আমি মুসলমানী, তোমাদের কথা বলা আমার অধিকারের বাইরে। তুমি সম্ভ্রান্ত ঘরের বউ, সকাল-সন্ধ্যা আহ্নিক আর পূজো নিয়ে তোমার কাটে,—আমি তোমার এসব কথার জবাব কেমন ক'রে দেবো, ছোটখুড়ি?

ছোটখুড়ি বললেন, আমাকে যদি চিরজীবন চোখের জল ফেলতে হোলো, যদি ভাত-কাপড়েব জন্যে পরের মুখের দিকে চেয়েই থাকতে হোলো,—তাহলে ত' জানবো, বিয়ে হোলো অভিশাপ। যাবা আমাকে হাজিপুরের বাড়িতে এনেছিল তা'রা আমার শত্রু। যদি জানা থাকতো এক জানোয়ারের হাতে প'ড়ে আমার জীবন নষ্ট হবে, তাহলে আমার মামা কি এ বিয়ে দিতেন? গরীবের মেয়ে ব'লে কি আমাব দাম ছিল কম?

হাসনু বললে, মানুষের দাম চিরদিনই বেশি, সন্দেহ কি?

সুমিত্রা বললেন, আমার বুঝতে বাকি নেই কিছু হাসনু। আমি এবার দাবির ওপর দাঁড়াতে চাই, দয়ার ওপর বাঁচতে চাইনে। আমাকে এবার তোমরা মুক্তি দাও।

তুমি কি এবাড়ি থেকে কোথাও চ'লে যেতে চাইছ?

আমি মুক্তি চাইছি হাসনু। মুক্তি পেলেই আমার পথ আমি চিনে নিতে পারবো। স্বাধীন হয়ে উপবাস করা ভালো, কিন্তু পরাধীন থেকে নিশ্চিন্ত ভাত খেতে চাইনে।

হাসনু হেসে বললে, তোমাকে কি কেউ বেঁধে রেখেছে, ছোটখুড়ি?

সুমিত্রা বললেন, একশোবার। আমাকে বেঁধে রেখেছে, স্নেহ, মোহ, চক্ষুলজ্জা। অভ্যাসে বাঁধা, শাস্ত্র বেঁধেছে আমাকে, আচাব-আচবণেব বোঝা আমার ঘাড়ে, ভয় আমার পায়ে বেঁধেছে শেকল। নড়তে গেলে ঝনঝন ক'বে বাজে, টানতে গেলে ছেঁড়ে না, খুলতে গেলে আবো জড়িয়ে যায়। এ আর আমার ভালে লাগে না।

হাসনু বললে, ছোটখুড়ি, মনে হচ্ছে তুমি একটা সামাজিক সম্মতি চাও। কিন্তু তুমি আমি হিরণ মীরা—এবা সবাই সমাজ নয়, যেখানে থেকে তুমি সেই সম্মতি চাইছো। সমাজ আমাদের ছিল, সেটা ভেঙে পড়েছে। আমরাও সব ছড়িয়ে পড়েছি। একটা মেসিনের তোড় জোড আল্গা হযে যেমন চারিদিকে তা'র কলকব্জা ঠিক্‌রে পড়ে—আমরাও তেমনি। আমাদেব আজ সমাজ নেই, আছে তা'র একটা অস্পষ্ট চেতনা। লক্ষ লক্ষ লোক একটা বিশেষ সংস্থাব থেকে ছিটকে পড়েছে। তাদেব জনতা দেখছি, দেখছি কোলাহল আর কচকচি,—কিন্তু তাদের মধ্যে ভাবের কোনো ঐক্য নেই, একজনেব সঙ্গে আরেকজনের সামাজিক বন্ধন কিছু নেই। নদীর প্রবাহে ভেসে চলেছে কচুরিপানা,—মাঝে মাঝে প্রবাহেব পথ আটকে যায়, আবাব দুরন্ত স্রোত পিছন থেকে ঠেলে তাদের নিয়ে যায় ভাসিয়ে। আমরাও আজ ভেসে যাচ্ছি সেই খরস্রোতে, ভয়ানক ঠেলা পিছন থেকে, সাধ্য নেই আত্মরক্ষাব। দুরন্ত গতিতে আমাদের ছুটে যেতে হবে। তুমি আজ সামাজিক সম্মতি চাও! কিন্তু কা'র কাছে? কোথায় সেই সমাজ? কোথায় সেই ব্যবস্থা—যে-ব্যবস্থা তোমাকে মুক্তি না দিয়েও তোমাকে অমৃতের আস্বাদ দেবে? ছোটখুড়ি, মুক্তি হোলো একটি মানসিক চেতনা। মুক্তি নিয়ে তুমি যাবে কোথায়? মানুষ ছাড়া আশ্রয় কোথায়? সুতরাং এখানে দরকাব তোমার বিচার বুদ্ধির। সমস্ত অনুশাসনকেই তুমি একটি মুহূর্তে অস্বীকার কবতে পারো, যদি তোমার বিচার বুদ্ধির সায় থাকে। তোমার পথে কেউ দাঁড়িয়ে নেই, ছোটখুড়ি!

হাসনু নিজেই চ'লে যাচ্ছিল, কিন্তু আবার ফিরে দাঁড়ালো। বললে, আমি মুসলমানের মেয়ে। আমার সমাজ আজও মূঢ়তায়, অশিক্ষায়, অজ্ঞানে, নোংরামিতে ভরা। এক পা এগোতে গেলে ইসলামের চোখরাঙানি। সমাজটা

মোল্লাতান্ত্রিক। কতকগুলো অর্থহীন ইতর সংস্কার কত অসংখ্য ভদ্র মেয়েরঃ জীবন নষ্ট ক'রে দিচ্ছে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি । প্রতিবাদ করতে গেলে বলবে ঘরের শত্রু, আর নয়তো রাষ্ট্রের দুষমন। কিন্তু কই, আমার ত সমাজ নেই। আমার ত পর্দা নেই! বার দুই-তিন বিয়ে করলুম; কিন্তু কই,—আমাকে সমাদর করতে প্রস্তুত নয়—এমন চরিত্রবান মৌলবী ত আজও চোখে পড়েনি? আসল কথা কি জানো, ছোটখুড়ি—মুক্তি হলো মানসিক। দেখতে চাই কোনো ভয় কোনো সংস্কার অভ্যাস আর প্রচলন—মনে মনে তোমাকে বেঁধে রেখেছে কিনা? এদের মোহ তুমি কাটাতে পেরেছ কিনা। যদি পেরে থাকো, তবে গড়ে নাও নতুন সমাজ, নতুন মানুষ, নতুন মন। সমসাময়িক কালের হাত থেকে তুমি নিন্দা আর অপযশ পাবে, কিন্তু ভবিষ্যৎ কাল তোমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে পুরস্কার হাতে নিয়ে। তোমার মুক্তি তোমারি হাতে, ছোট খুড়ি!

হাসনু চলে গেল সেখান থেকে। সুমিত্রা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানেই। চোখ ছিল তাঁর বারান্দার মেঝের উপর। যেন সেই মেঝেতে আঁকা ছিল তাঁর অদূরবর্তী ভবিষ্যতের একটা নক্সা। সেই নক্সাটাকে তিনি মনে মনে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে লাগলেন। হাসনু মিথ্যে বলেনি; তাঁর নিজের মনে আছে ভয়, আছে লৌকিক অনুশাসনের চেতনা। কিন্তু আজ কি দাঁড়িয়ে আছে কিছু, যা একদিন মানুষকে সত্যি সত্যি বেঁধে রাখতো? আজকের বাধা কি সত্যই পর্বতপ্রমাণ? হাজিপুরের জমিদার-বংশের কাছে তাঁর নৈতিক দায়িত্ব আর বাধ্যবাধকতা ছিল, কিন্তু আজকে সেই পরিবারের সামাজিক সম্ভ্রম আছে কি? যদি বা থাকে তবে এই বৃহৎ কলকাতা শহর পর্যন্ত তা'র প্রভাব প্রতিপত্তি কতটুকু? আজ সেই পরিবার ধূলিলুণ্ঠিত, ছিন্ন,—তার সম্পদ, তা'র ঐশ্বর্য, এমন কি তা'র অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন। কই, সেই পরিবার তাঁর পথে ত' বাধা সৃষ্টি ক'রে নেই। এই পরিবারের একমাত্র পুরুষ অত্রি যদি কখনও উঠে দাঁড়ায়, সে কি ফিরিয়ে আনতে পারবে সব? অসম্ভব। তাকেও নামতে হবে ভবিষ্যতে কঠোর সংগ্রামে। তাকেও দাঁড়িয়ে উঠতে হবে অভাব অনাদরের ধুলোবালির থেকে,—তার পথ আরো বিঘ্নসঙ্কুল।

তবু আজ ওই নক্সা থেকেই ভবিষ্যৎ কালের জন্য একটা প্রতিজ্ঞা তুলে নিতে হবে। তিনি কম কিসে? তিনি কিসে ছোট? তাঁর নিজের অধিকারে এখন ত' আর কোনো বিঘ্ন নেই। জীবেন্দ্রনারায়ণ মার খেয়েছেন, মার খেয়েছে মীরা,—কিন্তু তিনি? কই, তাঁর বিরুদ্ধে প্রজাদের ত' কোনো নালিশ নেই? তিনি যদি হাত পেতে চান, দেবে না তা'রা দুহাত ভরে?

যদি তিনি তাদের দুঃখে দুঃখী হন, তাদের অভাব মোচনের দিকে যদি তাঁর দৃষ্টি থাকে, তাদের সমস্ত ন্যায্য দাবি আর অধিকার যদি তিনি অকপটে স্বীকার ক'রে নেন, তবে ভয় কি? রাণী ভবানী, রাণী রাসমণি রাণী স্বর্ণময়ী এঁরা ত' নিজগুণেই সিংহাসনে বসতে পেরেছিলেন। আজকের সমস্ত অশান্তির জন্ম হয়েছে পুরুষের হাতে, বিবাদ মনোমালিন্য পুরুষে পুরুষে, আজ তিনি যদি দুই দলের মাঝখানে গিয়ে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ান তবে সেতুবন্ধ হবে না?

সিঁড়ি বেয়ে হাসনু উপরে উঠে এলো। দালানের দক্ষিণ দিকে এই ঘরখানায় সেবার এসে উঠেছিল আফজল আর কুলসুম। প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাতে এসেছিল কুলসুম আফজলকে সঙ্গে নিয়ে। আত্মমর্যাদার অভাবে অনেক মেয়ে অকালে নষ্ট হয়, একথা ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলবার আগেই আফজল ওকে নিয়ে এই ঘর থেকে পালিয়ে গেছে। ঘরখানার হাওয়া এখনও দূষিত হয়ে রয়েছে।

ঘরের ভিতর এক কোণে বসেছিল হিরণ মস্ত কাজ নিযে। দেশের সমাজের সংসারের কোনো উপকার আসবে না এমন এক গুরুভার কর্ম—অর্থাৎ কবিতা রচনা! সামনে ছেঁড়া কাগজ আর এক টুকরো পেন্সিল। কবিতা নাকি লেখার আনন্দেই লেখা চলে! হাসনু পা টিপে টিপে পিছন থেকে কাছে এলো।

কবি।

সম্ভাষণটা অভিনব। হিরণ মুখ ফেরালো। বললে, এসো।

কি হচ্ছিল? কবিতা?

হিরণ বললে, ঠাকুর দীঘির বাগানে ব'সে যখন প্রথম কবিতা লিখতুম তখন একটু চক্ষুলজ্জা হোতো,—কেউ দেখলে আড়ষ্ট হতুম। আজ আর লজ্জা পাইনে।

হাসনু বললে, লজ্জা কেন পাও না?

এখন মোটামুটি এই বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে যে, আমি কবি বটে, তবে ভালো কবিতা লিখতে পারিনে! প্রাণের তাড়া এক জিনিস, আর রচনা-শক্তি অন্য জিনিস। কবি হলেই যে কবিতা লেখা যায়, এই বিশ্বাস ভুল।

হাসনু গম্ভীর হয়ে কথাটা শুনলো। তারপর বললে, বেশ ত' আমাকে দেখিয়ো, আমি শুধরে দেবো? আমি তোমার চেয়ে অনেক বড় কবি, মনে রেখো।

মিথ্যে বলোনি!—হিরণ বললে, তিনবার বিয়ে ক'রেও যায় কুমারী নাম ঘুচলো না,—সে ত' মুহুর্মুহ নিজেকে নতুন নতুন ক'রে রচনা করেছে! বড় কবি তুমি সন্দেহ কি!

তামাসা রাখো, জামাই! হাসনু ব'সে পড়লো।

হিরণ বললে, তামাসা কিসের? আমি যদি তোমাদের হাজিপুরের জামাই হতুম, তুমি আমার শ্যালী হ'তে না?

হাসনু হাসলো। বললে, বড় ক্লান্ত আমি আমি হিরণ। চুপ ক'রে চোখ বুজে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে।

চুপ ক'রে শুয়ে থাকতে আসোনি তুমি, তুমি পদ্মবনে ঢুকেছ মত্ত মাতঙ্গিনীর মতন। তুমি না হয় ক্লান্ত, কিন্তু তা'র বোঝা আমাকে বইতে হবে কেন?

এ বোঝার ভাগ তুমি নাও, কবি।

হিরণ বললে, বাঃ বেশ কথা! আমাকেও বুঝি মানুষ ব'লে মনে করতে আরম্ভ কবেছ? আমি যে অপদার্থ, একথা আব সকলের মতন তুমিই বা বিশ্বাস করো না কেন?

হাসনু বললে, তুমি অপদার্থ, কে বললে?

সবাই! জনে জনে! পোড়া শোল মাছ যাব হাত থেকে পালায়, তা'ব পদার্থ আছে কিছু?

হাসনু বসেছিল, এবাব শান্তিতে গা এলিয়ে দিল। তারপব আস্তে আস্তে বললে, ভাঙ্গা সংসাবটাকে আবার গুছিয়ে তুলতে চাইলুম, কিন্তু পাবলুম না। আমরা ছন্নছাড়া হয়ে গেছি। কিন্তু আমার একটা কথা কি মনে হয় জানো? মীরাকে তুমি সত্যবস্তুর আশ্বাস দিতে পারোনি, জামাই। পোড়া শোলমাছ তাই পালিয়ে যাচ্ছে!

হিরণ বললে, দাঁড়াও আগে বস্তুটা অনুধাবন করি, পরে সত্যে এসে পৌঁছবো। তোমার এই বস্তুটা এমন যে, পৃথিবীতে কোথাও ওর অস্তিত্ব নেই। যার অস্তিত্ব নেই, সেটা বস্তু নয়—চেতনা মাত্র। যাকে শাস্ত্রে বলে, অনুভব! এর পরে রইলো তোমার সত্য! সত্য আবার এমন এক পদার্থ, যার সংজ্ঞা আছে কেবল বিদ্যাদিগ্‌গজের পাণ্ডিত্যে! সুতরাং মহীয়সী মীবা চৌধুরীকে আমি কিসের আস্বাদ দিতে পারতুম, বলো দেখি?

হাসনু বললে, সত্যি বলবো? তুমি ভালোবাসতে পারোনি! কাঠের পুতুলকেও তোমরা পুজো করো, কেননা তোমাদের ভালোবাসায় সে প্রাণ পায়, তোমাদের ভক্তিতে সে জাগ্রত!

হিরণ বললে, বেশ, কিন্তু কথাটা কি জানো, কাঠের পুতুল ন'ড়ে বেড়ায় না, কথা কয় না, সত্যকে মিথ্যা বলে চেঁচায় না,—তাই বোধ হয় পুজো পায়। কথা বললে কোনো ঠাকুরকেই আমরা পুজো করতাম না,—এমন কি শালগ্রাম

শিলাকে টান মেরে ফেলে দিতুম! কিন্তু এ ব্যক্তি কাঠের পুতুল নয় চামড়ার পুতুল—এ আবার ন'ড়ে বেড়ায়! একে ভালোবাসতে যাবো, এমন বুকের পাটা কি ছিল আমার? গেলেই মনে হতো, হয় মিশরের পিরামিড, নয়ত চীনের দেওয়াল।

হাসনু বললে, এবার বুঝি তা'র আড়ালে নিন্দে করতে চাও?

নিন্দে!—হিরণ বললে, ডাকো তাকে এক্ষুণি, তোমার সামনেই তাঁর পদতলে সমগ্র হৃদয়ের অনুরাগ আর ভালোবাসা এক্ষুণি ঢেলে দেবার চেষ্টা করবো,—তা'র বদলে তিনি কি প্রকার প্রতিদান আমার মুখের ওপর দেন দেখে নিয়ো?

হঠাৎ গলগলিয়ে হেসে হাসনু বললে, চেষ্টা করতে গিয়েছিলে বুঝি?

যেতে হয় না, হাসনু—ওটা উপলব্ধির ব্যাপার। তুমি ত' জানো সব, তোমার আড়ালে আমাদের কোনো ঘটনাই ঘটেনি। এক বাড়িতে থেকেছি, একঘরে পড়েছি, একসঙ্গে বেড়িয়েছি। তা'র ফল কি জানো? দুজনেব কোনো পৃথক অস্তিত্বের চেতনা ছিল না! একজন আরেকজনের কাছে অতি পুরনো, অতি নিকট-আত্মীয় হয়ে রইলো। এমন কোনো দূরত্ব রইলো না যার ফাঁক ভালোবাসার দ্বারা ভরানো চলে। ওটার কথা যখনই উঠেছে তখনই হেসে মরেছি আমরা, তখনই তামাশা করেছি!

হাসনুর মুখখানা গম্ভীর হয়ে এল। বললে, এমন কি হয়?

হয় বৈ কি।—হিরণ বললে, একই গ্রামে ভিন্ন বাড়িতে থাকলে হয়ত এটা হোতো না। বিচ্ছেদের ব্যথা লাগতো, বাল্যপ্রণয়ের জন্ম হোতো। কিন্তু একই বাড়িতে থেকে আবাল্য আত্মীয়তার জন্য বাল্যপ্রণয় মার খেয়ে গেছে। তারুণ্যের চেতনায় নতুন ক'রে যাকে আবিষ্কাব করতে পারা যায়নি, তাকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বোনা কি সহজ? মনে পড়ে, একই ঘরে আমবা সাজসজ্জা করতুম? মনে পড়ে, আমি ঘরে থাকলেও তোমরা সেই ঘরে কাপড়চোপড় বদলাতে কোনোদিন লজ্জাসঙ্কোচ করোনি? আমাদের অল্প বয়সে কোনো আব্রু কি ছিল? ছিল কি কোন আড়াল? তা'র ফলে আমরা অতি অন্তরঙ্গ। তিনজনের তিনটে দেহ পর্যন্ত আমাদের চোখে নতুন নয়। আমাদেব শরীরের প্রত্যেক অংশটি কেমন ক'রে দিনে দিনে বৃদ্ধিলাভ করেছে, তাও আমরা দেখে গেছি। সুতরাং মীরা আর আমি যদি এই এক বছর ধ'রে স্বামীস্ত্রীর মতন বসবাস করতুম, তাহলে সম্পর্কটার যদি বা অভিনবত্ব ঠেকতো, মন জানাজানির ব্যাপারে কিছুমাত্র রোমাঞ্চ থাকতো না। অনাবিষ্কৃত কিছু না থাকার জন্য অনুরাগেরও কোনো পরিচয় পেতুম না।

মাদুরের ওপরেই হাসনু কাৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। তারপরে বললে, জামাই, তুমি কবিতা প'ড়ে শোনাও, শুনতে শুনতে যেন মিষ্টি ঘুম আসে।

হিরণ বললে, কি ধরনের কবিতা শুনতে চাও বলো?

হাসনু চোখ বুজেই হাসিমুখে বললে, বলবো? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠি, এমন কবিতা প'ড়ে শোনাও?

বাইরে পায়ের শব্দ হোলো। বসন্ত এসে ঘরে ঢুকে ডাকলো, দিদিমণি, বড়দি এসেছেন—ডাকছেন আপনাকে।

হাসনু চোখ খুলে বললে, এখানে ডেকে নিয়ে আয়, বসন্ত। আর শোন, তিন পেয়ালা চা ক'রে নিয়ে আয় দেখি?

বসন্ত চ'লে গেল। মিনিট দুই পরে এসে হাজির হোলো মীরা। হাসিমুখে বললে, কাব্যচর্চার জায়গা বটে,—এঘরে কুলস্বমেব অভিসম্পাত আছে তা জানো তোমরা?—এই ব'লে দুজনের মাঝখানে এসে বসলো।

হিরণ মুখ ফেরালো। পরিহাস-সরস কণ্ঠে বললে, একালের মদনভস্মের নাম হোলো পাউডার। আপনার সর্বাঙ্গে তা'র সুগন্ধ।

হাসনু হেসে বললে, জামাইয়ের খোঁচাটা বুঝলে, মীরাদি?

বুঝলুম।—মীরা বললে, একদিন তোরা আমার চেহারা নিয়ে গ্রামে বড়াই করতিস্। আজকে তা'র জৌলুস নেই, সেইজন্যে পাউডার মেখে জেল্লা বাড়াচ্ছি। রোজগার ক'রে নিজের পায়ে দাঁড়াতে গেলে একটু শাদা একটু রাঙা হ'তে হয় বৈ কি।

হাসনু খুব হেসে উঠলো। হিরণ বললে, বিজয়িনীর আবির্ভাবটা কাব্যচর্চার কালে ভালোই লাগলো। কিন্তু কলকাতার কোন্ অংশটা আজকে জয় ক'রে আসা হোলো, একটু শুনতে পাই কি?

মীরা তা'র ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে আড়াইশো টাকার একগোছা নোট ব'ার ক'রে ওদের সামনে ফেলে দিল। বললে, জয়লাভের প্রথম চিহ্ন—প্রথম মাসের মাইনে পেয়েছি আজ।

হাসনু এবার তাড়াতাড়ি উঠে বসলো। আনন্দের আতিশয্যে পুরনো সম্ভাষণটাই ক'রে বসলো, সত্যি বলছিস্? এত দাম তোর?

হিরণ বললে, মনে হচ্ছে আমার অন্নবস্ত্রের ভাবনাও ঘুচলো?

মীরা বললে, কবিতা লিখে জীবন কাটালে অন্নবস্ত্রের ভাবনা থাকবেই বা কেন! কবিতা অমূল্য বস্তু! বেচলে প্রচুর টাকা!—হাতিশালে হাতি ঘোড়াশালে ঘোড়া!

হাসনু বললে, কবিতা লিখে জামাই যদি ধনকুবের হয়, তা'হলে তুই ওকে স্বামী ব'লে মানবি, মীরাদি?

মীরা বললে, একমণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না!

হিরণ বললে, আপনার পিতা আমাকে প্রতিপালন করিতেন, সুতরাং উত্তরাধিকার সূত্রে আপনি করিবেন না কেন?

প্রতিপালনের মানে? টাকা এনে আপনার পায়ে অঞ্জলি দেবো?

হিরণ বললে, অনেকটা তাই বটে। তবে তার আগে হাসনুর নির্দেশটা— ধরুন যদি মেনে নেওয়া হয়?

মীরা চোখ পাকিয়ে বললে, অর্থাৎ আপনাকে স্বামী ব'লে মালা গলায় দেওয়া?

হিরণ বললে, কথাটা তাই দাঁড়ায় বৈকি। অর্থাৎ পুরোনোটা ঝালিয়ে নেওয়া।

মীরা তিক্তকণ্ঠে বললে, ওর চেয়ে ভালো কবিতা লিখুন, ওতে একদিন হয়ত অন্ন জুটতেও পারে! মনে রাখবেন, আমার কপালে সিঁদুরের দাগ থাকলে আড়াইশো টাকা কপালে জুটতো না। গভর্ণমেণ্ট হলো পুরুষের, তা'রা জানিয়েছে মেয়েদেরকে তা'রা যোগ্য সমাদর করতে প্রস্তুত—যদি তাদের কপালে সিঁদুর না ওঠে!

আমি যদি থাকি তবে সিঁদুরের দরকার কি? সিঁদুর মানেই ত' আমি!

হাসনু মীরার হয়ে হেসে জবাব দিল, না, তা নয়। সিঁদুর মানে চাকরিদাতার জীবনের নৈরাশ্য!

অতি আনন্দে সবাই হেসে উঠলো! ইত্যবসরে বসন্ত চা দিয়ে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়ে হাসনু বললে, ছোটখুড়ি মুক্তি নিলে,—মীরাদি নিলে চাকরি, জ্যাঠামশাই আর ছোটকাকাবাবু নিলেন বিদায়—সব ভেঙ্গে চুরে তচনচ হ'য়ে গেল। আচ্ছা, মীরাদি?

কেন রে?

জামাইকে নিয়ে কিছুকালের জন্য কোনো বিদেশে বেড়াতে যাই, কেমন হয়।

মীরা হাসনুর গায়ে হাত বুলিয়ে মিষ্টকণ্ঠে বললে, তাই যা, তোর শরীর তা'তে একটু সারবে। অনেক ঝড়-ঝাপ্টা গেল তোর ওপর দিয়ে। যা কিছুদিন।

হিরণ সহাস্যে আড়াইশো টাকার নোটের গোছা পকেটে পুরে বললে, এতদিন কবিতা লেখা সার্থক। আমার ট্রেন-ভাড়াটা পেয়ে গেলুম!

৮

দরজার বাইরে একখানা মোটর এসে দাঁড়ালো মনে হচ্ছে। একটু পরেই মোটরের দরজা বন্ধ করার শব্দ, তারপর ভারী পায়ের জুতোর মসমস আওয়াজ, —তারপরেই এক ভদ্রলোকের আবির্ভাব ঘটলো ঘরের সামনে।

কাগজপত্রের থেকে হাসনু মুখ তুললো, বাইরে মেঘ জমে একটু অন্ধকার হয়ে এলেও অভ্যাগতকে লক্ষ ক'রে হাসনু বললে, আপনি সেই বেল্লিক মশায় না?

বেণুবাবু ঠিক এই আশঙ্কাই করেছিলেন, পাছে মুসলমান মেয়েটার মুখোমুখি পড়তে হয়। বেলেঘাটার বাড়িতে একদিনেই মেয়েটাকে চেনা আছে। গোখ্‌রো সাপ!

কৃতার্থ কণ্ঠে বেল্লিকমশাই বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ—

আসুন।—ব'লে হাসনু তাকে অভ্যর্থনা জানালো। বললেন, বসুন।—না না, তা হোক, আমার পাশেই বসুন, কোনো সঙ্কোচ করবেন না।

বেল্লিকমশাই সবিনয়ে বললেন, আর একদিন এসেছিলুম, আপনারা ছিলেন না। সেদিন ছোটরাণীর সঙ্গে দেখা ক'রেই চলে যেতে হয়েছিল!

ছোটরাণী! কে?—হাসনু তাঁর দিকে তাকালো।

ওই যে রামেন্দ্রবাবুর স্ত্রী······

হাসনু বললে, ও হ্যাঁ ···· উনি ছোটরাণীই বটে!

বেল্লিকমশাই লক্ষ্য করলেন, মেয়েটার মেজাজটা আজ যেন একটু শান্ত ও শোভন। এবার একটু গুছিয়ে বসে বললেন, উনি আমার ওখানে থাকতেই বিধবা হন্ কিনা,—ওঁদের বড়ই বিপদ-আপদ গেছে; ওই ঠিক আপনার আসবার আগে পর্যন্ত আর কি!

আজ্ঞে হ্যাঁ,—প্রত্যেকটি বিপদেই আপনি সাহায্য করেছেন। অর্থাৎ আপনার জন্যেই ওঁরা অকূলে ভেসে যাননি! অন্ন, অর্থ, আশ্রয়—সবই আপনি দিয়েছিলেন,—আমি সব শুনেছি বেল্লিকমশাই!

বেল্লিকমশাই পুনরায় কৃতার্থ হয়ে বললেন, আমি সামান্য!

হাসনু প্রশ্ন করলো, আপনার বিষয়-কর্ম কি, শুনতে পারি?

সেও সামান্য, এমন কিছু নয়। কলকাতায় খান আষ্টেক পর্ণ-কুটীর আছে, —তা'র থেকেই ভাড়া-ভূতো আদায় হয়! তেজারতি বন্ধকী কাজও কিছু ক'রে থাকি। মোটা ভাত মোটা কাপড় হয়ে যায়!

হাসনু ডাকল, বসন্ত—?

বসন্ত এলো। হাসনু বললে, বাবুকে চা দে।—আপনি বিবাহ করেছেন বেল্লিকমশাই?

বেল্লিক বললেন, করেছি বৈ কি। অনেক সময়ে ইস্কুলে পড়তেই আমাদের বিয়ে হয়। মল্লিকগুষ্টির নিয়মই এই।

আপনার ছেলেপুলে?

দুটি—একটি ছেলে, একটি মেয়ে। দুটিই ছোট ছোট!

হাসনু বললে, আপনার বয়সও ত' বেশি নয়। শুনতে পাই কলকাতায় অন্নাভাব; কিন্তু আপনাদের স্বাস্থ্যশ্রী দেখলে কথাটা বিশ্বাস হয় না। বোধ করি আপনারা উপরতলার লোক!

হাসনুর পরিহাসে বেণুবাবু পুলকের হাসি হাসলেন। হাসনু পুনরায় বললে, সত্যিই বলছি! আপনার সুশ্রী চেহারা আর স্বাস্থ্য দেখলে মনেই হয় না যে, আপনার বয়স হয়েছে!

যুবতীর মুখ থেকে স্বাস্থ্যর সুখ্যাতি শুনে বেল্লিকমশাই গদগদ হয়ে উঠলেন। বললেন, আমার বয়স কত আপনার মনে হয়?

হাসনু বললে, পঁয়ত্রিশ কি পেরিয়েছেন?

আমার সাঁইত্রিশ হয়েছে। আপনার কত?

আমার?—হাসনু হাসলো। বললে, মেয়েরা কি সত্যি বয়স কোথাও বলে?

বেল্লিকমশাই সাহস পেয়ে বললেন, কিন্তু আপনার স্বাস্থ্যের বাঁধুনি দেখলে যে-কোন মেয়ে হিংসে করবে। আপনি বুঝি আজও বিবাহ করেন নি?

হাসনু এবার খুব হাসলো। বললে,—একবার নয়, দু'বার বিয়ে হয়েছে। মন্দ লোক ব'লে বেড়ায়—তিনবার।

কি বলছেন? বেণুবাবু তাকালেন হাসনুর দিকে।

হাসনু বললে, আর বলেন কেন, বেণুবাবু—স্বাস্থের বাঁধুনি বজায় রাখতে গিয়ে সব ক'টিকেই তালাক দিতে হয়েছে।

বেণুবাবু বললেন, আপনাদের সমাজের কথা আমার কিছু জানা নেই, সুতরাং কি বলতে হয়ত কি ব'লে ফেলবো। আমাদের সমাজ হ'লে আবার সতীত্বের কথা উঠতো।

হাসনু বললে, আমাদের সমাজেও ওঠে। সতীত্বের ওপর পাহারা সব সমাজেই আছে।

আপনার ছেলেপুলে ?

হাসনু সবিনয়ে হাসলো। বললে' আজ্ঞে না, আমি বেকার।

বেকার মানে ?

মানে, ছেলেমেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি মানুষ করবো ব'লে।

বেণুবাবু একচোট হেসে উঠলেন। এমন সময় বসন্ত চা আনলো। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বেণুবাবু উৎফুল্লকণ্ঠে বললেন, মুসলমান সমাজে আপনার মতন আরো মেয়ে থাকলে বেশ ভালো হোতো।

হাসনু বললে, উচ্ছন্নে যেতো! আমার মতন মেয়ের দাম কোনো সমাজেই নেই, বেণুবাবু।—যাক গে, আজ আপনাব সঙ্গে দু'দণ্ড আলাপ করে ভারি খুশি হলুম।

বেণুবাবু বললেন, আপনারা কি একই দেশের লোক? এঁদের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা কেমন করে হলো?

এটা বলা অবশ্য কঠিন, তবে কিনা আমরা এক গাঁয়ের লোক। আমরা এক সঙ্গেই মানুষ। অর্থাৎ এক হাঁড়িতেই খেয়ে এসেছি এত কাল!

কথাটা শুনে বেল্লিক একেবারে অবাক। বর্ণ-হিন্দুর ঘরে এরকম একটা উদ্ভট এবং ধর্মবিরোধী ঘটনা ঘটতে পারে, এ তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর। তিনি শান্তভাবে বললেন, আপনার পরিচয়াদি জানতে পারি কি?

হাসনু বললে, পারেন বৈকি। তবে কিনা হাজার মুসলমান পরিবারের যা আমাদেরও তাই। দুতিন পুরুষ ঘাঁটতে গেলেই হিন্দু বেরিয়ে পড়ে। মায়ের বংশ ঘাঁটতে গেলেই দেখি, অনেক দিদিমা বামুনের মেয়ে, অনেক ঠাকুমা আবার কামার-কৈবর্ত,—চাষা-ধোপার বিধবা। পাঠান আমলে তিন হাজার, মোগল আমলে তিন লাখ, ইংরেজ আমলে তিন কোটি। আমাদের পরিচয় এমনি করেই বেড়েছে।—মহা কৌতুকে হাসনু হাসতে লাগলো।

বেল্লিক সোৎসাহে বললেন, তাহলে আপনাদের আদিপুরুষ হিন্দু বলুন?

আদি কথাটা নিয়ে টানাটানি করাটা কারো পক্ষেই নিরাপদ নয়। তবে আমাদের আদিতে পুরুষ, কি মেয়ে বলা কঠিন। আদিতে হয়ত মেয়েই ছিল। মুসলমানরা জানে, মেয়ে চুরির ওপরে তাদের সংখ্যা বেড়েছে; আবার হিন্দুরাও জানে, সতীত্বধর্মের কড়াকড়ি আর অস্পৃশ্যতার জন্যে লাখো লাখো মেয়েকে তারা হারিয়েছে। বাঙালী হিন্দু বাঙালী মুসলমানের সামাজিক পরিচয় জানতে না চাওয়াই ভালো, বেল্লিকমশাই।

ঈষৎ উত্তেজনায় হাসনু এবার একটু হাসলো।

সুমিত্রা এসে দাঁড়ালেন দরজার কাছে। হাত তুলে তিনি নিজেই বেণুবাবুকে নমস্কার জানালেন। বললেন, বন-বেড়ালের খাঁচায় ঢুকেছেন, প্রাণের মায়া নেই বুঝি আপনার ?

বেণুবাবু হেসে উঠলেন। হাসনু বললে, ছোটখুড়ি, ঘরের বেড়াল বনে গেলেই বন-বেড়াল হয়। আমাকে আব-একবার বিয়ে দিয়ে ঘরে তোলো, দেখবে কেমন পোষ মেনে থাকি।

বেণুবাবু বললেন, হুকুম দিন, ঘটকালিতে লেগে যাই। কিন্তু আজ এসে আমার লাভ হলো খুব। অনেক ভুল ভাঙলো আমার।

হাসনু বললে, ভুল হয়ত ভাঙেনি, তবে ভালো লেগে থাকবে।

ভালো লাগলেই ত' অনেক ভুল ভাঙে!

হাসনু বললে, জানবার চেষ্টা না থাকলেই লোকে ভুল করে, বেল্লিক মশাই!

হাসিমুখে চায়েব পেয়ালা শেষ ক'রে বেণুবাবু গুছিয়ে বসলেন। সুমিত্রা বললেন, আমার চিঠি পেয়েছিলেন আপনি।

বেণুবাবু, বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ—

বসন্ত আবার এসে দাঁড়ালো।—দিদিমণি, পাশের বাড়ির গিন্নি এসেছেন আপনাব সঙ্গে দেখা করতে।

হাসনু মুখ ফিরিয়ে বললে,কেন ?

আপনি যে বলেছিলেন দোতলাটা ভাড়া দেবেন ?

হাসনু উঠে বাইরে চ'লে গেল। বসন্ত চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে বললে, পান এনে দেবো ?

না, তুমি যাও।—বেণুবাবু বললেন।

সুমিত্রার পরনে তসরের একখানা থান। গলার তুলসীব মালার একটা অংশ দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য দেহকান্তির সঙ্গে সাত্ত্বিক পবিচ্ছদটি অপরূপ লাবণ্যে মিলে গেছে। বেণু তাঁর দিকে বিস্ময়াহত দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, আপনার চিঠির জবাবে চিঠি না দিয়ে নিজেই এসেছি।

অনুগত পুরুষকে মেয়েরা প্রথম দর্শনেই চিনে নেয়! সুমিত্রা বললেন, আপনাকে ফাই-ফরমাস করবার সাহস আমার নেই। কিন্তু আপনি আমার অনুরোধ রাখবেন, এই আশ্বাস দিয়েছিলেন একদিন।

উৎসুক আগ্রহে বেল্লিকমশাই বললেন, আপনি যে-কোনও অনুরোধই করতে পারেন। আমার কথার কখনো নড়চড় হয় না।

সুমিত্রা বললেন, এর আগের দিন আপনি আমাকে দেশে ফিরে যাবার জন্ত

পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমিও মনস্থির করেছি, অত্রিকে নিয়ে সেখানে যাবো,—আমার প্রজাদের মাঝখানে। সেখানে নিজেদের দাবি নিয়েই দাঁড়াবো, নিজের অধিকার নিয়েই থাকবো। এখানে মুখ থুবড়ে প'ড়ে থাকা আর আমার চলবে না!

বেল্লিক বললেন, খুব ভালো কথা! নাবালকের গার্জেন হয়ে আপনি সমস্ত সম্পত্তি নিজের হাতে নেবেন। নিজের পায়ে দাঁড়াবেন।

কিন্তু এই কাজে আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

বেল্লিক বললেন, কত টাকা আপনি চান বলুন?

সুমিত্রা বললেন, টাকা আমি চাইনে। কিন্তু আপনার মতন বিচক্ষণ লোক যদি আমার সঙ্গে থাকে, তবে আমার বিশেষ উপকার হবে। এ ভরসা আপনার কাছেই পেয়েছি, বেণুবাবু।

আমি সঙ্গে যাবো বলছেন?

দয়া ক'রে যদি যান—

কিন্তু এঁরা রাজি হবেন কেন? ধরুন, আমি ত' কেউ নই আপনাদের। এঁরা কি আপনাকে ছেড়ে দিতে চাইবেন আমার সঙ্গে?

কেন চাইবে না?

আমি কলকাতার লোক' মানে এই এদিককার আর কি—বেণুবাবু গলা ঝাড়া দিয়ে বললেন, তা ছাড়া পূর্ববঙ্গে আমি যাইনি কখনও।

আমার সঙ্গে যাওয়াটা কি আপনার পক্ষে খুবই অসুবিধে হবে?—সুমিত্রা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

অসুবিধে? না, তেমন কিছু নয়। তবে শুনেছি এদিককার লোক সেখানে গেলে নাকি নজরবন্দী করে! কেউ বলে, কল্‌মা না পড়লে সেখানে থাকতে দেয় না! রাস্তাঘাটে দেখলেই নাকি মারে। কেউ বা বলে, লুঙ্গি না পরলে রাস্তায় ধ'রে কোতল্ করে।

সুমিত্রা বললেন, এদিকে অনেক ভুল খবর আসে, বেণুবাবু।

বেণুবাবু বললেন, কিন্তু আমি যে ওদেশের কিচ্ছু চিনি নে? সেখানে নাকি সব জায়গায় নদী? সেখানে নাকি শোবার ঘর থেকে রান্নাঘরে যেতে গেলে নৌকা লাগে? সেখানে নাকি ধানক্ষেতে মাছ মারে? দেশগাঁ নাকি ডুবে যায়? সেখানে নাকি এ সময়ে কেউ জুতো পরে না?

সবই সত্যি।—সুমিত্রা খিলখিল ক'রে হাসলেন। পরিষ্কার দাঁতগুলির সঙ্গে তাঁর মুখখানিও ঝলমল করে উঠলো।

কিন্তু আমি যে সাঁতার জানি নে।

সুমিত্রা সকৌতুকে বললেন, বেশত, অজিরর কাছে সাঁতার শিখে নেবেন।

বেণুবাবু বললেন, বেশ, তা'হলে যাবো। অবিশ্যি যাবার আগে কালীপুজো ক'রে নেবো,—কি জানি যদি ফেরবার সময় দাড়ি রেখে লুঙ্গি প'রে ফিরতে হয়।

সুমিত্রা আবার হাসলেন। বললেন, আমার ওপর সে দায়িত্ব ছেড়ে দিন্। আমি তবে দিনস্থির ক'রে ফেলি?

করুণকণ্ঠে বেণুবাবু বললেন, করুন। আপনি তবে অভয় দিচ্ছেন, আমাকে বাপের নাম বদলে ফিরতে হবে না?

আমি আপনাকে অভয় দিচ্ছি, আপনার পৈতৃক পরিচয় অক্ষুন্নই থাকবে।

বেণুবাবু কিয়ৎক্ষণ কি যেন চিন্তা করলেন। পরে বললেন, আর এক কথা। বলতে গেলে এঁরাই এতকাল ধ'রে দেখাশোনা ক'রে এসেছেন আজ এঁদের সবাইকে বাদ দিয়ে আপনি একা গিয়ে দাঁড়ালে যদি তা'রা প্রথমটাব আমল দিতে না চায়?

সুমিত্রা একটিবার পিছন দিকে তাকালেন। পরে একটু গলা নামিয়ে বললেন, এঁরা মানে ত মীবা? সে যাবে না আব কোনদিন। আর বাকি যে-সব কথাবার্তা—সে-সব আপনাকে পথে যেতে যেতে বলবো। আমি শুধু বলতে চাই, আপনার ভয় পাবার কিছু নেই।

বেণুবাবু কিছু মোহগ্রস্ত হ'লেও হিসাব ভোলেন না। বললেন, যদি কিছু মনে না করেন, আর একটা কথাও আমার জানা দবকার।

বলুন?

আমি সেখানে কোন্ পরিচয় নিয়ে দাঁড়াবো?

সুমিত্রার কণ্ঠে এবার যেন একটু উত্তাপ দেখা গেল। বললেন, সে পরিচয় আমি দোবো গিয়ে। আমাব স্বামীর টাকায এখানে বহুলোক ভাগ্য ফিরিযে নিয়েছে। আপনার পরিচয়ের কোনো অভাব হবে না!

বেশ, ওই কথাই রইলো। আমি যাবো আচ্ছা, সেখানে কুঁড়েঘর-টর একখানা পাওয়া যাবে ত'? মানে আমি গিয়ে সেখানে উঠবো!

সুমিত্রা চোখ কপালে তুলে বললেন, আপনি উঠবেন কুঁড়েঘরে, আর আমি থাকবো প্রাসাদে? এ আপনি কেমন করে ভাবলেন?

বেল্লিক বললেন, কত দিনের খাই-খরচা নিয়ে যাবো সঙ্গে?

সুমিত্রা বললেন, আপনি হাসালেন বেণুবাবু। সেখানকার অন্ন খাবার লোক নেই আজকে। আপনার সব ভার নেবে আমার প্রজারা, কাছারী-বাড়ির লোকেরা। আপনাকে কোনো বিষয়ে ভাবতে হবে না।

কিন্তু তা'রা যে সব হাসনুর সমাজের লোক।

তা'রা মানুষ—অতিথির সমাদর তা'রা জানে।

বেণুবাবু কিছুক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর বললেন, তা'হলে চলুন, সামনের বুধবার রওনা হই—দিনটা ভালো।

সুমিত্রা বললেন, আমার সঙ্গে বসন্ত যাবে, ওকে ব'লে রেখেছি। আমি তবে এই চার পাঁচ দিনে তৈরী হয়ে নিই। এর মধ্যে আপনার ওখানে বসন্তকে একবার পাঠাবো। এখানে আর একটি দিনও আমার ভাল লাগছে না, বেণুবাবু।

বেণুবাবু বললেন, সে ত' বটেই। প্রতিমার চালচিত্র যদি পিছনে না থাকে, তবে লোকে প্রতিমাকে বলে পুতুল। আপনার সেই গ্রামই হোলো আপনার যথার্থ পরিচয়। স্বদেশের ঠাকুর বিদেশের কুকুর, সবাই জানে।

পিছন দিক থেকে হাসনু এসে দাঁড়ালো। বেল্লিকমশাই তাকে দেখে বললেন, আমি তা'হলে আজকের মতন উঠি। আপনাদের অনেক বিরক্ত ক'রে গেলুম।

হাসনু কৌতুককণ্ঠে বললে আপনার মুখ-চোখ দেখে মনে হচ্ছে মধ্যে মাঝে যেন আবার বিরক্ত করতে আসবেন?

বেল্লিক ও সুমিত্রা দুজনেই হাসলেন। বেল্লিক একবার তাকালেন হাসনুর দিকে। ভঙ্গীটিতে কিছু আছে এলায়িতভাব, কিছুবা তারুণ্যের বিহ্বলতা। আনন্দের উৎসাহে হেসে উঠলে মনে হয় সর্বাঙ্গের স্বাস্থ্যটাও নৃত্য ক'রে ওঠে। মেয়েটা অসামান্য সন্দেহ নেই। পুরুষের সান্নিধ্যে এলে আড়ষ্টতা দেখা যায় না, পরিচ্ছদের শিথিলতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, যেন জীবনের আলোচনায় সঙ্কোচের ধার ধারে না—এ মেয়ে আশ্চর্য বৈকি। বেল্লিকের মত পরিবর্তন করতে হোলো। লাভের অঙ্কে যেন বেশ মোটামুটি জমা পড়লো। তিনি বললেন, আপনার আকর্ষণ যদি আমাকে মধ্যে মাঝে এখানে টেনেই আনতো, সেটা কি আমার অপরাধ হোতো?

হাসনু বললে, নিশ্চয় আসবেন। আমরা সব ভাঙ্গা নৌকো,—হাল ভেঙ্গেছে, পাল ছিঁড়েছে, তলা ফুটো হয়েছে,—তবু এসেছি এই বিদেশের বন্দরে একটু-খানি আশ্রয়ের জন্যে। যদি আসেন মধ্যে মাঝে আনন্দই পাবো। এখানে আছি, নাও থাকতে পারি। আবার কোন্ বন্দরের দিকে এই নৌকো ভাসাবো তাও আমরা জানিনে। আমাদের না আছে বর্তমান না আছে ভবিষ্যৎ,—আমরা সব নোঙর-ছেঁড়া নৌকা। কারো কপালগুনে মিলেছে দর্মার বেড়া, কেউ পাচ্ছে একমুঠো চাল, কেউ পথের ধারে শুয়ে দিন কাটায়, কারো বা ভিক্ষে জোটে না।

সুমিত্রা বললেন, শোন্‌রে হাসনু—আসছে বুধবারে আমরা চ'লে যাচ্ছি এ বাড়ি ছেড়ে। আমি আর অত্রি।

হাসনু বললে, কোথায় যাচ্ছ?

হাজিপুর। বেণুবাবুকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। বসন্তও আমার সঙ্গে যাবে।—সুমিত্রার কণ্ঠস্বরে নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তের সংবাদ ফোটে।

আমাকে নেবে না সঙ্গে, ছোটখুড়ি?

সুমিত্রা বললেন, তোকে এ যাত্রায় নেবো না, হাসনু।

কেন?

আমি একা গিয়ে দাঁড়াতে চাই সেখানে। আমাব একলার দাম আছে কিনা আমি জানতে চাই।

হাসনু বললে, হালে পানি পাবে?

সুমিত্রা বললেন, যদি না পাই তোকে এসে নিয়ে যাবো?

হঠাৎ ভীতকণ্ঠে হাসনু কি মনে ক'রে বললে, ছোটখুড়ি, তুমি ত' বড়রাণী নও। কেমন ক'রে তোমাকে ছেড়ে দেবো? তুমি ত' আমাদেব সেই সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী নও,—তোমাকে দেখলে সম্ভ্রম জাগবে কি তাদের? তোমার যথার্থ স্তববন্দনা যদি না হয় সেখানে? ছোটখুড়ি, চৌধুরী-বংশের ছোটরাণী কি জীবপালিনীর চেহারায় দাঁড়াতে পারবে? ক্ষমা করো আমাকে ছোটখুড়ি, তোমার ওই সর্বনেশে চেহারা দেখলে আমারই ভয় করে।

সুমিত্রা বললেন, এই সব ব'লে কি তুই আমাব উৎসাহ নষ্ট কবতে চাস, হাসনু?

হাসনু বললে, ছি, তোমাব সিংহাসনে তুমি গিয়ে বসবে, আমার মতামতের দাম কতটুকু ছোটখুড়ি? আমি শুধু দেখবো জ্যাঠামশায়ের যথার্থ মর্যাদা তোমার হাতে বক্ষা হবে কিনা, দেখবো শুধু চৌধুরী-বংশের শেষ বধূর যোগ্য সম্মান পাওয়া গেল কিনা। কিন্তু তুমি যে যাবে, তোমার সেই সমারোহ কই? সমারোহটাই ত' শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে—তোমার গোষ্ঠির ওইটিই ত' পরিচয়। সেখানকার গরীবদের মন ভোলাবে কি দিয়ে? উষ্ণীষপরা বরকন্দাজদের দল, আটাসোঁটা আর চতুর্দোলা, পাইক পেয়াদা আর বাজন-বাস্ত, আভরণ আর অলঙ্কার,—সে-সব কই ছোটরাণী?

সুমিত্রার সর্বশরীর রোমাঞ্চ হয়ে এসেছিল, তাঁর নিমীলিত দুই চক্ষে যেন হাসনুর কণ্ঠের মাদকরস একপ্রকার মায়া বুলিয়ে দিয়েছে। তিনি হর্ষপুলক-কম্পিত কণ্ঠে বললেন, তোমার অনুমতি না পেলে আমার যাওয়া হবে না, হাসনু। তুই অনুমতি দে—আমি আবার সমস্ত ঐশ্বর্য ফিরে এনে দেবো!

হাসনু বললে, অসাধ্য সাধন করতে পারবে তুমি?

দীপ্তকণ্ঠে সুমিত্রা বললেন, যদি না পারি তবে মিথ্যেই চৌধুরীদের বউ হয়ে এসেছিলুম। যদি না পারি তবে তোদের কাছে আর কোনোদিন মুখ দেখাতে আসবো না।

বেল্লিকমশাই অপলক দৃষ্টিতে বিস্ময়াহত হয়ে হাসনুর দিকে চেয়ে ছিলেন। হাসনু সুমিত্রার কথায় একটিবার থেমে গেল। তারপর কি যেন মনে ক'রে সভয়ে বললে, ছোটখুড়ি এমন প্রতিজ্ঞা তুমি ক'রে যেও না। তুমি কথা দিয়ে যাও আবার তুমি ফিরে আসবে।

সুমিত্রা বললেন, না, আমি আর ফিরবো না, হাসনু।

কোথা যাবে? যদি হাজিপুরে তোমার জায়গা না হয়?

আমি ফিরে যাবো বাপের বাড়ি।

সেখানেও ত' কেউ নেই। কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

তবে আমি মাঠের মাটি আঁকড়ে প'ড়ে থাকবো। সেই আমার দেশ। সেখানে গাছের ফল আছে, নদীর জল আছে।

হাসনু বললে, একথা বলা সহজ, ছোটখুড়ি। যারা কোনদিন ঘরের বাইরে এক পা বাড়ায়নি,—তা'রা জানে না বাস্তব সংসার কী রূঢ়। তোমার মতন প্রতিজ্ঞা অনেকে করেছে, ছোটখুড়ি,—শেষকালে ওই মাটিতেই মুখ থুবড়ে মরেছে!

সুমিত্রা এবার আগুন হয়ে উঠলেন, দেখতে দেখতে ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, তুই অনুমতি দিবি নে?

হাসনুর চোখ দুটো জ্বালা ক'রে এলো। বললো, তবে সত্যই বলি, আমার বুকের ভিতরে ব'সে জ্যাঠামশাই বলছেন, ছোট বৌমাকে তুই পা বাড়াতে দিসনে, হাসু বানু।

সুমিত্রা উচ্চকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, আমাকে যদি তোমরা ধ'রে রাখো তাহলে আমার সন্দেহ সত্য ব'লেই ধ'রে নেবো। আমি জানবো তোমাদের মধ্যে ষড়যন্ত্র আছে, জানবো অত্রিকে তোমরা পথের কাঙাল করতে চাও। এও জানবো হাসনু, ভাসুরঠাকুর কোনোকালে তোমাকে চিনতে পারেনি। তিনি এতকাল ধ'রে যাকে পুষেছিলেন—সে হোলো কালসাপ। বেশ জানি, সবাইকে ভাসিয়ে একদিন তুই ফিরে গিয়ে সেই সম্পত্তি দখল করবি—এ আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি। তোর লোভ, তোর হিংসে, তোর চক্রান্ত, তোর শয়তানি—আর কেউ না বুঝুক, আগাগোড়া আমি জানি। বেণুবাবু, দেখলেন ত'? মুসলমানকে যে কখনো বিশ্বাস করতে নেই, একথা মুসলমানই আমাদের চোখে ধরিয়ে দেয়।

ছোটখুড়ি!

ছোটখুড়ি বললেন, বলবো না কেন? জাত ভুলে কথা বলতে তুই আমাকে যে বাধ্য করলি। আমার সম্পত্তি, আমার শ্বশুরবাড়ির অধিকার, আমার প্রজা, আমার যথাসর্বস্ব,—এতে তোর স্বার্থ আছে ব'লেই ত' তুই আমাকে যেতে মানা করছিস! চিরকাল ধ'রে চৌধুরী-বংশের ভাত খেয়ে আজ নেমকহারামি করলি তুই! বিশ্বাসঘাতকতা করলি! তোর কি কোনো ধর্ম নেই, হাসনু?

নতমুখে হাসনু সমস্ত অপমানজনক তিরস্কারগুলো শুনে গেল। এবার মুখ তুলে একটু হাসলো। সুমিত্রার দিকে একবার তাকালো। তারপর বললে, বেণুবাবু, তবে বুধবারেই আপনি ছোটখুড়িকে নিয়ে রওনা হবেন।—এই বলে নত হয়ে সে ছোটখুড়ির পায়ের ধুলো নিয়ে পুনরায় বললে, তোমাদের পরিবারে আমি মানুষ হয়েছি, ছোটখুড়ি—আজ তোমার দুটো অপমান আমি নিশ্চয় সইতে পারবো। যদি দোষ ক'রে থাকি আমাকে তুমি মাপ ক'রে যেও। আমার অনুমতি কেন, নিজের অধিকারেই তুমি যাও।

হাসনু আর দাঁড়ালো না, সেখান থেকে চ'লে গেল। পা দুখানা তা'র থরথর ক'রে কাঁপছিল!

বামুনঠাকুর রান্নাবান্না সেরে চ'লে যাবার পর আষাঢ়ের আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলো। বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ো হাওয়ার চাবুক ছিল, ছিল উদ্দাম উতরোল—এ মহল থেকে ও মহল; দোতলা থেকে একতলা—সমস্তটার উপর দিয়ে এক একটা দমকা শাসন যেন চাবুকের আঘাত করে চলেছে। মাঝখানে মেঘলোক বিদারণ ক'রে কোথায় একটা বজ্রপাত হয়ে গেছে, দূরের কোন পল্লীর থেকে জলে-ভেজা শাঁকের আওয়াজটা তখনও আসছে। ওই বাজের শব্দটা যেন এ বাড়ির ঝুটি ধ'রে নাড়া দিয়ে গেছে মনে হয়।

হঠাৎ এ বাড়ির ইলেকট্রিক আলোগুলো নিবে গেছে। শুধু যে আজকের রাত্রের মতো আলো নিবেছে তাই নয়, কোন ব্যক্তির সাড়াশব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। কাজকর্ম সেরে বসন্ত এরই মধ্যে কোথায় যেন গা-ঢাকা দিয়েছে। মাঝখানে এক সময় ছায়ার মতো নিঃশব্দে হিরণকে ঢুকতে দেখা গিয়েছিল, কিন্তু তারপরে সেও নিরুদ্দেশ। সুমিত্রার মহলটা একেবারেই নিশ্চুপ।

মীরা ফিরেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু এত বড় বাড়িতে আপাতত কোথাও তা'কে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অত্রির মাষ্টার এসে পড়িয়ে চলে গেছে বৃষ্টি নামবার আগেই। সম্ভবত মায়ের পাশে শুয়ে এতক্ষণে সে ঘুমিয়েছে। আর বাকি রইলো হাসনু। কিন্তু কোথায় সে? সে কি তিনতলার ছাদে? সেই

ছাদের উপরকার আকাশ যে অনেক বড়। সাগরের তাড়নায় যে আকাশে মেঘ ছুটছে লক্ষ লক্ষ দক্ষিণ থেকে উত্তরে,—মহাশূন্যলোকে যেখানে জন্ম হয় ঝড়ের, বিদ্যুতের বজ্রদণ্ডের—সেই দিকে চেয়ে কি হাসনু? ঝড়ের হাওয়ায় উড়ে গেছে কি তার আঁচল? আকাশবন্যায় কি ভেসে গেছে তা'র হৃদয়? আষাঢ়ের কালো আকাশ কি আচ্ছন্ন হয়ে এলো তা'র এলোচুলে?

না, হাসনু কোথাও নেই! তার ঠাঁই নেই। মোহবন্ধনে নেই, বেদনায় নেই, বন্ধুতায় নেই। সে একা, সে নিঃসঙ্গ, সে নিভৃত। কাছে টানলে সে দূরে স'রে যায়, দূরে গেলে কাছে আসার জন্যে সে কাঁদে। লোভে সে ভোলে না, স্নেহে সে গলে না, দুঃখে সে টলে না। না, হাসনুকে কোথায়ও দেখা যায় না। উদ্দাম উল্লোল জীবনের বাইরে যে অসীম বিরহ-লোক সেইখানে হাসনু হয়ত বাস করে। ধূলিমলিন পৃথিবীর কোনো কোলাহল সেখানে পৌছয় না, জীবলোকের চেতনা নেই সেখানে, বায়ু কোনো সংবাদ বহন করে না, শব্দ-স্পর্শ-ধ্বনির বাইরে অনন্ত অন্ধ ব্যোম লোক—সেইখানে হাসনুর মহাবুভুক্ষা চৈতন্যবিন্দুর মতো বিচরণ ক'রে বেড়ায়।

ঘণ্টা দুই চ'লে গেল, কোন আলোই জ্বললো না। নিচের তলাকার কোনো কোনো ঘরের জানালা দিয়ে আশেপাশের বাড়ির এক-আধ টুকুরো আলো এসে পড়েছে বটে, তা'তে শুধু দেখা যায় বৃষ্টির প্রবল সাপটে ঘরের মধ্যে জল থৈ-থৈ করছে। আজ যদি সব খোলা থাকে থাক্, সদর অন্দর কোথাও কোনো আগল না থাকে। আজ বৃষ্টিতে সব ভাসুক, ঝড়ে সব লণ্ডভণ্ড হোক, শূন্য ঘরে ঘরে বিদ্যুদ্দাম ছুটে বেড়াক উন্মাদিনীর মতো,—কাঁদন-বাঁধন সমস্তই আজ ঘুচে যাক।

অন্ধকার রান্নাঘরটার মধ্যে জ্বলন্ত উনুনের উজ্জ্বল আভাটা তখনও রয়েছে—অন্ধকারে শ্মশানের শেষ চিতাগ্নি আভার মতো। সেখানে এক সময়ে এক ছায়ামূর্তিকে নড়তে দেখা গেল! অতি দ্রুত কিছু একটা কাজ সেরে সেই ছায়া গেল বাইরের দিকে। বাস্তবিক, অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না।

হঠাৎ কা'র গায়ে যেন কা'র পায়েব হোঁচট লাগলো। প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল আর কি!

কে?—হাসনু সাড়া দিল।

আমি। হাসনু নাকি রে? হিরণ জবাব দিল।

হ্যাঁ। তুই রান্নাঘরে কি করছিলি?

ঘরজামাই হলে অর্ধেক রাত্রে তুইও রান্নাঘরে ঢুকতিস। আজ আমাদের কপালে এক পেয়ালা চা-ও জোটে নি, মনে নেই?—হিরণ অনুযোগ জানালো।

হাসনু বললে, নতুন জামাই হ'লে ঠিক মনে থাকতো। ব'সে ব'সে রান্নাঘরে টুং টাং আওয়াজ শুনে ভাবছিলুম বোধ হয় ছুঁচো ইঁদুর। তোর কি কোন সুখ-দুঃখ লাগে না রে?

হিরণ বললে, যেন তোরই খুব লাগে। আয় আমার সঙ্গে।—

গরম চায়ের পেয়ালা হিরণের ডান হাতে ছিল, বাঁ হাতখানা ঝুঁকে সে নিচের সিঁড়ির ধার থেকে হাসনুকে টেনে তুললো। তারপর বললে, আয়, আধ পেয়ালা চা তোকে দোব—গরম গরম খাবি।

ক্লান্তির বোঝা নিয়ে এক-একটি সিঁড়ি হাসনু উঠতে লাগলো। হিরণ এক সময় বললে, এত ঠাণ্ডা কেন রে তুই? মনে হচ্ছে তুই বেঁচে নেই। কাঁদছিস্? না, কান্না চাপছিস্? অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে। আয় আমার সঙ্গে, একটু চা খাবি চল।

পরম স্নেহে হিরণ তা'কে উপরে তুলে নিয়ে গেল। হাসনু একটি কথাও বলছে না। হিরণ বললে, দাঁড়া এই অন্ধকারে। ফের যদি ফুঁপিয়ে কাঁদবি, কান ম'লে দেবো, সেই ছোটবেলাকার মতন। এই নে, পেয়ালায় তুই খা, আমি প্লেটে ঢেলে নিচ্ছি। ইয়া।—খুব মার খেয়েছিস্ আজছোটখুড়ির কাছে। খুব লেগেছে,তাই না? আয়, এবার তুই আমার ঘরে, তোর কান্নার সঙ্গে কবিতার কান্না মিলিয়ে দেবো, আয়। চক্রবাক মরেছে কবিতায়,তুই হলি সেই চিরকালের চক্রবাকবধূ। তোর বুকের ব্যথায় ভরেছে বিশ্বের আকাশ,চোখের জলে ভরেছে সেই মধুমতী নদী, বুককাটা মাঠের ওপরে তোরই হাহাকার শুনতে পাচ্ছি। ঘরে আয়, তোর কান্নার দাম দেবো, তোকে আজ সান্ত্বনা দেবো কবিতায়।

ঘরে ঢুকে দেখা গেল এক কোণে হিরণ জ্বালিয়েছে এক টুকরো মোমবাতি। হাসনু তৎক্ষণাৎ বেঁকে দাঁড়ালো; বললে, জামাই, আজ আমি আলো চাইনে, কা'রো হাতের আলোয় আমি কিছু দেখতে চাইনে। আমাকে ছেড়ে দে, আমি অন্ধকারে থাকি, অন্ধকার দেখি। নিজেকে দেখতে চাই।

হাসনু দ্রুতপদে আবার নিচে নেমে গেল। পিছনে দাঁড়িয়ে মোমবাতির মৃত্যু-স্তিমিত আলোয় হিরণ তা'র পথের দিকে তাকিয়ে সুন্দর স্বচ্ছ শান্ত হাসি হাসলো। তারপর নম্রমধুর কণ্ঠে শুধু বললে, কবিতা।

নিচের তলায় বর্ষণমুখর অন্ধকার। ধীরে ধীরে হাসনু নেমে এলো নিচের তলায়। চোখ দুটোয় কেমন যেন অশ্রুসজল তীব্রতা। মায়াবাদিনী সে নয়, সে বিদ্রোহিনী। সে ঘুরে বেড়ালো কক্ষে কক্ষে, অন্ধকার থেকে অন্ধকারে। কালসাপ যদি সে হয়, মাথায় মণি ত' থাকবে? কোথায় সে মণি? পাগলিনীকে তা'র কে সন্ধান দেবে?

কোনো এক ঘরের বিছানার ধারে সে এসে দাঁড়ালো। ঠাণ্ডা বিছানা, বৃষ্টির হাওয়ায় ভিজে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখলো এটা ওটা সামগ্রী। কাঁচের শিশি ন'ড়ে উঠলো তা'র হাতে, নড়ে উঠলো কি একটা বাসন। বুঝতে পারা গেল, জ্যাঠামশায়ের অন্তিম কালের শয্যা। এ ঘরের হাওয়ায় নিঃশ্বাস জমে রয়েছে এক মহৎ প্রাণের, কল্যাণ চেতনার। এখানে রয়েছে সেই শেষ কণ্ঠস্বর, —হাসনু, অন্যায়কে ক্ষমা করিসনে। ধর্ম আর মৈত্রীর নামে কদাচারকে কখনও বরদাস্ত করিসনে। হাসনু, এই ষড়যন্ত্রের যুগে সকল জাত, সকল ধর্ম, সকল সমাজের বাইরে তুই গিয়ে দাঁড়া। তোর উদ্যত তরবারির ঝলকে অজ্ঞান যেন ভয় পায়।

সে-ঘর ছেড়ে হাসনু বেরিয়ে এলো। মানুষের আভাস পাওয়া যাচ্ছে কাছেই কোথাও। পুবদিকের ঘরে ঢুকলো। খালি তক্তার উপর ধীরে ধীরে বসতে গিয়ে কা'র পায়ে যেন তা'র হাত ঠেকলো। বললে, কে মীরাদি নাকি?

মীরা সাড়া দিল, হুঁ।

চুপ ক'রে শুয়ে যে?

এমনি। আলো জ্বলবে না আজ?

হাসনু বললে, না।

মীরা আর কোন কথা বলতে চাইলো না। হাসনু উঠে বেরিয়ে চলে গেল। বীণাযন্ত্রের সমস্ত তারগুলি যেন আজ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

সহসা মাঝপথে সে থামলো। কোথায় যেন কান্নার শব্দ হচ্ছে, না? সামনের ঘরে সে এসে ঢুকলো। পাশের বাড়ির জানালা দিয়ে এক ঝলক আলো এসে পড়েছে ভিতরে। সেই আলোয় দেখা গেল, অত্রি দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্ধকারে। হাসনু কাছে এসে তা'র গায়ে হাত রাখলো। বললে, এখানে দাঁড়িয়ে কেন রে?

অত্রি আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। বললে, তুমি কেন তাড়িয়ে দিচ্ছ আমাদের, ছোড়দি?

কেন দেবো না? আমি যে মুসলমান! আমি যে বিশ্বাসঘাতক কালসাপ! কিন্তু শুধু তাড়িয়ে দেওয়াটাই জেনে গেলি, অত্রি? এত দিনের ভালোবাসার বদলে কিছু দিয়ে যেতে পারলিনে?—অত্রিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে হাসনু ঝরঝরিয়ে কেঁদে সেখানেই ব'সে পড়লো।

৯

ফুটপাতে উঠে দোকানের পাশ দিয়ে ভিতর ঢুকে দোতলায় উঠতে বাঁহাতি পড়ে বিমলাক্ষের ডাক্তারখানাটা। কাঠের পার্টিশন্ দিয়ে ঘরখানাকে ভাগ করা হয়েছে। একভাগে ঔষধ বিক্রি, অন্তভাগটা হোলো বিমলাক্ষর চেম্বার। চেম্বারটা পেরিয়েই আবার বাঁ-হাতি দোতলার সিঁড়ি। সিঁড়িটা প্রশস্ত নয়, একটু ঘোলাটে অন্ধকারও বটে।

ভিতরে ঢুকে দু'পা অগ্রসর হ'তেই মীরার সঙ্গে বিমলাক্ষর দৃষ্টি বিনিময় হোলো। শনি রবিবার বাদ দিলে এটা প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক। চেম্বারে অন্য লোক থাকে: সুতরাং মীরার সঙ্গে কথা বলার অসুবিধা। বিমলাক্ষ নিয়ম-নীতি জানে,—লোক-সাধারণের সামনে মীরার সঙ্গে চিকিৎসকের চল্‌তি গাম্ভীর্য নিয়েই কথা বলে। কলকাতার কেতাদুরস্ত চলাচলের সঙ্গে মীরারও কিছু পরিচয় হয়েছে বৈকি।

দোতালায় উঠে ছোট্ট বারান্দা পেরিয়ে পর্দা সরিয়ে একখানা ঘরে মীরা এসে ঢুকলো। ঘরখানা স্বাধীন ও একক। ঘরের সঙ্গে বাথরুম সংলগ্ন; এপাশে ওরই মধ্যে একটু পার্টিশন্ দিয়ে একটা রান্নার জায়গা,—সেখানে ইলেকট্রিক উনুনে খাবার তৈরী হ'তে পারে। পার্টিশনের ওধারে রোগী দেখার একটি বন্দোবস্ত। এদিকে ডাক্তার বিমলাক্ষর নাম-খ্যাতি কম নয়,—তার ওপর বিলাতফেরতার ছাপ আছে। এ ঘরটাও বিমলাক্ষর নামে ভাড়া নেওয়া রয়েছে।

মীরার হাতে বর্ষাতি ছিল, সেটা হাত থেকে নিয়ে গুছিয়ে রাখার জন্য একটি ছোকরা চাকর তাড়াতাড়ি ভিতরে এসে হাত বাড়ালো। বর্ষাতিটা তার হাতে দিয়ে মীরা সামনের বিছানাটার উপরেই ক্লান্ত হ'য়ে ব'সে পড়লো। মেয়েদের চেহারাটা একটু চকচকে হ'লে চাকরি হয়ত তাড়াতাড়ি জোটে, কিন্তু দশটা-পাঁচটা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের মধ্যে অবসর জোটে না। আজ খুবই খাটুনি গেছে।

ছোট ছেলেটা পায়ের কাছে ব'সে জুতোর বোতাম খুলে জুতোটা ছাড়িয়ে নিয়ে এক জোড়া স্লিপার এগিয়ে দিল তা'র পায়ের কাছে। তারপর কাঁধের তোয়ালে দিয়ে সামনের ড্রেসিং টেবল এবং বড় আয়নার কাঁচটা সযত্নে মুছে দিল। মীরা মুখ টিপে হেসে বললে, কলকাতায় কতদিন চাকরি করিস্?

ক্যা, মায়ি?

কেত্না দিনতক্ নোক্রি করতা হ্যায় ?

বছর বারো বয়সের ছেলেটা সহাস্যে বললে, তিন বরিষ।

মুলুক কাঁহা ?

ছাপ্রা জিলা !—চা বনা দেই, মায়ি ?

মীরা বললে, না, তুই যা।

ছেলেটা বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু চ'লে গেল না। তা'র ওপর হুকুম, বারান্দায় ব'সে থাকবে, এবং কলিংবেল বাজলেই ভিতরে আসবে।

বিছানাটা মীরার। লোহার খাট, তার ওপর নতুন তোষক, বালিশ আর ধবধবে চাদর। চাদরখানা রোজ বদলানো হয়। লেখাপড়ার জন্য ছোট্ট টেবল চেয়ার, এক কোণে রেডিয়ো যন্ত্র, এ-কোণে টিপাইয়ের ওপর ফুলদানি। সামনে মেহগনিপালিশকরা চায়না গ্লাসকেসের মধ্যে নানাবিধ সামগ্রী। একপাশে কাঁচের পুতুল আর কেষ্টনগরের মাটির খেল্না। বিছানার পাশের দেওয়ালে শতবর্ষবিরহিণী শ্রীরাধিকার তরণীযাত্রার ছবি ঝোলানো, এবং এ-দেওয়ালে টাঙানো একখানা ইংরেজী-বাংলা ক্যালেণ্ডার। সম্প্রতি গতকাল এসেছে আর একটি স্টীল আলমারী—ওর মধ্যে নাকি প্রধানত মীরার কাপড়-চোপড় এবং অন্যান্য সামগ্রী থাকবে।

ঘরখানা বিমলাক্ষর, এটা নাকি দোতালার দু'নম্বর প্রাইভেট চেম্বার। আসবাবপত্র দামী, কিন্তু এসব আসবাব রোগী দেখার চেম্বারে থাকার কথা নয়, এগুলো মানায় বাসস্থানে। মীরা এ প্রশ্ন তুলেছিল। বিমলাক্ষ বলেছিল, এগুলো উপহার বলে মনে করো।

মীরা বলেছিল, আফিস-ফেরতা বিশ্রামের একটা জায়গা না হয় বুঝতে পারলুম, কিন্তু এত আসবাব-সজ্জা কেন ?

বিমলাক্ষ বললে, মনস্তত্ত্বে বলে, শূন্যঘরে মানুষের মন শূন্য মনে হয়! আসবাব-সজ্জা তা'র মনে স্বস্তি আনে, এগুলো অনেক সময়ে মানুষকে সঙ্গ দান করে।

ড্রেসিং টেবল আর আয়না কেন ?

ওই একই কথা। তোমার ছায়া পড়বে আয়নায়, কিন্তু দেখতে পাবে ভিন্ন মানুষকে। আয়না হোলো আত্মবিচারের পটভূমি।

কোনো কোনো কথায় মীরা চমকে উঠে, দুর্ভাবনা আসে মনে।

একথা সত্যি, বিমলাক্ষর জন্যই তার চাকরি, তার অবস্থার সুরাহা। বাবা দেখে যেতে পারেন নি, মেয়ে একটা খুঁটি ধ'রে দাঁড়িয়েছে! আড়াইশো টাকা মাইনে একটি মেয়ের পক্ষে আজকার দিনেও নেহাৎ কম নয়। সত্যি

বলতে কি, টাকা তার সহজে খরচ হয় না। আপিসে যায় হেঁটে,—কেননা নতুন পায়ে হাঁটা। হাঁটতে ভালো লাগে। বিমলাক্ষ তাকে নানা জিনিস উপহার দেয়, কেননা বিমলাক্ষকে আবাল্যের ঋণ শোধ করতে হবে। এককালে অপরিমেয় অর্থ নিয়েছে সে মীরার বাবার কাছে, আজ তাঁর একমাত্র মেয়ের পায়ের তলায় সেদিনকার দেনার বোঝা লাঘব করবে বৈ কি।

সাবান আর প্রসাধন দ্রব্যের সুগন্ধ আসছে কোথা থেকে। মুখ ফিরিয়ে মীরা লক্ষ্য করলো, বাথরুমের দরজা খোলা। সে উঠে গিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকলো। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করলো।

এ মন্দ নয়। কা'র বাড়ি, কা'র ঘর-দরজা—আজও তা'র জানা নেই। মেঝের পরে গালিচা পাতা, মাথার উপরে বৈদ্যুতিক পাখা। কিছু খেতে চাও, সব উপকরণ প্রস্তুত। ডিম, মাখন, ফল, রুটি, চা, কফি—যা চাও। কে জোগাচ্ছে? কোথা থেকে আসছে এসব? এ মন্দ নয়। একটি ঘরে তা'র অবারিত অধিকার! কেউ খোঁজ নেয় না, কারো কৌতূহল নেই, কেউ কৈফিয়ত চায় না,—কারো মনে উদ্বেগ নেই। ঘরের পর্দা তুললেই অপরিচিত জগৎ, রহস্যময় সংসার। এ বাড়িতে আছে কত জাত, কত শ্রেণীর লোক, কত বিচিত্র জীবন—কা'রো জানা নেই। ব্যবসায়ের কেন্দ্র আছে, অর্থনৈতিক ষড়যন্ত্র আছে, চোরা কারবারের গোপন দপ্তর আছে, রহস্যময় আনাগোনা আর চাপা কথাবার্তা আছে। এক কোণে থাকে ফিরিঙ্গী গেরস্থ, তার পাশে সিনেমা কোম্পানীর আপিস। হঠাৎ আসে ছিট্‌কে হাসপাতালের নার্স, কিংবা লেডি ক্যান্‌ভাসার, কিংবা চলচ্চিত্রে নামবার মতো কোনো বব-করা রং-পাউডার-মাখা বিলোলা মেয়ে। কোনো বুশ-শার্টপরা তরুণ শিস দিতে দিতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায়, পিছন দিকে রেখে যায় ব্ল্যাক-এণ্ড-হোয়াইটের গন্ধ। হঠাৎ আসে হয়ত শাদারংয়ের কোনো সার্জেণ্ট—কোনো একঘরে ঢুকে একগ্লাস রঙীন পানীয় খেয়ে সিগারেট ধরিয়ে চ'লে যায়। কোনো এক খানসামা হয়ত উঠে আসে তোয়ালে-ঢাকা কাঁচের ডিস হাতে নিয়ে। কোনো ঘরে গ্রামোফোনে নারীকণ্ঠের বোম্বাই গান শোনা যায়। শোনা যায় কাঁচের পাত্রের টুং-টাং অস্পষ্ট আওয়াজ। অনেক সময়ে জুতোর মসমস শব্দ কাছের দিকে আসে, আবার দূরে কোথাও গিয়ে মিলিয়ে যায়।

এই আধুনিক সংসারটার মাঝখানে মীরা একা। এদের সঙ্গে তা'র চিত্তের কোনো বাঁধন নেই, নেই কোনো সংযোগ। সে বিচ্ছিন্ন, সে একক, হুহু ক'রে ওঠে তা'র মন। যেমন হুহু ক'রে উঠতো হাজিপুরের গ্রামপ্রান্তে উতলা মধুমতীর উপর দিয়ে বনজুঁই আর কাঠমল্লিকার মৃদু মুখচোরা গন্ধ। সেখানে

বাঁশের বনে পাতার দোলায় তাদের হৃদস্পন্দন লেগে থাকতো, শিবের মন্দিরে আরতির ঘণ্টার আওয়াজ কাঁপতে কাঁপতে চ'লে যেতো বর্ষণমুখর মধুমতীর উপর দিয়ে তাদের কল্পনার পক্ষ বিস্তারের মতো। প্রাসাদ-অলিন্দে দাঁড়িয়ে থাকতো তা'রা—হাসনু আর হিরণ, সুমিত্রা আর অত্রি,—দূরে যেতো জেলে নৌকো, ঢেউয়ের উপর নেচে বেড়াতো। পারাবতের দল উড়ে এসে নামতো নিচে রাজবাড়ির প্রাঙ্গণে—যেখানে কবুতরখানা। সেরেস্তায় ব'সে থাকতো গ্রামের ভক্ত কুকুর বর্ষায় ভিজে; প্রজাদের মেয়েরা চুল বেঁধে কপালে টিপ প'রে বেরিয়ে যেতো রাজবাড়ির ময়ূরদলের খাঁচার পাশ দিয়ে। ওপাশ থেকে কাকাতুয়া, হিরামন আর নীলকণ্ঠের ডাকে সমগ্র প্রাসাদ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকতো। সেখানে আনন্দের সঙ্গে কোনো বেদনা ছিল না, এখানে সুখের সঙ্গে অস্বস্তি জড়িয়ে রয়েছে। সেখানে শান্ত জীবন ছিল সঙ্গীতময়, এখানে তরঙ্গমথিত জীবন নিত্য কোলাহলমুখর।

জুতোর শব্দ হোলো, তারপরেই এসে ঢুকলো বিমলাক্ষ। বিছানার উপর মীরা গা-এলিয়ে দিয়েছিল, বিমলাক্ষকে দেখেই উঠে বসলো।

বিমলাক্ষ বললে, ওই দেখো, তুমি কিছুতেই সহজ হতে পারো না মীরা, —কই, দুধ-মিষ্টি খেয়েছ?

মীরা বললে, খাবার কথা মনেই পড়েনি।

ব্যস্ত হয়ে বিমলাক্ষ বললে, আমি জানতুম! তোমাকে কতবার ব'লে রেখেছি, মীরা—স্বাস্থ্যই হোলো মানুষের সম্পদ! রাজত্ব গেলে রাজত্ব ফিরে পাওয়া যায়, কিন্তু স্বাস্থ্য একবার গেলে আর ফেরে না। তোমার আর কি বলো? যারা দিনরাত তোমার হিতাহিত নিয়ে মাথা ঘামায়,—তোমার চেহারা খারাপ হ'লে ক্ষতি তাদের।

তাই নাকি? মীরা হাসলো,—তুমি ত' চমৎকার মন ভোলাতে পারো, বিমলদা?

বিমলাক্ষ বললে, বেশ, তামাসা করো সইবো। কিন্তু এও ব'লে রাখি শরীর গতিক একটা কিছু হ'লে তখন না থাকবে হাসনু, না আসবে হিরণ— তখন আমাকেই হাল ধরতে হবে।

মীরা বললে, এবার আমি যাই, সন্ধে হয়েছে!

যাবে বৈ কি—কোনো বাঁধন তোমার ত' নেই। যখন খুশি আসবে, যখন খুশি যাবে। এ তোমারই ঘর, তাই ব'লে এঘর তোমাকে কোনো দিন বাঁধবে না, মীরা। মেয়েদেরকে চিরদিন বেঁধে রেখে আমরা তাদেরকে খাঁচার পাখি বানিয়েছি। জাতের আজকে দুর্দিন সন্দেহ নেই, কিন্তু মেয়েদের দুর্গতি

তার চেয়েও বেশি।—একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বিমলাক্ষ বললো। কলিং বেল্‌টা ছিল তার হাতের পাশে, সেটা টিপতেই ছোকরা চাকরটা এসে হাজির হোলো। বিমলাক্ষ পুনরায় বললে, হ্যাঁরে ছট্টু, মায়িজির জন্যে দুধ আর খাবার ছিল, দিস্‌নি কেন?

হাম্‌কো মালুম নেই থা।

নে, স্টোভটা জ্বালা—দুধ গরম কর। ওদিকে দেখেছ মীরা, আলমারিটা পছন্দ হয়েছে তোমার?

মীরা বললে, হাজিপুরের বাড়ি ছেড়ে এসে আজ আমাকে সামান্য আলমারি পছন্দ করতে হবে?

বিমলাক্ষ হাসলো। বললে, তা বটে! কোনো কিছু উপহার দিয়ে তোমার মন ভোলাবার চেষ্টা যদি কেউ করে, আমি তাকে বলবো বেকুব। দামী কাপড়-চোপড় আর জড়োয়া অলঙ্কার—এদের ওপরেও তোমার মোহ নেই, কেননা এদের মধ্যেই তুমি মানুষ হয়েছ। এ আর কি, সামান্য আসবাবপত্র।

মীরা বললে, এটা তোমার তোমার রোগী দেখার ঘর ছিল, কিন্তু এক মাসের মধ্যে কাউকে ত' দেখলুম না? তুমি এত বিছানাপত্র দেরাজ টেবিল আনতে গেলে কেন, বিমলদা?

কেন আনতে গেলুম?—বিমলাক্ষ চোখ তুলে বললে, বলছি। আগে দুধটুকু খেয়ে নাও।—ওরে ছট্টু, চা কর আমার জন্যে। হ্যাঁ, বলি। শোনো, মীরা—কলকাতা শহরে মেয়েছেলে—আর মহিলা, এ দুয়ের মধ্যে একটু তফাত আছে। স্ত্রীলোক মাত্রেই মহিলা হয় না,—কেননা মহিলার জাত আলাদা। গুণে বিদ্যায় চেহারায় চালচলনে যে সব মেয়ে প্রথম শ্রেণীর, আমরা তাদেরই বলি ভদ্রমহিলা। সেই ভদ্রমহিলা শ্রেণীর মধ্যে আবার ইতর বিশেষ আছে। সেখানে বড় জমিদারের মেয়ের সঙ্গে ছোট হাকিমের বড় মেয়ের পার্থক্য থাকে। তুমি আজ পথে নেমে চাকরি করতে এসেছে ব'লেই যে দ্বিতীয় শ্রেণীর মহিলা হ'য়ে উঠবে, তা ত' আর হ'তে পারে না। তোমার যোগ্য সম্মান আর মর্যাদা কই? তোমার উপযুক্ত যানবাহন কই? তোমার বিশ্রামের উপযুক্ত ঘর কই? সুতরাং সব ভেবেই আমি আনিয়েছি এসব তোমার জন্যে। হয়ত এর অনেক জিনিসেই তোমার দরকার নেই, কিন্তু এরা ঘরে থাকবে তোমার সম্মানের জন্যে।

মীরা বললে, তোমার স্ত্রী এ ঘরে এসে দাঁড়ালে কি পছন্দ করবেন তোমার এই ক্রিয়াকলাপ?

আমার স্ত্রী।—বিমলাক্ষ চেয়ারে হেলান দিল। বললে, সত্যি বলবো? স্রেফ হিস্টিরিয়া। এঘরে তিনি এসে দাঁড়ালে কি হোতো? ধর্মতলা স্ট্রীটে লোক জমে গাড়িঘোড়া চলাচল বন্ধ হ'য়ে যেতো। আর আমাকে ডাক্তারখানা থেকে এমন এক ঘুমের ওষুধ খেতে হতো যে, ঘুম আর ভাঙতো না। ব'লো না মীরা, ব'লো না—তিনি এ ঘরে এসে দাঁড়াবেন,—একথা ভাবলেও গা ভোল হ'য়ে আসে।

মীরা বললে, শোনো বিমলদা, আমারও সেকথা ভাবতে ভয় করে। কিন্তু কি জানো, আমাকে এমন ক'রে তুমি আস্তে আস্তে বেঁধে আনছো যে, তোমার কোনো আচরণের প্রতিবাদ করতে আরো বেশি ভয় করে।

একথা তোমার কেন মনে হচ্ছে, মীরা?

তোমার আগেকার চেহারার সঙ্গে এখনকার চেহারা মেলাতে পারছিনে, তাই ভয় হয়। তুমি তেমনি স্বার্থপর, তেমনি কুচক্রী থাকলেই ভালো হোতো।

বিমলাক্ষ হা হা ক'রে এক চোট খুব হাসলো। বললে, আচ্ছা মীরা, তুমি কি আমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারো না?

মীরা ধরা গলায় বললে, আগে পারতুম না, কিন্তু এখন যেন পা টিপে-টিপে বিশ্বাস করবার জন্যেই এগিয়ে যাচ্ছি। ডুবে যাবার আগে পায়ের তলা থেকে যেন মাটি স'রে যাচ্ছে!

আমি কি আজ পর্যন্ত তোমার কোনো ক্ষতি করেছি, মীরা?

করলে হয়ত ভালো হোতো। জানতুম তুমি সেই। তোমাকে বুঝে নিতে একটুও কষ্ট হোতো না। কিন্তু তোমার নিঃস্বার্থ চেহারাটাই আমার মনে ভাবনা আনে।—মীরা গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিল।

বিমলাক্ষ একটা সস্তা উপমা দিয়ে বসলো। বললে, মীরা, দস্যু রত্নাকর কি বাল্মীকি হ'তে পারে না?

মীরা বললে, হয়ত পারে। কিন্তু বুনো গোখরো সাপ ঢোঁড়া সাপ হয়ে উঠেছে, এ কোথাও শুনেছ? এ কোথাও শুনেছ, শৃগাল শশক হয়ে গেছে? —উপমা দিয়ো না, বিমলদা। আমি শুধু বলতে চাই তুমি বরং আমাকে অনাদর করো, কিন্তু সমাদর ক'রো না।

বিমলাক্ষ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। পরে বললে, আমার সেই চিঠিগুলো তুমি ত' আজও ফিরিয়ে দিলে না, মীরা? কতবার চাইলুম।

মীরা বললে, সে চিঠি এখন চেয়ো না তুমি, বিমলদা।

কেন বলো ত'?

তোমাকে অত্যন্ত রহস্যময় লাগছে ব'লেই ও চিঠিগুলো আপাতত নিজের কাছে রেখে দেবো। ওগুলোর মধ্যে তোমার সত্য পরিচয় আছে!

বিমলাক্ষ বললে, অল্প বয়সের চিঠিতে বাসনার আগুন আছে ব'লে কি ওটা সত্য পরিচয় হোলো?

মীরা হাসিমুখে বললে, অত্যন্ত নোংরা আর জঘন্য কথাগুলোকে বাসনার আগুন ব'লে পোশাক পরাও কেন, বিমলদা? তাছাড়া আরো অনেক কথা আছে সেসব চিঠিতে!

বিমলাক্ষ চমকে উঠে বললে, আমার সব মনে নেই, কি লিখতে কি লিখেছি। আর কি আছে বলো ত'?

আর একদিন বলবো, আজ উঠি। এই ব'লে মীরা উঠে দাঁড়ালো।

মীরা!—ব'লে বিমলাক্ষ উঠে পড়লো। যে-হাতখানা দিয়ে একদা সে এই নারীকে চিঠি লিখেছিলো, সে-হাতখানা নিজের দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিতে পারলে সে খুশি হোতো। পুনরায় বললে, আচ্ছা, একটা কথা আজ দাও? আমি যদি কখনো তোমার বিরুদ্ধে শত্রুতা না করি, তুমিও করবে না—কথা দিয়ে যাও?

মীরা হাসলো। হেসে বললো, তুমি শত্রুতা সহজেই করতে পারো, বিমলদা—কিন্তু আমি কেমন ক'রে তোমার শত্রুতা করবো? তোমার নাগাল পাবো কেমন ক'রে? তোমার নামে কলঙ্ক রটালে তোমার পসার বেড়ে উঠবে! দেশের মাঝখানে যদি প্রমাণ করা যায় তোমার মতন চরিত্রহীন ভু-ভারতে নেই, অমনি দেখবে লোকসমাজে তোমার প্রতিষ্ঠা কতখানি। তোমাকে বলবে, বীরশ্রেষ্ঠ। সুতরাং এমন নির্বোধ আমি নই যে, তোমার নিন্দে রটিয়ে বেড়াবো—ওতে যে আমারই নিন্দে রটবে।

বিমলাক্ষ বললে, কিন্তু চিঠিগুলো তুমি যদি আমার স্ত্রীকে দেখাও?

যদি দেখাই তাতেও ভয় নেই। দিন দুই মন কষাকষি, দুচারদিন এক বিছানা থেকে অন্য বিছানায় ছাড়াছাড়ি,—একটু আধটু চোখ মোছামুছি। তারপর একদিন তিনি নিজেই পাশে এসে পাশ ফিরে শোবেন—যাতে তুমি হাত বাড়িয়ে তাঁকে টেনে নিতে পারো।

অত উত্তেজনার মধ্যেও বিমলাক্ষ যেন একটু হাসলো। সবিস্ময়ে বললে, তুমি এত কেমন ক'রে জানলে, মীরা?

মীরা বললে, বই প'ড়ে নয়, সিনেমা দেখেও নয়,—আমাদের চোখের সামনে ছিলেন কাকা আর ছোটখুড়ি! অপরাধ ছোটখুড়ির ছিল না, কিন্তু কাকার কলঙ্কে দেশ ভ'রে উঠেছিল। চলো এবার যাই।

বিমলাক্ষ বললে, এখন বাড়ি গিয়ে কি করবে? হিরণের জন্যে বুঝি মন ছটফট করছে?

মীরা থমকে দাঁড়ালো। বললে, তা'র নামটা তোমার মুখে আর নাই শুনলুম, বিমলদা?

বিমলাক্ষ হাসলো। বললে, আচ্ছা, তা'র কথা না হয় নাই তুললুম। কিন্তু ধরো, আজ যদি হিরণের একটা ভালো চাকরী হয়, তবে তুমি আমার ওপর খুশি হবে, মীরা?

কেমন ক'রে তা'র চাকরী হ'বে?

ধরো যদি আমিই ক'রে দিই?

মীরা বললে, তুমি ত' মেয়েদের চাকরী ক'রে দিয়ে তাদেরকে পোষ মানাও, পুরুষ মানুষের ক'রে দিলে তোমার কি সুবিধে?

বিমলাক্ষ একটু বিমর্ষকণ্ঠে বললে, মীরা, তুমি নিষ্ঠুর!

মীরা এবার হাসলো। বললে, আমি নিষ্ঠুর হ'লে কি তোমার অনুগ্রহ নিতুম, না এ ঘর পা দিয়ে মাড়াতুম?

তবে তুমি এমন ক'রে আমাকে চাবুক মারো কেন, মীরা?

মেয়েদের লোভ দেখাতেই চাও, তাদের হাতে মার খেতে ভয় পাও কেন?

তুমি কেমন ক'রে জানলে আমি মেয়েদেরকে লোভ দেখিয়ে বেড়াই?

মীরা সহাস্যে বললে, একখানা ব্যবস্থাপত্র দেখলেই অভিজ্ঞ ডাক্তারকে চেনা যায়, বিমলদা। তুমি সবচেয়ে নিচের নোংরা ঘাঁটো ব'লেই সব চেয়ে নোংরায় তুমি ভয় পাও না! তুমি বাবার ঋণশোধ করবে ব'লে আমার বিশ্রামের জন্যে ঘর সাজালে—এক এক বিচিত্র ঋণ শোধ! আমার স্বাস্থ্যর উন্নতির জন্য এ ঘরে ব'সে খেতে হবে, আর চেহারার খোলতাই হবার জন্যে রং পাউডার মাখতে হবে, এ নৈলে তোমার দেনা শোধ হবে না, এ যুক্তিও বিচিত্র বটে! আমার বাবার দেনাশোধ করবার জন্য আমাকে নিয়ে নাচানাচি করাটা কোন্ শাস্ত্রে লেখে বলো ত'? দেখলেই মনে হয় তোমার বহু অভিজ্ঞতা আছে! কেবল দেশী নয়, বিলেতী অভিজ্ঞতাও বটে!

বিমলাক্ষ বললে, তোমার জন্যে সামান্য কিছু করলে যদি আমি আনন্দ পাই, মীরা?

এ আনন্দের সংবাদ তোমার স্ত্রীর কানে উঠলে তিনি আনন্দ পাবেন কি?

কে বলতে যাচ্ছে তাঁকে?

মীরা এবার হাসলো। বললে, ছোটবেলা থেকে আমার কাকার উদাহরণ আমার চোখের সামনে থাকার জন্যেই এগুলো বুঝতে পারি। তোমার স্ত্রীকে লুকিয়ে তুমি আমার সঙ্গে দেখাশোনা করতে চাও, এই না?

বিমলাক্ষ বললে, অনেকটা তাই বটে।

মীরা পুনরায় বললে, এবং ভবিষ্যৎটা নিরাপদ রাখার জন্যে তুমি আমার কাছ থেকে সব পুরনো চিঠিগুলো ভুলিয়ে আদায় ক'রে নিতে চাও!

ভুলিয়ে কেন বলছ, মীরা? আমি ত' চেয়ে নিচ্ছি! কিন্তু তুমি এত রকমের কথা জানলে কেমন ক'রে?

আমার কাকার অনুগ্রহে। বছর পাঁচেক আগে কলকাতার এক ফিরিঙ্গী মেমসাহেব হঠাৎ কাকার নামে নালিশ ক'রে বসলো, কাকা তাঁকে আর্য সমিতির সাহায্যে বিয়ে করেছেন, কিন্তু খোরপোষ দিতে চাইছেন না।

তারপর?—বিমলাক্ষ আবার বসলো।

মীরা হেসে বললে, কাকাকে দশহাজার টাকা খরচ ক'রে এই কথাই প্রমাণ করতে হয়েছিল, মেয়েটি নাকি পতিতা!

মীরা!

মীরা পুনরায় হেসে উঠলো। বিমলাক্ষ বললে, মীরা, এত বড় অসৎ চক্রান্ত আমার ঘাড়ে চাপিয়ো না তুমি।

মীরা বললে, তুমি একটু তফাৎ। কাকা গিলতেন একগ্রাসে, তুমি শিকার হাতে পেয়ে রেখে-রেখে গিলতে চাও!

তার মানে, মীরা?

মানে সহজ! স্ত্রীর কাছে তোমাকে সাধু থাকতে হবে, ধর্মতলার পাড়ায় সুনাম বজায় রাখতে হবে, সমাজে রাখতে হবে বিলেত-ফেরতার প্রতিপত্তি, আমার কাছে দেখাতে হবে একান্ত আগ্রহের আতিশয্য! মানে সহজ! সাধু তুমি ঘরে, চরিত্রবান তুমি বাইরে! আমার কাকা নির্বোধ ছিলেন, তাই তিনি অনেক সময়ে নাজেহাল হতেন, অনেক সময়ে লাখ-দু'লাখ টাকা দিয়ে রেহাই পেতেন,—কিন্তু তোমার সে ভয় নেই! তুমি হলে ডাক্তার—তোমার হাতে আছে আধুনিক কালের বিজ্ঞান! গোড়া থেকেই তুমি হাত ধুয়ে রাখতে চাও, না বিমলদা? আমি রেফুজী মেয়ে, আমি চাকরী করি বাইরে, আমি একা এই শহরে, হয়ত আমি স্বামী-পরিত্যক্তা, হয়ত বা অসুখ বিসুখের জন্যে ডাক্তারখানায় আনাগোনা করতুম, কলকাতায় আমার কোনো স্থায়ী আড্ডা নেই,—অর্থাৎ আমাকে ঝেড়ে ফেলবার মতন সমস্ত অস্ত্রই তোমার হাতে রইলো, তাই না?—মীরা এবার খুব হাসলো। পুনরায় বললে চিঠিপত্রগুলো আমার হাত থেকে নিয়ে যেতে পারলেই তুমি নিশ্চিন্ত হও, কি বলো বিমলদা?

বিমলাক্ষ চুপ ক'রে কথাগুলো শুনলো! তারপর মুখ ফিরিয়ে বললে, এই আমার পাওনা, এ আমি জানতুম! চলো যাই।

মীরা পুনরায় বিছানার ওপর ব'সে পড়লো। বললে, না, যাবো না। আগে আমার কথাগুলোর জবাব দাও।

বিমলাক্ষ বললে, আগে থেকে আমার সম্বন্ধে তোমার একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়ে রয়েছে কি জবাব দেবো আমি?

স্পষ্ট ক'রে বলো তো, আমার বাবার দেনা শোধ করবার এই কি পন্থা?

তাঁর একমাত্র মেয়ে তুমি,—তোমাকে সাহায্য করলে তুমি যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারো, সে কি আমার কর্তব্য নয়? এতে কি পরলোকগত আত্মার তৃপ্তি হবে না?

মীরা হাসলো। বললে, কিন্তু এই খাট-বিছানা-আলমারি, ওই রান্নার সরঞ্জাম, ওই আয়না টেবল আমার জন্যে—আমাকে নিয়ে রোজ মোটরে বেড়ানো, ভালো হোটেলে গিয়ে বসা, মেমেদের নাচের আসরে আমাকে নিয়ে যাওয়া, সাহেবদের দোকানে গিয়ে শৌখিন উপহাব কিনে দেওয়া,—এতে ওই পরলোকগত আত্মার কিছু দুশ্চিন্তাও হ'তে পারে।

বিমলাক্ষ বললে, আমি কি তোমায় শুধু লোভ দেখাই মীবা?

মীরা বললে, না শুধু লোভ কেন পথও দেখাও। দাঁড়াবার পথ, বাঁচবার পথ, ভোগের পথ,—আমি ত' অস্বীকার করিনে। কিন্তু দুটোয় তুমি মিলিয়ে দিতে চাইছ। লোভ শুধু দেখাচ্ছ না, আমাব লোভকেও খুঁচিয়ে জাগাতে চাইছ। তুমি সূক্ষ্ম কাজ ক'রে যাচ্ছ আমার মনে। আমার মনের রাশ শিথিল ক'রে দিচ্ছ দিনে দিনে! নদীর তটের নীচে মর্মে মর্মে জল ঢুকছে, তলা আলগা হয়ে চলেছে। হঠাৎ একদিন পাড় ভেঙ্গে পড়বে।

বিমলাক্ষ বললে, তুমি যদি ঠিক থাকো তোমার ভয় কি, মীরা?

মীরা বললে, মেয়েদেরকে নিয়ে তুমি খেলাই কবেছ, কিন্তু চেনোনি তাদের। তারা স্বভাব-কৃতজ্ঞ। আমাকে ঠিক থাকতে দেবে তুমি? ঠিক থাকা কা'কে বলে? তুমি যা কবেছ এ কি আমার পাওনা? তুমি যদি নিঃস্বার্থভাবেই ক'রে থাকো, আমার কৃতজ্ঞতা-বোধ যাবে কোথায়? দানের বদলে প্রতিদান—এই ত' সম্পর্ক। তুমি চতুর, তাই হাত পেতে কোনো প্রতিদান চাও না। তুমি অত্যন্ত আত্মপ্রিয়, অপবের দিক থেকে গরজটা দেখতে চাও, মেয়েদের হাত থেকে চাও পূজা। তোমাদের মুখে চোখে আপাত বৈরাগ্যের একটা ভনিতা আছে, তোমার আসক্তিটা থাকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এটা তোমার জানা দরকার,—তোমার স্নেহ পাবার জন্য আমার মন জ্ব'লে পুড়ে যাচ্ছে। তোমার সব চেয়ে বড় শক্তি কি জানো, বিমলদা? নিজের সাংঘাতিক লোভ আর অসংযমটাকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তুমি কঠিন

বাঁধনে বেঁধে রাখতে জানো। তুমি এত উপমা দিয়েছ, আমি একটা দিই। পুকুরের মধ্যে আছে মস্ত এক রুইমাছ। ছিপ ফেলে ব'সে আছো তুমি। খাবার সে খেলে, ছিপে টান পড়লো,—কিন্তু সারাদিন ধ'রে তুমি সুতো টানলে আর হুইল আল্‌গা দিলে। রুই মাছ যাবে কোথায়—চারিদিকে পাড়ের বাঁধন, পালাবার পথ নেই। অবশেষে সন্ধ্যায় সেই ক্লান্ত প্রাণীটি প্রায় তোমার পায়ের কাছে সামান্য জলে এসে দাঁড়ালো। তুমি খেলতে চাইলেও সে আর পারে না,—তার ক্লান্ত শরীর-মন তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করে।

বিমলাক্ষ বললে, মীরা, তোমাকে নেহাৎ গ্রামের মেয়ে ব'লে জেনে এসেছি, প্রাইভেটে তুমি না হয় বি-এ পাসই করেছ। কিন্তু সত্যি হোক মিথ্যে হোক, পুরুষের চরিত্র সম্বন্ধে তোমার আশ্চর্য অভিজ্ঞতা।

হবে না কেন?—মীরা বললে, কাকা ছিলেন সামনে। হাতের কাছে ছিল হাসনুবানু। হাসনুবানু আমার বয়সী,—কিন্তু এর মধ্যে তিনবার সে স্বামী বদল করেছে।

বিমলাক্ষ বললে, হ্যাঁ, তিনবার বলেই শুনেছি! কিন্তু ওই কি নারী চরিত্রের আদর্শ, মীরা? পুরুষ বদল ক'রে বেড়ায় যারা, তাদের চল্‌তি ভাষায় কি বলে জানো?

মীরা হাসলো,—হাসনুর ওপর তোমার আক্রোশ আছে আমি জানি, বিমলদা। কিন্তু সাবধান, তোমার গায়েও লাগতে পারে?

আমি কোনো কালেই হাসনুকে বরদাস্ত করতে পারিনি।

কিন্তু তা'কেও ত' তুমি ভোলাতে চেয়েছিলে। সে সব চিঠিপত্র সবই আমার কাছে আছে। মুসলমানের মেয়ে হ'লেও হাসনুর ওপর তোমার অরুচি ছিল, এমন প্রমাণ ত' সে চিঠিপত্রে ছিল না? আচ্ছা, একটা কথা বলবো, বিমলদা?

বিমলাক্ষ বললে, কোন্ কথাটা তুমি বলতে বাকী রাখলে মীরা?

মীরা বললে, হাসনুকে আমার মতন চাকরী জুটিয়ে দিয়ে তার জন্যে এই নৈবেদ্য সাজাতে পারতে?

হাসনুর জন্যে?—বিমলাক্ষ শিউরে উঠলো,—আমার প্রাণের মায়া নেই? ওর চাবুকের শব্দে ঘর কেঁপে ওঠে। কোনো পুরুষ ওকে বরদাস্ত করতে পারে না, তাই ওকে তিনবার স্বামী বদলাতে হয়েছে। তুমি কি মনে করো, কোনো ভদ্রসমাজে হাসনু জায়গা পাবে? ঘৃণা করবে মুসলমান, ওকে ঘৃণা করবে হিন্দু। স্ত্রীলোকের জগতে ওর ঠাঁই হবে না,—শিক্ষিত মহলের অশ্রদ্ধা কুড়িয়ে বেড়াবে।

মীরা বললে, আরেকটু ভেবে বলো, বিমলদা!

ভেবেই বলছি, মীরা—বলতে ভয় পাইনে। তোমার হাসনু যে-ডালে বসে সেই-ডাল কাটে। যে-ঘরে আশ্রয় পায় সেই ঘরে আগুন জ্বালায়। যে-বন্ধু ওকে টেনে তোলে, সেই বন্ধুকে ও ডোবায়। আমি জানি মীরা, হাসনুই জ্যাঠামশাইয়ের ভালো চিকিৎসা হ'তে দেয়নি।

বিমলদা, মিথ্যে দুর্নাম রটিয়ো না। একথা তোমায় কে বলেছে?

বলতে দাও মীরা। আমি এও জানি, তোমরা আর যাতে হাজিপুরে ফিরতে না পারো—তা'র কৌশল আগে থেকে হাসনু ক'রে রেখেছে। জ্যাঠামশাই কা'কে বেশি বিশ্বাস করতেন? তোমাকে, না হাসনুকে?

হাসনুকে।

তা'র ফল খুবই ভালো হয়েছে। মালখানার চাবির কথা তুললে তুমি এখনই রেগে উঠবে, তা আমি জানি। কিন্তু আমি জানি, হাসনু দেখতে চায় তোমাদের শেষ, তোমাদের পরিণাম। দেখতে চায়, পশ্চিম বাঙ্গলার মরুভূমির পথ দিয়ে মরীচিকার পেছনে ছুটতে ছুটতে তোমরা বালুর তলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছ।

মীরার দৃষ্টিতে অত্যন্ত কঠোরতা ছিল, কিন্তু এই লোকটার ঘৃণ্য অভিমতের প্রতিবাদ করতে তার প্রবৃত্তি হলো না। শান্তকণ্ঠে কেবল বললে, তোমার কোনো কথাই শ্রদ্ধেয় নয়, বিমলদা। আমি শুধু এইটুকু জানলুম, যার পায়ে ধ'রেও একদিন তুমি কৃপাকণা পাওনি, আজ লোক-সমাজে তা'র নামে কলঙ্ক ছাড়িয়ে তুমি পরাজয়ের প্রতিশোধ নিচ্ছ।

বহুবার আঘাত সহ্য ক'রে বিমলাক্ষ একবার উত্তেজিত হয়ে উঠলো। ফস ক'রে বললে, একথা তুমি জানো মীরা, তোমার সঙ্গে হিরণের বিয়েটা তারই চক্রান্তে ভেঙ্গে যায়? তোমার কাছ থেকে হিরণকে হাসনুই দূরে সরিয়ে রেখেছে? হাসনুই তোমাদেরকে মিলতে দেয়নি, এ কি জেনেছ?

এ ভয়ানক মিথ্যে, বিমলদা! কিন্তু এ আলোচনা থাক্। আমি ভাবছি এই বোধ হয় তোমার শেষ অস্ত্র!—মীরা মুখ টিপে হাসলো।

তুমি জানো, হিরণকে নিয়ে হাসনু আজকাল যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়?

তুমি আমাকে নিয়ে যেরকম বেড়াও, এই ধরনের কি?

বিমলাক্ষ বললে, তোমার মনে কি ঈর্ষা-বিদ্বেষ নেই, মীরা? তোমার সম্পত্তি অপরে লুটপাট করলেও কি তোমার গায়ে লাগে না!

মীরা বললে, হিরণকে আমি নিজস্ব সম্পত্তি মনে করিনে!

তুমি কি তাকে এতটুকুও ভালোবাসোনি? কোনোদিন হিরণকে একান্ত আপন ব'লে মনে করোনি?

মীরার চোখ দুটো হঠাৎ জলজল ক'রে উঠলো, কিন্তু পলকের জন্য। তারপরই বললে, এবার মনের কথা শুনতে চাও নাকি? দাম দিতে পারো মনের কথার? যাক গে, আর নয়—আজ উঠি, চলো এবার।

রাত ন'টা বাজে বিমলাক্ষের হাতঘড়িতে। সেও উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চলো। কিন্তু কি যেন বলতে গিয়েছিলে তুমি?

মীরা বললে, হ্যাঁ, বলছিলুম একটা কথা। চলো, আগে নীচে নামি।

বিমলাক্ষ বেল্ বাজালো। ছটু চক্ষের নিমেষে ভিতরে এলো। বিমলাক্ষ বললে, দরজা বন্ধ ক'রে মায়িজির হাতে চাবি দে।—এই বলে মীরার সঙ্গে সে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

ছটু দরজা-জানালা—আলো-পাখা এবং সবশেষে তালাও বন্ধ ক'রে মীরার হাতে চাবি দিল। চাবিটা রইলো ভ্যানিটি ব্যাগে। বিমলাক্ষ কটাক্ষে সেটি লক্ষ্য ক'রে খুশি হলো। ছটুর সেদিনেব মতন ছুটি।

নিচে নেমে ডাক্তারখানা পেরিয়ে যাবার আগে হঠাৎ মীরা থামলো। বললে, ওই যা স্লিপারটা প'রেই যে নেমে এলুম! রাস্তায় জল-কাদা!

বিমলাক্ষ হেসে বললে, যে-বকম লাঞ্ছনা আজ কবেছ তা'তে আব মোটরে তোমাকে নিয়ে যাবার কথা বলতে ভরসা হয না।

মীরা বললে, তোমার বোকামি ভাঙিয়ে যদি গাড়ি চ'ড়ে নিতে পারি মন্দ কি? কিন্তু পায়ে যে স্লিপার!

যদি অনুমতি করো তবে আমার পকেটে রুমাল আছে। পায়ে কাদা লাগলেও অসুবিধে নেই!

দাঁড়াও—মীরা বললে, কী ওষুধ আছে যেন তোমার ডাক্তাবখানায়? ওই যে বললে, দু' মিনিটে ঘুমে চোখ জড়িযে আসে?

বিমলাক্ষ বললে, হ্যাঁ আছে। ওর নাম রেখেছি এ্যাটম্ বোমা! কেন বলো ত'?

মীরা বললে—যেদিন থেকে তোমার অনুগ্রহ নিয়েছি সেইদিন থেকেই ঘুমোইনে। একটা এ্যাটম্ বোমা আনো আমার জন্যে।

কিন্তু মীরা, ওটা ভয়ানক জিনিস,—তোমার পক্ষে—

তর্ক করো না,—শিগ্‌গির আনো।

অগত্যা বিমলাক্ষ ডাক্তারখানায গিয়ে ঢুকলো। আলমারীর চাবি খুলে গোপনীয় জায়গা থেকে কি যেন বার করে নিয়ে এলো। ডাক্তারখানার চাকর এক গ্লাস জল এনে সামনে দাঁড়ালো!

বর্ণের বাহার আছে ওই ছোট এ্যাটম্ বোমার। হাতে নিলে পিচ্ছিল

মনে হয়। ওটা মুখের মধ্যে ফেলে মীরা জল খেয়ে নিল। পরে বললে, চলো!

সত্যই ফুটপাতের ওপর জল-কাদা। পাতলা স্লিপার প'রে নামতেই পা-টা ভিজলো, কাদাও কিছু লাগলো। কিন্তু বিমলাক্ষ সামনে ট্যাক্সি দেখেই ডাকলো। দু'জনে উঠে বসলো ভিতরে। বিমলাক্ষ বললে, তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসবো, মীরা?

মীরা বললে, না।

তবে?

যতটুকু রাস্তা আমাকে পাশে রেখে ঘুরলে তোমার খরচ ওঠে, ততটুকু ঘুরিয়ে আমাকে এক জায়গায় নামিয়ে দিয়ো।

তোমাকে নামিয়ে দেবো পথে?—বিমলাক্ষ কেঁদে উঠলো, আর কত অবিচার করবে আমার ওপর মীরা? আচ্ছা, কথা দিচ্ছি, আর কোনোদিন হিরণের নাম উল্লেখ করবো না তোমার কাছে!

মীরার চোখের পল্লবগুলিতে দেখতে দেখতে মাদকের টান ধ'রে এলো। চোখের তারা দুটো কাঁপতে আরম্ভ করবে কি? মীরা একটু মাথা হেলিয়ে আরাম ক'রে বসলো। বললে, ওষুধের গুণে গাড়ির মধ্যে যদি ঘুম আসে?

আসবেই ত'!

এ এ্যাটম্‌বোমা তুমি নিজে গেলো, বিমলদা?

বিমলাক্ষ বললে, গিলি বৈ কি। তোমার বৌদিদি যেদিন আমার চরিত্রের কথা তুলে কান্নাকাটি করেন, সেদিন এক-আধটা খেয়ে থাকি। তাঁকে আবার মাঝে মাঝে আত্মহত্যার ভয় দেখাতে হয় কিনা!

ট্যাক্সি ময়দানের হাওয়ার দিকে চললো। কলকাতার ট্যাক্সিরা সওয়ারি চেনে। মীরা বললে, এবার ফিরিয়ে নিয়ে চলো।

কেন, ঘুম পেয়েছে খুব?—বিমলাক্ষ জানতে চাইলো।

মীরা বললে, ঘুম না, ঘুমের ভয়—পাছে তলিয়ে যাই।

বিমলাক্ষ বললে, এ্যাটম্‌বোমার গুণই হোলো ওইটে। অজ্ঞানের দিকে তলিয়ে যাবার ভয়। মীরা, এটা আর কোনোদিন খেয়ো না। এসব জিনিস কাদের জন্য জানো। যা'রা সিনেমা থিয়েটারে অভিনয় করে। সারাদিন সারারাত অনাচারের পর শেষরাত্রে যা'রা ঘুমোতে চেষ্টা ক'রেও পারে না। যা'রা অনিদ্রা রোগে মাথার চুল ছেঁড়ে, নিজের শরীর নখ দিয়ে আঁচড়ায়,—তাদের জন্যে। ভদ্রঘরের মেয়েরা এসব ছোঁয় না।

ট্যাক্সি ফিরলো বাড়ির দিকে। ময়দান থেকে বেরিয়ে তারা পূর্বদিকের চওড়াপথ ধরলো। মাঝে মাঝে গাড়ির মধ্যে আলো পড়ছে।

মীরার পায়ে স্লিপার, মীরা জানে। এক সময় সেই দিকে তাকিয়ে মীরা বললে, বিমলদা, মেয়েদের পায়ে ধরেছ কোনোদিন?

বিমলাক্ষ হেসে বললে, চিরদিন। স্বদেশে বিদেশে ওই ধ'রেই ত' আছি। ওই ধরেই ত' একদিন বৈতরণী পার হবো।

আমার পায়ের চেহারা কেমন, বলো ত'।

বেদানার মতো। শাদায় রাঙায় টসটসে।—বিমলাক্ষ তৎক্ষণাৎ বললে।

মীরা এবার জড়িত কণ্ঠে বললে, তুমি যে তখন বললে, আমার পায়ে কাদা লাগলে রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দেবে?

আমি কোনোদিন মিথ্যে কথা বলিনে, মীরা—এই ব'লে ক্ষিপ্রহস্তে পকেট থেকে সুগন্ধী রুমাল বা'র করে বিমলাক্ষ হেঁট হয়ে মীরার দুখানা পা সযত্নে মুছিয়ে দিল।

তালতলার গলিতে গাড়ি ঢুকলো। বিমলাক্ষ সহসা গাড়ির মধ্যেই মীরার ডান হাতের একটি আঙুল ছুঁয়ে ঝুঁকে বললে, মীরা—?

নিদ্রাজড়িত ক্লান্ত কণ্ঠে মীরা বললে, কেন? মুখখানা সরিয়ে কথা ব'লো।

ধরা গলায় বিমলাক্ষ বললে, আমার ওপর অবিচার ক'রো না মীরা।

নিমীলিতচক্ষে মীরা বললে, না করবো না। কিন্তু আজ এই পর্যন্তই থাক্। স্বীকার করছি, তোমাকে ঘৃণা করার শক্তি কমে গেছে।

গাড়ি এসে দরজায় থামলো! মীরার পা কাঁপছিল।—

১০

দিন চারেক আগে সুমিত্রা বিদায় গ্রহণ করেছেন। হাজিপুরের গ্রাম নাকি তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। সেখানকার শূন্য সিংহাসন তাঁর জন্য নিশ্চিত হয়ে রয়েছে, তিনি হাজিপুরের ছোটরানী! একথা তিনি পরিষ্কার জেনে গিয়েছেন যে, মীরা কোনোদিন হাজিপুরে আর ফিরবে না, পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তির ওপর তার আর কিছুমাত্র মোহ নেই, এবং সরকারী খাজনার ব্যাপারে সে একেবারে মাথা ঘামাতে প্রস্তুত নয়। সম্পত্তি যদি নিলামে ওঠে, তা'তেও তার কিছুমাত্র উদ্বেগ নেই। সুমিত্রা জেনে গেছেন যে, অতঃপর হাজিপুরে তাঁর অব্যাহত অধিকার থাকবে। তাছাড়া আবার সে-দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে, এখন আর কোন প্রকার ভয়ের কারণ নেই।

হিরণ একবার বলতে চেষ্টা করেছিল যে, সাতদিন ধ'রে একখানা গ্রামে আগুন জলেছিল, সে-গ্রাম যত বড়ই হোক, তার কি আর অবশিষ্ট কিছু আছে, ছোটখুড়িমা ?

সুমিত্রা জবাব দিয়েছিলেন, তুমি নিজে আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দল ধ'রে পালিয়েছিলে, হিরণ,—সুতরাং ওসব তোমারও শোনা কথা।

হাসনু নিজের চোখে দেখে এসেছে, ছোটখুড়িমা !

সুমিত্রা উচ্চকণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন, হাসনুকে তোমরা আজও বিশ্বাস করতে পারো, আমি পারি নে। ও অমন নিজের চোখে অনেক জিনিস দেখে যা সত্যি নয়। আরো একটা কথা মনে রেখো হিরণ, মুসলমানের মেয়ে হয়ে মুসলমানদের যে নিন্দে ক'রে বেড়ায়,—তার ঠাই এপারেও নেই, ওপারেও নেই। নিজের জাতকে যাঁ'রা কথায় কথায় ছোট করে, তারা স্বজাতির শত্রু ছাড়া আর কি ! হাসনুর কথা আর আমাকে বলে না, হিরণ—আমার অনেক শিক্ষা হয়েছে !

কিন্তু এতে হাসনুর নিজের স্বার্থ কি ?

কা'র কোথায় স্বার্থ, সব সময়ে চোখে দেখা যায় না ! তুমি কি বলতে চাও, হাসনু ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারতো না ভাসুরঠাকুরকে ? তুমি কি বলতে চাও হাসনু নিজে ফিরবে না কোনোদিন হাজিপুরে ? নিশ্চয় ফিরবে, নৈলে আমি ব'লে রাখলুম, আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে নই ! সে ফিরবে ব'লেই আগে থেকে আমার যাওয়াটা সে পছন্দ করে না। আমি একথা জানি, প্রজারা তার হাতে, সেরেস্তার লোকেরা তার কথায় ওঠে-বসে, নথিপত্রের খোঁজ-খবর তার মুঠোর মধ্যে, মালখানার সে কর্তা, এমন কি তালুকের নায়েবরা হাসনুর নাম বলতে অজ্ঞান। বলো ত', এর ভেতরকার রহস্য কি ? ভাসুরঠাকুরের বুকের ছাতি ছিল দরাজ, কিন্তু বুদ্ধি ছিল না !

পাশের ঘরে ব'সে হাসনু ছোটখুড়ির সব কথাই হাসিমুখে শুনেছিল। শেষকালে জীবেন্দ্রনারায়ণের প্রতি এই কটাক্ষপাতে সে উত্তেজিতও হয়ে উঠেছিল, কিন্তু বিদায়কালে ছোটখুড়ির সঙ্গে বিসম্বাদ করতে তার মন প্রস্তুত ছিল না। আজ অনায়াসে সিংহাসন লাভ করার জন্য যদি ছোটখুড়ির মনে মুসলমান-প্রীতি জেগে থাকে, তবে তার বলবার কি আছে। হাসনু চুপ ক'রেই বসে ছিল।

হিরণ বললে, ছোটখুড়িমা, আপনার কি ধারণা হাসনু এখান থেকে ঠিক সময়ে চ'লে গিয়ে হাজিপুরের বিষয়-সম্পত্তি নিজে দখল করতো ?

আমি থাকতে সেটি হবার জো নেই, এখান থেকেই আমি হাসনুকে

জানিয়ে যাচ্ছি। তাঁকে ব'লো, মুসলমানেরা নিজের স্বার্থ একটু ভোলে না। আমাকে নিয়ে তাদের কাজ হবে, এ তারা বেশ জানে। আমার গায়ের ওপর জমিদারের ছাপ আছে, এই ছাপটা দেখিয়ে তাদের রাজস্ব তারা ঠিকই আদায় করবে। আজও তাদের কাছে জমিদার আর ইংরেজ ব্যবসায়ী প্রিয়, সে তাদের নিজেরই স্বার্থ। তারা তোমাদের ওই সাধারণ লোকের তোয়াক্কাও রাখে না! ব'লো তোমার হাসনুকে।

এর পরে মীরা এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। হাসিমুখে সে বললে, তোমার খুব সাহস আছে ছোটখুড়ি, আমার কিন্তু নেই। তোমাকে সেখানে দেখবে কে শুনি? আমার চেয়ে তুমি কতই-বা বড়? ভয়-ডর নেই তোমার?

সুমিত্রা বললেন, গায়ের জ্বালায় যারা পূর্ববঙ্গের নিন্দে রটায়, আমি তাদের দলে নেই, মীরা। সেটা বাঘ-ভালুকের দেশ নয়! যাচ্ছি নিজের ঘরে, নিজের বাড়ীতে, নিজেকেই আমি দেখবো। নিজে ভালো হ'লে পৃথিবীতে মন্দ কেউ থাকে না।

কিন্তু ধরো যদি কোনো বিপদ-আপদ ঘটে? সেটা শহরে নয়—গ্রাম, মনে রেখো?

মরার চেয়ে গাল নেই, মীরা। সধবা যতদিন ছিলুম, ততদিন ভয় ছিল পাছে তোমার কাকার উৎপাতে অত্রির হাত ধরে পথে বসি। আজ যখন পথেই বসেছি তখন আর ভয় কিসের? এবার ত' পথ থেকে ঘরেই উঠে যাচ্ছি। কলকাতার নরকে আর কতদিন কিলবিল ক'রে বেড়াবো?

মীরা বললে, তুমি বিছানাপত্র, বাসন, হাতখরচ—এসব নিয়ে যাচ্ছ না কেন?

সুমিত্রা বললেন, তোমাদের জিদ আমার থাকবে না কেন? কিচ্ছু নোবো না আমি সঙ্গে,—শুধু নিয়ে যাচ্ছি পুজোর বাসন দু'চারটে। একেবারে খালিহাতে গিয়ে দাঁড়াবো, দেখি আমার হাত ভরে কি না! সাতদিন ধ'রেই না হয় আগুন জ্বলেছে, সাত বছর ধরে ত' আর জ্বলেনি! জমিদারের বাড়ীতেই না হয় আগুন দিয়েছিল, তাই ব'লে জমিদারি ত' আর জ্বলে পুড়ে যায়নি! জিনিসপত্র পুড়েছে, ধানক্ষেত পোড়ে নি। আমি আর কোনো বাধা মানতে চাইনে, মীরা।

মীরা বললে, রেল্লিকমশাই যাচ্ছেন তোমার সঙ্গে, ওঁকে তুমি কতদিন রাখতে পারবে?

উনি পৌঁছে দিয়েই চ'লে আসবেন। থাকবো আমি আর অত্রি, সেরেস্তার লোকেরা আছে, ঠাকুরবাড়ী আছে, তাছাড়া ওই বাবুইরা আছে,—খবর দিলেই আসবে। তোমরা এখানে সব ভুলে থাকতে পার, আমি পারিনে।

আমি কিছু চাইনে ব'লেই ভুলে থাকতে পারি, ছোটখুড়ি।

সুমিত্রা বললেন, আমি সব চাই। কোনো কিছু আমার আজো পাওয়া হয়নি ব'লেই আমি সব চাই। যা কিছু সব পাবার কথাই ছিল, হারাবার কথা ছিল না। স্বামীর কাছে সদ্ব্যবহার পেলে সম্পত্তি হারানোটা গায়ে লাগতো না,—কিন্তু এখন আমি চাই তা'র ক্ষতিপূরণ। সমস্ত সম্পত্তি হাতে নিয়ে বরং নিজের হাতে তচনচ করবো. সেও ভালো, তবু অন্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেড়াবো, এ আমার সইবে না।

মীরা বললে, বেশ, তুমি যাও, অত্রিকে আমার কাছে রেখে যাও।

কেন ?

অত্রির কোনো বিপদ-আপদ ঘটতে পারে ত'। ওই ত' চৌধুরী-বংশের শেষ ছিটেফোঁটো।

সুমিত্রা বললেন, এখানে হাসনুর কু-শিক্ষার মধ্যে অত্রিকে আমি রেখে যেতে পারবো না, মীরা। ছেলে যদি মানুষের বদলে জানোয়ার হয়ে ওঠে, তবে ছেলের কোনো দাম থাকে না। তা ছাড়া নিজের মাটিতে নিজের দেশে অত্রি মানুষ হবে—সেই ত' গৌরব।

স্টেশনে যাবার সময় হয়েছিল। বসন্ত প্রস্তুত হ'য়ে একখানা গাড়ী ডেকে আনলো। গাড়ীতে ওঠবার আগে অত্রি জামার হাতায় চোখের জল মুছছিল,—হাসনু সেটা লক্ষ্য করলো জানালার ফাঁক দিয়ে। নিজে গাড়ীতে ওঠবার আগে সুমিত্রা বললেন, হাসনু একথা যেন জেনে রাখে, মুসলমান রাজত্বেই আবার ফিরে যাচ্ছি বটে, কিন্তু মাটিটা আমার। জমিদারি কেড়ে নেওয়া যায়, মাটি কেড়ে নেওয়া যায় না। পৃথিবীর সব জিনিসেই আগুন লাগানো যায়, কিন্তু মাটি কখনও পোড়ে না। আমি সেই আমার শ্বশুরবাড়ীর মাটিতেই ফিরে চললুম। আয় বসন্ত—গাড়িতে ওঠ।

বড় এক গোছা চাবি ছোটখুড়ির হাতে দিয়া মীরা বললে, এই নাও মালখানার চাবি,—এতদিন হাসনুর কাছে ছিল। আমরা এখান থেকে সবাই কামনা করবো, তুমি যেন সব ফিরে পাও!

চাবির গোছা নিয়ে ছোটখুড়ি গাড়ীতে উঠলেন। গাড়ী ছেড়ে দিল। হিরণ আর মীরা চেয়ে রইলো পথের দিকে। গতকাল রাত্রে সুমিত্রা কথায়-কথায় বলেছিলেন, অহঙ্কার ছাড়লেই আমাদের দুঃখ ঘুচবে, মীরা। আমরা ওদের দয়া করি একথাটা ভুলতে হবে: ওরা চিরকাল আমাদের রসদ যুগিয়েছে,—একথাটা মনে থাকলেই অনেক ঝগড়া-বিবাদ মিটমাট হয়ে যেতো।

মীরা বলেছিল, তবে কেন হাসনুর সঙ্গে তুমি বিবাদ ক'রে যাচ্ছ, ছোটখুড়ি? একথা হাসনুও ত' এতদিন ব'লে এসেছে!

হাসনুর কথা আমি আর আলোচনা করতে চাইনে! ওকে আমার চেনা হ'য়ে গেছে! এই ব'লে সুমিত্রা ঘরে চ'লে গিয়েছিলেন। অত্রি এসে শোবার চেষ্টা করেছিল হাসনুর কাছে গতকাল রাত্রে, কিন্তু ওঘর থেকে সুমিত্রার কঠোর আহ্বানে সে আবার গিয়ে সুমিত্রার ঘরে ঢোকে। হাসনু নির্বাক কাঠিন্যের সঙ্গে সুমিত্রার এই আচরণ লক্ষ্য ক'রে সমস্ত রাত চোখ বুজে বিছানায় প'ড়ে ছিল। যাক্, আজ থেকে আর কোনো তর্ক রইলো না।

হিরণ দাঁড়িয়ে ছিল হাতের পাশে। মীরা মৃদুকণ্ঠে বললে, আর কিছু নয়, অত্রির ভবিষ্যৎটা অন্ধকার হ'য়ে যেতে পারে।

হিরণ কোন কথা বলতে পারলো না। পিছন থেকে এবার হাসিমুখে বেরিয়ে এলো হাসনু। ওর চোখ দুটো আঁচল দিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে ঘষা,—লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যায়।

মীরা বললে, হাসনু, তোর অহঙ্কার ধূলিসাৎ হোলো! চৌধুরী পরিবারকে এতদিন তুই কান ধ'রে ঘুরিয়েছিস, আজ থেকে তোর সেই গিন্নিপনা ঘুচলো! আমি খুব খুশী!

হিরণ এবার কথা বললে, আমিও খুশী।

হাসনু প্রশ্ন করলো, তুই খুশী কেন জামাই?

মালখানার চাবির গোছা তোর হাতে থাকতো, তাই তোর তোয়াক্কা রাখতুম,—আজ থেকে কি আর কেয়ার করবো তোকে?

হাসনু হঠাৎ তপ্তকণ্ঠে ব'লে বসলো, একটা গরীব মুসলমানের মেয়ের কাছে তোরা এতদিন বশ্যতা স্বীকার করে ছিলি, তোদের একটুও কি অপমান বোধ ছিল না?

মীরার কণ্ঠে উত্তেজনা এলো। বললে, বাবার কাছে কে বেশি আদুরে মেয়ে ছিল? তুই, না আমি? অপমান বোধ থাকবে কেমন ক'রে? বাবা কি তোর কথার অবাধ্য হতেন কোনোদিন? মৃত্যুকালে তোর মতামতেই ত' সায় দিয়ে গেছেন! বাবাই যদি বশ্যতা স্বীকার ক'রে থাকেন, তবে আমরা কোথায়?

হাসনু শান্তকণ্ঠে বললে, আমার গিন্নিপনা ঘুচলো, সেজন্য আমি সব চেয়ে খুশী মীরাদি। এবার থেকে আমারও মুক্তি! এবার আমিও তোমাদের কাছে থেকে ছুটি চেয়ে নেবো।

হিরণ্ বললে, আমারও আজ থেকে মুক্তি! আমারও ছুটি!

মীরা কটাক্ষ ক'রে বললে, আপনার বন্ধন ছিল কিসে?

ছিল! ওই চাবির গোছাটা যতদিন হাসনুর কাছে ছিল। ওটাই ছিল লোভের চাবিকাঠি।

মীরা বললে, কিসের লোভ?

হিরণ হাসলো। বললে, আপনার পাণিপীড়ন করতে পারলে ওই চাবির গোছাটাই ত' আসতো! ওটার নামই ত' রাজত্ব।

শোন্ রে হাসনু—মীরা হাসিমুখে বললে, আজ সকাল পর্যন্ত ওর নাকি রাজত্বের ওপর লোভ ছিল। কাকে কান নিয়ে গেল, ছুটুন তার পিছনে।

হিরণ বললে, না ছুটবো না। রাজত্ব যাকগে, এবার রাজকন্যের মন পেলেই আমি খুশি থাকবো।

হাসনু বললে, ভালো ক'রে চেয়ে দেখ্ জামাই, চাবির গোছার সঙ্গে রাজকন্যাও অদৃশ্য হয়ে গেল, রইলো এক বুড়ি-কুমারী। ওর মন পেয়ে তোর এখন আব লাভ কি? তোর জমার খাতা আগাগোড়াই শূন্য।

হিরণ বললে, তাই ত' এবার ছুটি চাইছি তোমাদের কাছে?

মীরা বললে, ছুটি নিয়ে কোথায় যাবেন?

বিক্রমাদিত্যের দেশে!

হাসিমুখে মীরা তার দিকে একবার তাকালো। তারপর বললে, উদ্দেশ্যটা বুঝলুম। কিন্তু যক্ষ-বিরহীর মতন চেহারাটা থাকলেও তার ভূমিকায় অভিনয় করাব মতো কিছু আছে কি?

হিরণ বললে, কেন? নেই কেন?

যার সঙ্গে একত্র মানুষ হওয়া যায়, তাকে নিয়ে কবিতা লেখা অত সহজ নয়।

মানসিক বিরহলোক তৈরী ক'রে নেবো। হিরণ ঘোষণা করলো।

তার মাঝপথে ওই মালখানার চাবির গোছাটা এসে দাঁড়াতো। মন্দাক্রান্তা ছন্দ দেশ ছেড়ে পালাতো আর মেঘদূত ব'লে যাকে আপনি ঘটক ঠাওরাতেন, সে আরেকখানা মেঘেব সঙ্গে চুলোচুলি বাধিয়ে আপনার মাথায় বজ্রাঘাত ক'রে চ'লে যেতো!—এই ব'লে মীরা হাসিমুখে সেখান থেকে চ'লে গেল।

অত্রিকে বিদায় দিতে গিয়ে কাল থেকেই ওদের মন ছিল ভারাক্রান্ত, আজ তারা চ'লে যাবার পর যেন অনেকটা হাল্কা মনে হচ্ছে। সমস্ত বাড়িখানা শূন্য,—সমস্ত বাড়িখানাই যেন অনিয়মে ভরা। ওদের জীবনের এখন আর কোনো দায় নেই, পারিবারিক শিকড় নেই, সাংসারিক ভিত্তি নেই। ওদের তিনজনের মধ্যে সান্নিধ্য আছে, সহযোগিতা আছে, কিন্তু সত্যই কোন বাঁধন নেই। হিরণ চুপ ক'রে আছে, কেননা তার জীবনে নিশ্চিন্ত কোনো সিদ্ধান্ত

খুঁজে পাওয়া যায়নি, মীরা চাকরি নিয়ে চুপ ক'রে আছে, কিন্তু তার ভবিষ্যৎটা নিজের কাছে এখনও স্পষ্ট হয়নি ; ওটা যেন অনেক পরিমাণে বিমলাক্ষর মুখ চাওয়া—যেটা ভাবতে ভয় করে। হাসনু চুপ ক'রে আছে,— কিন্তু তার মন পরিক্রমা ক'রে চলেছে নানা বিষয়ের আশেপাশে। সমুদ্রটা এখনও দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার তরঙ্গ-ভঙ্গের সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসটা কানে এসে লাগছে। অহরহই মন বলছে, সাগরতরঙ্গে ঝাঁপ দিতে হবে, নৈলে তার মুক্তি নেই।

আজকে মীরার অফিসের ছুটি, আসছে কালও ছুটি। অবসরটা ছিল অবারিত। মীরার মনে কোনো ক্লান্তি নেই, কেননা নতুন জীবনের নতুন একটা আস্বাদ আছে। এ বয়সে অনেক মেয়ের মনে অবসাদ আসে, অনেকে খুঁটি ধ'রে দাঁড়াতে চায়, অনেকের মনে অহেতুক অসন্তোষ। ভবিষ্যৎটা সম্পূর্ণ স্পষ্ট না হ'লেও চলতি কালটাই বা মন্দ কি ! হাজিপুরের অনড় সুখের নিরিবিলি বাসস্থান ভেঙে গেছে, কিন্তু এখানে নিত্য কলমুখরতার মাঝখানে নানাবসের আলোড়ন,—এতেই বা তার মন বিরূপ হবে কেন ? নগবের রাজপথের কত অপরূপ অঙ্গসজ্জা, কত বিচিত্র জীবনেব প্রবাহ, কত আশ্চর্য বর্ণের বাহার,—তার মাদকতা আছে বৈ কি।

মীরা শুয়ে ছিল, সহসা উঠে বসলো। গলা বাড়িয়ে ডাকলো, ঠাকুর ?

ঠাকুর রান্না করছিল, সাড়া দিয়ে একটু পরে এসে সামনে দাঁড়ালো। মীরা প্রশ্ন করলো, ঠাকুর, তোমার মনে বেড়াবাব শখ নেই ?

হঠাৎ ঠাকুর একটু আড়ষ্ট হয়ে বললে, আজ্ঞে দিদিমণি—

আছে কিনা বলো ?

আজ্ঞে, সারাদিন কাজ—কখন বেড়াবো ?

এক্ষুনি ! ব'লে মীরা উঠে বাইরে এলো। হঠাৎ জোয়ার এসেছে তার মনে, ঘরে আজ স্থির থাকতে দেবে না।

পাশের ঘরে হাসনু একখানা মোটা বই নিয়ে শুয়েছিল, আর ঘরের ওপাশে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে হিরণ। মীরা এসে বললে, তোরা যেন আধমরা হয়ে পড়লি,—চল, তোদের বেড়িয়ে নিয়ে আসি ! হৃদয়ের কারবার কিছুকাল বন্ধ রাখ দেখি ? চল্, খাবার দাবার সঙ্গে নিয়ে পিক্‌নিক্ ক'রে আসি !

যে-ব্যক্তি এতক্ষণ অঘোরে ঘুমোচ্ছিল, সে হঠাৎ স্পষ্টস্বরে বললে, আমি কিন্তু একা একা পাহারা দিতে পারবো না।

মীরা বললে, আপনি মেয়েছেলের ঘরে ত' বেশ দিব্যি ঘুমের ভান ক'রে প'ড়ে থাকেন ? ভাগ্যি কোনো বেফাঁস কথা বলিনি ?

হাসনু বললে, আচ্ছা, হিরণ যদি আমাদের সঙ্গে গিয়ে কবিতা শোনায় মন্দ কি!

মীরা বললে, পিকনিকের রসভঙ্গ। বেশ, উনি চলুন, ঠাকুরের বদলে উনি খাবারদাবারগুলো নিয়ে যাবেন। সেখানে পরিবেশন ক'রে আমাদের খাওয়াবেন, বাসন ধোবেন—আমার কোনো আপত্তি নেই।

হিরণ এবার উঠে বসলো। হাসিমুখে বললে, সেবা আদায় ক'রে নিতে চান—এই ত'? অনেক মেয়ে আছে, পুরুষকে খাটিয়ে নিয়ে সুখ পায়, পায়ে ধরিয়ে পায় আনন্দ। অনেক মেয়ে আছে, ঠাকুর চাকরের কাছে শারীরিক লজ্জা পায় না। অনেক বৌদিদি আছে, দেওরদের দিয়ে গোপনে ফাই ফরমাস খাটালে তৃপ্তি বোধ করে। অনেক মেয়ে আছে, পুরুষের গলা টিপে নিচে নামাতে পারলে খুব পুলকিত হয়। এগুলোকে মনোবিশ্লেষণের কোঠায় ফেললে দেখা যায়, এ একপ্রকারের সম্ভোগ। বেশ ত,' যক্ষবিরহীর ভূমিকায় নাও যদি মানায়, কিঙ্করের ভূমিকায় মানাবে ত'? সেই কাজই না হয় নেবো?

হাসনু বললে, এমন বেহায়ার সঙ্গে তুই পেরে উঠবিনে, মীরাদি। তার চেয়ে আমি বলি, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া যাক।

মীরা মুখ টিপে হেসে বললে, বরং এক কাজ করা যাক, হাসনু—আমি বলি খাওয়াদাওয়ার হাঙ্গামা ক'রে আর দরকার নেই। ওকাজ সেরে চল্ দুজনে বেরিয়ে পড়ি। ওঁকেও তাহ'লে খাবার বইতে হয় না। আমরাও একলা বেড়িয়ে গায়ে হাওয়া লাগাতে পারি।

হিরণ বললে, কিন্তু সে-ক্ষেত্রে মেয়েছেলের ভার বইবে কে? দুটি সরস বয়সের তরুণী হঠাৎ সব বাঁধন খুলে যদি ট্যাক্সি নিয়ে ভেসে পড়ে, তবে পুরুষজাতির পক্ষে কত বড় লজ্জার কথা? একটা দুর্বিপাক যদি ঘটে, আমি ছাড়া দেখবে কে?

হাসনু বললে, কিন্তু তুই নিজে যদি আমাদের দুজনকে দুর্বিপাকে টেনে নিয়ে যাস, আমাদের বাঁচাবে কে?

সেটা কি প্রকার দুর্বিপাক?

মীরা বললে, খবরের কাগজে যাকে বলে, অসদভিপ্রায়।

হিরণ বললে, এ কথাটা এতকাল মনে আসেনি কেন আপনার? কোন্ অভিজ্ঞতা থেকে কথাটা তুললেন?

মীরা মনে মনে একটু চমকে উঠলো। বললে, পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস করতে নেই!

খুশী হলুম আপনার কথায়। আমাকে পুরুষ ব'লে আজ প্রথম স্বীকার করেছেন। এবার হয়ত ক্রমে একথাও স্বীকার করবেন যে, আমি সুপুরুষও বটে!

হাসনু বললে, তুই থাম হিরণদা, পুরুষকে রূপবান বলতে গেলে আমাদের দাম থাকে না, তা জানিস?

কিন্তু রূপবান যদি সে সত্যিই হয়?

তাহ'লে সেকথা তার কানে কানে স্বীকার করতে পারি,—অর্থাৎ যেন আর কোনো পুরুষ না শোনে।

হিরণ খুশী হয়ে উঠে পড়লো। বললে, যা, আজকের পিকনিকের খরচটা আমিই দেবো। আর নয়ত ট্যাক্সিভাড়াটা!—মীরার দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে পুনরায় বললে, গোটা পঞ্চাশেক টাকা ধার দিন ত'?

মীরা বললে, ধার শুধবেন কেমন ক'রে?

বিয়ের যৌতুক আদায় হ'লে দেবো,—দিন্।

বিয়ে কা'র সঙ্গে?

ভারতবর্ষের আঠারো কোটি মেয়ের একটির সঙ্গে! হিন্দু-মুসলমান কিছু বাদবিচার করবো না!

মীরা বললে, হাসনুকে আপনি বিয়ে করুন না কেন?

হাসনু হাসিমুখে তাকালো। হিরণ বললে, মালখানার চাবির গোছাটা ছেড়ে না দিলে প্রস্তাবটি ভেবে দেখতুম্।

হাসনু বললে, কিন্তু তুই যে বলিস্, লক্ষ্মীকে বিয়ে করে মাড়োয়ারী, আর সরস্বতীকে বিয়ে করে বাঙ্গালী?

হিরণ বললে, সরস্বতীকে হাতে রেখেই লক্ষ্মীর কথা ভাবছিলুম!

মীরা ও হাসনু হাসতে হাসতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ওদের কোনো দায় নেই ব'লেই দুঃখ নেই। ওদের মনে এ যুগের সংশয় কিছু বাসা বেঁধেছিল বৈকি, যেটার আত্মপ্রকাশ ঘটছে এই এক বছরে। বৈষয়িক জীবনে মার খেয়েছে, ব্যবহারিক জীবনে অসুবিধা ঘটেছে, কিন্তু সেটা কি ওদের মর্মস্থলে পৌঁচেছে? ওদের বিলাসের কেন্দ্রটা ভেঙ্গে পড়েছে, যেটা লোভের বাসা, যেটা সুরক্ষিত স্বার্থের একটা স্থায়ী সংস্থা—সেটা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। তার জন্য বিক্ষোভ যদি বা কিছু ছিল, দুঃখ আছে কি কিছু?

কিন্তু আর একটা কথা উঠেছে ওদের মনে, যেটা চল্‌তি সংস্কারের বিরোধী, ঘর ভাঙলো তা'দের চিরকালের মতন, তার সঙ্গে আর যা-যা

ভাঙলো সেদিকে চোখ পড়ছে কি? তা'র জন্য বেদনাবোধ আছে কি কা'রো? স্থিতিস্থাপকতার মানে কি? পারিবারিক জীবনটা কিসের ওপর থাকে দাঁড়িয়ে? ওর ভিত্তি স্নেহ,·· না স্বার্থ? ওর ভিত্তি রক্তের সংস্রব, না অর্থনীতির গোড়ার কথাটা! মানুষের মনে একালের অশান্তির মূল কারণটা কি? দুঃখের জন্ম হচ্ছে লোভের থেকে, না ব্যর্থতার থেকে? যাদের কিছু নেই তাদের বিক্ষোভে আজ কানে তালা লাগছে, সুতরাং যাদের আছে তারাও ত' শান্তিতে নেই!

মাঠের ধারে পায়চারি করতে করতে হাসনু বললে, শুধু আমরা কিছু বিশ্বাস করিনে, এই মাত্র। আমরা বিশ্বাস করিনে যে, মানুষ মন্দ, মানুষ নীচ। মানুষের মধ্যে শয়তানের বাসা একথা ব'লেছে কা'রা? কা'রা এতকাল ধ'রে রটিযে এসেছে হিংসা কেবল বর্বরের ধর্ম? তোর আমার রক্তের মধ্যে হিংসা নেই? কিন্তু কই, আমরা কি সত্যই বর্বর?

আষাঢের শেষ দিকে আজ আকাশ পরিষ্কার হয়েছে, কয়েকদিনের পর রোদ ছিল মাঠে, খুবই চড়া রোদ। ওরা চলেছিল এক আমবাগানের ধার দিয়ে। অপবাহ্নেব এখনও অনেক বিলম্ব, দিনমানের এ সময়ে বেড়িয়ে বেড়াতে পারে একমাত্র ওরাই—যারা সমস্ত ব্যবস্থাটাকেই একরূপ তচনচ করে দিয়েছে।

হিরণ বললে, কথাটা দাঁড়ালো বর্বর কিনা। হাসনুর মনে অভিমান আছে, ওর নাকি সংস্কৃতিলাভ ঘটেছে, ওর ধারণা ও নাকি বর্বর নয়। ওর ধারণা হাজিপুরের বাড়িতে যারা আগুন লাগিয়েছিল তার অজ্ঞান, কিন্তু বর্বর নয়। ছোটখুড়িমা যা ব'লে গিয়েছেন, এখন দেখছি বর্ণে বর্ণে সত্যি!

সুমিত্রার উল্লেখমাত্রই অলোচনাটা ঘুরে দাঁড়ালো। এখানে আসে অন্য কথা। তিনি ব'লে গেছেন, হাসনু আর হিরণ যে বিদেশে যেতে চাইছে, এ আমি ভাল মনে করিনে, মীরা। ও মেয়ে পারে না হেন কাজ নেই!—তুই কি জবাব দিলি, মীরাদি?

বললুম, ছোটখুড়ি, তুমি কি মনে করো এতে আমার কপাল পুড়লো?

ছোটখুড়ি বললেন, জামাই না হয হয়নি হিবণ, কিন্তু ও ছাড়া জামাই হবেই বা কে? অবিশ্যি হিরণকে আমি দেখছি চোদ্দ বছর ধ'রে,—ডাইনীর ফাঁদে পা দেবে ব'লে মনে করিনে!

তুই কি বললি?

আমি বললুম, ফাঁদে পা দিলেও আমার দুঃখ নেই, ছোটখুড়ি! বিয়ে আমি করবো না।

ছোটখুড়ি বললে, বিয়ে করবিনে? দুটো জীবন মাটি হবে?

বললুম, বিয়ে না করলে মাটি হবে, কিন্তু বিয়ে করলে যদি পাঁক ঘুলিয়ে ওঠে ?

হিরণ চুপ ক'রে শুনছিল। এবার বললে, পাঁকটা কিসের ? আমি লিখতুম কবিতা, আর আপনি করতেন চাকরি—পাঁক ঘুলোতো কেমন ক'রে ?

মীরা বললে, আমি কি চিরকাল আপনাকে এনে খাওয়াতুম ?

কিছুকাল খাওয়াতেন না হয় ? তারপব আমার কবিপ্রতিষ্ঠা হ'লে গড় গড় ক'রে টাকা আসতো ? অবস্থা ফুলে-ফেঁপে উঠতো, আপনার নামে কাব্যগ্রন্থগুলো উইল ক'রে দিতুম ? আর চিরকাল খাওয়ালেই বা দোষ কি ছিল ? কেউ খায়, কেউ-বা খাওয়ায় !

হাসনু বললে, তা হ'লে তোদের মধ্যে এই চুক্তিই থাক। হিরণেব অবস্থা ভালো হ'লে তোকে আর চাকরি করতে হবে না, মীরাদি ! তখন না হয় বিয়ের কথাটা তোলা যাবে ?

তিন জনেই খুব আনন্দে হাসলো। মীরা বললে, চল ভাই, আর আমি হাঁটতে পাচ্ছিনে।

বসবি কোথাও ?

না, বড় রাস্তার দিকে চল্।

হাঁটতে হাঁটতে হিরণ বললে, আমাদেব যাবাব দিনটা এবার ঠিক করা যাক্ হাসনু—আর কিন্তু ভালো লাগছে না।

হাসনু বললে, খুড়িমার 'আশঙ্কা দেখে আমি যে আর ভরসা পাইনে, জামাই ! তোকে সঙ্গে নিলে যদি মীরাদির কপাল পোড়ে ?

মীরা হেসে বললে, ওরে পোড়াকপালি, চাকবিটা বজায় থাকলে পোড়া কপালের দাগ ঠিকই সারিয়ে নিতে পারবো, মনে রাখিস।

হিরণ বললে, আশ্বস্ত হলুম। বড় গাছে নৌকা বাঁধা থাকলে নৌকো ডুববে না, এ ভরসাও রইলো।

মীরা বললে, হুঁ। গাছটা না হয় বুঝলুম, কিন্তু বড় গাছটা কি ?

হিরণ ফস্ ক'রে জবাব দিল, ধরুন, বিমলাক্ষ ডাক্তার ! যে-ব্যক্তি আপনার চাকরি ক'রে দিয়েছে ? যে-ব্যক্তির ওপর এককালে আপনার অসীম ঘৃণার কথা সকলের জানা ছিল !

দেখতে দেখতে মীরার মুখখানা রাঙা টকটকে হয়ে এলো। সে বললে, বিমলাক্ষ আমার চাকরি ক'রে দিয়েছে, একথা আপনাকে কে বললে ?

হিরণ জবাব দিল, আপনার ওই মস্ত সরকারি আপিসে এমন ব্যক্তি আছে যে হোলো বিমলাক্ষর জ্ঞাতি-ভাই—এবং আমার সহপাঠী। হঠাৎ সেদিন

বন্ধুর মুখে আপনাদের গল্পটা শুনলুম। শুনতে শুনতে ভান ক'রে রইলুম আমি আপনাকে চিনিনে। আজকালকার সিনেমা-দেখা ছেলেরা কোন্ ভাষায় মেয়ে-পুরুষের গল্প করে, একি আপনার জানা আছে?

থাম্ তুই, হিরণদা,—হাসনু এবার ধমক দিল,—তিলকে তাল করিসনে। মাংসখণ্ড পাবার আগে পর্যন্ত কুকুরেরা ডাকে, তারপর যখন ল্যাজ নাড়তে থাকে, তখন তাদেরকে বলা চলবে না, সুসভ্য কুকুর। মেয়েরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করলে হিংস্র দাঁত কা'রা বার করে? নিশ্চয় মেয়েরা নয়! বিদ্বেষ থেকেই আসে ব্যঙ্গ আর নিন্দে,—যেটা করে মানুষ; বিদ্বেষ থেকেই আসে হিংস্রতা—যেটা করে কুকুর! বলিস তোর বন্ধুকে।

শান্তকণ্ঠে হিরণ বললে, আমি ক্ষমা চাইছি। একসঙ্গে একবাড়ীতে থেকে এতকাল মানুষ হয়েছি, সেজন্যে অনেক সময় অধিকারের বাইরে গিয়েও কথা বলি। যে-কথাটা আপনি এতদিন প্রকাশ করতে চাননি, সে-কথাটা আমার মুখ দিয়ে প্রকাশ পাওয়াটা আমার অসভ্যতা হলেই মনে করি।

হাঁটতে হাঁটতে একসময়ে মীরা থামলো। বললে, স্বীকার করি, আমার চাকরি পাবার ব্যাপারটা প্রকাশ করতে লজ্জা পেয়েছিলুম। কিন্তু আপনার ওই বন্ধুর মুখে শোনা গল্পটা কি? গল্পের আদি অন্ত আছে নিশ্চয়? একটু ফলাও ক'রে বলুন ত' শুনি?

হাসনু হললে, মীরাদি, তুই কেন অজ্ঞান হোস? গল্প কেন ফাঁদবে না? তোর যে সর্বনেশে রূপ! সর্বনেশে মুখের চেহারা যে তোর! আশ্চর্য, আমাদের স্বাস্থ্য ভাঙবে কবে? কবে শুকিয়ে শীর্ণ হবে? কবে যাব ঝ'রে? এত রেফুজী রোগে ভুগে মরে, অথচ আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখো দিনে দিনে! ভদ্র সমাজে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শরীর আড়ষ্ট হয়! বিশ্বাস করতে চায় না কেউ যে, আমরা সর্বহারা!

হিরণ হাসলো। হেসে মীরার দিকে চেয়ে বললে, আর কিছু আমার কাছে শুনতে চাইবেন না। গল্প যদি কিছু থাকে, আপনাদের মধ্যেই আছে,—আমার আলোচনার দরকার নেই!

মীরা বললে, আমার চাকরি যে ক'রে দিয়েছে তার ওপর আপনার হিংসে হয় না?

আপনি যাকে ঘৃণা করেন সে আমার ঘৃণ্য হতে পারে, কিন্তু তার ওপর আমার হিংসে হবে কেন?

মীরা পুনরায় বললে, যে ব্যক্তি আমার চাকরি ক'রে দেয়, সে কি আমার সত্যিকার বন্ধু নয়? তা'কে অযথা ঘৃণাই বা করবো কেন?

হিরণ বললে, আমিই বা তা'কে হিংসে করতে যাবো কেন? সে-ত' আমার কোনো ক্ষতি করেনি? তা ছাড়া আপনার ঘৃণা যে কমে গেছে,. একথা বুঝতেই বা আমার দেরি হবে কেন?

ও, একথাও আপনি বুঝতে পেরেছেন? ধন্য বুদ্ধিমান আপনি! মানুষ আপনি হ'তে পারেন নি বটে, কিন্তু পাকা গোয়েন্দা হয়ে উঠেছেন দেখছি!

হঠাৎ উত্তেজনা এলো হিরণের কণ্ঠস্বরে। বললে, নিজের খবর আপনি নিজেই দেন্, আমার গোয়েন্দা হবার দরকার নেই। জুতো প'রে অফিস যান আর স্লিপার প'রে বাড়ী ফেরেন। সেদিন অত রাত্রে বিমলাক্ষ মোটরে আপনাকে বাড়িতে পৌছে দিল, আপনি দেওয়াল ধ'রে-ধ'রে টলতে টলতে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। অত রাত্রে আপনার জন্যে কে আলো জ্বেলে দিয়েছিল? সদর দরজা থেকে আপনার একপাটি স্লিপার কে কুড়িয়ে এনে গুছিয়ে রেখেছিল ঘরে? লজ্জার সঙ্গে আর একটা কথাও স্বীকার করি, কিছু মনে করিসনে হাসনু, রান্নাঘর থেকে খাবার নিয়ে ওঁকে খাইয়ে দিতেও হয়েছিল। রাত তখন বারোটা, ছোটখুড়ির দরজা বন্ধ, তোব নাক ডাকছিল!

বিবর্ণ মুখে মীরা পাথরেব মত দাঁড়িয়ে রইলো!

হাসনু বললে, কে খাইয়ে দিলে? তুই, না ঠাকুর?

হিরণ বললে, ঠাকুর ত' চ'লে যায় সন্ধ্যের পর।

যাক্ বাঁচলুম।—হাসনু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। পুনরায় বললে, মীরাদি, এবার কিন্তু জামাইকে যক্ষ-বিরহীর ভূমিকায় ঠিক মানিয়েছে। তোর ফিরতে দেরি হ'লে ও যে রাত বারোটা পর্যন্ত জানলার ধারে ওৎ পেতে ব'সে থাকে, একথা কে জানতো?

মীরা ধীরে ধীরে চলতে লাগলো, কোন কথার জবাব দিল না। শুধু হাসির অন্তরালে হাসনুর সমগ্র অন্তর বিমলাক্ষর প্রতি ঘৃণায় রি রি করতে লাগলো।

বাড়ি ফিরে এলো তারা সন্ধ্যার পর। পরস্পরের সম্পর্কটা যেন এতকাল পরে আজ প্রথম গ্লানিতে ঘুলিয়ে উঠেছে। কোথায় একটা মস্ত ভুল থেকে যাচ্ছে। সেটা বুঝতে পারছে না মীরা, ধরতে পারছে না হিরণ। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করতে পারছে না হাসনু। তাদের আলগা বাঁধন, ঢিলা সম্পর্ক, শিথিল ওদের মন,—এইটেই হোলো ওদের বর্তমানের প্রতিক্রিয়া। ওরা দ্রুত নেমে চলেছে নীচের দিকে—একেবারে সকলের নীচে, যে-ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে আজ সর্বহারার দল। বিষয়বৈভব নিশ্চয়ই মানুষের সব নয়,—আরো আছে কিছু যা দেখা যায় না। চরিত্রের দৃঢ়তা, মনুষ্যত্বের আদর্শ, স্বভাবের সৌন্দর্য, জ্ঞানের শুচিতা,—এগুলো শুধু কথার কথা নয়,—সর্বহারার

দল এগুলোকেও হারিয়ে এসেছে কি? হাসনুর চোখে কান্না এলো। এই শতাব্দীতে আলো আর কোথাও জ্বলবে না,—এই বেদনাময় সংবাদটা সে আজ কা'কে জানাবে? উৎপীড়িত মানবাত্মার চোখ দিয়ে জল গড়াবে এই শতাব্দীতে—এই তার দিব্যদৃষ্টি! জ্ঞানী কাঁদবে, গুণী কাঁদবে, কাঁদবে মূঢ় আর অজ্ঞান, সভ্যতার যারা কর্ণধার, হিংসার যারা অবতার,—তারাও কাঁদবে কোনো তপোবনে যদি কোথাও সত্যদ্রষ্টা ঋষি থাকে, কোনো রক্তাক্ত রণক্ষেত্রে যদি কোথাও থাকে জ্ঞানযোগী সেনাপতি,—তারাও কাঁদবে। যুগান্তের এই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে একথা কি জানা যায়, কোথাও জন্মগ্রহণ করেছে এক দেবশিশু—যে একদিন বিরাট পুরুষ হয়ে এসে দাঁড়াবে এই শতাব্দীর প্রান্তে? যার একহাতে সংহতি, অন্যহাতে সমন্বয়। সংশয়, ভয়, দুঃস্বপ্ন, নৈরাশ্য, অজ্ঞান অধঃপতনের থেকে সর্বশক্তিমান সে-পুরুষ তুলে ধরবে এই শতাব্দীকে? কোথাও জন্ম নিয়েছে কি সে? আদর্শ বিরোধের এই অন্ধ উন্মাদনা—এই আঁধারাচ্ছন্ন যুগগর্ভের থেকে সেই জ্যোতির্ময় দেবশিশু কোথাও ভূমিষ্ঠ হয়েছে কি? হাসনুর চোখে কান্না এলো।

চোখ মুছে হাসনু উঠে এলো এ-ঘরে। ভিতরে আলো জ্বালা নেই। কিন্তু অন্ধকারে জানলার ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে হিরণ, আর এধারে ভাঙা নড়বড়ে তক্তাখানার ওপর উপুড় হ'য়ে রয়েছে মীরা।

হাসনু প্রশ্ন করলো, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কেন? হয়েছে কি?

হিরণ বললে, উনি বোধ হয় চোখের জল ফেলছেন!

বটে! মেয়েমানুষের চুলের ঝুঁটি ধরে তুলে চোখের জল মুছিয়ে দিতে জানিসনে?

তোর স্বামীদের কাছে ওটা শিখে নিলে পারতুম!—হিরণ জবাব দিল!

হাসনু হাসিমুখে তক্তার ওপর ব'সে মীরার গায়ে হাত রাখলো। তারপর বললে, তোদের নিয়ে কি করি বল্‌ত? আমাকে কি কোথাও যেতে দিবি নে? কোনো কাজ করতে পারবো না তোদের জন্যে?

মীরা মৃদুকণ্ঠে বললে, এ বাড়ি তুই ছেড়ে দে, হাসনু!

ছেড়ে দিলে যাবি কোন্ চুলোয়?

তুই দেশে চলে যা। আমি আমার ব্যবস্থা ক'রে নেবো।

হাসনু বললে, আর হিরণ?

হিরণ নিজেই জবাব দিল। বললে, আমি রেফুজীর টিকিট নিয়ে ক্যাম্পে চ'লে যাবো। আর নয়ত সরকারি টাকা ধার করে কোনো বস্তির ধারে পান-বিড়ির দোকান দেবো!

হাসনু বললে, বেশ, সেই ভালো। আমাকে এবার ছুটি দে, মীরাদি! আমি চলে যাই, কেননা আমার পথ আলাদা। আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাইনে, আমি চাই ভেসে যেতে। আমার কানে আছে জ্যাঠামশাইয়ের মন্ত্র! সেই মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন! আমি স্বামী চাইনে, অর্থ আমার দরকার নেই, ঘর আমার কাজে লাগবে না! বেশ, তোরা যখন কিছুতেই মিলতে পারলিনে, তখন এ বাড়ি ছেড়েই দে। তোদের নিয়ে আর আমি পারিনে! কতকগুলো টাকা তোদেরই জন্য আমি এনেছিলুম, মনে করেছিলুম তোদের ঘর এখানে গুছিয়ে দিয়ে জ্যাঠামশাইকে নিয়ে আমি দেশে চ'লে যাবো। জ্যাঠামশাই মারা গেলেন, ছোটখুড়ি রাগ ক'রে চ'লে গেল, আর এদিকে তোদের এই দশা। বি-এ পাশ ক'রে তুই শিখলি একগুঁয়েমি, আর এম-এ পাশ ক'রে ও দেবে বিড়ির দোকান। এই তোদের কপালে ছিল!

হিরণ বললে, তুই পান সাজবি আর আমি বিডি পাকাবো!—আধা-আধি বক্‌রা! আমার হাত থেকে তোর ছুটি নেই!

হাসনু বললে, রাত বারোটায় দোকান বন্ধ ক'রে দুজনে যাবো কোথায়?

হিরণ বললে, যে-কোনো গর্তে গিয়ে ঢুকবো দুজনে। তুই বার দুই-তিন বিয়ে করেছিস, সুতরাং তোর সতীত্বের কথা ওঠে না, আর আমার যখন স্বামী হবার কোনো যোগ্যতাই নেই তখন আমার চরিত্ররক্ষার কথাও উঠবে না।

হাসনু বললে, কিন্তু আমি যে দেশে ফিরে যাচ্ছি।

আমি সঙ্গে যেতে পারিনে তোর আঁচল ধ'রে?

হাসনু মীরার গা ঠেলে বললে, কি মীরাদি, এ প্রস্তাবে রাজি আছিস?

মীরা উঠে বসলো। বললে, সর্বান্তঃকরণে!

১১

ভোরের একখানা ট্রেন—বোধহয় ডাকগাড়ি—ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল সমস্ত স্টেশনকে কাঁপিয়ে দিয়ে। ওয়েটিং রুমের মধ্যে বড় আয়না টাঙানো ছিল, তার সামনে দাঁড়িয়ে দুই হাত পিছন দিকে তুলে হাসনু বললে, মুসলমানী চুল বাঁধা দেখেছিস কখনো? লজ্জা পাসনে, আমার দিকে ফিরে দাঁড়া। চুলের পাটা নামবে দুই ভুরুর ওপর, তেলা-তেলা প্লেন—যেমন পালিশ-করা মোজাইকের মেঝে। এই চেয়ে দেখ,—মুসলমান মেয়েকে কোনো দিন স্নেহের চক্ষে দেখিসনি তোরা—আজ চোখ ভ'রে দেখে নে,—চুল বাঁধলে কপাল দেখা যাবে না, শুধু মাঝখানে শাদা সিঁথি উঠে চ'লে গেছে। ঢালু অরণ্যের মাঝখান দিয়ে যেমন ঝরনার ধারা চ'লে যায়।

হাজারিবাগ জেলার ছোট্ট স্টেশনের একটি ওয়েটিং রুমে ওদের ভোর হয়েছে। শেষ রাত্রে কখন নেমেছে এই নির্জন স্টেশনে, কখন অন্ধকারে ভিতরে ঢুকে ওরা ঘুমচোখে বিছানা এলিয়ে ঘুমিয়েছে ওদের মনে নেই। সকালে খানসামার খুটখাট শব্দে আগে ওঠে হাসনু। লজ্জার সঙ্গে ওরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, শয্যাসামগ্রীর প্রাচুর্য নেই—একজনেরই মোটামুটি চ'লে যায়। ওই অল্পপরিসর সংস্থিতির মধ্যেও শেষরাত্রে হাসনু জড়িতকণ্ঠে পরিহাস করেছিল, পুরুষকে ঠাঁই দেবো কোথায় এতটুকুর মধ্যে? পায়ের তলায় রাখতে পারিনে, রাখতে পারিনে পাশে, না বা রাখতে পারি শিয়রে। সব অবস্থাতেই অস্বস্তি।

হিরণ বললে, বুঝলুম তোর জৈব পরিহাস! কিন্তু হঠাৎ মুসলমানী সাজসজ্জা আরম্ভ ক'রে দিলি, তোর মতলবটা কি বলতো?

হাসনু বললে, মুসলমানীর আলাদা কোনো সজ্জা নেই,—বিশেষ ক'রে বাঙ্গলায়। তাই ওরা হিন্দু মেয়ের সাজসজ্জার অনুকরণ ক'রে মরে। তোরা দেখেছিস কখনো চোখ তুলে? উৎসুক লোভ নিয়ে তাকিয়েছিস কখনো মুসলমান মেয়ের দিকে?

হিরণ বললে, না, আমাদের রুচিতে বাধে। মুসলমানের মেয়ে দেখলে একশো গজ দূরের থেকে আমরা ত্রাহি মধুসূদন বলি।

কেন?

সত্যকথা নাই-বা শুনলি।

বুঝলুম, কিন্তু ভালো ক'রে ভেবেছিস, ভালো না লাগার কারণ? আমাকে কেন তোর ভালো লাগে?

তোর মধ্যে যে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ হিন্দু রে!

হাসনু বললে, তুই এম-এ পাশ করা মূর্খ। আগে পোশাক থেকে আরম্ভ কর। টাইট্ বডিসের পর কাঁচুলী,—কোমরের থেকে উপর দিকে ইঞ্চি দুই বেআব্রু মাংস! শাড়ি নয়, ইরানী ঘাঘরাও নয়—এক প্রকার লজ্জানিবারণী বালিশের ওয়াড়! পাশের দিকে বোতাম বাঁধা, পায়ের দিকে একটু কাটা। আর নীচের দিকে চেয়ে দেখ্, সরুপাড়ের স্লিপার। কাল ট্রেনে ওঠার আগে হাতে পায়ে দিয়েছি মেহেদী পাতার রং। কাল থেকে হাত-পায়ের নখ ম্যানিকিয়োর করা—যেন টসটসে রঙীন ভ্রমর আঙুলের ডগায় এসে বসেছে। চোখ তুলে দেখ্, চোখের পাতায় সুর্মার রেখা, নাকে নোলক টেপা, কানে কানবালা—কেমন লাগছে বলতো?

হিরণ বললে, কিম্ভূতকিমাকার। আজ তোকে প্রথম চিনলুম তুই

মুসলমানী। আজ প্রথম তোর ওপর অরুচি হোলো। তুই পায়ে প'ড়ে কাঁদলেও আমি আশীর্বাদ করবো না!

হাসনু বললে, দেখ্ চেয়ে আমি হলুম নবাবজাদী! যদি দুটো পরিষ্কার উর্দু বলতে পারি, তবে বংশ-পরিচয় তুলতে সাহস করবে কেউ? কুলুজি ধ'রে টানাটানি করবে মনে করিস?—শোন, আমি তোর পায়ে প'ড়ে কাঁদতে যাবো না—আমার পায়ে এসে কাঁদবে সুলতান আর বাদশাজাদার দল? কেন জানিস? নারীরত্নম্ দুষ্কুলাদপি!

হিরণ হেসে উঠলো। হাসনু বললে, কিন্তু চেয়ে দেখ্ আমার বাঙ্গলার দিকে। মুসলমানের মেয়ে থাকে জন্তুর মতন লুকিয়ে। ওরা হোলো সম্পত্তি, ওরা শুধু ভোগের সামগ্রী। গরু-বক্‌রি আছে, হাঁস-মুরগী আছে খামারে,—ওরাও তাদের সঙ্গে প্রতিপালিত। মুসলমানের সংখ্যা বাড়াবার যন্ত্র ছাড়া বাঙ্গলায় ওদের আর কোনো পরিচয় নেই। ওরা জীব, জীবন নয়! ওরা প্রাণী—মানুষ নয়! জন্তুর খাদ্য ওরা খায়, তার চেয়ে বেশি মার খায়!

হিরণ বললে, আবার জিজ্ঞেস করি, তোর মতলব কি বলতো?

হাসনু হেসে বললে, মতলব খুব ভালো নয়!

বেশ, তার আগে মনের কথার আভাস দিয়ে রাখ্।

কেন, তোর ভয় করছে?

হিরণ বললে, ভয়ের চেয়ে ভাবনা বেশি। তোর এই সর্বনেশে চেহারা আগে কই দেখাসনি ত'?

হাসনু বললে, আজ থেকে দেখানোটা আরম্ভ। মনে রাখিস দু'বার হয়েছে আমার বিয়ে, তিনবারের বার দিকে! পুরুষের হাড়-চামড়া মেদ-মজ্জা সব জানি।

হিরণ বললে, তবে আবার কেন লোভের মেলা সাজালি নিজের দেহের ওপর?

তোকে দেখাবার জন্যে। দরজার বাইরে থাক্ আমার ওই বিরাট দেশ, থাক ওই বন-অরণ্য-নদী,—আজ এই স্টেশনে কেউ কোথাও নেই! আজ পৃথিবীকে আড়াল ক'রে তোর সামনে দাঁড়াবো, হিরণ,—আমার মান-সম্ভ্রম সঙ্কোচ ভয় লজ্জা—সমস্ত তুই ঘুচিয়ে দিয়ে আমার দিকে চেয়ে দেখ,—আমি বাঙ্গলার এক মুসলমানের মেয়ে। কবি, তোর মন কি পাবো না? কবি, যারা চিরকাল ধ'রে অন্ধকারে রয়েছে, তুই কি তাদেরকে খুঁজে বা'র করবিনে?

হিরণ সোজা হয়ে দাঁড়ালো। বললে, হাসনু?

হাসনু তার বিহ্বল মুখখানা তুলে ধরলো হিরণের দিকে।

হিরণ বললে, তোর সত্য পরিচয় কি আমার জানা নেই, বলতে চাস্?

হাসনুর গলা ধ'রে এলো। বললে, না, জানা নেই তোর। তোরা সবাইকে চিনেছিস,—তোদের জ্ঞানের আলো পড়েছে সকল খানে, কিন্তু আমার সত্য পরিচয় তোদের জানা নেই!—হাসনু বলতে লাগলো, আমি মুসলমানের মেয়ে, এই শুধু জেনে এলি এতকাল, কিন্তু আমি যে তার চেয়ে বড়—আমি বাঙ্গালীর মেয়ে! কবি, তোর অবহেলা, তোর তাচ্ছিল্য, তোর ঔদাসীন্য—আমি মাথায় ক'রে বেড়াচ্ছি যুগ-যুগান্তর, জন্ম-জন্মান্তর,—কিন্তু কই তোর মন পেলুম না ত'? কই, আমাকে ত' টেনে তুললিনে? পাশে ত' বসালিনে?—হাসনুর কণ্ঠ যেন কান্নায় বুজে এলো।

হিরণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে, হাসনু, চুপ কর তুই! আমি কি তোর ওপর কখনো অবিচার করেছি?

হাসনু ভগ্ন জড়িত কণ্ঠে বললে, করেছিস। এমন গভীর অবিচার যে চোখ দিয়ে দেখা যায় না। তুই এতই বড় যে, সকলের চেয়ে নীচে তোর চোখ পড়লো না! কোনোদিন মানুষ ব'লে স্বীকার করলিনে, কাছে আসতে দিলিনে, কোনোদিন একটা মিষ্টিকথা বললিনে! কিন্তু আমি চেয়ে রইলুম তোদের দিকে—শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় আরাধনায় আমার দুই চোখ ভ'রে রইলো। কবি, দেখলি কোনোদিন মুসলমানের মেয়েকে? তোদের ঘৃণা মাথায় তুলে নিয়ে আস্তাকুঁড়ের পাশে দাঁড়িয়ে রইলুম, তোদের জীবন-সমারোহ আর শোভাযাত্রা সামনে দিয়ে চ'লে গেল, দেখলুম মুগ্ধ চক্ষে! কিন্তু এক কণা উচ্ছিষ্ট আমাদের দিকে কোনোদিন ফেলে দিয়ে গেলিনে, সোনার কথা ব'লে যা'কে মাথায় নিয়ে কাঁদবো! জামাই, তুই না কবি, তোর দৃষ্টি না উদার, তোর হৃদয়টা না সর্বব্যাপী?

হিরণ দুই ঠোঁট চেপে দাঁড়ালো। তারপর বললে, হুঁ। শ্রাদ্ধ কতদূরে গড়াবে বুঝতে পাচ্ছি। কবির সঙ্গে পাগলের সংযোগ—ভ্রমণ-বৃত্তান্তটার চেহারা যে কী দাঁড়াবে, ভাবতেও ভয় করে!—কেন মরতে এলুম তোর সঙ্গে?

হাসনু আত্মসম্বরণ ক'রে বললে, ভয় নেই—চল। তুই হারালে কেউ খুঁজবে না, ম'রে গেলে কেউ কাঁদবে না! আয়,—বাইরে যাই।

এই সাজসজ্জা নিয়ে বাইরে যেতে পারবি?

এইত' বাইরের সাজসজ্জা রে! জনসাধারণের লোভকে খোঁচাবো, শিল্পীর চোখে নেশা ধরাবো, ভক্তের চোখে আনব বিহ্বলতা—আর তুই কবি, তোর বুকের রক্ততরঙ্গে হৃৎপিণ্ড টলমল করতে থাকবে,—এই হোলো আমার

সাজসজ্জা! জানিস তুই হিরণ, বাঙ্গালী মুসলমান তার ঘরের মেয়েকে কতখানি অন্তরের সঙ্গে অপছন্দ করে?

একি কথা, হাসনু?—হিরণ প্রতিবাদ করলো বিরক্ত হয়ে।

শুধু অপছন্দ নয় রে, নিজের ঘরের মেয়েদের দিকে তাকালে তাদের মন অসন্তোষে ভ'রে ওঠে। সারাজীবন ধরে একটা প্রবল অতৃপ্তি রি রি করতে থাকে তাদের মনে। বাঙ্গালী মুসলমানের মেয়ে এই অপমান মুখ বুজেই সইতে থাকে। ঘরের থেকে পায় তারা ঘৃণা, আর বাইরের থেকে পায় অবহেলা।—আয়, বাইরে আয়।

হিরণের হাত ধ'রে হাসনু বাইরে নিয়ে এলো। পশ্চিমের দিকে পাহাড়ের উপরে মেঘ জ'মে রয়েছে, এদিকের আকাশ খানিকটা স্বচ্ছ। রোদ উঠেছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ নয়।

ধুতি-পাঞ্জাবী-পরা সুশ্রী বাঙ্গালী যুবকের সঙ্গে একান্ত অন্তরঙ্গ বিচিত্রবেশিনী এক নারীকে লক্ষ্য করার মতো জনতা আশেপাশে ছিল বৈকি। দু'একজন কুলীর কানাকানিতে স্টেশনমাস্টারও বেরিয়ে এলেন,—তাঁর সঙ্গে এলো রেলওয়ে পুলিশের লোক। হাসনু আড়চোখে সেদিকে একবার তাকালো, তারপর কী যেন একটা কথায় গলগলিয়ে হেসে হিরণের একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে জড়িয়ে নিল। যেন সমস্ত ব্যাপারটাই তার পূর্বকল্পিত।

সবাই অবাক। কোমর বক্ষ থেকে নীচে পর্যন্ত বেগুনীরঙের রেশমী ঝুলন, গায়ে জড়িয়ে মাথায় উঠে গেছে অতি মিহি ওড়না চুমকি জরি বসানো,—রংটা তার বাসন্তী। নাকে নোলক এই যুগে। কানে কানবালা, গলায় হাঁসুলী হার। পাঁয়ে আলতার বদলে মেহেদীর চিত্রাঙ্কন। গায়েব ওড়নাখানা এতই মিহি যে, সেখানা নন্দনবাসিনী উর্বশীর চক্ষুলজ্জা নিবারণের কাজে মানাতো। এর উপর আবার সকাল থেকে উঠেছে শাওনের মেঘের হাওয়া। হাসু বানু আজ সেই হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে চাইছে তার মন! তার আবরণ, তার আভরণ। কী সুন্দর মানিয়েছে তা'কে, পশ্চিমের পাহাড়ের পারে পরেশনাথের পাদমূলে অরণ্যলোক থেকে ময়ূরদলের কেকারব আসছে কানে—ওদের সঙ্গে হাসনু গিয়ে পেখম মেললে বর্ণসমারোহের সঙ্গে সে মিলে যেতে পারতো।

মোটর বাস যেখানে ছাড়ে, ওরা গেল সেইখানে। খানসামা নিয়ে গেল স্যুটকেশ আর ছোট্ট বিছানার মোড়ক পিছনে পিছনে! আশেপাশে বিমূঢ় জনতার মধ্যে তখন সাড়া জেগে উঠেছে,—চন্দ্রের আকর্ষণে তরঙ্গের জোয়ার যেমন স্ফীত হয়ে ওঠে।

একদা জ্যাঠামশাই একজন উচ্চশিক্ষিত মৌলভীকে মোতায়েন করেছিলেন হাসনুকে উর্দু ভাষায় পারদর্শিনী ক'রে তোলার জন্য।

মূল আরবী হরপে সে শিক্ষালাভ করেছে, উর্দু সাহিত্যে পড়েছে সে সযত্নে, উর্দু ভাষণে তার দক্ষতাও কম নয়। সুতরাং প্লাটফরমের মাঝামাঝি এসে ইংরেজিতে সে হিরণকে ইঙ্গিত ক'রে বললে, তুই বলবি আগাগোড়া ইংরেজি, আমি আগাগোড়া উর্দু।

হিরণ প্রশ্ন করলো, কেন?

হাসনু বললে, চমক লাগাবো!

হুঁ। এরপর পুলিশের হাতে পড়তে বাকি রইলো আর কি!

ভয় কেন তোর অত, কমরেড?

হিরণ বললে, মেয়েরা যখন লজ্জা আর ভয় ত্যাগ করে, তখন পুরুষের বড়ই দুর্দিন!

হাসনুর আলুলিত ভঙ্গিটাও ঢলঢলে। খিলখিল ক'রে হেসে সে বললে, পুরুষের দুর্দিন সন্দেহ কি! আশেপাশে দেখেই বুঝতে পারছি। চোখের ইঙ্গিতে তেতে ওঠে, ভূষণের ভঙ্গিতে মেতে ওঠে।

বেলা কম হয়নি, স্টেশন-পল্লীর এখানে ওখানে দুচারটি দোকান খুলেছে। কেউ হাসছে, কেউ হিরণকে দিচ্ছে ধিক্কার, কেউ বা তার রসবোধের তারিফ করছে।

অর্থাৎ এসব শ্রেণীর নরনারী প্রায়ই এদিকে বেড়াতে আসে, প্রায়ই রেখে যায় কলঙ্কের কাহিনী।

বাসে উঠে ওরা বসলো সামনে প্রথম শ্রেণীতে। বসলো ঘন হয়ে, মদালসা বসলো মাধুযের গায়ে গায়ে। একসময়ে মুখ বাড়িয়ে হাসনু খানসামাকে ডেকে সুমধুর উর্দু ভাষায় বললে, মিঞা-ভাই, কিছু খাবার আনতে পারো?

ফরমাইয়ে হুজুর!

দশটাকার একটি নোট হাসনু হাত বাড়িয়ে খানসামার হাতে দিল। পড়ি কি মরি, খানসামা ছুটলো দোকানে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আনলো গরম-গরম পুরি আর জিলিপী। খরচ এক টাকা, বকশিস নয় টাকা! খানসামা মূঢ়ের মতো চেয়ে রইলো। হাসনু তা'কে বুঝিয়ে দিল, হাজিপুরের নবাব নন্দিনী ওটা তোমাকে ইনাম দিচ্ছে! যাও, খাবার জল আনো!

শুধু জল! ভোগবতী তটিনীর অমৃতবিন্দু এনে দিতে পারলে সে যে তৃপ্তি পেতো! খানসামা ছুটে গিয়ে জল এনে মুখের কাছে ধরলো।

মোটর বাস ছেড়ে দিল। পিছনের কামরাগুলি ইতিমধ্যে যাত্রীতে ভ'রে

গেছে। পথ অনেকদূর, যাবে তারা নিরুদ্দেশে। আকাশে মেঘ ঘোরালো হয়ে আসছে, বৃষ্টি নামবে কোনো একখানে। কথা উঠেছিল তারা কতদূর যাবে। হাসনু কন্‌ডাক্‌টরকে জানিয়েছে, ততদূর পর্যন্তই যাবে যেখানে লোকনিন্দা পৌঁছবে না।

অমন নিখুঁত উর্দুভাষা এদেশে কা'রো জানা নেই। সুতরাং ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে হিরণ জানালো, হাঁ করে চেয়ে দেখেছো কি? যাবো শেষ পর্যন্ত!

দুখানা দশ টাকার নোট ওর হাতে দেওয়া হলো, কিন্তু টিকিটের সঙ্গে বাকি টাকা-পয়সা হাসনু ফেরৎ নিল না। কন্‌ডাক্‌টর অবাক।

ছোট্ট জনপদ পেরিয়ে বাস ছুটলো। পথের দুধারের প্রান্তর বনময় দূরের মেঘলোকের ভিতরের গুরুগুরু ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।

হাসনু একসময় ডাকলো, কবি কমরেড?

কেন?—হিরণ জবাব দিল।

ভাল লাগছে না তোর?

না,—যন্ত্রণা বোধ করছি!

সচকিত কণ্ঠে বললে, যন্ত্রণা!

হিরণ বললে, কবিতা রচনার ঠিক আগে বুকের ভেতরকার রক্তাক্ত পাখি যেমন যন্ত্রণায় ডানা ঝটাপটি করে।

শান্তকণ্ঠে এবার হাসনু বললে, কবি, এ যুগের যন্ত্রণাকে তুই কবিতায় প্রকাশ করতে পারবি? শ্মশান থেকে তুলে ধরতে পারবি জীবনের নতুন ব্যাখ্যা? শোনাতে পারবি চিরনতুনের পদধ্বনি?

হিরণ বললে, এত গুরুভার আমার ওপর চাপাসনে তুই!

আমার সঙ্গে কতদূর যেতে পারিস, কমরেড?

বেহেস্ত থেকে জাহান্নম!

হাসনু তার একখানা হাত হাসিমুখে টেনে নিয়ে বললে, এত সম্মান কি আমার সইবে? আচ্ছা জামাই, আমাব ওপর কি তোর একটুও লোভ নেই?

হিরণ মুখ টিপে হেসে বললে, হেলেনকে নিয়ে যদি ট্রয়ের যুদ্ধ না বাধে, তবে সত্যি কথা বলতে পারি!

তাহ'লে না হয় মিথ্যে কথাই বল্?

হিরণ বললে, ভয়ানক লোভ তোর ওপর! হে লোভ, তোমারই নাম হাসনু!

হাসনু বললে, তোর লোভের উপকরণ কী আছে আমার মধ্যে?

প্রচুর আছে—হিরণ বললে, থরে থরে সাজানো। তোকে নিয়ে যদি উড়ে

যেতে পারতুম আকাশ-পথে,—যেখানে দুই পাখি কথা কয় নিজেদের মধ্যে,—যে কথা ভেসে আসে না সূর্যের আলো সাঁতরে নীচের দিকে, সেখানে বলতে পারতুম তোর কানে কানে!

ভালোবাসার কথা বলতিস?

না, একেবারেই না।

হাসনু উৎসুক হয়ে বললে, তবে?

হিরণ বললে, বলতুম আমাকে নিয়ে চল তোর সঙ্গে। যেখানে আমাদের আকাশ অনন্ত, যেখানে আমাদের আনন্দ অফুরন্ত!

সে কোন্ দেশ, কমরেড?

যে-দেশে তোর প্রতি আমার লোভের সীমা খুঁজে পাবো না,—যে-দেশে আমার প্রতি তোর অগ্নিবাসনার আদি-অন্ত থাকবে না!

হাসনু বললে, তবু অস্পষ্ট রইলো জামাই!

হিরণ বললে, চেয়ে দেখ পূর্বদিকে,—শাওনের হাওয়া উঠেছে সে-দেশের আকাশ-লোকে, বেণুবনের কান্না শোন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে!

না, ওতে ছাবি খুঁজে পাইনে, কবি!

তোর আর আমার বুকের রক্তে যে-মাটি সরস, আমাদের চোখের জলে যে-মাটি স্নেহসিক্ত!—এবার পাচ্ছিস?

না, পাইনে।

হিরণের কণ্ঠে বিহ্বলতার কাঁপন লাগলো। বললে, সন্ধ্যার রঙ্গীন পাখি যে-দেশে নেমে আসে রাঙা আকাশ থেকে, জ্যোৎস্নার জোয়ারে ভেসে আসে শূন্যলোক থেকে অপ্সরার দল নির্জন প্রান্তরে, গ্রামের বধূরা জলের কলস নিয়ে নদীর ধারে যে-দেশে থমকে দাঁড়ায় মাঝির কণ্ঠে গোধূলির ভাটিয়াল শুনে! আমাকে সেই দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবি তুই, হাসনু?

হাসনু চুপ ক'রে গেল।

হিরণ বললে, যে-দেশের কোমল মাটির 'পরে পা টিপলে চোখের জল ওঠে, যে-দেশের বিচ্ছেদাতুর জননী নিরুদ্দেশ সন্তানের আশায় করুণ প্রদীপটি জ্বেলে মধুমতীর ধারে ব'সে চোখের জল ফেলে,—পারবি সেখানে তুই নিয়ে যেতে, হাসনু?

হাসনু কথা বললে না।

হিরণ পুনরায় বললে, পথ গিয়েছে এঁকে-বেঁকে, নদীর ঘাট থেকে উঠে গিয়েছে সৈদালির মহাজনী হাটের দিকে। আমবাগানের তলা দিয়ে সোজা চ'লে যাও তালদীঘির ধার দিয়ে। বাঁ-হাতি শালুক আর পদ্ম ফুটেছে

পাশাপাশি। মল্লিকা আর মধুমালতীর উপর দিয়ে এতদিন শাওনের হাওয়া বয়ে চলেছে। বারোয়ারীতলা পেরিয়ে ভাঁটিখানা ছাড়িয়ে ডানহাতি ঘুরে যাও বঙ্কিবাগানের ধার দিয়ে। সামনেই জুল্লিদের পুরানো চালা, তার পাশে ঘটি-বাবাজির আখড়া। এগিয়ে চলো পশ্চিমে। শশী-গয়লানির গোয়াল ছাড়ালেই পাবে কর্তাখানের মস্ত বিল। বিলের ধারে কাঁচা রাস্তার ওপর বাঁদীবন্দর পাঠশালা,—যেখানে গিরীশ চৌকিদার রোজ রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভজন গায়। এঁকে-বেঁকে চল্, আরো দূরে চল্, পথ ফুরোবে না তোর, কাঁচা ধানের গন্ধে মুখ ফিরিয়ে দেখবি কাঁচের পাখা মেলে বাদলা ফড়িংরা বসেছে জলের ধারে,—জলের আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নেচে উঠছে তারা। বাঁ-হাতি বেঁকে চল্ কামিনী বনের ধার দিয়ে,—ওখানে আসে মৌমাছিরা, আসে সাপেরা,—কামিনীর গন্ধে ওরা ওখানে এসে ঘুমিয়ে পড়ে!

হিরণ থামলো। মোটর চলেছে এবার পাহাড়ী পথের উঁচু-নীচুতে। প্রান্তরে কোথাও কোথাও তখনও কৃষ্ণচূড়ার আর পলাশের সমারোহ রয়েছে। শালের অরণ্যে গ্রামের পথ হারিয়ে গেছে। বাতাস হোলো বসন্তের মতো, তার সঙ্গে রয়েছে জলকণার আমেজ। হাসনু সেইদিকে অনুরাগবিধুর দৃষ্টি ফিরিয়ে বললে, কবি, তারপর?

হিরণ বললে, এবার ছবি পা'স খুঁজে?

পাই, ও আমার হাজিপুরের ছবি, ওই ছবি আমার চিরকালের বাঙ্গলার'

তুই সত্যি ফিরে যাবি দেশের বাড়িতে?

হঠাৎ পিছনের রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে একটি লোক কথা ব'লে উঠলো। মুখ বাড়িয়ে বললে, বাবুজি—

হিরণ মুখ ফিরিয়ে তাকালো। প্রশ্নকর্তা পুনরায় বললে, আপনাদেব মুলুক কোথায়?

হিরণ জবাব দিল, বাঙ্গলায়!

হাসনুর দিকে চেয়ে লোকটি আবার জানতে চাইলো, ওঁর দেশ কোথায়?

জবাবটা হাসনুই দিল, বললে, বলা কঠিন।

লোকটি থতমত খেয়ে বললে, আপনারা কোন্ জাতি?

হাসনু পুনরায় উর্দু ভাষায় জবাব দিল, ওটাও বলা কঠিন।

লোকটি বোধকরি বহুক্ষণ থেকে ওদের আচার-আচরণ, চালচলন এবং আলাপচারী শুনছিল। কৌতূহলটা তার যেন বহুক্ষণের। সুতরাং নাছোড়বান্দার মতো লোকটি পুনরায় প্রশ্ন ক'রে বসলো, উনি কি আপনার বিবি, মানে সহধর্মিনী?

হিরণ পরিষ্কার স্বচ্ছ হাসি হেসে উঠলো। কিন্তু উত্তরটা দিলে হাসনু। বললে, শেঠজি, আমি ওর সহধর্মিনী, কিংবা দুঃসহধর্মিনী,—একথা জানতে গেলে আপনাকে প্রথম শ্রেণীতে উঠে আসতে হবে! অর্থাৎ আমাদের দুজনের মাঝখানে এসে বসুন!

লোকটি বললে, বিবি সাহেব, আপনি কি মুসলমান?

আমার পিতা মুসলমান বটে!

উনি ত' নিশ্চয়ই হিন্দু?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আগাগোড়া—যাকে বলে, অবিমিশ্র! সনাতনী!

আপনারা কি করেন?

হিরণ বললে, আপনার প্রশ্নটা বড়ই স্পষ্ট। মোটামুটি আমরা হলুম রেফুজী। আপাতত মস্তিষ্ক বিকৃতিব চিকিৎসাদির জন্য এদিকে এসেছি।

কোথায় যাবেন?

হাসপাতালে!

লোকটা সাগ্রহে প্রশ্ন করলো, কোন্ হাসপাতালে?

হাসনু হেসে জবাব দিল, রাঁচীতে।

রাঁচী শহরে মোটরস্ট্যাণ্ডে এসে ওরা যখন নামলো, তখন বেলা প্রায় বারোটা। উক্ত লোকটা ওদের সঙ্গে লেগেই ছিল। ওর সঙ্গে হাসনুর কিছু ঘনিষ্ঠতা ঘটেছে। বাজারের সামনে ওরা অগ্রসর হোলো, তখন একটা জনতা ওদেরকে প্রায় ঘিরেছে। ধুতি পাঞ্জাবী পরা একটি হিন্দু যুবকের সঙ্গে অমন একটি সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী এবং সুসজ্জিতা মুসলমান ললনাকে দেখে কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করতে চাইলো না যে, ওরা স্বামী-স্ত্রী,—এবং বিশ্বাস করবার কোনো হেতুই নেই। যদি বলা যেতো, একজন হোলো কবি, এবং অপরজন মুসলমান সমাজনেত্রী,—তাহ'লে জনতার হাত থেকে ওদের নিরাপদে রাখা কঠিন হোতো। হাসনুর গায়ের ওড়না আর কাঁচুলী-বাঁধার চেহারা দেখে আর যাই মনে হোক, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা মনে আসা কিছু কঠিন ছিল বৈ কি! তার চেয়ে কঠিন্ সমাজনেত্রী ব'লে বিশ্বাস করে নেওয়া!

হাসনু তার সাঁচ্চা জরির কাজকরা স্লিপার পায়ে দিয়ে হিরণের হাত ধ'রে দু'পা এগিয়ে দেখলো, কয়েকখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে। একজনকে বললে, এ গাড়ি কোথায় যায়?

ট্যাক্সিওলা বললে, হুড্রু, জুনা, বাজরোপ্পা, রামগড়—সব জায়গায় যায়। সব সময় ভাড়া করতে পাববেন।

হাসনু প্রশ্ন করলো, রাত্রেও যায়।

আজ্ঞে হ্যাঁ, সমস্ত রাত আমাদের গাড়ী চলে।

ধরুন, আপনার গাড়ী নিয়ে কোনো জঙ্গলের ধারে, কিংবা পাহাড়ের ঝরনার পাশে যদি আমরা যাই? যদি বলি, আপনার গাড়ীতে আমরা বাস করবো কিছুকাল, আর আপনি ততক্ষণ কোনো কফিখানায় ব'সে দেহতত্ত্বের গান ধরবেন? এতে কি রাজি আছেন?

ড্রাইভার একটু বিনয়ের হাসি হাসলো, অর্থাৎ এবম্বিধ অবস্থায় তার বিশেষ কোনো আপত্তি নেই। সে জানালো, উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেলে অসুবিধে বোধ করিনে।

আগেকার সেই লোকটা সঙ্গেই রয়েছে। হিরণ জিজ্ঞাসা করলো, আপনার নাম কি?

লোকটি সবিনয়ে বললে, আমার নাম ঠাকুরপ্রসাদ।

হাসনু বললে, ঠাকুর, যৌবনচাঞ্চল্যের দরুন পুরি আর জিলিপী আমাদের হজম হয়ে গেছে। এখানে কোন্ হোটেলে প্রসাদ পেতে পারি বলো ত'?

এই যে, আসুন না—এই ত' ওই শাদাবাড়ীটা,—ওই যে লম্বা বারান্দা, নীচে অনেক দোকান। খুব ভাল হোটেল। যা চাইবেন তাই পাবেন। এই ব'লে ঠাকুরপ্রসাদ ওদের বিছানার পুঁটলি আর সুটকেস নিয়ে চললো।

হাসনু বললে, কিন্তু মুসলমানেরা জিদ ধ'রে যে-জন্তুটি খেলে আপনারা তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন, সেটা ওখানে পাবো কি?

ঠাকুরপ্রসাদ একটু হতবুদ্ধি হ'য়ে বললে, কি বলছেন, বেগমসাহেবা?

জবাব দিল হিরণ। বললে, এই ধরুন না কেন, আমরা ধরলুম শিং আর ওরা ধরলো লেজ—এই নিয়েই ত' বিবাদ।

বিবাদ কা'দের মধ্যে?

হাসনু তৎক্ষণাৎ হেসে বললে, কেন বদ্না আর গাড়ু? পুব আর পশ্চিম, লুঙ্গি আর ধুতি, দাড়ি আর টিকি। ধরুন না কেন, গরু নিয়ে ঝগড়া থেকেই ত' ভারত-ভাগ হোলো। ঝগড়া ত' মানুষে মানুষে নয়, মন্দিরে আর মসজিদে।

জনতার সমুদ্রে তৎক্ষণে তুফান উঠেছে। কেউ বললে, ঘেরাও করো,—কেউ বললে, থানায় খবর দাও। কেউ বা বললে, এবারে এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনিবার্য।

ঠাকুরপ্রসাদ বললে, আপনাদের বাঙলাদেশের সাম্প্রদায়িক ঝগড়ার জন্যেই ত' দেশের এই দুরবস্থা!

হাসনু বললে, সে কি ঠাকুরপ্রসাদজী,—ওই দেখুন, পূর্ববঙ্গের লোক এতক্ষণে নমাজ পড়ছে পশ্চিমবঙ্গের দিকে মাথা নুইয়ে!

হিরণ পরের কথাটা জুগিয়ে দিল। বললে, আর দেখুনগে, পূর্ববঙ্গের দিকে ফিরে পূজোয় বসেছে এতক্ষণে পশ্চিমবঙ্গ। ভালোবাসায় ঝগড়া আছে ব'লেই ত' ভালোবাসা একঘেয়ে নয়। তরকারীতে নুন আছে ব'লেই ত' সুস্বাদু!

ঠাকুরপ্রসাদ মুখোজ্জ্বল ক'রে বললে, তবে কি আপনারা মিলবেন শীঘ্র?

হাসনু বললে, কেমন করে মিলবো প্রসাদজী?—মাঝখানে যে গরু! গরুগুলিকে না সরালে মিলন নেই!

ওরা অবশেষে ঠাকুরপ্রসাদের চেষ্টায় হোটেলে এসে উঠলো। জনতা চেয়েছিল দাঙ্গা। হাসনু তার চপল যৌবনের লাস্যভঙ্গীতে কতকটা মধুর-হাস্যের জারকরস মিলিয়ে এমন কলোচ্ছ্বাসে তাদেরকে সরস ক'রে তুললে যে মোহাবিষ্ট জনতার মন থেকে অন্তত দ্বিতীয় রিপুটা ততক্ষণে অদৃশ্য হ'য়েছে! হোটেলের দোতলায় উঠে ওরা কোণের ঘরখানা দখল করলো। ঠাকুরপ্রসাদ বিছানাটা আর সুটকেস রাখলো একপাশে। সুশ্রী মেয়েছেলে সঙ্গে থাকলে বিনা মূল্যে চাকরও জুটে যায়। অর্থাৎ কিনা ঠাকুরপ্রসাদ আছে সঙ্গে সঙ্গে। তার ইচ্ছা, এই বিদেশ-বিভুঁয়ে তার ন্যায় নিঃস্বার্থ পরোপকারী ব্যক্তি ওদের সঙ্গে একটুখানি জড়িয়ে থাকে। ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই হাসনু বললে, ওই পর্যন্ত, বুঝলে প্রসাদজী। ভেতরটা হোলো হারেম!

ঠাকুরপ্রসাদ কথায় হতবুদ্ধি। হাসনু বললে, আপনি অত্যন্ত সরল, তাই একটু দেরীতে কথা বোঝেন। বৃন্দাবনের কথা আপনি শুনেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এ ঘর হোলো সেই গুপ্ত বৃন্দাবন! আসবেন শেষরাত্রে নিধুবনে, আপনাকে আমি সুবল সখা বানিয়ে দেবো। বুঝেছেন কথা?

ঠাকুরপ্রসাদ আবার হতবুদ্ধি। ওকে নিয়ে আর পারা যায় না বাপু। গরমে আর পরিশ্রমে হিরণ আর হাসনু উভয়েই ক্লান্ত। ওড়নাখানা খুলে এক পাশে রেখে হাসনু বললে, প্রসাদজী, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তার চেয়েও বেশি ধন্যবাদ দেবো, যদি আমরা এখন তোমার হাত থেকে মুক্তিলাভ করি।

হাসনুর দিকে তাকিয়ে প্রায় কেঁদে উঠে প্রসাদজী বললে, আবার কি আমি আসবো?

নিশ্চয়! উনি কাল ভোরে চলে যাবেন, আমি এই বিদেশে থাকবো একা। কাল থেকে আমাকে কেউ দেখবার থাকবে না প্রসাদজী।

বেশ, আমি কাল থেকে দুবেলা আপনার খবর নেবো ?

হাসনু কেঁদে উঠে বললে, কিন্তু একলা ঘরে কেমন ক'রে যে রাত আমার কাটবে, আল্লা জানেন। আল্লা হো আকবর।

হাসনুর করুণ নিশ্বাস পড়লো। কিন্তু এই বিষণ্ণ দৃশ্য বরদাস্ত করবার জন্য ঠাকুরপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেনি। সে ছটফটিয়ে উঠে বললে, যদি বলেন তবে আমি রাত্রে এসে আপনাকে পাহারা দেবো !

হাসনু মুখখানা বাড়িয়ে গলা নামিয়ে কটাক্ষে বললে, আপনার পায়ে আমার হৃদয়ের সমস্ত কৃতজ্ঞতা ঢেলে দিতে চাই। বেশ, আপনি এসে দাঁড়ালে আমার কোন ভয় থাকবে না ! তবে কিনা আমার মরদটি লোক ভালো নয়। আপনি কাল সকালে সামনের রাস্তায় পায়চারী করতে থাকবেন,—উনি চ'লে গেলেই আমি হাতছানি দিয়ে আপনাকে ডেকে ঘরে তুলে নেবো। দেখবেন, আমার একাগ্র অনুরোধ ভুলবেন না যেন। হতভাগিনীকে মনের কোণে একটু ঠাঁই দেবেন !

নারীর চোখের অশ্রু ! কিন্তু হায়, কোনো উপায় নেই ! এ অশ্রু এখনই মুছিয়ে দেওয়া যেতো, কিন্তু—না থাক, ঠাকুরপ্রসাদ হন্‌হন্‌ ক'রে চলে গেল।

সিঁড়ি পর্যন্ত ঠাকুরপ্রসাদ হয়ত গিয়ে থাকবে সহসা ঘরের মধ্যে হাসনু আর হিরণের উচ্চ কলরোলে হাসির বিস্ফোরণ ঘটলো। হিরণ হাসতে হাসতে বললে, তুই যখন ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে তামাসা করছিলি, তখন এই লোকটাই আমার কানে কানে বলছিল, মুসলমানীকে আপনি বিবাহ করেছেন, আপনার কি ধর্মভয় নেই ?

তুই কি বললি ?

বললুম, ভয় আছে প্রচুর, তবে ধর্ম আছে কি না বলতে পারিনে !

হাসনু আবার হেসে উঠলো।

হোটেলে স্নান ক'রে দুজনে আহারে বসলো। রান্না অবিশ্যি পরিপাটি নয়, তবে আহার্য প্রচুর। খরচ দিচ্ছে হাসনু। উপলক্ষ্য একটা পেলে খরচ করতে সে জানে ! হোটেলের লোকটি টেবিলের ওপর খাদ্যসম্ভার সাজিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। হিরণ আর মীরার সঙ্গে হাসনু চিরকাল যেমন খেয়ে এসেছে, আজও তার ব্যতিক্রম নেই। রাজা রামমোহন রায়ের দূরদর্শিতা ছিল, মুসলমানীকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। হাসনুর পক্ষে এক সুশ্রী তরুণ হিন্দু কমরেড জুটে গেছে, ভাগ্য তার সুপ্রসন্ন বৈকি ! তবে কিনা রাজা রামমোহনের সেই স্ত্রী বহুভর্তৃকা ছিলেন না। সুতরাং হাসনুকে হিরণের কাছে আসতে হয়েছে কমরেডের ভূমিকা নিয়ে। কমরেড শব্দটা

-বহুব্যাপী, যে-কোনো সম্পর্ক লাগাও, বেশ খাপ খাবে। দুই কমরেডে ব'সে আহার চলছে, যেমন তাদের চিরকাল চ'লে এসেছে। কখনো সুমিত্রা থাকতেন তাদের ভোজন আসরে। কখনও তিনি থাকতেন না,—কেন না রাজবাড়ীর তিনি ছোটরাণী, এবং ছোটরাণীর সম্মান আলাদা। সে-বাড়ীতে জ্যাঠামশায়ের হাতের তৈরী সমাজ, এবং হাজিপুর অঞ্চলে তাঁর নিজের ধর্মবিশ্বাসটার প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল বেশি। সেই ধর্মবিশ্বাসটা থাকতো সমগ্র সমাজকে আলিঙ্গন ক'রে—যেমন ধরো ইলাহীধর্ম। ওটা মিলিয়ে দেয়, ওটা আনে ঐক্য, আনে শক্তি, আনে সাহস,—তাই রাজবাড়ীতে ওটা ছিল প্রিয়। ধর্মবিশ্বাসটা গায়ে লেখা থাকে না ব'লেই ওটার কিছু মূল্য এখনও পাওয়া যায়! যারা ওটার তক্‌মা কোমরে জড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়, তারা একটা বিশেষ মনোবৃত্তির দাসত্ব করে। ইতিহাসের আদিতে সিন্ধু পাই, কিন্তু হিন্দু শব্দটার কোথাও উল্লেখ নেই ভারতীয় শাস্ত্রে,—কেননা হিন্দু শব্দটা অর্থহীন হিন্দুধর্ম,—অর্থাৎ হিন্দুধর্ম ব'লে কোনো পদার্থেরই অস্তিত্ব নেই ভূভারতে। আছে শুধু ভারতীয় দর্শন! রাজা পৃথ্বীরাজের আগে হিন্দু শব্দটার হয়ত চলন ছিল, কিন্তু হিন্দুধর্ম বললে কিছু বোঝাতো কি? ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ্ এরা হিন্দুধর্মের মুখোস চড়ালো যখন এলো মহম্মদ বিন-কাসিম। মুসলমানকে দেখামাত্র দর্শন হয়ে উঠলো ধর্ম।

ফাউলকারীটা ভাতের প্লেটের ওপর ঢেলে নিয়ে হিরণ বললে, হিন্দুর ওপর কটাক্ষ করলেই তুই রাগ করিস্ আমি জানি, কিন্তু আমি যে সময়টার কথা বলছি, তখন মুসলমান ধর্মের বয়স মাত্র আড়াইশো কি তিনশো বছর।

হাসনু বললে, অর্থাৎ তখনো হাঁটতে শেখেনি!

হ্যাঁ, হাঁটছে বৈ কি। মধ্য-প্রাচ্যের দিকে হাঁটছে, নিকট-প্রাচ্যের দিকে ছুটছে। ছুটছে উত্তরে আর দক্ষিণে।

অত প্রসার কেন হলো বল ত?

হিরণ বললে, ওর মধ্যে উৎপীড়িত মানুষের মুক্তির সংবাদ ছিল! খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের অনাচারে কোথাও ভদ্রলোক টিঁকতে পারতো না, অথচ ভারতীয় দর্শনের দিকে আসতে গেলে সাধারণ লোকের পক্ষে বিদ্যেবুদ্ধির দরকার হোতো, দরকার হোতো চিত্ত-সংস্কৃতির, দরকার হতো গভীর উপলব্ধির। মরুভূমির থেকে উঠলো ইসলাম সাম্যবাদের মন্ত্র নিয়ে। সকলের সমান মূল্য, সমান অধিকার। কেউ ছোট নয়, ধনী-নির্ধনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যা খাদ্য আছে, যা সম্পদ আছে,—সবাই সমান ভাগ ক'রে নাও। কেউ বঞ্চিত হবে না, কেউ ব্যর্থ হবে না। আজকের যুগে যার নাম রেশন, যার

নাম কনট্রোল—তার প্রথম জন্ম হোলো মুসলমানের দেশে। যেখানে খাদ্য ছিল অপ্রচুর,—মানুষকে যেখানে সমান ভাগ করে খেতে হোতো। ইসলাম আনলো প্রথম সাধারণতন্ত্রবাদ। যেটাকে পোশাক পরিয়ে বলা হচ্ছে সমাজতন্ত্র,—যেটার শেষ নাম হোলো কম্যুনিজম। এ আমার ব্যাখ্যা হাসনু, পুঁথিপড়া ব্যাখ্যা নয়। ইসলামের আদি ভিত্তি হোলো সাম্যবাদ! ওরা ছিল দরিদ্র, ছিল সর্বহারা,—কিন্তু বিশ্বাসের জোরে ওরা দাঁড়িয়ে! ওরা খাদ্যের অভাবে লুটপাট করে খেয়েছে চিরকাল, কিন্তু ঈশ্বরকে ভোলে নি। ওরা নিজেদের সামাজিক আর রাজনীতিক প্রতিষ্ঠার জন্য—অর্থাৎ পৃথিবীতে খেয়ে প'রে বেঁচে থাকার জন্যে কেবলই দল ভারী করেছে। ওরা ধর্মবোধের জোরে দাঁড়িয়ে নেই, কিন্তু ধর্মবিশ্বাসের থেকে ঐক্যবোধ ওরা পেয়ে এসেছে, তার থেকেই ওদের শক্তি, ওদের সংহতি! মরক্কো থেকে মালয় পর্যন্ত ওদের ওই একই ইতিহাস। সভ্যজাতিরা এই সেদিন পতাকা তুলে বুলি ধরেছে,—সাম্য, মৈত্রী আর স্বাধীনতা। কিন্তু ওই অসভ্য মুসলমান দেড় হাজার বছর আগে থেকে ওই তিনটি বস্তু রক্তের প্রবাহের সঙ্গে বহন ক'রে এনেছে। এদিকে ভারতের ইতিহাসে কি দেখেছি? হিন্দুধর্মের নামে অনাচার চ'লে এসেছে যুগে যুগে। আচার-অনুষ্ঠান, অনুশাসন, অস্পৃশ্যতা, অনাচার, উৎপীড়ন, তার সঙ্গে শ্রেণীবিদ্বেষ—জাতিতে জাতিতে ঠোকাঠুকি, বর্ণে বর্ণে মারামারি, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে সংঘর্ষ,—এর মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে মুসলমান সাম্যবাদ। তারা উৎপীড়িতের দিকে স্নেহের হাত বাড়িয়ে বলেছে,—এসো, আশ্রয় দেবো। সমান অধিকার দেবো, সহজ জীবন দেবো, স্বাভাবিক আনন্দ দেবো। তার ফল কি জানো, হাসনু? হিন্দু আর বৌদ্ধ সমাজ নয়শো বছর ধ'রে ভাঙতে ভাঙতে আজ নয় কোটি মুসলমানের সংখ্যায় দাঁড়িয়েছে।

হাসনু এবার বললে, কিন্তু ওদের ইতিহাসের বর্বরতা?

আছে! হিরণ বললে, কিন্তু সে যে বাঁচবার জন্যে! ওরা মরুভূমিতে মানুষ, স্বভাবে ওদের কাঠিন্য! ইসলাম যতদূর গিয়েছে, ততদূর অবধি কাঁকর আর পাথর আর বালু। ওরা তার থেকে তুলেছে খাদ্য। চামড়ায় বেঁধে দূরের থেকে এনেছে জল। রক্ত ঝরেছে, ঘাম পড়েছে, অশ্রু নেমেছে—ওর মধ্যেই ওরা অস্তিত্ব রক্ষা করে এসেছে। ওরা লুট করেছে তাদেরকে, যারা চিরকাল ধ'রে লুট করে সম্পদ জমিয়েছে। ভারতের দস্যুবর্বর বড় জোর রত্নাকর থেকে বাল্মীকি হয়, ওদের দস্যুবর্বর সিংহাসন দখল করে। ওরা মেয়েদের দরবারে গিয়ে ভালোবাসার জন্যে কাঁদে, ভিখারী-কাঙালের মতো ভিক্ষা চায়,—কিন্তু ঘর ওদের সুখের নয় বলে মেয়েরা ওদেরকে তাড়িয়ে দেয়।

হাসনু বললে, তাই কি ওরা জোর ক'রে ভালোবাসা আদায় করে ?

হিরণ বললে, ঠিক তাই। ওরা মেয়েকে টেনে নিয়ে আড়ালে চ'লে যায়, আর সেখানে গিয়ে সেই মেয়ের পায়ে প'ড়ে কাঁদে! অসতী ব'লে অনাদর নেই ওদের ঘরে, ছোট জাত ব'লে ঘৃণা নেই, বেজাত ব'লে অবহেলা নেই, ওরা চায় ভালোবাসা! দস্যুর হাত দিয়ে মেয়েদেরকে নিংড়ে ওরা বা'র করে প্রেমের নির্যাস! অত কঠিন ব'লেই অত কোমলতার ভক্ত।

সহসা নীচের তলায় একটা গোলমাল শোনা গেল। ওরা দুজনে একবার থেমে কান পেতে শুনলো। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে ওরা যখন পুনরায় আলাপ আরম্ভ করেছে, তখন কয়েকটি লোক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো। ওদের দরজার সামনে এসে তারা কোলাহল করে উঠলো। ব্যাপার কি ?

একজন উত্তেজিতকণ্ঠে বললে, আপনাদের জন্যে নীচে দাঙ্গা বেধেছে, জানেন কি ?

হিরণ বললে, তাই নাকি ? হতাহতের সংখ্যা কত ?

ওরা বললে, হোটেলের ম্যানেজার আর চাকর মার খেয়েছে আপনাদের জন্যে। একেবারে রক্তারক্তি, তা জানেন ?

হাসনু এগিয়ে এলো। বললে, কোন্ দলের লোক বেশি মার খেয়েছে ? হিন্দু, না মুসলমান ? সাবধান, সংখ্যাই হলো রাজনীতি! একশো একের পাশে নিরানব্বই বসালেই কিন্তু দেশব্যাপী দাঙ্গা! সংখ্যাটা শিগ্গির গুনে আসুন। যান ?

একজন বললে, মুসলমান একজনও নেই!

একজন আছে বৈ কি—হাসনু বললে, খুঁজে দেখুনগে।

না, নেই!

সত্যি বলছেন ? আমি তবে কোন্ জাত ?

ওরা চীৎকার করে বললে, আপনার জন্যেই ত' রক্তপাত! এখানে কোনো অশান্তি ছিল না!

হিরণ এগিয়ে এলো। বললে, ঠিক বলছেন আপনারা! আশি বছরের কুরূপা মুসলমানী ঠাকুমা আমার সঙ্গে এলে রক্তারক্তি হতো না! যেহেতু যৌবন, যেহেতু হেলেন, সেই হেতু ট্রয়, সেই হেতু রক্তপাত!

এটা মুসলমান থাকার হোটেল নয়, তা জানেন ?

আপনারা কি হোটেলের মালিক ?

আমরা দেশের মালিক!

হাসনু এগিয়ে এলো,—ও, দেশের সুসন্তান, সমাজপতি! নিবাস কোন জেলায়? আপনাদের পিতাগুলির কি কি নাম?—আপনারা কি সূর্যবংশীয়?

ওরা বললে, আপনাদের এ হোটেল ছেড়ে যেতে হবে। এটা হিন্দুর।

বেশ, এক্ষুনি ছেড়ে যাবো! কিন্তু আপনাদের কা'রো বাড়িতে নিয়ে চলুন? খরচপত্র আপনাদের। তাছাড়া আমি ত' হিন্দু ব্রাহ্মণ কমরেড ছাড়া থাকতে পারবো না। আমি একা মেয়ে? আপনাদের মধ্যে কেউ রাজি আছেন কি?

একজন বেরিয়ে বললে, আমি রাজি আছি। আপনারা দুজনে চলুন।

হিরণ বললে, তা হবে না। উনি যাবেন হিন্দু ঘরে, আমি যাবো মুসলমানের ঘরে। আপনাদের মধ্যে মুসলমান আছেন কেউ?

না।

তাহ'লে কেমন ক'রে যাবো? মুসলমানী ছাড়া আমি ত' থাকতে পারবো না? তার চেয়ে এক কাজ করুন। আপনারা আর একবার মারমুখী হোন, আমি পুলিশ ডাকি। আমাদের সুখের ঘরকন্নায় একদল হিন্দু ডাকাত হামলা করছে, একটা মামলা বাধুক। দাঁড়ান, পালাবেন না। আরে ওখানে যে ঠাকুরপ্রসাদ দাঁড়িয়ে। দাঙ্গায় বুঝি তোমার কারসাজি আছে? এদের বুঝি তাতিয়েছ?

হাসনু হঠাৎ খিল খিল ক'রে হাসতে লাগলো। ঠাকুরপ্রসাদ সিঁড়ির কাছ থেকেই গা ঢাকা দিল।

হিরণ চট্ ক'রে তার কবিতার খাতা আর ফাউনটেন পেন বা'র ক'রে বললে, এক একজন ক'রে নাম বলে যাও, দেখো, ভয় পেয়ে যেন বাপের নাম ভুলে যেয়ো না! ওকি, পালাও কেন? পুলিশ, পুলিশ এসেছে নীচে! কে মেরেছে? সবাইকে ধরবে! দাঁড়াও, পালিয়ো না···পুলিশ···পুলিশ···

ওরা সবাই হুড়মুড় ক'রে পালাতে আরম্ভ করে দিল রাঁচীর হাসপাতালের পাগলের মতো। আর পিছন দিকে উচ্চরোলে হেসে লুটিয়ে পড়লো জীবেন্দ্রনারায়ণের প্রতিপালিতা আদরিণী কন্যা শ্রীমতী হাসু বানু!

বিকাল বেলায় জোরে বর্ষা নামলো। হাসনু মনে করছিল, বিকালের দিকে রাঁচী শহরে আবার রসের তুফান তুলে বেড়াবে,—কিন্তু তা আর হোল না। হিরণ ব'সে গেল কবিতা রচনায়। নীচের থেকে ওদের চা আর জল-খাবার দিয়ে গেল। ওদের হজমশক্তি ভালো। সুতরাং হোটেলের ম্যানেজারের হাতে ওরা তিনদিনের মতো টাকাকড়ি দিয়ে দিয়েছিল। জলযোগের পর ঘুমিয়ে রইলো হাসনু। আন্দাজ রাত দশটায় যখন হিরণ কবিতা রচনা শেষ করলো, তখন দরজার কাছে ষোড়শ উপচারে আবার ভোজ্য এসে প্রস্তুত।

খাবারের গন্ধে হাসনুর ঘুম ভাঙলো। নিন্দুকেরা মনে করতে পারে, গুনগুন কবিতার স্বর শুনতে শুনতে তার চোখে ঘুম ছিল না।

আহারাদির পর হাসনু হঠাৎ বললে, চল্ বেরিয়ে পড়ি।

হিরণ বললে, এই ভয়ানক বৃষ্টিতে? অন্ধকারে?

এই ত' পালাবার সময়! চল্—

হাসনু মুসলমানী সজ্জা ছাড়লো। পরলো লালপাড় শাড়ি, হাতে কাঁচ আর সোনার চুড়ি, সুর্মা মুছলো চোখের, মাথার সিঁথিতে সিন্দুরের বদলে লিপস্টিকের লাল রং টেনে দিল, পায়ে দিল স্যাণ্ডাল। মানুষের পরিচয় পোশাকে। হাসনু হয়ে উঠলো সতীসাধ্বী হিন্দুনারী। হিরণ একেবারে বিস্ময়বিমূঢ়।

কিন্তু বিস্ময়ের অবকাশ নেই। হিরণকে পরতে হোলো পায়জামা, চোখে সুর্মা, মাথায় মুসলমানী ক্যাপ। গায়ে বেলদার লতাপাতা-কাটা পাঞ্জাবী, গলায় কালো কার বাঁধা, তার সঙ্গে একটি কবচ ঝোলানো, পুরোপুরি মুসলমান। মানুষের পরিচয় পোশাকে।

হিরণ বললে, এবার নাচবি, না নাচাবি?

হাসনু বললে, আমি নাচবো মণিপুরী, তুই নাচবি তুর্কিনাচন!—চল্ বিছানার মোড়ক হাতে নে, আমি নিচ্ছি স্যুটকেশ।—আয়!

রাত বারোটার পর ওরা চুপি চুপি বেরিয়ে এলো। সব আলো নেবানো। পিছনের ফটক খোলা। বৃষ্টি তখনো চলছে অবিরাম। সেই বৃষ্টিতে ওরা নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লো জনহীন রাজপথের ওপর। লোকচক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে ওরা ছুটলো মোটরস্ট্যাণ্ডের দিকে।

মুসলমান যুবকের পিছনে পিছনে এলো রাঙাশাড়ী-পরা হিন্দু-কুলবধূ। কী করুণ পদক্ষেপ, কী শান্ত নিরীহ অবগুণ্ঠনবতী অবলা। হিরণ একখানা ট্যাক্সির কাছে এসে পরিষ্কার উর্দুতে বললে, সওয়ারি নিয়ে যাবে?

কোথা যাবেন?

রাঁচী রোড স্টেশন। ভাড়া?

ভাড়া পঁচিশ টাকা। রাত্রে এই দর।

হিরণ আগে উঠলো ট্যাক্সিতে। হাসনু কাঁদতে কাঁদতে উঠলো। কী কান্না তার ঘোমটার তলায়। হিরণ ওর হাত ধ'রে টেনে নিল ভিতরে।

অদূরে কোলাহল উঠছে। মোটর স্টার্ট দিল। চীৎকার উঠেছে পিছনে। মোটর ছেড়ে দিল।—চীৎকার উঠেছে, হিন্দুনারী অপহরণ!—মোটর ছুটলো। কাঁদতে কাঁদতে হাসনু বললে, একশো টাকা কবুল ক'রে একশো মাইল স্পীডে ছোটাতে বলো।

র্‌াচী ছুটছে ওদের পিছনে। মধ্যরাত্রের বৃষ্টিতে কলরোল জেগে উঠেছে রাজপথে। টাকার লোভে বৃষ্টি বিদীর্ণ ক'রে ড্রাইভার গাড়ী ছোটালো। গাড়ীর মধ্যে ওরা হেসে লুটোপুটি।

ড্রাইভারও হাসছে!

১২

সুমিত্রা যেদিন কলকাতা থেকে রওনা হন সেদিন প্রবল চিত্তক্ষোভ এবং উত্তেজনার মধ্যে একথা তাঁর মনে পড়েনি যে, বর্ষাকালে পূর্ববঙ্গে বিলের সঙ্গে খাল, খালের সঙ্গে নদী, নদীর সঙ্গে ধানক্ষেত এবং পরিশেষে ধানক্ষেত এবং গ্রামের বসতবাটী প্রায়ই জলে একাকার হয়ে থাকে। সুমিত্রার সঙ্গে আছে অত্রি এবং পথের সঙ্গী শ্রীমান বেল্লিকমশাই। সমানে তিনদিন বেণুবাবু যেদিকেই চেয়ে দেখেছেন দিগদিগন্ত জোড়া শুধু থৈ-থৈকার জল! পথে বৃষ্টিতে ভিজেছেন, সর্বাঙ্গে কাদা মেখেছেন, পায়ের পামসু জোড়া খুলে পুঁটলীর মধ্যে পুরেছেন, কিন্তু চারিদিকে অগাধ জলের চেহারা দেখে তার গলা, জিহ্বা, তালু —সমস্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। বেল্লিকের চেহাবা এবং দুরবস্থা দেখে সুমিত্রা সত্যই লজ্জায় পড়েছেন। সোজা রাস্তায় তাঁরা যেতে পারেন নি, জলের জন্য তাঁদেরকে কেবলই ঘুরতে হয়েছে। রেলপথ মোটামুটি একশো মাইল পর্যন্ত ছিল, তারপর স্টীমারেও একবেলা, কিন্তু তাবপর থেকে সেই যে জলের দুর্যোগ আরম্ভ হয়েছে তার আর শেষ নেই। প্রথম রাত কেটেছে স্টেশনে, দ্বিতীয় রাত স্টীমারঘাটায়, তৃতীয় রাত নৌকার মধ্যে,—এবং সেই নৌকা গতকাল সমস্ত রাত ধ'রে জলের ধাক্কায় বানচাল হয়েছে। সকাল বেলা যখন বেল্লিকমশাই উঠে চারিদিকে অকূল পাথার দেখলেন, তখন তাঁকে সান্ত্বনা দিতে যাওয়া বৃথা। সুমিত্রা তাঁর চেহারা দেখে একটু যেন ভয় পেলেন, যেন মনে হোলো ভদ্রলোক তিনরাত শ্মশান জেগে ফিরেছেন। তিনি কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন, আপনার ভারি কষ্ট হচ্ছে বেণুবাবু—কিন্তু বাড়ী গিয়ে পৌঁছলে আপনার বিশ্রামের সব ব্যবস্থা আমি ক'রে দেবো।

নৌকার মধ্যে বহুবার বেল্লিকমশায়ের মাথা ঠুকেছে, জামায় খোঁচা লেগেছে, কাপড় ছিঁড়েছে,—এবং সর্বোপরি বৃষ্টিতে এই ক'দিন ভিজতে ভিজতে তাঁর কাঁপুনি আর থামেনি। সুমিত্রার কথার জবাবে তিনি কেবল বললেন, কষ্ট কি আমার একলারই! আপনার ছেলেটির জন্যই আমার ভয়, ওর না শরীর খারাপ হয়!—এই ব'লে তিনি একটু হেসে পুনরায় বললেন, আর

বিশ্রাম! হাজিপুরের ছোটরাণীকে যদি তাঁর সিংহাসনে বসিয়ে আসতে পারি, তবে সেই আমার বিশ্রাম, সেই আমার পরম লাভ।

অত দুর্যোগের মধ্যেই সুমিত্রার কর্ণমূল একটু রাঙা হয়েছিল। কিন্তু এই কয়দিনে আরো যেটুকু অন্তরঙ্গতা উভয়ের মধ্যে ঘটেছিল তারই কথা স্মরণ ক'রে সুমিত্রা বললেন, কলকাতায় অবিশ্যি একদিন আপনাকে ফিরতেই হবে, কিন্তু অত্রিকে আপনি মনে না রাখলে চলবে না—

বিলক্ষণ! বেল্লিকমশাই বললেন, এ চারদিন পথে ঘাটে যত গল্পই না ক'রে থাকি আপনার সঙ্গে,—একটি কথা আমি ভেবেছি বৈকি সারাক্ষণ,—ভাবছিলুম এত তাড়াতাড়ি সে কথাটা বলবো না—

সুমিত্রা বললেন, কি বলুন ত' ?

বেল্লিক যেন এক মস্ত পরিকল্পনা চেপে রেখে বললেন, হ্যাঁ, বলবো বৈ কি। কিন্তু আগে পৌছই, ধীরে সুস্থে সে-কথা হবে।

বেণুবাবু হাসলেন। বললেন, তবে শুনুন—আপনার এখানে রামরাজত্ব যত বড়ই হোক, কলকাতা হোলো বাঙলার নাভিকেন্দ্র। ওখানে আপনার একটা পাকা ব্যবস্থা থাকা চাই। অত্রি এখানে যদি বড় হয় হোক, কিন্তু ওকে মানুষ হ'তে হবে সেখানে। সেখানে দাঁড়িয়ে ওকে নিজের ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তুলতে হবে।

সেকথা আমারও মনে আছে, বেণুবাবু। কিন্তু যৌথ পরিবারের বউ ত' আমি,—পাছে মীরার সঙ্গে মামলা বাধে এইজন্য কথাটা এখনো স্থির করিনি।

আছে! বেণুবাবু হাত তু'লে জানালেন, সে-ব্যবস্থাও আছে। আপনার বিশ্বাসী যদি কোন ব্যক্তি কলকাতায় থাকে, তবে তার বেনামীতে সবই আপনি করতে পারেন। কে জানছে? কে বা বাধা দিতে ছুটে আসছে!

অল্প অল্প বৃষ্টি, তবু অত্রি আর বসন্ত দুজনে বসেছিল নৌকার ছাদে। অত্রির মাথার ওপর চাপানো ছিল বেল্লিকের ওয়াটারপ্রুফ। ভিতরে বসেছিলেন বেল্লিকমশাই আর সুমিত্রা। কাল সন্ধ্যা থেকেই এ নৌকায় বসবাস চলছে, এবং কাল রাত্রে মাঝি-মাল্লার সাহায্যে কোনমতে সুমিত্রা দুটি ভাত ফুটিযে ওদের দুজনকে খেতে দিয়েছিলেন। আহারাদির ক্লেশ এবং অতটুকু সঙ্কীর্ণ জায়গায় রাত্রিবাসের কষ্টের দিকে তাকিয়ে সুমিত্রা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনাকে এত দুঃখ পেতে হবে জানলে আপনার স্ত্রী কি আপনাকে আমাদের সঙ্গে আসতে অনুমতি দিতেন, বেণুবাবু?

বেণুবাবু সুমিত্রার সকুণ্ঠ মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, আমার স্ত্রী! তিনি কি কখনো জেনেছেন যে, আপনাদের সঙ্গে এই একবছরে আমার এতটুকু ঘনিষ্ঠতা হয়েছে?

বলেন কি? জানাননি তাঁকে?—সুমিত্রা সবিস্ময়ে তাকালেন।

জানালে কি রক্ষে ছিল?

তবে কেমন ক'রে তাঁর কাছে ছুটি নিয়ে এলেন?

বেল্লিক বললেন, মিছে কথাগুলো আপনি আর নাই শুনলেন?

সুমিত্রা হাসিমুখে বললেন, আপনি কি স্ত্রীর কাছে মিছে কথা বলেন?

আপনার স্বামী কি কখনো আপনার কাছে সত্য বলতেন?

কিন্তু আপনি ত' সে-রকম স্বামী নন্!

বেল্লিক এবার হাসলেন। বললেন, সব স্বামীই সমান। প্রত্যেক স্ত্রী হাড়ে হাড়ে চেনে তার স্বামীকে! স্ত্রী ছাড়া স্বামীর সত্য পরিচয় আর কি কেউ জানে?

সুমিত্রা বললেন, কিন্তু যদি তিনি জানতে পারেন কোনোদিন? আমার জন্যেই ত' সেদিন আপনার লাঞ্ছনা হবে!

লাঞ্ছনা যদি আপনার জন্যেই হয়, তবে সইতে পারবো বৈ কি!

আমার জন্যে যদি আপনাকে লাঞ্ছনা সইতে হয়, এ আমারই লজ্জা! তবে আমার এই বিপদে যাঁর স্বামীর কাছে এতখানি সাহায্য পেলুম, তাঁর কাছে আমার ঋণ থেকে যাবে। কলকাতায় যদি কখনো আবার যাই, তাঁর সঙ্গে নিশ্চয় গিয়ে আলাপ ক'রে আসবো!

বেল্লিকমশাই সভয় দৃষ্টিতে সুমিত্রার দিকে তাকালেন। তারপর হেসে উঠে বললেন, যদি আলাপ করতে যান্ কখনো, তবে তাঁর জন্যে নিয়ে যাবেন দড়ি আর কলসী, আমার জন্যে এক ভরি আফিঙ!

সুমিত্রার গলার মধ্যে হাসি ফেনিয়ে উঠেছিল। শুধু বললেন, কেন? একথা কেন বলছেন?

বেল্লিকমশাই বললেন, সত্যি কথা বলা আমার অভ্যাস নেই, তবু বলি। পৃথিবীর কোনো সমাজের কোনো স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে আপনার মতন সুন্দরী মহিলাকে দেখলে পুলকিত হবেন, এই কি আপনি মনে করেন?

কথাগুলি খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে এবার সুমিত্রা তাড়াতাড়ি নিজেই সলজ্জ-ভাবে থামিয়ে দিলেন। বললেন, বেণুবাবু, নৌকা ঘাটে লেগেছে, এবার আমি আপনার বিছানা ছড়িয়ে দিই।—

বেণুবাবুও তারপর আর কোনো কথা বলেন নি। মাথার দিকে সুমিত্রা আর অত্রির জন্য জায়গা রেখে দিয়ে তিনি মুড়িশুড়ি দিয়ে রাত্রির মতো চুপ ক'রে গিয়েছিলেন। বসন্ত জায়গা নিয়েছিল মাঝিদের পাশে।

আজ সকালে হাজিপুরে নৌকা পৌছবে। দিক্‌চিহ্ন অনুসারে আত্রেয়ী

নদী থেকে মধুমতীতে নৌকা পাড়ি দিয়েছে। শ্রাবণের আকাশ মেঘমলিন হয়ে রয়েছে। এপার ওপারে ছোট ছোট গ্রাম দেখা যাচ্ছে। কোথাও কোথাও বা গ্রামের ছেলেমেয়েরা ঘরের দরজা থেকেই ঝাঁপ দিয়ে মাতামাতি শুরু করেছে। নৌকার ছইয়ের উপর ব'সে অত্রি মাঝে মাঝে সেই দিকে হাততালি দিয়ে উঠছে। এক সময় অত্রি নিজেই চেঁচিয়ে উঠলো, মা, ওমা, ঘাট এসেছে আমাদের।

বাঁচা গেল!—বেল্লিক বললেন।

সুমিত্রা বললেন, ঘাটে কাউকে দেখছিস অত্রি?

না, মা—।

বেল্লিক বললেন, আজকাল ছত্রিশ ঘণ্টায় নাকি বিলেত পৌঁছানো যায়! আমরা ছিয়ানব্বই ঘণ্টায় এলুম তিনশো মাইল। এবার তবে জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নেওয়া যাক্।

আপনি ব্যস্ত হবেন না, বেণুবাবু। মাঝিরা সব ঠিক ক'রে নেবে!—এই নিন্, মালখানার চাবি আর টাকার পুঁটলিটা,—আপনার কাছে রাখুন।

আমি রাখবো? কিন্তু এখানে আপনার নিজের লোক—

সুমিত্রা বললেন, নিজের লোক কি আপনি নন্?—নিন্, রাখুন। আপনার হাতে যদি ঠকি, সে আমার সইবে!

ঘাটে এসে নৌকা লাগলো, কিন্তু কাছে-পিঠে লোকজন কারোকে দেখা গেল না। বাঁধানো ঘাট উপরে উঠে গিয়েছে, উপরে উঠেই সেই মেয়েদের প্রসাধনের আগার,—সেটি জীবেন্দ্রনারায়ণের তৈরী। এই ঘাটের অনেক দূর উঁচু পর্যন্ত পাথরের বাঁধ দেওয়া আছে।

লোকজনকে না দেখে সুমিত্রা একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। তিনি এখানকার ছোটরাণী, তাঁর সম্মানবোধ যেন কিছু আহত হোলো। তিনি বললেন, নায়েব মশায়ের চিঠিখানা আপনি ঠিক সময়ে ডাকে দিয়েছিলেন ত'?

বেল্লিক বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়!

সুমিত্রার কণ্ঠে উষ্ণতা এলো। তিনি বললেন, কাছারির লোকেরা হাসনুর কথায় ওঠে বসে,—আমরা তাদের কাছে কেউ না। এর মধ্যে কোনো লোকের কারচুপি আছে, বুঝলেন বেণুবাবু। গোড়া থেকেই এরা আমার বিরুদ্ধে যেতে চায়!

টিপটিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে! মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে বেণুবাবুও এবার একটু বিরক্ত হলেন। কিন্তু এখানকার বাতাসটা যে বিরোধী, একথা প্রথমেই তাঁর মনে এলো। তিনি চুপ ক'রে রইলেন। বসন্তও মূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে ছিল!

সুমিত্রা বললেন ওরে বসন্ত, বাক্স, বিছানাগুলো নামিয়ে নিয়ে আয় বাবা। ওরা যত্ন ক'রে কাউকে আসতে দেয়নি। আমার ধারণা কি জানেন, বেণুবাবু? আমাদের আসবার আগে হাসনুই এদের কাছে চিঠি দিয়ে কলকাঠি নেড়ে রেখেছে!

বিশ্বাস অবিশ্বাস বেণুবাবুর কোনোটাই নেই। কিন্তু এটা তিনি জেনেছেন, এ যুগে পূর্ববঙ্গে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় কথা না বলাই ভালো। এদিক ওদিক তাকিয়ে তিনি যা সন্দেহ করেছিলেন তাই দেখতে পেলেন। অর্থাৎ একটি হিন্দুকেও এ তল্লাটে তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। মোটামুটি এটা তাঁর জানা ছিল, গাঁয়ে এসে ছোটরাণী পৌছবামাত্র রসুনচৌকী বাজতে থাকবে, ময়ূরপঙ্খী পাল্‌কী আসবে তাকে নিয়ে যাবার জন্য, প্রজারা আসবে ছুটে ভেট হাতে নিয়ে, কাছারিতে হৈ চৈ প'ড়ে যাবে। কিন্তু পিতৃমাতৃহীন সামান্য এক মুসলমানী তরুণীর একটি চিঠির আঘাতে যদি সমস্তটাই লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়ে থাকে, তবে সে-মেয়ের আশ্চর্য প্রতিষ্ঠা এখানে, সন্দেহ কি?

দু' একটি গ্রাম্যবধূ দূর থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল, এবং কাছের দিকে এগিয়ে এলো দু'একজন জেলে আর হাটের লোক। বেণুবাবু সাহস ক'রে তাদেরকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা এখানকার লোক বুঝি? তোমরা, মানে আপনারা?

তারা সহসা কথার জবাব দিল না। সুমিত্রা বললেন, ওরা মুসলমান, আমার প্রজা। আসুন বেণুবাবু, আমরা যাই—

একটি লোক এগিয়ে এসে অত্রিকে চিনলো। বললে, দাদা, কোথা ছিলে এদ্দিন? রাজাবাবুরা মরেছে শুনি?

অত্রি বললে, হ্যাঁ, তাঁরা মারা গেছেন।

দ্বিতীয় লোকটি বললে, হাসু বানু আসেনি?

আসবে! –ব'লে অত্রি মায়ের সঙ্গে এগিয়ে চললো।

অদূরে বাঁহাতি হাটতলায় লোকজন বিকিকিনি আরম্ভ করেছে। কয়েকজন এদিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। বেল্লিকমশাই আড়ষ্ট হয়ে ত্রাহিমধুসূদন জপ করতে আরম্ভ করলেন। পূর্ববঙ্গ সম্বন্ধে যা কিছু তিনি খবরের কাগজে এযাবৎ প'ড়ে এসেছেন, সেইগুলোই যেন চারিদিক থেকে হাঁ ক'রে তাঁর দিকে তেড়ে আসছিল।

দূরের থেকে রাজবাড়ী দেখা গেল। প্রকাণ্ড একটা দীঘির শেষ অংশটা পশ্চিমপ্রান্ত অবধি এসে আবার রাজবাড়ীর দিকেই ঘুরে গেছে। রাজবাড়ীর গা-ঘেঁষে মস্ত এক মন্দির। বেল্লিক বুঝতে পারলেন এটাই ঠাকুরদীঘি, আর

ওটা হোলো সেই শিবমন্দির। তিনি কল্পনা ক'রে রেখেছিলেন, কাকাতুয়ার কর্কশকণ্ঠ ও ময়ূরের কেকারব বহুদূর থেকে শোনা যাবে। কিন্তু দূরের থেকে দেখা যাচ্ছে রাজবাড়ী জনহীন। সমগ্র প্রাসাদ যেন শোকাচ্ছন্ন; বড় বড় নক্সা-কাজকরা স্তম্ভগুলো যেন অনির্দিষ্ট দুর্ভাবনা আর আশঙ্কা নিয়ে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে।

সামনে পদ্মদিঘীর সাঁকো। সেখানে জল আর পদ্ম দুই আছে, কিন্তু ফোয়ারাটায় আর জল পড়ে না। পথের দুদিকে ছিল মৌসুমী লতা আর ফুলের সজ্জা,—সেগুলো নেই, আছে আগাছার দীর্ঘ জঙ্গল। ওদের মাঝখান দিয়েই সুমিত্রা, অত্রি আর বেণুবাবু চললেন। সুমিত্রার মনের ভিতরে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। অত্রি ছিল ক্ষুধায় কাতর, আর বেণুবাবু ভাবছিলেন চারিদিকের সংশয়, অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্রের মাঝখানে কোনমতে আপাতত একটা নিরাপদ আশ্রয় পেলে তিনি বাঁচেন। গ্রামের মধ্যে তখন অল্পবিস্তর জানাজানি হয়ে গেছে।

কিন্তু রাজবাড়ী শূন্য ছিল না, এইটিই হোলো ভাগ্যের বিদ্রূপ। বড় দেউড়ীর সামনে এসেই দেখা গেল সশস্ত্র এক সেপাই। দীর্ঘ, শীর্ণ, কঠিন কোন্ অজানা দেশের লোক—সহসা তা'কে দেখেই সুমিত্রা আড়ষ্ট হয়ে উঠলেন! লোকটা সম্ভবত পাঠান,—চেহারাটা গ্রে-হাউণ্ডের মতো। কিন্তু যত কর্কশ তা'কে মনে করা গিয়েছিল ততটা সে নয়। সুমিত্রাকে দেখেই তার মুখমণ্ডলে কোথায় যেন বিস্ময়-মেশানো হাসির ঝলক খেলে গেল, তারপর সে ডানকাঁধে বন্দুকটা রেখে বাঁ হাতে নিজের গোঁফের কোণে হাত দিয়ে কি একটা অদ্ভুত ভাষায় প্রশ্ন করলো, এক বর্ণও কেউ বুঝলো না।

অত্রি ধরা গলায় বললে, মা, ফিরে চলো!

চুপ কর, অত্রি—অত ভয় আমি করিনে।—এই বলে সুমিত্রা হাত নেড়ে একপ্রকার বোঝাতে চাইলেন, ভিতরে কে আছে, খবর দাও।

এমন সময় একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এলো। তাঁকে দেখামাত্র সুমিত্রা চেঁচিয়ে উঠলেন ফকিরের মা?

ফকিরের মা পলকের জন্য হতচকিত। তারপর সে কলরব ক'রে উঠলো, ওমা, ছোট বৌমা যে! কখন্ এলে? কোথায় ছিলে? তোমাদের ঘরসংসার যে লণ্ডভণ্ড! এসো মা, এসো,—ওরে এই, উনি আমাদের ঘরের লোক, ছেড়ে দে। ইনি কে, বৌমা?—এসো দাদা, এসো—সোনার চাঁদ এসো।

সুমিত্রা এতক্ষণ পরে চেনামানুষকে পেয়ে হাঁপ ছাড়লেন। দেখতে দেখতে তাঁর মুখচোখ গৌরব-গর্বে দীপ্ত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, ইনি আমার আত্মীয়, ফকিরের মা।

হঠাৎ ফকিরের মা কেঁদে উঠলো—ছোট বড় দুই রাজাই গেল, এইটি রইলো বংশের বাতি! আহা, বাছার কী চেহারা হয়েছে!

বসন্তর সঙ্গে মাঝিরা জিনিসপত্র এত রাস্তা পর্যন্ত বয়ে এনেছিল। এবার সেগুলো রেখে তারা স'রে দাঁড়ালো। ফকিরের মা বললে, যা এখন তোরা,—এসব রাজবাড়ীর মাল,—যা তোরা!

তারা গেল না, দুজনের একজন বললে, হোক না রাজবাড়ীর মাল, আমাদের মেহন্নতের পয়সা দেবে ত'?

ফকিরের মা বেণুকের দিকে তাকিয়ে বললে, ওই দেখো বাবা, আজকাল রাজবাড়ীর আর খাতির নেই! যা নিচে ছিল তাই ওপরে উঠেছে,—নৈলে এই বাড়ীর দেউড়িতে দাঁড়িয়ে ওরা পয়সা চায়? এত বুকের পাটা ওদের? আমিও ত' মোছলমানের মেয়ে, তাই ব'লে কি মুড়ি-মিছরির এক দর? দাও বাবা, ওদের হাতে কিছু না দিলে ওরা শুনবে না!

বেণু পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বা'র করে ওদের হাতে দিলেন।

ফকিরের মা সকলকে সঙ্গে নিয়ে পরম উৎসাহে আর আনন্দে ভিতর-মহলে গেল। ঘরের পর ঘর প'ড়ে রয়েছে—একটি ঘরে মালপত্র রাখা হোলো। সুমিত্রা একবার থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, ভেতরে কাদের গলা শুনছি ফকিরের মা?

ফকিরের মা একবার সুমিত্রার দিকে তাকালো, তারপর মুখখানা ঝট্‌কা দিয়ে বললে, কপালখানা! সব বলবো, আগে ভেতর থেকে আমার দাদাকে কিছু খাইয়ে আনি বৌমা।—এই ব'লে অত্রিব হাত ধ'রে ভিতরে যাবার আগে সে পুনরায় বললে, ওরে বসন্ত, ঘরের লক্ষ্মী ঘরে ঢুকলো, দেখছিস্ ত'? ওদের সব গুছিয়ে দে,—আমি এদিকের ব্যবস্থা করিগে। সাবধান, বিধবা মানুষ,—আমাদের মুখরক্ষে করিস্।

মাঝপথে যেতে যেতে অত্রি প্রশ্ন করলো, দিদি, ওরা কে?

জানিনে ভাই—ফকিরের মা জবাব দিল, ওরা সব সরকারি লোক, সাত দেশ থেকে এখানে চড়াও হয়েছে। ইড়িমিড়ি কখন কি বলে বুঝিনে। ওপরে এসে রয়েছে বড় সাহেব, ওরা বলে হামিদ সাহেব। লোক-লস্কর, সেপাই—এই ত' সারাদিন, বাছা! আয় ভাই।

ওরা কি থাকবে আমাদের বাড়ীতে?

তোমাদের বাড়ী। হ্যাঁ, তা নয়ত কি? এসবই তোমাদের। তোমরা ভাই ছিলে না এদ্দিন, ওরা এসে ঢুকেছে।

এদিকে বেণুবাবু এক জায়গায় এসে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। জিনিসপত্র

গুছিয়ে রেখে সুমিত্রা এসে বললেন, দেখতে পাচ্ছি দোতলার সব হলগুলো ওরা দখল করেছে। কিন্তু একথা জানবেন বেণুবাবু, হাওয়া আজকে যতই বদলে থাকুক, আমার বিনা হুকুমে আমার বাড়ীতে সেপাই দাঁড় করিয়ে কারো বাড়ী দখল করবার অধিকার নেই। দেশ ভাগ যদি হয়ে থাকে হোক, কিন্তু আমার ঘর দখল করার আইনসঙ্গত শক্তি কারো নেই, বেণুবাবু।

বেণুবাবু আস্তে বললেন, আপনারা চ'লে গিয়েই মুস্কিল হয়েছে। একটি প্রাণীও না গেলে এসব দখলের কথা উঠতো না। পালিয়ে গেছেন ব'লেই ত' শোবার ঘরে হাত পড়েছে! যাক্, আবার কেউ না শোনে! কপালে কি আছে জানিনে!

সুমিত্রা বললেন, কিচ্ছু না, কোনো ভয় নেই! আপনি দেখে নেবেন আমার প্রজারা এসব বরদাস্ত করবে না! কি জানেন, যা কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে তার জন্য দায়ী দু'জন—আমার ভাসুর, আর ওই কালনাগিনী হাসনু। শয়তান গাছে ফলে না, বেণুবাবু।

হাসনুর মুখখানা মনে পড়লে তার ওপর বেণুবাবুর আর কোনো আক্রোশ হয় না। তিনি শুধু বললেন একসঙ্গে এতকাল থাকলে কি হবে! হিন্দু-মুসলমান কেউ কাউকে চেনে না! বুঝলেন ছোটরাণী, জাত নিয়েই কানাকানি হয়ে এসেছে, মন নিয়ে জানাজানি হয়নি!

এইবার হবে বেণুবাবু—সুমিত্রা বললেন, এইবার আমার হাতেই প্রায়শ্চিত্ত হবে। আমি দাঁড়াবো গিয়ে সকলের মাঝখানে, আমি ওদের সকলের ভার তুলে নেবো। কিন্তু কি জানেন, মীরা কিছুই করবে না, আমি তাকে জানি,—কিন্তু ওই ডাইনি, একমুঠো ভাতের বেশি যার এখানে কোনো পাওনা ছিল না,—ওই হাসনুই কলকাতায় ব'সে হয়ত কলকাঠি টিপবে।

বেল্লিকমশাই বললেন, ঘাটে নেমে পর্যন্ত হাসনুর কথাই শুনছি চারিদিকে,—ওর কি এত প্রতিপত্তি ছিল এখানে?

হবে না কেন?—সুমিত্রা যেন আগুন হয়ে উঠলেন, প্রভুভক্ত জীব মনে করে, ঠাকুরঘর থেকে রান্নাঘর—সব জায়গাতেই তার সমান অধিকার। নিজের কতটুকু দাম, সে কি বোঝে? আমার ভাসুর ওর দু'দুবার বিয়ে দিলেন, কিন্তু এই সম্পত্তির লোভে দুবারই স্বামী ছেড়ে চ'লে এলো। নিকে করলো একজন, তাকেও লাথি মেরে তাড়ালো। নিজের জাতকে এমন ঘেন্না করতেও আর কাউকে কখনো দেখিনি!

বেল্লিকমশাই তখনকার মতো চুপ ক'রে গেলেন।

রান্নাবান্নার আয়োজনটা একরকম ক'রে অগ্রসর হ'য়ে গেল। ফকিরের

মা বললে, আমি ত সব জানি, আমার হাতে ওসব হবার যো নেই। বিধবা মানুষের রান্নার ব্যবস্থা সব আলাদা,—বসন্তকে দিয়ে সব আমি ব্যবস্থা করেছি। বলি, শোনো বৌমা, হাটতলা থেকে টগরকে আনিয়েছি, রাখু চক্কোত্তি এসেছে, নীলু এনেছে আলো চা'ল, শশী গয়লার কাছ থেকে দই আর দুধ, ঘরের আনাজ তরকারী,—তুমি এ বাড়ির 'ছোটরাণী, তোমার ভাবনা কি বৌমা?

সুমিত্রা বললেন, এঁদের ব্যবস্থা করেছ, ফকিরের মা?

ওমা, তা করবো না গা? হাবু মোড়লের মেয়ে আমি জাত মোছলমানের বাচ্চা,—কাজে আমার ভুল পাবে না। বড়দীঘির মাছ, হাঁসের ডিম, যদি বলো তবে কুঁকড়োর মাংস, দুধ মালাই,—ঘরের গাওয়া ঘি। তেল এদেশে নেই বৌমা, সব ঘিয়ের রান্না!—ফকিরের মা বললে, আমি চললুম। তোমরা চান্ ক'রে নাও বৌমা, এবার হবিষ্যি চড়াবে। আমি ব'লে আসি ওদের।

প্রাসাদের এ অংশটায় আগের লোক জন বিশেষ থাকতো না। মাঝখানের একটি দরজা বন্ধ করলে এ-মহল একেবারে পৃথক মনে হয়। যতদূর মনে পড়ছে, সুমিত্রা দু-একবার মাত্র এদিকটায় ঘুরে গেছেন,—এর বেশি এদিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও ছিল না। সাধারণত কোনো নায়েবের পরিবার অথবা বাইরের কোনো মধ্যবিত্ত অতিথি, কিম্বা নবাগত কোনো সাধারণ সরকারী লোক—এরা এসে এ-মহলে এক-আধ রাত্রি বা'স করে যেতো। বাড়ীর মহিলাদের পক্ষে এদিকে আসার কোনো কারণই ঘটেনি।

ফকিরের মার যত আকিঞ্চনই থাকুক, সমস্ত চেহারাটাই যেন বাইরের অতিথি আপ্যায়নের মতো। বেণুবাবুর খরদৃষ্টি সমস্তটাকেই বিচার ক'রে যাচ্ছিল। উপরতলাটা রইলো অধিকারের বাইরে, নিচের তলার ভালো দুখানা ঘর এবং রান্নাবান্না স্নানের ঘর সমেত একটি মহল সুমিত্রাকে ছেড়ে দেওয়া হোলো। উপরে আছেন কেন্দ্রীয় সরকারের একজন বড় কর্মচারী, বিহারবাসী, নাম আবদুল হামিদ। দেউড়ীতে সশস্ত্র সিপাহী দেখে তাঁর প্রতিপত্তি সম্বন্ধে বেল্লিকমশায়ের আর কোনোও সংশয় নেই। পূর্ববঙ্গে প্রথম পদার্পণ করার আগে পর্যন্ত তাঁর মনে যে-আশঙ্কা ছিল, এখানে প দিয়ে অতটা আশঙ্কা না থাকলেও তাঁর দুর্ভাবনা একটুও কমেনি। উপরতলাটা হামিদ সাহেবের দখলে, এবং তাঁর লোকজনও কম নয়। ইতিমধ্যে উপর থেকে এক-আধবার নারীকণ্ঠও তাঁদের কানে এসেছে। বুঝতে পারা যায়, হামিদ সাহেব এখানে সপরিবারেই বাস করেন। এ বাড়ী কা'র, এখানে

তাঁর থাকার শর্ত কি, অনুমতি নেবার কোনো বালাই আছে কিনা, এ-বাড়ীর সমস্ত আসবাবসজ্জা কিভাবে রক্ষিত আছে, এবং আছে কিনা, এসব আনুপূর্বিক জানবার মতো দুঃসাহস সুমিত্রার নেই ব'লেই তিনি বিশ্বাস করেন। একথাও তিনি গত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চিন্তভাবে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছেন যে, লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করবার মতো ব্যক্তিত্ব আপাতত চৌধুরী বংশে আর কা'রো নেই।

আহারাদির পর একসময় বসন্তকে দিয়ে সুমিত্রা ফকিরের মাকে ডাকিয়ে আনলেন। ফকিরের মা ছুটতে ছুটতে এলো। বললে, মোছলমানের মেয়ে হ'লেও বামুন-শুদ্দর মানি, বৌমা। বামুনের হবিষ্যির কাছে শুদ্দর হয়ে থাকি কেমন ক'রে?—হ্যাঁ, বলেছি আমি বড় সাহেবকে।

কি বলেছ, ফকিরের মা?

সত্যি কথাই বলেছি। বললুম, বাড়ীর মালিক এসেছে, তুমি সাহেব এবার পথ দেখো। যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই! বড় রাজা যদি থাকতো তবে দেখাতো ঘুঘুর ফাঁদ! মানে-মানে এবার স'রে পড়ো।

হামিদসাহেব কি বললেন?

গলা নামিয়ে ফকিরের মা বললে, মেড়ো কিনা, তাই দাড়িতে হাত বুলিয়ে হাসে। ওদের মনের কথা বোঝে—কা'র বাপের সাধ্য?

সুমিত্রা বললেন, কিন্তু আমি যে তাঁর সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই, ফকিরের মা। তুমি তাঁকে একবার আসতে বলো দেখি?

এক্ষুণি আমি গিয়ে খবর দিচ্ছি, বৌমা।—ফকিরের মা তৎক্ষণাৎ ছুটলো।

বেল্লিকমশায় একটু ব্যস্ত হয়ে বললেন, কিন্তু—আপনি কেন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চান?

সুমিত্রা বললেন, আপনার মনে কি ভয় আছে বেণুবাবু?

ভয়!—হ্যাঁ, তা আছে বৈ কি। মানে, ধরুন যদি তিনি—?

কি বলুন?—সুমিত্রা একটু হাসলেন। তাঁর শুষ্ক চুলের গোছা ঝুঁকে এসেছে ঘোমটার ভিতর দিয়ে। আকর্ণবিস্তৃত চক্ষে প্রবল ঔৎসুক্য।

বেল্লিক বললেন, আপনাকে কি বুঝিয়ে বলতে হবে?

সুমিত্রা পলকের জন্য মুখ নত করলেন। পর বললেন, আমি নিজে তাঁর সামনে না দাঁড়ালে কি কোনো প্রতিকার হবে, বেণুবাবু?

চাপা গলায় বেল্লিক বললেন, আমি বাইরের লোক, আপনি এখানে একা। যারা আছে তারা কেউ নয় আপনার। যদি কোনো বিপদ ঘটে?

সুমিত্রা ততক্ষণে মনস্থির করেছেন। বললেন, আপনার মনের কথা

আমার বুঝতে বাকি নেই, বেণুবাবু। মেয়েমানুষের বিপদ কি তাও জানি—!

বাধা দিয়ে বেল্লিক বললেন, শুধু মেয়ে-মানুষ নয়, এ-বাড়ীর ছোটরাণীর মান-সম্ভ্রম, তাঁর নিরাপত্তা, তাঁর—

বেণুবাবু!—সুমিত্রা মাঝপথে থামিয়ে বললেন, অধিকার ফিরিয়ে নিতে গিয়ে কাঁচের পাত্র যদি টুকরো টুকরো হয় তবে হোক—কিন্তু এ-বাড়ীর ছোটরাণী যদি তার সমস্ত অধিকার হারিয়ে ছেলের হাত ধ'রে পথে দাঁড়ায়, তবে তার পেটের অন্নই বা কেমন করে জুটবে?

বেণুবাবু বললেন, আমার মুখের ওপর একথা বললে আমি ত' শুনবো না, সুমিত্রাদেবী! আপনাকে নিয়ে যেদিন কলকাতার বাইরে পা বাড়িয়েছি, সেদিন কি আমার ভবিষ্যৎ কর্তব্যের হিসেব-নিকেশ করিনি বলতে চান?

কী আপনার ভবিষ্যৎ কর্তব্য? শুনতে পারি কি?

আজ আপনার না শুনলেও চলবে!

আপনি কি আর কোনো পথ ভেবে রেখেছেন?

সুমিত্রার উৎসুক প্রশ্নের উত্তরে বেল্লিক কিছুক্ষণ মাথা নিচু ক'রে থেকে কি যেন বলবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন এমন সময় বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। তৎক্ষণাৎ বেণুবাবু চাপা গলায় বললেন, আপনি একটু আড়ালে যান সুমিত্রা দেবী!

যাবো না, বেণুবাবু!—সুমিত্রা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। পুনরায় বললেন, মুসলমানের সংখ্যা যেখানে বেশি সেখানে যারা চির কাল বাস ক'রে এসেছে, তারা মুসলমানকে ভয় পায় না! ওঁকে আসতে দিন।

দূরের পায়ের শব্দ নিকটতর হয়ে এলো। হামিদকে নিয়ে ফকিরের মা আসছে কথা কইতে কইতে। বেণুবাবু বিবর্ণ ভয়ার্ত মুখে উঠে দাঁড়ালেন। পরমুহূর্তে হামিদসাহেব দরজার সামনে আবির্ভূত হলেন।

পুরুষোচিত স্বাস্থ্য, শান্ত দৃষ্টি, গৌরকান্তি, হাসিমাখা মুখ—হামিদসাহেব আগেই পায়ের জুতো বাইরে খুললেন। তারপর দূরের থেকেই বললেন, আদাব রাণীজি!

বন্দেগি জনাব।—সুমিত্রা দুটি শব্দ উচ্চারণ ক'রে নিজের হাতে একখানা কার্পেট বিছিয়ে দিলেন। বললেন, আইয়ে—!

বেল্লিক ঠকঠক ক'রে কাঁপছিলেন। হামিদসাহেব আসন নিয়ে হাঁটু পিছন দিকে মুড়ে বসলেন। তারপর মিষ্টহাস্যে বললেন হামি আপনার

মেহেরবানিতে এ প্রাসাদে জা'গা পাইয়েছি! হামিও এখন হাপনার প্রজা আছে, রাণীজি!

সুমিত্রা দুই হাত তু'লে বললেন, আপনি আবার আমার নমস্কার নিন্।

ভাঙা ভাঙা বাঙলা ভাষাটা হামিদ সাহেবের মুখে বেমানান লাগছে না, কেননা তিনি বাঙালী মুসলমান নন্। তাঁর চেহারাটা যেন মোগল আমলের ভগ্নাবশেষ। পরনে চুড়িদার, উপরে মসলিনের তৈরী বেলদার মিহি পাঞ্জাবী। হাতে হীরের আংটি ঝলমলে। কেয়ারিকরা চাঁপদাড়িটি রঙীন, চোখে কাজল, দাঁতগুলি অতি পরিষ্কার। পূর্ববঙ্গের বাঙালী মুসলমানের মধ্যে তাঁকে না মানালেও মোঘল দরবারে তাঁকে অবশ্যই মানিয়ে যেতো।

হামিদ সাহেব বেল্লিকের দিকে তাকিয়ে মিষ্ট কণ্ঠে বললেন, আপনিও কৃপা ক'রে বসুন?—হ্যাঁ, রাণীজি, আমি সামান্য লোক। আপনি এখানে আসছেন জানলে আমি এ বাড়ীতে আসতুম না। মুস্কিল কি মা আমাদের আর সব আছে, লেকিন, বাড়ীঘর নেই! পাকিস্তানের শাসন যাদের হাতে, তাদের পরিবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে! আপনি এখানে থাকলে হয়ত আপনার কাছে একটি ঘর ভিক্ষা চেয়ে নিতুম। আপনি আমাকে মাপ করুন, কাল ফজিরে আমি এ-বাড়ী আপনারই হাতে ছেড়ে দিয়ে চ'লে যাবো! আপনার জমিন্দারী এক্তিয়ার আপনারই থাকবে!

উল্লাস উদ্দীপনা আর উৎসাহে সুমিত্রার গলা বুজে এলো। তিনি বললেন, আপনার সরকারি কাজ কোথা থেকে চলবে, মিঞাসাহেব?

হামি কোথাও তাঁবু খাটিয়ে নেবো?

তাঁবু?

শান্ত হাস্যে হামিদ বললেন, হ্যাঁ, তাঁবুতে। পাকিস্তানরাজ ত' বুতে শুরু। করাচীতে তাঁবু, ঢাকায় তাঁবু। হিন্দুস্তানী লোকেরা দিল্লীর রাজতখ্ত্ পেয়েছে, তার সঙ্গে কোটি কোটি টাকার দৌলত। তাদের মিলেচে সোনার ভারত, আমাদের মিলেছে চাঁদির পাকিস্তান। লেকিন ভারত ত' আপনা ঘর সামলাতে জানে না,—হররোজ সেখানে হুজ্জত লেগে থাকে। হামাদের পাকিস্তান শান্তির জা'গা। হাপনার মতুন ভালো জমিনদার হামাদের দেশে থাকলে হামাদের সুখশান্তি থাকবে!

সুমিত্রা বললেন, এই বর্ষায় তাঁবুতে আপনারা কেমন ক'রে থাকবেন, মিঞাসাহেব?

বেল্লিক মনে মনে সুমিত্রার উদ্দীপনা দেখে ক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন। এবার হেসে বললেন, তা পারবেন বৈ কি, ওঁদের যে অভ্যাস!

হামিদ একবার বেল্লিকের দিকে ভালো ক'রে তাকালেন। পরে বললেন, হাঁ, হামাদের আদৎ আছে! হামাদের আদৎ দুখ পাওয়া, দুখ দেওয়া নয়। দুখ-ভিখের ওপর পাকিস্তানকা বনেদ আছে। যে-সন্তান ছোটবেলায় দুখ কষ্টে মানুষ, সে বড় হয়ে চরিত্রবান হয়, মানুষের মতন মানুষ হয়। ভারতের কাছ থেকে আমরা জ্ঞান পাবো, সাহায্য পাবো, না। রাণীজি, এই বাবু কে?

সুমিত্রা বললেন, উনি আমাদের পরিবারের বিশেষ বন্ধু।

পাকিস্তানের লোক?

বেল্লিক আড়ষ্ট হয়ে বললেন, না—

কুছু ভব করবেন না, হাপনি পাকিস্তানকা অতিথি আছেন! বান্দার সালাম নিন।

দুজনে প্রীতি ও নমস্কার বিনিময় হোলো। তারপব হাত জোড ক'রে হামিদ বললেন, বেযাদপি মাপ করবেন। কাল হামলোক চ'লে যাবো। বন্দেগি রাণীজি!

তাঁর উঠে দাঁড়াবাব আগেই সুমিত্রা গলা পরিষ্কার ক'রে বললেন, মিঞাসাহেব, আমার স্বাধীন দেশই আমার কাছে বড। আজ এব নাম যদি পাকিস্তান হযে থাকে হোক। ইতিহাসে অনেক দেশের নাম অনেক বদলায়, কিছু আসে যায় না। ইণ্ডিয়া নামটা অশ্রাব্য, কে না জানে! কিন্তু চ'লে এসেছে এতকাল! গান্ধার ছিল একদিন ভারত, এখন তাব নাম কান্দাহাব! হোক না পাকিস্তান, কিন্তু এখানে মানুষের বাসা হোক? পাকিস্তান বড হলে আমিও বড় হবো, কেননা এই আমার মাটি। মাটিব নাম বদলায কিন্তু মাটি বদলায় না মিঞাসাহেব, হিন্দু মাটি আব মুসলমান মাটি,—এই সর্বনেশে কথাটা আপনি ভুলিয়ে দিন। বলুন, মানুষেব মাটি! এ মাটিতে মানুষের অধিকার, এখানে এদেশের মানুষ বাস করবে!—আপনাব কোথাও যাবাব দরকার নেই, এ প্রাসাদ অনেক বড়, এখানেই আপনার দপ্তর রাখুন,—আপনিও থাকুন এখানে! আমার কোনো আপত্তি নেই।

হাত জোড় ক'রে এই রূপলাবণ্যবতী নারীর দিকে তাকিয়ে হামিদ বললেন, হাপনি তবে হামাদেরকে থাকবার হুকুম দিচ্ছেন রাণীজি?

সুমিত্রাও হাত জোড় ক'রে বললেন, এ গরীবখানায় আপনার জায়গার অভাব হবে না, মিঞাসাহেব!

হামিদ হেঁট হয়ে কুর্ণিশ জানালেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হামার জা'গা লাগবে কম, হামি একা মানুষ আছে! হামার ভগ্নি আসিয়েছেন

গুলজারবাগ থেকে, তাঁরা চলিয়ে যাবেন কাল। বন্দেগি রাণীজি, বান্দাকো কসুর মাপ কিজিয়ে।

হামিদ সাহেব চ'লে গেলেন। বেল্লিক হতবাক হ'য়ে সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে রইলেন। যা মনে করা গিয়েছিল তার বিপরীত।

এতক্ষণ পরে একপাশ থেকে ফকিরের মা কথা ক'য়ে উঠলো। আস্তে আস্তে বললে, হ্যা বৌমা, খাল কেটে কুমির আনলে না ত'? লোক কেমন বুঝলে?

সুমিত্রা সহাস্যে বললেন, ভালো লোককে এক মিনিটেই জানা যায়, ফকিরের মা!—কি বলুন বেণুবাবু?

বেণুবাবু এদিক ওদিক তাকিয়ে বললে, ফকিরের মা আমাদের আপন, ওর কথা ধরিনে। কিন্তু মেড়ো মুসলমান কিনা,—ভয় থেকেই সন্দেহ আসে!

হাসনুর মুখের চল্‌তি কথাটাই সুমিত্রার মুখে এসে পড়লো। তিনি বললেন, সন্দেহ থেকেই অশ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধার থেকেই ঘৃণা, বেণুবাবু!

বেণুবাবু বললেন, এক বাড়ীতে হিন্দু-মুসলমান! তা ছাড়া আপনি বিধবা আপনার পূজো-অর্চনা, পালা-পার্বণ—আপনার শুদ্ধাচার—!

ফকিরের মা বললে ও যা বলেছ বাবা, তেলে-জলে কি মেশে কখনো?

সুমিত্রা বললে, মেশে ফকিরের মা—নৈলে আমি কে? সকলে যদি জায়গা না পায তবে এ রাজবাড়ীব ছোটরাণী চিরকাল ছোট থেকে যাবে?

পরদিন যথাসময়ে অত্রি আর বেল্লিকমশাইকে নিয়ে সুমিত্রা রাজবাড়ীর দোতলায় উঠে গেলেন, এবং হামিদ সাহেব সদলবলে নিচে নেমে এলেন। উপরতলার সঙ্গে নিচের যোগাযোগ আগেও ছিল না, এখনও রইলো না। হামিদের ভগ্নি তাঁর সঙ্গীসাথী নিয়ে নৌকাযোগে রওনা হলেন তাঁদের দেশের দিকে। ছোকরা খানসামা আর বাবুর্চি ছাড়া হামিদের সঙ্গে আর কেউ রইলো না। হামিদ নাকি আজও বিবাহ করেননি। নিচে নামবার সময় উপরতলাটা তিনি ধুয়ে মুছে রেখে গেছেন।

প্রাসাদের পটভূমি রইলো পিছনে। এবার ছোটরাণীকে চিনতে আপনার দেরি হবে না। লুপ্ত গৌরব এবং সিংহাসন দুই তিনি পুনরুদ্ধার করলেন। হাসনু যদি আসে কোনোদিন এখানে, তবে সে দেখে যাবে সুমিত্রার শক্তি আর অধ্যবসায়। আসুক সে, নতজানু হয়ে আসুক,—আজও এলে সে অন্নভিক্ষা পাবে, আশ্রয় পাবে। সে ছাড়া চৌধুরীর পরিবারের কোনো অস্তিত্ব নেই, হাজিপুরের রাজবাড়ীর কোনো মুখপাত্রী নেই,—তার এই মিথ্যো দম্ভটা ভেঙ্গে গেছে, একথাটা সে আজ জেনে যাক্।

সুমিত্রা হাসিমুখে বললেন, আসুন বেণুবাবু, আপনাকে সব দেখাই। বাইরের মহলে ওই যে মার্বেলের দালান দেখছেন ওখান থাকতেন আমার ভাসুর ঠাকুর, আর তাঁর আদুরে মেয়ে হাসনু। এ মহলে মীরা আর আমি, সামনের অংশটায় হিরণ। হিরণের ছিল একটা লাইব্রেরী। এই দেখুন, এই হল্‌টায় মীরার বিয়ের আসর বসেছিল, আর ঠিক সেই সন্ধ্যাবেলায ডাকাতরা এসে আগুন লাগায়। এই যে, এটা আমাব মহল। কিন্তু কোথাও কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি? লুট বয়ে গেছে সব—বাদ বাকি আগুনে পুড়ে গেছে।

কা'রা এ কাজ করলো? বেল্লিক প্রশ্ন করলেন।

কা'রা? যদি কখনো আবার হাসনুর সঙ্গে দেখা হয় জিজ্ঞেস করবেন। এ বাড়ীতে নাকি প্রায তিন লক্ষ টাকার আসবাবপত্র ছিল,—ভাসুর বলতেন। কিন্তু আজ অত্রিকে ঘুম পাড়াবাব মতন বিছানাপত্রও নেই, সমস্তই আমাকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করতে হবে।

বেল্লিক বললেন, এ বাড়ীর সর্বনাশ যারা কবেছে আপনি ত' আবার তাদেরই মাঝখানে ফিরে এলেন।

সুমিত্রা বললেন, ভয় পাবার কিছু নেই, বেণুবাবু! প্রজাদের উত্তেজনা হোলো খড়েব আগুন। দাউ দাউ ক'বে হঠাৎ জ্বলে ওঠে, তাবপব আর কিছু থাকে না। আমি পালাতে চাই নি, কিন্তু আমাব পোড়া .চহাবাটার জন্যেই আমাকে ওঁরা টেনে নিযে গিয়েছিলেন। আজ আমার অনুতাপ বাখবার জায়গা নেই। সম্পত্তি ফিরে পেলুম, কিন্তু সম্পদ হাবালুম। আবাব আমাকে সব গড়তে হবে. আবার সাজাতে হবে। আমার স্বামী ক'বে গেছেন অপরাধ, ভাসুর ক'বে গেছেন অবিচাব। জমিদাবী ভোগ ক'বে গেছেন তিনি, আর আমার জন্য শুধু রেখে গেলেন দুর্ভোগ, শুধু রেখে গেলেন মাটি।

বেল্লিকমশাই ঘুরে ঘুরে অনেক্ষণ দেখে দেখে বেড়াতে লাগলেন।

সমস্যাটা দিন তিনেক পব থেকেই আস্তে আস্তে দেখা দিতে লাগলো। কিছু কিছু জিনিসপত্র আনবার জন্য সুমিত্রা ফরমাস ক'রে পাঠিয়েছিলেন গ্রামের এখানে ওখানে, কিন্তু সেগুলোর কোনো হদিস নেই। ঘরকন্নার সামগ্রী দুর্মূল্য কেবল নয়, দুষ্প্রাপ্যও বটে। সাতদিন ধ'রে এবাড়ী লুট হয়েছিল, সুতরাং থাকার মধ্যে আছে মাত্র কয়েকটা আধপোড়া কাঠের জিনিস আর দু-একটা চীনামাটির ফুলদানি। খাট-পালক, গ্লাসকেস, বাক্স-সিন্দুক—কোনটারই চিহ্ন নেই। আছে শুধু শূণ্য কক্ষ,—কক্ষের পর কক্ষ। চারদিকে তাকালে সুমিত্রার কান্না পায়।

ফকিরের মা এসে দাঁড়ালো। বললে, বৌমা, কিছু না পেয়ে ফিরে এলুম।

বললে, গরুর দুধ এসে নিয়ে যেতে হবে, দিয়ে যেতে পারবে না। আর নৈলে গরু রাখো বাড়ীতে।

সুমিত্রা বললেন, ভাঁড়ারের জিনিসপত্র ?

একটিও নেই, বৌমা। চাল ডাল দেবে কে? কারো বাড়তি নেই। তেল-নুনের দাম আগুন।

কাছারিতে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আমাদের খরচের কি ব্যবস্থা হবে ?

ফকিরের মা বললে, ওমা, তা আর করিনি! কিন্তু কোনো কথাই ওরা গায়ে মাখে না বৌমা, কেবল মিটির মিটির হাসে।

সুমিত্রা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। পরে বললেন, কাছারির মনিরুদ্দি সাহেব কি বললেন ?

উনি বললেন, দুকিস্তি রাজার খাজনা জোটেনি—আমার কিছু করবার নেই, ফকিরের মা।

উগ্রকণ্ঠে সুমিত্রা বললেন, এক বছর ধ'রে খাসমহলের ধান-পাট গেল কোথায়? তার হিসেব কই? টাকার ব্যবস্থা কি হয়েছে ?

ফকিরের মা আর কোনো কথা বললেন না। সুমিত্রা আবার কি যেন প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বসন্ত এসে দাঁড়ালো।

হ্যাঁরে, কি বললেন হামিদ সাহেব ?

বসন্ত মাথা চুলকে বললে, ওঁর ত' সরকারি চাকরি, ওঁর হাতে রাজার খাজনা জুটলেই ওঁর কাজ শেষ—এই বললেন।

সুমিত্রা বললেন, টাকার কথা ?

আপনি ধার নিলে উনি টাকা দিতে পারেন।—বসন্ত জবাব দিল।

সুমিত্রা চাবির গোছা বা'র ক'রে এনে বললেন, আসুন বেণুবাবু, দেখলেন ত' ব্যাপারখানা। আপনাকেই বলি, মালখানা থেকে কিছু নেওয়া আমার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না,—কিন্তু আমি বাধ্য হলুম নিতে। সাত পুরুষের সঞ্চয়, তার ওপর হাত দিতে আমারও হাত কাঁপে! কিন্তু আর কোন উপায় নেই।

নিচের তলায় মোটা দেওয়ালের সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে এসে সুমিত্রা বড়চাবি দিয়ে মালখানা খুলে ফেললেন। কিন্তু তার পরের দৃশ্য দেখে তাঁর সর্বশরীর হিম হয়ে এলো। ছয় পুরুষের ছয়টি সিন্দুকই খোলা রয়েছে, তাদের সেই শূন্যগর্ভে আরশোলার বাসা বেঁধে রয়েছে। পাষাণ প্রতিমার মতো কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে একসময় সুমিত্রা বললেন, এ সমস্তই হাসনুর চক্রান্ত। একটা অসচ্চরিত্র মুসলমানের মেয়ে চৌধুরী পরিবারটাকে পথে বসিয়ে দিল।

১৩

মোটর এসে থামলো তালতলার বাড়ীর দরজায়। চাবি বন্ধ ক'রে বিমলাক্ষ মোটর থেকে নেমে ভিতরে এসে ডাকলো, ঠাকুর ?

বেলা তখনও ন'টা বাজেনি, ঠাকুর সম্ভবত বাজারে গিয়ে থাকবে। ঠিকা ঝি তার কাজ সেরে বেরিয়ে যাচ্ছিল, বিমলাক্ষকে দেখে বললে, দিদিমণি এখনও ওঠেন নি, ডেকে দেবো কি, ডাক্তারবাবু ?

না থাক—আমি বাইরে অপেক্ষা করি।

একটু ঘোমটা টেনে হেসে ঠিকা ঝি বেরিয়ে চ'লে গেল। বিমলাক্ষ আড়চোখে তাব পথের দিকে একবার তাকালো। তাবপর মাথাব টুপিটা খুলে হাতে নিয়ে শোবার ঘবেব দিকে এগিযে গেল। কিন্তু দরজায় পা বাড়াবার আগে মুখ বাড়িয়ে ভিতরেব বিছানায় একবারটি লক্ষ্য ক'রেই সে দুপা পিছিয়ে এলো। হঠাৎ এলো কাঁপুনি তাব বুকের রক্তের মধ্যে, হঠাৎ গলাব ঠিক কাছে যেটা উঠে এলো সেটাকে কি যেন বলে ? মাথাটা যেন তার ঝিম্ ধ'রে এলো। এদিক ওদিক তাকিয়ে বিমলাক্ষর মনে হোলো, সদর দরজাটা সে কি বন্ধ ক'রে আসবে ! না, থাক, বন্ধ কবাটা ভালো নয়। ভবিষ্যতে মামলা বাধলে বন্ধ দরজার সাক্ষ্যটা তাব বিরুদ্ধে যাবে। কিন্তু ঠাকুর যদি হঠাৎ বাজার থেকে ফিরে এসে পিছনে দাঁড়ায় ?

ভয় কি ! বিমলাক্ষ নিজেকে একবার ঝাঁকুনি দিযে মীরার ঘবে গিয়ে ঢুকলো। জুতোর শব্দেও মীরার ঘুম ভাঙলো না। নিজের কাছে একটা কৈফিয়ৎ রাখার জন্য একবারটি সে এমনভাবে মীবার নাম ধ'রে ডাকলো, যাতে নিদ্রিতা নারীর অচেতন কানে সে আওয়াজ না ঢোকে। বিমলাক্ষব পা দুখানা ঠকঠক ক'রে কাঁপছিল, কিন্তু অনেকটা সে বেপরোয়া, অনেকটা দুর্বল, —জানলার গরাদটা ডান হাতে ধ'রে সে দাঁড়িয়ে রইলো। পাশের বাড়ী থেকে মীরাকে কেউ না দেখে এবং তার উপস্থিতিব প্রতি কা'রো চোথ না পড়ে,—এজন্য জানলার একটা কপাট সে সন্তর্পণে টেনে দিল। এটা তস্করের আচরণ সে জানে বৈ কি, এটা নোংরামি—তার চেয়ে বেশি কে জানে ! কিন্তু এই এলায়িত অচেতন তনুলতা হোলো হাজিপুরের সেই নবাব-নন্দিনীর, যার দাম্ভিক চরণের আঘাতে ঠাকুরদীঘির বেণুবীথিকার দুই পাশে মৌসুমী ফুলেরা মাথা দুলিয়ে হাসতো, আর পুরুষের রসের কল্পনা রঙীন তুলি বুলিয়ে দিত আকাশে। একদা রাজপ্রাসাদের শিখরে এই চকিতসঞ্চারিণী বিদ্যুৎলতাকে

দূরের থেকে লক্ষ্য ক'রে মধুমতীর বুকের উপরে নৌকারা পথ হারাতো। এই অগ্নিকুণ্ডের থেকে একদা স্ফুলিঙ্গের মতো ঘৃণা ঠিক্‌রে আসতো বিমলাক্ষর দিকে। আজ দেখে নাও সেই রক্তিম বিলোল বিহ্বল মদালসাকে। দেখে নাও প্রাণ ভ'রে।

ঘুমের ঘোরে মীরা একবার ন'ড়ে উঠলো। বিমলাক্ষ ছুটে পালাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু তার নড়বার শক্তি লোপ পেয়ে গিয়েছিল। সে যেন অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছিল। ছোট্ট আওয়াজে একবার ডাকলো, মীরা?

মীরা সাড়া দিল, উঁ?

আমি এসেছি, মীরা!

বালিশের মধ্যে মুখ ঘ'ষে মীরা বললে, না এলে কি হোতো?

মীরার এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। সম্ভবত বিমলাক্ষকে আজও সে পুরুষ মনে করে না। বিমলাক্ষ বললে, বাঃ তিন দিন তোমার কোনো খোঁজখবর নেই, একটু ভাবনা হয় বৈ কি। কিন্তু অনেক বেলা হয়েছে, তুমি উঠবে না?

মীরা জেগে উঠলো, কিন্তু শুয়ে রইলো। বললে, ও, তুমি! হঠাৎ সকালে যে? বেলা কত?

বিমলাক্ষ বললে, বেলা ন'টা। কত ভোরে তুমি উঠতে, আজ এত বেলা? আপিস যাবে না?

মীরা বললে, যাবো, তার আগে জানলার বাইরে তুমি একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াও দেখি?

বিমলাক্ষ লজ্জা পেয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো। মীরা উঠে ব'সে বললে, মুখের রং আর পাউডারে বালিশ দুটোর কি অবস্থা হয়েছে, আ মরি! আচ্ছা, চাকরি আমাকে আর কতদিন করতে হবে বলো দেখি? বলতে বলতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে নিজেকে গুছিয়ে সে আবার এসে বসলো। বললে, কাল রাত্রে তুমি ছিলে না? কে ছিল আমার সঙ্গে?

বিমলাক্ষ সবিস্ময়ে বললে, মানে? কী বলছ, মীরা?

না কিছু না। স্বপ্নটা সত্য হয়নি! মীরা জবাব দিল।

বিমলাক্ষ অনুযোগ ক'রে বললে, তিনদিন তোমার সঙ্গে দেখা নেই। ওখানে তোমার ঘরে চাবিও খোলা হয়নি! কাল তোমার আপিসে ফোন্‌ ক'রে জানলুম, তুমি ফ্রেঞ্চ-লীভ নিয়েছ। এ-ক'দিন ছিলে কোথায় বলো ত'?

মীরা হাসলো। হেসে বললে, আজকে আপিস না গেলে কেমন হয়, বিমলদা? আবার ঘুমোতে ইচ্ছে হচ্ছে।

সে হবে না, মীরা,—যতই হোক, এ পরের চাকরি। কাজ নিয়ে না থাকলে তোমার আরো অবসাদ আসবে।

মীরা গলা বাড়িয়ে ডাকলো, ঠাকুর?

ঠাকুর ফিরেছিল ততক্ষণে। বাইরে থেকে সে গলার সাড়া দিতেই মীরা বললে, এখানে চা দিয়ে যাও—আচ্ছা বিমলদা, আগে তোমাকে অত ঘেন্না করতুম কেন বলো ত'?

বিমলাক্ষ হাসলো। বললে, তাহ'লে বলো তোমার সেই অসুখ আমি সারিয়েছি, আমার ডাক্তারির গুণ আছে।

তোমার ডাক্তারি কেমন তা জানিনে আজও, তবে তোমার অধ্যবসায়ের গুণ আছে, মানতেই হবে।

তোমাকে আমি অনেক দুঃখে জয় করেছি, মীরা।

জয়!—মীরা বিমলাক্ষর দিকে তাকালো। পরে বললে, ঝড়ের আগে তুমি দৌড়তে পারো জানি, কিন্তু এটাকে জয় বলে না, ডাক্তার।

বিমলাক্ষ বললে, তবে এটা কি?

মীরা বললে, কলকাতার জীবনে তুমি অপরিহার্য। এ শহর তোমাদেরই জন্যে। আমার লোভ ছিল, লোভকে তুমি বাড়িয়েছ! ক্ষিদে ছিল,—দেখিয়ে দিয়েছ তৃপ্তি কোথায়! তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, বিমলদা।

মীরা, তোমার মুখের সঙ্গে মনের মিল নেই! একটা কথা মনে রেখো, গায়ের জোরে তোমার উপকার করতে ছুটিনি।

মীরা বললে, রোজ একবার ক'রে বোধ হয় তুমি শুনতে চাও আগে আমি তোমার দরজায় গিয়েছিলুম, এই ত'?

বিমলাক্ষ হেসে উঠে বললে, সকালবেলা যদি ঝগড়া শুরু করো, তবে কিন্তু তোমার আপিস যাওয়া হবে না।

ঠাকুর চা আর বিস্কুট এনে রাখলো। মীরা বললে, কি জানো বিমলদা, একটা বিশেষ কাঠামোর মধ্যে আমরা মানুষ, অঙ্কটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নির্ভুলভাবে মিলে যাবার কথা। কিন্তু মিললো, না,—একটা ভূমিকম্প হয়ে গেল। একটা আদিম জীবনে ছিটকে এসে পড়লুম। এর থেকে উঠে দাঁড়াবো কি নিয়ে? সে-মন কই? সে-ঘর কই? সে-ভাবনার ধারা কই? ঘর ভাঙলে ঘর হয়, নদী ভাঙলে এক পার ভাঙে। কিন্তু মানুষের বুক ভেঙে গেলে যে দুকূলই ভেঙে যায়!

বিমলাক্ষ বললে, মীরা, তোমাকে না মানা করেছি এ নিয়ে তুমি আর মাথা ঘামাবে না?

মীরা বললে, তবে কি নিয়ে ঘামাবো? আমার ঘৃণার বদলে তোমার ভালবাসা পেলুম কিনা, এই নিয়ে দাঁড়িপাল্লা ধরবো? বিয়ে-করা পুরুষ ভালবাসার কাঙাল হয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ালে তার চেহারা কেমন হয়, আয়না ধ'রে দেখেছ কোনোদিন? কোনোদিন দেখেছ তোমার ফিটফাট চেহারার নিচের কাঙালীকে?

বিমলাক্ষ বললে, আমি কি ওই জন্যেই তোমার কাছে আসি, মীরা?

তবে কি চাও, তুমি? বিনা মতলবেই কি বিড়াল ঘোরে পায়ে-পায়ে?

আমি—আমি তোমার ভালো চাই, কল্যাণ চাই, উন্নতি চাই!

মীরা হাসলো। বললে, তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর আমার প্রচুর উন্নতি হয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু এ উন্নতির শেষ কোথায় বলতে পারো? কোন্ কোন্ লাইনে উন্নতি আর বাকি আছে, পারো বলতে?

বিমলাক্ষ জোর দিয়ে বললে, নিশ্চয় পারি। তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াবে, চাকরিস্থানে উন্নতি করবে, অনেক টাকা হবে তোমার, পাঁচজনে তোমার অন্নে প্রতিপালিত হবে, দেশের সেবা করবে তুমি,—এই ত' আমি বুঝি।

যদি এতে আমার বিশ্বাস না থাকে!

তাহলে বুঝবো তুমি উদ্‌ভ্রান্ত! বুঝবো, তুমি তবে নিজেকে নষ্ট করতে চাও, নিজের বাঁচবার পথে কাঁটা দিতে চাও।

মীরা বিদ্রূপ কটাক্ষে বললে, পাছে আমি নষ্ট হই এই জন্যেই বোধহয় তুমি ডাক্তারখানার দোতলার ঘর ভাড়া নিয়ে আমার জন্যে আসবাব সাজিয়ে রেখেছ! এই জন্যেই বোধহয় স্ত্রীকে লুকিয়ে আমার জন্যে শাড়ি কিনে বেড়াচ্ছ? হীরের দুল জোড়াটা এনে দিয়েছ বোধহয় আমার উন্নতিরই জন্যে? আমি আল্‌গা হয়ে ঘুমিয়ে থাকলে চোরের মতন এসে আমার ওপর লোভের চক্ষু মেলে থাকো, বোধহয় আমার ভালোরই জন্যে?

মীরা! কী বলছ, মীরা?—বিমলাক্ষ হতবুদ্ধির মতো ব'লে উঠলো।

মীরা খিলখিল ক'রে হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়লো।—

তুমি কি তখন ঘুমোচ্ছিলে না?

মীরা বললে, মোটরের আওয়াজে কি আমার ঘুম ভাঙেনি? তোমার চোখ দিয়ে আমি কি নিজেকেও দেখছিলুম না?

বিমলাক্ষ অধীর হয়ে বললে, তাহ'লে বলো আমার কাছে তোমার আর কোনো লজ্জা নেই?

মনে হচ্ছে, স্বীকার করলে তুমি খুশি হও?

মীরা,—বিমলাক্ষর গলা কেঁপে উঠলো, তোমার মনের নাগাল আমি আজও পাইনে কেন বলতে পারো?

মীরা বললে, তুমি ডাক্তার, তোমার কারবার দেহ নিয়ে, মন নিয়ে নয়! তুমি মনের কথা তুলো না, ডাক্তার বিমলাক্ষ! ঘৃণা যারা সইতে পারে না তাদেরই ঘৃণা ক'রে সুখ। তুমি ঘৃণার বোঝা ব'য়ে বেড়াতে পারো এই জন্যেই তোমার কাছে হার মেনেছি, ডাক্তার।—আচ্ছা, এবার তুমি ব'সো, আমি স্নান ক'রে আসি।

মীরা উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ বিমলাক্ষ তার একখানা হাত ধরলো। বললে, মীরা, সত্যি ক'রে বলো, যারা পৃথিবীতে হিরণ হয়ে জন্মাতে পারলো না, সে হতভাগারা কি চিরদিন তোমার লাঞ্ছনা বয়ে বেড়াবে?

মীরা ভুরু কুঁচকে বললে, কি? কার কথা বলছ?

বিমলাক্ষ তৎক্ষণাৎ নিজের আবেগ সম্বরণ করলো। বললে, আমাকে পুড়িয়ে-পুড়িয়ে কেন তুমি ইস্পাত বানাচ্ছ? কোন কাজে তুমি আমাকে লাগাবে, মীরা?

হিরণের নামটা শুনে মীরা একবার থেমে গিয়েছিল। এবার সে হাসলো—বললে, কোন্ কাজে? তোমার স্ত্রীর কাছে জেনে আসবো কোন্ কাজের তুমি যোগ্য?

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে মীরা ঘর থোক বেরিয়ে গেল।

স্নানাহার সেরে আধঘণ্টার মধ্যে আবার সে ঘরে এসে দাঁড়ালো। মাথাটা ভালো মোছা হয়নি, তখনো চুলের ডগা দিয়ে জল ঝরছিল। কাছে এসে বললে, তোমার মোটরে আমাকে আপিসে পৌছে দিলে কত ভাড়া নেবে, বিমলদা?

বিমলাক্ষ মুখ ফিরিয়ে বললে, হাত তুলে যেটুকু দেবে তুমি, সেই আমার বকশিস!

তবে মোটরে গিয়ে বসো, আমি আসছি এক্ষুনি।

বেলা সাড়ে দশটা বাজে। বিমলাক্ষ উঠে বাইরে চ'লে গেল।

মিনিট দুই পরে ঠাকুর এসে দরজার বাইরে দাঁড়ালো। বললে, দিদিমণি, ওবেলায় কি রান্না হবে?

মীরা বললে, তোমার নিজের বিদ্যেয় যা কুলোয় তাই রেঁধো, ঠাকুর।

হাত কচলে ঠাকুর বললে, এ মাসে আমাদের টাকা এখনও পাইনি দিদিমণি।

কাপড়খানা জড়াতে জড়াতে মীরা একবারটি থমকে দাঁড়ালো। তা বটে,

কিছু না থাকলেও পিছনে একটা ঘরকন্না আছে। একটা অতি রূঢ় বাস্তবের দাবি আছে তার ওপর, একথা তার মনে ছিল না। এখানে সে একা, একার জন্য ঘরকন্না,—সে একান্তই একা। হাসনুরা চিঠি দিয়েছিল, কিন্তু কবে তারা ফিরবে—কিছু লেখেনি। এমনি ক'রেই হয়ত চ'লে যাবে।

ভ্যানিটি ব্যাগে টাকা ছিল, তার থেকে গোটা চল্লিশেক টাকা ঠাকুরের হাতে দিয়ে মীরা বললে, ঝিকেও চুকিয়ে দিয়ো।

ঠাকুর আবার দাবি জানালো, রেশন আনতে হবে দিদিমণি।

ও, রেশন—আচ্ছা, আর দশ টাকা নাও।—মীরা তাড়াতাড়ি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধনের কাজটুকু সেরে নিতে লাগলো।

টাকা নিয়ে ঠাকুর চ'লে গেল। পায়ে কোনোমতে হিলতোলা জুতোটা চড়িয়ে মীরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। হাতঘড়ি দেখে বিমলাক্ষ বললে, দশটা সাতাশ।

দিদিমণি। ঠাকুর আবার ডাকলো পিছন থেকে। মীরা গাড়ীতে পা তুলে আবার মুখ ফিরালো।

ঠাকুর বললে, ভাঁড়ারের জিনিসপত্র, ঘুঁটে কয়লা—এসব একেবারেই নেই।

আঃ—চুপ করো ঠাকুর—

সত্যি দিদিমণি—গয়লা এসে রোজ ফিরে যাচ্ছে। তাছাড়া ধোপার টাকা···

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে বাকি নোটের গোছা আর টাকাকড়ি সবশুদ্ধ নিয়ে মীরা ঠাকুরের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে গাড়ীতে উঠলো। বিমলাক্ষ গাড়ীতে স্টার্ট দিল। অত্যন্ত বিরক্তকণ্ঠে মীরা বললে, হাসনু হতভাগী এই ফাঁদে আমাকে জড়িয়ে চ'লে গেছে! কবে যে ফিরবে!

গাড়ী চললো। বিমলাক্ষ বললে, হাসনু বুঝি সব করতো?

নয়ত কি? ও যে পাকা গিন্নি! ঘরকন্নার খবর কোনোদিন আমরা রাখিনি। ও না থাকলে সব অন্ধকার।

বিমলাক্ষ বললে, মন্দ কি, এবার বিদেশ ঘুরতে বেরিয়েছে,—রাশ আল্‌গা। আনন্দেই আছে।

মীরা বললে, তুমি যেন বিদ্রূপ করতে চাও মনে হচ্ছে?

আমি করবো কেন? যারা তাকে জানে তারাই করবে? যে-লোভ নিয়ে সে কলকাতায় এসেছিল, তার খোরাক জুটে গেছে বৈ কি!

মানে? তুমি কি হিরণের কথা আনছো আবার?

বিমলাক্ষ বললে, মীরা, তুমি ছ'বছর আগে বি-এ পাস করেছ, আর আমি

বিলেত-ফেরতা ডাক্তার। আমরা আর যাই হই, অন্তত শিশু নই। কিন্তু আমি তোমার মনে কোনো আঘাত দিতে চাইনে।

মীরা হাসলো। বললে, হিরণের সঙ্গে তুমি ঘর করোনি বিমলদা—আমি করেছি। আমি তাকে জানি, তাকে জানতে জানতেই এতকাল আমার কেটে গেল। হাসনুকে জানি,—আরেকটা জন্ম পেলেও হাসনুকে জানা আমার ফুরোবে না।

আগুন আর ঘি পাশাপাশি আছে তা জানো, মীরা?

উপমা দিলে মিথ্যে হয়ে যাবে, বিমলদা। তুমি দেখছ আগুন আর ঘি, আমি দেখছি ফুল আর চন্দন! এটা দেখার ভঙ্গী—যে দেখে তার নিজের প্রকৃতি অনুসারেই দেখে।

বিমলাক্ষ বললে, বাবা একদিন নিজের হাতে আমাদের তিনজনকে গ'ড়ে তুলেছিলেন, নিজেদের মধ্যে ওটা আমাদের নেই।

এটা বুঝি তোমাদের নিজেদের ভেতরকার চুক্তি?

ধরো তাই।

বিমলাক্ষ একটা বিশ্রী উক্তি ক'রে বললো—তবে কি এই কথাই বুঝবো যে, তোমাদের তিনজনের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা আছে?

মীরা বললে, কিসের ভাগ?

দুয়োরাণী সুয়োরাণীর ভাগ!

মীরা হেসে উঠলো। গলগলিয়ে বললে, একবার দেখো না চেষ্টা ক'রে যদি এই লোভ দেখিয়েই হিরণের মন ভেজাতে পারো! মুস্কিল কি জানো বিমলদা, লোভ ব'লে কোনো পদার্থ নেই হিরণের মধ্যে—অসংযম ত' দূরের কথা। ওই পাথরকে হাসনু যদি ভাঙতে পারে তবে আমি খুশিই হই। তুমি পুরুষকে চেনো, সাধুকে চেনো কি? লোভীকে চেনো, কিন্তু লোভ যাকে দেখে লজ্জা পায় তাকে জানো কি?

মোটর মাঝপথে একটা বাঁক নিল। স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে এক সময় বিমলাক্ষ বললে, এত বড় কথা হিরণের সম্বন্ধে বলতে কি তোমার মুখে বাধে না?

জীবন দিয়ে এ অভিজ্ঞতা কিনেছি, বিমলদা।—নাও, গাড়ী থামাও, আপিস এসে গেছে!

ওবেলায় আসছ ত'?

গাড়ী থেকে নেমে মীরা হেসে বললে, ধরো যদি বিকেলের দিকে বিমলাক্ষর বদলে একটা কমলাক্ষ পেয়ে যাই, তাহলে কি আর যাবো তোমার ওখানে? যাও, দূর হও—

বিমলাক্ষ মৃদু হাস্যরেখা মুখে নিয়ে পিছন থেকে মীরার লীলায়িত ভঙ্গিমার দিকে কয়েক মুহূর্ত অপলক চক্ষে চেয়ে রইলো। তারপর নিশ্বাস ফেলে এক সময়ে গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে আবার স্টিয়ারিং ঘোরালো।

আঙুল দিয়ে গ্রামের যে-কোনো লোক দেখিয়ে দিত হিরণকে। বলতো, ওই হোলো রাজার জামাই! জমিদারী পাবে মেয়ে, আর জামাই হবে মেয়ের ডান হাত। আসলে জমিদারীটাই হবে জামাইয়ের যৌতুক। এ নিয়ে মীরার স্বপ্নজাল বোনবার দরকার ছিল না, কারণ এটা ছিল স্বতঃসিদ্ধ সত্য। ভিতরে-ভিতরে প্রণয়কাহিনীর কোনো অবতারণা ছিল না, সমাজনৈতিক চেতনাটাও কোনোদিন কোথাও ঘুলিয়ে ওঠেনি, কারণ এ সত্যের পরিণতিবোধ ছিল সকলের মনে। ওদের জীবনটাকেও মেলানো ছিল। তরুণ বয়সে উভয়ের মন জানাজানির কথা ওঠেনি, না উঠেছে মন দেয়া-নেয়ার! মনের মিল না হ'লে কী হোতো? বিয়ে বন্ধ হোতো কি? কখনই না।

আসলে মীরাই ভাঙলো। বিবাহকে অতিক্রম ক'রে মীরার কল্পনা ছুটেছিল। ঐশ্বর্যটা আত্মপ্রকাশের একটা বাহন—সে জেনে এসেছে। শূন্যহাতে প্রণাম করা যায় না,—সেখানে অর্ঘ্য চাই, চাই নৈবেদ্য, আনুসঙ্গিক উপচার। বড় হবার জন্য সুমিত্রা চেয়েছিলেন সম্পদ, কিন্তু পারিপার্শ্বিককে বড় ক'রে তোলবার জন্য মীরা চেয়েছিল ঐশ্বর্য। মীরা সব চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে সেইখানে। সেখানে যে কেবল তার ভবিষ্যৎ জীবনের মহৎ পরিকল্পনাটাই মার খেয়েছে তাই নয়, তার নিজ অস্তিত্বের শিকড় পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। তার দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত নেই। বিলাস সে চায়নি, চেয়েছিল বৈভব। সম্ভোগ সে চায়নি, চেয়েছিল আনন্দ। এদের বাদ দিলে জীবনে যা থাকে তার দাম সামান্যই।

আত্মপ্রকাশনার ভিন্ন উপকরণ ছিল হিরণ,—কিন্তু বৈভবকে বাদ দিয়ে হিরণের অস্তিত্ব নেই। সিংহাসনকে বাদ দিলে রাজার ব্যক্তিত্বের মূল্য থাকে যৎকিঞ্চিৎ; চালচিত্রকে বাদ দিলে প্রতিমা হয়ে ওঠে পুতুল। হাজিপুর প্রাসাদের জীবেন্দ্রনারায়ণ, আর বেলেঘাটার বস্তিতে বেল্লিকের নোংরা ঘরের জীবেন্দ্রনারায়ণ—এক ব্যক্তি ছিলেন। মীরার কাছে ওইটেই বড় শিক্ষা, ওটাই হোলো তার পথনির্দেশের অঙ্গুলিসঙ্কেত। একটা ছোট্ট জীবন বিরাট হয়ে উঠতে পারে ঐশ্বর্যের গুণে, বিরাট জীবন-সম্ভাবনা কোনো সঙ্কীর্ণ বদ্ধজলার মধ্যে এসে ঢুকলে দম আটকে মরে। কথা উঠতে পারে, বেশ ত' যা গেছে তাকে ভুলে যাও, আবার নতুন ক'রে গ'ড়ে তোল।

নিজের চরিত্রবত্তার পরিচয় দাও, আত্মিক শক্তির উদ্বোধন করো। ব'সে ব'সে কেঁদো না, দরজায়-দরজায় হাত পেতে বেড়িয়ো না। এসব কথা উঠতে পারে।

আপিসের টেবলে ব'সেই মীরা হাসলো। এ যেন ব্যাঙ্ক ফেল হবার পর নতুন ক'রে ব্যাঙ্ক গ'ড়ে তোলার যুক্তি। লৌকিক বুদ্ধি এই কথাই বলে, টাকাকড়ি ঘরবাড়ী গেছে যাক,—আবার উপার্জন করো, অবার তৈরী ক'রে নাও সব। একদা জার্মানীর হিট্‌লার লণ্ডনকে ভেঙে দিয়েছিল, কিন্তু লণ্ডন-বাসীকে মাটির থেকে উচ্ছেদ করেনি। সেখানে পুরনো ভেঙে নতুন গ'ড়ে উঠেছে অখণ্ড অধ্যবসায়ের ফলে। এখানে সে-যুক্তি নেই, কেন-না এখানে সম্পদের বিনষ্টি ঘটেনি, এখানে ধ্বংস হয়েছে অন্তরের ঐশ্বর্য। দেহ অটুট আছে, জীবনটা ছারখার হয়েছে। প্রাণীর মৃত্যু ঘটেনি, কিন্তু প্রাণের ঘটেছে সর্বনাশ। মানুষ মার খায়নি, কিন্তু মার খেয়েছে মানুষের প্রেম। মীরা হাসলো। তার নিজের কণ্ঠের মধ্যে আজ হাসুবাবুর বাণী যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। হাসুবাবু থাকলে আজ ঠিক বলতো, ঐশ্বর্যহীন জীবনের সব চেয়ে বড় বোঝা হোলো স্তূপাকার সম্পদ্। মীরা যদি কোনোমতে আজ সম্পদ্ আহরণ করে, তবু হাজিপুরের ঐশ্বর্য তার ফিরবে না। হিরণের সঙ্গে যদি সে আজ কেবলমাত্র স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাস করতে প্রস্তুত হয়, তবে কেমন চেহারা দাঁড়াবে? সুখের ঘরকন্না? প্রেমের শান্তিনিকেতন? আনন্দের মধুকেন্দ্র?—মীরা আবার ঠোঁট্ উল্‌টিয়ে হাসলো। সে ত' প্রেমপাগলিনী নয়। 'কপোত-কপোতী যথা বাসা বাঁধি থাকে উচ্চ বৃক্ষচূড়ে'—সেই ক্ষণসুখোন্মত্ত হীনবৃত্ত কপোতীর সুখচিন্তা ত' তার নেই! হিরণ তার যৌন চেতনার অবলম্বন-মাত্র নয়; তাকে ঘিরে সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো শিশু প্রতিপালন পরিকল্পনা সে ত' করেনি। কেবলমাত্র তেল-নুন-কাঠের ঘরকন্না, আহার-নিদ্রা-মৈথুনের ঘরকন্না,—যেখানে অভাবের মধ্যে ক্ষুদ্র সন্তোষ, দারিদ্র্যের মধ্যে তুচ্ছ তৃপ্তি, রোগ-শোক-দুঃখে দরিদ্রা ছিন্নবস্ত্রা বাঙালীনীর ক্ষীণ হাসি, অর্ধনগ্ন অপুষ্ট শিশুপালের ইতর জীবনযাত্রা, আসন্ন বার্ধক্যের আতঙ্কে নগণ্য সঞ্চয়; তারপর একদিন ক্লিন্নক্লিষ্ট জীবনের শেষ দেনা শোধ করে নিঃশব্দে চ'লে যাওয়া,—এই ভয়াবহ অপচয়ের ত' হিরণ নয়। এর চেয়ে ভালো মৃত্যু, এর চেয়ে ভালো অপমৃত্যু—এর চেয়ে ভালো একক জীবনের শোচনীয় বীভৎস পরিণাম। তবু হিরণকে ডেকে এনে একথা বলা চলবে না যে, আমাদের সম্মিলিত জীবনের সমস্ত উচ্চাভিলাষ অনাস্বাদিত থেকে যাক্, ঘুচে যাক্ আমাদের আবাল্যের স্বপ্ন, মুছে যাক্ আমাদের আশৈশবের ছবি, তুমি এসো, তোমাকে নিয়ে

সঙ্কীর্ণের অন্ধ সুড়ঙ্গের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই! তার চেয়ে হিরণের মৃত্যু হোক, তার সঙ্গে হোক নিজের সহমরণ।

কাগজপত্র সরিয়ে রেখে মীরা উঠলো। ঘড়িতে পাঁচটা বেজে দশ। অনেকেই চ'লে গেছে। ভ্যানিটি ব্যাগটা তুলে নিয়ে ডেস্কে চাবি বন্ধ ক'রে সে বেরিয়ে এলো। যে-প্রশ্ন উঠেছে তার মনে, তার সিদ্ধান্ত হওয়া চাই বৈকি। যে-কথা উঠেছে হিরণকে নিয়ে তার সম্পর্কে, তার নিষ্পত্তি না হ'লে সত্যিই চলবে না। নিরিবিলি মাঠের মধ্যে গিয়ে জলের ধারে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা প্রতিবিম্বিত না দেখলে নিজের সঙ্গে আলাপ চলবে না। মীরা আপিস থেকে বেরিয়ে পথে নামলো।

হঠাৎ মোটরের হর্ন বাজলো পাশের থেকে। মীরা চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে দেখে, হাসিমুখে বিমলাক্ষ গাড়ীতে অপেক্ষা করছে। মীরা শিউরে উঠলো, হেসে উঠলো তার সঙ্গে। হাসিমুখে বললে, কেউ কিছু নয়, তুমিই আমার নিয়তি!

বিমলাক্ষ বাঁ হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিয়ে বললে, কি বললে?

মীরা উঠে তার পাশে ব'সে বললে, বলছিলুম তুমিই আমার সর্বনাশা! ভেবেছিলে বুঝি বা আমি তোমার হাতছাড়া হয়ে যাই? কিন্তু ভয় নেই তোমার, বাঘে ধরলে আর কোনো জন্তু কাছে আসে না!

গাড়ী চালিয়ে দিয়ে বিমলাক্ষ প্রশ্ন করলো, আমার মনে ভয় ছিল কেমন ক'রে তুমি জানলে?

শিকারী জন্তু মাত্রেই ভীতু,—শিকার হারাবার ভয়!

বিমলাক্ষ বললে, আমাকে গালাগালি দেবার আগে একথা ভেবে দেখো যে, আমার ওখানে যাবার মতো গাড়ীর ভাড়া পর্যন্ত নেই তোমার হাতে!

মীরা বললে, কেমন ক'রে জানলে?

খুলে দেখো তোমার ভ্যানিটি ব্যাগ? বাড়ীর ঠাকুরের হাতে সমস্ত টাকা পয়সা দিয়ে এসেছ, মনে নেই?

মীরা কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো। পরে বললে, এত বিবেচনা তোমার? এতই কি ভালো তুমি?

বিমলাক্ষ এবার স্বভাববিরোধী কথা ব'লে বসলো,—একথা আমি ভুলিনে মীরা, আমার বিধবা মা তোমার বাবার অন্ন খাইয়ে আমাকে বড় ক'রে তুলেছিলেন। আজ নিজের মোটর নিজে চালাই,—এর পেছনে তোমাদেরই টাকা মীরা!

মীরা বললে, বিমলদা, আমাকে মোটর চালানো শেখাতে পারো?

নিশ্চয় পারি!

মোটর কিনে দিতে পারো?

বিমলাক্ষ স্টিয়ারিং ধ'রে তার দিকে তাকালো। বললে, যদি বলি, তোমাকে মোটর কিনে দিতে পারলে ধন্য হই?

আঃ—আবার ওই কথা,—মীরা ধমক দিয়ে উঠলো, তুমি যে ভালো এ আমি শুনতে চাইনে, তুমি যে ক্ষমতাবান এই শুধু জানলেই আমার চলবে!

মীরা, ক্ষমতাবান লোক যে ভালো হ'তে পারে, একি তুমি বিশ্বাস করো না?

মীরা বললে, করি, কিন্তু সে-আলোচনা তুমি নাই করলে?

বিমলাক্ষ চুপ ক'রে গেল। অনেকক্ষণ পরে চাপা নিশ্বাস ফেলে সে বললে, আমি গাড়ী নিয়ে না এলে তোমাকে আমার ওখানে হেঁটেই যেতে হোতো, কি বলো?

হাসিমুখে মীরা বললে, তোমার কাছে সেজন্যে আমি অসীম কৃতজ্ঞ শুনে রাখো। কিন্তু আমি যে তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম, একথা কে বললে?

কোথায় যাচ্ছিলে তবে?

যদি বলি কমলাক্ষর ওখানে?

কমলাক্ষ কে?

বিমলাক্ষ আর বিশালাক্ষের স্বগোত্রীয়!—এই ব'লে মীরা খুব হাসলো। হেসে বললে, তোমাকে ভালো ক'রে চিনলে কলকাতাকে চেনা যায়। তোমরা অনেকেই এক, কেবল নামেই তফাৎ।

বিমলাক্ষ এবার একটু আহত হোলো বৈকি। বললে, পুরুষ মাত্রেই যদি তোমার চোখে ছোট হয়, তবে হিরণ বড় হয় কেমন ক'রে?

আবার হিরণের কথা!—মীরা শান্তকণ্ঠে বললে, হিরণ যে পুরুষের চেয়ে অনেক বড়! কেন তোলো তার কথা বার বার?

ডাক্তারখানার দরজা এসে গেছে। পাশেই গলির মধ্যে গাড়ীবারান্দা। বিমলাক্ষ বললে, গাড়ী এখানেই রাখি। তুমি ওপরের ঘরে গিয়ে ব'সো, আমি এক্ষুণি আসছি।

মীরা বললে, আবার ঘরে কেন? ঘর দেখলেই ঘরের জিনিসপত্র আমার ভাঙতে ইচ্ছে করে! না, ঘরে নয়—চলো,—বাইরে, মাঠে, গঙ্গার ধারে—যেখানে হোক। ঘরে নয়।

তাহ'লে গাড়ীর মধ্যেই অপেক্ষা করো, আমি আসছি।

না, গাড়ীতে নয়, ঘরের মধ্যে চলো!—এই ব'লে মীরা তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে ডাক্তারখানার পাশ দিয়ে উপরের সিঁড়িতে উঠে গেল।

বিমলাক্ষর অনেক কাজ আগে সারা ছিল। দু একজন রোগী তার জন্য

অপেক্ষা করছিল। বিমলাক্ষ শশব্যস্তে এসে ভিতরে ঢুকেই রোগীদের নাড়ি দেখতে ব'সে গেল। একজনের পর একজন, মোট জন চারেক। একজন সহকারী মেডিক্যাল ছাত্র সামনে এসে দাঁড়ালো। বিমলাক্ষর নির্দেশমতো ব্যবস্থাপত্রগুলি লিখে নিল। রোগীদেরকে পথ্য নির্দেশ দেবার পর দু'তিনটা আলমারী ও টেবিলের ড্রয়ার সে খুললো। অনেক কিছু নিল এবং রাখলো। তার-পর এক সময় আবার দ্রুতপদেই ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে উপরে উঠে গেল।

উপরের ঘরে পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকেই বিমলাক্ষ অবাক! এরই মধ্যে মীরার স্নান করা কাপড় পরা সব হয়ে গেছে। বিমলাক্ষর উপহার দেওয়া সেই দামী জর্জেট শাড়ি প্রথম পরেছে সে; আস্কন্ধ নগ্ন বাহু পেরিয়ে গায়ে সেই নীলরঙের ব্লাউজ—পিঠের দিকে বাদামী ডিজাইনের ফুটো, ওর ভিতর দিয়ে শুভ্ররক্তিম পিঠের একটুখানি লাবণ্য দেখা যায়। এই ব্লাউজ প'রে গ্র্যাণ্ড হোটেলের সর্বনাশীরা কার্পেট-মোড়া সিঁড়ি বেয়ে মধুচ্ছন্দ চরণে উপরে উঠে যায়। গোলাপের পাপড়ির মতো ওষ্ঠাধরে পুরুষের হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত নিয়ে লেপন করা হ'য়েছে, দুই চক্ষে বনহরিণীর মায়াকাজল, কম্বুগ্রীবায় রক্তিম প্রবালের মালা; তারপরে নিচের দিকে যতদূর নেমে যাও—পাদমূল অবধি মদন ও বসন্তের মায়াকানন। সমগ্রভাবে মিলিয়ে দেখলেই মুখে আসবে, পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা! এমন সাজসজ্জার ঘটা আর কোনোদিন বিমলাক্ষর চোখে পড়েনি।

তুমি যে বললে ঘরেই থাকবে?

মীরা হেসে বললে, এ বারুদের স্তূপকে ঘরে রাখবে কোন্ ভরসায়? তার চেয়ে বাইরে গিয়ে এর বিস্ফোরণ হোক,—চলো!

কোথায় যাবে, মীরা?

মীরা বললে, যে-নরকুণ্ডে সেই একদিন তুমি নিয়ে গিয়েছিলে? চলো না যাই—?

বিমলাক্ষ বললে, মীরা, তোমার মধ্যে মাঝে মাঝে আত্মনাশা মনোবৃত্তির চেহারা দেখতে পাই কেন?

মীরা ঘুরে দাঁড়ালো। বললে, বিমলদা, তোমার আমার মধ্যে এই আনাগোনা দেখাশোনার তাৎপর্য কি? যদি আমার সেই মনোবৃত্তিই থাকে, তুমি কি তা'কে লালন করছ না? খাবার জিনিস সাজিয়ে দিয়েছ চারিদিকে, মাঝখানে আমাকে বসিয়ে কি উপবাসের ব্রত নিতে বলছ?

আলোচনাটা আবার বাঁকাপথ নিতে পারে এই আশঙ্কায় বিমলাক্ষ বললে, আজ তোমার মন ভালো নেই, চলো বেরোই।

মীরা বললে, আগে আমার কথার জবাব দাও ?

তোমার মনের হদিস আমি পাইনি, মীরা !

মীরা পুনরায় প্রশ্ন করলো, স্পষ্ট ক'রে বলো কী চাও তুমি ?

বিমলাক্ষ বললে, দেবতার সৌভাগ্য আমার নেই ; থাকলে বলতুম আমি নৈবেদ্য চাই। কিন্তু দেবতা আমি নই।

আমি যদি বলি, তুমি মানুষও নয় ?

হ'তে পারে, হয়ত আমি পশু। মানুষ হ'লে হয়ত হঠাৎ ভালোবাসা ক'রে বসতুম।

কিন্তু পশুর কি-কি কাম্য, বললে না ত' ?

মীরা—!—বিমলাক্ষ আতুরকণ্ঠে তা'কে সজাগ ক'রে দিল।

মীরা খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো ? বললে, হ্যাঁ, বিমলদা, সেই তুমি। সেই তোমার তেইশ বছর বয়সের চিঠির তাড়া !—সেই নোংরা ভাষার রাজা তুমি ! তুমি পাস করেছ, বিলেত থেকে ফিরেছ, বিয়ে করেছ, ভদ্রসমাজে জায়গা জুড়ে বসেছ,—অর্থাৎ অনেক পালিশ পড়েছে কিন্তু তবু তুমি সেই ! তোমার মুখোসের নিচের থেকে সেই পুরনো লোভাতুর উঁকি দিচ্ছে। তোমার একটুও বদল হয়নি।

একখানা চেয়ার টেনে বিমলাক্ষ বললে, এই আমি বসলুম, আমি কোথাও যাবো না।

মীরা বললে, কেন ?

তোমার কথার চাবুক কত সইবো আমি ?

মীরা আবার হেসে উঠলো। তারপর বললে, আচ্ছা বিমলদা, আমার বাবার কাছে কত টাকা তোমার দেনা ? আন্দাজে বলো ত' ?

বিমলাক্ষ বললে, সত্যি বলবো, না মিথ্যে ?

যেটা বলা অভ্যাস সেটাই বলো ?

বিমলাক্ষ বললে, তা প্রায় লাখখানেক !

মীরা বললে, বলো কি ? কিছু দেনা আজ শোধ করবে ?

উঠে দাঁড়ালো বিমলাক্ষ। বললে, এ আমার সৌভাগ্য, মীরা !

আঃ—ন্যাজ নেড়ো না ! ঠিক ক'রে বলো, আজ কত আমার জন্যে খরচ করতে পারো ?

বিমলাক্ষ সোৎসাহে বললে, যত তুমি বলো ! এক সন্ধ্যারাত্রে তোমার সঙ্গে বেরিয়ে যত খরচ করা যায় ! দরকার হ'লে আমার ডাক্তারখানাটাও বেচবো !

মীরা হাসতে হাসতে বললে, তুমি জুয়া খেলতে জানো, বিমলদা ?

বিলেতে থাকতে খেলতুম।

আমাকে বাজি ধরতে পারবে ?

বিমলাক্ষ বললে, বাজি ? কার কাছে ?

মীরা বললে, কোনো দুঃশাসনের আসরে !

বিমলাক্ষ বললে, ছি মীরা, চলো বেরিয়ে পড়ি ঘর থেকে। আজ তোমার মনটা সত্যিই ভালো নেই !

মীরা মুখ ফিরিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর কেমন একটা অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে বললে, মন্দ হোতো না। অন্তত একান্ত মনে দ্রৌপদির সখাকে ডাকতে পারতুম কেঁদে-কেঁদে।

কথাটা বিমলাক্ষ কান পেতে শুনলো। কণ্ঠস্বরে কেবল আবেগ নয়, কারুণ্যের স্পর্শও পাওয়া যায়। আবার যেন সেই শরাহত রক্তাক্ত পাখির ডানা-ঝটাপটির আভাস। বিমলাক্ষ আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। মীরা থাকে যেন অনেক দূরে, তার মন আজও অনাবিষ্কৃত,—তা'কে জানতে গেলে শুধু অন্ধকারে হাতড়ানো ছাড়া আর কিছু হয় না।

মীরা ?

মীরা মুখ ফিরিয়ে তাকায়।

চলো বেরোই,—ওকি, তোমার চোখে জলের ছায়া কেন ?

মীরা হাসলো। হেসে বললে, তোমার সেই সুগন্ধ রুমালখানা কোথায়, যেখানা দিয়ে আমার পা মুছিয়ে দিয়েছিলে ?

বিমলাক্ষ সাগ্রহে বুক পকেট থেকে সেই রুমালখানা বা'র ক'রে বললে, হ্যাঁ, সেই থেকে এখানা আমার সঙ্গে-সঙ্গে থাকে !

হাসিমুখে মীরা বললে, আমার চোখের কাজল আর মুখের পাউডার বাঁচিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দাও ত' ?

আমি পারবো না !—বিমলাক্ষ রুমাল সরিয়ে নিল।

আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় বিমলদা,—আমার এ সজ্জা দেখলে হিরণের চোখে কান্না আসতো ?

রুদ্ধকণ্ঠে বিমলাক্ষ বললে, কি বলতে কি ব'লে ফেলবো, আজকের এমন দিনটাই মাটি হবে !

খিলখিল ক'রে হেসে লুটিয়ে মীরা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সিঁড়িতে নামলো। সেখান থেকেই ডাকলো, এসো, ডাক্তার !

দেবতারাও জানে না মেয়েমানুষের মন, বিমলাক্ষ কোন্ ছার ! এরাই

বিপদ ঘটায় পুরুষের, কোন সময়েই এরা নির্ভরযোগ্য নয় এরা ক্ষণমর্জী, ক্ষণবৃত্ত—বিশ্বাস ক'রে এদের সঙ্গে সাঁতরানো যায় না। এরা নিজেরা হাসিমুখে ডুবে মরে, অন্যকেও ডোবায়। নৈশ অন্ধকারের নিশাচর প্রাণী এরা নয়,—এরা আপন প্রাণশক্তিতে পারিপার্শ্বকে শঙ্কিত ক'রে তোলে। এদের খাম-খেয়ালের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর সামাজিক অসুবিধা পদে পদে।

মনে মনে দুর্ভাবনা নিয়ে বিমলাক্ষ বেরিয়ে এল ঘর থেকে। মীরা ভ্যানিটি ব্যাগ ফেলে গেছে, ছট্টু ওটা এনে বিমলাক্ষর হাতে এগিয়ে দিল। মীরা ততক্ষণে নিচে নেমে গিয়ে মোটরে উঠেছে।

ডাক্তারখানায় ঢুকে বিমলাক্ষ ম্যানেজারকে প্রশ্ন করলো, ফটিকবাবু, আসছে কাল মার্কেটিংয়ের জন্যে কত টাকা আছে?

ফটিকবাবু বললেন, টাকা কিছু চাই আপনার? কত?

যা পারেন দিন। কাল ব্যাঙ্কের ওপরে চেক দেবো।

ফটিকবাবু নোটের তাড়া গুণে বিমলাক্ষর হাতে দিয়ে একখানা খাতায় দস্তখৎ করিয়ে নিলেন। টাকা পকেটে পুরে বিমলাক্ষ সোজা মোটরে গিয়ে উঠলো। মোটরখানা কৃষ্ণকায়। রাজপথের অত্যুগ্র আলোয় চলতে চলতে এক-একবার ঝলসে উঠছিল। বিমলাক্ষর বুক যদি-বা কাঁপে, স্টিয়ারিংয়ের হাত কাঁপে না।

সেই জ্যোৎস্নাময়ী সন্ধ্যারাত্রির ইতিহাস নিজের পাতা উল্‌টিয়ে চললো। কিন্তু ভুল ক'রে একথা বলা চলবে না যে, মীরার যৌবনপ্রাঙ্গণে আজ বসন্তোৎসবের মাতন লেগেছে। বলা চলবে না, রাশ আল্‌গা ক'রে সে গা ভাসান দিয়েছে। মন তার সচেতন, তাই সুখের মধ্যেও সে যন্ত্রণা পায়, খেয়ালের মধ্যেও পায় বেদনার কাৎরানি। তার নিরেট কঠিন স্বাস্থ্য কিছুতেই ভাঙতে চায় না, এইটে দুঃখ। দেহটাকে যথেচ্ছ শাস্তি দিয়ে সুখ আছে, কেন-না ওতে অবাধ্য মনকে ঘুম পাড়ানো যায়। মোটরখানা চালাচ্ছে বটে বিমলাক্ষ, কিন্তু বিমলাক্ষকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ক্লান্ত ক'রে তুলেছিল মীরা।

অন্ধকার থেকে আলোয়, আবার আলো থেকে অন্ধকারে—এই ওদের চক্রপথ। মোটর থামিয়ে কোনো হোটেলে আধঘণ্টা, কোথাও-বা দেড়ঘণ্টা। ওরা দুজনে যেন দুটো জিজ্ঞাসা,—একবার ক'রে তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে, আবার হঠাৎ এসে দেখা দিচ্ছে আলোয় আর কোলাহলে। অনেকটা অলক্ষ্যে ওদের আনাগোনা।

রাত বারোটা। বিমলাক্ষ প্রশ্ন করলো, মীরা ফিরবে না?

না।

এবার কোথায় যাবে ?

নিমীলিত চক্ষে চেয়ে মীরা মৃদু হেসে বললে, হাসনু থাকলে বলতো, জাহান্নামে! দেখি তোমার সেই এ্যাটম্‌বোমের শিশিটা ? কই জল আনাও দেখি ?

বয়কে ডেকে বিমলাক্ষ জল আনালো। শিশি থেকে ট্যাবলেট্ বার ক'রে মীরা একটা মুখে পুরে জল খেলো। হাসিমুখে বললে, রেফুজী মেয়ের পক্ষে এমন সান্ত্বনার জিনিস আর কিছু নেই!

অজস্র খাদ্য সামনের টেবিলে, কিন্তু কি যেন একটু মুখে দিয়ে মীরা বললে, ওঠো, অন্য জায়গায় যাই চলো।

আবার বেরিয়ে এসে ওরা মোটরে উঠলো। মাঝে মাঝে ঢুলছিল মীরা, কিন্তু নিজেকে ফুৎকার দিয়ে সে যেন বার বার জ্বালিয়ে তুলছে। আজ ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না। আজ শ্রাবণের ঝুলন পূর্ণিমা। এতক্ষণে মধুমতীর ভরাবক্ষে জ্যোৎস্নার বন্যা দেখা দিয়েছে। এতক্ষণে রাজবাড়ীর সবাইকে লুকিয়ে হিরণ আর হাসনুর সঙ্গে ভরাদীঘিতে সে গিয়ে নেমেছে। সমগ্র হাজিপুর ঘুমিয়ে। ওরা তিনজনে জলের উপর ভাসছে—ওর নাম চিৎসাঁতার। ললাটে ওদের সোনার চন্দ্রতিলক, বুকের উপর ওদের আকাশ অচেতন ঘুমে অবশ হয়ে থাকতো! ওপারে বেণুবন থরথর করতো জ্যোৎস্নায়, এপারে মন্দিরের শয়নারতির ঘণ্টারব কাঁপতো দীঘির ঊর্মিমালার ওপর। কালোজলের মধ্যে ওদের তুজনের এলোচুলের রাশি যেত হারিয়ে!

মীরা ?

মীরা ঘুমিয়ে পড়েছিল, সহসা চমক ভাঙলো। বিমলাক্ষ বললে, এখানে নামবে বললে যে ?

হ্যাঁ, নামবো।—মীরা নিজেকে চাবকিয়ে মোটর থেকে নেমে পড়লো।

নতুন হোটেলে ঢুকে ওরা আবার নতুন ক'রে ফরমাস করলো।

মুখরতা ওদের শান্ত হয়ে এসেছে, এবার অবসাদের পালা। কিন্তু এত শীঘ্র অবসাদ কেন ? এখনও যে সমস্ত জীবন বাকি! এখনও বাকি যৌবনান্ত কালের অবশ্যম্ভাবী ক্লান্তি,—এরই মধ্যে ঘুম এলে চলবে কেন ? কাঁদে যেন কে ? কে যেন ফুঁপিয়ে ওঠে পাশের থেকে ? মীরা একবার এপাশে তাকালো, তাকালো, পিছন দিকে। না, কেউ না। এ তার নিজেরই গলার একপ্রকার ভগ্নস্বর, একপ্রকার নাসাধ্বনি। বাঁ-পাশের দেওয়ালে একখানা মস্ত আয়না ঝোলানো। তার মধ্যে মীরার নিজের চেহারা প্রতিবিম্বিত। কিন্তু এ কোন্ চেহারা! আয়নার মধ্যে যে মেয়েটি—সে শিবের মন্দিরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে,

তার সদ্যস্নাত ভিজা এলোচুল, কপালে সিন্দুরের টিপ, পরণে অক্ষয়তৃতীয়ার কুমারীব্রতের লালপেড়ে শাড়ি, হাতে নৈবেদ্যের থালা, নিষ্কলুষ মুখখানির উপরে নবপ্রভাতের মতো প্রসন্নসুন্দর হাসি। ও কোন মীরা? এ কেমন্ মীরা?

আয়নার থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো বিমলাক্ষর দিকে! খানিকক্ষণ তাকিয়েই রইলো। হঠাৎ জেগে উঠলো কেমন একটা উত্তেজনা। প্লেটের উপর থেকে এক চামচ মাস্টার্ড তুলে নিয়ে সে বাঁকাহাতে বিমলাক্ষর মুখের উপর ছিটকিয়ে দিল অভদ্র বর্বরের মতো। বিমলাক্ষ চমকে উঠলো।

ঘুমোচ্ছ যে? ফিরতে হবে না?

বিমলাক্ষ ঠিক স্বর্গীয় হাসি হাসলো। মধুর-রসে-ভরা চোখ মেলে বললে, এ তোমার স্নেহেরই ছিটেফোঁটা!—চলো যাই!

হোটেলের পাওনা চুকিয়ে ওরা বেরিয়ে এলো। এবার এলো হাত-ধরাধরি ক'রে—কেন-না একক হাঁটতে ওদের বিশ্বাস নেই। লোকচক্ষে হাস্যাস্পদ হবার ভয় আছে। বাইরে এসে দুজনে গাড়ীতে উঠলো।

রাত তখনো দুটো বাজেনি। এবার মীরা উঠে বসলো পিছনের সীটে। বিমলাক্ষ গাড়ী ছেড়ে দিল; নেশার ঘোরেও তার হাত কাঁপে না।

ওখান থেকে বেশিদূর নয়। কিন্তু তালতলার পল্লীর মধ্যে আজ ঢুকতে গেলে চলবে না। বিমলাক্ষ গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে এলো ধর্মতলা। ডাক্তারখানার পাশের গলিতে গাড়ীবারান্দার তলায় এসে সে যখন গাড়ী থামালো,—পিছনের সীটের গদীর ওপর মীরা তখন ঘুমোচ্ছে।

পুরুষের স্বাভাবিক সামাজিক দায়িত্ব আছে ব'লেই সে কঠোর। তার হাত-পা কোনোটাই কাঁপলে চলে না। বিমলাক্ষ গাড়ীর থেকে তুলে আনলো মীরাকে। সিঁড়ি দিয়ে তাকে তুলে নিয়ে গেল দোতলায়। তারপর চাবি খুলে ঘরের মধ্যে গিয়ে সে মীরাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। মীরা কী যেন বিড়-বিড় ক'রে বলছে তখন থেকে। মনে হলো ভাষাটা ইংরেজি।

"Oh, the longing—longing for one so intolerably dear!"

রসগদগদ কণ্ঠে বিমলাক্ষ বলল, এ কি আমাকে বলছ, মীরা?

তোমাকে?—মীরা ওঠবার চেষ্টা ক'রে বললে, এতবড় দামী কথাটা তোমাকে বলবো? তুমি ত' মোটর ড্রাইভার। যাও, ওই ছেট্ট্র বেঞ্চিখানার ওপর শুয়ে থাকগে! ভোরবেলা বেল্ বাজিয়ে আমাকে ডেকে দিয়ো।

আলো জালাবার সুইচটা অন্ধকারে কোনোমতেই খুঁজে না পেয়ে বিমলাক্ষ চেঁচামেচির ভয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলো।—

১৪

র াঁচীর থেকে সেই ঝড়বৃষ্টির রাত্রে হিরণকে নিয়ে পালাবার সময় হাসনু বলেছিল, দেখে নিস্—কাল থেকে র াঁচীতে নিশ্চিত দাঙ্গা—

হিরণ বলেছিল, ছোটখুড়ি শুনলে বলতো, তুই হ'লি পাকিস্তানী গোয়েন্দা, —এদিকে এসে তুই দাঙ্গায় উস্কানি দিস—তুই বরের ঘরের মাসী কনের ঘরের পিসি—!

হাসনু হেসে বলেছিল, র াঁচীর থানায় যদি এই কথা উঠতো যে, একটি হিন্দু যুবক জনৈক মুসলিম মহিলাকে নিয়ে হিন্দু হোটেলে উঠেছে, তাহ'লে বোধ হয় দাঙ্গা লাগতো না ?

তার আগেই পুলিশের সাহায্যে আমরা চ'লে েতে পারতুম !

পুলিশ সাহায্য করতো মুসলিম নারী অপহরণ ?

হিরণ বললে, কেন, আমরা নিজেদের সত্য পরিচয় দিতুম ?

হাসনু বললে, সত্য পরিচয়টাই ত' এই,—তোর সঙ্গে আমি পালিয়ে বেড়াই ! হোটেলে এসে ঘেরাও করেছিল কা'রা ? কা'রা শাসিয়ে বলেছিল যে, আমাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা বরদাস্ত করবে না ? শোন্—গুণ্ডাদের পেশাই হোলো দাঙ্গা ! তোরা যতই ভয় পাবি, ওরা ততই আস্কারা পাবে ! ঠাকুর প্রসাদের চক্রান্তে যদি ওরা এসে আমাদের আক্রমণ করতো, তবে তোর কি দশা ঘটতো ? শতখানেক গুণ্ডা যদি আমাকে টেনে নিয়ে যেতো, তা'হলে কি আমি সতীত্ব বাঁচাতে পারতুম ?

চাপা কৌতুকের হাসি হিরণের মুখে এলো। জবাব না পেয়ে হাসনু একেবারেই রেগে আগুন। বললে, তোর চুপ করে থাকার মানে বুঝি। অর্থাৎ মুসলমান সমাজে সতীত্ব নিয়ে কেউই মাথা ঘামায় না—এই ত' ?

হিরণ বললে, আমাকে দিয়ে স্বীকার করাতে চাস কেন ?

স্বীকার না করলেও কথাটা দাঁড়িয়ে থাকে। মুসলমান সমাজে সতীত্বের চেতনা অবশ্যই আছে, কিন্তু অসতীত্বের সমস্যা সেখানে কম। তোদের অসতীরা হয় অপাংক্তেয়,—একদল নামে প্রকাশ্য ব্যবসায়ে, আর নয়ত অন্যদল গোপন ষড়যন্ত্রের পথ ধ'রে সুড়ঙ্গলোকে নেমে যা:।

হিরণ বললে, মুসলমান সমাজে পতিতা নেই ?

হাসনু বললে, প্রচুর আছে যেমন আছে অন্য সব সমাজে। কিন্তু আমাদের সমাজে অসতীরা সমস্যা নয়, যেমন তোদের। আমাদের অসতীরা বিপদে

রাখা যায় না। কিন্তু আপনি সব ছেড়ে হিন্দু কমরেড ধরতে গেলেন কেন?

হাসমু জবাব দিয়ে এলো, আপনারা শুনেছি হিন্দু-মুসলমানে মিলন চান্, কিন্তু সত্যিকার মিলন দেখলে ভয় পান্ কেন?

হাসমু থানার বাইরে এলো। সামনেই বিমূঢ় হতবুদ্ধির মতো হিরণ দাঁড়িয়ে।

হাসমু ছুটে এসে একখানা হাত হিরণের কোমরে জড়িয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, কমরেড, তোমার কাছে ওরা কৈফিয়ৎ চায় না কেন?

হিরণ বললে, আমি যে পাকিস্তানের মাইনরিটির লোক, বর্ণশ্রেষ্ঠ হিন্দু—সাত খুন মাপ!

থানার লোকেরা পিছন থেকে এই সাম্প্রদায়িক গলাগলির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো।

হিরণ মৃদুকণ্ঠে বললে, তুই এতই জানিস, হাসমু!

চুপ।—চাপা গলায় হাসমু হিরণকে সতর্ক ক'রে দিল—চল্ আগে সাপের গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়ি।

দুজনে স্টেশনের দিকে চ'লে গিয়েছিল।

এর পর অনেক পথের অনেক কাহিনী। পশ্চিম ভ্রমণের পক্ষে যে সময়টা ঠিক প্রশস্ত নয়, ওরা সেই সময়টাই ঘুরতে লাগলো। নানাপ্রদেশে। এটা জানা চাই, এই ওদের দেশ—যার আয়তন বিরাট, জানা চাই—সমগ্র দেশের এই হোলো জীবন—যেটা বিরাটতরো। ওদের পক্ষে এ উপলব্ধি অশ্রদ্ধেয় যে, ওরা দুর্ভাগ্যক্রমে প'ড়ে গিয়েছে সঙ্কীর্ণ জীবনের খাদে,—যেখানকার পারিপার্শ্বিক ওদের মনুষ্যত্ব প্রকাশের অনুপযুক্ত নয়। ওরা রাজনীতিক বিভাজনের ধার ধারে না, নেতাদের বুদ্ধি বিবেচনা সম্বন্ধে ওরা যথেষ্ট শ্রদ্ধা রাখে না। ওরা জানে, জীবন যেখানে বিড়ম্বিত আর নিপীড়িত—স্বাধীনতা সেখানে অর্থহীন। কোনো সমাজকেই ওরা ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয়—যেখানে ব্যক্তির প্রতি পদে পদে অবিচার ঘটে। যেখানে মূঢ়তার অপর নাম রাজনীতি!

দেড়মাস পর্যন্ত ওরা ঘুরে বেড়ালো। স্বাস্থ্য ফিরেছে ওদের অনেকটা। হাসমুর দুই গালে রঙের ছোপ লেগেছে। বাঙলার থেকে বেরিয়ে ওদের গায়ে লেগেছে ভারতের হাওয়া, ওদের মনে ধরেছে ভরা জীবনের সুর। মীরার মতো ওঁদের জীবনে কোনো নৈরাশ্য নেই, সুমিত্রার মতো নেই উচ্চাভিলাষ—ব্যর্থতাবোধ ওদের মধ্যে কম। ওরা শুধু দেখতে চায়, কেন-না

দেখাটাই দর্শন ; ওরা জানতে চায়, কেন-না জানাটাই জ্ঞান। বাল্যকাল থেকে হাসনু বড় হ'তে চেয়েছিল,—ধনে সম্পদে ঐশ্বর্যে নয়—লৌকিক বিচারে বড় হওয়া নয়, এই বড় হওয়ার ব্যাখ্যা ছিল জ্যাঠামশাই জীবেন্দ্রনারায়ণের কল্পনায়—হাসনু যাঁর হাতে গড়া প্রতিমা।

দেড়মাস পরে একদিন রাত্রিবেলায় কোনো এক ধর্মশালার বারন্দায় শুয়ে-শুয়ে হিরণ বললে, এবার ফিরে যাই চল্, হাসনু।

হাসনু চোখ বুজে জেগেই ছিল। বললে, তোর এখনো ঘুম আসেনি ?

হিরণ বললে, ঘুমোতে গেলেই ছবি দেখতে পাই।

কৌতুক ক'রে হাসনু বললে, মীরার ছবি ?

না।

তবে কিসের ছবি ?

হিরণের কাছে জবাব না পেয়ে হাসনু আবর প্রশ্ন করলো, কোথায় ফিরে যেতে চাস ?

হিরণ বললে, বল্‌তো কোথায় যেতে চাই ?

একটুখানি থেমে হাসনু বললে, তুই ফিরে যেতে চাস পুরোনো-জীবনের ব্যবস্থায়। রাজবাড়ীর জন্যে তোর মন কাঁদছে ! তোর মন কাঁদছে মীরার জন্যে !

হিরণ বললে, মীরার জন্যে ?

হ্যাঁ, সেই ঐশ্বর্যশালিনী মীরা! ঠাকুরদীঘির পদ্ম-সমারোহ তোর চোখের সামনে, জ্যোৎস্নারাত্রের মধুমতী নদী, রাজবাড়ীর সেই আনন্দ কলরব, প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ যে-জীবনধারা। মীরা তোর পাশে,—মহীয়সী জগদ্ধাত্রীর চেহারায় হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। জন্ম-বিদ্রোহিনী হাসনু তোর এপাশে,—জ্বলজ্বল করছে তরবারির শাণিত ফলক। জ্যাঠামশাই তোর সামনে—দেদীপ্যমান হোমকুণ্ড! তুই চাস সেই অনাহত সুখ, সেই মধুর স্বপ্ন, তুই চাস সেই নির্বিরোধ জীবন,—সেই আনন্দের প্রাচুর্যের পরিপূর্ণ আরামের সংসারযাত্রা!

বারান্দার এক কোণে কালিঝুলিপড়া হারিকেনটা টিমটিম করছিল। অন্ধকারে মৃদুমৃদু স্নিগ্ধ বাতাস বইছে, আকাশলোকে শরৎকালের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। পশ্চিমের বড় তারাটা উত্তর দিকে স'রে এসেছে।

হিরণ বললে, বলতে পারলিনে, হাসনু।

হাসনু বললে, তোর মন কি কাঁদছে না ?

হিরণ বললে, বেশ, ধ'রে নিলুম তোর কথা। কিন্তু মন যখন আপন মনে কাঁদে, কেউ কি তার কারণ জানে ? নিজেই কি আমি জানি ?

হাসনু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো তার পর বললে, এখানে জনমানব নেই কোথাও, শুধু তুই আর আমি। সত্যি বলতো, মীরাকে কি তুই ভালোবাসিস্‌নে?

হিরণ বললে, ভালোবাসার কথা কি উঠেছে কোনোদিন? ওখানে বিয়ের কথাটাই কি বড় ছিল না?

তোর কি ধারণা, মীরা তোকে ভালোবাসে নি?

আমার মনে কোনো প্রশ্ন নেই, হাসনু।

হাসনু আবার চুপ করে গেল। এক সময়ে অন্ধকারে নিঃশব্দে সে হাসলো। তারপর প্রশ্ন ক'রে বসলো, আমাকে তুই কেমন চোখে দেখিস?

হিরণ বললে, কঠিন প্রশ্নের জবাবটাও কঠিন হয়, তা জানিস?

হাসনু বললে, না রে, জবাবটা সরল সহজ?

একটুখানি ভেবে হিরণ বললে, সত্যিকথা বলবো, না চাটুবাক্য শোনাবো?

তোর যা খুশি?

হিরণ বললে, তোর মুখ থেকে লোভের কথা কেন শুনি আজ?

হাসনু বললে, মেয়ে মাত্রই লোভী, মুসলমান মেয়ের লোভ আরো বেশি, জামাই!

কিন্তু লোভ কি তোর ছিল কোনোদিনই?

হাসনু ডুব দিল নিজের মধ্যে। সেখানে অনন্ত তমিস্রালোক, রহস্যে আবিল। তারই ভিতর দিয়ে সাঁতরে চললো তার চৈতন্যবিন্দু। চোখ দুটো তার অপলক—মীনাক্ষীর মতো। দেখলো শুধু আবিলতা, খুঁজে বেড়ালো অনেক,—রহস্যলোক থেকে জবাব এলো না কিছু।

এক সময়ে উঠে এলো হাসনু সেই অপার তমিস্রালোক থেকে। বললে, হিরণ?

কেন?

আমাকে বিয়ে করবি তুই?

না।

মুসলমান ব'লে কি আপত্তি আছে তোর?

হিরণ বললে, কোনো জাতের মধ্যে ত' তোকে ধ'রে রাখা যায় না?

হাসনু এবার একটু চঞ্চল হয়ে পাশে উঠে বসলো। বললে, কি বলতে চাস?

হিরণ শুয়ে রইলো স্থির হয়ে। শান্তকণ্ঠে বললে, অনন্ত বিশ্বের মধ্যে যে বিত্তাশক্তি ছড়িয়ে থাকে, তার ধরা-ছোঁওয়া আমরা পাইনে। তাই তাঁকে

প্রতিমার মধ্যে ধ'রে বলি, তুমি মহাশ্বেতা! তুই ত' প্রতিমা নয়, তুই হ'লি সেই বিশ্ববিদ্যার আইডিয়া! তোকে যদি প্রতিমার মধ্যে আনি তুই ছোট হয়ে যাবি!

হাসনু বললে, আর মীরা?

হিরণ বললে, মীরা ম'রে গেছে, হাসনু!

মানে?

পার্বত্য নদী হয়ে গেছে বদ্ধ জলা। নৈলে নিজের শক্তিতেই নিজের বেগ তার বাড়তো। জনপদ প্লাবিত করার কথা ছিল তার। কথা ছিল উর্বর ক্ষেত্রকে সে শস্যশালিনী ক'রে তুলবে, পিপাসা মেটাবে সে মানুষের। তারপর সেইদিকে ছুটবে যেদিকে মহাসাগর।

হাসনু বললে, মীরাকে কি তুই তুলে ধরতে পারিসনে?

হিরণ বললে, ওটা ত' আমার কাজ নয়!

কিন্তু দেশসুদ্ধ লোক সবাই জানে, তুই মীরার স্বামী!

হাসিমুখে হিরণ বললে, জানিনে কেবল আমরা দু'জন।

হাসনু আবার শুয়ে পড়লো। একটা যেন মস্ত আশাভঙ্গ হয়ে গেল তার। রাত অনেক হয়েছিল, চাদরখানা হাসনু এবার গায়ের উপর টেনে নিল। কান্না এলো তার দুই চোখে।

অনেকক্ষণ পরে হাসনু আবার ডাকলো, কমরেড—

হিরণ সাড়া দিয়ে বললে, বল্

এ জীবনে কোনোদিন কি তুই মন খুলবিনে?

মিছে কথা বললে কি মন খোলা হোতো?

হাসনু প্রশ্ন করলো, তোর আর আমার এই সম্পর্ক কেন? লোকচক্ষে এটা কি নিন্দনীয়?

হিরণ জবাব দিল, তুই কি নিন্দের ভয় রাখিস।

রাখিনে। কিন্তু লোকে যদি এটাকে বলে, দুই মিলে এক?—হাসনু বড় বড় চক্ষে তাকালো।

হিরণ বললে, লোকে বলুক কিন্তু তোর মুখে এ প্রশ্ন কেন? এ যদি মিলন হয়, এই বা কম কি? আমরা হলুম সেই সমান্তরাল রেখা,—ইংরেজিতে যাকে বলে, প্যারালাল্! পাশাপাশি আছি, কাছাকাছি আছি,—কিন্তু মিলছিনে! বিচ্ছেদ থাক্ মাঝখানে, কিন্তু লক্ষ্য আছে এক। একেই মিলন বলে, হাসনু!

হাসনুর দুই চোখ ভ'রে মধুর আনন্দের তন্দ্রা জড়িয়ে আসছিল। চোখ

টেনে সে বললে, একটা কথা আমার কাছে স্বীকার কর্ হিরণ—মীরার 'পরে তোর অভিমান আছে কি?

হিরণ বললে, বিন্দুমাত্র নেই।

ওর জীবনে যদি কোথাও ত্রুটি দেখিস, ক্ষমা করতে পারবি?

ওর কোনো ত্রুটি আমি দেখিনে, হাসনু।

হাসনু বললে, আমাকে আর একটা কথা দে?

কি বল্?

আমি যেখানেই থাকি, তুই মীরার কাছে গিয়ে দাঁড়াবি, কথা দে?

হিরণ বললে, কথা দিলুম।

হাসনু অন্ধকারে হিরণের হাতখানা টেনে নিয়ে বলে, তোকে কাছে পেলে আমার কোনো ভয় থাকে না অন্ধকারে। নে, ঘুমো, কাল তোকে নিয়ে আবার ভেসে যাবো।

এবার ওদের পূর্বগতি অভিযান। পূর্ববঙ্গের দিকে ওরা চললো। মাঝখানে আছে প্রায় সাতশো মাইল সীমানা। কিন্তু সোজারাস্তায় ওরা চলে না, পথ ওদের বাঁকা। কলকাতা হয়ে গেলেই চলতো, যেতে পারতো ট্রেনে, কিন্তু সেটা ভ্রমণ নয়। পথ সহজে ফুরোবে না, এই হোলো ভ্রমণ। উত্তর বিহারে ওরা ধরেছিল এক্কাগাড়ী, ধরেছিল হাঁটাপথ নদী পর্যন্ত, ওরা পেরিয়ে চললো পার্বত্য উপত্যকা, পেরিয়ে চললো আঁকাবাঁকা জলধারা—যেগুলি নেমে এসেছে হিমালয়ের থেকে। মানুষের পদচিহ্ন যে-অঞ্চলে পড়েনি, সেখানে গেল ওরা পথ খুঁজতে, যানবাহন যেখানে পাওয়া যায় না, সেখানে গিয়ে ওরা বললে আমরা নিরুপায়। খাদ্য যেখানে একেবারেই দুষ্প্রাপ্য, সেখানে গিয়ে ওরা ক্ষুধার্ত হয়ে ঘুরতে লাগলো।

সাত শো মাইল সীমানা-রেখায় ওরা খুঁজতে চাইলো কোনো একটা সুড়ঙ্গ পথ। দক্ষিণ সুন্দরবন দিয়ে যাওয়া যেতো—অরণ্য-রহস্যের ভিতর দিয়ে। যাওয়া যেতো গঙ্গা থেকে পদ্মায়—যাওয়া যেতো ব্রহ্মপুত্র থেকে যমুনায়। কিন্তু ওরা দেখতে চাইলো সীমানারেখা, সেটা নেই। দেখতে চাইলো বিচ্ছেদের বেড়া, যেটা নেই। জলের ওপর সীমানা নেই, কেন না তার ওপর দাগ পড়ে না। মাটির ওপর দাগ পড়ে না,—কেন-না সে-দাগ মুছে যায়। ওরা খুঁজে বেড়াতে লাগলো সীমানা।

হাসনু বললে, না, কোনো শহরে নয়। শহরে মানুষ আছে, মানবতা কম। শহরে দান আছে, দয়া নেই। শাসন আছে, স্নেহ নেই। শহরে যাবো না, গ্রামের দিকে চল্।

কোন্ গ্রামে যাবি ?

হাসনু বললে, হাজিপুরের যাবার পথে যে-কোন গ্রাম !

হিরণ বললে, গ্রাম-পরিক্রমা করবি ? দেখে যাবি জীবনের ধারা ?

ভালো কথা বলেছিস। তাই যাবো—চল্ !

কিন্তু কোন্ পরিচয় নিয়ে যাবি ? কোন্ অধিকারে গ্রামের অন্নে ভাগ বসাবি ?

হাসনু বললে, কোন্ অধিকারে হাজিপুরের অন্ন খেতুম ?

হিরণ জবাব দিল, স্বাভাবিক অধিকার, সে তোর আজন্মের লীলাক্ষেত্র ! সেখানে তুই সেবা করেছিস অনেক। এখানে তোকে দান গ্রহণ করতে হবে ; সম্মানের অন্ন তোর কপালে জুটবে না।

হাসনু হাসলো। বললে, বেশ, সেবার বদলেই অন্ন নেবো ?

সেবা কি ওরা চাইবে ?—হিরণ থমকে দাঁড়ালো।

অজ্ঞানেরা জানে না কোন্‌টা তাদের সেবা। ওরা হাসপাতাল গড়তে জানে, জানে না মানুষের শুশ্রূষা, ইস্কুল গড়তে জানে, জানে না শুধু শিক্ষা। শাসন করতে জানে, জানে না মানুষের উন্নতি ; অন্ন সৃষ্টি করতে জানে, জানে না অন্ন বিতরণের ক্ষেত্র ; নদী বাঁধতে জানে, জানে না মানুষের পিপাসা মেটে কেমন ক'রে। চল্ আমার সঙ্গে তুই, সেবাই করবো—হাসনু এগিয়ে চললো।

ক্ষেতের ধানে তখনও পাক ধরেনি, কিন্তু ধানের শিখা অনেক উঁচুতে উঠেছে। ওরা অবেলায় বেরিয়ে পড়লো মাঠের দিকে। হাসনুর পরণে সেই রাঁচীর পরিচ্ছদ,—রাঙ্গাপাড় শাড়ি, সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর, সোনার পা দুখানি আল্‌তামাখা, হাতে শাখা আর নোয়া, মাথায় ঘোমটা টানা। হাসনু চলেছে শ্বশুরবাড়ি। কেঁদে কেঁদে তার দুইচোখ ফুলে উঠেছে।

মাঠের ধার পেরিয়ে বড় রাস্তা। সেখানে ওই ফুল-লতা-আঁকা টিনের সুটকেস, আর দরিদ্র বিছানার পুঁটলী হাতে নিয়ে হিরণ এক জায়গায় দাঁড়ালো। মোটর বাস এলো অনেকক্ষণ পরে। সেই বাসে ওরা চাপলো। ভিড়ের মধ্যেও জায়গা পেয়ে গেল ওরা নতুন স্বামী-স্ত্রী। পূর্ববঙ্গের সীমানা তখনও আসেনি।

কন্‌ডাক্টর প্রশ্ন করলো, কোথায় যাবেন ?

বড়ই অসুবিধাজনক প্রশ্ন। সপ্রতিভ কণ্ঠে হিরণ বললে, আজকাল এ গাড়ী যাচ্ছে কদ্দুর ? ওদিকে জল কতটা ?

জল অনেক। এ গাড়ী যাবে উজিরপুর পর্যন্ত। আপনারা কি পাকিস্তানে যাবেন ?

হ্যাঁ।

তাহলে আপনাদের গাঙ পেরোতে হবে।

সে ত' জানি—তুমি উজিরপুরের টিকিটই দাও।

পথ জনশূন্য। কোনো কোনো গ্রামের এক আধটা গোলদারি দোকান ছাড়া আর কোথাও প্রাণের চিহ্ন দেখা যায় না। সন্ধ্যার তখনও বিলম্ব আছে। মোটর বাস চলেছে হু-হু শব্দে। পরম্পরায় জানা গেল, উজিরপুরের হাট ভাঙ্গার আগেই গাড়ী সেখানে পৌছবে! পথ বেশি বাকি নেই।

হাসনুর দিকে কতকগুলি যাত্রীর চোখ প'ড়েই আছে। কী সুশ্রী মেয়ে। বাঙ্গালী মেয়ের এমন স্বাস্থ্য,— দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মেয়ে একেবারে লক্ষ্মীমন্ত। ঘোমটার ভিতর পতিগত প্রাণার দৃষ্টি আর কোনোদিকে পড়ছে না!

আহা, এমন মেয়ে চললো পাকিস্তান!

উজিরপুরে একেবারে হাটের ধারে এসে ওরা নামলো। গাঙের প্রায় কোলের কাছে মস্ত হাট। এক ধারে অসংখ্য পাটের গাঁইট স্তূপাকার করা। এ পাশে জোলারা এনেছে গামছা আর কাপড়। একদিকে চাউল আর তামাকের আড়ৎ। তরী-তরকারীর বাজার বসেছে। বসেছে মণিহারী সম্ভার, আর খেলনার দোকান! লোহা আর এলুমিনিয়মের নানা সামগ্রী। এক পাশে হাড়ি-কলসী। মাছ এনেছে জেলেরা। বকৃরির-পাল এসেছে গ্রাম থেকে। হাস-মুরগী এসেছে একধারে। কোথাও বা মুদি-মসলা।

অবগুণ্ঠনবতী হাসনু হাটের পাশ কাটিয়ে চললো হিরণের পিছনে পিছনে। আলজ্জ আনম্র বধূ। হাটের মুসলমানেরা তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলো। কিন্তু উজিরপুরের মৌলবীরা কোরাণের নির্দেশ দিয়ে বলেছে, হিন্দু মেয়ের দিকে কদাচ পাপের দৃষ্টিতে তাকাবে না। ওরা সবাই একবার ক'রে তাকালো। তাকিয়ে কি যেন মন্ত্র প'ড়ে চোখের পল্লব ছিঁড়ে ফেললো।

এক জায়গায় একটি লোক খঞ্জনীবাঁধা ডুগডুগি বাজিয়ে গান ধরেছে, পায়ে ঘুঙুর-পরা। ওই না দেখে বালিকাবধূ আবদার ধ'রে বসলো, আমাকে ডুগডুগি কিনে দাও! ছোট ছোট দেবর আর ভাসুরপো'দের জন্যে নিয়ে যাবো। টিনের মোটরগাড়ী কেনো, তার সঙ্গে ওই গাছের ডালের বাঁদর। পুতুল কিনে দেবে কাঁচকড়ার? প্লাস্টিকের চিরুনী আর ভ্যানিটি ব্যাগ? খোঁপায় পরবো ওই প্লাস্টিক বেলদার মালা। আম্মাকালির জন্যে জরির ফিতে। ঝুটো মুক্তোর মালা দিদিমণির জন্যে। আ মরে যাই, কী চমৎকার সাবানের কৌটো আর পাউডারের পাফ! ওগো, কিনবে তুমি? টাকা আছে আমার আঁচলে!

লোকে ভিড় করেছে ওদের চারিদিকে। শুনেছে সবাই কান পেতে। হিরণ বললে, ওগুলোয় না হয় তোমার ভয়ানক লোভ আছে বুঝলুম, কিন্তু ঘুঙুরী-বাঁধা ডুগডুগি চাও কেন? কা'কে নাচাবে?

ওমা, মানুষের কথা শোনো! শখের একটা জিনিস, তাও তুমি দিতে চাও না! আমার মান রাখবে না ব'লেই বুঝি শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যাচ্ছ? ওই দেখো ভিক্ষে করছে, দাও না কিনে একখানা গামছা ওকে?—হাসনু একেবারে কেঁদে উঠলো, মানুষের দুঃখ, আমি যে সইতে পারিনে, তা কি তুমি দেখতে পাও না?

গ্রীবা দুলিয়ে উঠলো হাসনু। হাটে সাড়া প'ড়ে গেল।—একে সুশ্রী, তায় স্বাস্থ্যবতী,—সুতরাং সবাই মিলে বললে, বাবু, ঠাকুরণ চাইছে ক'টা সামগ্রী, দেন্ কিনে। পয়সা হাতের ময়লা!

সুতরাং হিরণকে প্রায় পঞ্চাশ টাকার সামগ্রী কিনতে হোলো।

হাট থেকে কিছু খাবার জিনিস কিনে ওরা চললো ঘাটের দিকে। ওপারটা হোলো পাকিস্তান। এপারে মাল আসে ওপার থেকে—দুই পারের চৌকীদারের মোটা পয়সা রোজগার। দুই চৌকীদারের মধ্যে খুব ভাব—ওরা একই গাঁয়ের লোক। শিরিশ চৌকীদারের কাছে মোক্তার মিঞা আসে তামাক খেতে নায়ে পেরিয়ে। আর শিরিশ যায় ওপারে শ্বশুরবাড়ীতে রোজ সন্ধ্যার পর। বউটা আছে সেখানে। বউটা রোজ মাছ-ভাত পাঠায় আবুলের হাত দিয়ে এপারে শিরিশের কাছে। মোছলমানের ছোঁওয়া খাদ্য কিনা, তাই শিরিশ সেই ভাতের পুটলী লুকিয়ে রেখে আসে একেবারে রান্নাঘরে।

নৌকায় ওঠার আগে শিরিশ এসে অনেক দুঃখ জানালো ঘাটে হিরণের কাছে। শিরিশের অনুরোধেই জমিরুদ্দি সস্তায় নৌকো নিয়ে এলো। না'য়ে আর কেউ চাপবে না কর্তা,— আমারে আট আনা দেন্। একসের চাল লইয়্যা ঘরে ফিরুম্।

তথাস্তু। ওরা গিয়ে নৌকায় উঠলো।

নতুন-কেনা জিনিসপত্রগুলি হাসনু নিজের কাছেই রাখলো। কেবল ঘুঙুরী বাধা ডুগডুগিটা দিল হিরণের হাতে। ঘুঙুরের জোড়াটা রাখলে নিজের কাছে। হিরণ বললে, হুঁ, আমাকে এত নাচিয়েও তোমার মন উঠছে না, কেমন?

ঘোমটা আরো নিচের দিকে টানলো হাসনু। কিন্তু এই ঘোমটার ভিতর দিয়েই সে কটকট ক'রে হিরণের দিকে তাকালো।

মিনিট দশেকের মধ্যেই নৌকা এপারের ঘাটে এলো। ওদিকে গ্রামের

মেয়েরা ঘাট থেকে তখন উঠে যাচ্ছে। তারা কি যেন বলাবলি করলো। ঘাটে নেমে নৌকোর মাঝিকে হিরণ একটি টাকা দিয়ে প্রশ্ন করলো, মিঞা,— মনসাখালির পথটা ব'লে দিতে পারো ভাই?

মাঝি বলল, কইতে নারুম কর্তা,—আপনারা যাবেন কনে?

আমরা যাবো বড় নদী পেরিয়ে গঞ্জের দিকে।

সোনগঞ্জের খ'নে?

হিরণ বললে, হ্যাঁ ঠিক বলছে; আচ্ছা, এখানে ইস্কুল-টিস্কুল আছে কর্তা?

মাঝি বললে, এ গায়ে আমার বাড়ী নয়, তবে জ্যান আছে একটা মক্তব। আপনারা সোজা গিয়ে জিগান গিয়া।

মালপত্র পোঁটলাপুঁটলি সঙ্গে নিয়ে হিরণ ও হাসনু হেটে চলল। সন্ধ্যা হ'তে তখন আর বিলম্ব নেই। কাঁচামাটির রাস্তা; অনেক জায়গায় জল শুকোয়নি, অনেক জায়গায় কাদা জমে রয়েছে। গ্রামখানি নিরিবিলি। কোথাও কোথাও চালাঘর জনশূন্য হয়ে রয়েছে; কোথাও বা সাজানো সংসার হঠাৎ গেছে স্তব্ধ হয়ে। বুঝতে দেরি হয় না অনেক লোক্‌ চ'লে গেছে পশ্চিমবঙ্গে। পাকা ঘর, করোগেটের চালা শূন্য প'ড়ে আছে। প্রায় আধঘণ্টা হাটতে হাটতে ওদেরই মধ্যে একখানা পাকা দালানে ওরা দু'জন এসে উঠলো। বলা বাহুল্য, ওরা যথাসম্ভব ভদ্রলোক। পোশাক-পরিচ্ছদ এ গ্রামের সঙ্গে ওদের বেমানান। সেই কারণেই অনেকক্ষণ আগে থেকে ওরা চৌকীদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ওদেরকে পরিত্যক্ত পাকা দালানে উঠতে দেখে চৌকীদার হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির।

হিরণকে নিয়ে হাসনু ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল। তাড়াতাড়ি টিনের বাক্স আর পুঁটলি এলিয়ে হাসনু হিরণের পোশাকটা দিল বদলে। হিরণ পরে নিল পায়জামা, বেলদার বুটিকাটা মসলিনের পাঞ্জাবী, চোখে সুর্মা, পায়ে সেই বেগুনী প্লাস্টিকের পামসু। গলায় কালো কার কবচবাঁধা।

চৌকীদার বাইরে থেকে আওয়াজ দিল, বাবু—?

ভিতর থেকে সাড়া এলো, কে?

সাড়া দিয়ে হিরণ বেরিয়ে এলো। বললে, কে তুমি মিঞা?

আমার নাম মোতাহার,—সালাম্‌!

হিরণ বললে, কত নাম-ডাক শুনে এলুম তোমার ওই উজিরপুরে। গাঙের এপারে ওপারে তোমার নাম বলতে সবাই অজ্ঞান—সবাই তোমাকে জানে!

হে হে .....আপনি মোছলমান দেখি, আমি ভাবছেলেম...হে হে...

মিঞা, কথা আছে, বলবো চুপি চুপি। কিন্তু দেখো এদিকে—এঘরে থাকি কেমন ক'রে বলো ত'?

কোথায় যাবেন আপনারা?

আমরা যাবো সোনাগঞ্জের বাজার পেরিয়ে গোলকপুর।

গোলকপুর! কই, নাম শুনি নাই ত'! গোপালপুর কইছেন নাকি?

হিরণ বললে, ওই ছ্যাখো, কথাটা কিছুতেই মনে আসে না। ওখানে আমার মামার বাড়ি!

মোতাহার বললে, কাদের বাড়ি?

ওই যে—গোপালপুর থেকে বেরোলেই যাদের বড় তালুক—

রহমন সাহেবের কথা বলছেন?

হিরণ সহাস্যে অবাক হয়ে বললে, বাঃ মোতার মিঞা, তুমি ত' দেখি চেনো সব্বাইকে?

মাতাহার বললে, রহমন সাহেব মস্ত বড় তালুকদার। ওকে কে না জানে। দাঁড়ান, আমি আপনাদের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্চি। আচ্ছা, এক কথা। একটাই ত' রাত! আপনি যদি মেহেরবানি ক'রে থাকেন আমার ঘরে,—অনেক তকলিপ হবে অবিশ্যি—

হিরণ বললে, তোমারও তকলিপ হবে, মিঞা?

কিচ্ছু না, কিচ্ছু না—সব ব্যবস্থা আমার। এঘরে সাপ আসে রাত্রে,—চারদিকে জল ত'? পাশেই ত' বাঁশবন! এই হারিকেনটা রইলো, আমি এক্ষুনি আসছি। যাবার উদ্যোগ ক'রে মোতাহার একবার থমকে দাঁড়ালো। পুনরায় বললে, আচ্ছা, আপনারা ত' এদিকের নয়? আপনার বাড়ী কোথায়?

চাপা গলায় হিরণ বললে, আমার বাড়ী বর্ধমান! সেখান থেকে জান নিয়ে পালিয়ে এসেছি মিঞা। মামার ঘরে গিয়ে বাস করবো।

পাইলা আইলেন ক্যান?—মোতাহার মিঞা বড় বড চোখে তাকালো?

হিরণ একবার ঘরের দিকে ফিরলো। তারপর সভয়ে বললে, সে অনেক কথা, মিঞা! বলবো রাত্তিরে।

মোতাহার বললে, বুঝলম! হিঁদুর বিবিরে আনছেন সাথে কইরা, তাই না?

হিরণ বললে, ধরেছ তুমি ঠিক, মোতার মিঞা।

মোতাহার মিঞা বিজ্ঞের মতো বললে, ভালো কাম করেন নাই!

ফস ক'রে হিরণ দশটি টাকা বা'র করলো। বললে, মিঞা, তোমার ঘরে রাত্তিরে থাকবো, তোমার ত' খরচা আছে। এই নিয়ে তুমি ব্যবস্থা করো।

টাকা মোতাহারের হাতে গছিয়ে হিরণ বললে, সাবধান, ব'লো না কোথাও।

মোতাহারের মুখে হাসি ফুটলো। বললো, বলবো না কারেও। কিন্তু আপনি ভালো করেন নাই! টাইনা আনছেন, না বিয়া করছেন?

দু বছর বিয়ে করেছি, মিঞা! সে কি আজকের কথা?

তাহ'লে আর ভয় নাই।—আমি আসছি।

মোতাহার ছুটতে ছুটতে চ'লে গেল।

আধঘণ্টার মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে মোতাহার মিঞা ওদেরকে নিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে তুললো। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

একটি রাত্রির পাখির বাসা। হাসনু চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। এক কোণে কেরোসিনের ডিবে থেকে গল্‌গল্‌ ক'রে শিস উঠছে। ঘরে আছে একখানা চৌকী, তার নিচে কালিঝুলিমাখা গোটা দুই হাঁড়ি। একদিকের দেওয়াল থেকে মাটি ধ্বসে গেছে, বেরিয়ে পড়েছে চাঁচ! চালের দিকের একধারে একটা অংশ থেকে গোলপাতা ঝ'রে গেছে। বুঝতে পারা যায় গত চৈত্রে ছন্‌ জোটেনি। ঘরের ভিতর থেকেই অন্ধকার আকাশের এক টুকরো দেখা যাচ্ছে। হাসনুর দম আটকে এলো। কান্না এলো চোখে।

হাসনু ডাকলো, আবদুল?

হিরণের সাড়া পাওয়া গেল না। আবদুলের বদলে এলো মোতাহারের বিবি, আর এক মেয়ে। চৌকী থেকে উঠে গিয়ে হাসিমুখে হাসনু ওদের দুজনের হাত ধ'রে এনে বসালো। মা ও মেয়ে একেবারে আড়ষ্ট। এমন মেয়ে ওরা কখনো দেখেনি—এমন রূপ, লাবণ্য। ওদের একেবারে বাক্‌রোধ হয়ে গেছে।

হাসনু বললে, আপনারা বুঝি বাইরে যাননি কখনো?

তরুণী মেয়েটির নাকে রূপোর নোলক, কানে পিতলের মাকড়ি। সে এবার গলা পরিষ্কার ক'রে বললে, ছোটবেলায় উজিরপুর গেছলাম!

মাত্র উজিরপুর পর্যন্ত? এই ত' মাইল দেড়েক!—তোমার নাম কি ভাই?

নূরী।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে কি বলে ডাকবো, আম্মা?

হাসনু হেসে বললে, একটা রাতের মামলা, কাল সকালেই ত' গাঙে পাড়ি দেবো! নাম বললেও কি আপনার মনে থাকবে? আমার নাম সুহাসিনী!

গিন্নী বললেন, হিঁদুর মাইয়া, আমাগো মাথার মণি! রূপ আছে বটে তোমাদের ঘরে, আম্মা?

, হাসনু বললে, তার চেয়েও ভালো জিনিস আছে আপনাদের ঘরে মা। আপনাদের সহ্যশক্তি!

নূরী বললে, আমরা যে গরীব! আমাদের সব সয়। আমাদের মারলেও কথা কইনে।

মেয়েটির কণ্ঠে সহসা যেন উত্তাপ বিচ্ছুরিত হোলো। হাসনু সেটি লক্ষ্য ক'রে মায়ের দিকে ফিরে বললে, আপনার ছেলে পুলে কি, মা?

গিন্নী বললেন, আমার পেরথম ঘরের ছেলে আছে একটি—সে থাকে রংপুরে। আর এ ঘরের দুই মাইয়া। নূরী আর হুরী।

বিয়ে হয়েছে এদের?

হাঁ। হুরীকে দিছলাম নিকায়, আর এইটি। এটিরে ত্যাগ করেছে ওব মরদ। আর হুরীর চোখ নষ্ট হয়েছে বলদের ল্যাজের ঝাপটায়। দুই মাইয়া ঘরেই শুকাইছে! মরদটা মানুষ নয়। তামুক খেতে আসে এক-একবার। কথা কয় না, অমনি চ'লে যায়। মাইয়ারা কান্দে!

নূরী আবার উচ্চকণ্ঠে বললে, মিছা কথা, কান্দে না কেউ ওরা। ওরা মরলে হাড় জুড়ায়। বাড়ি দিয়ে মেরেছে সেদিন, মনে নাই?

মা বললে, চুপ কর বেটি, সমঝে কথা ক'।

কেন—কেন কথা কইবো সমঝে? মারে নাই? কালশিরা পড়ে নাই মাজায়?

নূরীর পিঠে হাত বুলিয়ে হাসনু বললে, এ দেশের সব মেয়েরই এই দশা, বোন?

নূরী বললে, আপনাদের ওদিকে ছেলেমেয়েদের কবার বিয়ে হয়?

হাসনু বললে, মেয়েদের বিয়ে একবারই হয়। ছেলেরা আগেকার কালে হয়ত দু'বার করতো। তবে কিনা স্ত্রী বেঁচে থাকতে আজকাল কেউ আর ভিন্ন স্ত্রীকে ঘরে আনে না। সেকালে কুলীনরা লজ্জাশরমের ধার ধারতো না, তাই অনেকগুলো বিয়ে ক'রে অনেক মেয়েকে ভাসিয়ে দিত।

শুদ্ধ ভাষায় আলোচনা ওদের পক্ষে দুর্বোধ্য। তবু প্রশংসমান দৃষ্টিতে ওরা হাসনুর দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে রইলো। মিনিট দুই পরে মা উঠে গিয়ে তালপাখা এনে হাসনুকে বাতাস করতে উদ্যত হতেই হাসনু তার হাত ধরে বললে, ও কি কথা। মেয়ে হয়ে মায়ের সেবা কেমন ক'রে নেবো। দিন্ আমার হাতে।

কপাল বেয়ে হাসনুর দরদর ক'রে ঘামের ফোঁটা নামছিল। সে নিজের হাতে পাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগলো। ওরা মুগ্ধ, অভিভূত। আনন্দে,

উদ্দীপনায়, উত্তেজনায়, দুরাশায় নূরীর দুটো চোখ দপদপ ক'রে যেন জ্বলছিল। চোখ দুটোর ভাষা যেন এই, এতদিনে তার জীবন, তার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। নূরীর সমস্ত শরীর আবেগে থরথর করছিল।

দরজার পাশে এখানকার চার-পাঁচটি বউ-ঝি এসে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে হাসনুর দিকে চেয়ে ছিল। কেরোসিনের ওই আলোতেও হাসনুর মাথার সিঁদুর অস্পষ্ট নয়। হাতপাখার সঞ্চালনে তার হাতখানা যেন বিদ্যুতের মতন অন্ধকার ঘরে ঝলক দিচ্ছে। এমন পরিচ্ছদ-পারিপাট্যের ধরন তারা কখনও চোখে দেখেনি।

এপাশের দরজায় এতক্ষণ পরে মোতাহার মিঞা আর আবদুলের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। নূরী উঠতে চাইলো, কিন্তু হাসনু ওকে ধ'রে রাখলো। বললে, লজ্জা কি বোন, আমি আছি—আসুক না ওরা ?

মোতাহারকে ধ'রে নিয়ে আবদুল ঘরের মধ্যে এলো, এবং আর কোনো কথা না ব'লে ওই স্যাঁৎসেঁতে মাটির মেঝের উপর চেপে বসলো। বুঝতে পারা গেল, মোতাহারকে সম্পূর্ণ প্রভাবান্বিত ক'রে হিরণ ওকে ফিরিয়ে এনেছে।

মোতাহারের মনের বিক্ষোভ মুছে গেছে। প্রসন্ন আনন্দে ওর মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মোতাহার হাসিমুখে বললে, হিঁদু মোছলমানে এত ঝগড়া-বিবাদ, কিন্তু হিঁদুর মেয়ে আমাদের ঘরে এলে ঘর আলো হয়! আসে না ব'লেই ত' মিঞা-ভাইদের এত রাগ। বলবো সত্যি কথা!

উপস্থিত সকলেই সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লো। মোতাহার মিঞা চৌকিদার হ'লে কি হবে—ও লেখাপড়া কিছু জানে বলেই ত' ইদানিং মাইনে হয়েছে বত্রিশ টাকা। দু'জন দফাদার আছে ওর তাঁবে। তারা ওর কথায় ওঠে বসে।

একরাত্রের অতিথি নিশ্চয়। কিন্তু এ গাঁয়ের জামাই হয়ে পড়েছে আবদুল এই ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই। জামাই ত' নয়, চাঁদের টুকরো। এমন রূপবান্ সুপুরুষ জামাই ক'টা আছে বাঙালী মোছলমানের ঘরে। সুতরাং দরজার বাইরেও মেয়েরা একটুও লজ্জা না পেয়ে বরং আরও সামনে এগিয়ে এলো। ওদের আজ উৎসব, ওর' যেন এসেছে ফুলশয্যার রাত্রে। ওরা আজ কিছুতেই নড়বে না।

ওদেরই মাঝখান দিয়ে একটি মেয়ে এক ভাঁড় দুধ এনে দরজার কাছে রাখলো। তারপর নিজেরই কুণ্ঠা কাটিয়ে হাসনুর দিকে উদ্দেশ ক'রে বললে, বিবিরে খাইতে দিয়ো, নূরীর মা। বাপজান দুইটা ইল্‌শা আন্‌ছে।

পিছন থেকে একটি গ্রামের লোক দুইটা টাট্‌কা ইলিশ মাছ এনে নামালো। বললে, মাইয়া জামাইরে পাক কইরা দিবা, নূরীর মা।

চারিপাশ থেকে যেন অভ্যর্থনার প্রতিযোগিতা লেগে গেছে। আবদুল স্তব্ধ হয়ে তাকালো সেদিকে। হাসনু ওদের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় ক'রে রইলো। এলো মুড়ির মোয়া, খইয়ের নাড়ু, একছড়া সবড়ি কলা, গোটা কয়েক ডিম, কেউ এনে দিল মৌসুমী আনাজ তরকারী, কেউ-বা একবাটি সরষের তেল,—মেয়ে-জামাই এসেছে গ্রামে, সাড়া প'ড়ে গিয়েছে চারদিকে। দেখতে দেখতে মোতাহার মিঞার ঘর ভ'রে উঠলো। গৌরবে, গর্বে, আনন্দে মোতাহারের স্ত্রী নিজের ভাষায় সকলকে সাদর সম্ভাষণ করতে লাগলো। তারপর এক সময়ে উঠে গেল রান্নাঘরের দিকে।

অভ্যর্থনা আবদুলেরও কিছু পাওনা ছিল। যে-বছর রাজা আসে গাঁয়ে, সেই বছরে মোতাহারের একটাকা তলব বাড়ে। সেই সম্মানটা উপলক্ষ্য ক'রে মোতাহারকে একটি লাল মখমলের ফেজ টুপি আর একজোড়া কানের আঙট উপহার দেওয়া হয়। আজ মোতাহার বেপরোয়া হয়ে সেই দুটি জিনিস বার ক'রে এনে আবদুলের মাথায় ও কানে পরিয়ে দিল। সুহাসিনী তাকালো আবদুলের দিকে। হিরণের কানে কানবালা, মাথায় লাল ফেজ। অপূর্ব দৃশ্য বটে!

নতুন হুঁকোয় তামাক সেজে আনলো কলিমুদ্দি দফাদার। সেই হুঁকো নিয়ে বাঁ হাতখানা ডান হাতে ছুঁইয়ে মোতাহার আবদুলের হাতে দিতে চাইলো। আবদুল তাড়াতাড়ি বললে, ও আমি খাইনে মিঞা!

তামক খান্ না? তা হবেই ত'! শেরের বাচ্চা যে! অ'চ্ছা, আমি ভালো জিনিস আনাইতে আছি। কলিমুদ্দি, আনতো রে!

কলিমুদ্দি তাড়াতাড়ী অন্ধকারে সহাস্যে বেরিয়ে গেল।

মেয়েরা অনেকেই জড়ো হয়েছিল। তারা নিজেদের মধ্যে কি যেন একটা আলোচনা ক'রে নিল। তাদের ইশারায় নূরী সাহস ক'রে হাসনুর পাশে এসে বললে, ভাবী, আসেন আপনি আমাগো ঘরে। ওরা কইছে সবাই।

হাসনু গরমে আর গুমোটে কষ্ট পাচ্ছিল। বললে, বেশ ত, চলো—তোমাদের সঙ্গে গল্প করিগে।—এই ব'লে সে উঠলো, এবং ওদিকের ঘরে যাবার আগে হাটের কেনা সমস্ত জিনিসপত্রগুলি সঙ্গে নিয়ে ওদের হাত ধ'রে বেরিয়ে গেল। মোতাহার হাস্যমুখে আবদুলের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করলো, আবদুলের মুখ-চোখ সুন্দরী সুচরিতা স্ত্রীর গর্বে গৌরব-গর্বিত।

কলিমুদ্দি এবার ফিরে এলো। হাতে তার একটি ভাঁড় এবং একটি

কলাইয়ের গেলাস। মোতাহার সোৎসাহে সেই গেলাস এবং ভাঁড় নিজের হাতে নিল। তারপর বললে, যা ত' কলিমুদ্দি, পাকঘরে গিয়া চারটি চা'ল ভাইজা আন্ দেখি! এ একেবারে খাঁটি জিনিস, জনাবালি। একটুও পানি নাই!

আবদুল বললে, ও কি আনালে, মিঞা?

মোতাহার খুব হেসে উঠলো। বললে, কলিমুদ্দি, তোরেও দিমু, ব'স।—তারপর আবদুলের দিকে ফিরে বললে, খাশের জিনিস, নবাব সুবো ছাড়া খায় কেডা? এ তোমাগো ধেনো পচাই না, টাট্‌কা তালের রস থাইকা বানাইছে। খাইলে ভুলবা না।

১৫

হাসুবানুকে নিয়ে মেয়েরা কাঁচা উঠোন পেরিয়ে পুবদিকের ঘরখানায় উঠে এলো। সুহাসিনী নামটি হাসনুকে মানিয়েছে বৈ কি। হাসি ছাড়া সে কথা বলে না। হারিকেনের আলোয় দূরের থেকেও দেখা যায়, দাঁতগুলি শুভ্র সুন্দর, ও-মুখে তাম্বুল স্পর্শ করেনি কখনো। আলতামাখা পা দুখানি ছুঁয়ে চলেছে কাদামাটির উঠোন—হাসনুর রাঙাচরণস্পর্শে সে মাটি ধন্য হয়ে রইলো। ঘরের মধ্যে এনে-ওরা-হাসনুকে বসালো সকলের মাঝখানে।

এটি-মোতাহার মিঞার শয়নকক্ষ। চৌকীদার চাষীর ঘরে আসবাবপত্রের চেহারা কিরূপ হ'তে পারে, এ অনুমান করা কঠিন নয়। দরিদ্রের গৃহসজ্জার বর্ণনায় আনন্দ পাওয়া,—ওর ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকে আত্মমর্যাদার অভাব। হাসনু প্রতিপদে কুণ্ঠাবোধ করছিল, কেন-না এই আবহাওয়ায় সে বেমানান। তার শাড়ি, তার জামা, তার কান, গলা ও হাতের অলঙ্কার, তার জুতো,—সমস্তর জন্যই সে সঙ্কুচিত। কিন্তু আজ রাত্রির সমস্ত সমাদর এবং অভ্যর্থনা তাকে গ্রহণ করতে হবে, কেন-না এই হলো গ্রামের দাবি। হাসনু ওদের চোখে আজ বিচিত্র বিস্ময়, ওদের আজীবনের কামনার মতো, ওদের চিরকালের দুরাশা। ওরা শ্রদ্ধা ক'রে এসেছে হিন্দু মেয়েদেরকে চিরদিন, ওরা সেবা ক'রে এসেছে যুগ-যুগান্তর, ওরা ধান ভেনে আর পাইট কেটে অন্ন যুগিয়ে এসেছে, ঘরের পুরুষদেরকে পাঠিয়ে ওরা হিন্দু মেয়েদের ঘর গুছিয়ে দিয়ে এসেছে। তার বদলে শ্রদ্ধা পায়নি, পেয়েছে কৃপা; ভালোবাসা পায়নি, পেয়ে এসেছে দয়ার ছিটেফোঁটা। অথচ এদের ঘর গুছিয়ে দিতে আসেনি হিন্দুমেয়ে, এদের

লেখাপড়া শেখায়নি, এদের টেনে আনেনি বৃহত্তর কোনো কর্মক্ষেত্রে। ওদের চেহারা, ওদের কৌতূহল আর কানাকানির ভাষা শুনে হাসনুর মাথা যেন হেঁট হয়ে আসছিল।

বিছানাটার দারিদ্র্য দেখলে শরীর রোমাঞ্চ হয়ে আসে, তবু সেটি পরিপাটি ক'রে পাতা। আধময়লা একখানা ডুরে শাড়ি পাট ক'রে এক জায়গায় ঝোলানো। দু'তিনটি পিতলের বাসন সামনে এনে রাখা হয়েছে, কেন না ওতে ঘরের শোভা বাড়বে। একদিকের ছেঁচা বাঁশের দেওয়ালে পবিত্র মক্কাতীর্থের একখানি রঙীন ছবি ঝুলছে। ওইখানে গিয়ে চোখ দুটো দাঁড়িয়ে থাকে।

দরজাটা আলগোছে পেরিয়ে একটি বড় মেয়ে ভিতরে এলো। একটি চোখে তার কাপড় বাঁধা, হাতে একটি কলায়ের থালা, তার ওপর গুটিচারেক খইয়ের লাড়ু, ডানহাতে একবাটি দুধ। এই মেয়েটির নামই নূরী,—স্বামীপরিত্যক্তা। চেহারায় শ্রী নেই, স্বাস্থ্য নেই,—দেখলে গা ভোল হয়ে আসে। নূরী বললে, ভাবী, ওরা সকলেই ক্ষ্যাতে কাম করে। হিঁদুরা থাকতে কাজ পেতো, কাপড় পেতো,—এখন বড় তকলিপ। মেয়েদের পোড়া নসিব, পাকিস্তান হইয়া নসিব ফিরে নাই!

এই মেয়েটাই কেবল কথা বলে, আর সবাই বোবা। আজ ব'লে নয়, কোনোকালেই ওদের মুখে ভাষা দেয়নি কেউ। ওরা তাই দুঃখ জানাতেও ভরসা পায় না। মরদরা চাষ করে, ধান কাটে, তামাক-তাড়ি খায়, বউকে ঠেঙায়, ধান উঠলে নিকা নিয়ে আসে, আর নয়ত কোঁচ নিয়ে গিয়ে হাটতলায় দাঙ্গা বাধায়। এক স্বামীর সন্তান অন্য মরদ পালন করে, এক স্ত্রীর সন্তান ভিন্ন স্ত্রী এসে লালন করতে থাকে। সমস্ত বছর ধ'রে মেয়েরা ম্যালেরিয়ায় ভোগে, আর গরমের চার মাস ওলাউঠায় মরে।

একটি খইয়ের লাড়ু এবং দুধটুকু হাসনু নিল, তারপর উজিরপুর হাট থেকে কেনা সমস্ত সামগ্রী-ভরা পুঁটলীটি সকলের মাঝখানে খুলে বসলো। সে জানতো, খালি হাতে গ্রাম্য সমাজে যাওয়া যায় না।—বিতরণ করার মতো কিছু জিনিসপত্র তাকে সঙ্গে নিতেই হবে।

প্রায় ত্রিশ-বত্রিশটি মেয়ে,—বরং বেশী ত' কম নয়। পুঁটলীটিও বেশ বড় ছিল। খঞ্জনী-বাঁধা ডুগডুগিটি আবদুলের কাছে সে রেখে এসেছে,—এ পুঁটলীতে প্রায় পঞ্চাশ টাকার সামগ্রী। কিন্তু ওদের চোখের কৌতূহল অনন্ত, হাত আড়ষ্ট। ওরা দিয়ে এসেছে সবাইকে, নিতে শেখেনি। ওদের ক্ষুধা আছে, কিন্তু ক্ষুধার নিবৃত্তি আছে এ ওরা জানে না। হাসনু হাস্যমুখে বললে, তোমাদের জন্যেই এনেছি বোন, তোমরা সবাই ভাগ করে নাও।

ওরা ভয়ে কেউ হাত দিতেই সাহস করলো না। বাইরে ছোট ছোট উলঙ্গ অর্ধনগ্ন ছেলেমেয়েরা এসে ভীড় করেছে, কলরব সুরু করেছে। এ গ্রামে আজ মেয়ে-জামাই নিয়ে উৎসব—এ খবর অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছেছে। হাসনু নিজের হাতে পুঁটলীর থেকে এক-একটি জিনিস নিয়ে ওদের মধ্যে বণ্টন ক'রে দিল। আয়না, চিরুনী, কুঙ্কুম, মাথার কাঁটা, ফিতে, পাউডার, তেল, সাবান স্নো—কি নয়? খেলনা আছে বহু রকমের, ঘরকন্নার কাজে লাগে এমন সামগ্রীর সংখ্যাও কম ছিল না। বিস্কুট ছিল, ছিল লজেঞ্চেস, ছিল প্লাষ্টিকের নানাবিধ উপকরণ।

এমন সময় বাইরে যেন একটু সাড়া প'ড়ে গেল। মেয়ে-জামাইয়ের খবর পেয়ে পশের গ্রাম থেকে এসেছেন বেগম খাতুন। পাকিস্তান হবার পর পাশের গ্রামে মেয়েদের জন্য শাকাওয়াৎ ইস্কুলটি গড়ে ওঠে, বেগম খাতুন সেখানকার প্রধান শিক্ষয়িত্রী। তিনি সুহাসিনির নাম শুনে আর স্থির থাকতে পারেননি। রোশন চাকরটার হাতে হারিকেনটা দিয়ে তিনি এই রাত্রিতেই এসে হাজির।

মেয়েদের ভিড় সরিয়ে বেগম খাতুন ভিতরে এসে হাসনুকে সালাম জানালেন। হাসিমুখে বললেন, বড় আনন্দের কথা! দু এক রোজ থাকবেন ত'?

হাসনু ওঁকে ধ'রে সমাদরের সঙ্গে পাশে বসালো। বাইরে থেকে কোনো সম্ভ্রান্ত লোক এলেই বেগম খাতুনকে এগিয়ে দেওয়া হয়। তিনি এ অঞ্চলের মুখপাত্রী। পরিচয়াদির পর বেগম বললেন, ইস্কুলটা অনেক কষ্টে চলে। লেখাপড়া শেখার অভ্যাস ত' নেই, সবাই কাজ নিয়েই থাকে। আর চাষার লেখাপড়া শিখলেই বা কি, একদিন মাঠে ওদের নামতেই হবে!

ঘণ্টা তিনেকের পর হাসনু এবার মুখ খুললো। বললে, কি শেখে এরা?

বেগম বললেন, কীই বা শিখবে! বই কাগজ ত' নেই,—যা আছে তা এতই বেমানান, এমনই বাজে যে, নিজেদের লজ্জা করে। শিশুপাঠ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। লেখাপড়াব কোনো ভবিষ্যৎ নেই ব'লেই মা-বাপরা গ্রাহ্য করে না। তা ছাড়া কি জানেন, পাকিস্তান হবার আগে সবাই কত কথাই ভাবতো,—কিন্তু হবার পরে কা'রো কোনো মাথাব্যথা নেই। যা ছিল তাই আছে, কেবল মাঝে মাঝে ঢাকায় গণ্ডগোল বাধে! পাকিস্তান হয়ে আমাদের কোনো সুবিধে হয়নি, বোন।

মহিলাটির বয়স বছর ত্রিশ। সাদামাটা চেহারা! কানে দুটো ফুল, হাতে কাচের চুড়ি। নাকটি অতিশয় লম্বা, সম্ভবত নাকটি নিয়ে স্কুলের মেয়েরা হাসি-

তামাসা করে। হাসনু বোধহয় মনে করেছিল, গ্রামে এসে গ্রামের কথাই কান পেতে শুনবে,—শুনে চ'লে যাবে। কিন্তু দু একটি কথার জবাব না দিলে তাকে সবাই ভুল বুঝতে পারে। সুতরাং জবাব সে দিল। বললে, আপনারা কোন্ সুবিধের কথা ভেবেছিলেন, দিদি ?

কী মধুর কণ্ঠস্বর! একদল দাঁড়কাকের মাঝখানে হঠাৎ যেন বসন্তের কোকিল ডেকে উঠলো। সকলে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো। হাঁ, একথা সত্যি—! ভালো মেয়ে, ভালো চেহারা, ভালো স্বাস্থ্য—যদি কোথাও থাকে ত' সে হিন্দু মেয়ে মহলেই আছে।

বেগম বললেন, ধরুন, ভারত স্বাধীন হয়ে হিন্দু মেয়েদের মধ্যে যেমন সাড়া প'ড়ে গিয়েছে। লেখাপড়া শিখবে, কাজ পাবে, সামাজিক উন্নতি, ভালো ক'রে বাঁচবার উপায়

হাসনু বললে, কিন্তু মেয়েদের সুবিধার জন্যে পাকিস্তান ত' হয়নি। পাকিস্তান হলো পুরুষের, একটা বিশেষ গোষ্ঠীর। আপনাদের নিয়ে ওদের ভাববার সময় নেই।

বেগম হাসিমুখে হাসনুর দিকে তাকালেন। সন্দেহ নেই, স্নেহের দৃষ্টি। শান্তকণ্ঠে তিনি বললেন, আপনি ত' হিন্দুমেয়ের মন নিয়ে কথা বলছেন। লোকে ত' বলবে, পাকিস্তানের ওপর আপনাদের রাগ আছে।

সুহাসিনী হাসনুও হাসলো। বললে, সত্যি কথা, খুব রাগ। কিন্তু রাগের ওপরেই যে পাকিস্তান। হিংসা আর ঘৃণার ওপর, রক্ত আর মৃত্যুর ওপর, জায়া জননী আর ভগিনী অপমানের ওপর। মেয়েরা পাকিস্তানে কতটুকু সম্মান পেয়েছে দিদি। মুসলমান সমাজের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, গুণী আর পণ্ডিতরা জায়গা নিয়েছেন ভারতে, পাকিস্তানে নয়।

এ কি বলছেন আপনি ?

হ্যাঁ, আমি হিন্দু ব'লেই বোধ হয় রাগে কথা বলছি। চেয়ে দেখুন হিন্দু মেয়ে এখানে অমর্যাদা সইছে, মুসলমানের মেয়ে সইছে অবহেলা। একদল হোলো লোভের সামগ্রী, আরেক দল হোলো ঘৃণার পাত্রী। হিন্দু মেয়েরা হয়ত দেশ ছেড়ে বাঁচবে,—কিন্তু আপনাদের মাথা উঁচুতে উঠবে কোনোদিন ?

ঘরের বাইরের শিশুমহল পর্যন্ত হতবাক হয়ে গেছে, আর ভিতরে সবাই রুদ্ধশ্বাস। যার হাতে একটু আগে একদল মণিহারী সামগ্রী উপহার পাওয়া গেছে, যাকে একটু আগেও মনে হয়েছে লজ্জাবনতা আনম্রা স্বল্পভাষিণী—হঠাৎ সে হোলো মুখরা! ঘোমটার ভিতর থেকে যেন সহসা জ্ব'লে উঠলো এক

বিপ্লববাদিনী নারী, এক বিদ্রোহিনী,—যাকে একটু আগেও তিলমাত্র বোঝা যায়নি। মুসলমানদের মেয়ে ব'লে যাকে এখনও কেউ আবিষ্কৃত করেনি।

উত্তেজনাটা হাসনু সম্বরণ করলো। মনে' প'ড়ে গেল, কঠিন কথা এখানে শোনানো চলে না। এরা নরম, এরা সরল, এরা মূঢ়। সে এবার শান্তকণ্ঠে বললে, আমার স্বামী মুসলমান, সুতরাং নিজেকেও আমি মুসলমান মনে করি। কায়মনোবাক্যে আমাকে মুসলমান হ'তে হয়েছে, দিদি। সেই অধিকারেই আমি বলছি। দুনিয়াসুদ্ধ লোক আপনাদের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছে, কখনো জেনেছেন? তারা ভাবছে, মেয়ে হ'যে মেয়ের ওপর অনাচার আপনারা চিরদিন মুখ বুজে সইছেন,—আপনাদের কোনো মেরুদণ্ড নেই! পুরুষের লাম্পট্য আপনাদেরকে চঞ্চল করে না, দস্যু পুরুষের সাংঘাতিক লালসায় আপনাদের মনুষ্যত্ব পর্যন্ত জ্বলে পু'ড়ে গেলেও কোনো ভ্রূক্ষেপ আপনাদের নেই!

বেগম খাতুন বললেন, এমন পুরুষ ত' হিন্দুসমাজেও আছে, বোন।

হাসনু বললে, আছে কিন্তু এমন মেয়ে সেখানে নেই। সেখানে লালসা দস্যুতার প্রতি ঘৃণা আছে, বহু-নারীগত পুরুষের প্রতি অশ্রদ্ধা আছে, বর্বরের প্রতি সেখানে শাস্তিবিধান আছে। তাই শত দুঃখেও সেখানে মেয়েরা বাঁচে, উঠে দাঁড়ায়, দায়িত্বভার বহন করে, পুরুষকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। কিন্তু এখানে?

নূরীর চোখ দুটো অবরুদ্ধ উত্তেজনায় পাশের থেকে যেন দপদপ ক'রে জ্বলছে। ভাষাটা দুর্বোধ্য, কিন্তু ব্যঞ্জনাটা উপলব্ধি করার মতো। কী প্রশংসা ওর মুখে চোখে,—হাসনু বুঝতে পারে।

বেগম খাতুন বললেন, মুসলমান সমাজে কত বড়-বড় মেয়ে জন্মেছে, আপনি কি তাদের কথা শোনেন নি?

হাসনু হেসে বললে, চাঁদ সুলতানা, রিজিয়া, শমরু, জাহানারা—এঁদের কথা বলবেন ত'? তাঁরা নমস্য, তাঁদের কথা থাক—তাঁরা থাকুন শিশুপাঠ্য বইয়ের ছবির মধ্যে। তাঁরা হলেন ব্যতিক্রম। ওঁরা বলবেন ওঁদেরও আছেন অহল্যাবাঈ আর রানী ভবানী ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তা নয় দিদি, নেমে আসুন আমাদের মধ্যে। চেয়ে দেখুন, চিরকাল ধ'রে মুসলমানরা মেয়ে চুরি করেছে, আর মুসলমানের জননী-ভগিনীরা সেই অপমান বরদাস্ত ক'রে এসেছে। এই বাঙলায় শত শত বছর ধ'রে মুসলমানেরা মেয়ে চুরি ক'রে চলেছে, কিন্তু একটি মুসলমান মেয়ে কখনো কি উঁচু গলায় এই অপমানজনক নোংরামির প্রতিবাদ করেছে? কখনো কেউ দাঁড়িয়েছে এই দস্যুতার বিরুদ্ধে?

মেয়েদের নিজের ভাষায় কোন মুসলমানী আত্মমর্যাদার পরিচয় দিয়েছে? কখনো বলেছে, নারীধর্ষণ হোলো পাপ? বলেছে কখনো যে মুসলমান জননীর ঘরে এত বড় কদাচার হ'তে দেবো না?

ফস্ করে হেসে বেগম খাতুন বললেন, আপনার বিয়ে হয়েছে কি ভাবে?

আমার?—হেসে হাসনু জবাব দিল, আমাকে আর লজ্জায় ফেলবেন না! দু'টি কথা শুধু বলতে পারি। বাপের বাড়ির সঙ্গে আর আমার কোনো যোগ নেই; আর দ্বিতীয়ত, আমার মনে কোনো অনুশোচনা নেই।

তাহ'লে বলুন স্বামী আপনার খুব ভালো?

মন্দ হবার উপায় ছিল না, দিদি।

কেন?

হিন্দুমেয়ে ঠকে না, তারা বাড়িয়ে নিতে জানে। স্বয়ম্বর সভা হিন্দুসমাজেই ছিল,—মেয়েদের প্রতি এত বড় সম্মান কোনো যুগে কোনো দেশেই ছিল না। মুসলমান মেয়ের দুর্ভাগ্য, তারা পুরুষকে পায়, পুরুষের প্রশংসা পায়, এমন কি সমাদরও পায়,—পায় না শুধু পুরুষের ভালোবাসা!

বেগম বললেন, আপনি কি পূর্ববঙ্গ ছাড়া আর কোনো দেশের কথা বলছেন?

হাসনু বললে, না দিদি, আমি বাঙ্গলাদেশের কথা বলছি। বলতে পারেন, বাঙ্গালী মুসলমানেব মেয়ে কবে নিজেদের স্বাভাবিক ন্যায্য অধিকার নিয়ে দাঁড়াবে? কবে তারা মোল্লাতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে মাথা তুলবে? ভরসা দিতে পারেন সেদিনের?

বেগম বললেন, আমাদের শক্তি কতটুকু, বোন?

আপনাদের শক্তি আছে কি শুধু বাঁদী হয়ে থাকার? ইসলামের সমাজনীতি আমার জানা নেই, হয়ত অনেক মোল্লা-মৌলানাবাও খুঁটিয়ে জানে না। কিন্তু একথা কি ইসলামে আছে যে, মেয়েদেব পক্ষে দাসী বাঁদী হয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো পরিচয় নেই? তারা কেবল বিছানার সঙ্গী, তারা কেবল খেয়ালের খেলা? যখন খুশি ভাঙ্গো, যখন খুশি নতুন খেলা আনো? একথা কি আছে ইসলামে যে, হাটে-মাঠে-বাটে স্ত্রীলোকের দেহ নিয়ে ছিনিমিনি খেলাই পৌরুষ? আছে কি ইসলামে যে, পারিবারিক সম্ভ্রম আর শুচিতার থেকে, সমস্ত আত্মীয়স্বজনের ভালোবাসার মাঝখান থেকে ভদ্রনারীদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে পালানোটাই পুরুষের ধর্ম? ইসলামে কি বর্বরতাব প্রশ্রয় আছে, লোভ আর লালসার আস্কারা আছে? দিদি, এই প্রশ্নই আমার,—চিরকাল এই প্রশ্নই আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে।

বেগম খাতুন এবার ধরা গলায় বললেন, আমাদের ভয় দুটো। ধর্মের ভয়, পুরুষের ভয়। ইসলাম আমিও জানিনে। কিন্তু এটা জানি, ইসলাম হোলো পুরুষের—ওটার মধ্যে মেয়ে নেই। লক্ষ্য করবেন, কোনো মেয়ে মুসলমান ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না। এও লক্ষ্য করবেন, মেয়েদের ডেকে কোনো মোল্লা ইসলামের বাণী শোনায় না।

হাসনু শান্তকণ্ঠে বললে, আমার অনুরোধ, ঘরের মধ্যে আপনারা শুচিতা আনুন,—ঘর আপনাদের পবিত্র হোক, সুশ্রী হোক। এ উপদেশ নয় দিদি, এ আমার কামনা। ঘর থেকে জঞ্জাল সরিয়ে দিন, পুরুষকে মানুষ করুন। স্কুল চালাচ্ছেন আপনি, কিন্তু চরিত্রের নীতি গ'ড়ে তুলতে না পারলে লেখাপড়া শিখিয়ে কী হবে ? বইয়ের অক্ষরে শিক্ষা নেই, শিক্ষা আছে অন্তরে। মনুষত্বের শিক্ষা হোলো স্নেহে, শাসনে, বাৎসল্যে ভালোবাসায়। পাকিস্তান বড় হোক, তার চেয়ে বড় হোক পূর্ববঙ্গের সকল মানুষ। মানুষের চেয়ে ধর্ম বড়—একথা ভুল। ধর্মের চেয়ে মানুষ অনেক বড়। মানুষের হাতে বহু রকমের সৃষ্টি হয়েছে, ধর্ম তার মধ্যে আর একটি সৃষ্টি মাত্র। ধর্মের ব্যাখ্যা যুগে যুগে বদলায়, কেন-না মানুষ যে বদলে চলেছে। আমি হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুয়ানী আমার রক্তে,—এই আপনি বলবেন ত' ? কিন্তু বিশ্বাস করুন, কোনো ধর্মেব সাধ্য নেই, আমাকে চালায়। আমি ধর্মের চেয়ে বড়, আমার আবদুল আমাব চেয়েও বড়—কেন-না ওর ধর্ম হোলো মনুষ্যত্বের। ধর্মের আঁচার, ধর্মের অনুষ্ঠান, ধর্মের অন্ধ সংস্কার, ধর্মের চলতি বুলি—কোনটাতেই আমরা রস পাইনে, কোনোটাতেই আনন্দ পাইনে। খ্রীষ্টানদের দেশে খ্রীষ্টধর্মের মৃত্যুর পর থেকে খ্রীষ্টান সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছে,—কেন-না গির্জা আর পাদ্রীর শাসনে কেউ চলতে রাজি হয়নি! মসজিদ যদি পাকিস্তানকে শাসন করে, তবে পাকিস্তান ঢুকবে মসজিদের ভিতর,—মানুষ থাকবে বাইরে। রাষ্ট্রের ভিত্তি যদি ধর্মের ওপর গড়ে, তাহ'লে বুঝবো আকাশে প্রাসাদ গড়া হচ্ছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—সবাই আকাশের দিকে তাকিয়ে পরম পিতাকে খোঁজে—যে আকাশটা শূন্য। শূন্যের থেকে যারা ভরসা পায় তারাও দাঁড়িয়ে থাকে, মাটিতে,—কেন না মাটিই হোলো রাষ্ট্র, ধর্মটা রাষ্ট্র নয়। মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরকে চাই,—আকাশ চিরদিনই শূন্য থাকে !

রাত অনেক হয়েছে। আলোচনার ভাষা এবং ধারা বুঝতে পারেনি অনেকে, কিন্তু অনেকে উঠে ব'লে যাবার সময় শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ রেখে গেছে এই গোলপাতার ঘরটির মধ্যে। ইতিমধ্যে মোতাহার মিঞার স্ত্রী এসে বার দুই আহারের জন্য তাগাদা দিয়ে গেছেন। অল্পবয়সী চার পাচটি মেয়ে ছাড়া

আর সকলেই একে একে বুকভরা আনন্দে বিদায় নিয়ে গেল। বেগম খাতুনও এবার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে বড় খুশি হলাম। ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

যাবেন না—ব'লে হাসনু তাঁর হাত ধরে টেনে আবার বসালো। পুনরায় বললে, আজ থাকুন আপনি, কাল ভোরে উঠে যাবেন।

কিন্তু ব'লে আসিনি যে?

নূরী বললে, আমি এখুনি কলিমুদ্দিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি থাকুন, দিদিমণি!

বেগম খাতুন বললেন, তোমার না হয় মরদ নেই এখানে, কিন্তু উনি? ওঁকে বুঝি বর নিয়ে ঘরে উঠতে দেবে না?

হাসনু হেসে বললে, হারাবার ভয় ত' নেই,—নাই বা একদিন বর নিয়ে ঘরে উঠলুম? আপনি থাকুন আজ আমার কাছে—দু'জনে এক জায়গায় শোবো।

নূরী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমি তবে এবারে আপনাদের খাবার জায়গা ক'রে দিই।—এই ব'লে সে বাইরে গেল।

হাসনু আস্তে আস্তে বললে, দিদি, এবার মুসলমানের মেয়েরা সব ভয় ঘুচিয়ে উঠে না দাঁড়ালে আমাদের কোনো উপায় নেই। ঘরে-ঘরে আলো জ্বাললে মুসলমান পুরুষ ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেবে। সুতরাং আলোর বদলে চাই আগুন,—সেই আগুনে আবর্জনাও পুড়বে এবং তার আভায় পথও দেখে নেওয়া চলবে। প্রত্যেক ঘরকে অসহনীয় ক'রে তুলতে হবে,—তবেই মুসলমান পুরুষ ঘর বাঁচাতে চাইবে, তবেই তাদের দৃষ্টি বাইরের থেকে ঘরের দিকে ফিরবে।

বেগম বললেন, আমাদের ওপর উৎপীড়নের চেহারা কি আপনার জানা আছে?

আছে। কিন্তু হোক না অপমৃত্যু! অপমানের থেকে মুক্তি হবে ত? বেঁচে থেকে মরার চেয়ে ম'রে বাঁচা কি ভালো নয়? ভারত আর পাকিস্তান —শুধু দুটো নাম মাত্র। মানুষের সমস্যা এখানে এক। হিন্দুর মেয়েরা ঝগড়া করতে জানে, স্বামীকে শাসন করতে জানে, তাই তারা বেঁচে যাবে। কিন্তু চুপ ক'রে থাকলে মুসলমানের মেয়ে যে বাঁচবে না, দিদি! লক্ষ লক্ষ ভদ্র মুসলমান পরিবারকে সভ্যজগতে কলঙ্কিত ক'রে রেখেছে মুসলমানী মনোবৃত্তি। এই মনোবৃত্তি ঘোচার ভার আপনাদের হাতে। আপনাদের গর্ভে নতুন জাতের জন্ম হোক, তারাই আনবে পাকিস্তানের সম্মান, তারাই আনবে আপনাদের সত্যকার মুক্তি। তারা দেবে আপনাদের ভাষা, আপনাদের শক্তি, আপনাদের স্বকীয়তা আর স্বাতন্ত্র্য। সেইদিন সমাজের অন্ধকার ঘুচবে!

নূরী এসে দাঁড়ালো।বললে, আসুন ভাবী, দিদিমণি আসুন।—আপনাদের খাবার দেওয়া হয়েছে।

ভোরবেলা উঠে বেগম খাতুন বাড়ী চ'লে গিয়েছিলেন, সুতরাং বিদায়কালে তাঁর সঙ্গে আর দেখা হোলো না। সকালের দিকে আহারাদির একটা পাট ছিল, সেটা চুকিয়ে আবদুলকে নিয়ে সুহাসিনী যাবার জন্য প্রস্তুত হোলো। পুরুত বামুনের ছেলে হিরণ পুরোপুরি মুসলমানের সজ্জা নিল—ধরা ছোঁয়ার যো ছিল না, মাথায় চড়িয়ে নিল সেই লাল রঙের ফেজটুপি আর কানে কানবালা,—মোতাহার মিঞার দেওয়া দুটি অমূল্য উপহার। হাতে নিল সেই ঘুঙুনী-বাঁধা ডুগডুগি,—তার মামা রহমত সাহেবের ছেলের জন্য। চোখে সুর্মা, —দাড়ি কামাবার সময় চিবুকে একটুখানি নুর আগেই রাখা ছিল। পায়ে সেই বেগুনী প্লাস্টিকের পাম-সু, গায়ে সেই বেলদার ফুলকাটা আদ্দির পাঞ্জাবী,—গলার কাছ থেকে চেনবাঁধা রূপোর বোতামের সেট ঝুলছে। কলকাতার চাঁদনীর বাজার থেকে হাসনু ওসব নিজে পছন্দ ক'রে কিনেছে। জীবনটাকে নিয়ে নানা রসের খেলা না খেলতে পাবলে শ্রীমতী হাসনুবানুর কোনো আনন্দ নেই। নিঃসঙ্কোচে মিথ্যাভাষণে হাসনুর জুড়ি খুঁজে পাওয়া কঠিন, নির্ভয় সত্যভাষণে তাব কিছুমাত্র দ্বিধাও দেখা যায় না!

ঘাটে এসে হাসনু আর হিরণ যখন নৌকায় উঠলো, তখন সমস্ত গ্রাম এসেছে ওদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্য। নূরী আর তার মা আঁচলে চোখ মুছছে,—নূরীকে আদর ক'রে হাসনু ওব হাতে পঁচিশটি টাকা গোপনে উপহার দিয়ে এসেছে। চোখে কাপড় বেঁধে হুরী এসেছে, কিন্তু সে হাবা, তার সঙ্গে ওইজন্য আলাপ করা হয় নি। চৌকিদাব মোতাহার মিঞা এ গ্রামের সমাজপতি, সুতরাং সে মেয়ে-জামাইয়ের বিদায়েব ব্যাপারে সমস্ত প্রকার তদ্বির তদারক নিয়ে রয়েছে। হাসনু নিজের নাম নিয়েছিল সুহাসিনী, নৌকায় উঠে ছদ্মনামের পূর্ণ মূল্য দিল। রোদ পড়েছে তার বেগুনীরঙের এলো খোঁপায়, কপালের চুলের ঝালরে,—তার সুবর্ণ স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে। রোদের আলোয় তার কপালের ঘামের বিন্দুগুলিও প্রভাতের রঙীন শিশির-বিন্দুর মতো ঝলমল করছিল।

নৌকা যখন ছাড়লো তখন লালটুপি-পরা রূপবান আবদুল হাসিমুখে গ্রামের সমস্ত শ্যালিকাদের উদ্দেশে বিদায় সম্ভাষণ জানালো। নৌকা যাবে পশ্চিমে, এখন দক্ষিণের পার ঘেঁষে চললো।

হাসনু এক সময়ে ডাকলো, আবদুল?

হিরণ মুখ ফিরিয়ে তাকালো।

হাসনু বললে, হিন্দু মেয়ের খাতির এখানে হোলো কেমন?

হিরণ বললে, রাঁচীতে মুসলমান মেয়ে যে-খাতির পেয়েছিল এখানে তার বিপরীত। ক্ষতিপূরণ হয়ে গেল।

হাসনু ইংরেজিতে বললে, সাবধান, নৌকা-চালক যেন আমাদেরকে বুঝতে না পারে!

পারলে ক্ষতি কি?—

হেলেনের জন্য ট্রয়ের যুদ্ধের সম্ভাবনা!

হিরণ বললে, তোর কি ধারণা, তুই এত বড় সুন্দরী?

সুহাসিনী হাসুবানু একটুখানি সর্বনেশে হাসি হাসলো। বললে, আমার ধারণা, আমি হলুম পাকিস্তানের শিবরাত্রির সল্‌তে। ট্রয়যুদ্ধে তুই মারা গেলে শিবরাত্রির সল্‌তেটি তেলের অভাবে শুকিয়ে নিভে যাবে! কমরেড, তোর দুইপাশে যদি রুক্মিণী-সত্যভামা কখনো এসে জোটে ত' জুটুক,—কিন্তু তুই যে দ্রৌপদীর সখা! আমার অন্তর্যামী!

নৌকাওলা বললে, জনাবালি, লা'য়ের মধ্যিখানে বয়েন্। পানির ধাক্কা মারছে। পালে বাদাম আইছে।

ওরা বসলো পাশাপাশি ঠিক মাঝখানে। হিরণ বললে, সকালবেলা হঠাৎ স্তবগান কেন?

তোকে দিয়ে কিছু কার্যসাধনের উদ্দেশ্য আছে যে?

যথা?

হাসনু বললে, নৌকো থেকে নেমে তুই ডুগডুগি বাজাবি আর আমি এবার নাচের আসর জমাবো।

ভ্রূকুঞ্চন ক'রে হিরণ বলল, হেতু?

হাসনু বললে, ধ'রে নে, এই আমাদের পেশা। রঙ্গীন জরি-বসানো সেই ঘাঘরা—জ্যাঠামশায়ের দেওয়া মনে আছে? সেটা সঙ্গেই এনেছি। নাচতে সাধ হয়েছে আমার, কমরেড।

হিরণ মুখ টিপে বললে, কিন্তু তোর স্বাস্থ্যে উন্নতিটা নাচের পক্ষে বাধা হবে না?

হাসনু তার শঙ্খগ্রীবা দুলিয়ে বললে, মোটেই না। আমি নাচবো, আমার স্বাস্থ্য নাচবে, নাচবে পাকিস্তান, নাচবে মুসলমান,- মন্দ কি?

আর কোনো দুরভিসন্ধি আছে তোর?

আছে। ডুগডুগি বাজিয়ে তুই গান ধরবি। কত যত্নে তোকে গান শিখিয়েছিলুম মনে পড়ে?

হিরণ বললে, তাই বলে তুই আমাকে সঙ সাজিয়ে নাচগান করাবি?

হঠাৎ হাসনুর চেহারাটা ফিরে গেল। দূরের নদীপথের দিকে আয়ত দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে সে বলল, এ ছাড়া পথ নেই, কমরেড। ওদেরকে ভোলাতে হবে নাচে গানে আনন্দে, ওদেরকে ভোলাতে হবে বেদনা-বোধ জাগিয়ে। ওরা বহুকালের উপেক্ষিত আর বঞ্চিত। মায়ের কোলে অবাধ্য শিশু শান্ত হয় ঘুমপাড়ানি গান শুনে। ওরা গান শুনে অভিভূত হোক্, নাচ দেখে আনন্দে প্লাবিত হোক, কাব্যের ব্যঞ্জনায় ওরা মুগ্ধ হোক!—এই ব'লে হাসনু ছইয়ের মধ্যে আস্তে আস্তে স'রে গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগলো দূরের পশ্চিমপারে এসে পৌঁছতে। আশ্বিন মাসের ভাটির টানে নৌকা বাগ মানানো যায় না সহজে। ঘাটে এসে নৌকা লাগলো। সামনেই সখারামপুরের হাট। এটা টাউন-বাজার। পাকাবাড়ি আছে খানকয়েক। হাটে গোলদাড়ি আড়ৎ আছে অনেকগুলো। পাটোয়ারী মাড়োয়ারীদের এখানে মস্ত ঘাঁটি। সাউদের এখানে মসলার ব্যবসাকেন্দ্র। কাঁসারীরা এখান থেকে বাসন চালান দেয়। মাইলখানেক পথ গেলেই গোপালপুরের কাছারী।

ঘাটে নামবার আগেই খঞ্জনী-বাঁধা ডুগডুগি সহসা বেজে উঠলো। তার সঙ্গে আবদুলের দীর্ঘকণ্ঠের মধুর গানের দুইটি চরণ। শরৎকালের সোনার রৌদ্রে পারাবতের দল উড়েছে আকাশে,—সেই আকাশ ঝলমলে নীল। নিচে দুর-দুরান্তর অবধি গৈরিকবসনা বিবাগিনী নদী। জেলেদের ঘাটে শোনা যায় গাঙচিলের ডাক। শুভ্র মেঘলোকের মধ্যে উধাও একা মন উড়ে যায় পথহারানো সুরে। এই পটভূমিকায় বিরহী ব্যথাতুরের কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হলো হিরণের কণ্ঠে। মাতৃভূমির মৃত্তিকার তল থেকে কে যেন ডাকে!

হঠাৎ নৌকার ছইয়ের ভিতর থেকে নেমে এলো নতুন ছন্দ, কী বিচিত্র মধুরকণ্ঠী নর্তকী! কাচুলী-বাঁধা দেহের উপরে মসলিনের ওড়না। কানে কানবালা, চোখে কাজল, সিঁথিতে সিঁদুর, পরনে সাচ্চাজরির পাড় দেওয়া রাজপুতানীর ঘাঘরা। দেখতে দেখতে হাটের লোকেরা এলো ঘাটে, দেখতে দেখতেই লোকে লোকারণ্য। মেয়েটা হিন্দু, ছেলেটা মুসলমান। অপূর্ব সাজসজ্জা দুজনের, তার চেয়ে অভাবনীয় হোলো রূপ। আবদুলের মুখ থেকে টেনে নিল সুহাসিনী গানের ধুয়ো। সেই গান নিজের কণ্ঠের শিরা ছিন্ন ক'রে ছুঁড়ে দিল দূর আকাশে—মহাশূন্যলোকের নীলাভ বিস্তারে—যেখানে বেদনার চিরবিরহলোক!

ইরানী ঘাঘরা ঘুরলো হাটের মাঝখানে—যেখানে জনসাধারণ। নাচের

তালে-তালে বাজছে ডুগডুগি আর খঞ্জনী। নাচতে নাচতে সকল বাঁধন হারানো নর্তকী—কণ্ঠের, প্রাণের, সত্তার, সংস্কারের,– সমস্ত বাঁধন যেন এলিয়ে পড়লো। নাচের শেষ রঙ্গে এসে থামতেই হিরণ আবার ধ'রে দিল বাউলের গান! সহজে পাওয়া যায় না সেই প্রেম, পেলে আর হারানো যায় না। যে-প্রেমের আগুন তোর বুকে, তারই কথা শুনি মুখে-মুখে। পুড়তে যেজন জানে না সে পায় কেমনে দরদী!

গানের ধুয়ো ধ'রে পাপিয়ার তীক্ষ্ণ কণ্ঠ আবার উঠে গেল আকাশলোকে। হাসনুর চোখের কোণে জল, হাসনুর কণ্ঠে অথৈ মধুমতীর কান্না,—বুকের মধ্যে তার সুধার সমুদ্র।

সাখরামপুরের সেদিনের হাট গেল ভেঙ্গে। নৌকারা দাঁড়িয়ে গেছে মাঝ-দরিয়ায়, নদীর ঘাটে জনসমুদ্র। বিরহবিধুর কণ্ঠের ডাক যতদূর অবধি ছুটে গেছে,– বল্লভডিহির ভরা ধানক্ষেত পেরিয়ে, বোরেগীর হাট ছাড়িয়ে, নদীর খাঁড়ি ডিঙ্গিয়ে,—ততদূর থেকে কাতারে কাতারে মেয়েপুরুষ-বালক-বালিকারা ছুটতে ছুটতে এসেছে। ঐ হোলো গানের ডাক, এ হোলো নাচের দোলা—যে-নাচের নূপুর-নিক্কণে মহাসাগরের বুকের থেকে উঠে আসে আগুন, প্রলয়-তাণ্ডব কটাক্ষে ডাক দিয়ে যায় ঝড়ের কেন্দ্রকে, ভূমিকম্প ভেঙ্গে দিয়ে যায় সংস্কারবদ্ধ মানুষের সাজানো সংসার, কক্ষহারা চ্যুতনক্ষত্র দিগ্বিদিকে ছোটে।

যে-নিষ্ঠুর সেই ত' প্রেমিক। যে আমাকে পুড়িয়ে মারে, সেই ত' আমার আপনজন, সেই আমার প্রেমের পরীক্ষক। আমার এই দেহের দাম কি আছে কিছু। মৃত্যুর পর এ-দেহ মিশবে মাটির মধ্যে। সবাই যাবে সেই মাটি মাড়িয়ে,—সেই পদস্পর্শেই অভাগীর মুক্তি। কিন্তু এই জনমে আমারে কাঁদাও, নেংড়াও, পোড়াও,– সেই রসেতে জ্বলবে আগুন, দইবো অনুক্ষণ—সে যে প্রেমের রস!

শোনো শোনো জনপদবাসী, শোনো বন্ধু, শোনো দুষমন,—বিচ্ছেদে আছে প্রেম, মিলনে আছে অশ্রু! ওরে নিষ্ঠুর দরদী, তুই কি শুধু দহন করবি, করবি বিচার, করবি ভয় আর সংশয়? দিবিনে প্রেমের ভিক্ষা? তোদের ওই অগাধ গাঙে কি তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মরবো? ভরা ওই ধানক্ষেতের মাঝখানে মরবো কি শুকিয়ে? অজ্ঞানের বোঝা তুই নে, প্রাণের বোঝা তুই দে রে বন্ধু!

হাসনুর চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে এসেছে তপ্ত অশ্রুর ফোঁটা; নেমে এসেছে কপালে ঘামেরবিন্দু চুলের ঝালরের ভিতর দিয়ে। গ্রীবা হেলিয়ে গানের শেষ ধুয়া ধরে সকলের মাঝখান দিয়ে সে ঘুরছিল হাত পেতে। ভিক্ষা দাও!

তার সেই পেলব নধর নগ্নবাহু প্রসারিত দেখে জনৈক মাড়োয়ারী ভিড়ের ভিতর থেকে এগিয়ে এসে পান চিবোতে চিবোতে দশটি টাকা তার হাতের মধ্যে দিল। গানের মধ্যেই হাসনু সেই টাকা ছন্দিত হস্তে ছুঁড়ে ফেলে দিল লোকের ভীড়ের মধ্যে, এবং তার সঙ্গে আবার ধ'রে দিল গান—

"ওরে মাড়ুয়া ভাই,
দেহের কারবার নাই রে বন্ধু, প্রাণের কারবার করি,
প্রাণ দিয়ে প্রাণ চায় রে যে-জন,
তার তরে প্রাণ ধরি!"

হিন্দুর মেয়ে হয়ে মাড়োয়ারীর দেওয়া টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিল, একটি দেখবার মতো দৃশ্য বটে। হিরণ তারিফ করলো হাসনুর আচরণের, এবং তৎক্ষণাৎ লুনরায় ডুগডুগির সঙ্গে খঞ্জনীর আওয়াজ তুলে সমগ্র ব্যাপারটি একটা প্রবল ঐকতানিক সঙ্গীতে পরিণত ক'রে দিল।

আসর যখন ভাঙলো বেলা তখন অনেক। উত্তেজনায় আবেগে আনন্দে হাসনুর শরীর তখনও স্থির হয়নি। ঘাটের কাছ থেকে উঠে ওরা হাটতলার ছায়ার কাছে স'রে এলো। চারিদিকে প্রচুর জনতা, অগণ্য নরনারী। কেউ ওদের বসবার জন্য চৌকি দিল, কেউ ওদের ঘর্মাক্ত রাঙা মুখ দেখে নতুন নতুন দুখানা গামছা আনলো, কেউ বা হাতজোড় ক'রে সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে, বেয়াদপি মাপ করবেন। আমাদের ওপর যা হুকুম হয় আপনাদের!

হাসনু জানতো বিশ্রাম করা চলবে না। লোকের বিস্ময় থাকুক,—কৌতূহল না বেড়ে ওঠে। মোতাহার মিঞার ওখানে তারা প্রচুর আহার ক'রে এসেছে, সুতরাং ও সম্বন্ধে আর কোনো উদ্বেগ নেই। আবদুল ওদের অনুরোধের জবাব দিয়ে বললে, আমরা সামান্য লোক, গরীব,—আমাদের কোন দাবি নেই মিঞা। এই আমাদের পেশা।

কোথায় যাবেন আপনারা?

আমরা যাবো বগুড়া, সেখান থেকে রঙ্গপুর, তারপর মৈমনসিং।

কে একজন প্রশ্ন করলো, আপনার বিবি বুঝি হিঁদুর মেয়ে?

হিরণের বদলে হাসনুই জবাব দিল। বললে, হ্যাঁ মিঞাসাহেব, আমি হিঁদুর মেয়ে। একেবারে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ঘরের নিষ্পাপ কুমারী কন্যা!

তার মিষ্টমধুর কণ্ঠে উপস্থিত সকলেই আনন্দে বিহ্বল। অনেকেই বলাবলি করলো, বহুভাগ্যে এমন দুর্লভ দর্শন মেলে!

এলো স্নিগ্ধ পানীয়, এলো মিষ্টান্ন আর ফলমূল, এলো নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার।

ওদের অভ্যর্থনা ক'রে একখানা নিরিবিলি চালাঘরে আনা হোলো। নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ আর মিথ্যা পরিচয়ের জন্য হিরণ আড়ষ্টভাবে সমস্ত অভ্যর্থনা গ্রহণ করছিল। কিন্তু হাসনুর মুখে চোখে কোনো বিকার নেই,—সে সহজ সে অবারিত। তাকে ভেঙে গড়া যায় যেমন অবলীলায়, তাকে গ'ড়ে আবার ভেঙে ফেলা যায় তেমনি স্বচ্ছন্দে। যে-কোনো সময়ে যে-কোনো ধর্ম ও জাতির ছাপ নিতে তার এতটুকু বাধে না। কেন-না হাসনু নিজের মুখেই ব'লে এসেছে, পৃথিবীর কোনো ধর্ম মেনে চলার দায় মেয়েমানুষের নেই, কারণ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম হোলো নারীধর্ম। পৃথিবীর যে-কোনো সমাজ, ধর্ম ও জাতির মধ্যে মেয়েরা অতি সহজে আত্মবিলোপ ঘটাতে পারে,—পুরুষ সে কাজ করতে অক্ষম। কে না জানে ধর্ম ও সমাজ সৃষ্টি হয়েছে পুরুষের হাতে, মেয়েরা সৃষ্টি করেছে প্রাণ। প্রাণ নিয়েই মেয়েদের কারবার, ভালোবাসা নিয়েই মেয়েদের প্রাণধারণ।

স্থানীয় কয়েকজন মাতব্বর দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। হাসনু আর আবদুল ফিরে তাকালো। তাঁদের একজন বললেন, বেগমসাহেব আর জনাবালি, আপনাদের দুজনকেই জানাচ্ছি, যদি আপনারা এখান থেকে কিছু প্রণামী গ্রহণ না করেন তবে সখারামপুরের বড় বদনাম হবে। আপনারা মেহেরবানি ক'রে আমাদের ইনাম গ্রহণ করুন।

হাসনু বললে, কি করতে হবে বলুন ?

ওদের মধ্যে একজন নতজানু হোলো। বললে, আপনারা যে আনন্দ আজ দিলেন এর তুলনা নেই। বান্দারা বেঁচে থাকতে সে-কথা ভুলবে না। আপনারা বলেছেন, নাচগান আপনাদের পেশা। লাখো টাকা দিলেও আপনাদের যোগ্য ইনাম হবে না। আমরা সখারামপুরের তরফ থেকে সামান্য পাঁচশো টাকার এই পুঁটলিটি আপনাদের হাতে দিতে চাই। আমাদের বেয়াদপি মাফ করবেন জনাবালি !

হাসনু বললে, আপনাদের হাত থেকে পুরস্কার নেব, কিন্তু আপনাদের কোনো সেবা কি আমরা করতে পেরেছি ?

একজন প্রবীণ মাতব্বর বললেন, মানুষের জন্য আপনাদের চোখের জল পড়েছে, পাকিস্তানের জন্য আপনাদের বুকে দরদ বেজেছে,—এই ত' সেবা ! আপনাগো নাচ-গান দেইখা-শুইনা মানষে কাইন্দা ভাসাইছে, এই ত' খিৎমদ ! এ টাকা নিয়ে আপনারা আমাদের ধন্য করুন।

হাসনুও নতজানু হ'য়ে সেই তোড়া দুই হাত পেতে নিল। আবদুল এদিকে এসে সকলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রীতি সম্ভাষণ বিনিময় করলো। সমগ্র

সখারামপুর আনন্দে আন্দোলিত হয়েছে আজ নাচগানে। বিরাট জনসাধারণের ভালোবাসা হাসুবানু আজ আদায় ক'রে নিয়ে চললো। হিরণের সমগ্র মুখখানা আজ যেন গৌরবগর্বে রক্তিম।

সখারামপুর ছাড়ালে মস্ত মাঠ,—ধানক্ষেতের গা বেয়ে পথ চ'লে গিয়েছে গোপালপুরেব দিকে। পবম্পরায় জানা গেছে, গোপালপুরে আছে ডাকবাংলো,—সেখানে একটা রাত্রি থাকার অসুবিধা কিছু নেই। কাল সকালে গোপালপুব থেকে নৌকা ছেড়ে গাঙ পেরিয়ে গেলে ওপারে স্টেশন পাওয়া যাবে।

হাটতলা থেকে বেরিয়ে হিবণ আর হাসনু যখন গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে মাঠের পথ ধরলো, তখন সমগ্র সখাবামপুব পবম শ্রদ্ধা সম্মান আর প্রীতি নিয়ে ওদের পিছনে দাঁড়িয়ে রইলো। আসবার আগে হাসনু হাটতলায় ছেলে-মেয়েদেব মধ্যে সমস্ত খাদ্যসামগ্রীগুলি পবিবেশন ক'রে দিয়ে এসেছে।

নিরিবিলি পথে চলতে চলতে একসময়ে হিরণ বললে, পুরুৎ বামুনের ছেলেকে এখানে 'আবদুল' না সাজালে কি হোতো? তুই হাসুবানু হ'লেই বা মন্দ হোতো কি?

হাসনু হাসলো,। বললে, কথাটা দু'দিন ধ'রে তোব মনে অস্বস্তি আনছে দেখছি। কিন্তু পাকিস্তান হবাব পব থেকে কখনো শুনেছিস যে, একটি সুশ্রী মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করেছে এক বর্ণশ্রেষ্ঠ হিন্দু?

হিরণ বললে, কিন্তু সম্পর্কটা যে আমাদের মিথ্যে, একথাটা জানতে দিলেই বা ক্ষতি কি ছিল।

তাহ'লে আরো সাংঘাতিক হোতো।

কেন?

তোকে আর খুঁজে পাওয়া যেতো।

হিরণ বললে, অর্থাৎ সেই ট্রয়যুদ্ধ! কিন্তু তুই নিজেকে বার বার সুশ্রী বলছিস্ কেন?

হাসনু বললে, আমাব মুখ দিয়েই শুনতে চাস্? তবে শোন্। এই পাঁচশো টাকা তুই কা'র দৌলতে পেলি? একটা কদাকাব কুৎসিত স্ত্রীলোক যদি নাচতো তাহ'লে লোকে বলতো পেত্নীর দাপাদাপি! সুশ্রী মেয়ে নাচলে তবে হয় নৃত্য!

হিরণ বললে, তবে কি তোর দাম পাঁচশো টাকা?

না। লাখ টাকা দিতে পারেনি, তাই পাঁচশো!

হিরণ চলতে চলতে পুনরায় বললে, লাখ টাকা দিলে যদি তোকে কেনা

যায়, তবে না হয় চল্—মীরার বেনামিতে হাজিপুরের জমিদারীটা বিক্রি ক'রে আসিগে ?

হাসনু মুখ টিপে হেসে বললে, আজ তোর মনে এমন দুর্বলতা দেখা যায় কেন, কমরেড ?

এ দুর্বলতার দামও লাখটাকা রে !

হাসনু কয়েক পা দ্রুত এগিয়ে হিরণের হাত ধরলো। মিষ্টিমধুর কণ্ঠে বললে, কি হয়েছে তোর, বলতো ?

মৃদুহাস্যে হিরণ বললে, চিত্তদৌর্বল্য !

হাসনু প্রশ্ন করলো, আমার এই নাচের পোশাক কি তোকে অশান্ত করেছে ?

হিরণ বললে, ছি ! রাজপুতানীর ঘাঘরার সঙ্গে আমার মন ঘুরবে, তোর কমরেড কি এতই ছোট ?

তবে ?

হিরণ স্বীকার করলো, অনেক কাল পরে তোর নাচগান আমার ভালো লাগলো।

হাসনু বললে, বিশ্বাস করিনে। আমার নাচে সাধারণ লোকে মন ভোলানো সহজ হয়, তোর মন ভোলে কেমন করে ?

মন ক্লান্ত থাকলে সুরের একটি মৃদু ঝঙ্কারই যথেষ্ট। তোর গানে আজ বিচ্ছেদের ব্যথা ফুঁপিয়ে উঠেছিল, সমস্ত বাঙ্গলা কেঁপে উঠেছিল তোর গানে,—ওরা মিথ্যে বলেনি রে।

কিন্তু তুই আজ ক্লান্ত কেন ?

হিরণ চুপ ক'রে চলতে লাগলো। সামনেই দেখা যাচ্ছিল গোপালপুরের ছোট কাছাবি স্কুলঘরের চালাটা পড়ে ডানদিকে। ডাকবাংলার এখনো হদিস্ পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েক পা গিয়ে বাঁ হাতি একখানা খ'ড়ো চালা পাওয়া গেল। বাইরে মাটির দেওয়ালে লেখা, জটিরাম দাসের দোকান। কিন্তু দোকানও নেই, লোকজনও নেই। হাসনু বললে, আয় ত' ভেতরে,—তুই এখানে দাঁড়া, আমি ঘাঘরাটা ছেড়ে আসি।

হিরণের হাত থেকে টিনের সুটকেসটি নিয়ে চট ক'রে হাসনু ভিতরে গেল, এবং মিনিট তিনেকের মধ্যেই নর্তকীর পোশাক ছেড়ে শাড়ি আর জামা জড়িয়ে বেরিয়ে এলো। হিরণ বললে, সিঁদুর মুছে এলিনে ?

সিঁদুর থাক্, আবদুলও থাক্। এই বলে হাসনু হিরণের হাতে সুটকেসটা ফিরিয়ে দিল। হিরণ তার নিজের কান থেকে কানবালা দুটো খুলে পকেটে রাখলো।

দুজনে এবার অনেকটা সহজ হয়ে চলতে লাগলো। কিছুদূর গিয়ে হাসনু বললে, ডাকবাংলোয় শুয়ে আজ সমস্ত দিন রাত ধ'রে দুজনে ক্লান্তির গল্প করবো। তোর যখন তন্দ্রা আসবে, আমি গুনগুনিয়ে গান করবো!

হিরণ বললে, আমার আগে যদি তোর ঘুম আসে?

হাসিমুখে হাসনু বললে, বেশ, আমার সেই তন্দ্রার দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তুই একটি কবিতা রচনা করবি? মোমবাতি জ্বালাবি আমার শিয়রে,—বাইরের থেকে হাওয়ায় ভেসে আসবে শেষ-আশ্বিনের কাঁচাধানের গন্ধ। জানালাটা খুলে দিবি, শুক্লপক্ষের শেষ চাঁদ আমার মুখের ওপর দিয়ে যেন হেসে চ'লে যায়।

হিরণ বললে, হাসনু, তুই বার বার লোভ দেখাস্ কেন রে?

দুজনের কপাল বেয়ে নামছে ঘামের ধারা। হাসনু বললে তোর যে লোভ নেই, তাই লোভ দেখাই। তোকে হার মানাতে এসে পদে পদে যে তোর কাছেই হার মানলুম রে! এই কালামুখ নিয়ে মীবাব কাছে কি আব কোনদিন গিয়ে দাঁড়াতে পারবো?

হিরণ সচকিত হয়ে বললে, কেন?

হাসনু বললে, তাকে বড়-মুখ ক'রে বলে এসেছিলুম আমাব উত্তাপে বরফ গলাবো। কিন্তু কই, পারলুম কি?

কী চেয়েছিলি তুই আমার কাছে?

রাক্ষসীরা কি চায়? সর্বগ্রাসিনীরা কি পেলে খুশি হয়?

হিরণ বললে, তাই ব'লে তুই লোভের ডালা সাজাবি? আমার অপমৃত্যু ঘটিয়ে তোর জীবনের সার্থকতা কি?

বড় একটা গাছের ছায়ার নিচে এসে ওরা দাঁড়ালো। হাসনু বললে, কিছু না। আমি শুধু দেখতে চেয়েছিলুম তোর জীবনের বসন্তরাগ,—তোর যৌবন-নিকুঞ্জে যদি পাখিরা গান গেয়ে ওঠে, যদি তোর ঘুম ভাঙে! কিন্তু আমার সব খেলা তুই মিথ্যে ক'রে দিলি, কমরেড। মনে করেছিলুম তোকে পরিপূর্ণ ক'রে ফুটিয়ে মীর হাতে তুলে দিয়ে ছুটি নেবো,-এ কাজ শেষ ক'রে অন্য কাজে চ'লে যাবো,—কিন্তু তুই নিজেও ফুটলিনে, আমাকেও ফুটতে দিলিনে।

হিরণ বললে, আমাদের রেখে তুই কোথায় যেতে চাস্?

হাসনু বললে, যেখানে গেলে তোদের কথা আর ভাববার সময় পাবো না, সেইখানে। আমার পায়ে কাঁটা ফুটে রক্ত ঝরতো, নতুন-নতুন আঘাত পেতুম, ডাইনে-বাঁয়ে ঢেউয়ের দোলায় দিশেহারা হতুম, প্রবলের অনাচারে মাথা হেঁট

হোতো, সমস্ত জীবন মন্থন ক'রে উঠতো শুধু বিষ,—হয়ত সেই পথে গেলে নিজের যথার্থ পরিচয় পেতুম। মনে পড়ছে: হাজিপুরের বাড়িতে যেদিন গুণ্ডারা আগুন দিল, বিয়ের আসর ছেড়ে তুই আর মীরা চ'লে গেলি জ্যাঠা-মশাইয়ের সঙ্গে,—আমিও গেলুন অনেকটা পথ সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু হঠাৎ আবার ফিরে গেলুম সেই হাজিপুরের শ্মশানে। শেষ রাত্রির অন্ধকারে সেদিন মাঠের ওপর মুখ থুবড়ে হাউ হাউ ক'রে কেঁদেছিলুম বটে, কিন্তু ফাল্গুনের সেই শুকনো মাটি চোখের জলে ভিজিয়ে তার থেকে ফোঁটা দিয়েছিলুম কপালে। প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, এই অন্ধকারে আলো জ্বালবো! নিজের অস্থি মাংস মজ্জা দিয়ে আগুন জ্বালাবো এখানে,—সেই আলোয় ডাক দেবো সবাইকে। ভয় সংশয় বিচ্ছেদ ঘৃণা অপমান—সেই আগুনে জ্ব'লে পুড়ে যাবে, আমি হবো সার্থক। কিন্তু তোদের কাছে রয়ে গেল যে আমার নৈতিক বন্ধন! ভাগ্যের হাতে তোদেরকে ছেড়ে দিয়ে চুপ ক'রে থাকতে পারলুম কই? সুখের ঘরকন্নায় তোদের ভুলে দিতে পারলে তবেই ত' চরম মুক্তি পেতুম, কমরেড?

হিরণ কোনো কথার জবাব দিল না।

দুজনেই পরিশ্রান্ত এবং ঘর্মাক্ত। স্বাস্থ্য ফিরেছে ওদের পশ্চিমে অনেক দিন ঘুরে। রোদ লাগলেই মুখ ওদের রক্তিম হয়ে ওঠে। গাছের নিচের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ওরা অনেকক্ষণ ধ'রে শরৎকালের স্নিগ্ধ হাওয়ায় বুক ভ'রে নিশ্বাস নিল,—সেই হাওয়া যেন সমস্ত বাঙ্গলার স্নেহের স্পর্শের মতো। জননীর সাশ্রু আশীর্বাদের মতো।

হাসনু তার আঁচলের অংশটা দিল হিরণের হাতে। বললে, মুখখানা মুছে নে।

আঁচল দিয়ে হিরণ মুখখানা মুছে নিয়ে বললে, চল্ এবার এগোই।

সুটকেস পুঁটলি নিয়ে ওরা আবার অগ্রসর হোলো। বেলা তখন প্রায় অপরাহ্ণ, পথ ঘুরে গিয়েছে পশ্চিম দিকে। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হয়ে ওদের ভুল ভাঙলো। সখারামপুর পেরিয়ে এলে এটা আর একটা পাট-ব্যবসায়ের কেন্দ্র। আশেপাশে মহাজনের গদি। এপার ওপার থেকে অসংখ্য লোকজন এখানে হাজির হয়েছে। পাট চলেছে নদীর দিকে, বজরাগুলি ভ'রে চালান যাবে। পাট কেনাবেচার জন্য ছোটোখাটো শহর গ'ড়ে উঠেছে। বড় বড় করগেটের চালা এখানে ওখানে।

রূপ, যৌবন এবং আলুলায়িত ভঙ্গীর তরঙ্গ তুলে ওরা দুজন চলেছে সকলের মাঝখান দিয়ে। ওরা ভিন্‌দেশী লোক সন্দেহ নেই। ওদের সঙ্গে এ অঞ্চলের পরিচয়টা মেলে না, ওরা যেন এখানকার প্রাত্যহিক জীবনধারার মধ্যে মস্ত

বৈচিত্র্য। সেই জন্য কাজকর্ম সরিয়ে অনেকে তাকালো ওদের মুখের দিকে। মেয়েটি হিন্দু নর্তকী—ঘণ্টা তিনেক আগে অনেকেই নাকি ওকে সখারামপুরের মহাজনী হাটে দেখে এসেছে। কিন্তু এখন আর নর্তকীর পোশাক নেই; গৃহস্থ বধূর সজ্জায় ওকে এখন আশ্চর্য মানিয়ে গেছে। আর ওই রূপবান মুসলমান যুবক, ওর দৃষ্টিতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। ওরা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের চেয়েও বড়,—ওরা যেন সেই চিরকালীন নরনারী,—পুরুষ আর প্রকৃতি।

প্রশংসমান আনন্দে পথের দু'পাশের লোকজন ওদের রাজোচিত চেহারার দিকে চেয়ে রইলো।

হাটের দিকটার থেকে এগিয়ে গোপালপুরের থানা পেরিয়ে গেলে তবে ডাকবাংলো। কিন্তু অতদূর পর্যন্ত ওদের আর যেতে হয়নি। থানা ছাড়িয়ে বাঁশবাগান পেরিয়ে আসতেই ডালপাশের বস্তির থেকে নারীকণ্ঠের ডাক এলো, হাসনু দিদি—আবার ভেক্ চড়ালে কেন গো?

হঠাৎ যেন দুজনে ছিটকে পড়লো বাস্তব পৃথিবীর কর্কশ মাটির ওপর। সচকিত দৃষ্টিতে হাসনু সেই দিকে ফিরে তাকালো। বস্তির সামনে বিকৃত হাস্য হেসে কুলসুম দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাসনু কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়ালো। তারপর প্রশ্ন করলো, তুমি এখানে কুলসুম?

কুলসুম যেন সহসা যুদ্ধের পাঞ্জা নিয়ে দাঁড়ালো। ঘাড় উঁচিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললে, তুমিই বা এখানে কেন, বল না শুনি? বাঃ ভেক্ চড়িয়েছে বেশ দেখছি? পাশে উনি না-সেই হিরণ চক্কোত্তি? উনি মুসলমান, তুমি হিন্দু,—চমৎকার! কিন্তু এমন ভেক্ চড়িয়ে এদিকে এসেছ, তোমাদের মতলবটা কি বলো ত?

কুলসুমের গলার আওয়াজে আশেপাশে অনেকেই এসে দাঁড়ালো। কলকাতার বাড়িতে কুলসুমের চোখে মুখে একদিন আক্রোশ দেখা গিয়েছিল, আজ সে যেন এই দূর দেশে ব'সে সেই আক্রোশের শোধ তুলতে চায়।

হাসনু বললে, কুলসুম, একটু শান্তভাবে কথা বলো। আমাদের মতলবটা পরে শুনো। কিন্তু তুমি এখানে এলে কেমন ক'রে? চট্টগ্রামে ফিরে যাওনি?

কেন যাবো?—কুলসুম আবার চেঁচালো,—তোমার মামা হোসেন সায়েব, তোমার মামাতো ভাই আফজল, তোমার সাতগুষ্টি হোলো জোচ্চোর, বদমায়েস, নেমকহারাম।

হাসনু আবেদন জানালো, শান্ত হও ভাই কুলসুম?

কেন শান্ত হবো? আমাকে যদি কেউ পথে বসিয়ে পালায়, আমি শোধ নিতে পারিনে? ওই হারামি তোমার ভাই আফজল—আমাকে ভুলিয়ে এনে চিবিয়ে রেখে চ'লে গেছে! আমি পরিনে শোধ তুলতে? একটা মরদের বদলে পাঁচটা মরদ আমি জোটাতে পারিনে!

হিরণ রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। লোকজন প্রচুর জমে গেছে। তার এই মুসলমানের ছদ্মবেশটা যেন এবার চারিদিক থেকে তাকে বিদ্রূপ আর ধিক্কার দিচ্ছে। তার পায়ের তলার থেকে মাটি স'রে যাচ্ছিল।

হাসনুর কিছুমাত্র উত্তেজনা নেই। শান্তকণ্ঠে বললে, তোমার বিয়ে হয়েছে কুলসুম?

বিয়ে!—কুলসুম যেন পিশাচীর মতো হেসে উঠলো। বললে, বিয়ে আমার রোজ-রোজ হয়। আমি ত' তোমাদের মতন লুকোইনে, আমি ত' কপালে সিঁদুর মেখে সতী সেজে ঘুরে বেড়াইনে! বিয়ে! তুমি নিজে বিয়ে ক'রে পুরুষ ঘেঁটে বেড়াও না? ওই যে তোমার ওই হিরণ চক্কোত্তি, ওটাকে নিয়ে ক'টা হোলো তোমার?

কুলসুমকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তিন চারটে লোক অত্যন্ত অশ্লীল আকার ইঙ্গিতের সঙ্গে হাসাহাসি করছিল। হাসনু বললে, কুলসুম, তুমি আমাদের কুটুম্বর মেয়ে। তোমার এই দশা দেখে আমি দুঃখ বোধ করছি। কিন্তু আমি এটা জানতুম, তাই তোমাকে কলকাতার বাড়িতে সেই রাত্রে আফজলের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলুম। তুমি আমার কথা না শুনে পালিয়ে গিয়েছিলে!

থামো, থামো—কুলসুম বাধা দিয়ে উঠলো,—অনেক হয়েছে, এবার থামো। তুমি নিজে কী? তোমাকে বিশ্বাস করবে কে? এদেশে এসেছ ভেক্ নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে কোন সাহসে? হিঁদুকে মোছলমান সাজিয়ে নাচগান ক'রে বেড়াচ্ছ কোন্ মতলবে? সেই জমিদারটা বুঝি ঘুষ খাইযেছে? কলকাতার হিঁদুদের বুঝি তাঁবেদারি করছ? আমি সব ফাঁস ক'রে দিচ্ছি, দাঁড়াও। মনে করেছ এদেশে থানা নেই, পুলিশ নেই, মানুষ নেই—কেমন?

কথাটা সঙ্গে সঙ্গে বহুদূর পর্যন্ত রটনা হয়ে গেল। আজ সকালে এরাই দুজন সখারামপুরে নাচগান ক'রে বহু লোককে বশীভূত করেছে। এদের এই রহস্যজনক গতিবিধি অনেকের পক্ষেই সন্দেহজনক। দেখতে দেখতেই গোপালপুর থানার ছোট দারোগা লোকজন নিয়ে ওদের মাঝখানে এসে পৌঁছলেন। হাসনুর বুঝতে বাকি রইলো না যে, ব্যাপারটা অনেকদূর পর্যন্ত গড়াবে।

কুলসুম কেমন একটা বিজয়োল্লাসের সঙ্গে সকলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলো, ওরা গোয়েন্দা, আমি জানি ওরা গোয়েন্দা! ওই লোকটা হিন্দু, ওর মতলব ভালো নয়। কেমন হাসনুদিদি, এবার মুখের মতন জুতো হয়েছে ত?

মেয়েটার স্পর্ধার দিকে হাসনু কিয়ৎক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। কিছু বললে না, কেন-না ওর সত্যকার অপরাধ কিছু নেই। সমগ্র পুরুষ জাতির পরে আক্রোশ নিয়ে নিরুপায় হয়ে এখানে এসে পতিতাবৃত্তি নিয়েছে, সেই আক্রোশের থেকে শুভানুধ্যায়ীদেরকেও রেহাই দিতে চায় না। ওর আন্তরিক যন্ত্রণাটা দুর্বোধ্য নয়! কিন্তু ওর ইতর ভাবভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে হাসনুর মাথাটা ধীরে ধীরে হেঁট হয়ে এলো।

বিপুল জনতা ভীড় করেছে চারিদিক থেকে। সেই জনতার চাপা বিক্ষোভ লক্ষ্য ক'রে ছোট দারোগা একটু যেন ভয় পেলেন। হয়ত বা এখনি দাঙ্গা বেধে উঠতে পারে। ব্যাপারটার তদন্ত পরে হতে পারবে, কিন্তু এই দুটি নরনারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করতে পারলে চলবে না। তিনি চেঁচামেচি ক'রে ভীড় সরিয়ে হিরণের হাত ধ'রে বললেন, আপনারা আগে এখান থেকে বেরিয়ে চলুন। ওই বেশ্যাটা সকলকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে!

পাটোয়ারীদের গদির থেকে লোকজন এসে পড়েছিল। থানায় যে কয়জন লোক ছিল তারাও এসে দাঁড়ালো। তখন বেশ হল্লা উঠেছে। কাছারির থেকেও অনেকে ছুটে এসেছে। এ গ্রামে এমন ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। তাদের সকলের সাহায্যে ছোট দারোগা জমিরুদ্দি সাহেব হাসনু আর হিরণকে অতি কষ্টে থানার ভিতর নিয়ে গিয়ে তুললেন। ওদের দুজনের চেহারায়, চালচলনে আর কথাবার্তায় আভিজাত্যের ছাপ দেখে তাঁর নিজেরই মনে একটি সম্ভ্রমবোধ জেগেছিল।

থানায় ওরা ঢোকবার পর বাইরের থেকে চীৎকার উঠলো, গোয়েন্দাদের বিচার চাই! পাকিস্তানের দুষমন বরবাদ যাক্!

জমিরুদ্দি সাহেব বেরিয়ে এলেন। কয়েকজন লোকের দিকে মুখ খিঁচিয়ে বললেন, থাম্! ছুঁচো কোথাকার! দাঁড়কাকের দল এসেছে ময়ূরের বিচার করতে। বাজারের একটা মেয়েমানুষের কথায় নেচে উঠছে সব! যা পালা! থানার এলাকায় কেউ পা দিলে পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে চালান দেবো ব'লে দিচ্ছি! জমিরুদ্দি সাহেব কয়েকটি লোকের হাতে লাঠি দিয়ে থানার চারপাশে পাহারাদার বসিয়ে দিলেন। তারপর ভিতরে এসে বললেন, আপনারা ডাক-বাংলায় না গিয়ে এখানেই বিশ্রাম করুন।

বাইরের কোলাহল কিছু ক'মে এলে হিরণ প্রশ্ন করলো, আমাদের কি গ্রেপ্তার করা হয়েছে, স্যার?

অনেকটা তাই বটে!—জমিরুদ্দি হাসলেন। পুনরায় বললেন, বাইরে থাকলে আপনাদের পক্ষেই অসুবিধে হোতো। আমি খবর পাঠিয়েছি বড় দারোগাকে, তিনি কাছারি থেকে এখনই আসবেন। গ্রেপ্তার হয়েছেন ব'লে কিছু মনে করবেন না, এখানে স্বচ্ছন্দে থাকুন।

জমিরুদ্দি সাহেব ওদের বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। পাশেই একটি ছোটখাটো ফুলের বাগান, সেখানকার কুয়াতলায় গিয়ে ওরা মুখ হাত ধুয়ে এলো। একজন চৌকীদার ওদের জন্ত চা ও জলযোগের আয়োজন করলো, আরেকজন এসে বড় তক্তপোষের উপর ফরাস পেতে দিয়ে গেল। সেই কোন্ সকালে মোতাহারের ওখান থেকে তারা খেয়ে বেরিয়েছিল, এতক্ষণে ক্ষুধাও পেয়েছিল ওদের। ডাকবাংলোয় গিয়ে উঠলে এত সহজে এ সমস্ত আয়োজন করবার সুবিধে হোতো না সুস্থির ও শান্ত হয়ে বসতে ওদের ঘণ্টাখানেক লাগলো বৈ কি।

এমন সময় বড় দারোগা এসে পৌঁছলেন। বাইরের দিকে তখনও লোকের ভিড় ছিল। তিনি ভিতরে এসে ওদের দুজনকে দেখে বিস্মিত হলেন। হাসিমুখে বললেন, সকালবেলায় অমন চমৎকার নাচগান করলেন আপনারা,—এবেলায় এ কি কাণ্ড?

হাসনু হেসে বললে, সকালবেলাকার পুরস্কার!

বড় দারোগা বললেন, পুরস্কার পেয়েছেন পাঁচশো টাকা! আমি নিজে সেখানে ডিউটিতে ছিলুম। বাস্তবিকই আপনারা নাচ-গানে সকলকে অভিভূত করেছিলেন। কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরির চার্জ দিচ্ছে কেন ওরা? ব্যাপারটা কি?

হিরণ আর হাসনু তাদের আনুপূর্বিক কাহিনী ব'লে গেল। তারা এই দেশেরই লোক, তাদের বাড়ি হাজিপুরে, তারা দুজনে বেরিয়েছে ভ্রমণে,—সমস্তই তারা অকপটে প্রকাশ করলো। বড় দারোগা মনোযোগ দিয়ে সমস্ত শুনে বললেন, আপনাদের ছদ্মবেশ নেবার কারণ কি?

হিরণ হাসিমুখে বললে, মনে ভয় ছিল, তাই জাতটাকে আমরা উল্টে নিয়েছিলুম!

আপনারা কি সত্যই স্বামী-স্ত্রী নন্?

দয়া ক'রে কথাটা উচ্চারণ করবেন না, আমরা লজ্জা পাই।

তবে আপনাদের সত্যিকারের সম্পর্কটা কি?

হাসনু জবাব দিল আমরা বাল্যকাল থেকেই কমরেডস্! একই পরিবারে আমরা মানুষ। আমরা একই সাপ, কিন্তু দুটো মুখ। হাসনু নিজেই খুব হেসে নিল।

ছোট দারোগা আগাগোড়া সমস্ত ডায়েরী লিখে নিলেন। বড় দারোগা বললেন, আজকের দিনটা এখানে থাকুন, কাল কোনো সময় লোক দিয়ে আপনাদের পাঠাবো। হাজিপুর থেকেই তদন্ত হওয়া দরকার। আপনারা শিক্ষিত ভদ্রসন্তান, আপনাদের ওপর আমার বিশ্বাস আছে ব'লেই আমি সেখানে পাঠাবো আপনাদের। নইলে এখানে আপনাদের রেখেই হাজিপুরে তদন্ত করবার কথা। সেখানকার থানাতেই আপনাদের যেতে হবে।

হিরণ বললে, আপনি কি পুলিশ পাহারা দিয়ে আমাদের সেখানে পাঠাবেন?

বড় দারোগা বললেন, নিশ্চয়ই! আপনারা যে বিচারাধীন আসামী,—একথা ভুলে গেলে চলবে কেন?

১৬

কলকাতায় ফিরে যাবার সময়ে বেল্লিকমশাই চিন্তিতভাবে ব'লেছিলেন, ছোটরাণী, আপনাদের জমিদারিও আছে, অধিকারও আছে, কিন্তু তালপুকুরে ঘটি আর ডুববে না—একথা আমি ব'লে গেলুম।

সুমিত্রা বললেন, আমাকে চারিদিক থেকে শক্তিহীন ক'রে তোলার একটা চক্রান্ত রয়েছে, এটা আগে আমি জানতে পারিনি, বেণুবাবু।

বেল্লিক বললেন, দেখুন স্বাধীনতা পাবার পরে দেশের অবস্থা বদলেছে কিনা আমি জানিনে, কিন্তু মনের অবস্থা সকলেরই বদলেছে। এর পর নতুন ব্যবস্থা কি দাঁড়াবে এখনই বলা কঠিন, কিন্তু পুরনো ব্যবস্থা মানুষ আর কিছুতেই মানবে না। সুতরাং আমার ধারণা, আপনি যা ফিরে পেতে এসেছিলেন, তা বোধ হয় আপনার হাতে আর ফিরবে না।

সুমিত্রা চুপ ক'রে বেল্লিকের কথা শুনে গেলেন।

বেল্লিক বললেন, আমি চ'লে যাচ্ছি, কিন্তু ভাবনা নিয়ে যাচ্ছি। ধরুন, কি নিয়ে আপনি থাকবেন এখানে? আপনাদের নামে আছে সম্পত্তি, কিন্তু ঘর আপনাদের শূন্য। পাওনা আছে, কিন্তু প্রাপ্তি নেই। আদায় আছে, কিন্তু

ভোগ নেই। পুরনো অবস্থাটা আবার ফিরবে, সেই আশায় ব'সে থাকবেন এই হাজিপুরে?

সুমিত্রা বললেন, আপনি কি মনে করেন আমি প্রজাদের মন ফেরাতে পারবো না?

বেল্লিক যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে হাসলেন। বললেন, কলকাতায় আমাদের আট-দশখানা বাড়ি আছে, ভাড়াটেদের কাছে ভাড়া পেয়ে থাকি। প্রায় সকলেই তারা ভদ্র। কিন্তু আড়ালে আমাকে তারা কি বলে, আমি কি জানিনে? সেখানে খাদ্য আর খাদক সম্পর্ক—সেখানে অবস্থা ফেরানো যায় না। তা ছাড়া বুঝতেই পারেন, এদিককার হাওয়া গেছে বদলে।—আচ্ছা, আমি তবে এবারের মতন আসি।

সুমিত্রা সঙ্গে সঙ্গে এলেন। বললেন, আপনি ত' কোনো কথাই ব'লে গেলেন না, বেণুবাবু?

বেণুবাবু ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন, প্রাপ্য আপনি পাবেন না, দান আর দয়া পেতে পারেন। সেই একমুঠো দয়ার ওপর আপনি কতদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন, আমি কেমন ক'রে বলবো বলুন?

সুমিত্রা বললেন, কলকাতায় চিঠি লিখলে কি আপনি জবাব দেবেন না?

বেল্লিক বললেন, আপনাকে এখানে পৌঁছে দিয়েই আমার চ'লে যাবার কথা ছিল, কিন্তু থেকে গেলুম এতদিন! আপনি নিজেই সকলকে জানিয়ে এসেছেন, কলকাতার সঙ্গে আপনার আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। চিঠি দিলে জবাব আমি অবশ্যই দেবো, কিন্তু তা'তে আপনার নিজের সুবিধে হবে কতটুকু? দূরের থেকে আমি আপনার কোন্ সাহায্যে আসতে পারবো বলুন?

বসন্ত যাচ্ছে বেণুবাবুর সঙ্গে পাকিস্তানের সীমানা অবধি। বসন্তর বাড়ী হোলো ফরিদপুরে। সীমানায় বেণুবাবুকে পৌঁছে দিয়ে সে আবার ফিরে আসবে এমনি কথা আছে। কিন্তু সুমিত্রা এখন থেকেই বুঝতে পারেন, বসন্ত আর ফিরবে না,- সে নিজের দেশেই চ'লে যাবে। এখানে তার অন্ন বস্ত্র এবং মাসিক বেতন অত্যন্ত অনিশ্চিত। জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে সে আগেই গিয়ে নৌকায় উঠে বসেছে।

বেণুবাবু?—বলতে বলতে সুমিত্রা কাছে এসে দাঁড়ালেন। উত্তেজনায় আর আবেগে তাঁর চোখ দুটি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। বেণুবাবু শান্ত হয়ে দাঁড়ালেন।

সুমিত্রা বললেন, যাবার আগে আপনি কি আর কোনো কথা শুনে যেতে চেয়েছিলেন?

বেণুবাবু বললেন, কী কথা? কই না?

আপনার অতদিনের নিঃস্বার্থ সাহায্যের দেনা কেমন ক'রে আমি শোধ করবো? কী আছে আমার?

বেণুবাবু বললেন, দেনা শোধ ত' আমি চাইনি।

সুমিত্রা বললেন, অত্রি মানুষ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত আমি হাজিপুরের এ বাড়ীতে থাকতে পারবো কি না আপনি ত' ব'লে গেলেন না?

আমি ত' আপনাদের অভিভাবক নই?

সুমিত্রা ঈষৎ অনুযোগ জানিয়ে বললেন, আপনি ছাড়া আর কোনো অভিভাবক এই এক বছরে ছিল কি?

বেণুবাবু কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। পরে বললেন, না, এ বাড়ীতে আপনি অতদিন থাকতেও পারবেন না, এবং এখান থেকে অত্রিকে মানুষ ক'রেও তুলতে পারবেন না!

সুমিত্রা নিরুপায়ভাবে বললেন, তা হ'লে উপায়?

উপায় আছে!—বেণুবাবু বললেন, কিন্তু সে-উপায় কি আপনার পছন্দ হবে?

উদ্‌গ্রীব হয়ে সুমিত্রা বললেন, কি উপায়?

বেণুবাণু বললেন, এখানে প্রায় একমাস থেকে গেলুম। বিশ পঞ্চাশখানা গ্রামের খোঁজ-খবরও পেলুম! কিন্তু হাজার হাজার লোকের মুখে কেবল একটা নামই ঘোরে,—হাসুবানু। হাসুবানুর সঙ্গে আপনার বিবাদ মিটিয়ে যদি তাকে এখানে আনতে পারেন, তবেই হয়ত অবস্থা ফিরতে পারে। একটি সাধারণ মুসলমানের মেয়ের এমন আশ্চর্য প্রভাব আর প্রতিপত্তি, এ আমি না দেখলে বিশ্বাস করতুম না!

সুমিত্রার গলার আওয়াজটা বদলে গেল। তিনি বললেন, আমাদের অন্নে যে মানুষ, তার দয়ার দানের ওপর অত্রিকে মানুষ করতে হবে,—এই অপমান কি আপনি মেনে নিতে বলেন?

একটি ফুৎকারে ছাইচাপা আগুন যেন হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে। বেণুবাবু বললেন, না, না, আপনাকে মেনে নিতে কিছু বলিনি,—আমি কেবল ভাবছিলুম যে, হাসুবানু এলে অবস্থা ফিরতে পারতো, প্রজারা বশ হোতো, প্রাপ্য খাজনার অতিরিক্ত আদায় করা যেতো। চাই কি, আপনাদেরও শূন্য ঘর ভ'রে উঠতো! আচ্ছা, এবার আমাকে বিদায় দিন্।

বেণুবাবু অগ্রসর হলেন। পিছন থেকে সুমিত্রা পুনরায় বললেন, কলকাতায় কখনো গেলে কি আপনার ওখানে আর আশ্রয় পাবো না, বেণুবাবু?

বেণুবাবু ফিরে দাঁড়িয়ে হাসলেন। বললেন, এখানে আসবার আগে আপনার মনের যে-জোর ছিল, তা ক'মে গেছে বুঝতে পারছি। কিন্তু কলকাতায় না গেলে আশ্রয়ের কথা ওঠে না, তার যদি গিয়েই পড়েন, তবে কি জলে ভাসবেন ?

কথাটা শুনে সুমিত্রার বিষণ্ণ মনেও ঈষৎ হাস্যরেখা দেখা দিল। বেণুবাবু সেটি লক্ষ্য করলেন, তারপর হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে দেউড়ীর দিকে অগ্রসর হলেন। সুমিত্রা আড়ষ্ট রক্তিম মুখে সেইখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। নিজের ওষ্ঠাধরের উপর নিজের হাসি যেন রি রি ক'রে জ্বলতে লাগলো।

উপরতলায় একটির পর একটি শূন্য কক্ষ অতীত বৈভবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। সকালের দিকে ফকিরের মা এক পুঁটুলী চাউল কোথা থেকে যেন সংগ্রহ ক'রে আনে। হয়ত এ তার নিজেরই ঘরের চাউল, কিন্তু সেকথাটা সে প্রকাশ করে না। ঘরের গরুর দুধ এনে দেয় এক-আধ পোয়া, হাটতলা কুড়িয়ে হয়ত আনে কখনো দু'একটি শাকসব্জি। কলুবাড়ী থেকে একবাটি তেল আনে, আর হামিদ সাহেবের খানসামার কাছ থেকে চেয়ে আনে নুন। অত্রি ছেঁড়া হাফসার্ট প'রে ঘুরে বেড়ায়, সে-দৃশ্য ফকিরের মা'র পক্ষে অসহ্য। হাটের দিন সে সবুজ ডোরাকাটা এক জামা এনে দিয়েছে অত্রির জন্য, দাম দিয়ে এসেছে সে ফকিরের ঘরামির মজুরি থেকে। মুসলমান ঘরের অশিক্ষিত স্ত্রীলোক হলেও ফকিরের মা এ কথাটা সহজেই বুঝতে পারে, ভয়ানক অভাব আর দারিদ্র্য চারিদিক থেকে এ বাড়ীর ছোট বৌমাকে ঘিরে ফেলেছে। সে যথাসাধ্য ছুটোছুটি করতে থাকে।

বেণুবাবু চ'লে যাবার কিছুদিন পরে ফকিরের মাও একদিন বলেছিল, আচ্ছা ছোট বৌমা, ছোট দিদিমণিকে একবার আসতে লিখলে হয় না ?

সুমিত্রা বললেন, হাসনুর কথা বলছ ?

হ্যাঁ গো। সে-মেয়ে তোমার হাতে থাকলে ভাবনা কি ছিল? তার এক ডাকে হাজার লোক জড়ো হতো, খাজনার টাকায় আর ধান পাটে তোমার ঘর ভ'রে উঠতো!

সুমিত্রা বললেন, হুঁ, সে যে পাকিস্তানের কত বড় শত্রু, তা কি তোমরা জানো, ফকিরের মা ?

ফকিরের মা অবাক! বললে, বলো কি গো, তাকে না দেখে দেশশুদ্ধ লোক কাঁদছে যে! তা'কে শত্রু বলো কেন? তোমাদের রাজবাড়ীর সেই ত' ছিল কর্তা। মৌজা-তালুকের লোকেরা তার কথায় ওঠে-বসে যে গো!

আমার কথা দেখে নিয়ো ফকিরের মা!—ব'লে সুমিত্রা সেখান থেকে চ'লে গিয়েছিলেন।

দিন কয়েক পরে হামিদ সাহেব একদিন ফকিরের মাকে ডেকে পাঠালেন ও-মহলের নিচের তলায়। ফকিরের মা গিয়ে সামনে দাঁড়লো। হামিদ তাঁর গড়গড়ার নল থেকে মুখ সরিয়ে বললেন, তোমাদের বেল্লিকবাবু ত' চলে গেলেন?

হ্যাঁ, ছায়েব।

তোমাদের ছোটরাণী কেমন লোক আছে, ঠিক ক'রে বলো ত' ফকিরের মা?

ফকিরের মা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়ালো। প্রশ্নের তাৎপর্যটা সে বুঝতেই পারলো না। হামিদ সাহেব বললেন, অন্য কোনো কথা নয়, লেকিন্ তিন মাসের মধ্যে তোমাদের রাণী একদিন আমাকে নিমন্ত্রন্ন ক'রে খাওয়াতে পারলেন না? লোকে বলে, হিন্দুরাণীরা খুব অতিথি সেৎকার করতে জানে।

ফকিরের মা হামিদ সাহেবের একছত্র প্রতিপত্তির কথাটা অনেক দিন থেকেই জেনেছে। শুধু তাই নয়, তিনি এখন এ অঞ্চলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। রাজার সম্পত্তির তিনি অছিদার, রাজার খাজনার উপরে তাঁর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব। এ অঞ্চলের তিনি সর্বাধিনায়ক। সুতরাং ফকিরের মা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, ছায়েব আপনাকে অনেক দিন থেকেই ছোটরাণীমা নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াবার ইচ্ছে করেছেন, কিন্তু বলতে তাঁর সাহস হয়নি।

হাসিমুখে হামিদ বললেন, কেন?

আপনি যে বড় ছায়েব, হাকিম···সেইজন্যে!

না, না, ফকিরের মা। আমি সামান্য লোক, আমি তাঁর আশ্রয়ে বাস করি। তিনি জমিদার, আমি প্রজা। তাঁকে ব'লো।

পরদিন ফকিরের মা সমস্ত আয়োজন করলো এবং রান্নাঘরে গিয়ে নিজের হাতে সুমিত্রা রান্নাবান্না ক'রে হামিদ্ সাহেবকে ডেকে খাওয়ালেন। খেতে বসে হামিদ সাহেব বললেন, বক্রির মাংস কি আপনিই রসুই করেছেন?

সুমিত্রা ঘোমটা টেনে অদূরে দাঁড়িয়ে বললেন, হয়ত আপনার রুচির মতন হয়নি রান্নাটা!

হামিদ খুশি হয়ে বললেন, খুব ভালো রসুই করেছেন, রাণীজি! আমার বাবুর্চি রসুই জানে না, তাই আমি বহুৎ তকলিপে আছি। আবার নসিব ভালো। তাই এমন মিঠা খানা মিললো!—আচ্ছা, মেহেরবানি ক'রে বান্দার একটি কথার জবাব দিন্ ত'?

কি বলুন ?—সুমিত্রা মুখ তুলে তাকালেন।

হামিদ সোজা সুমিত্রার দিকে চেয়ে বললেন, হাসুবানু ব'লে এক মেয়ে থাকতো আপনাদের এখানে। তার খুব নাম। সে মেয়ে কেমন ?

সুমিত্রা বললেন, আমাদের বাড়ীতে সে মানুষ। এ গ্রামে সবাই তাকে খাতির করে।

সে পাকিস্তানের দুষমনি ক'রে বেড়ায়, আপনি জানেন ?

আমি জানি নে।

আপনাদের টাকা নিয়ে সে প্রচারকার্য করে, রাষ্ট্রবিরোধী দল পাকায় আর আপনারা জানেন না ?—হামিদ একটু হাসলেন। কিন্তু তাঁর হাসি লক্ষ্য ক'রে সুমিত্রার মনে দুর্ভাবনা দেখা দিল।

তিনি বললেন, এসব কথা আমার জানা নেই, জনাব হামিদ।

হামিদ সাহেব বললেন, চিটাগঙ্ থেকে আমার কাছে রিপোর্ট এসেছে। হাসুবানুর বিরুদ্ধে প্রবল অভিযোগ। লেকিন্ আপনি এক কাজ করতে পারেন, রাণীজি !

কি বলুন ?

আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন, যদি সহযোগিতা করেন,—তবে কুছু ভাবনা থাকবে না।

সুমিত্রা বললেন, আপনাকে আমি কী সাহায্য করতে পারি ?

হাসিমুখে হামিদ বললেন, আরেকদিন বলবো, রাণীজি !

আহারাদির পর ধন্যবাদ জানিয়ে হামিদ নিজের মহলে চ'লে গেলেন।

দিন দুই পরে হঠাৎ এক সময়ে জানা গেল, রাজবাড়ীর ভিতরে ফকিরের মার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছে। এই প্রকার হুকুমের অর্থ কি, একথাটা জানার জন্য সুমিত্রা নিচের তলার সামনের মহলে নেমে এলেন, কিন্তু সেখানে হামিদ সাহেবের কয়েকজন অবাঙ্গালী লোকজনকে দেখে তিনি আবার উপরে উঠে গেলেন। উপরতলায় তিনি একা। মহলটা বিরাট, কিন্তু সন্ধ্যার দিকে তার শূন্যতা দেখলে গা যেন ছমছম করে। অত্রি তাঁর একমাত্র সম্বল, কিন্তু অত্রির এমন বয়স নয় যে, সে বাহির থেকে খাবার খুঁটে আনে। কিশোর বালকের এমন স্বকীয়তা হয়নি যে, তার কাছে সাহস ও ভরসা পাওয়া যায় ! ফকিরের মা ছিল তাঁর একমাত্র ভরসাস্থল,—ভিতর ও বাহিরের সঙ্গে সে-ই সংযোগ রেখে চলতো। কিন্তু হঠাৎ এই হুকুমানার তৎপর্য কি, একথা তাঁর না জানলে কিছুতেই চলবে না। ফকিরের মা যদি এক আধদিন না আসে, তবে একবেলা একমুঠো আহারাদির পর্বটাও বন্ধ হবে !

অত্রি!

অত্রি যেন কোথায় ছিল, সাড়া দিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে, কেন মা!

ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সুমিত্রা চমকে উঠলেন। একি চেহারা হয়েছে অত্রির? রূপ গেল কোথা? কোথা গেল শরীরের মাংস? শুধু অস্থির উপরে চর্মের পাতলা আবরণ,—এ ত' হাজিপুরের চৌধুরী পরিবারের সর্বশেষ প্রদীপ অত্রি নয়? সন্তানের দিকে তাকিয়ে জননীর চোখ ছলছল ক'রে এলো। তিনি বললেন, অত্রি, ফকিরের মাকে এবাড়ীতে আর ঢুকতে দেবে না, শুনেছিস্?

অত্রি বললে, শুনেছি। কি বলবে বলো!

তুই একবার ফকিরের মা'র খোঁজ নিতে পারবি, বাবা?

আমাকেও বাইরে যেতে মানা ক'রে দিয়েছে!

সবিস্ময়ে সুমিত্রা বললেন, তোকেও? কে মানা করেছে?

সেরেস্তার পেয়াদারা।

কিন্তু বাইরে না গেলে আমাদের চলবে কেমন ক'রে?

অত্রি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়ালো। তারপর রুষ্টকণ্ঠে বললে, তোমার জন্যেই ত' এসব হোলো! কলকাতায় আমরা বেশ ছিলুম! তুমিই ত' জোর ক'রে এলে!

সুমিত্রা হাসবার চেষ্টা ক'রে বললেন, নিজের বাড়ীতে না এসে যাবো কোথায় রে?

নিজের বাড়ী না ছাই! ছোড়দি কত মানা করলো, তুমিই শুনলে না!

সুমিত্রা গম্ভীরভাবে বললেন, আসবার আগে হাসনু বুঝি তোর কানেও মন্তর দিয়েছে? তুইও বুঝি তার দলে?

অত্রি সামনে থেকে চ'লে যাচ্ছিল! ঈষৎ কঠোর কণ্ঠে সুমিত্রা ডাকলেন, শুনে যা!

অত্রি মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো। সুমিত্রা উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, হামিদ সাহেবকে গিয়ে বল, এ বাড়ীর ছোটরাণী অপমান সইবার জন্যে নিজের বাড়ীতে এসে ঢোকেনি। অন্যায় জুলুম যদি কোথাও থাকে তবে হাজিপুরের বাইরে থাক্। এ গ্রাম আমার, এ মাটি আমার,—যতদিন আমি আছি এখানে, আমার হুকুমে সমস্ত চলবে। কাছারি, সেরেস্তা, খাজাঞ্চিখানা, খাজনা আদায়, আয়, ব্যয়,—সমস্ত আমার হুকুমে হ'তে হবে। হামিদ সাহেবকে ব'লে আয়, তিনি আজ থেকে অন্য জায়গা দেখুন। আর আজ যাবার আগে আমার কাছে সমস্ত হিসাবপত্র বুঝিয়ে দিয়ে যান। পারবি বলতে?

পারবো!

সুমিত্রা বললে, এও ব'লে আসবি, রাজবাড়ীটাকে কয়েদখানা ক'রে তোলবার আগে তিনি কি আমার সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন? এও জেনে আসবি, রাজবাড়ীর আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থা না ক'রে তিনি খাসমহলের ধান-পাট কোথায় চালান দিয়েছেন? তিনি কি আমাদের এখানে উপোষ করিয়ে রাখতে চান?

অত্রি চ'লে গেল। অধীর উত্তেজনা আর আক্রোশে সেইখানে দাঁড়িয়ে সুমিত্রা কাঁপতে লাগলেন। এবেলাটায় কোনোমতে হয়ত অত্রির মুখে দুটি ভাত দেওয়া চলবে কিন্তু তারপরে সমস্তটাই অনিশ্চিত। একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্রের আভাস তিনি পাচ্ছিলেন। বেল্লিকের বিদায়কালীন আলাপটা যেন তাঁর কানে বাজছিল।

মিনিট দশেক পরে অত্রি ফিরে এলো। সুমিত্রা ততক্ষণে খানিকটা নরম হয়েছেন। বললেন, কী কৈফিয়ৎ দিলেন শুনি?

অত্রি বল্লে, কিছু বললেন না!

কিছুই না?

তামাকের নল মুখে দিয়ে হাসছিলেন!—মা, হামিদ সাহেবের টেবিলের ওপর ছোড়দির একখানা ফটো দেখলুম।

সচকিত হয়ে সুমিত্রা প্রশ্ন করলেন, হাসনুর ফটো?

হ্যাঁ মা,—কী সুন্দর ছবিটা!

থাম্—ব'লে সুমিত্রা স্নান করতে চ'লে গেলেন। ফিরে এসে তিনি নিজেই হামিদকে এখানে ডেকে পাঠাবেন মনে হোলো।

কিন্তু স্নান সেরে বাইরে এসে তিনি দেখলেন, উপরতলার প্রবেশ-পথের সামনে হামিদের একটি লোক এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখ ফিরিয়ে তিনি বললেন, কি চাই?

লোকটা বললে, বড়া সাব আপ্‌কো সেলাম দিয়া!—আর কোনো কথা না ব'লেই লোকটা আবার নিচে নেমে গেল। সুমিত্রা কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করলেন। পরণে ছিল তাঁর একখানা জীর্ণ থানধুতি। কলকাতা থেকে এখানে আসবার সময় তাঁর ধারণা ছিল, এখানে পৌছানো মাত্র তাঁর সমস্ত অভাব অভিযোগ একদিনে ঘুচবে,—সেজন্য কারো অনুরোধেই তিনি সঙ্গে কিছু আনেন নি। দ্বিতীয় একখানা কাপড় ছিল, কিন্তু তাও তিনি জোর ক'রে গছিয়ে দিয়েছেন ফকিরের মাকে। ফলে, অবস্থাটা এখন এই দাঁড়িয়েছে যে, লোকজনের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে এখন তাঁর মাথা হেঁট হয়।

সুমিত্রা ঘরে গিয়ে তাঁর শেষ সম্বল একখানা চাদর গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে এসে নতমুখে নিজের দিকে একবার চেয়ে দেখলে, তারপর অত্রিকে বললেন, তুই উনুনে কাঠ দে,—আমি একবার দেখা ক'রে আসি।—এই ব'লে তিনি নিচে নেমে গেলেন।

হামিদ সাহেব তাঁর জন্ত অপেক্ষা করছিলেন। সুমিত্রা দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই তিনি উঠে নত হয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, সালাম আলেকম্ রাণীজি!

সুমিত্রা বললেন, নমস্কার।

হামিদ বললেন, হিন্দুর জেনানাতে আমরা প্রবেশ করিনে। আমরা তাঁদের ইজ্জৎ মানি, রাণীজি!

সুমিত্রা স্পষ্টকণ্ঠে বললেন, আপনাকে ধন্তবাদ, মিঞাসাহেব।

হামিদ বললেন, আপনার লড়কা এসেছিল, আর গরম গরম কথা ব'লে গেল আপনার জবানিতে। আমার কসুর হয়েছে, আপনি মাফ করুন। আপনি জমিদার, আমি প্রজা। আপনার বান্দা আমি!

টেবিলের ওপর হাসুবানুর ছবিখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সুমিত্রা বললেন, আপনি কি ফকিরের মার ওপর হুকুম জারি করেছেন,—যাতে সে না আসে?

আমি নয়, আমার খানসামা!

কেন জানতে পারি কি?

হামিদ বললেন, ও মাগি দেশী লোক আছে, সেই সুবাদে। রাণীজি, সাপের একমুখ থাকলে ভাল হয়, ফকিরের মা হচ্ছে দোমুখো সাপ! আপনাকে মানা করি, এই দেশী মুসলমানকে আপনি বিশ্বাস করবেন না এরা জাতের সুনাম শেখে না। এ হারামিদের জন্মের গোলমাল আছে!

সুমিত্রা বললেন, আমরা চিরকাল এদেশের মুসলমানের সঙ্গে থেকে এসেছি, মিঞাসাহেব—তারা আমাদের পরমাত্মীয়!

হামিদ হাসলেন। বললেন, সে আমি জানি। কিন্তু এরা হোলো বোকা, বজ্জাত,—ইসলামের নীতি এদের জানা নেই। এরা বেতমিজ। দুনিয়ার মুসলমান সমাজ এদেরকে জানোয়ার মনে করে। পাকিস্তান-রাজ এদেরকে একদিন সায়েস্তা করবে!

মনের বিরক্তি চেপে সুমিত্রা বললেন, আপনি তলব করেছেন কেন আমাকে, মিঞাসাহেব?

হামিদ বললেন, হাঁ, আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছে। হিন্দুস্তান হ'লে আপনি

আমাকে তলব করতে পারতেন, লেকিন্ পাকিস্তানের চাকা উল্টাদিকে ঘোরে। জমিদারিটা আপনার, কিন্তু মাটিটা আমাদের। আর পাকিস্তান মানেই ত' মাটি!

সুমিত্রা তাঁর অবরুদ্ধ বিক্ষোভ দমন ক'রে বললেন, কিন্তু আমার এই মাটিতে ব'সে আমি উপোস ক'রে থাকবো, এই কি আপনি চান্, মিঞাসাহেব?

হামিদ সহাস্যে তাকালেন সুমিত্রার দিকে।

সুমিত্রা কম্পিতকণ্ঠে বললেন, আমার ঘরে ভাত নেই, পরণে কাপড়-চোপড় নেই, ঘরের বিছানাপত্র নেই, হাতে টাকাপয়সা নেই,—কাছারি সেরেস্তার লোক আমল দেয় না, প্রজাদের কেউ কাছে আসে না, হাটতলায় গেলে জিনিসপত্র দেয় না,—এ অবস্থা কেমন ক'রে হচ্ছে? আপনি কি চান আমরা সব ছেড়ে চ'লে যাই?

হামিদ বললেন, রাণীজি, আপনি আমাকে শরম দিচ্ছেন। এ সবই আপনার! আমি আপনার আশ্রিত। আপনি যদি চান তবে আমার সিপাই সান্ত্রী, খানসামা, বাবুর্চি, লোকলস্কর—সবাই আপনার খিৎমত করতে হাজির আছে। আপনি যত টাকা চান্ নিন্, খাবার জিনিস নিন্, ভাণ্ডার ঘর, রসুইখানা সব নিন্—আপনি আমাকে যা খেতে দেবেন আমি তাই খাবো। আপনি আমার মনিব হয়ে থাকুন। পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমান মিলন না হ'লে কুছু আশা-ভরসা নেই, রাণীজি!

হাওয়াটা ঠিক কোন্ দিকে বইছে বুঝতে না পেয়ে সুমিত্রা বললেন, তাহ'লে আমার ব্যবস্থা কি হবে আমাকে বলে দিন্?

হামিদ মুখ তুলে বললেন, আপনি কি খুব গোঁড়া হিন্দু আছেন, রাণীজি?

না!

তবে আপনি নিচে এসে রসুইঘরে রান্না করতে পারেন। আমি বাবুর্চিকে সরিয়ে দিচ্ছি।

সুমিত্রা বললেন, সে রান্না কে খাবে?

হামিদ বললেন, আপনার মেহেরবানি হ'লে আমিও সেই রান্না খেতে পারি।

সুমিত্রা প্রশ্ন করলেন, আমার টাকাকড়ি পাবার কি বন্দোবস্ত হবে?

টাকাকড়ি? যত টাকা চান্ দেবো। সোনা চাঁদি, আর, আপনার ঘরের আসবাব, আপনার ধনদৌলৎ—সবই পাবেন।

সুমিত্রা বললেন, আপনাকে রেঁধে খাওয়ালেই আমার কপাল ফিরবে? যা চাইবো তাই পাবো?

উৎসাহিত হয়ে হামিদ বললেন, আপনি এ বাড়ীর রাণী,—আর জিন্দগী ভোর আপনি রাণীই থাকবেন।

সুমিত্রা দৃঢ় শান্ত কণ্ঠে বললেন, হাজিপুরের রাণী থাকবো বাইরে, আর ভেতরে থাকবো আপনার রাঁধুনি হয়ে, এই কি আপনি বলছেন, মিঞাসাহেব?

হামিদ আবার কুর্নিশ জানালেন। পরে বললেন, বান্দার গোস্তাকি মাফ করুন, রাণীজি। আমি আপনার ভালোর জন্য বলছি। আপনি যদি আমার জন্য রশই করেন, আমি নিজের হাতে সব্জি কেটে দেবো, মসলা পিষে দেবো, পানি তুলে আনবো, বাসন ম'লে দেবো। আপনি যদি রাজি হন্ তবে আমি ফকিরের মায়ের মতন দশজন বাঁদীকে আপনার পায়ের কাছে দেবো।

সুমিত্রা বললেন, এ মুলুকে যদি আমার বদ্‌নাম রটে তবে কে দায়ী হবে মিঞাসাহেব?

হামিদ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন সুমিত্রার আপাদমস্তক। পরে বললেন, বদনাম! এই গ্রামে? কুত্তার দল যদি ঘেউ ঘেউ করে তবে কি মানুষের কাজ বন্ধ হবে? কুছু বদ্‌নাম আপনার গায়ে লাগবে না। ধনদৌলৎ, পোশাক-আশাক, রাজবাড়ীর নবাবী, বাগান-বাগিচা, সিপাই-লস্কর,—আপনার নিজের জিনিসের তলায় সব বদনাম চাপা প'ড়ে যাবে। তার বদলে শুধু আমাকে রসুই করিয়ে খাওয়াবেন আপনি, রাণীজি, আর যদি আপনার বদনামের ভয় থাকে,—কুছু পরোয়া নেই, আপনি আমার মহলে স'রে আসবেন, কোনো লোক আপনার খবর জানতে পারবে না। আমি নিজে সারাদিন ধ'রে আপনার পাহারায় থাকবো। হামিদ তাঁর এমন চমৎকার সুব্যবস্থার কথা বলতে বলতে নিজেই প্রচুর উৎসাহ বোধ করলেন।

সুমিত্রা বললেন, আপনার টেবিলে ওই ফটো রয়েছে কেন?

হামিদ বললেন, ও ফটো হাসুবানুর। ও শয়তান মেয়ে আছে। পাকিস্তানের দুষমন! পাকিস্তান-রাজ ওকে সায়েস্তা করবে।

সুমিত্রা বললেন, আপনি জানেন, আমার মালখানার সমস্ত দৌলৎ হাসুবানু কেমন ক'রে হাতসাফাই করেছে?

হামিদ সাহেব এবার খুব হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, পাকিস্তান-রাজ বেকুফ নয়, রাণীজি!

সুমিত্রা চুপ ক'রে তাকালেন। হামিদ বললেন, আপনার মনে পড়বে, এখানকার বোকা মুসলমান লোক এই রাজবাড়ীতে আগুন লাগিয়ে সব লুট করেছিল, লেকিন্ পাকিস্তান-রাজের লোক ছিল পিছনে। তারা আগে মালখানার জিম্মা নেয়।

সচকিত হয়ে সুমিত্রা বললেন, তারপর ? এ কি সত্যি ?

হামিদ আবার হাসলেন। বললেন, আপনার সব ধনদৌলৎ আমাদের কাছে জিম্মা আছে। আপনি সব ফেরৎ পাবেন। আগে-ভাগে গুণ্ডারা নিজের কাজ করে যায়, পিছে পিছে আমাদের কাজ আমরা ক'রে যাই।—বেশ, আজকের মতন আপনি খানাপিনা করুনগে, আমি আপনার সব কিছু বন্দোবস্ত ক'রে দেবো।—এই ব'লে তিনি ঘণ্টা বাজালেন।

একজন খানসামা এলো। হামিদ ব'লে দিলেন, দোতালায় সব খানা-পিনাকো শামান ভেজ দেও, লতিফ।

আড়ষ্ট পা টেনে টেনে সুমিত্রা দালান পেরিয়ে উপরে উঠে গেলেন এবং মিনিট পনেরোর মধ্যে নিচের থেকে মাত্র দিন তিনেকের মতো চা'ল ডাল ইত্যাদি এবং দশটি টাকা লতিফ উপরে এসে সামনে রেখে চ'লে গেল।

সুমিত্রার সর্বশরীর ঠকঠক ক'রে কাঁপতে লাগলো। সমস্ত ব্যাপারটা এখন থেকে আর দুর্বোধ্য নয়। প্রতিষ্ঠা যদি তাঁকে পেতে হয় তবে তা সম্ভ্রমবোধের বিনিময়ে,—এবং তার পরিণাম কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে ভবিষ্যতও দুর্ভাবনায় ভরা। খাদ্যসামগ্রীর পরিমাণ দেখে এ কথাটা বুঝতে আর বাকি থাকে না যে, মাত্র তিন দিন তাঁকে সময় দেওয়া হয়েছে। এই তিন দিনের মধ্যেই তাঁকে চরম সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পৃথিবীসুদ্ধ লোক বাইরের থেকে জানবে যে, হাজিপুরের ছোটরাণী তাঁর সিংহাসন, তাঁর রাজবাড়ীর বৈভব, জড়োয়া জহরৎ, তার সঙ্গে জমিদারির অধিকার—সমস্তই পুনরায় ফেরৎ পেয়েছেন; এবং ভিতরে থেকে নিজে জানবেন যে, একজন সরকারী বেতন-ভোগী কর্মচারীর রুচিমাফিক রান্নাবান্না ক'রে নিয়মিত দুইবেলা খাওয়াতে না পারলে তাঁর সিংহাসন মাঝে মাঝে ন'ড়ে উঠবে। বাইরে তিনি রাণী, ভিতরে চাকরাণী! বাইরে তাঁর রাজোচিত প্রতিপত্তি, ভিতরে তিনি বিনা বেতনের রাঁধুনী। সিংহাসন, বিলাস, বৈভব—সমস্তর উপর তাঁর অধিকার অব্যাহত থাকবে, কেবল নিজের ওপর অধিকার তাঁর থাকবে না।

কার্তিক মাসে হিম পড়তে আরম্ভ করেছে। মধুমতীর প্রবাহ কিছু স্তিমিত হয়ে এসেছে। শরৎকাল ধীরে ধীরে বিদায় নিয়ে গেল। বেলাবেলি সূর্য নামে অস্তাচলে।

যতদূর সংবাদ পাওয়া যায় ঠিক এমনি সময়টায় হঠাৎ হাজিপুরে একটা হৈ-চৈ ওঠে। রাজবাড়ী হোলো গ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলের প্রান্তে, কিন্তু এখান থেকেও বুঝতে পারা যায়, এদিককার জনসাধারণ হল্লা করতে করতে ছুটেছে

হাটতলার দিকে। কলরোল উঠেছে চারিদিক থেকে। বোধ হয় দাঙ্গা বেধেছে আবার।

হামিদ সাহেব কড়া লোক। গ্রামে কেমন ক'রে শান্তি আর শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হয় তা তিনি জানেন। রাজবাড়ীর চারিদিকে তাঁর সশস্ত্র লোকজন পাহারায় দাঁড়িয়ে গেল। তিনি নিচের তলা থেকে উপরে খবর পাঠালেন, সুমিত্রা যেন কিছুমাত্র ভয় না পান। তাঁকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রাখার জন্য প্রয়োজন হ'লে তাঁর বান্দা নিজেই অস্ত্রধারণ করবে!

জনতার কলরোল শোনা যাচ্ছে দূরের থেকে। সুমিত্রা অত্যন্ত উদ্বেগ আর দুর্ভাবনা নিয়ে প্রাসাদ-অলিন্দে এসে দাঁড়ালেন। দেখা যায়, কাছারির কোনো কোনো লোক হামিদের মহলে দ্রুতপদে আনাগোনা করছে। ভিতরের লোক যাচ্ছে বাইরের পথে, বাইরের লোক আসছে ভিতরে ছুটতে ছুটতে। বুঝতে পারা যায়, হামিদ সাহেব সমগ্র ব্যাপারটার সম্বন্ধেই অবহিত আছেন। দিগন্তবিস্তার নদীতীরের শান্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন গ্রাম হঠাৎ অনেকদিন পরে আবার যেন প্রচণ্ড প্রাণশক্তিতে মুখর হয়ে উঠেছে। সুমিত্রা আতঙ্কিত চক্ষে উত্তর অঞ্চলের দিকে তাকালেন। দূরের থেকে যেন এগিয়ে আসছে বিপ্লবের বন্যা, ধ্বংস আর মৃত্যুর তরঙ্গ। সমগ্র হাজিপুরে আগুন লাগতে আর দেরী নেই!

এমন সময় নিচের থেকে অত্রি ছুটতে ছুটতে উঠে এলো। সুমিত্রার কাছে এসে ঊর্ধ্বশ্বাসে অত্রি একবার হাসলো। ডাকলো, মা?

মুখ ফিরিয়ে সুমিত্রা বললেন, খবর কিছু শুনতে পেলি?

হ্যাঁ, তুমি শুনেছ মা? শুনতে পাচ্ছ না? কান পাতো?

কি শুনবো রে?

অত্রি বললে, শোনো না কান পেতে?—উদ্দীপনায় আর উৎসাহে অত্রির যেন গলা বুজে এলো।

উত্তেজনা ছিল সুমিত্রারও মনে। তিনি বললেন, অত হাসছিস কেন? কি হয়েছে রে?

অত্রি রুদ্ধকণ্ঠে বললে, দাঙ্গা নয়—আমি জেনে এলুম!

তবে?

তুমি গান শুনতে পাচ্ছ না ছোড়দির? বারোয়ারিতলায় ছোড়দি আর জামাইবাবুর নাচগান হচ্ছে যে!

সুমিত্রা ধমক দিয়ে বললেন, পাগলের মতন কি বকছিস, অত্রি?

বিশ্বাস করছো না, মা? ছোড়দি আর জামাইবাবুকে যে গ্রেপ্তার ক'রে এনেছে এখানে। ওরা নৌকা থেকে নেমেই গান ধরেছে, আর হাজার হাজার

লোক ওদের দুজনকে দেখে নেচে উঠেছে। একদিকে পুলিশের দল, আর একদিকে গাঁয়ের অত লোক। ওরা ছোড়দি আর জামাইবাবুকে ছাড়াতে চায়, কিন্তু পুলিশ কি ছাড়বে? দাঙ্গা বাধতে পারে, মা?

এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হোলো। কারা যেন উঠে আসছে। সুমিত্রা সচকিত হয়ে সাড়া দিলেন, কে?

জনদুই লোক সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং হামিদ সাহেব সিঁড়ির শেষপ্রান্তে উঠে এলেন। তারপর জবাব দিলেন, বেয়াদপি মাফ করবেন, রাণীজি। আপনাকে খবর দিতে এসেছি। আজ চারদিন আগে পাকিস্তানের দুষমন সেই শয়তানী হাসুবানু ধরা পড়েছে। তাকে আনা হয়েছে এখানে। হাজিপুরে তার মস্ত দল আছে, তারা দাঙ্গা বাধিয়ে ওকে ছাড়াতে চাইছে। মেয়েটার ভয়-ডর কুছু নেই, তাজ্জব মেয়ে বটে! আচ্ছা, ওর সঙ্গে এক হিন্দু জোয়ান আছে, তাব নাম জামাই। জামাই কে রাণীজি?

সুমিত্রা শান্তভাবে বললেন, এখানকার এক ব্রাহ্মণ বাড়ির ছেলে। আমাদের বাড়ীতে মানুষ হয়েছে।

কেমন ছেলে আছে?

ছেলেটি খুবই ভালো, খুবই নিরীহ! আমাদের বড় আপন!

হামিদ বললেন, আপনার যদি হুকুম হয় তবে জামাইকে সাজা না দিতে পারি। কিন্তু ওই শয়তানীকে জনমভোর রেখে দেবো গারদখানায়।

সুমিত্রা প্রশ্ন করলেন, কি নাচগান করছে বারোয়ারিতলায়?

বাঘের কপিশ চোখ যেন শিকার হাতে পেয়ে জ্বলে উঠলো। হামিদ বললেন, হ্যাঁ, নাচনা-গাহানা চালিযেছে ওরা। এই শেষ গাহানা। হাজার দেড়হাজার কুত্তা চাষী-মজদুর জড়ো হয়েছে ওখানে। আমাদের দল ওদেরকে ঘিরে আছে, আমি এখনই যাচ্ছি সেখানে।

হামিদ বললেন, হাসুবানুকে আপনার এখানে আনবো রাত্রে, আর জামাই থাকবে থানায় হাজতে। রাজবাড়ীতে মেয়েকে রাখলে গ্রামের কুত্তারা আর কিছু করতে পারবে না। আর আপনাকে দিযে ওর পেট থেকে কথাও বা'র করাতে পারবো। আপনার কোন ভাবনা নেই, রাণীজি।

হামিদ সাহেব লোকজন নিয়ে নেমে গেলেন। সুমিত্রা মনে মনে শিউরে উঠে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর এই চেহারা এসে দেখবে হাসনু! দেখবে মেঝের উপরে চাটাই পেতে তাঁর রাত্রিবাস, পরণে আধময়লা ছেঁড়া কাপড়, ঘরে চা'ল নেই, মাথায় এক ফোঁটা তেল নেই, সম্ভ্রম বাঁচাবার সংস্থান নেই! হাসনুর কাছে একদিন যে-দম্ভ এবং অহংকার প্রকাশ ক'রে এসেছিলেন, তা

যে আজ ধুলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে,—এ দৃশ্য এক পলকে হাসনু বুঝে নেবে। এর ওপর তাঁর কাছে হামিদের সবশেষ প্রস্তাব যদি হাসনু আর হিরণের কানে ওঠে? যদি তারা বিশ্বাস করে, এ প্রস্তাবে তিনি সম্মত ছিলেন? যদি হাসনুর মনে কোনও প্রকার সন্দেহের চিহ্ন দেখা দেয়?

সমস্ত অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎ জীবনটা যেন সুমিত্রার বুকের মধ্যে কাঁটার মতো। ছেলের হাত ধ'রে সুমিত্রা আড়ষ্ট চাপাকণ্ঠে বললেন, অত্রি, কি উপায় বলত?

মায়ের স্পর্শে অত্রি কেঁদে ফেললো, ওরা ছোড়দি আর জামাইবাবুকে মেরে ফেলবে, মা!

কিন্তু আমরা?

অত্রি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

সন্ধ্যা আসন্ন। বহুদূরে গ্রামবাসীর সম্মিলিত কণ্ঠরোল এবার যেন আরো ঘন হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই জনসমুদ্রশ্বাসের ভিতর থেকে এতক্ষণ পরে যেন বিদীর্ণ মধুকণ্ঠের কাঁপন আর কাঁদন দিনান্তগগনের দিকে ভেসে চলছে। গানের সেই অন্তরা হাসনুর বক্ষপঞ্জর ভেদ ক'রে বিচ্ছুরিত হচ্ছে দিকদিগন্তে। হাসনুর কণ্ঠের সেই মর্মান্তিক মূর্ছনায় মূর্ছিত হবে জনসাধারণ,—একথা আজ সুমিত্রার চেয়ে বেশি আর কে জানে!

নিচে সাড়াশব্দ পেয়ে গলা বাড়িয়ে সুমিত্রা দেখলেন, স্বয়ং হামিদ সাহেব প্রায় কুড়ি বাইশ-জন সশস্ত্র লোকজন নিয়ে এতক্ষণ পরে রওনা হলেন। তাঁর খানসামা আর বাবুর্চিরাও অস্ত্র ধরতে জানে, সুতরাং তারাও বন্দুক আর পিস্তল নিয়ে সাহেবের সঙ্গে চললো। আজ হয়ত রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। কাছারি আর সেরেস্তার দিকটা জনশূন্য,—সবাই কাজ সেরে চ'লে গেছে! বুড়ো আলিমিঞা এই সময়টায় বাসায় যায়, রাত্রে কাছারির বারান্দায় প'ড়ে থাকে। রাজবাড়ী প্রায় জনহীন।

সুমিত্রা বললেন, নিচে গিয়ে দেখে আয় ত' অত্রি, কেউ আছে কিনা? তোকে যেন কেউ দেখতে না পায়, বুঝলি?

অত্রি সাবধানে নিচে নেমে গেল, এবং মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আবার ফিরে এসে বললে, কেউ নেই মা, শুধু সেই গাঁজাখোর মেড়ো সেপাইটা লাঠি নিয়ে ব'সে ঢুলছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ছড়িয়ে গেছে চারিদিকে। তারই মধ্যে এক টুকরো কাগজ বা'র ক'রে ইংরেজি হরফে সুমিত্রা তাড়াতাড়ি কি যেন লিখে আঁচলে বাঁধলেন। তারপর বললেন, অত্রি, চল্ বাবা!

অত্রি বললে, কোথায় মা ?

কিছু জানতে চাসনে, শুধু চল আমার সঙ্গে। সব প'ড়ে থাক্, শুধু পুঁটলিটা সঙ্গে নেবো। চল্, অন্ধকার হয়ে এসেছে, বেরিয়ে পড়ি।

কিন্তু ছোড়দি আর জামাইবাবু ?

ওরা! ওরা বাঘের খাঁচায় ঢুকেছে। ওদের পরিণাম জানিনে। চল্ আর দেরি নয়।

সুমিত্রা কোনোমতে একটি পুঁটুলি তৈরী ক'রে নিলেন, তারপর হ্যারিকেনটা প্রকাশুভাবে জ্বালিয়ে রেখে সিঁড়ির দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দক্ষিণ দিকের মহলের অপর প্রান্তে অগ্রসর হলেন। সেখানে চোড়া সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে পড়লেন রাজবাড়ীর বাগানের পূর্বপ্রান্তে। সামনেই তাঁদের শিবমন্দির। মন্দিরের পাশ দিয়ে ঠাকুরদীঘির বাগান। বর্ষাশেষের আগাছায় জঙ্গল রয়েছে দীঘির চারিপাশে, কিন্তু সেখান দিয়ে আত্মগোপন ক'রে যাবার সুবিধা ছিল। অত্রিকে সঙ্গে নিয়ে হন হন ক'রে সুমিত্রা চ'লে গেলেন।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফকিরের মার ঘর পাওয়া গেল। গোলপাতার ঘরখানার চারিদিক জঙ্গলে আকীর্ণ। অত্রি গিয়ে আস্তে আস্তে দাওয়ায় উঠে ঘরে ঢুকলো। ফকিরের মা সেখানে কেরোসিনের ডিবে জ্বেলে ভাত নামাচ্ছিল। অত্রিকে দেখেই চমকে উঠে সে বললে, ওমা, তুমি কোত্থেকে, রাজাভাই ?

একবার বাইরে এসো, মা ডাকছেন।

মা ? ছোটবৌমা ? কোথায় গো ?—ফকিরের মা দ্রুতপদে বাইরে এলো।

আঙুল মুখে দিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সুমিত্রা বললেন, চুপ, চেঁচিয়ো না। আমরা চ'লে যাচ্ছি, ফকিরের মা।

ফকিরের মা কেঁদে ফেললো। বললে, পোড়া দেশ অন্ধকারেই প'ড়ে থাক্, তোমরা আলো নিবিয়ে চলেই যাও, বৌমা !

ফকির কোথায় ?

এখনো ফেরেনি।

সুমিত্রা বললেন, তুমি ঘাটে গিয়ে নৌকায় তুলে দেবে চলো, ফকিরের মা। ছায়েদের নৌকোখানা পাবো ত' ?

হ্যাঁ, পাবে বৈ কি। এখনি যাচ্ছি আমি। ছোটবৌমা, রাজার ছেলে শুধু মুখে চ'লে যাবে আমার ঘর থেকে, এ কেমন ক'রে সইবো ?

অত দ্রুততার মাঝখানেও সুমিত্রা একবার থমকে দাঁড়ালেন। অন্ধকারে তাঁর চোখে জলের রেখা দেখা দিল। বললেন, তোমার অন্নের দাম কি দিয়ে শোধ করবো, ফকিরের মা! আমি দাঁড়াই, তুমি শিগগির অত্রিকে দুটি খাইয়ে দাও।

ফকিরের মা ভিতরে গিয়ে কচুপাতার ওপর অত্রিকে দু'টি ভাত বেড়ে দিল। ভাতের সঙ্গে ডাল আর কুমড়ো সিদ্ধ। অত্রি তার ক্ষুধার মুখে পরম তৃপ্তির সঙ্গে ভাত দুটো খেয়ে নিল।

ঘরের দরজায় শিকল টেনে দিয়ে ফকিরের মা নেমে এলো। তারপর বললে, বৌমা, আমি তোমায় নৌকায় তুলে দিয়েছি জানলে আমার যে গর্দান যাবে!

সুমিত্রা আঁচল থেকে সেই কাগজটুকু বা'র ক'রে ফকিরের মার হাতে দিয়ে বললেন, না, যাবে না। এই চিঠি কারো হাত দিয়ে তুমি পৌঁছে দিয়ো, হামিদের কাছে। তোমার কোনো ভয় নেই।

লোকটা যে কাল-কেউটে, বৌমা!

সুমিত্রা বললেন, এ চিঠিতে কেউটের মন্তর আছে, ফকিরের মা। তোমার ভয় পাবার কিছু নেই।

ফকিরের মা বললে, তোমরা ঘাটের দিকে এগাও, আমি ছায়েদকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি।

সুবিধা ছিল এই, গ্রামের সমস্ত মেয়ে-পুরুষ হাসমু আর হিরণের খবর পেয়ে ইতিমধ্যে চ'লে গেছে বারোয়ারিতলায়। সেদিক থেকে এখনো কলরোল কানে আসছে। সুতরাং বন-বাগানের যে-জঙ্গলী পথটা ধ'রে ঘাটের ধারে পৌঁছনো যায়, সেখানে কারোকে দেখতে পাওয়া গেল না। অত্রির সঙ্গে সঙ্গে সুমিত্রা পৌঁছলেন।

একটু পরেই সন্তর্পণে এলো ফকিরের মা। বুড়ো ছায়েদ তার সঙ্গে। লোকটার একটা চোখ কানা, কিন্তু নৌকোর হাল ধরতে এ গাঁয়ে তার জুড়ি কম। ছায়েদ এসে ঘাটে নেমে তার নৌকো টেনে আনলো। নৌকোর যাত্রী কা'রা, এ কৌতূহল তার ছিল না। অন্ধকারে অতটা ঠাহর করে সে দেখলে না। সুমিত্রার সঙ্গে অত্রি গিয়ে নৌকোয় উঠে বসলো! শামরাইয়ের ঘাটে পৌঁছতে ঘণ্টা দুই লাগবে, ভাটিতে নৌকো যাবে তরতরিয়ে। ছায়েদ নৌকো ছেড়ে দিল। ফকিরের মা ঘাটের ধারে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে চোখের জল মুছতে লাগলো। ভাটির টানে নৌকো চ'লে গেল দূর থেকে দূরান্তরে। উপরে অনন্ত গগন নক্ষত্রখচিত, নিচে অগাধ নদী,—অন্ধকারে সেই দিকচিহ্নহীন

জলরাশির দিকে তাকালে বক্ষস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে আসে। কিন্তু এই অথৈ অকূলে ভেসে যাওয়া ছাড়া তাঁদের আর কোনো উপায় নেই।

বুড়ো ছায়েদ হাল ধরেছে শক্ত হাতে, ভিতরে ভিতরে জলের ধাক্কা ছিল প্রচুর। এক সময় সুমিত্রা প্রশ্ন করলেন, তোমার নৌকো কখন ফিরবে, ছায়েদ ?

ছায়েদ বললে, ফিরতে দুদিন লাগবে, মা-ঠাকরুণ। আবার উজিয়ে আসতে হবে ত'! আপনারা যাবেন কোথায় ?

আমরা ? আমরা শামরাইয়ের ঘাটে নেমে গরুর গাড়ী ধরবো। রেল গাড়ীতে যাবো, বাবা।

এত রাত্তিরে যান্ ক্যান্ ?

কি আর করবো, বাবা—দিনের বেলা কোন গাড়ী নেই। দিনের বেলা গেলে অনেকক্ষণ ব'সে থাকতে হয়। গাড়ী কখন্ ছাড়ে, জানো ছায়েদ ?

ছায়েদ বললে, গাড়ী ছাড়তে সেই দু'পহর রাত, তার আগে নয়। ছাওয়ালটার গায়ে একখানা চাদর দেন— মা কর্তা! এখন হিমের কাল।

কথাটা মিথ্যে বলেনি ছায়েদ। নিজের চাদরখানার এক প্রান্ত নিয়ে সুমিত্রা অত্রির গায়ে ঢাকা দিলেন। পরে বললেন, আর বাবা, চাদর! পেটের অন্নই জোটে না, চাদর জুটবে কোত্থেকে ?

ছাযেদ অত্রিকে চিনতে পারেনি, সুমিত্রাকেও না! দুঃখের কথা শুনে সে বললে, পাকিস্তান হইয়্যা সুখ নাই কা'রো। আপনারা আসছেন কোত্থেকে ?

সুমিত্রা বললেন, আমাদের বাড়ি দাউদপুরে। বড় জামাইয়ের বড্ড অসুখ, তাই দেখতে যাচ্ছি।

মেয়ের শ্বশুরবাড়ি কোথা ?

সে অনেক দূর, গোয়ালপাড়া !

ছায়েদ বললে, আমার নাম জানলেন ক্যামনে, মা-কর্তা ?

সুমিত্রা তাড়াতাড়ি বললেন, ওই যে ফকিরের মা—ছেলে গেল-বছরে আমাদের চালে ছন্ দিয়েছিল। ফকিরের মা বললে, হাজিপুরের ছায়েদ মিঞা যদি নায়ের হাল ধরে, তবে তোমাদের কোনো ভাবনা নেই। তাই তোমার নাম জেনেছি। তোমাকে সবাই চেনে, ছাযেদ।

ছায়েদ বললে, আপনাদের আশীর্বাদেই গতরটা রাখতে পেরেছি মা।

সুমিত্রা বললেন, শামরাইতে নেমে তুমি আমাদের জন্যে একখানা গরুর গাড়ী ঠিক ক'রে দিয়ো, ছায়েদ।

যে আইজ্ঞা। গরুর গাড়ীতে গেলে আধ ঘন্টায় পৌঁছে দেবে বামনজি, পথে পানি নাই, সব শুক্‌নো।

সুমিত্রা এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন। হাল ধরার গুণে নৌকা তীরবেগে ভেসে চললো অন্ধকার থেকে অন্ধকারে।

১৭

গোপালপুরে থানা থেকে বেরিয়ে হাজিপুরে এসে পৌঁছতে লেগেছিল একটি দিন ও একটি রাত। পুলিশের হেপাজতে আছে হাসনু আর হিরণ, ছোট দারোগা ছিলেন সঙ্গে, আর ছিল তিনজন সশস্ত্র কন্‌স্টেবল্‌। হাসনু ছিল মক্ষিরাণী, সুতরাং সমস্ত পথটায় সহযাত্রীরা আনন্দ পেয়েছিল প্রচুর। অতখানি পথ,—মাঝখানে একবার রেলগাড়ী আর দুইবার নৌকা,—কিন্তু একটি কানাকড়িও রাহাখরচ লাগেনি,—হাসনুর মনে সে-আনন্দও ছিল। সমস্ত পথটায় সে গান গেয়েছে প্রাণের উল্লাসে, তাতিয়ে তুলেছে হিরণকে এবং মাতিয়ে তুলেছে আব সবাইকে। ছোট দারোগাব চাকরি জীবন সার্থক, সন্দেহ নেই। আর তাঁর সঙ্গী ওই তিনজন কন্‌স্টেবল্‌,—ওদের তিন-দু'-গুণে ছয়টি মুগ্ধ চক্ষু কী দেখেছিল, বলাই বাহুল্য। হাসনু চিরকালের জন্য ওদের মাথা খেয়ে রাখলো!

হাজিপুরের ঘাটে নামবার আগে হাসনু বলেছিল—যেমন সে চিরকাল ব'লে এসেছে—সংঘাত আর সংগ্রামে আমার সত্য পরিচয় ফোটে। আমি মেয়ে, কিন্তু অবলা নই, আমি জন্ম-যোদ্ধা। ফুলের মালা আমার হাতে দাও, কা'রো গলায় পরাতে গেলে আমার হাত কাঁপবে, তরবারি দাও, হাতে মানাবে। বিরোধ আনো আমার সামনে, আনো ভয় আর বাধা, আনো কাপুরুষতা আর কপটতা,—আমি তাদের প্রতিকার জানি।

হিরণ প্রশ্ন করলো, গায়ের গয়নাগুলো খুলে জলে ফেলে দিয়ে এলি কেন?

হাসনু জবাব দিয়েছিল, ওগুলো বশ্যতা স্বীকারের চিহ্ন। হাতের চুড়ি হোলো স্নেহ-মোহ তার সেবার প্রতীক, গলার হার হোলো মালাবদলের সঙ্কেত, কানের ফুল হোলো লোভের হাতছানি, চোখের সুর্মা হোলো মায়া। আমার জীবনে এর কোনোটাই আমি স্বীকার করিনে।

তবে কিসের টানে তুই সংসারে বাঁধা?

সংসারের টান নয়, টান মনুষ্যত্বের। সংসারের টান হোলো ভালোবাসার,—যার ছোট আশ্রয়ে মানুষ বাসা বাঁধে। মনুষ্যত্বের টান হোলো অনেক বড়—সে ঘুচিয়ে আসে মোহবন্ধন, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে আসে ঘর-গেরস্থালি।

সেই মনুষ্যত্বের চেহারাটা কেমন?

চেহারাটা যদি বাঙ্ময় হয়, ক্ষতি নেই। কীর্তি আর সাফল্য দিয়ে তার বিচার চলবে না—আইডিয়া দিয়ে তার বিচার। তার বিচার সত্যপ্রকাশের দিক দিয়ে। হাসনু বলেছিল, এপারে-ওপারে এই যে লক্ষ লক্ষ নিরুপায় মেয়ে-পুরুষ কাঁদতে বসেছে,—এ কি শুধু সম্পদ্ হারাবার জন্যে? ঘটি বাটি খোয়াবার জন্যে? না, তার জন্য নয়। ওরা মনুষ্যত্বের আইডিয়াটা খুইয়েছে। যে-আলোটা ওরা চোখের সামনে জ্বালিয়ে রেখেছিল যুগ-যুগান্তর, সেই আলোটা ওরা হারিয়েছে চারিদিকে ধুলোয় আর ধোঁয়ায়। ওরা ঘর হারায়নি, পথ হারিয়েছে: বিচার হারায়নি, বিশ্বাস হারিয়েছে।

সন্ধ্যার আগেই ওরা নেমেছিল হাজিপুরের ঘাটে। নামবার সঙ্গে সঙ্গে খবরটা চারিদিকে র'টে যায়, দলে দলে লোক এসে দাঁড়ায় ঘাটের ধারে। ওদেরকে অভ্যর্থনা করার জন্য হাটতলা থেকে বহুলোক আসে,—চাষী, মাঝি, ফড়ে, দোকানকার, ছাত্র, ইত্যাদি বহু শ্রেণীর লোক। এ গ্রামের চলতি জীবনধারা যেন সহসা উদ্বেলিত হয়ে উঠে। জমিদার থাকতেন সাধারণ লোকের নাগালের অনেকটা বাইরে, জমিদারের মেয়ে মীরা থাকতো লোক-চক্ষুর অন্তরালে। কিন্তু ওরা দুজন,—হাসনু আর হিরণ,—ওদের বাসা ছিল গ্রামের হৃদয়ের মধ্যে। জমিদার ছিল আরাধ্য, ওরা ছিল বাঞ্ছিত। জমিদারের প্রতি ছিল শ্রদ্ধা, ওরা পেয়ে এসেছে ভালোবাসা। সেই ভালোবাসা আজ শত শত কণ্ঠে নদীর ঘাটে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল।

খবর পেয়ে হাজিপুর থানার দারোগা একা এসে দাঁড়ালেন। বুড়ো দারোগাকে দেখেই হাসনু আর হিরণ হেসে উঠলো। তিনি এবম্বিধ ব্যাপার দেখে একেবারে হতবুদ্ধি। গ্রামের জামাই আর দিদিমণি গ্রামে ফিরেছে পুলিশের হেপাজতে,—এ দৃশ্য তাঁর কাছে একেবারে অভিনব। হাসনু তাড়াতাড়ি এসে তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, কেমন আছ, দাদু?

বুড়োর নাম হারুমিঞা। ওর ছেলে বাঁচাতে গিয়েছিল জীবেন্দ্রনারায়ণকে গেল বছরে,—কিন্তু আগুনে সে পুড়ে মরেছে। বুড়ো নিশ্বাস ফেলে বললে, এখনও মরি নাই, বুন! ওরে জামাই, মা-বুন্‌রে ফেইলা পালাইছিলি, পোড়ার মুখ লইয়া ফিরিয়া আইলি ক্যান্? একটু শরম নাই?

এ প্রশ্নের কোনো জবাব ছিল না। হিরণ এসে দাঁড়ালো বুড়ো হারুমিঞার পাশে। অনুতপ্ত সন্তান যেমন বৃদ্ধ পিতার কাছে এসে দাঁড়ায়।

গোপালপুরের ছোট দারোগা এসে সমস্ত ব্যাপারটা হারুমিঞাকে বুঝিয়ে দিল। ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই, ওরা ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে ঘুরছিল গ্রাম-গ্রামান্তরে। ওরা কখনো হিন্দু, কখনো-বা মুসলমান। ওদের অভিমত এবং বক্তব্য হোলো পরস্পরবিরোধী, ওরা যে-ডালে বসে সেই ডাল কাটে। ওরা কথার করাত দিয়ে কাটে পাকিস্তান, কাটে হিন্দুস্থান। ওদের সত্যকার পরিচয়টাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ওদেরকে আনা হয়েছে হাজিপুরে, এখান থেকেই ওদের সম্বন্ধে তদন্ত হওয়া দরকার।

হারুমিঞা সমস্ত খবর শুনে সংশয় প্রকাশ ক'রে বললেন, ঘরের ছেলে-মেয়ে ফিরেছে, তদন্ত কিসের? মেয়েটা হোলো এমদাদ আলীর বেটি, আর ছেলেটা হোলো হারাণ চক্কোত্তির বেটা,—গাঁয়ের পুরুত। পীরের দরগায় সিন্নি দিয়ে ছোটবেলা ওর বাপ ওর কালাজ্বর ছাড়িয়েছিল। ওর ঠাকুরদাদা ছিল আমার মাস্টার। আমার গাই গরুর দুধ খেতো ওর মা আঁতুড়ে। আমার বাগানের আম-জাম চুরি ক'রে খেয়ে এই ছেলেমেয়ে দুটো মানুষ,— এদের আবার তদন্ত কি বটে? পাকিস্তানের লগে বুঝি মাইয়া-পোলারে গারদে চালান দিমু? তোমাগো আর কোনো কাম নাই?

ইতিমধ্যে হামিদ সাহেবের কাছে খবর গিয়েছিল রাজবাড়ীতে।

বুড়ো হারুমিঞা ছোট দারোগার দিকে চেয়ে বললেন, আজ রাত্রে তোমরা থাকো এখানে, কাল সকালে উঠে চ'লে যেয়ো? হাসনু আর জামাইয়ের ভার আমি নিলুম। রাজার বাপের আমল থেকে আমি এখানে নোকরি করি, আমি ওদের হাড়হদ্দ জানি। জামাই, মাইয়ারে লৈয়া যা তোর যেখানে খুশি।

বহু লোকজন জড়ো হয়েছিল হিরণ আর হাসনুকে ঘিরে। ওরা এলো বারোয়ারিতলায়, জনতা এলো পিছনে পিছনে। তারা বহুকাল পরে পেয়েছে কাম্যবস্তু; সুতরাং ছাড়তে রাজি নয়। গ্রাম ছিল অন্ধকার, হঠাৎ জ্বলে উঠেছে আলো। ওদের মধ্যেই ছিল সেই জনতার একটা অংশ—যেটা একদা রাজবাড়ীতে আগুন দিয়েছিল। ওরা জনসাধারণ। ওরা ক্ষণমর্ত্তী। আদিম বৃত্তি নিয়ে ওরা ঘর করে। কালাপাহাড় এসে দাঁড়ালে ওরা ক্রোধে উন্মত্ত হয়, তাতার দস্যুর উস্কানিতে ওরা হয় হিংসায় অন্ধ, শ্রীচৈতন্যের অনুপ্রেরণায় ওরা হয় প্রেমে পাগল, রাজনীতিক নেতার প্রচারকার্যের গুণে ওরাই আবার ঘৃণা বিদ্বেষ অভিমানে মেতে ওঠে। ওরা জনসাধারণ,—ওরা শিশুর মতো সরল। শিশুর মতো মূঢ় আর অজ্ঞান।

কিন্তু এই বিশাল জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়েও হাসনুর মন ছিল অন্যমনস্ক। সুমিত্রার কথা সে ভোলেনি। কা'রো মুখে সে এখনও ছোট রাণীর উল্লেখ শোনেনি। হারুমিঞাকে সে মুখ ফুটে জিজ্ঞাসাও করেনি। রাজবাড়ীতে এতক্ষণে তাদের আগমন-বার্তা অবশ্যই পৌঁছেচে, কিন্তু হাসনুর মনে এই প্রত্যাশা ছিল, ছোটখুড়ি সমস্ত বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলে তাদের দুজনকে আমন্ত্রণ ক'রে ঘরে তুলবেন! যদি অত্রি ছুটে আসে ভিড়ের ভিতর থেকে, কিংবা অন্ততঃ যদি আসে ফকিরের মা! এ গ্রামের বাইরে হাসনু হোলো নায়িকা, হোলো সমাজনেত্রী,—কিন্তু গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে সে হোলো শিশুকন্যা, তার কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই, জননী জন্মভূমির কোলে এসে স্বকীয়তা সে হারিয়েছে।

হিরণের প্রতি জনতার সমাদর দেখবার মতো। বহুলোক তাকে নিয়ে লোফালুফি করছিল। রাজকন্যা হবে তার স্ত্রী, আর রাজার সম্পত্তির সে হবে কর্ণধার, কিন্তু তার সেই পরিচয়টা একটা বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর বাইরে হিরণের পরিচয় হোলো, সে সর্বসাধারণের লোক। তার জাত্যাভিমান নেই, কোনো একটা বিশেষ মনোবৃত্তির দাসত্ব সে করে না। তার লোভ নেই ব'লেই স্বার্থরক্ষার দায় নেই। এর মধ্যে পায়ের জুতো জোড়াটা খুলে কা'কে যেন সে দান করেছে, পাঞ্জাবিটা খুলে দিয়েছে যেন কা'র হাতে, পুঁটলির থেকে ফেজ টুপিটা বে'র ক'রে কা'র মাথায় যেন সে পরিয়ে দিয়েছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বহুলোকের অনুরোধে বারোয়ারিতলায় যখন গানবাজনার আসর জমেছে, তখন হামিদ সাহেব এলেন তাঁর দলবল নিয়ে। তাঁর মনে যাই থাক, মুখে ছিল হাসি। রাজার সম্পত্তির তিনি সরকারি অছিদার, তাঁর জিম্মায় আছে রাজবাড়ী আর মালখানা, তিনি এখন কাছারির হর্তাকর্তা,—সুতরাং তাঁর খাতির অন্য রকমের। তিনি এসে পৌঁছতেই হাওয়াটা গেল বদলে, তাঁকে সম্মানের সঙ্গে বিশেষ জায়গায় এনে বসানো হোলো। অমায়িক মৃদুহাস্যে মুখখানা তাঁর প্রসন্ন, কেবল তাঁর জন-কুড়ি অনুচর বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে আসরের একপাশে একটু আড়ালে গা বাঁচিয়ে দাঁড়ালো। তাদের মধ্যে দু' একজন পশ্চিমা লোক, কিন্তু বাদবাকি দেহরক্ষীদের প্রায় সকলেই পাঠান শ্রেণীর মুসলমান,—যাদের আকার প্রকার এবং চেহারার সঙ্গে এ গ্রামের কোনো মিল নেই। হাসনু গান গাইতে গাইতে একবার সমস্তটা দেখে নিল এবং

অলক্ষ্যে হাসনুর মুখের দিকে তাকিয়ে হিরণের মনে কিছু দুর্ভাবনা দেখা দিল। হাসনুর ঈষৎ ভ্রূভঙ্গীর সঙ্গে তাল ভঙ্গ হ'তে-হ'তে প্রায় বেঁচে গেল,—এবং এই ভ্রূভঙ্গীর অর্থ হিরণ জানে। হামিদের এই অমায়িক প্রসন্ন মুখের ছবিতে হাসনু কপটতার রেখা লক্ষ্য করেছে,—এটা হিরণের চোখ এড়ায়নি। সশস্ত্র দেহরক্ষীদেরকে লক্ষ্য করেছে হাসনু তার গানের অন্তরা-তে। হাসনুর প্রাণের দিগন্তে ঝঞ্ঝার রক্তিম নিশানা দেখা দিয়েছে,—এও চোখে প'ড়ে গেল হিরণের।

গানের তারিফ করতে গিয়ে মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল শ্রোতা সাধারণ। হাসনুর সঙ্গীতচর্চার সঙ্গে তাদের পরিচয় অনেক দিনের, কিন্তু এমন গান তারা আগে শোনে নি। সঙ্গে তার কোনো যন্ত্র থাকে না, থাকে না আয়োজন,—যে-কোনো সময়ে এবং যে-কোনো অবস্থায় তার প্রাণের অফুরন্ত প্রাচুর্য কোনো একটা উপলক্ষ্য পাবামাত্র স্বতঃস্ফূরিত হয়ে ওঠে। তার গানের আসর এককালে হঠাৎ ব'সে যেতো হাটতলার বিবাদের মধ্যে, ব'সে যেতো ফসলকাটা মাঠের ধারে। দুঃখীর ঘরে ঢুকে দারিদ্র্যের মাঝখানে ব'সে যেতো আর্তজনের শিয়রে, হয়ত সে ব'সে যেতো সন্তানহারা কোনো বিধবার পাশে। তা'কে এড়াবার যো ছিল না। কিন্তু মীরা এ কাজ পারতো না, মীরার ছিল আনম্র সঙ্কোচ, ছিল মৃদুস্বভাবের স্বল্পভাষণ। যুদ্ধের সজ্জা নিয়ে মীরা কোথাও এগিয়ে যেতে পারতো না, আপন চিত্তের ওজস্বিতার গুণে কারোকে প্রভাবিত করার শক্তি ছিল না তার, বিধিনিষেধের অবরোধকে প্রবল কণ্ঠে অস্বীকার করতে সে ভয় পেতো,—সেইজন্য মীরা পিছিয়ে প'ড়ে থাকতো। হাসনু চাইতো তেজ, বিক্রম, সাহস, বীর্য, বলিষ্ঠতা; মীরা চাইতো সংস্কৃতি, সংশিক্ষা, সৌজন্য, শান্তি, আনন্দ। মীরা চাইতো বিরোধের মীমাংসা, হাসনু চাইতো নারী-সমাজের পরিবর্তন, হাসনু চাইতো নারী-জগতের বিপ্লব। মীরা চাইতো বুদ্ধির সংস্কার, হাসনু চাইতো দুর্বুদ্ধির সংহার। মীরার মন ছিল বিন্যাসে, হাসনুর মন ছিল বিদ্রোহে। মীরা বলতো বিশ্বসৃষ্টি আনন্দময় হোক। হাসনু বলতো, বসুন্ধরা হোক্ বীরভোগ্যা।

গান যখন থামলো, রাত তখন এগারোটা বেজে গেছে। কার্তিক মাসের হিম, তবু লোকের ভিড় এতক্ষণ ধরে বেড়েই চলেছিল, বহুলোক মাথায় মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্থানীয় থানায় লোকজন নিয়ে হারুমিঞা বসে ছিলেন একপাশে। তাঁর সঙ্গে ছিল গোপালপুর থানার লোকেরা। একপাশে শান্তভাবে হামিদ সাহেব অপেক্ষা করছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল হিরণ আর হাসনুর প্রতি।

আসর ভাঙার পর হামিদ সাহেব এগিয়ে এসে হারুমিঞাকে ডাকলেন। বুড়ো কাছে এসে দাঁড়াতেই হামিদ বললেন, ওদের কি বন্দোবস্ত করছেন আপনি?

হামিদের মনোভাব অনেকটা হারুমিঞার জানা ছিল, কেন না হামিদ গত কয়েকমাসের মধ্যে অনেকবার থানায় এসে হাসুবানুর সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করতেন। হারুমিঞা বললেন, কেমন বন্দোবস্ত হ'লে আপনি খুশি হন্?

ওরা কি এখানে ছাডা থাকবে?

ওদের দেশে ওদেরকে বেঁধে রাখতে যাবো কেন?

হুঁ।—হামিদ কি যেন কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করলেন। পরে বললেন, কিন্তু ওদের কার্যকলাপে পাকিস্তানের লোকসান হতে পারে ত'?

হারুমিঞা একবার হামিদ সাহেবের আপাদমস্তক লক্ষ্য করলেন। পরে বললেন, আপনি কি চাংড়া-চাংড়িকে থানায় বাইন্ধা থু'তে ক'ন্?

হামিদ সাহেব যুক্তিসহকারে বললেন, হাসুবানু চলুক রাজবাড়ীতে আর হিরণ না হয় থাক আপনার জিম্মায়?

ক্যান্?

রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য।

হারুমিঞা বললেন, আর আমার নিজের নিরাপত্তাটা? 'পোলারে' থানায় ধ'রে রাখবো, আর গাঁয়ের লোক আমাকে ধ'রে পিটুনি দেবে না? থানা জালিয়ে দেবে, হাটে দাঙ্গা বাধাবে, আমাগো ঘরের মাইয়া-ছাওয়ালরে বেইজ্জত করবে,—এই আপনি চান? আমার প্রাণডা যাইলে পাকিস্তানের লগে কোন্ কলাটা?

এবার হামিদ সাহেব হারুমিঞার দিকে আপাদমস্তক তাকালেন। কিন্তু ভিতরের রুদ্ধ আক্রোশ বাইরে তিনি প্রকাশ পেতে দিলেন না। শুধু মুখে বললেন, কিন্তু ওদের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আছে, আপনার নিশ্চয় জানা উচিত।

হারুমিঞা একবার গোপালপুরের দারোগার দিকে তাকালেন। দারোগা বললেন, আমাদের কাগজপত্র আপনাদের দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে যেতে পারলে আমাদের আর দায়িত্ব নেই।

হামিদ বললেন, ওরা তবে থাকবে কোথায়?

হারুমিঞা বললেন, ওই যে আসছে ওরা, আপনি জিগান্।

হাসনু আর হিরণ এসে সামনে দাঁড়ালো। হাসনু বললে, দাদু আমরা থাকবো কোথায় বললে না ত'?

হারুমিঞার বদলে হামিদ সাহেব জবাব দিলেন। বললেন বেয়াদপি মাপ করবেন। আমি আপনাকে রাজবাড়ীতে নিয়ে যেতে এসেছি।

হাসনু মুখ তুলে বললে, আপনি কে?

আমি ছোটরাণী সাহেবার প্রতিনিধি। তিনি আপনাকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছেন।

হাসিমুখে হাসনু বললে, আমাকে নিয়ে যাবার জন্য কি ওই সশস্ত্র পাঠানের দল তাঁরই পাঠানো?

হামিদ বললেন, ওরা রাজবাড়ীর পাহারাদার। আপনাকে সরকারীভাবে খাতির করার জন্যে ওরা এসেছে।

হাসনু হঠাৎ হিরণের দিকে তাকালো। বললে, ব্যাপারটা যেন কেমন লাগছে, না রে জামাই?

হিরণ জবাব দিল, মন্দ কি, ভালোই লাগছে।

বেশ ঘোরালো, না?

রাজকীয়!—হিরণ জবাব দিল।

হামিদের দিকে ফিরে হাসনু সহাস্যে প্রশ্ন করলো, ক্ষমা করবেন, আপনার নাম কি?

ঈষৎ আহত কণ্ঠে হামিদ বললেন, আমার নামটা কি আজো আপনার কানে ওঠে নি?

কই, শুনিনি, ত'?

হিরণ বললে, ওঁর নাম মিঃ হামিদ আলি। উনি এখন কাকাবাবুর জমিদারীর অভিভাবক। উনি সমস্তই দেখাশোনা করেন।

হারুমিঞা বাকি কথাটা যুগিয়ে দিলেন, সেরেস্তা কাছারিতে তুই যা করেছিস্, উনি এখন তাই করেন।

হাসুবানু বললেন, শুনে খুশি হলাম। যোগ্য ব্যক্তি সন্দেহ নেই। ওঁর বেতনাদি কত, দাদু?

বুড়ো হারুমিঞা চটে উঠলেন, বললেন, তোর সে খবরের দরকার কি? ব্যাতন তুই যোগাবি? উনি যা ব্যাতন পান্ তা তোর বাপ-দাদায় শোনে নাই। নগদ আড়াই হাজার, তার ওপর পাঁচশো টাকা মাগ্‌গি ভাতা। শুনেছিস্ কখনো?

হাসনু বললে, এমন কিছু বেশি নয় দাদু। কিন্তু টাকাটা দেয় কে? জমিদার, না সরকার?

হিরণ বললে, তোর যত আজগুবি কথা। জমিদারের সম্পত্তি দেখাশোনা করবেন উনি, আর টাকা জোগাবে সরকার?

কঠিন মুখখানা হাসনু কিয়ৎক্ষণ নত ক'রে রাখলো। তারপর মুখ তুলে বললে, আর ওই পাহারাদারদের খরচ?

হামিদ জবাব দিলেন, ওটাও জমিদারের খরচ।

এতে ছোটরাণীর সম্মতি আছে?

হামিদ এবার একটু হাসলেন। বললেন, আছে বৈ কি?

জনতার ভিড় তখনো সকলকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। সেইদিকে একবার তাকিয়ে হাসনু বললে, আচ্ছা চলুন তবে।

ভিড়ের ভিতর থেকে কয়েকজন ডাকলো, দিদিমণি!

হাসনু মুখ ফিরিয়ে হাসলো। কী মধুর সুন্দর হাসি তার! বললে, ভয় নেই রে, এখন আর আমি কোথাও যাবো না।

লুকিয়ে চ'লে যাবে না ত'?

ছি, নিজের দেশ ছেড়ে যাবো কোথায়? আমরা থাকতে এলুম এখানে। চলুন হামিদ সাহেব।

পেট্রোম্যাক্স আলোটা নিয়ে কয়েকটি লোক পথ দেখিয়ে আগে আগে চলেছে। কিছুদূর গিয়ে হামিদ বললেন, আপনার বন্ধু হিরণবাবুকে ছোট-রাণীসাহেবা যেতে বলেন নি।

হাসনু ঘুরে দাঁড়ালো,—তার মানে?

উনি বাইরের লোক আছেন কিনা।

বিষধর সর্প এবার তার ফণা তুললো? বললে, মিস্টার হামিদ, সত্যি বলতে কি, আপনি ছাড়া এ গ্রামে আর কোনো বাইরের লোক নেই। গোড়া থেকে আমি জানি, ছোটরাণীর জবানিতে আপনি নিজের কথাই বলছেন। মনে রাখবেন, আমি মেয়েমানুষ, কিন্তু ছেলেমানুষ নই!

হাসনু ঠকঠক ক'রে রাগে কাঁপছিল।

হামিদ বললেন, হিরণবাবু কোন্ সুবাদে রাজবাড়ীতে গিয়ে ঢুকবেন?

হাসনু আত্মসম্বরণ ক'রে বললে, আমি কোন্ সুবাদে সেখানে যাচ্ছি, মিঃ হামিদ। আপনি কি জানেন, আমার চেয়ে হিরণবাবু ছোটরাণীর বেশি আপন? আপনি কি জানেন, আমরা একই পরিবারের লোক? একই সঙ্গে মানুষ?

হামিদ একটু থতমত খেয়ে চুপ ক'রে রইলেন। এই বাঙলা মুলুকটা নিয়ে পাকিস্তানরাজের যত ঝামেলা! এখানে হিন্দু আর মুসলমানকে চেনবার উপায় নেই। এমনভাবে এই বোকারা পরস্পর জড়িয়ে থাকে যে তফাৎ করা যায় না। একজনের কান ধ'রে টানলে আরেকজনের মাথা স'রে আসে!

হিরণ বললে, কোন সমস্যাই দেখা দিত না—আসবার সময় মীরার সঙ্গে একগাছা মালা বদল ক'রে এলেই ল্যাঠা চুকে যেতো! ছোটখুড়ির সঙ্গে আমিও তোকে নেমতন্ন ক'রে পাঠাতে পারতুম!

হামিদের একেবারেই ইচ্ছা নয় যে, দ্বিতীয় কোনো পুরুষ রাজবাড়ীতে গিয়ে ঢোকে। তিনি বললেন, আপনার বাড়ী কোথায়, হিরণবাবু?

বাড়ী? বাড়ী এই গাঁয়ে।

না, না—আপনার ঘর কোথায়?

হিরণ জবাব দিল, বছর কুড়ি আগে নদীর ধারে দু'খানা চালা কাৎ হয়ে ছিল, একটু একটু মনে পড়ে। এখন সেখান দিয়ে নদী বয়, বুঝলে সাহেব?

কথা বলতে বলতে বক্সিদের বাগান পেরিয়ে সবাই মিলে এসে পড়েছিল নদীতে যাবার কাঁচা রাস্তাটায়। সশস্ত্র পাঠানের দলটা আসছিল পিছনে। হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে হিরণ ডাকলো, দাদি? জেগে আছ নাকি?

পাশেই ফকিরের মায়ের ঘর। ভিতর থেকে সাড়া এলো, কে গো!

আমি জামাই।

খটাং ক'রে দরজা খুলে ফকির আর তার মা বেরিয়ে পড়লো। জামাই গিয়ে উঠলো সোজা দাওয়ার ওপর। তাকে দেখে ফকিরের মা হাঁকপাক ক'রে উঠলো আনন্দে। বললে, ওমা চান্দমন যে? খবর আমি পাইছি! খাইছিস কিছু?

না, খাইনি! ভাত দেবে নাকি?

হ্যাঁ, দিমু। তোদের ভাত তোরাই খাবি, আমি কোন্ কর্তা? আয়, ব'স ঘরে।

হিরণ বললে, হাসনুকে দেখেছ? ওই যে দাঁড়িয়ে।

অদূরে দাঁড়িয়ে হাসনু হাসছিল। ফকিরের মা ওকে দেখে আনন্দে কেঁদেই ফেললো। কাঁদতে কাঁদতে বললে, সর্বনাশি, আমাগো ভুইল্যা ছিলি এদ্দিন, তোর মায়া দয়া নাই—তুই—ডাইনি—তুই—

ফকিরের মা আলুথালু হয়ে এসে হাসনুকে জড়িয়ে ধ'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। কান্না ছাড়া তার আর কোনো ভাষা ছিল না। হিরণ একধারে গিয়ে ফকিরের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইলো। হামিদ ভ্রূকুঞ্চন ক'রে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালেন।

কান্নাকাটি থামবার পর ফকিরের মা বললে, চারটি খেয়ে যা তোরা আমার ঘর থেকে। আমার কথা শোন্—

বেশ, ভাত চাপিয়ে দাও। কতকাল তোমার ঘরে খাইনি, দাদি।

ফকিরের মা ছুটতে ছুটতে ভিতরে চ'লে গেল!

হামিদ এবার একটু আপত্তি জানিয়ে বললেন, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, বেগমসাহেবা।

হাসনু বললে, আপনি যেতে পারেন মিঃ হামিদ। আমার রাস্তা আমি ঠিক চিনে যাবো।

লেকিন্ রাণীজির ওখানে আপনার খাবারের বন্দোবস্ত ছিল। তিনি অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে। তা'ছাড়া রাতও হয়েছে।

হাসনু একটু হাসলো। বললে, মিঃ হামিদ, রাণীজি আমার জন্যে একটুও ব্যস্ত নন, আমি জানি। সে অনেক কথা। রাণীজিকে আপনি গিয়ে বলুন, রাজবাড়ীর খাবারের চেয়ে এই ঘরামির ঘরের ভাত আমার কাছে অনেক দামী। তবুও যদি আপনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চান তবে এখানে অপেক্ষা করুন, আমি খেয়ে-দেয়ে যাব।

হামিদ বললেন, আর একটা কথা আপনি কি জানেন, এই মাগি হলো পাকিস্তানের দুশমন?

কে?

এই আপনার ফকিরের মা। এর শয়তানী আমি জানতে পেরেছি।

হাসনু একবার স্পষ্ট ক'রে হামিদের দিকে প্রসারিত দৃষ্টিতে তাকালো। পরে বললে, এই বিচারবুদ্ধি নিয়ে আপনি এদেশে এসেছেন চাকরি করতে? আপনাদের হাতে পাকিস্তান বাঁচলে হয়!

এক ঝলক হাসি হেসে হাসনু ভিতরে চ'লে গেল।

শিকারীরা জানে, রাত্রিকালে কোনো অরণ্যে বাঘের চোখের ওপর আলো পড়লে দেখা যায়, তার চোখ দুটো রক্তিম। চোখের এই বর্ণ অন্য কোনো জন্তুর নেই। হামিদের মুখের ওপর পেট্রোম্যাক্স থেকে যে-আলোটা এসে পড়েছিল, তা'তে কেউ সামনে এসে দাঁড়ালে দেখতে পেতো দুটি চোখের তারা দিয়ে তাঁর যেন রক্ত ঝরে পড়ছিল। কিন্তু তিনি স্বভাবসংযত লোক; এটি সুমিত্রার সামনে অনেকবার প্রমাণিত হয়েছে। ভিতরে তার যত প্রচণ্ড ঘৃণা অথবা ক্রোধ জ'মে উঠুক বাইরে তিনি সহজে তা প্রকাশ পেতে দেন না। তার স্বভাবের পরিচয়টা হোলো কর্মকুশলতায়, কিন্তু বাকবহুলতায় নয়। মনে হচ্ছিল, তার দলের লোকজনের সামনে তার ন্যায় একজন সম্ভ্রান্ত কর্মচারীর কিছু অসম্ভ্রম ঘটেছে, সেইজন্য তিনি সেই অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে ঠকঠক ক'রে কেঁপেছিলেন। এই মেয়েটার সম্বন্ধে যতখানি রিপোর্ট তার দপ্তরে এসে অদ্যাবধি জমা হয়েছে, তা'তে কেবল এইটুকু বোঝা যায় যে, এ মেয়েকে

বলপ্রয়োগ দ্বারা বশ্যতা স্বীকার করানো চলবে না, একে ছলে ও কৌশলে করায়ত্ত করা দরকার।

সুতরাং মিঃ হামিদকে ওখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকতে হোলো এবং জনচারেক সশস্ত্র প্রহরীকে কাছে রেখে বাকিগুলিকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন। এখানে এই কাঁচা রাস্তার ওপর মশার উৎপাত সহ্য ক'রে দাঁড়িয়ে থাকাটা তার পক্ষে অসম্মানজনক, এ তিনি জানেন। যে ফকিরের মাকে তিনি রাজবাড়ীতে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন, সে হোলো এক নোংরা চাষী মুসলমানের মেয়ে,—তার দরজার সামনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকাটা যে সম্ভ্রমবোধবিরোধী,—এ ত তিনি বেশ বোঝেন। কিন্তু হাসুবানুকে সঙ্গে ক'রে না নিয়ে গেলে তার চলবে না। এ অঞ্চলের মুসলমানের প্রতি তাব শ্রদ্ধা কম, এদের জাতিধর্মের কোনো নির্দিষ্ট নিরিখ্ নেই, এদেব চরিত্রনীতিব কোনো আভিজাত্য নেই,—এবং হাসুবানু এদেব একজন। এরা হিন্দুর সঙ্গে জড়িযে থাকে, হিন্দুর কথায় ওঠে বসে, এরা হিন্দুদের পুতুলপূজোয আর উৎসবে নিজেদের গা ঢেলে দেয় এবং আপদে বিপদে এবা মুসলমান সমাজকে কলা দেখিয়ে যে হিন্দুদের সঙ্গে গলাগলি করতে ছোটে, এর প্রমাণ অনেকবাব পাওয়া গেছে। হামিদ জানেন, পাকিস্তানের দুর্বল অংশ হোলো এই পূর্ববঙ্গ,—কেননা এটা বাঙ্গালী মুসলমানের দেশ। আর বাঙ্গালীরা যে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্যই দুনিয়ায় বেঁচে থাকে,— দুনিযাব তামাম মুসলমান জাতি একথা জানে।

ঘবের ভিতব থেকে উচ্চকণ্ঠেব হাসি তামাসা ও কলরবের ধ্বনি বাইরে এসে হামিদের কানে তীরের মত বিঁধছিল। কিন্তু এখানে তাঁকে দাঁড়িযে থাকতেই হবে, কেন-না মেয়েটাকে তিনি বিশ্বাস করেন না। তাঁর রিপোর্টে আছে, মেয়েটা বশীকবণ জানে, ধাপ্পা দিয়ে পালাতে জানে, বস্তুরূপ ধাবণ করতেও নাকি তার জুড়ি নেই। কোনোমতে রাজবাড়ীতে নিযে গিয়ে ঢোকাতে পাবলে সুমিত্রার সাহায্যে তিনি একে বাগ মানাতে পাববেন বৈ কি। যে দলটা আজ এই মেয়েটাকে কেন্দ্র ক'রে নানা জেলায় রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্ত গ'ড়ে তুলেছে সেই ষড়যন্ত্রটাকে যদি সমূলে ধ্বংস করতে তিনি পারেন, যদি প্রত্যেকটি অপরাধী তার জালে ধরা পড়ে, তবে অন্তত একটা জেলার কর্তৃত্ব তার ভাগ্যে জুটবে বৈ কি। তখন একবার দেখে নেওয়া যাবে এই দেশী চাষী জাতটাকে! জেনে নেওয়া যাবে বাঙ্গালী মুসলমানের জাতজন্মের আসল খবরটা!

এমন সময় ছুটতে ছুটতে দু'টি সেপাই অন্ধকারে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকলো, হুজুর—

দু'পা এগিয়ে হামিদ প্রশ্ন করলেন, কেয়া?

বহুৎ বুরা খবর হ্যায়, হুজুর!

হঠাৎ রুষ্টকণ্ঠে বললেন, কহো কেয়া?

রাণীজিকো মিল্‌তে নেহি ঘরমে! পাতা নেহি কাঁহা গিয়া!

হামিদ উত্তেজিত হয়ে বললেন, ঝুটমুট ক্যা কয়তা তুম?

হুজুর আল্লা-কসম্‌!

তাজ্জব! ই কৈ ধোকেবাজি হ্যায়?—হামিদ বললেন, দো আদমি হিঁয়া রহো, বাকি আও মেরে সাথ!

হামিদসাহেব হন হন ক'রে রাজবাড়ীর তোরণের দিকে অগ্রসর হলেন। যারা সুমিত্রার অদৃশ্য হওয়ার সংবাদ এনেছিল, তারাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চললো।

ঘণ্টাখানেক পরে হামিদ সাহেব আবার হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলেন। উজ্জ্বল আলোটা সামনে রেখে এবার তিনি নিজেই ফকিরের দাওয়ায় উঠে দরজায় ধাক্কা দিলেন। ভিতর থেকে দরজা খুলে সামনে দাঁড়ালো হাসুবানু।

হামিদ প্রশ্ন করলেন, আপনাদের খানা পিনা হয়ে গেছে?

হ্যাঁ—হাসনু জবাব দিল, আজ আমরা এই ঘরেই থাকবো, মিস্টার হামিদ।

হামিদ উত্তেজনা দমন ক'রে বললেন, সে আমি জানি। কিন্তু একটা খবর আছে, বেগমসাহেবা। আপনাদের ভালোমন্দ সেই খবরের ওপর নির্ভর করে।

কি বলুন?

আমার সঙ্গে যারা দুষমনি করতে চায়, পাকিস্তানরাজ তাদেরকে সমস্ত শক্তি দিয়ে সায়েস্তা করবে, একথা আমি জানাতে এসেছি। আমি পাকিস্তান-রাজের প্রতিনিধি।

হাসুবানু ঘরের ভিতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালো। তারপর বললে, এই চোখ লাল করার মানে কি, হামিদ?

তৎক্ষণাৎ হামিদও সম্ভাষণের ভাষাটা বদলে দিলেন। বললেন, আমি এর মধ্যে ষড়যন্ত্র দেখতে পাচ্ছি, বেগম।

হাসনু বললে বড় বড় কথা তোমার মুখে বেমানান। আসল বক্তব্যটা শোনাও, আমার ঘুম পেয়েছে।

হামিদ বললেন, ছোটরাণীজি এঘরে এসে উঠেছেন কিনা জানতে চাই।

বেশ, ভেতরে ঢুকে ভালো ক'রে দেখে নাও।

হিরণ মুখ তুলে হামিদের দিকে তাকালো। ফকিরের মা আতঙ্কিত চক্ষে হামিদকে একবার লক্ষ্য ক'রে একপাশে স'রে গেল।

হামিদ সাহেব ভিতরে ঢুকে অবশ্য সুমিত্রাকে খোঁজাখুঁজি করবার চেষ্টা করলেন না, কিন্তু মুখে বললেন, ঠিক বলছো এখানে তিনি নেই ?

হাসনু বললে, হামিদ, আমাদের ধৈর্যের সীমা আছে! তোমাকে এমন কিছু মস্ত লোক মনে করিনে, যার জন্যে মিছে কথা বলবো।

এবার হিরণ এসে উভয়ের মধ্যে দাঁড়ালো। বললো, মিঃ হামিদ, ব্যাপার কি বলুন ত' ?

উত্তেজিত মুখখানা হিরণের দিকে ফিরিয়ে হামিদ বললেন, রাণীজিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!

নাই বা পাওয়া গেল। আপনার কী ক্ষতি ?

তিনি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা,—তাঁর প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব আছে, তা জানেন ? যদি তাঁর কোনো বিপদ ঘটে তবে হিন্দু কাগজওয়ালারা পাকিস্তানের বদ্‌নাম রটাবে—এ কি বোঝেন আপনারা ? আমি সমস্ত রাত ধ'রে এই গ্রাম তোলপাড় করবো। তারপর হেড কোয়ার্টার্সে খবর পাঠাবো!

হাসিমুখে হিরণ বললে, মনে হচ্ছে তিনি আপনার বন্দী ছিলেন ?

একেবারেই না। আমি তাঁর প্রজা, তিনি জমিদার।

হাসনু বললে, সিংহাসনখানা তিনি ফিরে পেয়েছিলেন কি ?

হামিদ কোনো জবাব দিলেন না, উত্তেজনা আর দুর্ভাবনায় তাঁর মাথার ঠিক ছিল না। কেবল বললেন, আজ তুমি কেন যাবে না, জানতে পারি কি ?

এবার হাসুবানু নিজের ভাষাটাই প্রয়োগ করলো। প্রশ্ন করলো, তুমি কি রাজবাড়ীতে সপরিবারে আছো, হামিদ ?

না, আমি একা থাকি। লেকিন এসব কৈফিয়ৎ দিতে আমি রাজি নই।

হাসনু হাসলো। বললে, অর্ধেক রাত্রে তুমি রাণী খুঁজতে বেরিয়েছ, তুমি একজন মান্যগণ্য অবিবাহিত,—এতে কি পাকিস্তানের বদনাম হবে না ?

হামিদ বললেন, এটা তোমার বেয়াদপির কথা, বেগম।

তবে আরেকটু বেয়াদপি করি। এবার বোধ করি নাকের বদলে নরুন চাইতে এসেছ তুমি ? ওই শূন্য রাজবাড়ীতে এই রাত্রে একটি মুসলমান যুবতীকে না নিয়ে গেলে তোমার আর চলছে না, কেমন ?

হামিদ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন কতক্ষণ। তারপর একবার কঠোর দৃষ্টিতে অলক্ষ্যে তাকিয়ে বললেন, আমি চলে যাচ্ছি। লেকিন আমি জানি রাজ-বাড়ীতে ঢোকবার ভয় আছে তোমার!

সশস্ত্র লোকজন আশপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদেরকে ডেকে নিয়ে, হামিদ সাহেব দু'পা অগ্রসর হ'তেই হাসনু এবার জবাবটা দিল,—বাঘের

খাঁচায় ঢুকতে সবাই ভয় পায়, মিস্টার হামিদ। কিন্তু ভয় পায় না সে, কে জানো ?

হামিদ ফিরে তাকালেন।

তীক্ষ্ণ হাসি হেসে হাসনু বললে, খাঁচায় ঢুকে সার্কাসের বাঘকে যে খেলিয়ে বেড়ায়! সেই খেলোয়াড়ের হাতে কি থাকে দেখেছ কখনো ?

আগুনের ফুল্কির মতো হামিদ একটু হাসলেন! বললেন, মাই ডিয়ার বেগম, এ বাঘ ভারতের পোষমানা অহিংস জানোয়ার নয়, এ বাঘ পাকিস্তানের,—মনে রেখো।

হাসনু বললে, হ্যাঁ, চোখে দেখছি বটে। তোমার আচরণেই তার প্রমাণ। একথা জানি, পাকিস্তানের বাঘ শুধু ভয় দেখাতেই জানে, জানে শুধু দাঁত দেখাতে—! কিন্তু মাথা তুলে যদি কেউ দাঁড়ায় তার সামনে, তবে হঠাৎ সেও অহিংস হয়ে ওঠে। শুধু কেবল তার ল্যাজের ঝাপটে ধুলো ওড়ে।

হাসনু এসে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। হিরণ বললে, চমৎকার! ছোটখুড়ি ধুলো দিয়েছে চোখে খুব!

হাসনু হেসে গড়িয়ে পড়লো। বললে, ভানুমতীর খেল!

হামিদ সাহেব আস্তে আস্তে দাওয়া থেকে নেমে লোক-জন নিয়ে চ'লে গেলেন। সমস্ত অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস, ঘৃণা আর আক্রোশের মধ্যে এই অভিমতটি তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন, এ মেয়ে আর যাই করুক, ভয় পেয়ে পালাবে না। এর চেহারায়, চক্ষে, বাহুতে এবং স্বাস্থ্যশ্রীতে একটি কথা লুকোনো আছে, বশ্যতা স্বীকারের জন্য এর জন্ম হয়। এ মেয়েকে সুমিত্রা মনে করা চলবে না।

ঝড়ের সূচনা রইলো সামনে এবং পিছনে, এপাশে আর ওপাশে! হামিদ সাহেবের তীব্র তীক্ষ্ণ দুই চক্ষু অন্ধকারকে সূচীবিদ্ধ করতে করতে এগিয়ে চললো।

সুমিত্রার সমস্ত গল্পটা ফকিরের মায়ের মুখ থেকে হাসনু রাত জেগে শুনে নিয়েছিল। সুমিত্রার দারিদ্র্য, অনাহার, অসম্মান,—এমন কি হামিদকে স্বহস্তে সুমিত্রার রেঁধে খাওয়ানোর ইতিহাসটাও। তিনি শূন্য সিংহাসন দখল করতে এসেছিলেন, এসেছিলেন হৃতরাজ্য পুনরধিকার করতে, এসেছিলেন কুলতিলক অত্রিকে মানুষ ক'রে তুলতে। হাসনু একে একে মন দিয়ে শুনে গিয়েছিল একটির পর একটি। হামিদ চরিত্রের নিখুঁৎ চিত্রটি মনের মধ্যে সে এঁকে নিয়েছিল।

যাবার সময় সুমিত্রা ফকিরের মায়ের হাতে যে-চিঠিটি হামিদের নামে রেখে গিয়েছিলেন, সে-চিঠিও এলো হাসনুর হাতে। ভাষাটা ইংরেজি।

বক্তব্যটা হোলো এই: ক্ষমা করবেন, আপনাকে না জানিয়ে বিশেষ কারণে এখনই আমি চ'লে যাচ্ছি। তবে আপনার প্রস্তাবটিতে আমার কিছু নৈতিক আপত্তি থাকলেও আমার নিজের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই আমি একবার বিবেচনা ক'রে দেখবো। আপনাকে যথাসময়ে জানাবো। ইতি সুমিত্রা!

হিরণ বললে প্রস্তাবটা আবার কি রে? শুনলে ভাবনা হয় যে!

হাসনু কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। পরে বললে, তুই কিছু শুনেছিস্ দাদি?

ফকিরের মা বললে, কেমন ক'রে শুনবো? শেষের দিকে কি আমাকে রাজবাড়ীতে ঢুকতে দিত?

হাসনু আরো অনেকপ্রকার প্রশ্নের অবতারণা করলো। কিন্তু অনেক কথার জবাব ফকিরের মাও দিতে পারলো না। এক সময় হিরণ বললে, তুই কি এখানে এলি ছোটখুড়ির পেছনে গোয়েন্দাগিরি করতে?

না—হাসনু বললে, ওই লোকটাকে আমার জানা দরকার সব দিক থেকে। ছোটখুড়িকে লোকটা উপোস করিয়ে রেখে কোন্ প্রস্তাবে রাজি করাতে চেয়েছিল, এটা জেনে রাখতে চাই বৈ কি। সম্পদ আর সিংহাসনের ওপর ছোটখুড়ির অন্ধ লোভ আমি ভুলিনি, জামাই! হামিদ এমন কী প্রস্তাব তুলে ধরেছিল তার সামনে? কী এমন প্রস্তাব যা'র জন্য নৈতিক আপত্তি ওঠে?

হিরণ বললে, তুই কি হামিদের নৈতিক চরিত্রের ওপর কটাক্ষ করতে চাস?

কটাক্ষ ত' করিনি, খোঁজখবর নিচ্ছি!

একজন অবিবাহিত সুদর্শন মুসলমানের চরিত্রতত্ত্বের খোঁজখবর নেওয়া'র পিছনে তোর মনস্তত্ত্বটা কি, ভেবে দেখেছিস?

হিরণের বাঁকা কথায় হাসনু হাসলো। তারপর বললে, ছোটখুড়ি একদিন রাগ ক'রে আমার ওপর যে-সন্দেহটা করেছিল, এবার কিন্তু সেই মতলবটা হাসিল করার সুযোগ!

ভ্রূকুঞ্চন ক'রে হিরণ্ বললে, অর্থাৎ?

হাসনু আবার হাসলো। বললে, জ্যাঠামশায়ের সম্পত্তিটা এবার যদি আমি দখল করি, বাধা দেয় কে?

হিরণ বললে, পাকিস্তানী আইনের বাধা পাবি।

পাকিস্তানের আইন!—হাসনু উচ্চকণ্ঠে পুনরায় একচোট হেসে নিল।

তারপর বললে, এ কি কাফেরের দেশ যে, কথায়-কথায় আইন? আইনের সৃষ্টি দুর্বলের জন্যে, যুক্তিবাদীদের জন্যে! ইসলামী রাষ্ট্রে ইচ্ছাই হোলো আইন! আমি যদি হামিদকে বিয়ে ক'রে সিংহাসনে বসি, আমাকে হটায় কে? মুসলমান গণতন্ত্রকে ডেকে বলবো যে, এটা ইসলামের নির্দেশ! বলবো যে, কোরানে এই আচরণের নির্ভুল সমর্থন আছে!

পবিত্র কোরান তুই পড়েছিস? হিরণ প্রশ্ন করলো।

হাসনু বললে, দাঙ্গা বাধলেই কোরান পড়বার ইচ্ছে হোতো। কিন্তু ভাগ্যি পড়িনি?

কেন?

কোরান পড়লেই মনে ভালোবাসা জাগে রে! আর ভালোবাসা জাগলেই ত' দুই রাষ্ট্রের ক্ষতি! ঘৃণা আছে বলেই ত' দুই রাষ্ট্র পৃথক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! কোরান মানে মিলন, পাকিস্তান মানে বিচ্ছেদ!

হিরণ বলল, দাঁড়া, আসল কথাটার থেকে স'রে যাসনে। দেখা যাচ্ছে ছোটখুড়ি কেটে পড়েছে, মীরা ঝরে পড়েছে,—আর অত্রিটা হোলো নাবালক! তুই এখন দিব্যি এই ঘোলা জলে মাছ ধ'রে নিতে পারিস!

হামিদের সঙ্গে আমার মিলবে মনে করিস?

হিরণ বললে, একেবারে রাজযোটক!

হাসনু বললে, আগে কথা দে, তুই আমার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী হ'বি?

সেক্রেটারী হ'তে পারি, কিন্তু প্রাইভেট্ নয়!

শুধু কি কমরেড হ'য়ে থাকবি?

সর্বনাশ, পাকিস্তানে ও-শব্দটা উচ্চারণ করিসনে!

হাসনু বললে, কিন্তু তোকে ছাড়লে হয়ত মীরার চলবে, আমার ত' চলবে না' কমরেড!

হিরণ বললে, ছাড়তে হবে না, আমি চাইবো ছাড়া থাকতে। তোব গুলবাগিচাব ভার নোবো আমি "দেবী, আমি তব মালঞ্চের হবো মালাকর!"

হাসনু সহাস্যে বললে, "মালাকর?"

"ক্ষুদ্র মালাকর! অবসর লব সব কাজে!"

"ওরে তুই কর্মভীরু অলস কিঙ্কব, কী কাজে লাগিবি?"

"অকাজের কাজ যত, আলস্যেব সহস্র সঞ্চয়। শত শত আনন্দের আয়োজন!"

"কী লইবি পুরস্কার।"

হিরণ আবৃত্তি করলো, "প্রত্যহ প্রভাতে ফুলের কঙ্কন গড়ি কমলের পাতে

আনিব যখন, পদ্মের কলিকাসম ক্ষুদ্র তব মুষ্টিখানি করে ধরি মম আপনি পরায়ে দিব,—এই পুরস্কার !"

হাসনুর চোখ দুটো টসটসে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। তৎক্ষণাৎ সে জবাব দিল, "ভৃত্য, আবেদন তবে করিনু গ্রহণ !...তুই থাক্ চিরদিন স্বেচ্ছাবন্দী দাস, খ্যাতিহীন কর্মহীন , রাজসভা-বহিঃপ্রান্তে রবে তোর ঘর, তুই মোর মালঞ্চের হ'বি মালাকর !"

পোঁটলা পুঁটলী সঙ্গে নিয়ে ওরা ফকিরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ফকিরের মা ভয়ে-ভয়ে চললো ওদের সঙ্গে সঙ্গে। বলা বাহুল্য, নিজেদের ভাগ্যটা ওরা অনির্দিষ্টের হাতে ছেড়ে দিতে একটুও প্রস্তুত নয়। ওই গোলপাতার দরিদ্র গৃহসজ্জার মাঝখানে ব'সে ফকির আর ফকিরের মাকে নিয়ে তা'রা ভুরি-ভোজন সেরে নিয়েছে। পাঁচশো টাকার তোড়াটা রয়ে গেছে হিরণের কাছে, এবং হাস্নুবানুর কাছে তার চেয়ে অনেক বেশি।

সকলের দিক থেকে খবরটা আরো বেশি রটনা রয়ে গেছে। এ অঞ্চলে হিরণ আর হাস্নুবানুর সশরীরে উপস্থিতিটা স্বচক্ষে না দেখে যারা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নয়—এমন অনেক মেয়ে-পুরুষ এসেছে আশপাশের গ্রাম থেকে। অনেকে উৎসাহিত হ'য়ে ওদের জন্য এনেছে নমস্কারী টাকা, অনেকে বা এনেছে নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী। সুতরাং ওরা দুজন ফকিরেব মাকে নিয়ে যখন রাজবাড়ীর দিকে অভিযান করলো, তখন ওদের পিছনে প্রায় শতাবধি মেয়ে-পুরুষের ছোট খাটো জনতা। ওদের দুজনের হাতে হাজিপুরের নেতৃত্ব, এ অঞ্চলের ভালোমন্দর দায়িত্ব ওদের হাতে, ওরা দুঃখীর বন্ধু দীর্ঘকালের, এ তারা জানে।

হাস্নুবানুর মুখে চোখে গাম্ভীর্য ফিরে এসেছে। সে চললো একা। হিরণ চলেছে সকলের মাঝখান দিয়ে হাসি-তামাসায় মুখর ক'রে। কিন্তু ওরই মধ্যে তাঁকে আড়ালে নিয়ে ফকিরের মা বললে, জামাই আসল কথা জানতে পারলে আমাকে ধ'রে কোতল করবে, তা জানিস্ ?

তার ভীত মুখখানার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে হিরণ বললে, তুই যদি ঘটকালি করিস্ তাহলে বেঁচে যেতে পারিস্, দাদি।

কিসের ঘটকালি ?

তোর ওই গোমড়ামুখী নাৎনীটির সঙ্গে হামিদের বিয়ে দে। চাঁদপানা নাৎজামাই পাবি !

ফকিরের মা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, ওর সঙ্গে ? কেন, মধুমতীতে পানি নাই ? হাটে রশি-কলসী নাই ?

রাজবাড়ীর চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকলো হাস্নুবানু আর হিরণ। তাদের পিছনে পিছনে জনতা। কাছারির লোকজন আগেই খবর পেয়েছিল। তা'রা জানতো আজ একটা হাঙ্গামা বাধতে পারে। প্রহরীরা সকলেই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে ছিল। এ কথাটা সকলের মুখে চোখে সুস্পষ্ট যে, সুমিত্রাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি।

হামিদ সাহেবের লোক ছিল এখানে ওখানে। সুতরাং তিনি আগেই জানতেন যে, হাস্নুবানু আসছে। এবার তিনি পোশাক আসাক চড়িয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন সকলের সামনে। অভিবাদন বিনিময়ের পর হাসনু আবার নতুন ক'রে ভদ্র সম্ভাষণ জানিয়ে হাসিমুখে বললে, মিঃ হামিদ, এবার দিনের আলোয় আমাদের দুজনের শুভদৃষ্টি হোক।

জনতার দিকে তাকিয়ে হামিদ বললেন, এরা কা'রা ?

এরা হোলো আমাদের অন্নদাতা! আপনি আর আমি ওদের দাসদাসী!

কী চায় ওরা ?

কিচ্ছু না। ওরা এসেছে আমার সঙ্গে। আজ রাজবাড়ীতে ওদের নেমন্তন্ন!

কয়েক মুহূর্ত হামিদ কি যেন ভাবলেন। পরে বললেন, অবাঞ্ছিত জনতাকে আপনি সঙ্গে এনেছেন দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমি ওদেরকে খাতির করবার জন্য প্রস্তুত নই। রাজবাড়ীটা সরাইখানা নয়।

হাসনু একবার তাকালো হিরণের দিকে, একবার তাকালো ভয়ার্ত ফকিরের মায়ের মুখের উপর দিয়ে বিক্ষুব্ধ জনতার দিকে। তারপর আবার চোখ দুটো ফিরিয়ে এনে হামিদের চোখের ওপর রেখে বললে, সাফ কথা বলুন মিঃ হামিদ। আপনি কি আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে চান্ না ?

আপনি ঢুকলে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু—ওদের জন্য আমাকে অর্ডার আনতে হবে। আপনি ভিতরে আসুন।

জনতার ভিতর থেকে কয়েকটি লোক গোলমাল ক'রে উঠলো। কাছারিতে দু'জন নবনিযুক্ত শিক্ষিত ছোকরা কর্মচারী হঠাৎ ঠাস্ ক'রে হাটের দুটি লোককে চড় মেরে বসলো। দেখতে দেখতে এমন হৈ-চৈ বেধে গেল যে, উভয় দলের মধ্যে মারধর শুরু হোলো। হিরণ ঝাঁপিয়ে পড়লো ওদের মাঝখানে মিটমাটের জন্য। কিন্তু মিটবে কেমন ক'রে ?—পাকিস্তানের রক্তটা হোলো নতুন। তা'রা নিজের হাতেই নিজেদের বিচার করে সঙ্গে সঙ্গে। চিৎকার উঠলো জনতার থেকে। সেই প্রবল হাঙ্গামার ডাক শুনে চারদিক থেকে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বহু লোক এলো ছুটতে ছুটতে। দেখতে দেখতে রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণ লোকে-লোকারণ্য।

উৎকণ্ঠিত হামিদ দেখলেন তাঁর নিজের লোকের জন্যই ব্যাপারটা চরমে উঠলো। এতগুলো লোককে শত্রুতে পরিণত করলে তাঁর চলবে কি? এখন কিস্তির খাজনা আদায়ের সময়। দিনকাল ভালো নয়।

কয়েক পা এগিয়ে এসে হামিদ ডাকলেন, বেগম সাহেবা?

হাসুবানু সহাস্য মুখ ফিরিয়ে তাকালো। হামিদ বললেন, তিরিশ-চল্লিশটা অস্ত্র আমার হেফাজতে আছে, আমি তার ব্যবহার জানি। কিন্তু পাকিস্তানে এসে যা'রা মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দেয়, তা'রা পাকিস্তান আর মুসলমান দুয়েরই দুষমন!

হাসুবানু বললে, আমিও তাই ভাবছি, মিস্টার হামিদ। পাকিস্তান বাঁচতে পারে, আপনার মতন লোক যদি এখানে না থাকে।

আপনি কি বলতে চান?

বলতে চাই আপনি শাসকও নন, বিচারকও নন। আপনি জমিদারের বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র। কিন্তু আমি দেখছিলুম আপনার নবাবী জীবনযাত্রা। লোকলস্কর ঢাল-তরোয়াল নিয়ে আপনার এখানকার কায়েমী ব্যবস্থা। বেশ ত', এতই যদি শক্তিমান আপনি, তবে দাঙ্গাটা থামান? ওই ছেলে দুটোকে কান ধ'রে একবার শাসন করুন? আপনার বন্দুকের বারুদের চেয়েও বেশি শক্তি ওই জনতার, একথা মনে রাখবেন, মিঃ হামিদ।

হামিদ বললেন, এর ফলাফল কি জানেন?

জানি বৈ কি।—এই ব'লে হাসনু সেইখানে দাঁড়িয়ে ডাক দিল জনসাধারণকে। ডাক দিল সবাইকে।

অনেকগুলো লোক ফিরে তাকালো হাসনুর দিকে। ভিড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো হিরণ আর ফকিরের মা। কাকারির লোকেরা সরে দাঁড়ালো। গ্রামের লোকেরা মুখ ফেরালো।

হাসনু তারপর বললে, মিঃ হামিদ, এবার আমরা দেউড়ীর ভিতর ঢুকবো। হয় আপনি আমাদেরকে বাধা দিন্, আর নয়ত আপনার সেপাইদেরকে হুকুম দিন্—ওরা বন্দুক-পিস্তল নিয়ে আমাদের সবাইকে আক্রমণ করুক।

বুড়ো দারোগা হারুমিঞা ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পড়েছিলেন। এবার চেঁচিয়ে বললেন, ওরে হারামজাদারা, এখানে হুজ্জৎ করতে আইচিস্, তোগো আর কোন কাম নাই? বেরো, বেরো সব মামদোর দল! মাইরা একেরে নিকেশ কইরা ফ্যালাইমু। যা দূর হ, পাজি, ছুঁচা—সব বজ্জাৎ বদমাইস হারামির দল।

হাসনু বললে, দাদু, ওদের কোন দোষ নেই!

হারুমিঞা থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, ওদের নেই? তবে কা'র দোষ? ওই হালাইর পো হামিদ বুঝি? সালাম আলেকম্! বলি ও হামিদ সাহেব,—তুমি বাপু হাল-চাল বেঝো নাই। আমাগো রাজবাড়ীর জামাই আইছে, পথ ছাইড়া দাও। আর এই মাইয়াই ত' জমিদারের যা কিছু। এই মাইয়ারে তুমি রুখতে পারবা না, হামিদ। এ একেবারে কালকেউটে! আয়, আয় তোরা,—হুজ্জৎ করিস্‌নে। আমার সাথে আয়।

হামিদের মুখের ওপর দিয়ে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে হারুমিঞা দেউড়ি পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। জনতা ঢুকলো পিছনে পিছনে।

১৮

সকাল থেকে কাছারির কাজকর্ম সব বন্ধ। নায়েব মশাই গা-ঢাকা দিয়েছেন, বুড়ো আলিমিঞা বেগতিক দেখে ঘরগুলিতে তালাচাবি লাগিয়ে স'রে পড়েছে। যে দু-জন ছোকরা কর্মচারী অসহিষ্ণু হয়ে প্রথম আক্রমণ করেছিল,—বুড়ো দারোগা হারুমিঞার হাতে তাদের কম লাঞ্ছনা হয়নি। তারা নিজেদের বাসায় চলে যাবার আগে বলে গেছে, অপমানের প্রতিকার যদি না হয় তবে তা'রা এ চাকরি ছেড়ে চ'লে যাবে। তারা হামিদের লোক।

কিন্তু হামিদ সাহেবের পরাজয় ঘটেছিল। হারুমিঞা পুলিশের দারোগা, তার সাহায্যে হাসুবানু দল-বল নিয়ে ঢুকছে রাজবাড়ীতে,—সুতরাং এ ঘটনাকে বে-আইনী জনতার আক্রমণ ব'লে অভিহিত করা চলবে না। তিনি রাজবাড়ীর অছিদার বটে, কিন্তু দারোগার ওপর তাঁর কর্তৃত্ব নেই। পরাজয়টা কেবল যে হাসুবানুর কাছে, তাই শুধু নয়, হারুমিঞার কাছেও তাঁর সম্মান বাঁচেনি। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের কথা এই, গতকাল পর্যন্ত এই হাজিপুরে তাঁর যে প্রকার কঠোর প্রতিপত্তি আর অভিভাবকত্ব ছিল,—হাসনুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ তার চাকাটা যেন ঘুরে গিয়েছে; তিনি প'ড়ে গিয়েছেন পিছন দিকে! গতকাল রাত থেকে সেরেস্তা কাছারির লোকেরাও যেন বেঁকে দাঁড়িয়েছে।

রাজ বাড়ীর হুজ্জৎ-হাঙ্গামাটা কতকটা জুড়িয়ে আসবার পর হামিদের লোকেরা গিয়েছিল হাটতলায়, কিন্তু তারা রিক্তহস্তে ফিরে এসেছে। তাঁর

দেহরক্ষীরা অধিকাংশই অবাঙ্গালী। সুতরাং একেই ত' তাদের প্রতি স্থানীয় লোকের অনেকটা বিরক্তি আছে, তার ওপর সেদিন সকালের ঘটনায় তা'রা অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে উঠেছিল। ফলে, টাকাকড়ি সম্পূর্ণ দিয়ে পাঠালেও হাট থেকে খাদ্যসামগ্রী আজ কিছুই আসেনি। কেবল তাই নয়, আজ ভোরবেলায় উঠে কাছারির জন-দুই বরকন্দাজ মাইল দুয়েক দূরে গিয়েছিল রূপচাঁদপুরে খাজনা আদায়ের ব্যাপারে। কিন্তু চাষীরা নাকি স্পষ্টভাবে ব'লে দিয়েছে, এ তল্লাটের কোনো তালুক থেকে খাজনা আদায় করতে পারবে না, মিঞা। তবে যদি জমিদার হাতে পেতে চায় ত' টাকা দিমু!

এরা বলেছিল, জমিদার ম'রে ভূত হয়ে গেছে। জিম্মাদার হোলো সর্বেসর্বা। টাকা না পেলেই তোদের চালান দেবে!

হ, চালান দেয় কেডা? গাঁয়ে মানে না তবু নিজেই মোড়ল হইয়া বৈছে! তুমি ফিরে যাও, কর্তা। খাজনা যদি দিতেই হয় তবে দিমু গিয়া হাসুবেগমের হাতে,—তোমাগো হাতে আর নয়!

বরকনদাজের মুখে কথাটা শুনে হামিদ একেবারে চুপ করে গেলেন। দিন তিনেক তাঁর আর কোন সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না। সমগ্র অবস্থাটা তাঁকে একবার বিচার ক'রে নিতে হবে বৈকি।

আরদালি আর খানসামা নিয়ে প্রায় জনকুড়ি দেহরক্ষী তাঁর আছে। ওর মধ্যে জন দুই লোক রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দেউড়ীতে, এবং জন চার-পাঁচ রাত জেগে রাজবাড়ীর চৌহদ্দি পাহারা দেয়। সুমিত্রার অন্তর্ধানের পর থেকে এই নিয়মটি বহাল হয়েছে, এবং হামিদ সাহেবের আন্দাজ যদি সত্য হয়, তবে সুমিত্রার পলায়নের ব্যাপারটাও পূর্বকল্পিত। অর্থাৎ এই ষড়যন্ত্রটায় হাসুবানু যে গভীরভাবে লিপ্ত, এটি হামিদ বিশ্বাস করেন। বিশ্বাস করবার প্রধান হেতু হোলো, সুমিত্রার সেই ইংরাজী লেখা চিঠিটুকু এর মধ্যে একদিন উপর থেকে হাসনু নিচের তলায় পাঠিয়ে দিয়েছিল, সেই চিঠির নীচে একটি ছোট প্রশ্ন জুড়ে দিয়েছিল, ছোটরাণীর কাছে কি-কি প্রস্তাব আপনি করেছিলেন আমাকে জানাবেন কি? এমন কি প্রস্তাব ছিল যা স্বীকার করতে ছোটরাণী নৈতিক বাধা পেয়েছিলেন।

চিঠি পেয়ে হামিদ একটু কেঁপে উঠেছিলেন, কিন্তু তিনি ভয় পাননি। তার ধারণা, পাকিস্তান সরকার আছেন তাঁর পিছনে। সেই কারণে হাসনুর প্রশ্নের জবাব দিতে তিনি গ্রাহ্যই করেন নি। স্থানীয় কয়েকজন মুসলমান বাচ্চা তাঁকে নির্বোধ বানিয়ে কাজ হাসিল করার একটা চক্রান্ত করছে বটে, কিন্তু যথাসময়ে তিনি এদের যোগ্য জবাব দেবেন। তিনিও জাতমুসলমানের বাচ্চা!

শূন্য দোতলাটা কয়েকদিন থেকে মুখর হয়ে রয়েছে। কোলাহল, কলরব, দেশীভাষায় তামাসা, গান আর আবৃত্তি, বক্তৃতা আর বিবাদ, উচ্চকণ্ঠের অনর্গল হাসির ফোয়ারা, ওরা যেন বাইরের পৃথিবীর ধার ধারে না। রাজবাড়ীর অন্দরমহলে অপরিচিত বহু নরনারীর আসা যাওয়ার পথে দ্বিতীয় দিনে হামিদ সাহেবের লোক বাধা দিয়েছিল। চাষী, ফড়ে, ক্ষেতমজুর, ঘরামি, দোকানদার, জেলে আর জোলা, ধোপা আর নাপিত,- যারা জীবনে কোনোদিন রাজবাড়ীর দেউড়ীতে পা দিতে সাহস করেনি,—তা'রা সবাই এসে যেন দোতলায় রাজ্যপাট বসিয়েছে। হামিদ সাহেব নিচের থেকে চিঠি পাঠিয়ে বলেছিলেন, সমস্ত অবস্থা জানিয়ে আমি সরকারকে চিঠি লিখেছি, সরকারি হুকুমনামা না আনা পর্যন্ত আমি সাধারণ লোকের আনাগোনায় রাজি হ'তে পারবো না।

সেই চিঠির জবাব হাসনু দিয়েছে। লিখেছে, আমি এই রাজবাড়ীর মালিকের তরফের লোক। সরকারি হুকুমনামা আসবার আগে পর্যন্ত একথা আমি জানাতে চাই, নিচের তলায় যারা থাকে তা'রা আমাদের বেতনভোগী ভৃত্য ছাড়া কিছু নয়। আপনার পত্রে আমি যে-বেয়াদপি লক্ষ্য করলাম, তা'তে আমি কেবল এই প্রস্তাবই করতে পারি যে, আপনি চাকরিতে ইস্তাফা দিয়ে অন্যত্র চ'লে যান্। আর এক কথা, আপনার দেহরক্ষীদের আচরণে যদি আমার লোকেরা অসম্মানিত হয়, এবং তার জন্য যদি কোন হিংসাত্মক হাঙ্গামা বাধে, তবে তার সমস্ত দায়িত্ব আপনার। অবশ্য এইরূপ অবাঞ্ছিত ঘটনা যদি ঘটে, তবে সে ক্ষেত্রে আমি আপনাকে নিরাপদে রাখারই চেষ্টা করবো। আশা করি, পুনরায় কোনো হাঙ্গামা বাধিয়ে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেবেন না। আপনার ন্যায় কর্মচারীর অদূরদর্শিতায় পাকিস্তানের অমঙ্গল ঘটতে পারে, এই মর্মে আমিও কর্তৃপক্ষের নিকট চিঠি পাঠিয়েছি।

পরদিন দেউড়ী পার হবার সময় ফকিরের মা লক্ষ্য করলো, রাইফেলধারী পশ্চিমা সেপাইরা সেখানে নেই, তা'রা একদিকে স'রে গিয়ে হামিদ সাহেবের মহলটা পাহারা দিচ্ছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ফকিরের মা হাসিখুশি মুখে ভিতর দিকে চ'লে গেল।

দুই দিন বাদে যাতায়াতের পথে কাছারিবাড়ীর ধারে হামিদ সাহেব হিরণের মুখোমুখি হলেন। হিরণ নমস্কার জানালে, এবং তার জবাবে কপালে হাত ঠেকিয়ে হামিদ বললেন, আদাব। কেমন আছেন?

হিরণ বললে, দিনকাল মন্দা, সুখে দুঃখে যা হোক ক'রে কেটে যাচ্ছে আর কি? আপনার সর্বাঙ্গীন কুশল ত'?

হামিদ বললেন, আপনার সঙ্গে আমার ভালো ক'রে আলাপই হয় নি। আসুন না আমার ঘরে একটু বসবেন।

হাসিমুখে হিরণ বলল, বেশ ত' চলুন আলাপ করিগে। তবে কি না আপনার ওই সেপাইরা আমাকে একলা পেয়ে গুম ক'রে দেবে না ত'?

হামিদ সাহেব উচ্চকণ্ঠে কাষ্ঠহাসি হাসলেন। বললেন, আপনি হলেন পাকিস্তানের জিম্মি! কোরানে আছে নিজের জান দিয়ে জিম্মিদেরকে বাঁচানো চাই। তা ছাড়া এই দেখুন না, আপনি কেমন আরামে আছেন হামাদের এই রাজবাড়ীর দোতলায়, এমনি আরামে পাকিস্তানের সারা মাইনরিটি সুখে আছে।

হিরণ এসে হামিদের ঘরে করজোড়ে বসলো। হামিদ তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, হাপনাকে হামি প্রথম থেকে ভুল বুঝেছিলাম। পরে দেখছি আপনি সাচ্চা লোক আছেন। সাধারণ হিন্দুলোগ এখানে পঞ্চবাহিনীর কাম ক'রে থাকে, লেকিন্ সেদিন আপনি হামার কর্মচারীদেরকে না বাঁচালে তারা মার খেয়ে ম'রে যেতো। আপনি এখানে কি কাম করতেন, হিরণবাবু? হিরণ সবিনয়ে বললে, আমাকে আর আপনি বলবেন না। আমি এখানে কাছারির লোকদের জন্যে তামাক সেজে দিতুম।

হামিদ বললেন, খিৎমদগারি?

জি, হুজুর।

তবে যে লোকে বলে, আপনি রাজবাড়ীর জামাই? আপনি নাকি বড় তরফের সম্পত্তির মালিক?

হিরণ হাসলো। বললে, সাহেব, এসব ঝুটা খবর। জামাই ব'লে ওরা আমাকে তামাসা করতো। ওরা সবাই কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখিয়েছিল!

প্রবচনটা হামিদ সাহেবের বোধগম্য হোলো না। তিনি বললেন, মীরা চৌধুরীকে আপনি সাদি করেননি?

সেটা খেলাঘরে বিয়ে, সাহেব! ছোটবেলা থেকে আমরা পুতুলখেলা করতুম।

হাসুবেগমও কি আপনাদের সঙ্গে থাকতো?

জি, হাঁ।

হামিদ সাহেব কি যেন কাজে একবার বাইরে উঠে গেলেন। তাঁর মুখে চোখে যে কৌতূহল এবং ঔৎসুক্যের তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পাচ্ছিল সেটি গোপন করার দরকার ছিল। একটু বাদেই তিনি ফিরে এলেন। একপাশে গিয়ে একখানা মখমল বাঁধানো গদিমোড়া আরাম কেদারায় বসলেন। ওখানায়

এককালে বসতেন জীবেন্দ্রনারায়ণ। কেদারায় ব'সে হামিদ হঠাৎ এতক্ষণকার সম্ভাষণটা বদলে দিলেন। বললেন, হাসুবেগমের কাছে তুমি কি কাজ করো?

আমি নোক্‌রি করি হুজুর। রেঁধে দিই, ছাড়াকাপড় কাচি, বাসন মাজি, জুতো মুছে দিই।

হামিদ বললেন, তুমি হিন্দু ব্রাহ্মণ আছো, এ কাজে তোমার আপত্তি নেই?

একটুও না, হুজুর। আপনাদের মতন দিলদার লোকের সেবা করতে পারলেই আমি ধন্য।—হিরণ কপালে হাত ঠেকালো।

হামিদ একবার হিরণের মুখের দিকে তাকালেন। পরে বললেন, হাসুবেগম কত টাকা তোম্‌হাকে তলব দেয়?

হিরণ বললে, সামান্য, তাতে আমার খরচ চলে না। আর ভাত কাপড়? তাও বন্ধ করেছে, হুজুর। আজ দু'বছরের মধ্যে একখানা কাপড় দেয়নি। আমি আর এইসব বাজে লোকের চাকরি করবো না সাহেব। আমি কাজ ছেড়ে দেবো।

না, না, সে কি কথা! ধরো তোমায় যদি কেউ বেশি মাইনে দেয়, তুমি থাকবে তার কাছে—হামিদ প্রশ্ন করলেন।

হিরণ বললে, হুজুর, যদি কেউ এক টাকাও বেশি দেয়, তবে আমি তারই কাছে যাই। আর আমার চলে না!

ভুরু কুঁচকে হামিদ বললেন, সাচ্‌ বলছো হিরণ?

হিরণ বললে, আল্লা-কসম!

আল্লাকে তুমি মানো?

হাত কচলে হিরণ বললে, ও ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু মানবার মতন আছে কি? আল্লা-হো-আকবর!

হামিদ তাঁর মনিব্যাগ থেকে পাঁচটি টাকা নিয়ে হিরণের হাতে দিয়ে বললেন, এই তোমার বকশিশ। এখানকার বদমায়েস মুসলমানদের চেয়ে তোমার মতন হিন্দু আমাদের প্রিয়। এই শালা হারামিদের হাত থেকে মাইনরিটিকে বাঁচাবার জন্যে হামি লড়াই করবো, হিরণ! আচ্ছা, আর একটি কথা হামাকে তুমি বলো······কুছু ডর নেই!

পাঁচটি টাকা নগদ বকশিস পেয়ে হিরণ কৃতার্থ হয়েছিল। বললে, সাহেব, তুমি যা কিছু জানতে চাইবে আমি গলগল ক'রে ব'লে যাবো। মনের মানুষ পাইনে ব'লেই ত' চুপ ক'রে থাকি।

হামিদ খুশি হয়ে বললেন, হাসুবেগম এসে সুমিত্রাকে সরালে কেন বলো ত'?

হিরণ বললে, সোজা কথা! মেয়েমানুষের হিংসে!

হুঁ!—ব'লে হামিদ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। পরে বললেন, ছোটরাণী কোথায় পালিয়েছে তুমি জানো?

হিরণ একবার পিছন দিকে তাকালো। পরে গলা নামিয়ে, বলতে ভরসা নেই, হুজুর।

হামিদের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। বললেন, হামার জান থাকতে তোমার কোনো ডর নেই, হিরণ। তুমি কায়দা ক'রে ছোটরাণীকে আমার কাছে এনে দিতে পারো?

পারি, সায়েব!

কত টাকা চাও?

টাকা চাইনে হুজুর!

তবে?

হিরণ মাথা নিচু ক'রে রইলো। অধীর আগ্রহ নিয়ে হামিদ সাহেব এগিয়ে এলেন তার কাছে। বললেন, জবাব দাও মেহেরবানি ক'রে? বলো কি চাও?

হিরণ মুখ তুললো। চোখ দুটো তার টসটসে। হঠাৎ এবার যেন তার গলার আওয়াজটা একটু অন্যরকম শোনালো। শান্ত কণ্ঠে বললে, ভয় পেয়ে যারা চ'লে গেছে তাদের সবাইকে ডেকে এনে দেবো। তারা যদি আপনার হাত থেকে নিজেদের মাটি আর মান ফিরে পায়, যদি ফিরে পায় একটু আশা একটু ভালোবাসা, যদি ফিরে পায় ন্যায়বিচার আর বিবেচনা, তারা সবাই ফিরবে, হুজুর। আমি কথা দিচ্ছি।

হামিদ বললেন, আমিও তোমাকে কথা দিচ্ছি, হিরণ। কিন্তু সুমিত্রাকে ফিরিয়ে আনার বকশিস তুমি কি চাও, বলো?

আমি?—হিরণ গলাটা পরিষ্কার ক'রে বললে, আমি শুধু আমার জন্মভূমিতে থাকতে চাই সায়েব!

তাজ্জব! কী বলছ তুমি? আর কিছু চাও না?

না, এখানে শুধু বাঁচার অধিকার চাই, সায়েব। বাঙ্গালীর ভাষায় যাকে বলা হয়ে থাকে মনুষ্যত্বের অধিকার, তাই চাই। আমি আমার ওই মাঠের মাটিতে কীটাণুকীট হয়ে বেঁচে থাকতে চাই। বলো, তুমি তাই দেবে?

হামিদ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দেখতে দেখতে হিরণের কণ্ঠস্বরে কিছু আবেগ এসে পৌঁছলো। বললে, ধনদৌলত থাক্ তোমাদের জন্যে। রাজতখৎ—তাও থাক্ তোমাদের। আমি জননীর কোলে বসে,

অন্ন খুঁটে খেতে চাই। এ আমার মাটি চিরকালের মাটি,—এ মাটির কানায় কানায় লেগে আছে আমার ধ্যান-জ্ঞান, আমার বিদ্যা, আমার ভালোবাসা, আমার সমস্ত প্রাণের চেতনা। সাহেব, বলো তুমি আমার সেই অধিকার ফিরিয়ে দেবে? একবার বলো যে, এটা মানুষের রাজত্ব-ইসলামী রাজত্ব নয়?

ইসলামী রাজত্ব শুনে তোমরা ভয় পাও কেন? তোমাদের শাস্ত্রে কৃষ্ণ কি ধর্মরাজ্য বানাবার কোশিস করেনি?

হিরণ বললে, সাহেব, সেখানে ধর্ম আব অধর্মের কথা ছিল, হিন্দু-মুসলমানের কথা ছিল না। তারা দুই-জাতি তত্ত্বের জন্যে মারামারি করেনি, তারা ভারতের পাপ-পুণ্যের জন্য লড়াই করেছিল। আপনি যদি পাকিস্তান আর ভারতের ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসেন, সবাই আসবে আপনার পতাকার নিচে। কিন্তু মানুষকে বাদ দিয়ে মুসলমান রাজত্বের কথা তুললে ভয় পাবে। ইংরেজ এদেশে এসে খ্রীষ্টান রাজত্বের কথা ভাবেনি, কেনন তারা ছিল বুদ্ধিমান। শ্রীকৃষ্ণ চেঁচিয়ে বলেননি তিনি হিন্দু, দুর্যোধন চেঁচিয়ে বলেননি তিনি অহিন্দু। ধর্মরাজ্যে সবজাতির ঠাঁই আছে, কেন-না ন্যায়ধর্ম তার আদর্শ। পাকিস্তান যদি মানুষকে ধারণ করতে না পারে, তবে কোনো ধর্মই তার নেই। হুজুর, ইসলাম যদি সকল সমাজকে আজ নিজের কোলে জায়গা দিতে না পারে তবে সে-ইসলাম আপনার জন্যে নয়।

হামিদ সাহেব হাসছিলেন। এবার বললে, তুমি ত' বেগমের খিৎ-মদগারি করো, জানলে কোত্থেকে? আমার সন্দেহ, তুমি হিন্দু পণ্ডিত।

হিরণ এবার আত্মসম্বরণ করলো। বললে, সাহেব, এসব আমার খবরের কাগজ পড়া বিদ্যে।

তুমি পড়ালিখা জানো?

একটু-আধটু।

আমিও তাই ভাবছিলুম। পড়ালিখা যারা জানে, তারা আমার মতন চুপ ক'রে থাকে। এবার কাজের কথা বলো! আচ্ছা, তোমার ওই মনিব হাসুবেগম কেমন লোক আছে, একটু বলো ত'?

হিরণ আবার পিছন ফিরে তাকালো। এবার সে নিজেই একটু চাপা হাসি হেসে গলা মানিয়ে বললে, সায়েব, সত্যি বললে যদি আমার এতদিনের চাকরি যায়?

হামিদ বললেন, আবার তুমি বেকার হবার ভয় পাচ্ছ? আমাকে কি তুমি আজও চিনতে পারোনি?

এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে হিরণ বললে, যদি আপনার সেপাইরা কেউ শোনে?

কুছু ডর নেই, তুমি বলো।

হিরণ বললে, তবে শুনুন, মেয়েটি মোটেই ভালো নয়।

হামিদ প্রশ্ন করলেন, হাসুবেগম নাকি তিনবার সাদী করেছে?

হিরণ সর্বজ্ঞের মতো চোখ বুজে হাসলো। বললে, হ্যাঁ, তিনবার। কিন্তু ওর দুঃখ কি জানেন, হুজুর? ও যে তিরিশবার বিয়ে করতে পারেনি এই ওর আপসোস!

কেন?

ও বলে দেশে পুরুষ নেই। ওর ধারণা, ওপারে থাকে কাপুরুষ, আর এপারে থাকে জন্তু-জানোয়ার!

হামিদ সাগ্রহে বললেন, তোমার মতন খাপসুরত যুবককে ও তবে চাকর রাখে কেন? ওর মতলব কি?

হিরণ বললে, ওতেই ওর আনন্দ। আমাকে রেখেছে ঘটকালি করবার জন্যে।

হাসুবেগমের স্বভাবচরিত্র কেমন?

বুঝতেই পাচ্ছেন। আমাকে শাসিয়ে বেগম বলেন, অনেকবার বিয়ে করলেও নাকি তাঁর সতীত্ব অটুট থাকে।

হামিদ কতক্ষণ নিজের রঙ্গীন দাড়িতে হাত বুলোলেন। তাঁর ধারণা, তাঁর বয়স এখনো চল্লিশ হয়নি, এবং আজো তিনি কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচারী। হঠাৎ একসময়ে বললেন, হাসুবেগম তোমহাকে 'কমরেড' বলে কেন?

হিরণ বললে, হুজুর, মেয়েটার একটু মাথার দোষ আছে। লোকসমাজে আমাকে বলে, জামাই, মাঝরাত্রিরে কানে কানে বলে, কমরেড, আবার বেকায়দায় প'ড়ে ডাকে দ্রৌপদীর সখা। সত্যি কথা বলবো সাহেব? মনের মতন মরদ পায়নি ব'লেই ওর এত লাফালাফি। ভালোবাসা পেলেই মেয়েদের হিষ্টিরিয়া জুড়িয়ে যায়।

কেয়াবাৎ।—ব'লে হামিদ উৎসাহিত হয়ে ওঠেন।

হিরণ তার ওপর আরেক মাত্রা চড়িয়ে বলে, এসব আজাদী জেনানার মর্জিতে বাধা দিতে নেই। আপনি যদি একটু বশ্যতা স্বীকার করেন, দেখবেন কি ভাব আপনার সঙ্গে। আপনাকে ছাড়া ওর একটুও চলবে না।

হামিদ তাঁর মনিব্যাগ থেকে আরও পঁচিশটি টাকা বার ক'রে হিরণের দিকে হাসিমুখেই তাকালেন। বললেন, বহুত আচ্ছা। শোন হিরণ, সুমিত্রার

কথা এখন থাক্। জমিদারি যদি থাকে তবে তিনি একদিন নিশ্চয় ফিরবেন আর হামি যদি এখানে থাকি তবে হামার প্রস্তাবেও তাঁকে রাজি হতে হবে। এই নাও তোমাকে আরও ইনাম দিচ্ছি।

হিরণ হাত পেতে পুনরায় টাকাটা নিয়ে বললেন, পঁচিশ আর পাঁচে তিরিশ—হুজুর এতটাকা আমি একসঙ্গে কখনও দেখি নি। আপনি যা বললেন আমি তাতেই রাজি।

সৌম্যদর্শন হাদিম এবার একটু হাসলেন। বললেন, লেকিন্ তোমার কমরেড হাসুবেগম কি হামাকে পছন্দ করবে ?

পছন্দ! পোড়াকপালীর কি এমন সৌভাগ্য হবে? আপনার অনুগ্রহ পাবে না ভেবেই ত' আপনার সঙ্গে ঝগড়া করেছে। আমি এখনই গিয়ে যোগাযোগ ক'রে দিচ্ছি। কিন্তু একটা কথা, আপনি কখনো তার অবাধ্য হবেন না।

হামিদ বললেন, শুধু তিরিশ টাকা নয়, তোমাকে হামি তিরিশ হাজার টাকা দেবো, হিরণ। আর আমি মুসলমানের লেড়কা হয়ে কথা দিচ্ছি এই দেশী মুসলমানী মেয়ের পায়ের জুতা হয়ে থাকবো।

হিরণ এইবার উঠে দাঁড়ালো। হাত জোড় ক'রে সবিনয়ে সে বললে, তোমাদের দুজনের মিলন হবেই আমি জানি, হুজুর।

হামিদ হাসিমুখে বললেন, কেমন ক'রে জানলে ?

তেল আর জল যখন উপযুক্ত মাল-মসলার সঙ্গে আগুনে ফোটে তখনই তারা মেলে হুজুর। তা'তে একটু নুন ফেলে দিলে আরো সুস্বাদু।—হিরণ ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

রাজবাড়ীটা ওঁদের পক্ষে যাত্রীশালা, কিন্তু ঘরকন্নার কেন্দ্র নয়। এখানকার জীবনের স্থায়িত্ব কতটুকু ওদের জানা আছে, এবং তার চেয়েও বেশী জানে এই ঘরকন্নার ক্ষণস্থায়িত্ব। ওদের লক্ষ্য কেবল হাজিপুর নয়, ওদের মন জুড়ে রয়েছে পূর্ববঙ্গ। ওরা গুছিয়ে থাকতে আসে নি, এসেছে ছড়িয়ে থাকতে। হেমন্তের রৌদ্রোজ্জ্বল মাঠে-মাঠে পাকাধানের সঙ্গে ওদের স্বপ্ন দুলে ওঠে, ওদের আনন্দ কৃষকের কুটীরের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়। প্রান্তরের প্রান্তে যেখানে বটের ঝুরি নেমেছে, মধুমতীর স্রোতে যেখানে আলো আর ছায়ার কাঁপন,—সেইখানে ওদের মন ঘোরে। আত্মজীবনে ওরা চায় রিক্ততা,—কেন না সম্পদে লোভ নেই ব'লেই নিঃস্বতায় ওদের ভয় নেই। ওরা চায় রাষ্ট্রের প্রাচুর্য,—যেখানে মানুষের অন্নসংস্থান নিশ্চিত। যারা মার খেয়েছে যুগে যুগে, যারা মাথা তুলতে না পেরে মাটির ওপরেই মুখ থুবড়ে প'ড়ে রয়েছে,—সেই বিরাট জনতার ঝঙ্কার ওদের কণ্ঠে যেন ফুটে ওঠে।

রাজবাড়ী ওদের পক্ষে বেমানান—যেমন বেমানান আগেও ছিল। এখানকার কক্ষে কক্ষে তাদের কত কালের ইতিহাস স্তব্ধ হয়ে আছে, আছে কত অশরীরী কণ্ঠস্বর, কত সুখের আনন্দের ভরা যৌবনের কলোচ্ছ্বাস, আছে কতদিনের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের কাহিনী। কিন্তু এ রাজবাড়ী সে নয়। এখানে যে-মন ছিল সেই মন গিয়েছে ভেঙ্গে; প্রাণের যে দৃঢ় ভিত্তি এখানে ছিল সেই মূল এখন উৎপাটিত, যে-মানসাঙ্কের নির্ভুল নিশ্চিত একটা পরিণতি ছিল সেটা এখন বিপর্যস্ত। সেইজন্য রাজসম্পদ যদি বা ফিরে পাওয়া যায়, সেই হারানো মন আর ফিরবে না। ফিরবে না সেই চেতনা, সেই মানস-সংস্থা। ওরা যেদিন এসেছিল হাজিপুরে, সেদিন ওদের মনে হারানো সম্পদেব লোভ ছিল না,—ওদের লোভ ছিল বিশাল জনতার দিকে, ওদের মনে ছিল মাটির অচ্ছেদ্য আকর্ষণ। ওরা চাইতে এসেছিল চিত্তের উৎকর্ষ, বুদ্ধির সংস্কৃতি, জ্ঞানের নির্মলতা। অপমানের থেকে মানুষ উঠে দাঁড়াক, অন্যায়ের থেকে মুক্তিলাভ ঘটুক, অর্থনীতির অব্যবস্থার থেকে নতুন সমাজের জন্ম হোক।

হাসনু বলে, জ্যেঠামশায়ের জায়গায় এখানে কোনো ব্যক্তিকে আমি বসতে দেবো না, কমবেড্। জমিদারের সঙ্গে জমিদারিরও মৃত্যু হোক।

হিরণ বলে, ছোটরাণীর অধিকার নষ্ট করবার কে তুই?

আমি কেউ না, শুধু দাসীবাঁদী! কিন্তু জনতার কল্যাণে যদি ছোটরাণীর অধিকার নষ্ট হয় তবে কোনো দুঃখ নেই। আমি চাই ব্যবস্থার বিপর্যয়, যাকে তোদের সাংবাদিক ভাষায় বলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। যারা ভেঙ্গে গড়তে চায় তারা হোলো সংস্কারপন্থী, আমি শুধু চাই ভাঙ্গতে, শুধু তচনচ করতে। প্রচলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, কায়েমী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনতার বিপ্লব। আমাব হাতে সংস্কার নেই, আছে সংহার। বাঙ্গালীর রক্তে আছে এই সংহারের বীজ, এই ভাঙ্গার নেশা। ভারত সংস্কার করে, বাঙ্গলা করে সংহার। বিপ্লবেব বীজমন্ত্র চিরকাল বাঙ্গলার মাটির থেকে ওঠে, সেই কারণে ভারতের আর কোথাও সত্যকার বিপ্লবী দেখা যায় না। এই বাঙ্গলায় আবাব সেই কল্পান্ত আসন্ন, দেখা দিচ্ছে সেই সাংঘাতিক বিপ্লবের পূর্বাভাস।

হিরণ প্রশ্ন করে, কেমন করে জানলি?

হাসনু বলে, ওরে মূঢ়, চেয়ে দেখ্। রাজনীতি ক্ষেত্রে এসেছিল শকুনি, পাশাখেলায় হেবে গেছে পাণ্ডবেরা। দ্রৌপদীকে নিয়ে এলো সভাস্থলে। স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ চক্ষু দেখতে পায় না। দুঃশাসনের হাতে দেশলক্ষ্মীর বস্ত্রহরণ। মূঢ় ভীষ্ম, কাপুরুষ দ্রোণ,—বড় বড় রাষ্ট্রনেতা বড় বড় সমাজপতিরা বীর্যহীন, অশক্ত, অসাড়। তাদের সাহস, শক্তি, পৌরুষ, মনুষ্যত্ব, আদর্শ,

কোনোটাই অবশিষ্ট নেই। অসম্মানে তারা টলে না, অন্যায় আর ভীরুতার সঙ্গে তারা আপোস করে, ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে তারা ভয় পায়, ধর্মের গ্লানি আর মনুষ্যত্বের অপমান তারা মুখ বুজে সহ্য ক'রে যায়। তখন? তখন ওই অন্তরীক্ষে বাসুদেব এসে দাঁড়ান। অপমানিত দেশলক্ষ্মীর চোখের জল দেখে তিনি মৃদু হাসেন।

হাসেন?—হিরণ রাগ ক'রে ওঠে।

হাসনু বলে, হ্যাঁ, হাসেন। দ্রোপদীর কানে কানে বলেন, ব্যক্তিগত লাঞ্ছনায় ভয় পেয়ো না, কৃষ্ণা! তুমি চোখ মেলে দেখে নাও দেশের দুর্গতি। ক্ষমতার জন্য লড়াই আর আত্মকলহ, স্বার্থের সঙ্গে লোভের সংঘাত, শ্রেণীর সঙ্গে সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ, দলের সঙ্গে দলের হানাহানি, ষড়যন্ত্রের সঙ্গে চক্রান্ত, কুটিলতার সঙ্গে কাপুরুষতা,—এই হোলো কুরুক্ষেত্রের ভূমিকা। এই কুরুক্ষেত্রে প্রচণ্ড শক্তির অভ্যুত্থান ঘটবে। সেই মহাজনতার জয়ধ্বনি আমার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হোক। মূঢ় নেতৃত্বের অবসান ঘটুক।

হিরণ বলে, এতদিন পরে তোর মনের কথাটা বুঝলুম। এপারে ওপারে কোনো পারেই তোর ঠাঁই নেই। আর কিছু নয়, আমার সব চেষ্টা তুই মিথ্যে ক'রে দিলি।

হাসিমুখে হাসনু বললে, কোন্ চেষ্টা তোর মিথ্যে হোলো?

ভেবেছিলুম হামিদের সঙ্গে তোর মিলন ঘটাবো। তোরও একটা হিল্লে হোতো, আমার কপালটাও ফিরে যেতো। কিন্তু তোর মতিগতি ভালো মনে হচ্ছে না।

কেন?

তোর এই জনসাধারণের নাম শুনলেই হামিদ বেচারী আঁৎকে উঠবে। একেই ত' তোর জন্যে চাষাভূষোরা অবাধ্য হয়ে খাজনা দেওয়া বন্ধ করেছে, তার ওপর আবার ওই জনতার ধুয়ো তুললে লোকটা ছটফট ক'রে উঠবে। মাঝ থেকে আমার তিরিশ হাজার টাকার বকশিশটাই মাটি।

হাসনু বললে, আমি যদি হামিদকে বিয়ে করি, তুই আমার মালঞ্চের মালাকর হয়ে থাকতে পারবি?

ঠিক পারবো। হাসনুবানু হবে হামিদাবানু—এই মাত্র। আমার চাকরি যাবে কোথায়?

কিন্তু তিরিশ হাজার টাকা নিয়ে কি করবি তুই?

হিরণ বললে, গোটা দুই স্মৃতিফলক বানিয়ে রেখে যাবো।

হাসনু বললে, স্মৃতিফলক? কাদের রে?

একটা তোর, একটা মীরার। তুই বেঁচে মারা গেলি,—আর মীরা, ম'রে বাঁচলো!

হাসনু হাসলো। বললে, আমার কথাটা বুঝলুম, কিন্তু মীরা ত' আর মরেনি?

হিরণ বললে, কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখলুম, পার্শী পদ্ধতিতে সে মরেছে। মড়াটা রাখা হয়েছে ছাদে, আর চিল-শকুনি বসে গেছে ভোজের আসরে।

হাসনু কিছুক্ষণ হিরণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর হঠাৎ এক সময়ে হিরণের হাতখানা ধ'রে বললে, এবার স্বীকার কর্, কমরেড!

কি?

যাকে স্বপ্নে দেখেছিস তার চেয়ে আপন তোর কেউ নেই! স্বীকার কর্?

হিরণ বললে, একথা আসে কেন?

মীরার ওপর তুই অবিচার করেছিস্ তাই একথা আসে।

সুবিচারটা কি প্রকার হ'তে পারতো?

হাসনু বললে, তুই কোনোদিন তাকে একটি ভালো কথা বলিলিনে; একটি সান্ত্বনাবাক্য উচ্চারণ করিলিনে।

হিরণ প্রশ্ন করলো, সে কি শুনতে চেয়েছিল?

পুরুষ কথা বলে, মেয়ে চুপ ক'রে শোনে। সেটাতেই তার সম্মতি।

তোদের ক্ষেত্রে এই নীতি উল্‌টে গেছে!—এই ব'লে হিরণ সেখান থেকে উঠে চ'লে যায়। হল্ পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামে, তারপর নিচের তলাকার চকমিলানো বারান্দা পেরিয়ে সে চ'লে যায় ঠাকুরদীঘির দিকে। শিবমন্দিরের পাশ কাটিয়ে অতিথিশালাটা ডানদিকে রেখে ধানের খামার ছাড়িয়ে বাঁশবাগান পেরিয়ে সে চ'লে যায় গ্রামের দিকে। বাঁ-দিকে বিস্তৃত মাঠ, সেই মাঠে পেকেছে ধান। মাঠ পেরিয়ে গেলে বড়বংশীতলার ঘাট। সেই ঘাট থেকে খেয়া নৌকা মধুমতী পেরিয়ে যায় ওপারে নাগরদাঁড়ির ঘাটে। গ্রামের উত্তরপ্রান্তে লোচন বিল। এই পথ পেরিয়ে মীরা গিয়েছে কতদিন বদনমিঞার বাড়ীতে। বদনমিঞার মেয়ে ছিল মীরার ছোটবেলাকার সহপাঠিনী,—সে মেয়েটা মারা গেছে এই সে-বছরে। মনে পড়ছে, মেয়েটার নাম ছিল জুলেখা। তা'কে নিয়ে মীরা চ'লে যেতো বিলের ওপারে সেগুনের বাগানের নিচে দিয়ে 'আন্দকানের' ভিতরে। এখানে ছিল বদনমিঞার ফুলের চাষ, এই ফুল চালান যেতো সাহেবটোলার হাটে। 'আন্দকানের' আসল নামটা ছিল আনন্দকানন। এখানে তাদের অনেক সন্ধ্যা কেটেছে, কেটেছে অনেক শীতের অপরাহ্ণ, অনেক বৈশাখের পূর্ণিমারাত্রি। এই বন-বাগানের ভিতর

মীরার সঙ্গে তাকে ফিরতে হোতো সমস্ত পথটা পেরিয়ে। দুজনে ভালো কথা কোনোদিন বলেনি, কোনোদিন কোনো কারণেই রং-মাখানো কথা হয়নি দুজনের,—কেন না এমন কোনো কথা ছিল না উভয়ের মধ্যে—যার জন্য দরকার হোতো নিরিবিলি নির্জনতা, কোনো উদ্যানবীথি, কোনো-বা পুষ্পকানন। তাদের কণ্ঠে থাকতো জীবন সম্বন্ধে ছোট ছোট ধারালো বিদ্রূপ, কিংবা তীক্ষ্ণ কোনো পরিহাস, কিংবা কোনো নিছক কৌতুক-কাহিনী। একসময় স্বচ্ছন্দ আনন্দে ফিরতো দুজনে।

হাসনু তামাসা ক'রে বলতো, জামাই, তোর কোনো বেদনাবোধ নেই।

মীরা আরেকটু এগিয়ে এসে বলতো, ওর চেতনাবোধও নেই!

এখন মনে হচ্ছে মীরার কথাটায় নির্ভুল সত্য ছিল। সেদিনকার মুখর কলহাস্যের মধ্যে ওই দুটো শব্দ হিরণের মনে কোথাও ঠাঁই পেতো না। যে-বয়সটায় পৌঁছলে স্বপ্ন এসে বাসা বাঁধে, রঙের ছোপ লাগে মনে, অজানা কোন্ বিষাদে চিত্ত আনমনা হয়, এলোমেলো ভাবনায় উদাসীন হৃদয় আপনার পথ হারায়,—সেই বয়সটা হিরণের ছিল নিত্য আনন্দময়। কামনার থেকে জন্ম ব্যর্থতার। কিন্তু এর কোনোটার মধ্যেই হিরণকে পাওয়া যেতো না। মেঘের ছায়া পড়েছে মধুমতীতে, সে দাঁড়িয়ে যেতো ঘাটে; চৈত্রের শুকনো মাঠের খর রৌদ্রের মাঝখানে বিশাল বট তার চারিদিকে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে—সেই ছায়ার নিচে ব'সে হিরণ কাটিয়ে দিত একবেলা। কথাটা সত্য। তার চেতনা ছিল না, ছিল না ব্যথা-বেদানা। নিজের চারিদিকে সে রচনা করেছিল একটি আনন্দময় জগৎ,—সে থাকতো একা। কিন্তু তার সেই জগতে অপর কেউ প্রবেশ করলে তারাই পথ হারাতো, কেন-না ও-জগৎটা তাদের কাছে অপরিচিত।

রাগ ক'রে মীরা বলতো শ্বেতপাথর! দেখতে ভালো, কিন্তু প্রাণ নেই। হাসনু বলতো, পাথর নয়, ও হোলো শিমুলফুল! নিজের রঙেই রঙীন,—কিন্তু একটুও সুগন্ধ নেই যে, পরকে বিলোয়!

লোচন বিল পেরিয়ে গেলেই পীরসাহেবের মস্ত দরগা। এখানে মেলা বসে প্রতি বছর রাস পূর্ণিমায়। এরপর মহাজন-গোলার কয়েকঘর বস্তি! বস্তির সামনে কাঁচা রাস্তার ওপারে বিষ্ণুবাবাজির কালীমন্দির। মন্দিরের পাশে ছিল কয়েকটা রক্তজবার গাছ,—কিন্তু গাছগুলোর এখন চিহ্নও নেই। হিরণ তার পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে আপন মনে চ'লে গেল।

ডানহাতি বাগানটা পেরোলেই মইনুদ্দি মাস্টারের চালাটা পড়বে। হয়ত মাস্টারের সেই বোনটা ছুটে এসে এখনই তার পায়ের ধুলো নেবে—এই কথা

মনে করেই হিরণের পা দুখানা আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। পায়ে যতদিন ধুলো থাকে না ততদিন লোক পায়ের ধুলো নেয়, কিন্তু ধুলোপড়া পথক্লান্ত পায়ে কা'রো কি হাত দেবার আগ্রহ থাকে? মইনুদ্দি মাস্টারের ভগ্নী সুখে থাক্, কল্যাণশ্রীতে ভ'রে থাক্ ওদের ঘর। হিরণ সেইখান থেকেই পিছন ফিরলো।

শৈশবকালটা যেন তার ছুঁয়ে রয়েছে এখানকার পল্লীতে-পল্লীতে। তার বাল্য আর কৈশোর—তারাও যেন আপন আপন আনন্দে মাঠের ধুলোয় আজও গড়াগড়ি দিচ্ছে। এখানকার পরম পবিত্র ধুলিকণাদলের সঙ্গে ছিল তার অচ্ছেদ্য টান,—যে-টান তার রক্তের, শিরা-উপশিরার, অন্ত্রতন্ত্রের। এখানকার প্রতি বৃক্ষের আকর্ষণ যেন পুরনো বন্ধুর, আকাশের প্রতিটি নক্ষত্র যেন তারই চৈতন্যবিন্দু, মধুমতীর প্রতি জলকণা আজও তার রক্তকণায় কাঁপন এনে দেয়।

কেউ যেন না জানে--এখানে সে ছোট্ট নিশ্বাস রেখে চ'লে যাচ্ছে! কেউ না দেখে—এই মাটির পরে প'ড়ে রইলো তার হৃদয়ের ভগ্নাবশেষ, তার বেদনা আর চেতনার দাগ, তার চিত্তের প্রসাদ, তার আত্মার আবেদন। এই মাঠের ধুলোয় মিলিয়ে থাক্ তার প্রাণের শুভকামনা, তার মোহ আর স্নেহ, তার কবিতা আর কল্পনা, তার আনন্দ আর আশীর্বাদ। ইতিহাসের পর ইতিহাসের স্তর এই মাটিতে রচিত হোক, নব নব জীবনের ধারা বয়ে যাক্, নতুন সমাজ গ'ড়ে উঠুক, নতুন জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি আর আনন্দের প্রতিষ্ঠালাভ ঘটুক, এই মাটির 'পরে নতুন জাতির সৃষ্টি হোক।—কিন্তু কেউ যেন না জানে, এই মৃন্ময়ী জননীর হৃদয়ের গভীর তলে কেউ রেখে গেছে দুই বিন্দু অশ্রু, যন্ত্রণার একটুখানি কাতরোক্তি, ছোট একটুকরো বিষণ্ণ নিশ্বাস, সামান্য একটু মোহ, একটুখানি বেদনার ক্ষত। তা'রা লুপ্ত হয়ে থাক্ এই আনন্দময়ী মাটির অগাধ নিচের অতল অন্ধকারের মধ্যে। কেউ যেন না জানে।

অর্থহীন পথচলার অভ্যাসটা হিরণের আজও যায়নি। মাঠের ধার দিয়ে এলোমেলো পায়ে সে চললো যেদিকে খুশি। খুশি ছড়িয়ে রয়েছে হেমন্তের হাওয়ায় আর উজ্জ্বল রৌদ্রে। দেখতে দেখতে দূর-দূরান্তরে গিয়ে ক্ষুদ্র মানবক মিলিয়ে গেল।

গ্রামে একটি ছোট্ট ঘটনা ঘটলো, এবং যথাসময়ে সেটি হাসুবাবুর কানে এলো। কোনো একটি রহস্যময় কারণে বুড়ো হারুমিঞাকে পুলিশের দারোগাগিরি থেকে অবসর দেওয়া হলো,—তাঁর চাকরি ছিল পঞ্চাশ বছরের ওপর। একদা বাঙ্গলার বিপ্লবীদলের বহু ছেলে-মেয়ে এই বুড়োর সাহায্যে আত্মগোপন করতে সমর্থ হয়, এবং কোন কোন ফাঁসির আসামীও এই বুড়োর

জন্য বেঁচে যায়। পাকিস্তান হবার পর হারুমিঞাকে সরাবার চেষ্টা ছিল, কিন্তু জীবেন্দ্রনারায়ণের চেষ্টার ফলে বুড়ো এই গ্রামেই বহাল থাকে। দ্বিতীয় ঘটনা হোলো হামিদের যে দুইজন ছোকরা কর্মচারী বিনা দোষে দুটো লোককে মারধর করেছিল, সেই দুজনের বেতনবৃদ্ধি হোলো এবং অপরপক্ষে থানার নতুন দারোগা ইয়াসিন সাহেব সেই মার্ খাওয়া চাষী লোকদুটিকে ধ'রে কোথায় যেন চালান দিলেন।

এটা ঝড়ের সঙ্কেত, হাসনু জানে। এও জানে, এ দুটি ঘটনা তারই বিরুদ্ধে হামিদের প্রতিশোধ। এটা পাকিস্তান, তাকে জানানো হচ্ছে। অন্যায়কারী মাত্রই যে এখানে শাস্তি পাবে, এমন কোনো কথা নেই। এমন কোনো চুক্তি নেই যে, ভালো লোক মাত্রই এখানে শ্রদ্ধার আসনে ব'সে থাকবে। মুসলমান জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার এখানে আছে বৈ কি, কিন্তু তাদের মাথার ওপর পা দিয়ে যারা উঠেছে তাদের অধিকার সকলের আগে। কেন না তাদের উঁচু মাথাই অনেক দূরের থেকে দেখা যায়।

হাসনু চুপ ক'রে ভাবতে লাগলো তার পায়ের তলাকার মাটি কতখানি শক্ত। তার নিজের আইনসঙ্গত অধিকার এখানে অল্পই, কেননা সে হোলো জ্যেঠামশায়ের মানুষ করা মেয়ে। অনেককাল আগে জ্যেঠামশাই একখানা উইল্ করেছিলেন।—তাঁর অংশের সম্পত্তির একভাগ হাসনুর, আরেক ভাগ মীরার। কিন্তু সেই উইলের কথা শুনে হাসনু কান্নাকাটি করেছিল তিনদিন। বলেছিলেন, আমি সর্বহারাদের দলের মেয়ে, আমি কেন নিজের গৌরব খোয়াবো জমিদারি অংশ নিয়ে। সমস্ত বাঙলাদেশ আমার দখলে, এক-টুকরো ধানক্ষেত নিয়ে আমার কি হবে, জ্যেঠামশাই?

জীবেন্দ্রনারায়ণ বলেছিলেন, হয় সম্পত্তি, নয়ত টাকা—দুটোর একটা অন্তত নে, মা?

হাসনু হেসে বলেছিল, দুটোর একটাও নেবো না, জ্যেঠামশাই! একাদশ অক্ষৌহিনী সেনাও চাইনে, পাঁচখানি গ্রামও চাইনে। আমি শুধু চাই তোমাকে। তোমার পায়ের কাছে ব'সে থাকতে চাই।

হিরণ একান্তে ব'সে সমস্ত আবহাওয়াটাকে শান্তমনে বিচার ক'রে দেখছিল। বাতাসটা বিরোধী সন্দেহ নেই। হামিদ ব'সে রয়েছেন কাছারি হাতে নিয়ে, কিন্তু প্রজারা এসে কিস্তির টাকা দিয়ে যাচ্ছে হাসনুর হাতে। বিনা রসিদে হাসনু নিচ্ছে টাকা। হিরণ কেবল নাম টুকে রাখছে। প্রজারা জানে, হাসনু হোলো অভিভাবক, কর্তৃপক্ষ জানে হামিদ হলেন অছিদার। সুতরাং বুঝতে বাকি থাকে না, বারুদের স্তূপ দিন দিন উঁচু হচ্ছে। একটি

সামান্য হুকুমনামার বলে হাসনুকে হটিয়ে দিতে কর্তৃপক্ষের এক মিনিটও সময় লাগবে না।

হিরণ বললে, ভুল করেছিলি তুই, হাসনু—জ্যেঠামশায়ের দান হাত পেতে নিলে তোকে আজ এই চোরাবালুর ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হোতো না।

হাসনু বললে, কে জানতো পাকিস্তান হবে? কে জানতো নিজ বাসভূমে পরবাসী হবো?

কিন্তু একটা কাজ করলে ল্যাঠা চুকে যায়।

হাসনু জিজ্ঞাসা করলো, কি?

হরিণ বললে, তুই ত' মুসলমান, তোর আর ভাবনা কি? হামিদের তাঁবে তুই স্টেটের ম্যানেজারিটা নে না?

হাসনু হেসে বললে, তা হ'লে এক পা রাখবো স্বর্গে, অন্য পা মর্ত্যে,—হামিদ বেচারিকে পাতালে গিয়ে নামতে হবে। তার চেয়ে আমার তাঁবে হামিদ ম্যানেজারিটা নিক না কেন?

তাহ'লে এখানে ব'সে কি শুধু ঝগড়াই করতে চাস?

হাসনু বললে, না, এখানে থাকবো না। এখানে থাকতে আসিনি, কমরেড্। মীরা কি ছোটখুড়ি, কিম্বা অত্রি—ওদের কেউ যদি আসে এখানে, তবে একবার দেখে নিতে চাই হামিদের দলকে। ছোটখুড়ি পালিয়ে গিয়ে ভুল করলো। আমি তাকে ফিরিয়ে দিতুম ব্যক্তিগত সম্মান, প্রতিপত্তি, অধিকার,—তার নিজস্ব ধনদৌলত। তুই আরেকবার চেষ্টা ক'রে দেখ জামাই—যদি তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারিস।

হিরণ কতক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তারপর মুখ তুলে বললে, তুই এখান থেকে কোথায় যাবি?

জানিনে। বসন্তের শেষে কোকিল কোথায় যায়?

বুঝলুম। কিন্তু এখানে তোর কোন্ কোন্ কুকর্ম আর বাকি আছে?

হাসনু বললে, আসল যুদ্ধটাই যে এখনো বাকি রে!

যুদ্ধ?—হিরণ প্রশ্ন করলো, কা'র সঙ্গে?

হাসনু বললে, গ্রামে লোকের জন্যে কিছু করতে গেলেই যুদ্ধ করতে হয়, জানিসনে?

হিরণ বললে, বুঝলুম তোর মতলব! সেই পুরোনো মনোবৃত্তি! ইস্কুল আর হাসপাতাল! কো-অপারেটিভ আর কুটীরশিল্প! তোর আর কোনো আশা নেই, হাসনু।

হাসনু বললে, তুই ত' জানিস এগুলোতে আমারও অরুচি। তুই ত'

জানিস সমগ্র ঘৃণা আর বিদ্বেষের মূলে অর্থনীতিক অব্যবস্থা,—আর আমি চাই সেটার উচ্ছেদ।

তুই কি এখানে রাজনীতি করতে এসেছিস?

এটা জীবনের নীতি, কমরেড্। লক্ষ লক্ষ জীবনের বিকাশের জন্যে বিপ্লবকে ডাকবো। তারা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য মাথা তুলে দাঁড়াক। সম্পদকে সবাই মিলে ভাগ ক'রে নিক্।

হিরণ বললে, এটা ত' চলতি বুলি। সস্তা রাজনীতির শ্লোগান। এর জন্যে তোর ছটফটানি কেন? তুই এখানে থাকবি কোন্ কাজ নিয়ে?

হাসনু বললে, বিপ্লবের মধ্যে আছে কল্যাণ, আছে প্রেম,—এই কথাটা প্রচার করবার জন্যে এখানে থাকবো। মনুষ্যত্বের চেয়ে ধর্ম বড় নয়, এই কথাটা আমাকে এখানে ব'লে বেড়াতে হবে। আমাকে বলতে হবে, অন্যায় যেন প্রশ্রয় না পায়, দুষ্কৃতি এখানে যেন নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে সাংস্কৃতিক ধ্বংস না করে। চারিদিকের অসৎ চক্রান্তের মাঝখানে একটি মাত্র আলো হাতে নিয়েও যদি আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, তবে জীবনের সেইটিই সার্থকতা।

হিরণ বললে, শূন্য পাত্রের আওয়াজ বেশি। তোর জ্যেঠামশায়ের জমিদারিটা তোর হাতে থাকলে এসব কথাগুলো মানিয়ে যেতো।

হাসনু বললে, মূর্খ তুই। জমিদারি গেছে ব'লেই লোকে আজ আমার কথা শুনবে। এ কাছারিতে কেউ কোনোদিন বিনা রসিদে হাজার হাজার টাকা দিয়ে গেছে, মনে পড়ে তোর? ওরা দিচ্ছে আমার আইডিয়ার মূল্য। বিপ্লব ওরা করবে, আমি নই। ওরাই অধিকার আদায় করবে, আমি হবো তার সাক্ষী। মাটিতে উপুড় হয়ে প'ড়ে ওরা যুগে যুগে মার খেয়েছে, এবারে সেই দুর্গতির প্রতিকার। নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে বটে, কিন্তু পুরনো ব্যবস্থাপনার জালে এখনও জড়িয়ে রয়েছে। এর পুঁজি হোলো বিদ্বেষ, বুদ্ধি হোলো সাম্প্রদায়িক, অস্ত্র হোলো ইসলাম, আর শাসনটা হোলো দোহনের ভিন্ন নাম। এই চক্রান্তের থেকে জনতার মুক্তি চাই। বিপ্লবের দ্বারা এই চক্রান্তকে ভেঙ্গে দেওয়া দরকার, কেন-না এর ওপর যদি পাকিস্তান দাঁড়িয়ে থাকে, তবে পাকিস্তানের মেয়ে হয়ে এতবড় অপমান আমি সইতে পারবো না!

হিরণ বললে, কিন্তু এটা তোর ভাঙ্গনের আইডিয়া ছাড়া আর কিছু নয়, তা জানিস্? তুই না সগর্বে বলেছিলি, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তুই পাকিস্তানকে গ'ড়ে তুলবি?

হাসনু বললে, আজও বলছি, গ'ড়ে তুলবো। কিন্তু গড়বে কা'রা? কা'দের

সাহায্য নিবি তুই? চারিদিকে লক্ষ লক্ষ শৃঙ্খলিত মানুষের দারিদ্র্য,—ওদের দিয়ে কোন্ কাজ হবে? ওরা হোলো পুরনো ব্যবস্থার ক্রীতদাস, ওরা জন্মজন্মান্তর ধ'রে অধিকারচ্যুত, ওরা চিরদারিদ্র্যের বলি। সুতরাং গঠনের আগে ভাঙন, সৃষ্টির আগে সংহার—এর মধ্যে আর কোনো আপোস নেই। যদি বাঁচতে চাও তবে আঘাত করো, যদি দুর্গতির প্রতিকার চাও, যুদ্ধ ঘোষণা করো, যদি অপমানের থেকে উঠে দাঁড়াতে চাও তবে বিপ্লবই হোলো একমাত্র পথ।

হিরণ বললে, বেশ, তবে চল্ এখান থেকে বেরিয়ে যাই।

হাসনু বললে, কোথায়?

যেখানেই হোক, কিন্তু রাজবাড়ীতে আর নয়। বহু মানুষের কঙ্কালের ওপর এই রাজবাড়ী দাঁড়িয়ে। অহঙ্কারের উঁচু আসন থেকে—চল্ নেমে যাই? —ডান হাত দিয়ে হিরণ পথের দিকে দেখালো!

হাসনু বললে, কিন্তু উঁচু জায়গায় দাঁডালে অনেক দূরে গলার আওয়াজটা পৌছতো!

হিরণ বললে, না, এখানে নয়। এখানে শ্রদ্ধা পাবি, সম্মান পাবি, কিন্তু হাত বাডিয়ে যারা ভালবাসা চাইবে—তাদের কাছে পৌছতে পারবিনে। যে-শক্তির জোরে তুই রাজবাড়ী দখল করেছিস্ সেই শক্তিতেই একে ছেড়ে চল্। সমস্তটা নিঃস্বার্থভাবে ছেড়ে দিয়ে মাঠের মাটির ওপব গিয়ে ওদেব দারিদ্র্যের মধ্যে যদি নেমে দাঁড়াতে পারিস্ তবেই তোকে ওরা বিশ্বাস করবে।

আমাকে বিশ্বাস করে, কেমন ক'রে তুই জানলি?

হিরণ বললে, আমি জানি, কেন-না আমি যে তোর কথায় বিশ্বাস খুঁজে পাইনে!

হাসনু শান্ত কণ্ঠে বললে, তুই কে?

হিরণ জবাব দিল, আমি জামাই নই, কমরেড নই, আমি হলুম এদেশের কবি। সকল জাত, সকল ধর্ম, সকল শ্রেণী—আমার মধ্যে বাসা বেঁধে আছে। আমার বুকের মধ্যে ওদের চেতনা খুঁজে পাই, আমার শিরা-উপশিরায় রক্তের প্রবাহে ওদের আশা, ওদেব স্বপ্ন, ওদের কামনা ঘুরে বেড়ায়। ওরা মার খেলে আমার পিঠে দাগ পড়ে, আমি কান পাতলে ওদের কান্না শুনতে পাই। ওরা আমার কণ্ঠে কথা কয়, আমার চোখে ওরা দেখে, আমার গলা শুকোলে ওদের পিপাসা বুঝতে পারি, ওদের ক্ষুধায় আমি কাতর হই। আমি ওদের সকলের কবি!

হাসনু বললে, তবে চল্ রাজবাড়ী ছেড়ে যাই?

হিরণ বললে, আজই যাবো।

অগোছালো অস্থায়ী ঘরকন্নাটার থেকে ওরা নিজের জন্য গুছিয়ে নিল। বাইরের লোক, ফকিরের মা, কিংবা হামিদ—কেউই জানলো না। অজস্র টাকা জমেছে ওদের হাতে। পুঁটলী আর বিছানা নিয়ে বেরিয়ে পড়বার আগে হাসনু বললে, তুই এদেশের কবি তোর কণ্ঠে থাক মন্ত্র ; আমি এদেশের মেয়ে, আমার বুকের মধ্যে থাক শক্তি। তোর কথাই মেনে নিলুম কমরেড্—চল্, সকলের পায়ের তলায় গিয়ে দুজনে বাসা বাঁধিগে। সেই ভালো।

ওরা গিয়ে উঠেছিল অবসরপ্রাপ্ত দারোগা হারুমিঞার কাদামাটির ঘরে। বুড়োর কাছে চিরকাল বিপ্লবীরা আশ্রয় পেয়ে এসেছে, ওদেরও আজ জায়গা জুটে গেল। হারুমিঞার স্ত্রী-পুত্র নেই, থাকার মধ্যে আছে বৃদ্ধা এক ভগ্নী এবং নাতিসম্বাদে একটা ছোট ছেলে। হাসনু এসে বললে, দাদু, সরকার থেকে তোমার পেন্সনও বন্ধ হয়ে গেছে আমি জানতে পেরেছি। এবার যে ক'টা দিন তুমি বাঁচো, আমার হাতের রান্না তুমি খেয়ে নাও।

বুড়ো বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে হাসনুকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, আল্লার কিরে বলছি, আমারে যারা খেদাইছে, তাদের ওপর আমার কোনো রাগ নাই, বুন্!

হিরণ বললে, কাকাবাবুকে বাঁচাতে গিয়ে তোমার ছেলে পুড়ে মরেছে—আমি আজ তোমার ঘরে সব কাজ ক'রে দেব।

হারুমিঞা হিরণকে বুকের মধ্যে নিয়ে অনেকটা যেন বালকের মত কাঁদতে লাগলো। এ জীবনে আর কোনো পাওনা নেই বুড়ো জানে বৈ কি।

কিন্তু এই স্বাচ্ছন্দ্য সুখ এক সপ্তাহের বেশি ওদের ভাগ্যে টিকলো না। ওদের নিয়তি হোলো পাথরের টুকরোর মতো গড়িয়ে বেড়ানো, শ্যাওলা কখনো' ওদের গায়ে ধরবে না।

দিন আষ্টেক বাদে কতকগুলো লোকজন নিয়ে স্থানীয় থানার নবনিযুক্ত দারোগা ইয়াসিন সাহেব হারুমিঞার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বাইরে গোলমাল শুনে বুড়ো হারুমিঞা বেরিয়ে এলো। সামনে অনেকগুলো সশস্ত্র লোক।

ইয়াসিন সাহেবের লোকেরা ততক্ষণে চারিদিক ঘিরে ফেলেছে। তিনি খানাতল্লাসীর হুকুম দিলেন। বুড়ো হারুমিঞা একেবারে অবাক। তবে কিনা বুড়ো চিরকাল দারোগাগিরি ক'রে এসেছে, এই সমস্ত কায়দা-কানুন তার জানা। বললে, ব্যাপার কি, জনাব?

ইয়াসিন সাহেব উত্তর প্রদেশের লোক। তিনি পরিষ্কার উর্দু'তে বললেন,

বেগম হাসুবানু চৌধুরীর নামে পরোয়ানা আছে। তিনি জমিদারের টাকা লুট ক'রে এখানে পালিয়ে এসেছেন।

বুড়ো বললে, এসব ত' তোমাগো বাগের কথা, আসল কথাটা কি?

ইয়াসিন সাহেব বললেন, এর আগেও লুটের টাকা নিয়ে তিনি কলকাতায় রেখে এসেছেন। ওরা দু'জনে কম্যুনিস্ট দলের লোক।

হারুমিঞা বললে, কি কও? বদনাম দিয়া মাইয়া ছাওয়ালরে চালান দিবার লেগে আইছো?

হাসনুকে সামনে বেখে ঘণ্টা দুই ধ'রে খানাতল্লাসী চললো। কিন্তু লুটের টাকাটা কোনোমতেই পাওয়া গেল না। এক সময়ে ছোট দাবোগার পিছনে পিছনে হাসুবানু আব হিবণ বাইবে এসে দাঁড়ালো।

জনাব ইয়াসিন কাগজপত্র দেখিয়ে এবং তাব মাতৃভাষায নানা কথা বুঝিযে এক সময় হাসনুব দিকে চেয়ে বললেন, তিন চাবটে অভিযোগ আছে তোমাদের বিরুদ্ধে। এটা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা।

হাসনু বললে, হাত পা বাঁধাব জন্য শেকল এনেছো?

না।

গাড়ি এনেছো নিয়ে যাবার জন্য?

ইযাসিন বললেন, দরকার মনে কবিনি।

হাসনু বললে, তুমি হামিদের মতন ভাঙ্গা ভাঙ্গা নোংবা বাঙ্গলা বলতে না শিখে এখানে চাকরি নিয়েছ কেন?

ইয়াসিনের রূপ ছিল, কিন্তু বসবোধ কম। সুন্দব মুখখানা তাঁব রাঙ্গা হযে উঠলো। বললেন, এটা পাকিস্তান, উর্দুভাষাব দেশ।

হাসনু হাসলো। বললে, কিন্তু এটা ত' ঠিক পাকিস্তান নয়!

হঠাৎ মুখ ফিবালেন ইয়াসিন বক্রচক্ষে—তার মানে?

হাসনু শান্ত স্মিতহাস্যে বললে, পূববঙ্গটা পাকিস্তান নয, ইযাসিন। এটা হোলো পশ্চিম পাকিস্তানীদের উপনিবেশ। এখানে পাট জন্মায় বলেই ওখানে তোমাদের রাজ্যপাট চলে। এখানে কাঁচামাল আছে বলেই ওখানে তোমাদের হাতে কাঁচা পয়সা। এখানে তোমবা আসো ঝি-চাকরেব সন্ধানে,—আব যদি জোটে এক-আধটা ভদ্রঘরের মেযে, তবে তোমাদের উপ্‌রি লাভ। শোনো, ইয়াসিন,—হাসনু ইংরেজিতে বলতে লাগলো,—তুমি যখন গ্রেপ্তার করতে এসেছ, তখন আমরা নিশ্চয়ই যাবো তোমার সঙ্গে। কিন্তু বাঙ্গলায় এসে লাল চোখ দেখিও না। ওতে আমি ভয় পাইনে, কিন্তু তোমার বিপদ আছে!—যাক্ এখন আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে চাও?

হাসনুর চোখ আর মুখের চেহারা দেখে ইয়াসিন সাহেব যেন কতকটা সংযত হলেন। বললেন, আমার ওপর হুকুম আছে নজরবন্দী করে রাখার।

হাসনু বললে, জমিদারের টাকা লুট ছাড়া আমার বিরুদ্ধে আর কোনো অভিযোগ আছে?

ইয়াসিন বললেন, আছে বৈকি—পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র আর কার্যকলাপ।

হারুমিঞা অদূরে দাঁড়িয়ে রাগে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছিল। হাসনু একবার সেদিকে তাকিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে হাসলো।

ইয়াসিন পুনরায় বললেন, পাকিস্তানে কম্যুনিস্টদের জায়গা নেই। যারা চাষীমজুরদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায় তারা পাকিস্তানের দুষমন।

গ্রামের কতকগুলি লোক আশে পাশে জড়ো হয়েছিলো, কিন্তু ইয়াসিন সাহেব অত্যন্ত কড়া লোক, তাঁর সঙ্গে এসেছে কতকগুলি পাঞ্জাবী সেপাই, সুতরাং গ্রামের লোকেরা আজকে আর কোনো কথা বললে না।

হাসনু প্রশ্ন করলো, আমাকে কোথায় নজরবন্দী রাখা হবে?

ইয়াসিন বললেন, জমিদার বাড়ীতে।

হাসনু আবার হাসলো। বললে, বুঝলুম—আমাকে গ্রেপ্তার করার মধ্যে ওদের হাত আছে। বেশ চলো—

এবার থেকে ফস্ ক'রে হিরণ বললে, তাহ'লে ঘটকালির টাকাটা আমার ভাগ্যে জুটলো মনে হচ্ছে।

দূর মুখপোড়া।—হাসনু হাসিমুখে তাকে ধমক দিল।

ইয়াসিন সাহেব হিরণের দিকে ফিরে বললেন, তুমি মাইনরিটির লোক, আমাদের জিম্মি। তোমার ওপর বহিষ্কারের হুকুম আছে।

হিরণ বললে, সে কি? নিজের দেশ ছেড়ে যাবো কোথায় সাহেব?

ইয়াসিন কটাক্ষ ক'রে বললেন, ভয় পেয়ে নিজের মুলুক ছেড়ে সবাই যেখানে পালায় তুমিও যাবে সেখানে!

আধ ঘটা ওদেরকে সময় দেওয়া হোলো। তারপর একদল হাসনুকে নিয়ে রাজবাড়ীর দিকে গেল, অন্যদল হিরণকে নিয়ে অগ্রসর হোলো থানার দিকে। পিছনে দাঁড়িয়ে সজলচক্ষে বুড়ো হারুমিঞা কি যেন বিড়বিড় ক'রে বলতে লাগলো বোঝা গেল না।

১৯

পূর্ববঙ্গের পদাঘাতে ফুটবলটা আবার ছিটকে এসে পড়লো পশ্চিমবঙ্গে। ওলটপালট খেয়ে ধুলোবালি ঝেড়ে হিরণ আবার উঠে দাঁড়ালো। মন্দ কি, হাসনুর সঙ্গে কিছুকালের জন্য জমিদার বাড়ীতে থেকে রাজ্যপাট ভোগ ক'রে আসা গেল। চোরের পক্ষে রাত্রিবাসই লাভ! বিস্ময়ের কথা এই, তার সেই সনাতন পুঁটলিটাও এসেছে সঙ্গে। ওটায় জড়ানো আছে দারিদ্র্যের মালিন্য, জীর্ণতাব ছিন্নভিন্নতা। পথের খানাতল্লাসীতে ওটা পড়ে না,—গরীব আন্‌সার দল ওর মধ্যে সৌভাগ্যের সঙ্কেত খুঁজে পায়নি। কিন্তু ওটাও যেন ফুটবলের মতো গোলাকার। সুতরাং ওটাকে প্লাটফরমের ওপর ফেলে পা দিয়ে গড়াতে-গড়াতে হিরণ এনে ফেললো শিয়ালদা স্টেশনের বাইরে। ত্রিভুবনে ওটাই হোলো হিরণের পুঁজি, ভাগ্যের সম্বল ওইটিই—ওটাকে নিয়ে নিজের সঙ্গে পরিহাস করা চলে বৈ কি। এককালে তার পাবার কথা ছিল হাজিপুরের রাজত্ব এবং প্রাসাদশিখরবাসিনী রাজকন্যা,—সেই সৌভাগ্যের শেষ পরিণতি এখন ওই পুঁটলীটা। জীবনটা হোলো কোন এক জুয়াড়ীর যাদুবিদ্যা।

দৃশ্যটা দেখে আশেপাশের সকলেই অবাক। ডেলি-প্যাসেঞ্জার মহলে কৌতুকের সাড়া পড়ে গেল। স্টেশনের কুলিরা হেসে লুটোপুটি। সরকারী লোকেরা বাঁ হাতে সিগারেটটা নিয়ে ডান হাতে রুমালে করুণ চোখ মুছলো। ভাবলো,—রেফুজী কিনা, সমস্ত হারিয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

কথাটা সত্য নয়। রেফুজী বলো ক্ষতি নেই,—কিন্তু সর্বহারা বলা চলবে না। বাইরে এসে হিরণ পুঁটলীটার ধুলোবালি ঝেড়ে কুক্ষির মধ্যে তুলে নিল। ওর মধ্যে মোটা টাকা আছে। বুড়ো হারুমিঞার কাছে উপহার-পাওয়া একখানা আধময়লা ছেঁড়া লুঙ্গি, আর উজিরপুরের হাট থেকে হাসুবানু তাকে আদর ক'রে কিনে দিয়েছিল সবুজ ডোরাকাটা একটি হাফশার্ট—এগুলো আছে ওর মধ্যে। ময়লা একখানা রুমালে বাঁধা আছে ছাগলের ল্যাজের চারটি লোম। ওগুলি দিয়েছিল হাসনু। বলেছিল, 'আবার যদি তোকে কোথাও 'আবদুল' সেজে নাচগান করতে হয়, তবে এগুলো দিয়ে ছোট দাড়ি বানিয়ে নিস। রুমালে বেঁধে যত্ন ক'রে রেখে দে।' সুতরাং সমস্ত পথ পুঁটলী মাথায় দিয়ে হিরণ ঘুমিয়ে ছিল, এবং সেই লোমগুলির বোটকা গন্ধে স্বপ্ন দেখেছিল, ছাগলরা যুদ্ধযাত্রা করেছে ব্রহ্মার বিরুদ্ধে! হিরণের পায়ে জুতো নেই, ছেঁড়া

কাপড় গেরো দিয়ে পরা, হাতকাটা ফতুয়াটার বোতামও নেই। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। ওকে মানুষ বলে পথে-ঘাটে কেউ স্বীকার করে নি। আগুনের আঁচে সোনার ডেলাটার লোহার রং ধ'রে গেছে। সুতরাং ওই সনাতন পুটলীটা নিরাপদেই যে সঙ্গে আসবে, এতে সন্দেহ কি!

হিরণ খুশি হয়ে কোনো একটা পথ ধরে চললো। ধর্মরাষ্ট্র থেকে আজ সে এসে পড়েছে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে। সুতরাং তার ধর্মভয় কম। পরের টাকা আছে সঙ্গে, এ টাকায় জুয়া খেললে ক্ষতি নেই। সঙ্গে টাকা থাকলে ক্ষুধাবোধ থাকে না। রাস্তায় কলের জলে তৃষ্ণা মিটলেই হোলো। এ টাকার সাহায্যে চোরাকারবার করতে পারলে সে স্টেশনের রেফুজীদেরকে দিন দুই খিচুড়ী খাওয়াতে পারতো। তবে কিনা টাকাটার পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। এ টাকায় যদি সে গিয়ে উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে একখানা কাননঘেরা বাড়ী কিনে বাকী জীবন কবিতা লিখে কাটিয়ে দেয়, তবে আটকায় কে? কিন্তু কবিতা রচনা করবে কাকে নিয়ে? মীরা তাকে স্বামী ব'লে স্বীকার করেনি, তাকে নিয়ে কবিতা লিখতে অনুপ্রেরণা আসবে কি?

যাক হাসনুটা এ যাত্রা বেঁচে গেল। পুলিসের হাতে পড়েছে,—আর তার ভয় কি? বাইরে থাকলে নেতৃত্ব করার সুযোগ খুঁজতে হয়, আন্দোলন চালাতে হয়। তাতে আছে পরিশ্রম, ব্যর্থতা, হতাশা, অবসাদ। জেলে যেতে পারলে মান বাঁচে, স্বাস্থ্য বাঁচে এবং নিশ্চিন্ত অন্নবস্ত্র জোটে। এককালে বার দুই চেঁচিয়ে বন্দেমাতরম্ বলতে পারলে জেল্ হোতো, বার বার জেল্-এর ছাপ পড়লে নেতা হোতো, এবং নেতা হ'লেই দাদা-দিদি হয়ে উঠতো। হাসনু বেরিয়ে এলে হবে হাসনু দি। তখন আর হাসনুর ভাবনা কি? চারিদিক থেকে ছুটে আসবে ভাই-ভগ্নিরা। স্বাস্থ্যশ্রী স্থায়ী হ'লে ভক্তের সংখ্যা বেড়েই চলবে! কিন্তু দুর্ভাগ্য হিরণের, পূর্ববঙ্গের পুলিশ তাকে কম্যুনিস্ট ব'লে সন্দেহ করা ত দূরের কথা, কাম্যুনিস্ট যুবক বলেও মনে করলো না, গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিল! যাই হোক, দুঃখের কিছু নেই। হাসনু অবশেষে অকূল সমুদ্রে পুলিশের কূল পেয়ে গেল। জেলে গিয়ে সে সুখে থাক্, বাইরে এসে আর যেন সে ধুলো আর ধোঁয়া না ওড়ায়!

সামনে এক চায়ের দোকানে হিরণ উঠতে গেল। কিন্তু দোকানদার হাঁ হাঁ ক'রে এগিয়ে এসে বাধা দিয়ে বললে, যাও, যাও, স'রে পড়ো, ভিক্ষে-টিক্ষে হবে না!

হিরণ বললে, ভিক্ষে। চা খেতে এলুম যে!

এক পেয়ালার দাম ছ'পয়সা! আছে পয়সা?

পুঁটলীর টাকায় এ দোকানখানা এখনই কিনে ফেলা যায়। কিন্তু চা-পানের দরকার ছিল না হিরণের। সে বললে, আছে।

তার চেহারা আর পুঁটলীর দিকে তাকিয়ে দোকানদার বললে, আলগোছে আগে পয়সা দাও। গেলাস-টেলাস আছে তোমার পুঁটলীতে ?

না।—হিরণ জানালো।

তবে স'রে পড়ো, মিঞা। পেয়ালায় চা দিতে পারবো না।—দোকানদার নিজের জায়গায় গিয়ে বসলো।

হাজিপুর রাজবাড়ীর একমাত্র জামাই শ্রীমান্ হিরণচন্দ্র একটু হেসে আবার অন্যপথ ধ'রে এগিয়ে চললো। জীবনটা জুয়া!

অবশেষে কোনো ফুটপাতের ধারে সরকারী জলের পাইপের চাকতি তুলে হিরণ স্নানের আয়োজন করলো। জলটা ঘোলা,—বর্ষাশেষের মধুমতীর বর্ণ। পুঁটলী থেকে হারুমিঞার লুঙ্গি বেরোলো। খাটো লাল পাড় ধুতিখানা কেচে শুকোতে দিল ফুটপাতের এক গাছের ডালে। তারপর হেমন্তের মধুর রৌদ্রে কলকাতার রাজপথের ওপর ব'সে সংস্কারমুক্ত স্নান। বছর পাঁচেক আগেও এই পথ দিয়ে সে যেতো ট্যাক্সিতে। হাজিপুরের ভাবী জামাই,—অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা! বনভোজনে যেতো বন্ধুর দল নিয়ে,—খরচটা একা তার। মোটর ছুটে যাবার পর তার হাওয়াটায় থাকতো শুকনো গোলাপের মৃদু গন্ধ। তার বিলাস ছিল, কিন্তু ব্যসন ছিল না। পোস্টগ্রাজুয়েট ক্লাসের বাইরে করিডোরে দাঁড়িয়ে অনেক দুরাশাবর্তী তাকে নিয়ে কানাকানি করেছে, কিন্তু হিরণ কখনও মুখ ফিরিয়ে তাদেরকে ধন্য করে নি। আশেপাশে অনেক চক্রান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু কখনই তাকে পুরুষ ক'রে তোলা যায় নি।

খাটো ধুতিখানা শুকিয়ে আবার সে প'রে নিল। এবার সে স্বচ্ছন্দ ঝরঝরে স্বাধীন হাত দু'খানা দুলিয়ে সে আবার অগ্রসর হয়ে চললো। কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল পুঁটলীটা। তৎক্ষণাৎ সে ফিরে এলো—এসে দেখলো একটা কাক সেই পুঁটলীটা ঠোকরাচ্ছে। ছাগলের লোমের গন্ধ ওকে টেনে এনেছে।

পুঁটলীটা তুলে নিয়ে হিরণ আবার হাঁটতে লাগলো। কোথায় সে যেন শুনেছিল, কলকাতার মধ্যে একহাজার মাইল পথ আছে। এই পুঁটলী যদি সঙ্গে থাকে, আর যদি থাকে এই হাজার মাইল পথ,—তাহলেও কোনো অসুবিধা নেই। অন্তত ফুটপাত আছে, আছে অনেক বাড়ীর বারান্দা, কার্জন পার্কের শেড, গঙ্গার ঘাটের ঘর, স্টেশনের মেঝে, হাট বাজারের আনাচ কানাচ নিজের অতীত জীবনটা সে যদি তোলপাড় করে, তবে আপন আনন্দে

মশগুল হয়ে সপ্তাহখানেক কেটে যায়। লোকে তাকে বলবে রেফুজী,—কিন্তু কথাটা মিথ্যে। তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর ভিটে যা ছিল তা' মধুমতীর ভাঙ্গনে তলিয়ে গেছে অনেকদিন,—ভালোই হয়েছে। জমিদারি সম্পত্তির একটা অংশ তার ভাগ্যে বরপণ হিসেবে জুটে যেতো, কিন্তু সে ঝামেলাও কেটে গেছে। পোড়া কপালে একটা মনের মতন বউ প্রায় মিলে গিয়েছিল আর কি, কিন্তু বিধি বাম। শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বিয়ে তার হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বাকি পঞ্চাশ ভাগ হয়ে গেলে বাকি জীবনটা পান চিবিয়ে কবিতা লিখে মীরার সঙ্গে দুটো মনের কথা ব'লে এক রকম করে কাটিয়ে দেওয়া যেতো। কিন্তু বিধি বাম। পুরুৎ বামুনের ছেলের কপালে অত সুখ সইবে কেন?

হাজার মাইল পথ আপাতত থাক্, হিরণ হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে পৌঁছলো তালতলার সেই বাড়ীতে। এখানে সে ছিল অনেক দিন, আশেপাশের লোকেরা তাকে চিনতো বৈ কি। সুতরাং দুচারজন পল্লীবাসী তার দিকে সবিস্ময়ে ফিরে তাকালো। হিরণ বাইরে থেকেই কড়া নাড়ালো। এক মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে এলো এক স্থূলকায় প্রৌঢ় ব্যক্তি।

কাকে চাই?

মীরা রায় চৌধুরীকে। আছেন তিনি?

এ বাড়ীতে তিনি থাকেন না।

ও, তাঁর ঠিকানাটা—?

ভদ্রলোক হিরণের দিকে আপাদমস্তক একবার তাকালেন। বললেন, ঠিকানা আছে, কিন্তু তিনি কারুকে ঠিকানা দিতে মানা ক'রে গেছেন। তার কে হও?

হিরণ একটু থতিয়ে গেল। পরে বললে, আমাকে নিয়ে চলুন তাঁর ঠিকানায়, তিনিই এ প্রশ্নের জবাব দেবেন।

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, কোত্থেকে আসছো তুমি?

তাঁদের গ্রাম থেকে।

চাষবাস করো বুঝি? নাকি সেখানকার ধোপা নাপিত?—ভদ্রলোক এবার একটা সিগারেট ধরালেন।

হিরণ হাসিমুখে হাত কচ্‌লে বললে, ঠিকানাটা দয়া ক'রে দিন না?

অকিঞ্চনের ভঙ্গীটি দেখে ভদ্রলোকের মনে একটু করুণার উদ্রেক হোলো। তিনি গলা বাড়িয়ে ডাকলেন, ঠাকুর—?

ভিতর থেকে সাড়া এলো,—আজ্ঞে যাই—

এই ছোকরাকে বৌবাজারের ঠিকানাটা ব'লে দাও ত?

একটু পরেই ঠাকুর বেরিয়ে এলো। কিন্তু হিরণকে সামনে দেখেই সে ছটফটিয়ে উঠলো,—একি, জামাইবাবু যে? আসুন, আসুন,—কবে এলেন? ছোড়দি কই? কেমন আছেন?

ভদ্রলোক অবাক। হিরণ বললে, ঠাকুর ইনি বুঝি তোমার নতুন মনিব?

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, ইনি কে ঠাকুর?

উনি রাজবাড়ীর জামাই। মস্ত পণ্ডিত লোক। দাঁড়ান জামাইবাবু আমি ঠিকানা এনে দিচ্ছি।

ঠাকুর চট্ ক'রে গিয়ে একটি পাটকরা কাগজের টুকরো আনলো! মীরা নিজের হাতেই ঠিকানাটা লিখে রেখে চ'লে গেছে! এখানে চার মাসের বাড়ীভাড়া বাকি। হোসেন সাহেব চাটগাঁ থেকে বাড়ীভাড়ার তাগাদা দিয়ে চিঠি দিয়েছেন। হাস্নুবাবু টাকার কোনো ব্যবস্থা ক'রে যান নি। দিদিমণি বড্ড খামখেয়ালী,—তাছাড়া আরো অনেক কথা। আপনি এসে পড়েছেন, এবার সব দিক রক্ষা হবে।—ঠাকুরের কাছে একে একে সমস্ত কাহিনী হিরণ মন দিয়ে শুনে গেল।

এ সময়ে হিরণ প্রশ্ন করলো, তোমার দিদিমণির আর কি-কি দেনা এখানে আছে?

ঠাকুর বললে, এখানে অনেক দোকানে ধার আছে। তাছাড়া আমাদের তিনমাসের মাইনে-পত্রও দিয়ে যান নি। তা প্রায় সব মিলিয়ে শ' দুই টাকা হবে।

পুঁটলীটা ওই ভদ্রলোকের সামনেই হিরণ খুললো। ভিতর থেকে এক গোছা নোট বা'র করে বললে, তোমাদের দেনা এতেই শোধ হবে ঠাকুর—তবে এগুলো পাকিস্তানী নোট, বদলে নিয়ো। আর হোসেন সাহেবের হাজার টাকা আসছে কালই পাঠিয়ে দেবো। আচ্ছা, আমি এখন চললুম—

ঠিকানাটা সঙ্গে নিয়ে বিমূঢ় ভদ্রলোকটিকে নমস্কার জানিয়ে হিরণ পুঁটলীটা ঝুলিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লো। ঠাকুর দূরের থেকেই নমস্কার জানালো। তারপর ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে সে বললে, এরা সব বিশ-তিরিশ লাখ টাকার মালিক, বুঝলেন বড়বাবু! নজরটা একবার দেখলেন? সব ছাই-চাপা আগুন।

ভদ্রলোক হঠাৎ চ'টে উঠলেন। বললেন, খাটো লালপেড়ে ধুতি আর ছেঁড়া ফতুয়ায় রাজবাড়ীর জামাই এলে চিনবে কে?

ঠাকুর বললে, দেব-দেবতারা ভিখারীর বেশেই এসে দেখা দেয়, বড়বাবু! আমাদের পোড়া চোখ তাদের চিনতে পারে না।

ঠাকুর ভিতরে চ'লে গেল। হিরণ ততক্ষণ অনেকদূর চ'লে গেছে।

বৌবাজারের এ পল্লীর নৈতিক চেহারাটা এককালে ভালো ছিল না। সন্ধ্যার পর টিপটিপ ক'রে গ্যাসের আলো জ্বলতো, বস্তির আশেপাশে শোনা যেতো চাপা কথাবার্তা, মানুষের আনাগোনা ছিল রহস্যময়, কোনো কোনো দোতালার থেকে হারমোনিয়মের আওয়াজ শোনা যেতো, উটকো লোক হঠাৎ এসে ঢুকে পড়তো কোনো কোনো বাড়িতে গা ঢাকা দিয়ে, আবার হঠাৎ কোনো বস্তির থেকে চট্ করে বেরিয়ে কোনো লোক আর পিছনে না তাকিয়ে হন হন ক'রে চলে যেতো। মুখে চোখে নির্বিকার ঔদাসীন্যটি বজায় থাকতো।

এ পল্লীতে এখন এসেছে প্রকাণ্ড আভিজাত্য। কর্তৃপক্ষের তাড়নায় বহির্মুখী স্বরূপটি এখন হয়েছে অনেকটা অন্তর্মুখী। উপরের দিকটায় পোশাক চড়িয়ে পালিশ ক'রে দেওয়া হয়েছে। এই অঞ্চলেই কোনো এক গলিতে ঢুকে হিরণ বাড়ী খুঁজে বার করলো। নিচে তার অনেকগুলি দোকান,—কয়লা থেকে মসলা, শাকরা চেকে শর্করা সবই খুঁজে পাওয়া যায়। ছোট দরজাটায় ঢুকতে গেলে প্রথমেই নরককুণ্ড মনে পড়ে। পাশ দিয়ে সিঁড়ি। তেতালার থেকে কা'রা যেন নেমে আসছে। হিরণ উঠতে উঠতে একপাশে সরে দাঁড়ালো। এই নরককুণ্ডের কোল দিয়ে আসছে ময়লা জল, তার সঙ্গে ময়রার দোকানের উচ্ছিষ্ট আর শালপাতার ঠোঙ্গা। অর্থাৎ এ বাড়ীর আর একটা অংশে আছে খাবারের দোকান এবং পাইস হোটেল। বারে, আনায় ডাল-ভাত-চচ্চড়ি, শেষকালে আমড়ার টক। হঠাৎ ক্ষুধায় হিরণ জ্বলে উঠলে, কিন্তু মোটা টাকা থাকলে ক্ষুধা অসহ্য মনে হয় না। তাছাড়া বাঞ্ছকল্প দর্শনে এলে ক্ষুধার কথা ভুলতে হয়।

মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। দোতালায় উঠে এলেও সেই সমানই আবছা অন্ধকার। পাশেই সরু আনাগোনার পথ, সেখানে দু'পা এগিয়ে মুখ বাড়িয়ে হিরণ দেখলো তিনটি লোক ব'সে রয়েছে। নিচের থেকে এদেরই সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। সেই ঘর ছেড়ে আর দু'পা এগিয়ে যেতেই এঘর থেকে একটি লোক বললে, কোথা যাচ্ছ হে, ওদিকটা যে অন্দরমহল,—দেখতে পাচ্ছ না?

হিরণ থমকে দাঁড়ালো। দ্বিতীয় লোকটি প্রশ্ন করলো, এখানে কি চাই? মতলবটা কি?

হিরণ ওদের দিকে সটান তাকালো। তারপর বললে, আপনারা কে?

ওরা এ-লোকটার স্পর্ধা দেখে অবাক। একজন বললে, আমরা সরকারি

লোক। কিন্তু আমরা যেই হই, তোমার এখানে কি দরকার? দেখতে পাচ্ছ না ওপাশে মেয়েরা থাকেন? এই জন্যেই মীরাদেবীকে বলি, আপনি দরজা কখনও খুলে রাখবেন না। এ পাড়াটায় দিনে হয় চুরি, রাত্রে হয় বদ্‌মায়েসী। কিন্তু উনি সরল মানুষ, এসব বোঝেন না। যাও, এক্ষুনি নিচে নেমে যাও, নৈলে—

হিরণ একবার ওদের দিকে তাকিয়ে বোকার মত হেসে দিল। ওরা দৃষ্টিমান হ'লে বুঝতো, এ হাসির মধ্যে ছিল সমস্ত জীবন যৌবনের মধুরতম আনন্দ। কিন্তু সে পলকমাত্র, তারপরেই হিরণ চট করে গিয়ে ঢুকলো পাশের ঘরে।

বাইরের থেকে ওরা হাঁ হাঁ ক'রে কোলাহল ক'রে উঠলো! একটা হৈ চৈ লেগে গেল এক মুহূর্তে। পর্দা সরিয়ে ভিতরে গিয়ে ঢোকবার সাহস কারো হোলো না। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পরেই মীরা এগিয়ে এসে ঝোলানো পর্দাটাই নিজের গায়ে জড়িয়ে শুধু মুখখানা বাড়িয়ে বললে, আপনাদের অপেক্ষা করতে বলেছি, কিন্তু চেঁচাতে বলিনি!

ওরা চেঁচিয়ে উঠলো,—আপনার ঘরে একজন উটকো লোক এইমাত্র ঢুকে পড়েছে!

ঢুকলে ক্ষতি নেই। বড় জোর আমার সম্ভ্রম নষ্ট হ'বে তার বেশি কিছু হবে না। আপনারা যান—গিয়ে বসুন গে—এই ব'লে মীরা ওদের মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল।

মীরার আচরণ পূর্বাপর এইরূপ। এ অভিজ্ঞতা তাদের আছে। ওরা ভোতা মুখ নিয়ে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসলো।

ঘরে ঢুকে ভাঙ্গা তক্তাখানার পাশে গিয়ে হিরণ লুকিয়েছিল। দু'জন গুণ্ডার ভয় কম, কিন্তু তিনজনে হয় জনতা। জনতার মনোবৃত্তি তার জানা আছে, আক্রোশের মাথায় দু' ঘা বসিয়ে দিলে তাদের বাধা দেয় কে?

দরজাটা বন্ধ ক'রে মীরা দাঁড়ালো হিরণের মুখোমুখি। কিন্তু বাইরের দিকে গোলমাল শুনে ভিতর থেকে একটি বুড়ি এসে দাঁড়ালো। সম্ভবত ঝি আর রাঁধুনী মিলিয়ে এক। বললে, ওমা, আমি বলি আবার কী হোলো! তোমাকে নিয়ে গোলমাল একটা লেগেই আছে কিনা। এত বেলা অবধি ঘুমোচ্ছিলে আজ ভাবলুম শরীরটা বুঝি ভালো নেই! ইনি কে গা, দিদি?

বুড়ি একটু হাসলো। মীরা বললে, থামলে কেন, মানদা? আরেকটু বলে। কেচ্ছাটা কানে তুলে দাও?

বুড়ি আবার হাসলো। বললে, ছি, এ কি একটা কথা? মানুষ হোলো

লক্ষ্মী, তা সে যেই আসুক না কেন? হোক না ধোপা-নাপতে,—সোনার আংটি বাঁকা হ'লে কি দাম কমে?

হিরণের দিকে একবার আড়চক্ষে তাকিয়ে বুড়ি বেরিয়ে গেল।

মীরা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। হিরণ তক্তাখানার ওপর বসলো। দুই পায়ে তার এক হাঁটু ধুলো। ঘরখানার বাঁধুনি শক্ত কিন্তু বাড়ীটা পুরনো কালের। হিরণ এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। এক সময়ে শান্ত কণ্ঠে সে বললে, কপালে কাটার দাগ দেখলুম কেন?

মীরা পিছন ফিরলো না। সেইখানেই দাঁড়িয়ে বললে, পা টলতে টলতে প'ড়ে গিয়েছিলুম।

সে কি! কোথায়?

গ্র্যাণ্ড হোটেলের ফুটপাতে।

হিরণ চুপ ক'রে গেল। ঠোঁটের আগায় প্রশ্নটা এসেছিল, সেই ফুটপাতের ওপর কপালের থেকে যে-রক্ত ঝরেছিল, সেই রক্ত বিমলাক্ষ ডাক্তার মাড়িয়েছিল কিনা। কিন্তু প্রশ্নটা সে গিলে ফেললো। ভাঙ্গা তক্তার ওপর শতছিন্ন বিছানা, মেঝের ওপর গোটা তিন-চার এলুমিনিয়ম আর কলাইয়ের বাসন, ছোট একটা কাঠের ফ্রেমে-আঁটা ময়লা একখানা আয়নার সঙ্গে একটি দাঁড়াভাঙ্গা চিরুনি লটকানো। কুলুঙ্গীর শিশিতে একটু তেল এক কোণে একখানা আধময়লা শাড়ি ছিন্নভিন্ন করা রয়েছে। একপাশে টিনের একটা তোরঙ্গ। ঘরের দেওয়ালে উড পেন্সিলে লেখা নানা আজগুবি বাক্য আর দুই চারটা উদ্ভট নাম-ঠিকানা। এপাশে ফুটো জলের কলসীর থেকে আধখানা ঘরে জল গড়িয়ে গেছে। কেমন একটা বুকচাপা দারিদ্র্য আর মালিন্যে সমস্তটাই যেন রুদ্ধশ্বাসে চুপ ক'রে রয়েছে। হিরণের গলার মধ্যে অনেক দিন আগের হাসনুর কণ্ঠস্বরটা যেন ঠেলে উঠে আসছে। মীরার চোখের জল দেখে হাসনু একদিন তাকে বলেছিল, তুই না পুরুষ, চুলের ঝুঁটি ধ'রে চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারিস্‌নে?

অনেকক্ষণ পরে গলাটা পরিষ্কার ক'রে হিরণ প্রশ্ন করলো, বাইরের ভদ্রলোকেরা কি ব'সেই থাকবেন?

মীরা এবারেও এদিকে ফিরলো না। শুধু মৃদুকণ্ঠে বললে, ওরা ব'সে থেকেই আনন্দ পায়!

কে ওরা?

ওরা ভক্ত।

হিরণ বললে, কিছু প্রার্থনা আছে কি?

মীরার গলাটা কাঁপালো। বললে, আমি পরিহাস করার জন্যে কাউকে ডাকিনি!

হিরণ হাসিমুখে বললে, কিন্তু আমি এখানে পরিতাপ করবার জন্যেও আসিনি! কই, বুড়ি গেল কোথায়?

কেন?—মীরা এবার মুখ ফিরালো।

হিরণ বললে, দিন দুই আগে গোটা আষ্টেক পাকিস্তানী রসগোল্লা খেয়েছিলুম। বুড়ি কিছু খেতে দিলে খুশি হই।

মীরা বললে, পাকিস্তানী রসগোল্লা খেয়ে যদি দু'দিন চুপ ক'রে থাকা যায়, তবে পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে খেতে চাওয়াই ভালো। এক মাসের জন্যে পশ্চিমে বেড়াতে গিয়ে ছ'মাস পরে না ফিরলেই হোতো!

হিরণ বললে, হাসনুকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ীতে বাস করতে গিয়েছিলুম। চমৎকার ঘরকন্না পেতেছিলুম। রাজবাড়ীর ধন দৌলতের মধ্যে ডুবে দু'জনের সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটছিল,—

মীরা বললে, সে ত' চেহারাতেই প্রমাণ, পোশাকেই পরিচয়। ধোপা নাপতের পয়সা জোটেনি!

হিরণ একটু দমে গেল। গল্পটা আর জমতে পারলো না। পুঁটলীর থেকে টাকা নিয়ে চকচকে কাপড়জামা কিনে প'রে এলেই ভালো হোতো। চেহারার উন্নতি না হোক শ্বশুর বাড়ীর মান বাঁচতো।

মীরা এক সময় প্রশ্ন করলো, হাসনু এলো না কেন?

হিরণ জবাব দিল, তাকে শ্বশুরবাড়ীতে যেতে হোলো!

মানে?

মানে, পুলিশ এখন থেকে তাকে ভাত কাপড় জোগাবে। আমার কপালে সে সৌভাগ্য নেই, তাড়া খেয়ে ছিটকে এলুম।

ছোটখুড়ি কোথায়?

আমরা যেদিন হাজিপুরে গিয়ে পৌছলুম, সেইদিন থেকে তিনি নিরুদ্দেশ। তাকে আর অত্রিকে ফকিরের মা পাচার ক'রে দিয়েছে।

কেন?

হিরণ বললে, ছোটখুড়ি প্রায় সিংহাসনে বসেছিল, কিন্তু স্টেটের বর্তমান ম্যানেজার আকুমার ব্রহ্মচারী হামিদ সাহেবের কোনো এক প্রস্তাবে আপাতত রাজী হ'তে না পেরে ছোটখুড়ি পালিয়ে বাঁচে!

মীরা জিজ্ঞাসা করলো, প্রস্তাবটা কি?

কী প্রকার প্রস্তাব জানা যায়নি, তবে সেটা গ্রহণ করার পক্ষে নাকি ছোটখুড়ির নৈতিক বাধা ছিল।

মীরা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। পরে বললে, আপাতত রাজী হ'তে পারেননি মানে? পরে রাজী হবেন?

হিরণ বললে, নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথিবী সে কথা জানে। তবে কিনা মেয়েছেলে যে-প্রস্তাবটা পরবর্তীকালে মেনে নেয়, প্রথম দিকে সেটায় ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে থাকে।

কে যেন মীরার ঝুঁটি ধরে নেড়ে দিল। হঠাৎ থতিয়ে সে চুপ ক'রে [illegible]। হিরণ একবার তাকালো তার দিকে, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ভিতরের দিকে। সেখানে গিয়ে দেখলো, একখানা কালিঝুলিমাখা ঘরের সামনে ব'সে বুড়ি একমুঠো ডাল বাছছে। অতি সবিনয়ে হিরণ বললে, এখানে ব'সে কি হচ্ছে,—আমি আলাপ করতে এলুম, বুড়িদিদি।

মানদা বিরক্ত হয়ে মুখ তুললো। বললে, বুড়িদিদি কি গো, আমার নাম মানদা। [illegible]রের মেয়ে কখনো বুড়ি হয় না।

হিরণ তৎক্ষণাৎ বললে, বড্ড যে ক্ষিদে পেয়েছে, মানদা!

তা আর পাবে না, বেলা যে গড়িয়ে গেল! গলা নামিয়ে মানদা বললে, রান্নাবান্নার নামগন্ধও নেই। হবে কোত্থেকে? আমি বলি বাছা অত বাছ-বিচার কেন? পয়সা সকলের আগে, তারপর অন্য কথা। পেটের কথা পেটেই থাক্ কিন্তু পেটটা ত' চলা চাই? কাপড় চোপড় গয়না গাঁটি কিছুর অভাব থাকবে না,—মানুষ ঘরে এলেই হলো। মানুষই লক্ষ্মী।

হিরণ বললে, মানদা, তোমার মতন আপন আর ওঁর কে আছে বলো।

উৎসাহিত হয়ে মানদা বললে, কা'র কথা কে শুনে বাপু। ঘর না হয় ভেঙেছে, তা অত মন খারাপ কেন,—নতুন ঘর বানিয়ে নিতে কতক্ষণ? আর তাই বলি, তোমার [illegible] অভাব কি? মেয়েমানুষের চেহারার জৌলুস যদ্দিন, তদ্দিন দুঃখু কিসের?

হিরণ বললে, ঠিকই ত'। একথা [illegible] মানবে।

মানদা আরো গলা নামালো। বললে, লোকজনের ত' আর অভাব নেই? নিত্যিই আসছে দলে দলে। দরজার গোড়ায় কাঁড়ি-কাঁড়ি জিনিস-পত্তর রেখে যায়,—কিন্তু মেয়ের আর কিছুতেই মন ওঠে না।

কেন বলো দিকি মানদা?

আমি বলি কি জানো?—মানদা বললে, ওর মনে কেউ একজন ছুঁয়ে আছে। সেই কাঁটা না তুলতে পারল ওর সুখ নেই, বাছা?

হিরণ বললে, কে বলো দিকি, মানদা? কোনো ডাক্তার-বদ্যি?

উহুঁ, না—এদেশে থাকে না! সে থাকে দেশ-গাঁয়ে।

তুমি জানলে কেমন ক'রে মানদা?

ওমা, তা আর জানবো না? নেশা করলে ছুঁড়ির জ্ঞান-গম্যি থাকে নাকি? নেশা!

হ্যাঁ গো, ভাত না জুটুক—ওটা চাই! এই ত' আজ দুদিন হোলো, খেয়েছে কিছু? এক একদিন পেটের ব্যথায় ছটফট করে।

হঠাৎ পিছন দিকে এসে দাঁড়লো মীরা। কঠোর কণ্ঠে বললে, এখানে ব'সে-ব'সে বুঝি গোয়েন্দাগিরি হচ্ছে?

আর বাছা!—মানদা ব'লে উঠলো, গোয়েন্দাগিরি ত' বটে! সেকাল কি আর আছে! তাই বলছিলুম,—এই ছাখো না কাঁচা মুগের ডাল,—পাঁচপোর দাম এক টাকা! সরষের তেল আড়াই টাকার কমে নেই! ঘি ত' দেশ ছাড়া! গোয়েন্দাগিরি নয়ত কি বাছা? কোম্পানির রাজত্ব গিয়েই ত' এই দুর্গতি। বলতে বলতে উঠে পড়লো।

হিরণ বললে, আসবার সময় অমনি একটা নাপতে ডেকে এনো, মানদা।

এক্ষুণি যাচ্ছি—এই ব'লে রান্নাঘর থেকে মানদা বেরিয়ে এলো।

মীরা বললে, ঘোলা জলে মাছ ধরতে আসা হয়েছে বুঝি?

মানদা একবার দুজনের দিকে তাকালো, তারপর চাপা খুশি চেপে রেখেই সটান বেরিয়ে চলে গেল।

হিরণ উঠে দাঁড়ালো। বললে, মাছ ধরতে পারলে দুটি মাছের ঝোল-ভাত এক্ষুণি খেতে পেতুম। পেটে আগুন জ্বলছে।

মীরা মুখ ফিরিয়ে চলে এলো, হিরণ এলো পিছু। মীরা বললে, খেতে চাইলে পয়সা লাগে, অমনি খাওয়া যায় না।

হিরণ বললে, ঘরে কি কিছু নেই?

আর্তকণ্ঠে মীরা বললে, না!

ও, অতিথিরা বুঝি সবই খেয়ে গেছে! হাঁড়ির মধ্যে খুঁজে দেখলে হয় না? অন্তর্যামী নারায়ণ বড়ই ক্ষুধার্ত! সত্যিই নেই কিছু? অন্তত এককণা শাকান্নের অবশেষ?

হঠাৎ আগুন হয়ে উঠলো মীরা। বললে, না, কিছু নেই। এখানে এসে আমাকে অপমান করার কোনো দরকার ছিল না।

হিরণ থমকে দাঁড়ালো। তারপর বললে, এতদিনের চাকরি, মাসে মাসে আড়াইশো টাকা—কিছু জমে নি?

তিনমাস হোলো সে চাকরি নেই। টাকার দরকার যদি হয়, ওঘরে ভক্তরা আছে।—চাইলে দশ-বিশ টাকা এখনই দেবে!—মীরা মুখ ফিরিয়ে নিল।

স্তব্ধ বিস্ময়ে হিরণ দাঁড়ালো। মীরার গলার ভিতর থেকে আসছে একটা ভাঙ্গা আওয়াজ। মাথার চুল রুক্ষ, জট পড়া, কপালে সেই অদ্ভুত নতুন ক্ষতচিহ্ন, তার নিচে চোখের কোলে কালির ছাপ। স্বাস্থ্যের দিকে তাকালে আজো গা ছমছম করে, কিন্তু তার পেলব চিক্কণতা যেন ছয়মাসের মধ্যেই নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। সমস্ত চেহারাটায় পড়েছে একটা ধূলিধূসর আবরণ, মনে হচ্ছে নিজের শারীরিক পরিচ্ছন্নতার দিকেও মীরার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। বুঝতে পারা যায় এ মেয়ে অসহায় নয়, এ শক্ত। আপন ওজঃশক্তির দ্বারা জীবনের উপরে দাঁড়িয়ে অধিনায়কত্ব করে না,—এ মেয়ে মর্মে মর্মে দগ্ধ হয়, একদিন জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়ে চলে যায়। এ মেয়ে লোভ আর লালসা নিয়ে জন্মায় নি, জন্মেছিল প্রবল একটা শক্তি নিয়ে—কিন্তু কালচক্রের কুটিল সংঘাতে সে প্রতিভা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। এ অসহায় নয়, ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে প্রকাণ্ড বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এ হোলো মীরা—অন্তরে অশ্রুমুখী বাহিরে রুদ্ধরোষের রক্তাভা! এ মেয়ে আত্মনাশ করবে, কিন্তু আত্মপ্রকাশ করতে চায় না।

বাইরে থেকে দরজা ঠোকা পড়লো। পাশের ঘরের ছেলেদের একজন বললে, আমরা কি আর অপেক্ষা করবো?

মীরা বললে, অনেক ধন্যবাদ আপনাদের। কিন্তু সেই চাকরিতে আমি আর ফিরে যাবো না।

তা হ'লে আপনার চলবে কেমন ক'রে? এত অভাব অনটনের মধ্যে আপনি থাকবেন,—এ আমাদের সকলের পক্ষেই লজ্জার বিষয়।

মীরা বললে, আমাকে আর কিছুদিন ভাববার সময় দিন।

বেশ ত', সময় নিন্ না। তবে যদি বলেন, আমরা এখন কিছু টাকাও আপনাকে দিয়ে যেতে পারি। নিন না গোটা পঞ্চাশেক টাকা--

অত্যন্ত বিব্রতকণ্ঠে মীরা বললে, আপনাদের কাছে ঋণ আমি মনে রাখবো। কিন্তু এখন আর টাকা চাইনে। দরকার হ'লে টেলিফোনে আপনাদের খবর দেবো।

অত্যন্ত বিমর্ষভাবে নমস্কার জানিয়ে তারা চ'লে যাচ্ছিল, হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে আবার একজন জিজ্ঞেস করলো, যে লোকটি তখন এলো, সে কে জানতে পারি কি?

পারেন বৈ কি—মীরা জবাব দিল, ও হোলো রাতদিনের লোক।

আপনার এখানে থাকতে এলো বুঝি?

সহসা হাস্যবাষ্প যেন এসে মীরার কণ্ঠের মধ্যে জায়গা নিল। বিরক্তি চেপে সে বললে, হ্যাঁ, লোকটি তেমন ভালো নয়, সব জায়গায় তাড়া খেয়ে আমার এখানে এসে উঠেছে।

সবিস্ময়ে তারা বললে, এমন লোককে জায়গা দিলেন?

জায়গা ত' দিইনি, জায়গা নিয়েছে! আচ্ছা নমস্কার! মীরা আবার দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এদিকে স'রে এলো।

তার কণ্ঠের মধ্যে রুগ্নতাটা যেন চিঁ চিঁ করছিল। সুতরাং পরিহাসটার মধ্যে সরসতা থাকলেও হিরণ হাসতে পারলো না।

মীরা এখানে ওখানে-সেখানে কী যেন খুঁজলো, তারপর টিনের তোরঙ্গটা খুলে ভিতরটা খানিকক্ষণ হাঁটকালো। শেষে নিরুপায় হয়ে ভিতরের দরজার চৌকাঠে গিয়ে পিছন ফিরে ব'সে পড়লো। হিরণ তার দিকে তাকিয়ে সমস্তটা লক্ষ্য করছিল,—কিন্তু এমন সাহস তার ছিল না যে, গত পাঁচ ছয় মাসের কাহিনীর সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করে। অবশ্য আভাসে আন্দাজে আলাপে মোট কথাটা জানতেও তার কিছু বাকি নেই। হঠাৎ ঝড়ে বানচাল হয়ে দিশেহারা জাহাজখানা ঘুরছিল অন্ধকার সমুদ্রে, এবার ধীরে ধীরে তলে তলিয়ে যেতে বসেছে।

সাধারণ লোক মনে করতো, মেয়েটা উদ্‌ভ্রান্ত, দুর্বলচিত্ত,—নিজের একটা যুক্তিহীন জিদের জন্য নিজের দুর্ভাগ্য টেনে এনেছে। রেফুজী মেয়ে,—হোক না কেন জমিদারের মেয়ে—যখন আশাভরসা আর কিছু নেই, তখন এমন হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা কেন? ছেলেটাকে স্বামী ব'লে মেনে নিয়ে কোথাও গিয়ে ঘর বেঁধে দুঃখের ভাত সুখে খেতে ত' পারতিস? এই প্রকার প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসানোর মধ্যে চরিত্রের শৈথিল্য নেই কি? তোর মধ্যে আছে কদর্য লোভ, কুৎসিত কামুকতা, বীভৎস বাসনার ক্ষুধা,—এটা চাপা ছিল তোর মধ্যে, অবস্থার বৈগুণ্যে সেগুলো প্রকাশ পাচ্ছে। তুই জীবেন্দ্রনারায়ণের মেয়ে হয়ে এই নোংরায় স্বেচ্ছায় ডুব দিলি! মুখে বলছিস প্রতিশোধ, আর ভিতরে ভিতরে লোভের আর বাসনার পরিতৃপ্তি! বিমলাক্ষের মতো দুশ্চরিত্র লোকও তোর দুষ্প্রবৃত্তির চেহারা দেখে ভয়ে পালিয়ে গেছে!

এটা সাধারণ লোকের কথা, হিরণের কথা নয়! হিরণ জানে, এর সবগুলোই মিথ্যে। সে জানে এগুলো অপমৃত্যুর আয়োজন মাত্র, কিন্তু এর মধ্যে মহিমার বিলুপ্তি নেই।

উষ্ণকণ্ঠে হঠাৎ মীরা বললে, মানদা গেল কোথায় ?

হিরণ বললে, নাপতের খোঁজে গেছে, আসবে এক্ষুণি।

মীরা বিরক্ত ও বিব্রত হয়ে উঠেছিল। এবার বললে, আমাকে এমন বিপদে ফেলা কেন? আমার নিজেরই চলে না, অতিথি সৎকার আমি করবো কোত্থেকে? আগে থেকে জানলে না হয় তৈরী হয়ে থাকতুম।

হিরণ এবার হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালো। বললে, থাক্, ব্যস্ত হ'তে হবে না। অতিথি হ'লে ভাবনার কথা ছিল বৈ কি। কিন্তু আমি যে বাস্ত দিনের লোক, মনিবের বাড়ী কি আব শুধু হাতে এসেছি?—এই ব'লে সে ঘরের কাজে লেগে গেলে।

বিছানাটা ঝাড়লো, ছাড়া কাপড় সরিয়ে একপাশে রাখলো বাসনগুলো গুছিয়ে এক কোণে সরালে, ছেঁড়া কাপড় একত্র ক'রে পুঁটলী বাঁধলো। কাপড়ের টুকরোর সাহায্যে জলে-ভাসা মেঝেটা পরিষ্কার করলো। দশ মিনিটের মধ্যে ঘরের চেহারাটা ফিরিয়ে দিল ঘরকন্না গোছাবার কাজ হিরণ ভালোই জানে।

মীরা বললে, এসব আচরণের মানে কি? আমি কিন্তু এক্ষুণি বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাবো!

হিরণ বললে, গেলে খুশি হই, আমিও পিছনে পিছনে গিয়ে একটা ভদ্র পল্লীতে বাসা নিই।

মীরা তৎক্ষণাৎ জ্বলে উঠলো। তপ্তকণ্ঠে বললে, ভদ্র পল্লীতে বাসা আমি নিতে পারতুম না? আমি জানিনে ভদ্র জীবন যাপন কাকে বলে? জা'ননে কাকে বলে ভদ্র মন?—বলতে বলতে অগ্নিশিখার মতো মীরা দাঁড়িয়ে উঠলো।

খোঁচাটা কোথায় লেগেছে হিরণ জানে। শান্ত দৃষ্টিতে সে তাকালো। দারিদ্র্যে দুরবস্থায় আর অপমানে মীরার আত্ম-চেতনাটা হয়ে উঠেছে ধারালো, সুতরাং আহত সর্প উঠে দাঁড়ালো ফণা তুলে। মীরা চেঁচিয়ে উঠলো, কেন এ দুর্দশা, কেন এ অপমান? কোথায় আমার দোষ? কেন বরদাস্ত করবো এ অনাচার? কা'দের অন্যায়ের জন্যে এই নোংরায় ডুবতে হয়েছে? আমি চললুম—

বাতাস পেয়ে দাবানল জ্বলে উঠেছিল। আলুথালু অবস্থায় মীরা ছুটে গেল সিঁড়ির দিকে। চিৎকার কতদূর অবধি পৌঁছলো ঠিক জানা গেল না, কিন্তু পলকমাত্র। তারপরই হিরণ দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তার হাতখানা ধ'রে ফেললো। চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে মীরা বললে, না, না, আমি চ'লে যেতে চাই, আমি মুক্তি চাই—

মৃত্যুর আগে মুক্তি নেই।--ব'লে হিরণ তাকে টেনে নিয়ে এলো। কিন্তু ঘরের দিকে আর নয়, সোজা তাকে ধ'রে নিয়ে গেল ভিতর দিকের কলতলায়। সেখানে গিয়ে তার আশৈশবের সহচারিণীকে ধ'রে জলধারার নিচে বসিয়ে দিল। মীরা প্রতিবাদ করতে গেল, হিরণ বললে, চুপ, আর কিছু শুনতে চাইনে।

জল পড়তে লাগলো মাথার চাঁদিতে; মীরা চোখ বুজে রইলো, হিরণ ধীরে ধীরে মাথার উপর হাত চাপড়ে দিতে লাগলো। গায়ে-মাথা সাবান ছিল হাতের কাছে, সেখানা সামনে এগিয়ে দিয়ে হিরণ গিয়ে ঘর থেকে আনলো তেলের শিশি আর তোরঙ্গ থেকে একখানা যেমন-তেমন শাড়ি। অস্ফুট শৈশবকালের সেই নিত্যসহচরী, মাঝখানে শুধু ঘ'টে গেছে যুগান্তর। সেই মানুষ হয়ত আজ হারিয়ে গেছে, কিন্তু সেই মন হারায়নি।

পিছনে দাঁড়িয়ে মীরার মাথায় চুলের জট ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে তেল আর সাবান দিয়ে হিরণ পরিষ্কার ক'রে দিল। এতটুকু আড়ষ্টতা নেই তুজনের, কেন না এতটুকু অস্পষ্টতা নেই দু'জনের সম্পর্কের মধ্যে। এখানে তাদের সত্য পরিচয়—বাকি পরিচয়টা হোলো লৌকিক, যেটা লোকসমাজের মুখচাওয়া। এক সময়ে হিরণ প্রশ্ন করলো, ঠাণ্ডা জল ভাল লাগছে?

মীরা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। পিছন দিকে ফিরলে সে দেখতে পেতো স্বভাব কবির এক জোড়া আশ্চর্য চোখ। সেই চোখ দুটোও রাঙ্গা, কিন্তু তাতে আছে একপ্রকার বিচিত্র কোমলতা; উৎপীড়িত মানবাত্মার জন্য যুগে যুগে যাদের চোখে বেদনার অশ্রু জমা হয়,—এ চোখ সেই মানুষের। হিরণ ওকে স্নান করিয়ে দিল।

স্নানের পর শাড়িখানা হাতে দিয়ে হিরণ বেরিয়ে এসে পুঁটলীর থেকে টাকা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। মিনিট পনেরো পরে সে যখন আবার ফিরে এলো, তখন তার সঙ্গে নিচের হোটেলের একটি ছোকরা তুজনের জন্য রান্না খাদ্যসামগ্রী নিয়ে উঠে এসেছে। হিরণের হাতে ছিল দই, মিষ্টান্ন আর কয়েক টুকরো পাতি লেবু। ছেলেটা ঘরের মধ্যে এসে দুখানা থালায় প্রচুর ভোজ্যবস্তু সাজিয়ে রেখে গেল।

মীরার হাত ধ'রে হিরণ পাশে বসিয়ে দিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে মানদা জানালো, নাপতে পাওয়া গেল না। কিন্তু মুখ বড়িয়ে তুজনের ভোজনপর্বটা দেখে সে হাসিমুখে স'রে গেল।

জানলাগুলি খোলা। ভরা রৌদ্র ছিল হেমন্তের নীল আকাশে। দেখতে

জানলে সমস্তটাই বিস্ময়কর লাগে! মীরার ক্লান্ত চোখ দুটো ছিল নিমীলিত, এতকাল পরে যেন সেই দৃষ্টিতে এসে স্পর্শ করেছে মধুর আবেশ। শিয়রে ব'সে হিরণ তার মাথার চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

মৃদুকণ্ঠে এক সময়ে মীরা বললে, তালতলার বাড়ীতে আমার দেনা আছে, ওটা তুমি শোধ ক'রে দিয়ো।

হিরণ প্রশ্ন করলো, আর কোথায় কে টাকা পাবে?

এ বাড়ীটা হোলো মানদার এক বোনপোর, তার কাছেও দু'মাসের বাড়ী ভাড়া বাকি, তাছাড়া বাইরের কিছু দেনা আছে।

হিরণ বললে, হাসন্ত যাবার আগে তোমাকে অনেক কাপড়-চোপড় কিনে দিয়েছিল,—আরো নানা জিনিসপত্তর,—সে সব গেল কোথায়?

মীরা বললে, মানদাই সব বিক্রি করেছে, নৈলে এতদিন চললো কেমন করে?

হাতের চুড়ি দু'গাছা?

মানদার ভাইপোকে দিয়েছি।

হিরণ বললে, মাঝে মাঝে দান-খয়রাৎ করা মন্দ নয়, —কিন্তু দেহটার ওপর অত্যাচার করলে যে সন্ন্যাসী হওয়াও যায় না, জানো?

মীরা চুপ ক'রে রইলো। হিরণ তার মাথার সামান্য ভেজা চুলের রাশির মধ্যে হাত বুলিয়ে চললো। এক সময়ে পুনরায় সে প্রশ্ন করলো, হাসন্ত যে কয়েক হাজার টাকা তোমার কাছে রেখে গিয়েছিল, সেগুলোও কি খরচ হয়ে গেছে?

মীরা কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলো। দেখতে দেখতেই আবার তার কণ্ঠে এলো উত্তেজনা। বললে, পাঁচ সাত দশ জনে মিলে বিলিতি হোটেলে চাক বাঁধলে সে-টাকা কতক্ষণ থাকে?

পাঁচ সাত জন!—হাসিমুখে হিরণ বললে, মানে?

মানে একটুও অস্পষ্ট নয়। সব যখন গেছে তখন দেহটাই বা থাকে কেন? কাক, চিল, শকুনি—দেশে অনেক আছে।—মীরা যেন ডুকরে উঠলো।

জানলা খোলা থাকলেও ঘরে বোধ হয় গুমোট ছিল। মীরার কপালে ও মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছিল। আঁচলটা টেনে নিয়ে হিরণ হাসিমুখে মীরার মুখখানা সযত্নে মুছিয়ে দিল। পরে বললে, চাকরিটা ছাড়লে কেন?

মীরা বললে, বিমলাক্ষ ডাক্তার কলকাঠি নেড়ে দিয়েছিল।

সবিস্ময়ে হিরণ বললে, সে কি! বন্ধু শত্রু হোলো যে?

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লে বন্ধুও শত্রু হয়। একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম,

সম্ভবত সেই দিনই সে আমার বাক্স-ডেস্ক হাঁটকে চিঠির তাড়া হাত সাফাই করে।

হিরণ বললে, শুধু চিঠির তাড়াটা নিয়েই সে তোমাকে রেহাই দিল? বিমলাক্ষর বন্ধুত্ব ত' এ ধরনের নয়!

ঘাড় বাঁকিয়ে মীরা বললে, আমার কাছে কি তুমি স্বীকারোক্তি আদায় করতে চাও?

হিরণ আবার হেসে উঠলো। সেই মধুর হাসি মীরার অজানা নয়। সেই সস্নেহ নম্র হাস্যে হিরণ বললে, মানুষ আজও সভ্য হয় নি, তাই আদিম বৃত্তি ছাড়িয়ে আজও সে ওপরে ওঠে নি। এতকাল আমি যাঁকে শ্বশুর মনে ক'রে এসেছি, যাঁর হাতে আমি মানুষ—তিনি এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন যে, মুক্তি যদি নিতে হয় তবে ভালবাসার শাসন-বাঁধনকেও স্বীকার করা চলবে না। কেন না ওর মধ্যেও আছে মানবিক হিংসা বিদ্বেষ ইতরতা, কাম ক্রোধ লোভ। তোমার কাছে স্বীকারোক্তি চাইনে, কিন্তু চেয়েছিলুম বিমলাক্ষকে জানতে। কাক-চিল-শকুনির দলে বিমলাক্ষও পড়ে, সুতরাং সে মানুষ নয়। মানুষ জানতো তোমাকে বিশ্বাস ক'রে কেউ কোনোদিন ঠকেনি!

মীরার চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল। কিন্তু আহত আতুর কণ্ঠে সে ব'লে উঠলো, তুমি বুঝি এবার আমাকে বিশ্বাসের বাঁধনে বাঁধতে চাইছ? এবার বুঝি আমাকে স্নান করিয়ে ঘরে তুলতে চাও? আমি অশুচি ব'লেই বুঝি আমাকে সান্ত্বনা দিতে এলে। নিচে নেমে গিয়েছি ব'লেই তুলে ধরতে চাইছ?

মীরার মাথার চুলের মধ্যে হিরণের হাতখানা হঠাৎ একবার থেমে গেল। কিন্তু সে অল্প কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপরে আবার তার আঙুলগুলি চুলের রাশির মধ্যে বিচরণ করতে লাগলো। এতটুকু উত্তেজনা তার মধ্যে নেই। গলাটা একবার সে পরিষ্কার ক'রে নিল. তারপর বললে, আজ আমার অভিমত শুনে তোমার কী হবে? আমাকে কি কখনো মানুষ ব'লে মেনেছ? পুরুষ ব'লে জেনেছ? থাক্ থাক্, জবাব আমি চাইনে।

মীরা জবাব দিল না, শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। হিরণ বলতে লাগলো, আমি আজো রূপকথার ভক্ত, আজো কবিতা লিখি মনে মনে। তোমাকে তুলে আনতুম মধুমতীর কোল থেকে, তুলে আনতুম তোমাকে গোলাপের বাগান থেকে,—যেখানে তুমি ঘুমিয়ে পড়তে চাঁদের আলোয়! তুমি পালিয়ে যেতে লোচন বিল পেরিয়ে বদন মিঞার বাড়ীতে জুলেখার ঘরে—আমি তোমাকে টেনে আনতুম আন্দকানের ভিতর থেকে। এক সংসারে মানুষ হয়েছি, একই থালায় খেয়েছি দুজনে, একঘরে ঘুমিয়েছি

বাল্যকাল থেকে! সেই তুমি আমার কাছে মিথ্যে নয়, এই তুমি আমার কাছে সত্যি নয়! মধুমতীর বুকের বিস্তার অনেক বড়, এপার ওপার দেখা যায় না—আজ যদি তার ওপর দিয়ে নোংরা কিছু ভেসেই যায়, তবে তাকে অপবিত্র ব'লে মনে করবো,—আমি কি এমনই ছেলেমানুষ?

মীরার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এলো।

হিরণ বললে, থাক্ এখন এ আলোচনা। তোমাকে শুধু জানিয়ে রাখি, তালতলার বাড়ীর সমস্ত দেনা আজ সকালে আমি শোধ ক'রে দিয়েছি, এখানকার দেনা দিয়ে দেবো। হাসনু যা টাকা দিয়েছে তাতে আপাতত চ'লে যাবে।

মীরা পাশ ফিরলো। বললে, পুলিশের চোখ এড়িয়ে কেমন ক'রে টাকা আনলে?

হিরণ গুছিয়ে ব'সে একে একে আনুপূর্বিক হাজিপুরের কাহিনী ব'লে গেল। তারপর বললে নতুন দারোগা যখন হারুমিঞার ঘর খানাতল্লাসী করতে এলো, হারুমিঞা তার চাদরের মধ্যে নিয়ে রাখলো টাকার পুঁটলি। সেই পুঁটলি নি'য় ফকির শেখ সোজা রওনা দিল কলকাতার দিকে। রাণাঘাটে এসে সে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। ফকিরের মায়ের দেনা কোনোদিন শোধ করতে পারবো না।

স্তব্ধ শান্তভাবে মীরা সমস্ত কাহিনী শুনে গেল। পরে বললে, ওরা কি হাসনুকে ছাড়বে কোনোদিন?

বোধ হয় না।

কিন্তু ধ'রে রাখতে কি পারবে? হাসনু ত' কোনদিন মাথা নিচু করবে না? যারা বাঁধবে তাদের বিপদ বেশি!

হিরণ বললে, হ্যাঁ, হামিদ নিজের বিপদ ডেকে আনলো।—কিন্তু আর নয়, এবার তুমি একটু ঘুমোও। আমি বাইরে যাবো।

অতি মৃদুভাবে মীরা ওর একখানা হাত ধরলো। তারপর বললে, কোথা যাবে? আজ না গেলেই চলবে না?

বুঝতেই পাচ্ছ, কিছু কেনাকাটা আছে। ঘর যে শূন্য!

যেন কিছু দুর্ভাবনা ছিল মীরার মনে। একটু ব্যস্ত হ'য়ে সে বললে, যাবে, কিন্তু—ধরো যদি—

হেঁট হ'য়ে হিরণ বললে, কি বলো?

না, কিছু না। কিন্তু—ফিরবে কখন?

সকৌতুক স্নেহে হিরণ তার দিকে তাকালো। বললে, এতদিন ভয় করেনি,—আজ একলা থাকতে বুঝি ভয় করবে?

মীরা বললে, না, যাও তুমি। তোমার যখন খুশি এসো—যেদিন খুশি এসো।—এই ব'লে সে ওপাশ ফিরে শুয়ে চোখ বুজলো।

হিরণ খুব হাসলো। তারপর গায়ে জামা চড়িয়ে টাকা সঙ্গে নিয়ে সে মীরার আদুগা গায়ের উপর আঁচলটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। আজও হিরণ একা থাকলে মীরা নিজের বয়সটা ভুলে যায়!

সমগ্র দীর্ঘপথের উপরটায় পড়েছে হেমন্তের উজ্জ্বল রৌদ্র। চারিদিক খুশিতে ভরা। খাটো লালপেড়ে ধুতিখানা হিরণের পরণে ছিল এবং গায়ে ছিল হাম্বুরান্নর কেনা সেই হাফশার্ট,—সবুজ রংয়ের ছিটের জামা, পিছন দিকে ইংরেজি হরফের ছাপ, দাম লেখা অত টাকা অত আনা। ওই নিয়ে ঘুরলো সে বউবাজার অঞ্চলের নানা পথে। পায়ে জুতো নেই, এক পা ধূলো। সুতরাং এক মুচির দোকান থেকে সে সস্তায় কিনলো এক জোড়া চটি। তলাটি বরাবের, হেঁটে গেলে মসমস্ করে না। রাস্তায় ব'সেছিল নাপিত, তার কাছে চুল ছেঁটে নিল কদমফুলের মতো, দাড়িটা নিল কামিয়ে। চেহারাটা দাঁড়ালো কেমন, সেটা দেখে নেবার জন্যে পানের দোকানের আয়নার সামনে এসে হাসিমুখে দাঁড়ালো। মুখখানা বড় পরিতৃপ্ত, আনন্দের চোটে এক খিলি পান কিনে মুখে পুরে দিল। পাশের দোকান থেকে একশো টাকার একখানা নোট ভাঙিয়ে পানের দাম দিল এক পয়সা।

পৃথিবীর আর কেউ দুঃখ পাচ্ছে কিনা তার জানার দরকার নেই। কেন না সে আর দুঃখ পাচ্ছে না। রৌদ্রটা কিছু গরম, কিন্তু তার গায়ে লাগছে হেমন্তের স্নিগ্ধ হাওয়া। এই হাওয়া একদিন লেগেছিল, সে যেদিন এম-এ পাস ক'রে বেরোয়। কি নিবিড় রসকল্পনা তার দুই চোখে, কত রঙে রঙীন তার মন। মধুমতীর ধারে ব'সে থাকতো রাজকন্যা এলোচুলে,—বিপুল ঐশ্বর্য হাতছানি দিয়ে ডাকতো তাকে হাজিপুর থেকে। তার স্বাস্থ্য, তার বর্ণ, তার মুখের লাবণ্য, এবং আতাম্র চুলের রাশির দিকে তাকিয়ে বন্ধুরা ভাবতো, এছেলে পূর্বজন্মে ছিল রাজকন্যা, এজন্মে রাজপুত্র? রেশম আর গরদ ছাড়া পোশাক ছিল না, এবং বাহান্ন ইঞ্চির কোঁচানো কাঁচি ধুতির অগ্রভাগ লুটিয়ে লুটিয়ে যেতো একদিন এই শহরেরই এপথে-ওপথে। রাস্তার লোক থমকে দাঁড়িয়ে যেতো তার দিকে চেয়ে।

কিন্তু পুরুৎ বামুনের ছেলে সে, হিরণ নিজে জানতো। তবু মন্দ কি, সে খেলাটা সেদিন বেশ লাগতো। আজো এ-খেলাটা নেহাৎ মন্দ নয়। খাটো কোরা ধুতি, আর ছাপমারা ছিটের হাফশার্ট। পানের দোকানের আয়নায় চোখ রেখে সে নিজের হাতের মুষ্টি পাকিয়ে দেখে নিল, স্বাস্থ্য আজও বেশ

ভালো। তাকে পুরুৎ বলুক, কিংবা বলুক নাপতে, কিছু এসে যায় না। রাজকন্যা তার মিলে গেছে—তবে কিনা কিছু ক্ষুণ্ণ, কিছু ভগ্ন! তা হোক, এখানে নৈতিক প্রশ্ন কিছু নেই, এটা আত্মিক ভগ্নতা। মীরাকে ভুল বুঝলে চলবে না,—কেন-না তার ঘটনাপরম্পরায় কোনো ভুল নেই। ঐশ্বর্য-সম্পদের মধ্যে সে মানুষ হ'লেও একটা বিশেষ আদর্শবাদ নিয়ে সে লালিত। তার মধ্যে সুস্পষ্ট যে চেহারাটা ছিল, সেটা অনেকটা দশভুজার পরিকল্পনা। মীরার দায়িত্ব ছিল লোক প্রতিপালনের। অসুরকে সে বিনাশ করবে, দুর্গতি হরণ করবে, অভয় দান করবে, অকল্যাণকে মোচন করবে। এই আত্মিক রূপটা মার খেয়ে গেছে ঘটনাচক্রে। এ অপরাধ মীরার নয়, এ যুগের মহিষাসুরের চক্রান্ত আবার সাফল্যলাভ করেছে, সেই কারণে আত্মিক শক্তি আজ শৃঙ্খলিত। দুর্গত মানুষ আর্তকণ্ঠে মুক্তির প্রার্থনা জানাচ্ছে চারিদিক থেকে। মীরার স্বপক্ষে এই কথাটা ভাবতে কবি হিরণের বেশ ভালো লাগলো।

বাজারে ঘুরে-ঘুরে সে কিনলো খানকয়েক ভালো শাড়ি এবং নিজের গায়ের মাপে কিনলো কয়েকটা ব্লাউজ। দোকানদার অবাক, কিন্তু সেই নির্বোধ ব্যবসায়ীকে এই গল্পটা শোনানো গেল না যে, এককালে মীরা আর হাসনু তারই গায়ের পাঞ্জাবী আর শার্ট প'রে লুকিয়ে যেতো ঠাকুর দীঘির ধারে গোলাপের বাগানে এবং এদিক থেকে একটা ব্লাউজ গায়ে চড়িয়ে হিরণ ওদের তাড়া ক'রে যেতো সেই বাগানের আড়ালে আবডালে। যাই হোক্, জামা আর কাপড়ের পর সে কিনলো নানাবিধ প্রসাধন সামগ্রী, এবং তার সঙ্গে ঘর-বসতি জিনিসপত্র আর বিছানা বাসন। পরিশেষে গোটা তিনেক মুটের মাথায় রাশি রাশি দ্রব্যসামগ্রী চাপিয়ে সে চললো বাসার দিকে। লোকে নাকি ঘরকন্নার বিবিধ সমস্যায় বিপযস্ত হ'য়ে থাকে, বাস্তব জীবন নাকি বড় কঠোর, দিন যাপনের নানা গ্লানি আছে নাকি মানুষের জীবনে,—কিন্তু কই, তিনটে মুটের মাথায় ওই ত' একটা সংসার চলেছে! যদি এখনই কেউ এসে তা'কে প্রশ্ন করে,—কি হে, সংসারধর্ম কিছু করলে নাকি? সে বললে, হাঁ, ওই যে তিনটে মুটে! ওদের মাথার ওপরেই আমার সুখ-দুঃখের বোঝা! ব্যাপারটা হোলো এই, সামাজিক জীবনে হিরণের কোনো দুঃখ নেই। সত্য বলতে কি, দুঃখ-দুর্দশাটা ভালো ক'রে সে বুঝতেও পারে না। হাসনু রাগ ক'রে বলতো, তোর লোভ নেই ব'লেই অভাব নেই। মীরা তামাসা ক'রে বলতো, যার আসক্তি নেই, তার আক্ষেপও নেই। যদি আমরা ওর সামনে মরতে বসি ও আমাদের শোকে কবিতা লিখতে বসবে, কিন্তু ডাক্তার

থাকতে ছুটবে না। কাঁচকড়ার পুতুল দেখতে চমৎকার, আদর ক'রে সাজিয়ে রাখো,—কিন্তু প্রাণ নেই।

এসব কথা হিরণকে শুনতে হোতো। প্রাত্যহিক প্রাণধারণ সমস্যাবোধ থেকে দূরে থাকতো ব'লেই বাস্তব অভিজ্ঞতা তার কম। তুমি যদি দুঃখ পাও সে মর্মাহত হবে, কিন্তু দুঃখ লাঘবের কোনো উপায় তার জানা নেই। কবিতার মধ্যে সে খুঁজে পায় প্রাণের গভীরতর চেতনা,—কিন্তু তাকে মুখের ওপর কোনো একটা আধ্যাত্মিক কিংবা আত্মিক প্রশ্ন করো, সে বোকা ব'নে যাবে। দুঃখ আর বেদনা বোধটা তার বৃহত্তম ক্ষেত্রে, এবং আনন্দটা তার নৈর্বক্তিক, অনেকটা যেন সন্ন্যাসী-ফকিরের মতো। ভালোবাসার স্বরূপটাকে সে বোঝে কাব্যদৃষ্টির দিক থেকে, কিন্তু মীরা যদি আজ হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসে, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?—হিরণ ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকবে। কোনো সদুত্তর তার মুখ দিয়ে কিছুতেই বেরোতে চাইবে না।

তিনটে মুটে চলেছে আগে আগে, আর সে চলেছে তাদের পিছু পিছু। আজকে তার সঙ্কটকাল উপস্থিত, সন্দেহ নেই। আজ তাকে দাঁড়াতে হবে মুখোমুখি একটা সংসারের সামনে। আজ একা মীরা, একা সে। মীরা নিজে ঘরকন্না চায়নি, এবং তার নিজের জানা সেই কোন্‌টির নাম ঘরকন্না। মেয়েরা জন্মায় ঘরোয়া হয়ে, পুরুষেরা জন্মায় বেপরোয়া হয়ে। ঘরকন্নার মাঝখানে এসে দাঁড়ায় দুটো বিপরীত শক্তি—ইংরেজীতে যাকে বলা হয় পজিটিভ আর নেগেটিভ। একটা চায় বন্ধন, একটা চায় ছেদন, একটা বলে, হাঁ—একটা বলে, না। কিন্তু এই দুই বিপরীত এবং পরস্পর-বিরোধী শক্তিতেই ঘরবাঁধা সহজ হয়। এই দুই শক্তি মিলেই আলোটা জ্বলে, কাজের চাকাটা ঘোরে। কিন্তু তবু এর মধ্যে আছে হিরণের সঙ্কট। নৈতিক নয়, মানসিক। বিবাহকে মীরা স্বীকার করেনি, কিন্তু উভয়ের সম্পর্কের অচ্ছেদ্যতাকে সে জেনে এসেছে আশৈশব। এটাকে এক কথায় আবাল্যের প্রণয়বন্ধন ব লে ঘোষণা করলে ভুল হবে, কেন-না এটা পারিবারিক। প্রণয়ের সম্পর্কটা আত্মিক, পারিবারিক সম্পর্ক অনেকটাই আধিভৌতিক, অর্থাৎ শ্মশানের চিতা ছাড়া তার আর কোনো পরিণতি ভাবা যায় না। সঙ্কট হোলো এইখানে।

তিনটে মুটে যদি এখনই তার চোখে ধুলো দিয়ে গা ঢাকা দেয় তাহলে হিরণের সংসারযাত্রার পরিকল্পনাটা আপাতত ধোঁয়া হয়ে যায় বটে এবং যদি যায়ও তা'তে খুব বেদনার কারণ থাকবে না—কিন্তু তবু মীরার সামনে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। মীরা বলেছে, ঘরকন্না চাইনে, বাঁধন চাইনে—কিন্তু যেমন আমরা ছিলুম তেমনি চাই। অর্থাৎ যেটা প্রয়োজনের বাইরে, লৌকিক

বিচার সিদ্ধান্তের বাইরে—যেটাকে বলা চলে মানুষের সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক। মীরা একবার বলতে চেয়েছিল স্বামীর সম্পর্ক কিংবা নরনারীর স্বাভাবিক সম্পর্কটাই হোলো জটিল,—সবসত্তার সজলতায় সেটা নিত্যই আবিল, সেটার থেকে মুক্তি দরকার। মীরা বলেছিল, দেশ-বিভাজনের সর্বনাশা সিদ্ধান্তের ফলে দেড় কোটি নিরপরাধ জীবন নষ্ট হয়ে গেছে,—ইতিহাস বরং এ অপচয় একদিন বরদাস্ত ক'রে নেবে, কিন্তু সর্বহারাদের মধ্যে নতুন ক'রে দুঃখের জন্ম না হয়। তারা যেন চলতি সমাজনীতি, অভ্যস্ত চিন্তাধারা, সস্তা জাতীয়তাবাদের বুলি, পুরনো ছাঁচের দেশপ্রেম, মূঢ় নেতাদের বহু চর্বিত উপদেশ, এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়। মীরা বলতো, অদূরদর্শিতা, ভ্রান্তি আর ক্ষমতালোলুপতার থেকে জন্ম হয়েছে লক্ষ্য লক্ষ্য পরিবারের দুর্গতি—তাদের সম্মিলিত অসন্তোষ যেন নূতন ভাব বিপ্লবকে ডেকে আনে। এক মুঠো অন্নভিক্ষার লোভে তারা যেন মূঢ় নেতৃত্বকে ক্ষমা না করে, তারা যেন সৃষ্টি করে নূতন জাত আর নূতন ধর্ম নূতন সমাজ আর নূতন নেতৃত্ব, নূতন ব্যবস্থা আর নূতনতর রাষ্ট্রের পরিকল্পনা। তাদের বিনিদ্র রক্তচক্ষু যেন নিত্য জেগে থাকে, ক্ষুধা আর অসন্তোষ যেন থাকে উদগ্র, বিষাক্ত ফণার আর শাণিত দংষ্ট্রার যেন তারা প্রতিকারের পথ খুঁজে বেড়ায়। মীরা একদিন চেঁচিয়ে বলেছিল, শান্তি, প্রেম, কল্যাণ, অহিংসা,—এসব কথা প্রচার ক'রে এসেছে যারা তারা আমাদের মতো পথের ধারে মুখ থুবড়ে পড়েনি' আজ সংগঠনের নামে সেই উদ্‌ভ্রান্ত নেতৃত্ব আবার নতুন ফাঁদ পেতে ডাকছে, আমরা যেন ধরা দিই, তাদের সর্বনাশা ভুলটার দিকে আমাদের চোখ না পড়ে!

হাসন্ত প্রশ্ন করেছিল, তুই কেমন ব্যবস্থা চাস, মীরাদি?

জানিনে। আমি চাই বিনষ্টির সঙ্গে বিলুপ্তি।

কিসের বিলুপ্তি?

আমাদের আগেকার মনোবৃত্তির। আজ সব চেয়ে বেশি মার খেয়েছে তারা, যারা সব চেয়ে বেশি দেশের কাজ করতে গিয়ে সব চেয়ে বেশি মার খেয়েছিল ইংরেজের হাতে। উপর তলাটা মার খায় নি, মার খেয়েছে মাঝের তলা আর নিচের তলা। যাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় রকমের বিবাদ্ ছিল, তাদের মধ্যে আপোষ ঘটলো, কিন্তু মার খেলে তারা—যার মার খেয়েছে, লাঞ্ছনা সয়েছে, দুঃখ পেয়েছে, দুর্দশায় ভুগেছে। যারা শিক্ষিত, ভদ্র, কর্মী—যাদের সাহায্যে দেশের সম্পদ তৈরী হয়, জাতির মেরুদণ্ড গ'ড়ে ওঠে, যারা সমষ্টির গৌরব আর গর্ব—তারা মার খেয়েছে।

হাসনু বলেছিল, এদের মনোবৃত্তির থেকেই কি জাতির গৌরব গ'ড়ে ওঠেনি? এই মনোবৃত্তির বিলুপ্তি চাস কেন?

হাজিপুরের রাজকন্যা জবাব দিয়েছিল, হ্যাঁ, চাই এর বিলুপ্তি। কেন-না এই মনোবৃত্তির মধ্যে ভয়ানক ফাঁকি ছিল, সেটি উনবিংশ শতাব্দীতে কা'রো চোখে পড়েনি। সম্পদ্, শিক্ষাব্যবস্থা সামাজিক আর রাজনীতিক আদর্শ,—এরা গ'ড়ে উঠেছিল এক বিশেষ শ্রেণীর চেষ্টায়, সমষ্টির পরিশ্রমের দ্বারা নয়, এবং এর সুফল ভোগ করেছিল সেই বিশেষ শ্রেণী,—কিন্তু সমষ্টি নয়। এই ভুলটি করবার জন্য জন্মেছিল বড় বড় প্রতিভা, যারা সেকালে সবিস্ময় শ্রদ্ধা পেয়ে গেছে। কিন্তু এই ভুলের প্রতিকার করবার জন্য সেদিন কোথাও কোনো মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করলো না!

হাসনু বলেছিল, তুই কি গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের কথা ভুলে গেলি?

ভুলিনি—মীরা বলেছিল, তাঁদের প্রতিভাকে পাই বিংশ শতাব্দীতে, তার আগে সেই মনোবৃত্তি অনেক নিচে শিকড় নামিয়েছে। সেই কারণে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের জীবন হোলো প্রবল সংগ্রামের, বিরাট ভাববিপ্লবের। কিন্তু সেই বিপ্লবের থেকে মহৎ শিক্ষা লাভ কই? আজও শ্রেণী শাসন করছে সর্বসাধারণকে। শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা, প্রভুত্ব, সম্পদ আর শক্তি। সাধারণ মার খাচ্ছে শ্রেণীর হাতে। শ্রেণীর যেখানে সাধারণের ভাগ্য বিড়ম্বিত আছে। অন্ধকারে আচ্ছন্ন চারিদিক, নৈরাশ্য নিঃশ্বাসে দিক্‌দিগন্ত মলিন, গূঢ় গুহার মধ্যে ব'সে অসন্তোষের দানব নিজের ছুরিতে ধারালো শান দিচ্ছে। হাসনু, চেয়ে দেখ্—আগামী-কালের প্রচণ্ড সংগ্রামে এই শ্রেণীগত মনোবৃত্তির বিলুপ্তি ঘটবে। তারই কথা ব'লে যাবো আমরা—যার লাথি খেয়েছি, মান খুইয়েছি, নিঃসম্বল হয়েছি, তারই গান আমরা গেয়ে যাবো, তারই সম্ভাষণ রচনা ক'রে যাবো, হাসনু!

২০

মুটে তিনটের মাথায় জিনিসপত্র নিয়ে হিরণ আবার যখন সেই বহুবাজারের বাড়ীর দরজায় এসে ঢুকলো তখন সন্ধ্যার আলো জ্বালা হয়ে গেছে। বড় পুলক তার মনে,—এই সব সামগ্রীর ওপর মীরার প্রসন্ন দৃষ্টি পড়বে, বড় বেদনা তার মনে—মীরাকে এতক্ষণ সে একা বসিয়ে রেখেছে!

সিঁড়ি দিয়ে আগে-আগে সে উপরে উঠলো, তারপর বারান্দা পেরিয়ে দরজার কড়া নেড়ে সে ডাকলো, মানদা?

তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে গেল। হাসিমুখে মানদা অভ্যর্থনা জানিয়ে বললে, এই যে,—আমি বলি সেই কতক্ষণ হলো লোকটা গেছে,—সন্ধ্যের আলো প'ড়ে গেল, এখনো দেখা নেই! ওমা, কত জিনিসপত্তর এসেছে! হবে না,—এ একেবারে জাত সাপ!

মুটে তিনটে জিনিসপত্র সযত্নে নামিয়ে তিনটি টাকা নিয়ে চ'লে গেল। সমস্ত সামগ্রীগুলি হরির লুটের মতো সাগ্রহে কুড়োতে কুড়োতে মানদা বললে, একঘর জিনিস! কোন্ দিক সামলাবো? সত্যি বলবো বাছা, এসব নিয়ে মস্ত সংসার পাতা যায়, কোন কিছুর অভাব থাকে না!—হঠাৎ গলা নামিয়ে সে পুনরায় বললে, তবে কি জানো? কথায় বলে, যদি হয় সুজন তবে তেঁতুল পাতায় ন'জন! কেন হবে না? ঠিক হবে। মন ফিরবে বৈ কি! মিষ্টি কথায় ডাকলে ভগবান সাড়া দেন, আর মেয়েমানুষের মন ফিরবে না? চন্দর-সূয্যি কি মিথ্যে হবে?

অতীব উদ্দাম অধ্যবসায় নিয়ে মানদা সমস্ত ঘর-বসতি জিনিসপত্র আর ভাঁড়ারে' ম..ন্দী একে একে ঘরে তুলতে লাগলো। এক সময় বললে, ওমা ওই বাসন্তী রংয়ের শাড়িখানা কী চমৎকার! আমার ভাইপো-বৌ মেনি—র'টা কালো বটে, কিন্তু ওখানা পরলে খাসা মানাতো! কালো মেয়েকে মানায় গোলাপী, আর নয়ত হলুদ রঙের কাপড়।

হিরণ বললে, বেশ ত', তোমার দিদিমণির কাছে চেয়ে নিয়ো?

তবেই হয়েছে!—মানদা মুখ তুলে বললে, মেয়েমানুষ হয়ে মেয়েমানুষের কাছে কখনো হাত পাততে নেই, বাছা। দশ আনা দেয়, ছ' আনা হাতে রাখে,—আর বুঝিয়ে দেয় ষোল আনা।

হিরণ জিজ্ঞাসা করলো, তোমার দিদিমণির ঘুম ভেঙেছে?

মানদা এক গাল হাসলো। বললে, তুমি এসেছ নতুন,—অনেকটা বাধা-বাঁধি, তাই আজ ছুঁড়ির মুখে হাসিখুশি। হবে না কেন বলো, টাকার ভাবনা যদি না থাকে, তবে কল্‌কেতা ত' হাতের মুঠোর মধ্যে! যাই, ঘরে আলো জ্বেলে দিয়ে আসি। তুমি ঠাণ্ডা হয়ে ব'সো।

মানদা গিয়ে ঘরে আলো জ্বাললো। হিরণ তার পিছনে পিছনে ঘরে এসে দাঁড়ালো। ভিতরে চেয়ে বললে, তোমার দিদিমণি কোথায়, মানদা? একলা তিনি বেরিয়ে গেলেন, তুমি মানা করলে না?

একলা!- মানদা আবার হাসলো। বললে, একলা কি গো? সোমত্ত বয়েস থাকতে আজকালকার মেয়েমানুষ কি আর একলা বেরোয়? আর বেরোলেই বা কি, ফুটপাথে নামলেই সঙ্গী জোটে।—আমি যাই বাছা গুছিয়ে সব রাখিগে।

মানদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, এবং বলা বাহুল্য, হিরণ ব'সে পড়লো ঠাণ্ডা হয়ে। বড়ই ঠাণ্ডা,—জানালাগুলো বন্ধ করতে পারলে ভালো হোতো। হঠাৎ শীত যেন প'ড়ে গেল ঘরের মধ্যে। হিরণ এদিক ওদিক তাকালো। বিছানাটা আগোছালো, এলোমেলো। মেঝের উপর ছড়ানো কয়েকটা সিগারেটের দগ্ধ অবশেষ আর ছাই, কয়েকটা পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি। আয়নার সামনে প'ড়ে রয়েছে পাউডারের গুঁড়ো-মাখানো একটা ছেঁড়া পাফ্, ভাঙ্গা চিরুণীতে ছেঁড়া চুল জড়ানো। ওপাশে টিনের তোরঙ্গটা হাঁ-করা—ভিতরটা ওলোট পালট। হিরণ যাবার সময় রেখে গিয়েছিল তার সেই টাকার পুঁটলী তোরঙ্গর মধ্যে লুকিয়ে। সে-পুঁটলীটির গেরো খোলা। বুঝতে পারা যায় তার মধ্যে ছোট নোটের তাড়াটা নেই। ছাগলের লোমগুলি টান্ মেরে ফেলে ছড়ানো রয়েছে মেঝের চারিদিকে। যে-শাড়িখানি পরা ছিল মীরার - সেখানা ছাড়া রয়েছে এক পাশে। অর্থাৎ ঘরের ভিতরে সমস্ত চিহ্নগুলিকে উদ্ধত ক'রে রাখা হয়েছে যাতে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিতে তার এতটুকু কষ্ট না হয়।

হিরণ হাসলো। ঘরের দেয়ালগুলো যেন তার দিকে চেয়ে বিদ্রূপ কটাক্ষ করছে,—তাই সে হাসলো। চিরুণী, পাউডার পাফ, সিগারেটের কুচি, আগোছালো বিছানা, পরিত্যক্ত শাড়িখানা,—ওরা তার ধৈর্যকে পরীক্ষা করবার জন্য যেন নিজের ইতিহাস নিয়ে জেগে রয়েছে। কিন্তু হিরণের শান্ত সর্বক্ষমাশীল হাসি ওদের বুঝতে পারবার কথা নয়। সে আস্তে আস্তে ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল।

সকলের আগে সে শাড়িখানা তুলে গুছিয়ে পাট ক'রে সযত্নে রেখে দিল। বিছানাটা দুই হাত দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার ক'রে তার শিরোভাগে বালিশটি সাজিয়ে রাখলো। চিরুণী থেকে চুলের জট ছাড়িয়ে সেখানা মুছলো, পাউডারের কৌটায় পাফটি রেখে দিল। কিন্তু ঘরের মধ্যে কোথাও ঝাঁটা নেই। সুতরাং তোরঙ্গর ভিতর থেকে নিজের পুঁটলীটি খুলে হিরণ তার গামছাখানা বার ক'রে ঘরটা পরিষ্কার করতে লেগে গেল। সিগারেটের কুচি আর দেশলাইর কাঠিগুলি দুই হাতে তুলে সে জানালা গলিয়ে ফেলে দিয়ে এলো। বাইরের রাস্তার কাদার দাগ জুতোর সঙ্গে এসেছিল ঘরের মধ্যে, গামছা দিয়ে হিরণ সমস্তই মুছলো। জর্দাপান এসেছিল কলাপাতার দোনায়,—সেই চুন-মাখানো দোনাটা সে মেঝের থেকে তুলে নিল। হোটেল থেকে বোধ হয় এসেছিল চপ-কাট্‌লেট্, তারই টুকরো ছড়ানো ছিল এধারে, হিরণ সেগুলো পরিষ্কার করলো।

সব কাজ সেরে কাঁধের ওপর গামছা ফেলে কলসীটা হাতে নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তারপর কলতলায় হাত-পা ধুয়ে গামছাখানা কেচে এক কলসী জল নিয়ে আবার ফিরে এলো ঘরে। ঠিক এমন সময়ে মানদা এলো পিছনে পিছনে। গলা বাড়িয়ে বললে, হঁ্যা গো বাছা, কলার পাতায় অত ফুল আর ফুলের মালা এনেছ কেন? পুজো-টুজো করো বুঝি?

হিরণ ব্যস্ত হয়ে বললে, না, তা ঠিক নয়,—তবে হঁ্যা, সস্তায় পেলুম কি না, তাই কিনে আনলুম। ওগুলো এ ঘরে এনে দাও, মানদা। ওরই সঙ্গে আছে চন্দন-ধূপের বাণ্ডিল,— ওটাও নিয়ে এসো।

মানদা সেই মস্ত কলাপাতার মোড়কটা এনে ঘরের কুলুঙ্গিতে রাখলো। তারপর বললে, সেই দুপুরে বেরিয়েছিলে রোদ্দুরে, গলাটা শুকিয়ে গেছে। দাঁড়াও বাছা, খাবার জল এনে দিই।

মুখ ফিরিয়ে মানদা একটু মুচকি হাসলো, তারপর তাড়াতাড়ি একঘটি জল এনে হাজির করলো। মানদার কথাটা মিথ্যে নয়, সত্যই তার তৃষ্ণা ছিল, জল পাওয়া মাত্রই সম্পূর্ণ একঘটি জল সে আলগোছে পান ক'রে নিল।

ঘরের ভিতর এদিকে ওদিক তাকিয়ে মানদা প্রশ্ন করলো, তুমি বুঝি ওদের দেশের বাড়ীতে চাকরি করতে?

হিরণ বললে, হঁ্যা, তা অনেকটা—

তোমার সঙ্গেই বুঝি পেরথম দেশ ছেড়ে এসেছিল?

কথাটা ঠিক তা নয়, তবে আগে-পরে এসেছিলুম আর কি।

মানদা বললে, তোমাদের ভেতর এতই যদি ভাব, তবে তোমার অবাধ্য হয়ে হাতছাড়া হয় কেন?

হিরণ এবার খুব হেসে উঠলো। বললে, ওই আর কি। মানে ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ত!

বুঝতে পারবে না কেন? জলের মতন পরিষ্কার। এখন দেখছি তোমার বাছা কম্ম নয়, রাশ টানতে না জানলেই ঘোড়া ক্ষেপে ওঠে। তুমি বাছা ভালো মানুষের ছেলে। কথায় কথায় মেয়েমানুষের পায়ে যে ধরে, সে একদিন লাথি খায়। আমি বলি কি, তুমি ওর ঘরকন্না গুছিয়ে দিয়ে দেশে ফিরে যাও।

মুখের হাসি চেপে হিরণ বললে, তোমার দিদিমণি তাহ'লে এখানে একা থাকবে বলছ, মানদা?

মানদা বললে, ও আবার কোন্ বেমক্কা কথা? বয়স্ থাকতে মেয়েছেলে একা থাকবে কেন। মানুষ হোলো লক্ষ্মী! খালি ঘর পেলেই মানুষ এসে জায়গা নেবে। যাবার সময় তুমি যেন বাছা শাপ-মন্যি দিয়ে যেয়ো না।

হিরণ সহাস্যে বললে, ভেবে-চিন্তে দেখে তোমার উপদেশটাই নেওয়া উচিত মনে হচ্ছে, মানদা।

মানদা বললে, আর যদি মনে করো কিছু নগদ টাকা দিয়ে দেওয়া উচিত, তাও আমার হাতে দিয়ে যেতো পারো।

হিরণ বললে, বটেই ত', তুমি ঠিক বলেছ। আচ্ছা—

মানদা একবার আড়চক্ষে তাকিয়ে সেখান থেকে স'রে গেল।

কিছুক্ষণ পরে মানদা আবার এসে দাঁড়ালো। বললে, তবে কি এখনই যাবে বাছা? আমি তা হ'লে দোর-তাড়া দিয়ে একটু শুই।

হিরণ বললে, এখুনি চ'লে যাওয়াই দরকার বলছ?

গেলেই ত' ভালো, নৈলে মিথ্যে ঝামেলা বাড়ানো। ছুঁড়ি কি আর মুখে আমায় কিছু বলেছে? তবে তুমি এখানে থেকে গেলেই সে খুশি হয়, আমি জানি। তুমি চ'লেই যাও, বাছা।

তোমার দিদিমণি ফিরবে কখন্?

ফেরবার কি আর ঠিক আছে? একবার বেরোলে দুদিন তিনদিন নিরুদ্দেশ!—মানদা বললে, তবে কিনা আজ তোমার সঙ্গে আছে টাকার গন্ধ, আজ তাড়াতাড়িই ফিরবে। টাকার লোভে সর্বস্ব বেচে খেলে, দেখছ ত'?—বলতে বলতে মানদা এবার সিঁড়ির দিকে তাকালো। পরে পুনরায় বললে, হ্যাঁ, রাত দশটার মধ্যে ঠিকই ফিরে আসবে। এলে আমি বলবো গুছিয়ে যে, তুমি সন্ধ্যের গাড়ীতে দেশে চ'লে গেছ। আগে ভাগে যাওয়াই ভালো,—সে ত' আর একা আসবে না। তখন একটা গোলমাল লেগে যাবে। বাবুরা তোমাকে কেনই বা বরদাস্ত করবে বলো?

হিরণ প্রশ্ন করলে, তুমি কত মাইনে পাও মানদা?

মানদা বললে, মুখের কথায় পাই পঁচিশ টাকা, কিন্তু আজ অবধি একটি পয়সাও পাইনি। মাইনে পেলে ভাবনা কি বলো?

তাহ'লে তোমার চলে কেমন ক'রে?

চলে না, বাছা! এ চাকরি কি আর তেমন যে উপরিতেই চ'লে যাবে? আমরা বাছা এঘরে, ওঘরে কাজ করি, কিন্তু মাইনের তক্কা রাখিনে।

হিরণ বললে, এখানে ক'মাসের বাড়ীভাড়া বাকি!

মানদা বললে, এই তিন মাসের পড়েছে। বাড়ীঅলা আমার নিজের লোক, তাই এখনো নালিশ-ফোরেদ করেনি। অন্যলোক হ'লে এতদিনে ঘুঘুর ফাঁদ দেখাতো। আমি ভালো কথাই বলেছিলুম, বাছা। পাঁচটা মেয়ে যেখানে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে, সেইখানে একখানা ঘর নিয়ে থাকোগে। ওমা

ছুঁড়ি একেবারে কুলোপনা চক্কর নিয়ে উঠলো ! বললে, মানদা, তোর এত বড় আস্পর্ধা, তুই মানহানির কথা বলিস ? কী মনে করেছিস আমাকে ?— আমি আর কি বলি, চুপ ক'রে গেলুম। সেখানে গেলে রোজগারও বেশি হোতো, ঘরভাড়াও ক'মে যেতো। ঘরকন্না গুছিয়ে নিতে গিয়ে না হয় একটু মানই খোয়ালি বাছা ?

হিরণ বললে, বটেই ত' ! বুদ্ধি বিবেচনা থাকলে কি আর এই হাল হয়, মানদা ! তোমার মতন সৎপরামর্শ আর কে দেবে বলো ?

মানদা সোৎসাহে বললে, বলো দিকি বাছা ভালো মানুষের ছেলে ? মেয়েটার মতিগতি ভালো হ'লে আমিও আমার আখের গুছিয়ে নিতুম। এই সেদিন পর্যন্ত এক বিলেত-ফেরতা ডাক্তার আসতো মোটরগাড়ী হাঁকিয়ে —আহা, চাঁদপানা মুখ, বড়ঘরের ছেলে—

হিরণ প্রশ্ন করলো, ডাক্তার ? কী নাম ?

মানদা একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ বললে, মনে পড়েছে। বিমল ডাক্তার। একেবারে রূপে গুণে ! তাকে একদম মেরে তাড়ালে, বাছা ? ভদ্দরলোকের ছেলের গায়ে হাত তুললে ?

হিরণ শিউরে উঠে বললে, সে কি ! কী বলছ মানদা ?

আর কি বলছি ? পায়ের কাছে টাকা এনে ঢেলে দিচ্ছিম। কিন্তু তাই বলে তার সখ-আহ্লাদ নেই গা ? একদিন বাছা বড়মানুষের ছেলে এই বারান্দায় প'ড়ে রইলো,—সমস্ত রাত সেদিন কী বিষ্টি ! তুই ছুঁড়ি একবার ডাকলিনে লোকটাকে ঘরের মধ্যে ? এতটুকু আক্কেল-বিবেচনা নেই ? সেদিন রাত্তিরে দুঃখু ক'রে বিমল ডাক্তার বললে, মানদা, তোমাকে বলবো কি, আমার বুকের মধ্যে ঘা হয়ে গেছে ! এ যাতনা আর আমার সয় না !

তার পর ?

তারপর সেই একদিন,—মানদা অকপটে ব'লে গেল, লোকটা অবিশ্যি একটু বেপরোয়া হয়েই এসেছিল এখানে—

হিরণ বললে, বেপরোয়া কি রকম ?

বোধ একটু টলটলে ছিল, এই আর কি। ঘরের ভেতরে হঠাৎ চেঁচামেচি, গালমন্দ, আমি ছুটে গিয়ে দেখি—ওমা, ছুঁড়ি একেবারে রণরঙ্গিণী ! কিল, চড়, লাথি - সমানে মারছে ডাক্তারকে, আর ডাক্তার একেবারে চুপ !—মানদা সেদিনকার কথা স্মরণ ক'রে বলতে লাগলো, মেয়ের কি আস্পদ্দা ! গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে তাকে বলে, শুয়ারের বাচ্চা, আমার গায়ে তুই হাত দিস ? বেরো, দূর হ !--শোনো কথা ! তুই এমন কি সতীসাধ্বী যে ছুঁলেই একেবারে

মহাভারত অশুদ্ধ? তার ফলে কি হোলো জানো বাছা? সেই থেকে ডাক্তারকে হারালো!

হিরণ বললে, বুদ্ধির দোষ ছাড়া আর কি বলবো বলো?

মানদা বললে, ডাক্তারের কাছে আমি শুনেছি, একটা মোছলমানের মেয়ে নাকি ওর স্বামীকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। সেই থেকেই ওর মাথার দোষ।

ওর বুঝি বিয়ে হয়েছিল, মানদা?

মানদা ভুরু কঁচকে বললে, তুমি বুঝি জানো না? তুমি না ওর দেশের লোক? আর কেমন ক'রেই জানবে, তোমার চাকরি ত' গেছে অনেকদিন। কিন্তু কি জানো বাছা, পুরুষ মানুষকে ওই ছুঁড়ি এমন হেনস্তা করে—তারা যেন বেড়াল-কুকুর! অমন করলে কি আর আখের ভালো হয়। মেয়েটার মাথার ঠিক থাকলে এদ্দিনে দুয়োরে হাতী বেঁধে রাখতে পারতো।

হিরণ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তারপর বললে, মানদা, তুমি জানো ওর লিভারের ব্যথাটা কতদিন হয়েছে?

তা মাস দুই প্রায় হোলো।

চিকিৎসা কিছু হয়েছে বলতে পারো?

মানদা বললে, পোড়া কপাল! চিকিচ্ছে কে করবে? নিজের ওপর অত অনাচার করলে ডাক্তার-বদ্যির বাবার সাধ্যি কি ভালো করে?

হিরণ পুনরায় চুপ ক'রে রইলো। তার যাবার কোনোরকম লক্ষণ না দেখে মানদা এক সময়ে বললে, আজকের রাতটা আর তুমি নড়তে চাও না, কেমন বাছা? তা বেশ থাকো, কিন্তু সাবধান, বাছা পুরুষ মানুষ,—একটু সাবধানে ওর কাছে থেকো।

হিরণ সহাস্যে বললে, কেন বলো ত'?

দুষ্টু ঘোড়া,—বাগ মানে না! বায়না-আবদার যদি ধরো তবে তোমার কপালে অনেক অপমান আছে ব'লে রাখলুম! ওই সিঁড়ির পাশে কোণে শুয়ে থেকো রাতটা, কাল সকালে উঠে চ'লে যেয়ো।

তোমার মনে কি দুর্ভাবনা আছে মানদা?

মুখ বাড়িয়ে মানদা বললে, তুমি বাছা চাকর-বাকরের সামিল, আমার কিসের দুর্ভাবনা বলো? আমি শুধু সাবধান ক'রে দিচ্ছি। কই কিছু টাকা দেবে বললে যে?

হিরণ বললে, হ্যাঁ উনি আসুন—টাকাকড়ি ওঁরই কাছে রেখে গেছি। কাল সকালে তোমায় টাকা দেবো।

ওর কাছে? এই ঘরেই টাকা ছিল নাকি? ওই ভাঙ্গা তোরঙ্গয়? ওমা,

আমি মনে করি ঘরে বুঝি কিছু নেই!—মানদা বড় বিমর্ষ হয়ে সেখান থেকে স'রে গেল, মুখে চোখে তার বড় অনুশোচনার চিহ্ন।

আলোটা জ্বলছে। কাছাকাছি কোথায় যেন ঘড়িতে টং ক'রে একবার মাত্র আওয়াজ হোলো। হিরণ বসে রইলো অনেক্ষণ। কান রাখলে নিচের দিকটার সিঁড়িতে। কিন্তু এইভাবে ব'সে থেকে তার তন্দ্রা এলে চলবে না। এ ঘরে এখনও তার অনেক কাজ বাকি। সে উঠে বাইরে এলো।

নতুবা বিছানা সে কিনে এনেছিল। নতুন কার্পেট শতরঞ্চি তোষক বালিস চাদর আর বেড-কভার। সে এনেছিল আয়না চিরুণী কাঁটা ফিতে পাউডার তেল আর পমেড, স্নো আর ক্রীম,—তার সঙ্গে আরো অনেক সামগ্রী। এনেছে মেয়েদের বিবিধ অঙ্গসজ্জা। হিরণ একে একে সমস্ত জিনিসপত্র শয্যাদি এনে ঘরটিকে পরিপাটি করে সাজাতে লাগলে। হাজিপুরের রাজ বাড়ীতে ঘুমের সময় মীরা দুতিনটে নরম নরম বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকতে ভালোবাসতো, ভালোবাসতো মখমলের কোলবালিস,—হিরণ সেকথ ভোলেনি। মীরা বলতো, শাড়ি আর জামা গায়ে থাকবে বটে, কিন্তু এমন মিহি হওয়া চাই যে, তার বন্ধন টের পাবো না। শোবার ঘর হবে শয়নমন্দির, —সেখানে থাকবে ধূপের ধোঁয়ার মায়াজাল, গোলাপের গন্ধের মোহলোক মাথার শিয়রে বাজবে অতি মৃদু জলতরঙ্গের সুর, আর অস্পষ্ট রঙ্গীন আলোয় অশরীরী স্বপ্নরা আনাগোনা করবে তন্দ্রায়। জ্যোৎস্নার পাখিরা ডাকবে দূর আকাশে, মাথার দিকে জানালা থাকবে খোলা যার নিচে কাছে কামিনীর বন, আর মধুমালতীর ঝোপ। এখন একটা বন্দলোকের মাঝখানে থাকতে হবে শয়নমন্দির, নৈলে সুখ নেই। বিছানার এপাশ থেকে হাসমু বলতো, সে মন্দিরের ঠাকুরটি কে? মীরা জবাব দিত, আমি তার একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী! ওপাশের বিছানা থেকে হিরণ বলত, দেবী মাত্রই স্বার্থপর। পূজো না পেলেই শাপ দেয়। মীরা বলতো, আমার পুজো পাবার দরকার নেই, আমি একাই থাকবো সেই মন্দিরে।

একাই থাকুক মীরা, কিন্তু আনন্দে থাকুক। তাকে ঘিরে থাক প্রসন্ন শান্তি, নির্মল বাতাস, অনির্বাণ জ্যোতির্ময়তা। হিরণ ধূপদানিতে চন্দনধূপ জ্বালালো, পুষ্পাধারে রাখলো ফুলের তোড়া, শুভ্রশয্যার শিয়রে রাখলে যুঁইফুলের মালা। মীরা আসবে অসীম ক্লান্তি নিয়ে—সুতরাং ঝালরদেওয়া একখানা হাতপাখা রাখলো সে হাতের কাছে।

একবার বাইরে এসে হিরণ ঘরের ভিতরের দিকে চেয়ে দাঁড়ালো। ফুল

শয্যার ঘর এটা নয়, কিন্তু অনেকটা যেন সত্তবিবাহের পর বাসরঘরের মতো। সমস্ত ঘরখানা যেন ঝলমল করছে। যা কিছু জীর্ণ আর মলিন, আবর্জনা আর জঞ্জাল,—নববসন্তের আবির্ভাবে সমস্ত যেন ঘুচে গেছে, মুছে গেছে। কিন্তু মীরা যদি তার ক্লান্তির সঙ্গে ক্ষুধা নিয়ে আসে? যদি এসে বলে মিষ্টিকথায় পেটের জ্বালা যায় না?

খুব স্বাভাবিক। হিরণ একবার মানদার মণ্ডলের দিকে তাকালো। সেখানে কোনো সাড়া শব্দ নেই। তৎক্ষণাৎ সে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে রেখে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চ'লে গেল। মানদা বোধকরি ঘুমিয়ে পড়েছে।

ফিরে এলো সে মিনিট পনেরো বাদে। হাতে তার অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য-সামগ্রী। নিজের মনেই ঘরে ঢুকে সে কাচের ডিসে খাবারগুলি সাজিয়ে মিহি একখানা তোয়ালে চাপা দিয়ে সযত্নে কুলুঙ্গীতে গুছিয়ে রাখলো।

দূরে ঘড়িতে বাজলো দশটা। হিরণ বাইরে এসে বসলো।

বারান্দার বাইরে হেমন্তের আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না, কিন্তু তার সঙ্গে জড়ানো আছে হিমেল ধূসরতা। নগরের জনতা এবং যানবাহনের কোলাহলে চারিদিক মুখর। কিন্তু সমস্ত কলেবরে বাইরে একান্ত সে একা, যেমন ওই অনন্ত গগনে একা চন্দ্র। দুঃখ লজ্জা বেদনার অতীত একজন ব'সে থাকে তার মধ্যে—যে হোলো নিরাসক্ত আর নির্বিকার। শোকে সে অভিভূত নয়, অপমানে সে নতশির নয়, পৃথিবীর কোনো বঞ্চনায় সে বিক্ষুব্ধ নয়, কোনো আঘাতে সে ক্ষুণ্ণ নয়। সে সদাজাগ্রত, নির্বাক, নিষ্কাম নিষ্কলুষ। অসম্মান, প্রতারণা, অভাব, অধঃপতন—কোনো কিছুই তাকে স্পর্শ করে না।

ধূপ জ্বলছে ভিতরে, আলোটাও জ্বলছে, গোলাপের গোছা আপন হৃদয়ের সুবাস বিকীর্ণ করছে, দুগ্ধশুভ্র শয্যা রয়েছে তার জন্য—সে আসবে, ওরা তাকে বরণ করবে। সুশীতল পানীয় উৎকৃষ্ট ভোজ্যসম্ভার,—সে আসবে ক্লান্ত দেহে। মন, প্রাণ, সত্তা, আত্মা, চিন্তা, আন্তরিকতা,—সমস্ত উন্মুক্ত উৎসুক হয়ে রয়েছে, সে ফিরবে! আপন ভ্রান্তির থেকে সে ফিরবে, দুঃস্বপ্নের থেকে ফিরবে, শোক-তাপ-আত্মগ্লানি আর আত্ম-নিপীড়নের প্রবৃত্তির থেকে সে ফিরবে, উদার আলোয় জ্যোতির্ময় জীবনে সহজ চিন্তাধারায় প্রসন্ন আনন্দে নির্বিকার শান্তির মধ্যে সে ফিরবে?

ভিতরের মানুষটাই প্রশ্ন করলো, তোমার এ আয়োজন কেন,—তুমি কি ভালোবাসা চাও?

হিরণ হাসলো। শিশুকাল থেকে ওটা কি সে চেয়েছিল? ওটা কি কৈশোর তারুণ্যে যৌবনে মনে পড়েছিল? কখনও কি তার জীবনে এই

লৌকিক শব্দটা অভিব্যক্ত হয়েছে? কখনো কি সে আবেদন করেছে, কিংবা দাবি জানিয়েছে? ওটার নির্যাস হলো জৈবিক, ওটার চিন্তা ও স্বপ্ন হোলো মানসিক,—কিন্তু প্রেমের চেতনার দিক থেকে যে জ্যোতির্ময়তা বিচ্ছুরিত হয়, সত্তার পরম অভিব্যঞ্জনার যে প্রজ্ঞার আভা বিকীর্ণ হতে থাকে,—কবি হিরণের অন্তশ্চক্ষু সেই দিকে নিত্য জাগ্রত। সেই কারণে ভালোবাসার থেকে সে পেয়েছে কল্যাণের স্বরূপকে, পেয়েছে উদার সমবেদনা-বোধ, পেয়েছে লোকোত্তর আনন্দ, পেয়েছে সমস্ত লৌকিক সংসার যাত্রার সহস্র প্রকার বিপর্যয়ের মধ্যে একটি অনাহত অব্যয় অক্ষয় মহাশান্তি। হিরণ তার ইহলৌকিক জীবনে কোথাও কখনও বঞ্চিত হয়নি।

হঠাৎ তার ঘুম ভাঙলো। ঘড়িতে যেন কোথায় ক'টা বেজে গেল। হিরণ উঠে বসলো বারান্দায়—সর্বশরীরে শীত ধ'রে গেছে। আকাশে চন্দ্র কখন যেন পশ্চিমে অস্ত গেছে, নক্ষত্রের দল অন্ধকারে দপদপ করছিল। রাজপথের কলরোল কোন এক সময়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। হিরণ উঠে পড়লো।

আলোটা জ্বলছে ভিতরে। ধূপগুলি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গোলাপের গোছায় আর একটুও গন্ধ নেই। কিন্তু ঘড়ির শব্দে ত' তার ঘুম ভাঙে নি! মেঝের উপর কান পেতে সে শুয়েছিল, আওয়াজ পেয়েছিল নিচের থেকে। হিরণ বারান্দার ধার দিয়ে সিঁড়িতে নেমে গেল এবার মনে পড়েছে মোটরের হর্নের শব্দে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙেছে। সদর দরজাটা খোলা এবং তারই ঠিক সামনে সহসা তার চোখে পড়লো, অত্যন্ত নোংরা জায়গাটার ধারে মীরা বেহুঁশ হয়ে প'ড়ে আছে। সম্ভবত সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে গিয়েছিল, সেইজন্য দুটি ধাপের ওপরে রয়েছে তার আধখানা দেহ, বাকি অংশটা নোংরার দিকে ছড়িয়ে গেছে। রাস্তার থেকে আলোর আভাটা এসে পড়েছে যেন একরাশ লাবণ্যের উপর। হিরণ পাশ কাটিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে খিল তুলে দিল। কোনো উত্তেজনা তার নেই।

উপরের ঘরে মীরাকে তুলে এনে সে বিছানায় শুইয়ে দিল। মীরা একবার তাকালো, কিন্তু তাও ঘন নিদ্রা—আবার সে চোখ বুজলো। কপালে তার ঘামের বিন্দু ফুটে রয়েছে, শরীরের উপর তার কোনো আধিপত্য নেই। একখানা গামছা ভিজিয়ে এনে হিরণ তার মুখখানা মুছিয়ে দিল। কপালের কোণে সেই ছোট ক্ষতচিহ্নটা লেগে রয়েছে। চন্দ্রের জীবনে প্রথম কলঙ্কের রেখাপাত। হিরণ তক্তার ওপাশে গিয়ে মীরার দুই পা থেকে জুতো জোড়াটা খুলে নিল। আলোটা পড়েছে মীরার মুখের ওপর, বিশেষ একটা কৌশলে আলোটা সে ঢাকা দিয়ে এলো। মাঝে মাঝে মীরার কণ্ঠের থেকে উঠেছে

একটা শব্দ,—সেটা আর্তস্বর! হিরণ অতি মৃদুভাবে কিছুক্ষণ কাছে দাঁড়িয়ে পাখার বাতাস করতে লাগলো। অঘোরে ঘুমোতে লাগলো মীরা।

গলার কাছে জামার মধ্যে কি যেন একটা মোড়ক উঁকি দিচ্ছিল। হিরণ অতি সন্তর্পণে সেটি বা'র করে নিল। সেট রুমালে বাঁধা একটি পুঁটলী,—খুলে দেখা গেল এক তাড়া নোটের গোছার সঙ্গে একটি শিশি। শিশির মধ্যে লাল-সবুজ বর্ণের বিচিত্র কয়েকটি ট্যাবলেট্‌। মাস ছয়েক আগে এমনি একটা ট্যাবলেট্‌ সে তালতলার বাড়ীতে কুড়িয়ে পেয়েছিল। হিরণ সেগুলো নাড়া-চাড়া ক'রে দেখতে লাগলো।

দেখতে দেখতে প্রভাত হোলো, ঘরের আলোটা নিষ্প্রভ হয়ে এলো। কাকের ডাক শোনা গেল বাইরের থেকে। হিরণ জানলা দিয়ে একবার লক্ষ্য ক'রে ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিল। ঘড়িতে পাঁচটা বাজলো!

জানালা দিয়ে প্রভাতের আলো যখন এসে পড়েছে মীরা তখন পাশ ফিরে তাকালো নিমীলিত চোখে। হিরণ পাশে বসেছিল। মীরা মৃদুকণ্ঠে বললে, এখানে কখন এলুম? কোথায় যেন ছিলুম!

আরেকটু ঘুমোলে সব মনে পড়বে!—হাসিমুখে হিরণ বললে।

মীরা চোখ বুজলো। হিরণ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওঘর থেকে মানদার সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল।

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে হিরণ ফিরে এলো। কাঁচের গেলাসে লেবুর সরবৎ নিয়ে সে যখন ভিতরে এসে দাঁড়ালো, মীরা তখন স্নান ক'রে পরিচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। গ্লাসটা তার হাতে দিয়ে হিরণ বললে, লিভারের ব্যাথাটা কেমন আছে?

এখন নেই।

এর মধ্যে স্নান করলে যে?

মীরা বললে, হয়ত কেউ আসবে, তৈরী হয়ে থাকি!

হিরণ হাসলো। বললে, বিদ্রূপ বুঝলাম। কিন্তু আমি ছেলে ভালো, যে-কোনো পরীক্ষায় পাস ক'রে যাবো। একটু বসো, এক্ষুনি চা আসছে।

লেবুর জল পান ক'রে মীরা এদিক ওদিক তাকিয়ে বললে, কাল থেকে যে বাসর ঘর সাজিয়ে ব'সে আছ, তোমার মতলব কি? হাসনুর সঙ্গে বুঝি ষড়যন্ত্র ক'রে টাকা এনেছ?

হিরণ আবার হাসলো। বললে, মতলব একটা ছিল। ভাবলুম আমাদের বিয়ের যেটুকু বাকি ছিল, এই সুযোগে সেটা সেরে ফেলি!

এমন সময় মানদা এসে দাঁড়ালো হাসিমুখে। হিরণ তাড়াতাড়ি বললে, এই যে মানদা, তাহ'লে সব রইলো—তোমাদের দিদিমণিকে দেখাশোনা ক'রো—আমি তবে আজই রওনা হই? তোমাদেব কত বিরক্ত ক'রে গেলুম—

মানদা বললে, না বাছা, তা কিছু নয়। তবে সকালের দিকে যাওয়াই ভালো। বেশ, তোমার কথা মনে রইলো।

মীরা একবার দুজনের দিকে তাকালো। তারপব বললে, মানদা, তোর দালালি আমার অসহ্য। তোব ওসব কায়দা-কানুন নিজের ঘরে গিয়ে ফলাগে যা। মানুষ চিনে কথা কইতে জানিসনে?

মানদাও ছাড়বাব পাত্রী নয়, সে একবার দুজনের দিকে তাকালো। তারপর বললে, ও, কাল রাত্তিরে দুজনে বুঝি খুব ভাব হয়েছে? তা ভালোই ত',—এ লাইনে চাকর-মনিবেও ভাব হয়! আমি ভাবলুম বুঝি দশজনের একজন? এত কি আব জানতুম?

মীরা তেড়ে উঠলো,—যা, দূর হয়ে যা এখান থেকে। যতবাব তাড়াই ততবাবই চুবির লোভে আসিস নেড়ি কুকুরের মতন!

মানদা তার মনের দুঃখ চেপে রেখে আপাতত স'রে গেল, যদি সে দুলে তাঁতির মেয়ে হয় তবে এব শোধ সে নিয়ে ছাড়বে!

হোটেলেব সেই ছোকবা একটা ট্রে-তে ক'রে চা নিয়ে এসে ঘরের মধ্যে রাখলো। কাল রাত্রের মিষ্টান্নগুলি হিরণ কুলুঙ্গির থেকে নামিয়ে আনলো। মানদা গেল রান্নাবান্নার দিকে।

হিরণ চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, কাল আমাব আসবার আগেই তুমি বেরিয়ে গেলে কেন?

মীরা বললে, যারা ডাকতে এসেছিল তোমাব সামনে দিয়ে তাদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলে কি তোমার মান থাকতো?

হিরণ হাসিমুখে বললে, কথাটা বুঝতে পারলুম না।

এর বেশি বোঝাতেও পারবো না।

হিরণ বললে, যদি নিজের আচরণে আনন্দ পেয়ে থাকো, তবে সেই হোলো পরম লাভ। আমার মান রাখার জন্যে লুকিয়ে বেরোলে কি আমার মান বাঁচে?

মীরা বললে, তোমার কি কোনো অবস্থাতেই অপমান বোধ নেই?

আছে বৈ কি।

উত্তেজিত কণ্ঠে মীরা প্রশ্ন করলো, সে কখন?

যখন আত্মপ্রতারণা করি, তখন নিজের কাছে নিজে ছোট হই।

মীরা চায়ে চুমুক দিল। পরে বললে, আমি এ নরককুণ্ড আর কতদিন বরদাস্ত করবো ?

যতদিন তোমার খুশি। যেদিন ভালো লাগবে না সেদিন নিজেই তুমি চ'লে যবে।

তুমি কেন এলে এখানে ?

হিরণ বললে, এমন কথা কি ছিল, যে কোনোদিন আর তোমার সামনে আসবো না ?

মীরা চুপ ক'রে গেল। ভোজ্য সামগ্রীর থেকে এক প্লেট মিষ্টান্ন হিরণের দিকে সে এগিয়ে দিল, এবং এক প্লেট নিজের কাছে টেনে নিল। কিছুক্ষণ পবে নিজেব অস্বস্তির থেকে নিজেই সে প্রশ্ন করলো, ঘরকন্নার এত আসবাব সজ্জা, কাপড়-চোপড় তুমি আনতে গেলে কেন ?

হিরণ বললে, নৈতিক দাযিত্বেব জন্যই এনেছি।

নৈতিক দাযিত্ব!—মীরা বললে, কিন্তু তুমি ত' আমার সম্পূর্ণ স্বামী নও! বিযে ত' আমাদেব সম্পূর্ণটা হয়নি!

হিরণ হেসে উঠলো। বললে, যেটুকু স্বামী, আব যেটুকু বিযে, সেইটুকুব দায়িত্বই বহন করি!

মীরা গভীরভাবে বললে, আমি যদি তোমার সম্পূর্ণ স্ত্রী হতুম, আমার এ নোংরামি বরদাস্ত করতে পারতে ?

হিরণ ওর মুখেব দিকে তাকালো। তারপর বললে, নোংরামিতে যদি বিশুদ্ধ আনন্দ পেয়ে থাকো, তবে সেটা আর নোংরামি থাকে না। সেই নোংরামি মনুষ্যত্বকেও নষ্ট করে না!

কী বলছ তুমি ?—মীরা আর্তকণ্ঠে জানতে চাইলো।

হিরণ বললে, তুমিই এতদিন ব'লে এসেছ, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে স্বীকার করো না। একথা কি বলেছ যে, আমার সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্কও স্বীকার করো না ?

তাই ব'লে তুমি বার বার আমার ঘর গুছিয়ে দেবে, আর আমি সেই ঘরে ব'সে আমার জীবনের সমস্ত শুচিতাকে পায়ে থেঁৎলাবো ? এর থেকে কিছুতেই তুমি আমাকে তুলে ধরবে না ?—মীরার দুই চোখ ভরে কান্না এলো।

মীরার কান্না দেখেও হিরণ হাসলো। শান্তকণ্ঠে বললে, তোমাকে তুলে ধরার কথা ছিল, না তোমার ভেসে যাবার কথা ছিল ? সবাইকে সরিয়ে দিয়ে কলকাতাকে কি একা তুমি চাওনি ? তোমার না প্রতিজ্ঞা ছিল নিজের পায়ে দাঁড়াবার ? একা জীবন কাটাবার ?

মীরা উঠে দাঁড়ালো। চায়ের বাসনগুলি গুছিয়ে একত্র ক'রে হিরণ বাইরের বারান্দায় রেখে এলো। ভিতরে এসে দাঁড়াতেই মীরা বললে, দরজাটা বন্ধ ক'রে দাও।

ভিতর থেকে দরজাটা ভেজিয়ে হিরণ কাছে এসে দাঁড়ালো। মুখ তুলে মীরা বললে, চিরকাল একসঙ্গে রইলুম, কিন্তু চিরকাল ধ'রে তুমি পরিহাস ক'রে কাটালে,—কেন বলো ত' ?

হিরণ একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে সহাস্যে বললে, দরজাটা খুলে রেখে পরিহাসের কথাটা তুললে ভালো হোতো না ? মানদা আবার সন্দেহ না করে আমাদের দুটিতে গলায় গলায় ভাব !

মীরা নিজে উঠে গিয়ে দরজায় খিল তুলে দিয়ে ফিরে এলো। তারপর বিছানাটার উপরে ব'সে সে বললে, আমাদের দুজনের গলাতেই যে বিষ ঢালা আছে, একথা মানদাই বা জানবে কেমন ক'রে ? কিন্তু আজ এত যত্নে আমার জন্যে এই যে পরিপাটি করে ঘর সাজালে, এর মধ্যে কি তোমার মনের কোনো কথা নেই ? তুমি ত' কোনোদিন আমার জন্যে এত করোনি ?

হিরণ হাসিমুখে বললে তোমাকে খুসি করলে হাজিপুরের রাজত্বটা যদি ভাগ্যে মিলে যায় মন্দ কি ?

রাজত্বের ওপর কোনোদিন ত' তোমার লোভ ছিল না ? তা ছাড়া সে রাজত্ব আর কোনোদিন ফিরবে না—একথা তোমার চেয়ে আর কে বেশি জানে ?—মীরা হিরণের হাতখানা ধ'রে বললে, প্রথম থেকে তুমি আর হাসনু কেন আমাকে বাধা দাওনি ? আমাকে কেন যেতে দিয়েছিলে বিমলাক্ষর ওখানে ? কেন আমাকে আয়ত্তের মধ্যে বাঁধো নি।

হিরণ বললে, আজ বুঝি তুমি হিসেব নিকেশ নিয়ে বসতে চাও ?

মীরা বললে, না, আজ তোমাকে আমি জানতে চাই। কঠিন ক'রে তুমি আমাকে জানাও। কতটুকু তোমার মহিমা, কতখানি তোমার চাতুরী। যেখানে যত পুরুষ দেখলুম সবাই আমার পায়ের তলায় পড়তে চায়, কিন্তু তোমার মনে বিকার দেখিনে কেন ? তুমি কেন চাইলে না কিছু কোনোদিন ? তুমি কেন দুটো ভালো কথা বললে না এ জীবনে ?

হিরণ বললে, ভালো কথা ! আমার বুঝি প্রাণভয় নেই ?

মীরা তাকে টেনে পাশে বসালো। তারপর অধীর আবেগের সঙ্গে বললে, আজ আমাকে বলতে হবে—কতখানি তোমার পরিহাস, কতটুকু তোমার আন্তরিকতা ! সমস্ত অকাজের তলায় তলিয়ে গিয়ে কেন দেখি, তোমার মুখখানাই আমার দিকে চেয়ে হাসে ! আমার আনন্দের জন্যে যারা সর্বস্ব

আমার পায়ে ঢেলে দিতে চায়, তাদের মুখে তোমার নাম কেন সইতে পারি নে?

মুখে হাসি চেপে হিরণ বললে, একটা জবাব কিন্তু আমার মুখে এসেছে। যদি অভয় দাও তবে বলতে পারি?

মীরা মুখ তুললো। তার দুই গালে অশ্রুর ধারা নেমে এসেছে। হিরণ বললে, যেখানে যত জন্তুই দেখে বেড়াই না কেন, বাড়ব পোষা বিড়ালটার কথা ভুলতে পারি নে!

পোষা বিড়ালকে কি লোক এত লাঞ্ছনা করে?

করে বৈ কি, কিন্তু বিড়াল জানে এইটিই তার নিরাপদ ঠাঁই। এখানে টিঁকে থাকতে পারলে উচ্ছিষ্ট তার জুটবেই জুটবে!

চোখ মুছে মীরা সোজা হয়ে বসলো। তারপর স্পষ্টকণ্ঠে বললে, তোমার এ কথার মানে কী? হাসনু-তুমি-আমি কি এক আদরে মানুষ হইনি? এক অন্নে বড় হইনি? সম্পত্তির একটা অংশ কি তোমার পাবার কথা ছিল না? বাবা যে আমাকে তোমার হাতে দান করতে বসেছিলেন, সেটা কি তামাসা?

হিরণ এবারও নির্লজ্জের মতো হাসল। বললে, ভাগ্যি সে ব্যাপারটা তামাসার মতন হয়ে উঠেছিল, তাই তুমি রক্ষে পেলে!

মানে?

মানে—বিয়ে হ'লে বিমলাক্ষ চাকরিও ক'রে দিত না, এবং আর পাঁচটা ভদ্রলোক পায়ের কাছে টাকা ঢালতেও চাইতো না! মাঝ থেকে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ফ্যাসাদে পড়তুম! শেষ পর্যন্ত বেলেঘাটা কিংবা শালকিয়ার খোলার বস্তিতে যক্ষ্মায় মরতুম দুজনে। তার চেয়ে এই ভালো!

কোন্‌টা ভালো? মীরা প্রশ্ন করলো।

হিরণ বললে. এই ধরো, কবিতা লিখে ঘোরা আমার মতন, আর কবিতা হয়ে ঘোরা তোমার মতন! এতে সুখ না থাক্, স্বস্তি আছে বৈ কি।

রেফুজী মেয়ে-পুরুষের জীবনে এর চেয়ে বড় কাম্য কি কিছু নেই?—বাঁকা চক্ষে মীরা তাকালো।

হিরণ প্রশ্ন করলো, ঘর বাঁধতে চাও?

মীরা বললে, কী জন্যে ঘর বাঁধবো?

তবে কি স্বামী ধরতে চাও?

তোমার চেয়ে ত' স্বামী বড় নয়! তোমার কাছে আমার অমৃত ছিল কিন্তু তুমি ত' কিছু দিলে না!

হিরণ বললে, এ তোমার ভুল। অমৃতের সন্ধান আছে নিজের অন্তরে, তার জন্ম চোখ বুজে থাকতে হয়। আমার কাছে কিছু নেই, আমি নিঃস্ব—একান্ত শূন্য না হ'লে অহঙ্কার ঘোচে না মীরা।

মীরা বললে, আমার মধ্যে কি অহঙ্কার ছিল?

ছিল। আজো আছে। তুমি নিজেকে তুচ্ছ করোনি, লুপ্ত করোনি। তুমি আসলে ষড়ৈশ্বর্যশালিনী রাজকন্যা—সেকথা তুমি ভুলতে পারো নি। তুমি স্বাধীনতা চেয়েছে, চাকরি নিয়েছ, মাদকের মোহে পড়েছ, স্তব আর স্তুতিবাদের মধ্যে আত্মবিস্মৃত হবার চেষ্টা করেছ,—এ সমস্তই তোমার অহঙ্কারের পরিচয়। তোমার মধ্যে রয়েছে রাজ্যহারা বিক্ষুব্ধ রাজকন্যা; আহত আশাহত বঞ্চিত নীলরক্ত—সেই চেতনার থেকে তোমার এই ব্যর্থতা-বোধ, এই শোচনীয় অপচয়ের খেলা। তোমার ধূলিসাৎ অহঙ্কারের থেকে জন্মেছে আক্রোশ,—সেই আক্রোশ ফণা তুলে চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আঘাত করছো নিজেকে! তোমার দেহ মন চরিত্র কোনটাই আজো অশুচি হয়নি, কেন জানো? তোমার আভিজাত্যের অহঙ্কার হোলো গগনস্পর্শী—সেই কারণে অশুচিতা বড় জোর তোমার পা পর্যন্ত স্পর্শ করে, তার চেয়ে ওপরে উঠবার সাহস তার নেই! তোমার অহঙ্কারই তোমার রক্ষাকবচ।

জলের ধারা নেমে এসেছিল আবার মীরার দুই গালে। এক হাতে সে হিরণকে বেষ্টন ক'রে বললে, সব অহঙ্কার ঘুচিয়ে তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো!

হিরণ বললে, কোথায় যাবে?

যেখানে তুমি নিয়ে যেতে চাও!

যদি বলি এখানেই তুমি থাকো?

মীরা বললে, এখানে থাকলে আমার অহঙ্কার ঘুচবে না! আমাকে এই নরককুণ্ডের থেকে তুলে ধরো, অনেক উঁচুতে নিয়ে যাও—যেখানে তোমার বাসা! যদি সেখান থেকে ফেলে দাও, ক্ষতি নেই। আমি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে চাই।

হঠাৎ হিরণ তার কণ্ঠস্বর নামিয়ে আনলো। বললে, মীরা, আমার বাসা উঁচুতে, একথা সত্যি নয়। আমার বাসা মাটিতে—যেখানে সকলের পায়ের ধুলো পড়ে। পায়ের নিচে সকলের পিছে—যেখানে যত ভগ্নপ্রাণ, আশাহত, ক্ষয়হীন সর্বহারার দল মুখ থুবড়ে প'ড়ে রয়েছে। আমি সেই তীর্থের পথিক!

মীরা বললে, আমাকে নিয়ে চলো তবে তাদের মাঝখানে।

শান্ত আত্মস্থ কণ্ঠে হিরণ বললে, তোমার পায়ে বিঁধবে কাঁটা, রক্ত ঝরবে পায়ের তলায়, কপাল বেয়ে ঝরবে ঘাম, কণ্ঠ ও তালু যাবে শুকিয়ে, ক্ষুধার অন্ন জুটবে না, মাথার উপরে আকাশ ছাড়া আশ্রয় থাকবে না, হয়ত লজ্জাবাস জুটবে না সহস্র চেষ্টায়,—সে কি সইতে পারবে তুমি?

ধরা গলায় মীরা বললে, লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা কি এ দুর্গতি সইছে না?

কিন্তু তুমি যে রাজকন্যা, মীরা!

আমি রাজকন্যা,—কিন্তু আমি মানুষের মেয়ে। কিন্তু রাজপথ আর নয়, আমাকে নিয়ে চলো মানুষের পথে। লোভ ঘুচলেই পথ দেখতে পাবো, মোহ কাটলেই চোখ ফিরে পাবো। তুমি তাদের মাঝখানে আমাকে নিয়ে চলো—যেখানে বিরাট দুঃখ, বিরাটতরো বিক্ষোভ,—যেখানে ব্যথা-বেদনার আদিঅন্ত নেই!—হিরণের হাতের মধ্যে মাথা রেখে মীরা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

হিরণ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বেশ, তাই চলো। তার আগে সেই জায়গা আমাকে নির্বাচন করতে দাও,—সময় দাও কিছুদিন।

মীরার ভগ্নকণ্ঠে আর কোনো জবাব এলো না।

২১

দূর থেকে ছুটতে ছুটতে এসে একটি লোক হিরণকে ধরলো। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, শুনুন—ও মশাই, একটু দাঁড়ান্—

হিরণ পিছন ফিরে দাঁড়ালো। লোকটি বললে, ও হ্যাঁ,—আচ্ছা তোমার নাম কি বলো ত ভাই?

হিরণের জামাকাপড়ের দিকে একবার তাকিয়ে লোকটি তৎক্ষণাৎ সম্ভাষণটাকে 'আপনি' থেকে তুমি-তে নামিয়ে আনলো। হিরণ এতক্ষণ ধ'রে অন্যমনস্কভাবে হাঁটছিল। এবার থমকে দাঁড়িয়ে বললে, হিরণ চক্রবর্তী।

একবার এসো ভাই আমাদের ওই ডাক্তারখানায়, তোমাকে ডাকছে।

আমাকে? কে ডাকছে?

ওই যে—ডক্টর বিমলাক্ষ—ওই যে দাঁড়িয়ে আছেন দোকানের সামনে। বিশেষ দরকার তোমাকে—

লোকটার সঙ্গে সঙ্গে হিরণ রাস্তা পার হয়ে দেখলো, বিমলাক্ষ দাঁড়িয়ে

অপেক্ষা করছে তার জন্য। হিরণকে দেখে এগিয়ে এসে সমাদরের সঙ্গে বললে, ভেতর থেকে দেখলুম তুমি রাস্তার ওপার দিয়ে চ'লে যাচ্ছ।

হিরণ বললে, এই বুঝি আপনার চেম্বার। মস্ত দোকান দেখছি।

এ আর কি, এ সামান্য। তবে যেটুকু হয়েছে, সেটুকু তোমার শ্বশুরেরই কৃপায়। কিন্তু কি জানো ভাই হিরণ, চিরকালই আমাকে বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে।—এসো আমার সঙ্গে, দুঃখের কথা কেবল তোমাকেই জানাতে পারি।

হিরণকে সঙ্গে নিয়ে বিমলাক্ষ দোতলার সেই ঘরখানায় উঠে এলো। ভিতরে ঢুকে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে, বসো, চা আসবে এক্ষুণি। তুমি এমনই নিজের মনে হাঁটছিলে,—ভাবলুম, নিশ্চয়ই বাসায় ফিরে একটা কবিতা লিখতে বসবে! তারপর? কবে এলে? হাসনু ফিরেছে তোমার সঙ্গে?

হিরণ বললে, না, সে হাজিপুরে।

ভালোই হয়েছে! এবার তার সুবুদ্ধি হোক,—নিজের দেশে ব'সে চাষী ক্ষেপিয়ে বেড়াক, কম্যুনিজম্ ছড়াক—আমাদের কিছু এসে যায় না! অবিশ্যি ছুঁড়িটার পার্টস্ ছিল অনেক। কিন্তু সত্যি বলতে কি তোমার ঘাড় থেকে সে যে নেমে গিয়েছে, ওজন্যে আর সকলের মতন আমিও খুশি, হিরণ। যাক্, এবার আমার সামাজিক বিপদের কথা শোনো ভাই একটু—

হিরণ হাসিমুখে বললে, আপনার আবার সামাজিক বিপদ কি?

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিমলাক্ষ বললে, আমার সময় বড্ড কম, হিরণ, —নিচে অনেক রোগী অপেক্ষা করছে। তবু তোমার কাছে আমি আবেদন জানাই, তোমার স্বাভাবিক উদারতাই আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে!

বিমলাক্ষ মানুষের অহংবুদ্ধির উপরে চিরদিনই সুড়সুড়ি দিতে সুদক্ষ, হিরণ সেকথা জানে। বললে, এমন কী বিপদ আপনার?

ছট্টু, এক পেয়ালা চা আনলো, এবং সামনের টেবিলের ওপর রেখে চ'লে গেল। বিমলাক্ষ বললে, কিছু মনে ক'রোনা হিরণ, বিপদটা হোলো তোমার স্ত্রীকে নিয়ে,—মানে মীরার কথা বলছি—

হিরণ বললে, ব্যাপার কী?

বিমলাক্ষ বললে, কলকাতায় কবে ফিরেছ তুমি?

অকপটে হিরণ মিথ্যা কথা বললে। বললে, কাল অনেক রাত্রে!

বৌবাজারে মীরার ওখানেই উঠেছ ত'?

হ্যাঁ, কিন্তু তাঁর সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি। তিনি তাঁর এক সম্পর্কে মাসিমার বাড়ী গেছেন ইণ্টালীতে, সেখানেই যাচ্ছিলুম।

সন্দেহক্রমে বিমলাক্ষ বললে, তবে সার্কুলার রোড দিয়ে না গিয়ে এ রাস্তায় এলে যে?

হিরণ জবাব দিল, চাঁদনীতে গিয়েছিলুম হার্ডওয়ারের দর জানতে। কাজকারবার কিছু একটা করতে হবে ত'।

বিমলাক্ষ আবার হাতঘড়িতে সময় দেখলো। পরে বললে, তা'হলে তোমাকে খুলেই বলি। তোমার শ্বশুরের কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়েছিলুম সত্যি, অবিশ্যি কোনো কিছু তার দলিল কোথাও নেই,— কিন্তু সেই দেনার জন্যে আমার জীবনে যে এতো বড় অসম্মান ঘটবে, এ আমি কল্পনাও করিনি!

কে আপনাকে অপমান করলো?

শোনো বলি গুছিয়ে। মীরাকে একটা ভালো চাকরি ক'রে দিয়েছিলুম তোমরা জানো। কোনো রেফুজী মেয়ের পক্ষে এ চাকরী পাওয়া দুর্লভ সৌভাগ্য! হাসমুর হাতে বার দুই মোটা টাকাও দিয়েছি তাও তোমরা জানো। যাই হোক, যে কারণেই হোক—আমার ওপর মীরার ঘেন্না চিরকালের, সেই ঘেন্না সত্বেও আমার ক্ষুদ্রশক্তিতে যথাসাধ্য তার উপকার করার চেষ্টা করেছি। এখন নিজের দোষে সেই চাকরি খুইয়ে মীরা আমার সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করেছে!

হিরণ সহাস্যে বিনয়ের সঙ্গে বললে, আপনার সঙ্গে শত্রুতায় সে পেরে উঠবে কেন?

বিমলাক্ষ বললে, পেরে ওঠে বৈ কি। যখন তখন ডাক্তারখানায় এসে সে একটা হাঙ্গামা লাগিয়ে দেয়! এখানে এসে ভীষণ চীৎকার করে, জিনিসপত্র ভাঙতে থাকে, নয়ত আলমারীগুলোর কাঁচ ভাঙে,—রাস্তার লোক জড়ো হয়ে যায়। ওর নামই ত' শত্রুতা ভাই।

হিরণ স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। বিমলাক্ষ করুণকণ্ঠে বলতে লাগলো, আমি এখানকার ডাক্তার, এখানে আমার পসার প্রতিপত্তি, লোকে আমাকে কত মানে,—কিন্তু সমস্তই আমার ধূলিসাৎ হ'তে বসেছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমাকে যখন কুৎসিত গালাগালি করতে থাকে, তখন কী লোকের ভীড়! মাথা আমার হেঁট হয়ে যায়।

হিরণ বললে, কী বলতে চায় সে আপনাকে?

কোনো মাথামুণ্ডু নেই! হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মেয়ের মুখের গালাগালির কি কোনো মাত্রা আছে, হিরণ? আমি নাকি তাকে কলকাতার বীভৎস

চেহারাটা চিনিয়ে দিয়েছি, আমি নাকি তাকে সমাজের নোংরামি দেখিয়ে দিয়েছি! শোনো কথা,—এ কি ছেলেমানুষী নয়? রাস্তায় লোকে লোকারণ্য,—সবাই আমাকেই টিটকারি দেয়, কানাকানি করে, কেউ বা আমার দোকানে ইঁট ছোড়ে! মেয়েছেলের চেহারা সুশ্রী হ'লেই জনসাধারণ তাব পক্ষে নিয়ে কুকুরের মতন কামড়াতে আসে, জানো ত'? স্ত্রীলোকের কোনো অপরাধ তারা দেখতে পায় না।

হিরণ বললে, আপনি পুলিশ ডাকেন নি কেন?

কেলেঙ্কারীর ভয়ে! বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, কে না জানে! তা ছাড়া তোমার শ্বশুরের সুনাম আমার হাত দিয়ে বিপন্ন হবে, এ আমি কেমন করে চাইবো বলো? আমার ভয়ানক বিপদ, হিরণ। প্রতি সপ্তাহে একবার দু'বার এ হুজ্জৎ লেগেই আছে! তুমি যদি এর প্রতিকার না করো তা হলে আমাকে এখানকার কাজ-কারবার তুলে দিয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে হবে!

হিরণ বললে, বলুন, আমি কি করতে পারি?

গলা নামিয়ে বিমলাক্ষ বললে, তোমার স্ত্রী সত্যকার চরিত্রবতী মেয়ে, এ আমি জানি, হিরণ। যত হিস্টিরিয়াই মীরার থাক্‌, এ জীবনে সে কোনো লোভে কোনো মোহে আজ পর্যন্ত এইটুকু অন্যায় করেনি—এ আমি আমার নতুন শিশুসন্তানের মাথায় হাত রেখে বলতে পারি। এইটুকু নোংরার দাগ তার জীবনে নেই ব'লেই তার গলা এই রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অত উঁচুতে ওঠে। কিন্তু, এবার তুমি এসেছ, তুমি দয়া ক'রে তাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও ভাই।

হিরণ বললে, আমার কথা সে কি কোনোদিন শোনে?

বিমলাক্ষ অধীর আগ্রহে বললে, শুনবে—একশোবার শুনবে! তুমি তার স্বামী, তাকে কঠিন হাতে তুমি ধরো! তোমার ওপর তার ভালোবাসার যে-চেহারা দেখেছি হিরণ,—যে কোনো পুরুষের জীবনে সেটি দুর্লভ। তোমরা দুজনে দূরে কোথাও গিয়ে সুখের ঘরকন্না পাতো, আমি তোমাদের সাহায্য করছি। তোমার শ্বশুরের কাছে একদিন হাত পেতে বহু টাকা নিয়েছি, আজ তোমার কাজ-কারবারের জন্যে যদি সামান্য কিছু দিই, তবে সেটা আমার ঋণ শোধ ব'লেই ধ'রে নিয়ো। বলো, আমাকে কথা দাও?

হিরণ কিয়ৎক্ষণ কী যেন ভাবলো। তারপর বললে, বেশ, আপনাকে কথা দিলুম, মীরা আর কোনোদিন আপনার এখানে আসবে না।

উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বিমলাক্ষ হিরণের হাত ধ'রে বললে, আমার জীবনে তোমার চেয়ে বিশ্বাসী ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি। আমি জানি

পুরুষ হয়ে পুরুষের এ বিপদকে তুমি গভীরভাবে উপলব্ধি করবে। তোমার এই প্রতিশ্রুতির জন্য চিরদিন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো, হিরণ।

বুক পকেট থেকে একখানা চেক্ বই আর কলম বা'র ক'রে বিমলাক্ষ টাকার অঙ্কটা লিখে নিজের নাম সই করলো। চেকের উপর পনেরো হাজার টাকার অঙ্কটা দেখে হিরণ তার দিকে একবার তাকালো। ঠিক সেইক্ষণে বিমলাক্ষও তাকালো তার দিকে। নিমেষমাত্র, তারপরই বিমলাক্ষ চেকখানা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন আরেকখানা চেক্ লিখলো। এবার তার ওপর বসালো পঁচিশ হাজার টাকা। তারপর সেখানা হিরণের হাতে দিয়ে বললে, ইম্পিরিয়াল্ ব্যাঙ্কে এখনই চ'লে যাও, টাকা পেয়ে যাবে। আমি দোকান থেকে ওদের ওখানে টেলিফোন ক'রে দিচ্ছি।

হিরণের কোনো চাঞ্চল্য নেহ। বিমলাক্ষ আবার আকুল ভাবে প্রশ্ন করলো, তোমার প্রতিজ্ঞা কোনোদিন টলবে না, হিরণ ?

না।

হাতঘড়িতে সময় দেখে বিমলাক্ষ এবার উঠলো,—তারপর যা সে কোনোদিন ক'রে না,—দরিদ্র দুঃস্থ হিরণকে ধ'রে পরম সমাদরের সঙ্গে আলিঙ্গন ক'রে তাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো।

পথে নেমে হিরণ আবার হেঁটে চললো। চললো সে ইম্পিরিয়াল্ ব্যাঙ্কের দিকে। চতুর বিমলাক্ষ নিজের নির্বুদ্ধিতার মূল্য দিল এই ভাবে,—হিরণের মনে কৌতুকবোধ ছিল।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে টাকাটা ব্যাঙ্ক থেকে বা'র ক'রে নিয়ে বাইরে এসে নিজের নাড়ী পরীক্ষা ক'রে হিরণ দেখলো, ইড়া সুষুম্না আর পিঙ্গলা—তিনটেই চঞ্চল, সুতরাং সামনের পথ থেকে একখানা ট্যাক্সি ডেকে সে উঠে বসলো। বললে, চলো—

ট্যাক্সিওলা বললে, তুমারা সওয়ারি কাঁহা ?

লোকটা হিরণের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে বিশ্বাসই করতে চায় না যে, হিরণ নিজেই সওয়ারি! হাজিপুরের রাজবাড়ীর একমাত্র জামাইয়ের পকেটে সামান্য হাজার পঁচিশেক টাকাও যে থাকতে পারে, একথা এখন ওকে বিশ্বাস করানো চলবে না। হিরণ শুধু বললে, আমি সওয়ারি! বেশি বকাবকি করো না, সামনের দিকে চলো।

হিরণ তৎক্ষণাৎ স্থির করলে, লোকটার সন্দেহের প্রতিশোধ নিতে হবে। ওকে সারাদিন সারারাত সে ঘোরাবে, ক্ষুধায় ক্লান্ত করবে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটাবে, এক মিনিট বিশ্রাম চাইলে দেবে না, সবচেয়ে খারাপ রাস্তায় চালাতে

বলবে—যাতে গাড়ী জখম হয়। যত টাকা ওঠে মীটারে, সে দেবে। অবশেষে লোকটা পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইলে ছাড়বে। হিরণ কঠিন হয়ে বসলো।' গাড়ি চলতে লাগলো হু হু করে। রাস্তা দিয়ে যখন সে কপালের ঘাম ফেলে ধুলো পায়ে হেঁটে যায়, তখন দেখা হয় চৌদ্দজনের সঙ্গে, কিন্তু মোটরে ব'সে গলা বাড়িয়ে থাকলেও কোনো লোক দেখতে পায় না,—এমনি কপাল মন্দ!

লালদীঘি থেকে চৌরঙ্গী, সেখান থেকে বালিগঞ্জ, আবার সেখান থেকে মল্লিকবাজার,--তারপর চললো সোজা উত্তর দিকে। সেখান থেকে শ্যামবাজাব হয়ে শোভাবাজার, আবার সেখান থেকে কাশীপুর। কাশীপুর থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে আবার চলো পূবদিকে। রেললাইন দেখা যাচ্ছে। চলো সেখান থেকে উল্টোডিঙ্গি। পুলের পর পুল পেরিয়ে ট্যাক্সি ছুটছে,—হঠাৎ পিছন থেকে হিরণ ব'লে উঠলো, বাঁধো বাঁধো—এই ড্রাইভাব।

ব্রেক ক'সে ট্যাক্সি দাঁড়ালো পথের পাশে। প্রায় চল্লিশ টাকা উঠেছিল মীটারে, হিরণ ওকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে গাড়ী থেকে নেমে এলো। পিছনে পথের একপাশে জমেছিল জনতা,—সেই জনতাব কোলাহলের মধ্যে হিরণ দেখতে পেয়েছিল অত্রিকে।

হিরণ ভীড়ের ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। তিন চারটে লোক অত্রিকে আক্রমণ করেছিল। অত্রির কপাল বেয়ে নেমেছে রক্তের ফোঁটা। ভীড়ের ভিতরে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে আনুপূর্বিক ব্যাপারটা সে অনুধাবন ক'রে নিল। সামনেই খোলার চালাব নিচে একটা ভাতের হোটেল, অত্রি হোলো সেই হোটেলের নোংরা পরিষ্কার করার চাকর,—সে এঁটো পাড়ে, বাসন ধোয় ফাইফরমাস খাটে। অনেকবার সে কাঁচা পয়সা চুরি করেছে, আজকে ধরা পড়েছে হাতে-হাতে। আবার মুখের ওপর বলছে, চুরি করেছি বেশ করেছি! আমার মাইনে চুকিয়ে দে, শালা!

অত্রির চোখ দুটো লাল, অনেকটা যেন রুদ্রের কালকটাক্ষ! চোখে তার জল নেই, আছে রুদ্ধ আক্রোশের রক্তাভা নিরুপায় প্রতিশোধ-পিপাসায় সে কাঁপছে। জনতাকে সরিয়ে হিরণ গিয়ে অত্রির হাত ধরলো। হিরণের নিজের হাতখানাও কাঁপছিল।

অত্রি তাকিয়ে ছিল তার আক্রমণকারীর দিকে রক্তচক্ষে। হিরণকে না দেখেই সে বললে, ছাড়ো! আমি দেখে নেবো! খুন্ করবো!

ধরা গলায় হিরণ বললে, অত্রি আমি বড়দা—তোর জামাইবাবু।

অত্রি মুখ তুলে তাকালো। বললে, বড়দা! বড়দা, তুমি দাঁড়াও ত',

আমি ওদের খুন করবো! ওই শালারা আমাকে মেরেছে,—হোটেলের বঁটি দিয়ে আজ রাত্রে ওদের কাটবো—

হিরণ বললে, বেশ কাটিস—আমি তোর বঁটিতে শান্ দিয়ে দেবো, কিন্তু রাত্তিরের এখনও অনেক দেরি, অত্রি! আয়, আমার সঙ্গে।

অনেক কষ্টে হিরণ অত্রিকে বা'র ক'রে নিয়ে এলো। পরম্পরায় জানা গেল, আনা আষ্টেক পয়সা হোটেলের তহবিলে হিসাব অনুযায়ী মিলছিল না। সন্দেহক্রমে অত্রির জামা খানাতল্লাসী ক'রে আট আনা পাওয়া যায়। তারপরেই এবম্বিধ পাশবিক আক্রমণ চলতে থাকে।

অত্রিকে ধ'রে হিরণ অনেক দূরে নিয়ে গেল,—জনতার ভীড় দেখতে দেখতে হাল্কা হয়ে এলো। পুল পেরিয়ে হিরণ চ'লে গেল আরো দূরে,—একটি গাছের ছায়ার নিচে অত্রির হাত ধ'রে সে নিজের কাছে বসালো।

পিছন দিকে নোংরা কাঁচা নর্দমা, এপাশে ওপাশে দুর্গন্ধময় জঞ্জালের ধারে নিম্নশ্রেণীর বস্তি,—সামনে দ্রুতগামী মোটরের চাকার আঘাতে ধুলোয় ধুলোয় পথ অন্ধকার হচ্ছে। সেইখানে ব'সে অত্রির পিঠে হাত বুলিয়ে মৃদু মিষ্টকণ্ঠে হিরণ বললে, খুব লেগেছে না রে?

অত্রি তখনও কাঁপছিল। চাপা কণ্ঠে বললে, না—

একটিমাত্র শব্দ, কিন্তু ওরই মধ্যে ছিল বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উত্তেজনা। নিজের কোঁচার খুঁট দিয়ে অত্রির কপালের ক্ষতটা মুছিয়ে আবার হিরণ বললে, কতদিন পরে তোকে দেখলুম, অত্রি! আমাকে দেখে তোর আনন্দ হচ্ছে না? আমার ওপর রাগ করেছিস?

অত্রি কোনো জবাব দিল না। বালকের চোখ বেয়ে কতক্ষণে অশ্রুর ধারা নেমে আসবে, এই ছিল অপেক্ষা। কিন্তু এ-অত্রি, সে-অত্রি নয়। এ যেন আপন স্বভাবের সমস্ত লাবণ্য আর মাধুর্য হারিয়ে মরচে-ধরা লোহার মতো শক্ত হয়ে গেছে। মাথার চুল কতকাল থেকে রুক্ষ, সর্বাঙ্গে ধুলো-বালি, ময়লা জামাটায় নানা নোংরা দাগ, পরণে তারো চেয়ে নোংরা হাফপ্যাণ্ট,—সমস্ত চেহারাটায় অনাদার আর অপমানের শেষ পরিণাম যেন বর্ণে বর্ণে ছাপ রেখে গেছে।

রাস্তার কল থেকে আঁজলা ভ'রে জল এনে হিরণ আর একবার অত্রির ক্ষতস্থানে ধুয়ে দিল। তারপর তাকে একটু সুস্থ ক'রে কাঁধের ওপর হাত রেখে বললে, চল্ তোতে-আমাতে কোথাও এক জায়গায় ব'সে কিছু খাইগে, কেমন?

না, আমি খাবো না—

ওকথা বলতে নেই, ভাই! তুই বোধহয় জানিসনে তোদের বাড়ীতে খেয়েই আমি মানুষ। আজ যদি তোকে কিছু খাওয়াই, তুই খাবিনে? আয় আমার সঙ্গে—লক্ষ্মী সোনা আমার—

অত্রিকে ধ'রে হিরণ তুললো, তারপর তাকে সাদরে নিয়ে গেল কাছাকাছি এক অপেক্ষাকৃত ভদ্র ময়রার দোকানে। সেখানে গিয়ে দুজনে মুখ হাত ধুয়ে জায়গা নিয়ে ব'সে খাবার ফরমাস করলো। অত্রিব শরীরের কাঁপুনি অনেকটা কমে এসেছে, বন্য চোখের রক্তাভা কিছু শান্ত হয়েছে।

খেতে ব'সে হিরণ বললে, তোরা সেই হাজিপুরের হামিদ সাহেবের চোখে ধুলো দিয়ে বেশ পালিয়ে এসেছিল, না রে?

আমি আসতে চাইনি, অত্রি এতক্ষণ পরে সহজ ক'রে কথা বললে, মা কিন্তু ছোড়দি আর তোমার ভয়ে পালিয়ে এলো।

আমাদের জন্যে ভয় কিসের?

অত্রি বললে, তোমারা থাকলে নাকি মায়ের নিন্দে রটতো!

হিরণ খুব এক চোট হেসে নিল। তারপর বললে, তোর মা কোথায়?

ওই ত' স্পুরিবাগানের বস্তিতে।

বস্তিতে! হিরণ একটু ঢোক গিলে বললে, তোদের বাড়ীতে আমাকে নিয়ে যাবিনে, অত্রি? দেখে আসতুম ছোটখুড়িকে!

অত্রি ব্যস্ত হয়ে বললে, তুমি সেখানে যেয়ো না বড়দা—

কেন রে?

তুমি গেলে আমার লজ্জা করবে।

হিরণ আবার হাসলো। বললে, ওকথা কি বলতে আছে রে? পৃথিবীর কোন জায়গাই সামান্য নয়।

অত্রি কিছু একটা বলবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু কোনোমতেই সেটা হিরণকে বুঝিয়ে বলতে পারা গেল না। অত্রি থতিয়ে চুপ ক'রে গেল। কিছুক্ষণ খাবার পর হিরণ হাসিমুখে বললে, তোকে ওরা সবাই চোর বললে কেন রে, অত্রি?

অত্রি বললে, আমি পয়সা চুরি করেছিলুম।

হিরণ খুব হেসে উঠলো। এমন হাসলো যেন তার গলার মধ্যে খাবার আটকে গেল একপ্রকার কান্নায়। তারপর ঢোক গিলে সে বললে, সত্যি চুরি করেছিলি? কেন?

ওরা আমার মাইনের থেকে কেবলই পয়সা কেটে নেয়। আমি কোন দোষ না করলেও আমাকে সন্দেহ করে। বার বার মাইনে কাটলে আমার টাকা জমবে কি ক'রে?

হিরণ বললে, টাকা জমিয়ে কি করবি?

অত্রি বললে, আমি—আমি ছোড়দির কাছে চ'লে যাবো।

ছোড়দির কাছে! কিন্তু হাসনু যদি বলে তুই হিন্দু, তোকে পাকিস্তানে জায়গা দেবো না।

ছোড়দি তাই বলবে—অত্রি ডুকরে উঠলো,—আমি তবে থাকবো কোথায়? তবে সে কেন আমায় মিথ্যে বলেছে? কেন সে তবে আমার গলা ধ'রে কেঁদেছিল? কেন তবে সে—

বলতে বলতে অত্রি এতক্ষণ পরে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ফেললো।

দোকানের পয়সা চুকিয়ে হিরণ অত্রিকে নিয়ে উঠে পড়লো! তারপর নিজের কাপড়ের খুঁটে অত্রির চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললে, তুই কি তোর ছোড়দির কাছে সত্যি যেতে চাস্?

অত্রি কম্পিতকণ্ঠে বললে, হঁ্যা চাই, আমার টাকা থাকলে আজই আমি চ'লে যেতুম, বড়দা—

কিন্তু তোর মা তোকে ছেড়ে থাকতে পারবে, অত্রি?

পারবে না? একশোবার পারবে! আমাকে তাড়াতে পারলে বাঁচে! অমন মা মরুক, আমি আর ফিরবো না—

হিরণ বললে, ছি, এমন কথা বলতে নেই, ভাই!—আচ্ছা, না হয় তুই যাবি, কিন্তু সেখানে একলা যাবি কেমন ক'রে?

অত্রি বললে, ঠিক পারবো, তুমি দেখে নিয়ো। সেবারে সব আমি চিনে এসেছি। হাতে টিকিট থাকলে আর খাবার পয়সা থাকলে একটুও আমি ভাবিনে! ঠিক আমি চ'লে যাবো।

হিরণ তার পিঠ চাপড়ে বললে, বেশ, তাই যা। তোর সমস্ত খরচ আমি দেবো, অত্রি। এখনই তোর হাতে টাকা দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু যদি কোনো কারণে হাসনুকে ওখানে দেখতে না পাস, তবে আমার ঠিকানায় ফিরে আসবি ত'?

অত্রি খুশি হয়ে সম্মতি জানালো।

হিরণ তার হাতে খুচরো একশো টাকা দিয়ে বললে, লুকিয়ে রাখ্, কেউ যেন কেড়ে না নেয়। চল্, এবার তবে তোদের বাড়ী যাই। এতদূরে এলুম, ছোটখুড়ির সঙ্গে একটু দেখা ক'রে আসি।

অত্রির সঙ্গে সঙ্গে হিরণ চললো। সুপারীবাগান বেশি দূরে নয়; মারামারির সেই জায়গাটা ছাড়িয়ে একটু এগোলেই ডানহাতি কাঁচা সরু গলি। আশেপাশে বস্তির থেকে মেয়ে পুরুষের নানাবিধ বচসা ও বিবাদের কণ্ঠস্বর

শোনা যাচ্ছে। সন্ধ্যার দিকে এ গলিতে আলো জ্বালবার কোনো ব্যবস্থা নেই। বেলা একটু গড়িয়েছে। নর্দমার ধারে কোনো কোনো স্ত্রীলোক ডোবার জল তুলে বাসন মাজতে বসেছে।

ভিতরের মেঠো উঠোন থেকে নারীকণ্ঠের আওয়াজ আসছিল।—

—আর তাও বলি, তুকিই বা কেন যখন-তখন দূর ছাই করো? ছেলেমানুষ না হয় না ব'লে দুটো পয়সা নিয়েছে, তাই বলে চোব-ছ্যাঁচোড়ের মতন ব্যাভার তার সঙ্গে? পেটের ছেলে না? দশ মাস না গভ্যে ধরেছিলে?

—তুই থাম্ রিনি, ঝগড়া করিতে আসিসনে। বলে, মার পোড়ে না পোড়ে মাসির! তুই অত কথা বলবার কে শুনি? সুমিত্রার কর্কশ গলার আওয়াজ হিরণের কানে এসে বিঁধলো।

তৎক্ষণাৎ অপর একটি স্ত্রীলোকের কণ্ঠ ঝন্‌ঝনিয়ে উঠলো,—কেন বলবো না? একশোবার বলবো! ছেলেটা থাকলে ঘরে বুঝি বড্ড অসুবিধে হয়? বলছে সবাই, কা'রো মুখে হাত চাপা দেওয়া যায় না। কে না জানে—

বড্ড স্পর্দ্ধা তোর, তা জানিস, রিনি? তোর খাই, না পরি? ঘর-ভাড়া কি তুই যোগাস? ছেলেটাকে ভাত রেঁধে দিস, আর কাছে শুইয়ে সোয়াগ করিস,—বলবো তবে? শোনাবো সবাইকে? আমাকে সবাই জানে, আর তোকে জানে না পাড়ার লোকে?—বলতে বলতে সুমিত্রা বাইরেব দিকে বেরিয়ে আসতেই সামনে পড়লো হিরণ। সুমিত্রার ডান হাতের কলাইয়েব বাটিতে ছিল চা। তাঁব দুই চোখের নিচে কালি, মাথার চুল রুক্ষ, সবশরীরের বর্ণ জ্বলে-পুড়ে যেন কয়লা হয়ে গেছে। হিরণকে সামনে দেখেই তিনি গলা নামালেন। বললেন, এই যে—কবে ফিরলে, হিরণ?

হিরণ গলাটা পরিষ্কার করলো। কিন্তু কিছু বলতে পারলো না।

কেমন আছ সব? এ পথ চিনলে কেমন ক'রে?

হিরণ শুধু হাসলো।

সুমিত্রা বললেন, তোমার অবস্থাও ত' ভালো দেখছিনে, হিরণ? আর আমার কি জানো, সকলের দোষ মাথায় নিয়ে আমি প'ড়ে গেলুম সকলের নিচে। এর শোধ আমি নেবো!—একটা ছেলে, তাও মানুষ হোলো না—চোর হোলো!

হিরণ সহাস্যে বললে, ছেলেমানুষ বৈ ত' ন...

ছেলেমানুষ? দুনিয়ার ওঁচা! চোর-ডাকাত কোথা থেকে মরে এসেছে। অমন ছেলের মরণই ভালো। ও থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি! কথায় কথায় আমাকে মারতে আসে, বুঝলে হিরণ?

মারবে না? -আড়াল থেকে হঠাৎ রুদ্র মূর্তিতে অত্রি বেরিয়ে এল। বললে, তোমার দোষ নেই? তুমিই ত' যত নষ্টের গোড়া! তোমার জন্যেই ত' সবাই কষ্ট পাচ্ছে। তোমার মুখ দেখলেও পাপ!

শোনো হিরণ, হারামজাদার কথা শোনো! শুয়োরের বংশ, তাই মাকে ধরে মারতে আসে! আঁসবঁটিখানা কোথায় গেল রে,—দাঁড়া, আজ তোকে শেষ করবো! কই, লাঠিগাছটা নিয়ে বেরিয়ে এসো ত'. বেল্লিক।

যাই—ব'লে বেল্লিক মশাই একগাছা ছড়ি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একখানা বাঁকারি হাতে নিয়ে অত্রিও প্রস্তুত হয়ে ছিল। এবার সে চিৎকার করলো, শালার বেটা, এক পা তুমি যদি এগিয়েছ তবে আজ রক্তারক্তি!

সুমিত্রা চিৎকার করলেন, কেমন, হয়েছে ত'? কালসাপ আর পুষবে? ওর জাতের দোষ! আর তোমাকেও বলি, তুমিই বা ওর দশটা টাকা ফেলে দাও না কেন? টাকা নিয়ে ওর যেখানে খুশি চলে যেতো? বাঁচতো কি মরতো, খবরও নিতুম না?

বেল্লিক আজ হিরণকে গ্রাহ্যও করলেন না। বললেন, কেন দেবো টাকা? টাকা সস্তা? খোলাম কুচি? তোমার ঘরকন্না চালাবো, ভাত-কাপড় দেবো, ঘরভাড়া গুনবো, তার ওপর আবার ওই হারামজাদার হাতখরচ জোগাবো?

দূরে দাঁড়িয়ে অত্রি বাঁকারি তুলে বললে, গালাগালি দিলে তোমার মুখে জুতো মারবো, শালার বেটা শালা!

সুমিত্রা এবার আগুন হয়ে বেল্লিককে আক্রমণ করলেন। বললেন, আমার ঘরকন্না, না তোমার আড্ডাখানা? তুমি যে আমার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছ, তোমার দোষ নেই? আজ টাকা-পয়সার খোঁটা দাও—তোমার হাতে আমার মানইজ্জত নষ্ট হয় নি? বাইরের লোক দেখে তুমি বুঝি এখন যুধিষ্ঠির সাজতে বসেছ? এতটুকু লজ্জা-শরম নেই?

বেল্লিক বললেন, মায়ে-পোয়ে আমার ঘাড়ে এসে একদিন চেপেছিলে, সেদিন একথা মনে ছিল না?

ক্ষিপ্তকণ্ঠে সুমিত্রা বললেন, তোমার ভেতরেও ছিল চোর-ডাকাত, কিন্তু সোনার হরিণ সেজে আমাকে ভোলাতে এসেছিলে! দেখলে হিরণ, শুনলে ওর কথাটা? তুমিই বলো ত' ঘরে রেখে পুষলে খেতে পরতে কে না দেয়? আজ নেশা কেটেছে, তাই বুঝি টাকার গরম দেখতে এসেছ? পাকিস্তান না হ'লে তোমার সাত পুরুষকে কিনে ফেলতে পারতুম, তা জানো?

বেশ ত,' যাও না ফিরে সেই পাকিস্তানে? যাও?

যাবই ত'! এ মাসেই যাবো মনে করেছিলুম—আসছে মাসে ঠিকই চলে যাবো।—সুমিত্রা বললেন, যার মান খোয়া গেছে, তার না হয় এবার জাত খোয়া যাবে,—এই ত'? আমি ঠিকই যাবো! কিন্তু তোমার ওপর শোধ নিয়ে তবে আমি যাবো, বেল্লিক—এ কথাও মনে রেখো! হিরণ, তোমার কাছে কিছু টাকা যদি থাকে আমাকে দিয়ে যেয়ো ত'? নেড়িকুকুরের কামড়ে বিষিয়ে মরার চেয়ে একেবারে বাঘের পেটে যাওয়াই ভালো।

হিরণ শান্ত হাস্যে ঘাড় নাড়লো, তারপর পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করে সুমিত্রার হাতে দিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, আজ তবে আসি, খুড়িমা?

বক্রদৃষ্টিতে বেল্লিক একবার উভয়ের দিকে তাকালেন। পরে বললেন, এমন করে আমিও অনেকবার টাকা হাতে দিয়েছি হিরণবাবু।

হিরণ স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, এ টাকা ওদেরই, আমার নয়।—আর আপনি দিয়েছেন টাকা? সে সব টাকা নিজের দুষ্প্রবৃত্তিকে তুষ্ট করবার জন্যেই আপনি খরচ করেছেন, বেনুবাবু? টাকা দিয়ে মানুষকে তুলে ধরতে একটু সময় লাগে, কিন্তু টাকা দিয়ে তাকে নিচে নামাতে একটুও দেরি হয় না। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ব্যবহার করতে না জানলে টাকা জিনিসটে সবচেয়ে বেশি নোংরা হয়ে ওঠে!

সুমিত্রা বললেন, তুমি আর বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ো না হিরণ, তোমার কাজে তুমি যাও। কিন্তু তোমার ভাইকে ডেকে বুঝিয়ে ব'লে যাও, আমার ঘরে সে যেন আর না ঢোকে!

হিরণ বললে, অত্রি তবে কোথায় যাবে, ছোটখুড়ি?

চুলোয় যাক্। অমন কুলাঙ্গারের মরণ হলেও আমার কোনো দুঃখ নেই! আমার পায়ের কাঁটা দূর হয়ে যাক্—গেলেই আমি বাঁচি।

দূরের থেকে অত্রির গলার আওয়াজ এলো, তুমি চলে এসো, বড়দা! মা, না ডাইনী! চাইনে অমন মাকে। কিন্তু ওই শালার বেটার সব দোষ, বুঝলে বড়দা?

হিরণ ধীর পদক্ষেপে সেই বস্তির বিষাক্ত বাতাস থেকে বেরিয়ে এলো।

বেল্লিক হাঁক দিলেন, ওরে শুয়োরের বাচ্চা—আয় না দেখি একবার সামনে? সামনে এসে দাঁড়া দেখি?

হঠাৎ একটা মস্ত ইটের ঢেলা ছুটে এসে বল্লিকের ঠিক নাকের ওপর সজোরে আঘাত করলো। পলকের মধ্যে সমস্তটা অন্ধকার, তারপর লোকটা একটা বিকৃত আর্তনাদ ক'রে সেখানেই লুটিয়ে বসে পড়লো। অদূরে শোনা

গেল কিশোর কণ্ঠের উন্মত্ত হাসির খলখল শব্দ—এবং দেখতে দেখতেই শ্রীমান অত্রি তীর বেগে ছুটতে লাগলো বস্তির বাইরের দিকে।

বস্তির ভিতরে চারিদিক থেকে ততক্ষণ হাঁ হাঁ করে চিৎকার উঠেছে।

হিরণ অনেকবার ডাকলো পিছন থেকে, কিন্তু পৃথিবীর কোনো ব্যক্তিকে অত্রি আর পরোয়া করে না, কোনো শ্রদ্ধা সে রাখে না কারো ওপর। সুতরাং গলিঘুঁজি পেরিয়ে কোথায় সে চক্ষের নিমিষে অদৃশ্য হয়ে গেল, তার কোনো হদিস পাওয়া গেল না।

বড় রাস্তাটা ধ'রে হিরণ চলতে লাগলো। রাষ্ট্রবিচ্ছেদের জন্য শোচনীয় অদূরদর্শিতার থেকে মার খেয়েছে অত্রি, মার খেয়েছে সে সমাজের কাছে, বঞ্চিত হয়েছে সে জননীর বাৎসল্যে, প্রতারিত হয়েছে সে মানুষের হাতে,—সেইজন্য সে কাঁদে না, বিপ্লব বাধায়। তার পুঞ্জীভূত আক্রোশ, অসন্তোষ, আর যন্ত্রণা তাই বজ্রপাতের আনন্দে উন্মত্ত হয়ে ওঠে।

হিরণ কোথায় যে চললো সে নিজেও জানে না।

হাসনু একদিন কানে কানে বলেছিল, তুই বিশ্বাস কর জামাই, এটা পুরুষ-প্রাধান্যের যুগ,—যারা রাষ্ট্রবিচ্ছেদ আনলো তারাই মারলো মেয়েদের। মেয়েরাই মার খেলে এযুগে সব চেয়ে বেশি। বহু যত্নে বহু পরিশ্রমে বহুতর স্বার্থত্যাগে মেয়েরা ঘর বেঁধেছিল, আনন্দের বাসা তৈরী ক'রেছিল, একটা বিশেষ শৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল, এমন কি নিত্যবিপ্লবী প্রবল পুরুষ জাতিকে মিষ্টিকথায় ভুলিয়ে ঘরের দরজায় শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। মেয়েমানুষের কাছে একটুখানি স্নেহের প্রসাদ পাবার লোভে বর্বর পুরুষ মাটি খুঁড়ে ফসল বের করেছে, বন কেটে ঘর তুলেছে, জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে ভেসেছে, মেশিন নিয়ে আকাশে উড়েছে, নতুন নগর আর সভ্যতা গড়েছে। নির্বোধ পুরুষ বোঝেনি, মেয়েরা ওদের দিয়ে খাটিয়ে নেয়, আবার ওদের দিয়েই কাব্য সাহিত্যে নিজেদের ওপর স্তুতিবাদ লিখিয়ে নেয়! কিন্তু সে যাই হোক, ওই বর্বর আবার শিকল ছিঁড়ে কেন বেরিয়েছে জানিস? সভ্যতার অন্তর্লোকে মেয়েদের প্রভুত্ব আর আধিপত্য চেখে ওরা ভয় পেয়েছে, মানুষের বিরাট সমাজে মেয়েদের একচ্ছত্র প্রভাব দেখে ওরা ঈর্ষান্বিত হয়েছে,—সেইজন্য চেয়ে দেখ্ চারিদিকে—পৃথিবীব্যাপী রাষ্ট্রবিচ্ছেদ, বিপর্যয় আর বিদ্বেষের ভিতর দিয়ে ওই বর্বর দানব মেয়েদের ঘর ভাঙবার জন্য এগিয়েছে। যুদ্ধ বাধলে আজ যোদ্ধারা থাকে নিরাপদে,—নারী আর শিশুকে ওরা ধ্বংস করে। ওরা ধ্বংস করে মেয়েদের ঘর, শিশুর খাদ্য, ওরা ধ্বংস করে শৃঙ্খলা, ন্যায়নীতি, বাৎসল্য

এবং নারীধর্ম। আমাদের এদেশেও ওই দানবের আক্রমণে মেয়েদের বহুযত্নে গড়া ঘর ভাঙলো এই সেদিন। রাষ্ট্রবিচ্ছেদের নামে মেয়েদের জীবনসাধনাকে ওরা উৎখাত করলো, আনন্দের আয়োজনকে চূর্ণ করলো, লক্ষ লক্ষ নারীর প্রাণ নিয়ে পাশাখেলায় মত্ত হোলো, হাজার হাজার জনীর বাৎসল্যকে ধুলায় লুটিয়ে হাততালি দিল। আজ দেশব্যাপী বর্বর পুরুষের বীভৎস অভিযান দেখে মেয়েদের যখন হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়েছে, তখন আমি আর ঘরে ব'সে থাকতে পারিনে, জামাই। আমি চাই তরবারি—শাণিত, ঝলসিত, উলঙ্গ তরবারি। যেন হাত না কাঁপে, শক্তি না হারাই, বুদ্ধি না আচ্ছন্ন হয়,—জ্ঞান আর আদর্শের আলো আমাকে যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় এই অন্ধকারে!

বহুবাজারের গলিতে ঢুকে হিরণ তাদের বাসার দোতলায় যখন উঠে এলো তখনও সম্পূর্ণ সন্ধ্যা হয়নি। ঘরে ঢুকে নিজেই সে আলো জ্বাললো। পকেটে ছিল তার পঁচিশ হাজার টাকার কাছাকাছি,—তা থেকে আজ একটা সামান্য অংশ খরচ হয়েছে মাত্র। যে-কোনো লোক যে-কোনো সময়ে তাকে আক্রমণ ক'রে এই টাকাটা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারতো, কিন্তু নেয়নি। নিলে সে প্রতিরোধ করতো না, বরং পকেটটা হাল্কা হ'তে পারতো। পকেটসুদ্ধ নিয়ে পেটটাকে জড়িয়ে কাপড় বাঁধা ছিল, এবার সে বাঁধন আল্‌গা ক'রে পকেট থেকে পুঁটলীটা নিয়ে টিনের তোরঙ্গের মধ্যে ফেলে রাখলো।

মানদা ওদের বর্তমান জীবনযাত্রা দেখে অনেকটা বাগমানানো ছিল। হিরণকে দেখে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে, বড়বাবু, চায়ের জল চড়াবো কি? আমার উনুন খালি আছে।

হ্যাঁ, চড়াও। আচ্ছা মানদা, আজ যে একেবারে চারিদিক ঝক ঝক করছে, তোমার জামাই আসবে নাকি? ব্যাপার কি বলো ত'?

মানদা হাসিমুখে বললে, লক্ষ্মীমন্ত মেয়ের হাত পড়েছে যে? তুমি যে সেই ভোরবেলা বেরিয়ে গেলে, তারপর থেকে দিদিমণি কোমর বাঁধলো, ঘর দোর সব নিজের হাতে ঝাঁট দিল, কড়িকাঠের যত সব ঝুল ঝাড়লো, নিজের হাতে একগাড়ী কাচা-কুচি করলো,—আমাকে একটি কাজও করতে দিল না। আমি বলি, ওমা, বড়ঘরের মেয়ে, যদি বাছা অসুখে পড়ে? কিন্তু আমাকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দিল। নিচের তলায় গিয়ে রাজ্যের নোংরা ঘেঁটে সব পরিষ্কার করলো, তারপর চান ক'রে এসে নিজের হাতে চুল বাঁধতে ব'সে গেল। এই ত', এত দিন হ'তে চললো, একেবারে অন্যমানুষ, বুঝলে বড়বাবু? তুমি এসে না পড়লে দিদিমণিকে বাঁচানোও যেতো না—এ আমি ব্যাটার মাথায় হাত রেখে বলতে পারি।

হিরণ সকৌতুক হাসছিল। চায়ের জলটা তাড়াতাড়ি চড়িয়ে দিয়ে এসে মানদা আবার বললে, এ ত' ঘরনী মেয়ে, বাছা? দয়া, মায়া, মিষ্টিকথা, মুখ বুজে মেহন্নত করা, ঘরকন্না নিজের হাতে গোছানো, সারাদিন হাসিখুশি মুখ, স্বামী কতক্ষণে বাড়ি ফিরবে তার জন্যে ব'সে থাকা,—দিদিমণির এমন চেহারা ত' আমার জানা ছিল না, বড়বাবু? এ যে ঘরের লক্ষ্মী! মা অন্নপূর্ণা!

হিরণ এবার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো!

মানদা আবার বললে, আমার কি মনে হয়, জানো বড়বাবু? সব দোষ তোমার! তুমি কাছে টেনে নাওনি এদ্দিন, তাই ওর বারমুখী মন হয়েছিল। সোয়ামির কোলে জায়গা পেলে মেয়েমানুষের কাছে রাজার রাজত্বিরও দাম নেই। এমন রূপসী লক্ষ্মীকে কেমন ক'রে পায়ে ঠেলেছিলে তুমি, বাছা?

হিরণ হাসিমুখে বললে, সে কি মানদা, মাথার মণিকে পায়ে ঠেলবো। এ তুমি কি বলচ?

হ্যাঁ, এই ত' চাই, এই ত' কথা! কথা শুনলে শরীর মন জুড়িয়ে যায়। আমি বলি কি, শোনো বাছা। ওই তক্তাখানা এবার বদলাও, একখানা ডবল গদির খাট আনো। দিদিমণি তোমাকে জোর ক'রে তক্তায় শোয়াবে, আর সে নিজে শোবে মেঝেয়,—এ কেমন কথা।

মাথা চুলকে হিরণ বললে, কিন্তু মানদা—

মানদা বললে, আচ্ছা, তাই না হয় হলো। আলো নিবিয়ে দুজনে না হয় খানিকক্ষণ একতক্তায় শুলে, সমস্ত রাত্তির ত' আর নয়! ওতে একজনেরই কুলোয় না, আবার দুজন!

হিরণ চমকে উঠে শান্ত দৃষ্টিতে মানদার দিকে তাকালো। তারপর বললে, তুমি আজো তোমার দিদিমণিকে চিনতে পারো নি, মানদা!—এই বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মুখ হাত পা ধুয়ে সে যখন এসে স্থির হয়ে বসলো, মানদা তখন চায়ের পেয়ালা এনে সামনে রাখলো। হিরণ বললে, তোমার দিদিমণির চা কই? ডাকো তাকে রান্নাঘর থেকে?

মানদা বললে, দিদিমণি ত' নেই?

নেই? কোথায় গেলেন?

রেঁধে বেড়ে রেখে সেই বেরিয়েছে বেলা বারোটায়। ব'লে গেল আমি আসছি, মানদা। তোমার বড়বাবু গেছেন তালতলার পোস্টআফিসে, আমি তাঁকে নিয়ে ফিরে আসবো এক্ষুণি।

হিরণ বললে, খাওয়া-দাওয়া ক'রে গেছেন?

জিব কেটে মানদা বললে, ওমা তা কি হয়? তোমাকে না দিয়ে সে মুখে জল ঠেকায় না! তোমার সঙ্গে কি দেখা হয়েছে?

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে হিরণ বললে, কই না?

তাহ'লে কোথায় গেল? কলকাতার রাস্তাঘাট,—বাঘের মতন গাড়ী-ঘোড়া—আমার বাছা ভয় করে! ভালোয় ভালোয় ফিরলে হয়! আমি সারাদিন ধ'রে তোমাদের পথ চেয়ে আছি, বাছা!

মানদা, ওর মুখে চোখে এমন একটি আন্তরিকতা ফুটিয়ে তোলে যে, দেখলে ভিতর থেকে হাসি ফেনিয়ে ওঠে? মীরা তার কাজ সেরে ঠিক সময়েই ফিরবে, কিন্তু মানদার সঙ্গে এই দুর্লভ মুহূর্তগুলি উপভোগ না করলে হিরণের কিছুতেই চলবে না।

হিরণ এক সময়ে হাসি চেপে প্রশ্ন করলো, আচ্ছা, মানদা, তোমার দিদিমণি দিনরাত তোমাকে চোর বলে কেন বলো ত'?

মানদা বললে, ওমা, দিনরাত আমার দিকে নজর রাখে, আর বলবে না গা? সত্যসাধ্বী মেয়ের মুখ দিয়ে কখনো মিছে কথা বেরোয় বাছা?

অ্যাঁ, কি বললে, মানদা?

মানদা বললে, গরীব দুঃখীর মেয়ে, হাত-টানের একটু অভ্যেস না থেকে যাবে কোথা? দুধটা, মাছটা, পানটা,—আমার ত' বাছা মানুষের শরীর!

হিরণ বললে, তোমাকে কি টাকা-পয়সাও চুরি করতে হয়?

আর বাছা, টাকা! সুবিধে পেলে লোকে পুকুর চুরি করে, আমি কোন্ ছার! পাঁচ টাকা বাজারে নিয়ে গেলুম,—যদি ওর থেকে একটা আধুলী নিয়ে আঁচলে বাঁধি, তবে গেরস্ত কি আধপেটা খেয়ে থাকে? তুমিই বলো?

হিরণ বললে, হাঁ, কথাটা ঠিক। ঠিক বলছে! আচ্ছা তোমার দিদিমণি বলে, ঘরকন্নার জিনিসেও নাকি তোমার হাত পড়ে! ও কি সত্যি?

মানদা বললে দিদিমণি ঠিকই বলে, বাছা। ঘটিবাটি ঘরে প'ড়েই থাকে, পুরনো দু'একখানা কাপড়-চোপড়,—বাইরে দিয়ে এলে যদি দু'পাঁচ টাকা পাই, তাহ'লে অন্তত হাতখরচটা চলে যায় ত?'

কিন্তু এই নিয়ে যদি থানা-পুলিশ হয় মানদা?

থানা-পুলিশ! থানা-পুলিশের হাতটান নেই? তাদের ঘরে ঝি-চাকর নেই? রাঁধতে গিয়ে তারা বুঝি দুটো বড়া ভেজে মুখে তোলে না? তোমার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই, বড়বাবু।

হিরণ বললে, তা যা বলেছ, ও আমার দোষ। আচ্ছা মানদা, তুমি ঘরের তপিল থেকে পয়সাকড়িও চুরি করো নাকি?

মানদা বললে, তুমি বাছা বার বার চুরির কথা বলো না ওতে আমার মান খোওয়া যায়। টাকাটা-সিকেটা এক ফাঁকে বার করে নিলে কি তাকে চুরি বলে? কলতলা থেকে আংটি-মাকৃড়ি কুড়িয়ে পেলে কি চুরি করা হয়? সামনে দিয়ে তোমাদের নদী বলে যাচ্ছে, দিনরাত তোমাদের বাজে খরচা— তার থেকে আমি যদি আমার ঘটটা ভরে রাখি,—তাকে বলবে চুরি? শোনো তবে, এক গেরস্থ আমাকে একবার ধরে থানায় নিয়ে গেছলো, আমি নাকি তাদের ঘর থেকে হাতঘড়ি নিয়েছিলুম! আমি গিয়ে থানায় বললুম, কেন নেবো না? তোমাদের আছে এককাঁড়ি। আমাব বোন-পো আবদার ধরেছে, হাতঘড়ি চাই,—তোমাদের ঘর থেকে হাতঘড়ি না গেলে আমি পাবো কোথা গরীব মানুষ?

থানার লোকেরা কি বললে?

তারা হেসেই খুন। ওদের খোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেল। তারপব শোনো বাছা আরেকবারের কথা—

মানদা আবো কি যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হলো। মানদা ছুটে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। দেখতে দেখতে এক সময়ে মীরা উঠে এলো গুনগুনিয়ে। মুখখানা আজ তাব যেন উদ্ভাসিত আনন্দে টসটসে। হিরণ ওর হাত থেকে একটি মোড়ক নিয়ে বিছানার উপব রাখলো। মীরা হাসিমুখে ফস করে হিরণেব থুঁতনীটা ডান হাতে নেড়ে দিল। মীরার মুখে সরস মিষ্ট হাসি।

মোড়কে বেঁধে কী এত এনেছ?—হিরণ প্রশ্ন করলো।

মীরা পায়ের জুতো খুললো না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা গুছিয়ে বললে, জামাকাপড় ছাড়াও মেয়েদের আরো নানাবিধ সজ্জা আছে, সেগুলো লুকিয়ে কিনতে হয়। তুমি কোথায় ছিলে সারাদিন?

হিরণ বললে, তুমি একটু বসো, বিশ্রাম করো—তারপর বলছি।

মীরা বললে, না, বিশ্রামের আগেই বলো। এত দুঃখের পর সুখের ঘরকন্না পাতলুম,—ভাবলুম, তুমি বুঝি ভাসিয়ে দিয়ে পালালে!

হিরণ বললে, বাঃ, যে লোকটা ধার দিতে পারলে এ যাত্রা বেঁচে যায়, তার পালাবার কথা তোমার মনে এলো কেন?

মীরা গুনগুন ক'রে গান ধ'রে দিল, মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে হীল্‌তোলা জুতোয় সেই গানের তাল দিতে লাগলো, বিলেতী নাচের একটা রেশ যেন এসে পৌঁছলো তার দুই পায়ে,—একবার কি যেন মনে করে ডানহাতের দুটো আঙুল ঘষে কয়েকটা তুড়ি দিল; তারপর হঠাৎ বেরিয়ে গেল ঘর

থেকে। হিরণ বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকালো। এ-মীরা কাল রাত্রেরও নয়, আজ ভোরেরও নয়—এ অন্য মীরা।

রান্নাঘর থেকে মীরার কলরব শোনা গেল,—এঘর ওঘর থেকে তার কলকণ্ঠ কানে এলো, তারপর এক সময় আবার এঘরে এসে তক্তার বিছানাটার ওপর গড়িয়ে পড়লো। নিজের হাতখানা পায়ের দিকে বাড়িয়ে জুতোর ফিতে খুললো এবং পা-দুখানা এমনভাবে ঝাড়া দিল যে দুপাটি জুতো পায়ের থেকে ছিটকে কোথায় যেন ছুটে চলে গেল।

হিরণ এবার হাসলো। বললে, পেটে জ্বালা ধরলে এগুলো বেমানান হয় না। কিন্তু সারাদিন তুমি না খেয়ে রইলে?

মীরা চোখ বুজে ছিল। এবার মাথা তুলে বললে, খাবো না কেন? কলকাতায় হোটেল নেই? তুমিই বরং না খেয়ে আছ।

আমি? কেন, কলকাতায় ময়রার দোকান নেই?

মীরা খুব হেসে উঠলো।—

মুখ ফিরিয়ে হিরণ বললে, তোমার মুখে গন্ধ কিসের?

মীরা চুপ করে গেল।

হিরণ তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে পুনরায় বললে, আবার বুঝি তোমার সেই এটম্ বোমা গিলেছ?

মীরা বললে, না, তাঁর কোনো গন্ধ নেই।

তবে?

মীরা কোনো কথার জবাব দিল না। হিরণ সহাস্যে বললে, কিন্তু কলকাতার হোটেলের আসর এত সন্ধ্যারাত্রে ত' ভাঙে না? আর কিছুক্ষণ থাকার জন্যে পীড়াপীড়ি করেনি?

মীরা এবার বললে, শুধু পীড়াপীড়ি কেন, পায়ে ধরাধরিও করেছিল। আরো কিছু শুনতে চাও?

হিরণ বললে, আজ তোমার প্রতিজ্ঞাটা কিন্তু ভেঙে গেল মীরা।

হঠাৎ মীরা বিছানার থেকে ছিট্‌কে নেমে এলো। বললে, ওই যা নিচে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে,—মনে নেই! গোটা দশকে টাকা শিগগির দাও দেখি?

হিরণ তাড়াতাড়ি টাকা বার করে বললে, তুমি বসো, আমি ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আসছি।

না, না,—আমার হাতে দাও, আমি যাচ্ছি—আমার দরকার।—টাকাটা একপ্রকার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মীরা চক্ষের পলকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

উপর থেকেই বুঝতে পারা যায়, মিনিট দুয়েকের মধ্যেই দরজার কাছ থেকে মোটর গাড়িখানা স্টার্ট দিয়ে গলির রাস্তা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু যে গতিতে মীরা নেমে গিয়েছিল সেই গতিতে সে আর উঠে এলো না। তিন চার মিনিটের পর হিরণ একটু অস্বস্তিবোধ করলো। নিচের তলায় শুধু-যে ঘর নেই তা নয়, সেখানে নোংরা কলতলা ছাড়া দাঁড়াবারও বিশেষ জায়গা নেই। হিরণ উৎকর্ণ হয়ে বসে রইলো।

প্রায় পনেরো মিনিট কেটে যাবার পর হঠাৎ নীচের থেকে আচমকা একটা প্রকাণ্ড কাঁচ ভাঙার ঝনঝনে আওয়াজ শুনে হিরণ চমকে উঠলো। মানদা রান্নাঘরের দিক থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো। হিরণ ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়িতে গিয়ে নামলো। কিন্তু মীরা ততক্ষণে হাসিমুখে উপরে উঠে আসছে। মানদা আর কিছু না বলে সিঁড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিজের কাছে চলে গেল।

মীরা উপরে উঠে এলো। মাথার থেকে জল ঝরছে, কাপড় ভিজে সপসপ করছে। সেই জলঝরা অবস্থাতেই সে ঘরে ঢুকলো, হিরণ তোয়ালেখানা তাব দিকে এগিয়ে দিল। তারপর মুখ তুলে শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলো, নীচে অমন শব্দ হোলো যে?

মীরা মুখ ফেরালো। হিরণের দিকে ক্ষণকালের জন্য তাকালো। তারপর যেন ক্লান্ত জড়িত কণ্ঠে বললে, অত বড় প্রতিজ্ঞাটা ভাঙলে অতখানিই শব্দ হয় বৈ কি!

মীরা কোনোটাই যেন নাগালে পাচ্ছিল না। হিরণ একখানা ভালো শাড়ি টেনে এনে তার হাতের কাছে দিল। তারপর আলোটা নিবিয়ে নিজে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।

পাঁচ মিনিট পরেও মীরার কোনো সাড়া নেই দেখে হিরণ আবার ভিতরে এলো। মীরা সেইভাবে দেওয়ালের উপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই অবস্থায় তাকে দেখে হিরণ সকৌতুকে হেসে উঠলো। বললে, এ কি, এ যে একেবারে তান্ত্রিক সাধনা! আমি যদি এখনই পায়ের তলায় শুয়ে পড়ি, তা হ'লে বাইরের লোক কেউ দেখলে বলতো, রণরঙ্গিনী মহাকালী শিবের বুকে পা তুলে দিয়ে জিব কেটেছেন! হাসনুকে ডেকে এনে দৃশ্যটা দেখাতে ইচ্ছে করে!

জড়িত কণ্ঠে মীরা বললে, কি বলছো?

হিরণ সহাস্যে বললে, কিছু বলিনি! কিন্তু আর দেরি কোরো না, ভিজে দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ? আর নয়ত দাঁড়াও. আমি মানদাকে ডেকে দিই।

হিরণ আবার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। মিনিট তিনেক পরে মীরা এবার

নিজেই সুইচটা হাতড়ে আলো জ্বাললো। মানদা একসময়ে এসে ঘরখানা মুছে ভিজে কাপড় জামা তুলে নিয়ে চ'লে গেল।

মীরা ব'সে পড়েছিল তক্তার বিছানাটার উপর। ঘরের হাওয়াটা অত্যন্ত ঘোলা, সম্ভবত সেটা বুঝতে পেরেই মানদা চুপ ক'রে চ'লে গেছে, মীরার সঙ্গে একটি কথাও কয়নি। হিরণ এবার ভিতরে এসে বললে, তোরঙ্গয় তোমার অনেকগুলো টাকা জমেছে, ওগুলো কাল ব্যাঙ্কে রেখে আসবো, কেমন?

মীরা বললে, ওর মধ্যে কি বিমলাক্ষর টাকাও আছে?

হিরণ চমকে উঠলো? বিমলাক্ষর কাছে তার প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়লো। মৃদু কণ্ঠে সে বললে, হ্যাঁ, আছে। তোমার সঙ্গে কি তার দেখা হয়েছে?

মীরা হাসলো। বললে, তার সঙ্গেই ত' সন্ধ্যে পর্যন্ত ছিলুম।

হিরণ চুপ। কিন্তু এক সময়ে সে নিরুপায় কণ্ঠে বললে, মীরা জীবনের কোনো রহস্যই আমি জানতে পারলুম না। সমস্তটাই কল্পনার অতীত, বুদ্ধির অগম্য!

বিছানার উপরে মীরা কাত হয়ে পড়লো। আস্তে আস্তে বললে, দোষ তার নয়, আমার। লোভীর দোষ নয় লোভীকে যে প্রশ্রয় দেয় দোষ তার! আজ দুপুরে তাকেই আমি টেনে নিয়ে গিয়েছিলুম সাহেবের হোটেলে, সারাদিন ছিলুম তাকে নিয়ে।

হিরণ স্তব্ধ নতমুখে বসে রইলো।

বালিশের মধ্যে মুখ রেখে মীরা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে লাগলো, আধুনিক জীবনের নির্ভুল চেহারাটাকে সে প্রথম চিনিয়েছে, চিনিয়ে দিয়েছে চটুল মেয়েদের স্বাধীনতার পথ—সে কি আমার বন্ধু নয়? সে যা' চেয়েছিল আমার কাছে তা পায়নি,—চিঠির তাড়াটা পেয়েই সে পিছন ফিরেছে। কিন্তু আমি পেয়েছি তার কাছে অনেক শিক্ষা। আজ সমস্ত দিন তাকে পেয়ে বড় ভালো লাগলো! আজ দু'জনের সমস্ত খরচ আমিই করলুম।

হিরণ কথার জবাব দিচ্ছে না।

মীরা বললে, হোটেলে বসে তার কাছে কাঁদলুম বটে,—কিন্তু ক্ষমাও চেয়ে নিলুম। ক্ষমা চাইতে আমার মুখ আড়ষ্ট হয়নি।

হিরণ এবার মুখ তুললো। কোথায় যেন ডুব দিয়েছিল, এবার উঠে এলো। মৃদুস্বরে বললে, আবার কবে তোমার সঙ্গে তার দেখা হবে?

হঠাৎ মীরা ওঠবার চেষ্টা ক'রে বললে, আবার কেন দেখা হবে? এ-প্রশ্ন কেন?

তাহ'লে ওই টাকাটা তাকে ফেরৎ দিতে পারতে।

ও-টাকাটা তার দেনাশোধ, দান নয়।

হিরণ বললে, দানও নয়, কাকাবাবুর কথা ভুলে ওটা সে আমাকে ঘুষ দিয়েছে, - আমি কথা দিয়ে এসেছি তোমার সঙ্গে আর কোনদিন তার দেখা হবে না। যাই হোক, তোমার সঙ্গে দেখা হ'লে টাকাটা ফেরৎ দিও।

মীরা বললে, তার সঙ্গে আমারও আর কোনোদিন দেখা হবে না তা কি জানো তুমি?

কেন?

এই প্রতিজ্ঞাই আজ ক'রে এসেছি তার কাছে। প্রতিজ্ঞা আমার ভাঙবে না।

কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল মীরার মুখে, জড়িয়ে যাচ্ছিল চোখ দুটো। হিরণ তার দিকে চেয়ে একটু হাসলো, যেমন সে হেসে এসেছে চিরদিন। যেমন ক'রে হেসে চ'লে যায় সব কথার ওপর দিয়ে।

মীরা বললে, তুমি কি আমার প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করো না?

তোমার প্রতিজ্ঞায় তোমার নিজেরই যে বিশ্বাস নেই!

কেমন ক'রে থাকবে? নিজের ওপর কি আমার হাত আছে? আমার কথাটা কেন তুমি বিশ্বাস করো না?— মীরা সহসা উঠে বসলো,—বার বার হেসে কেন তুমি আমাকে অপমান করো?

হিরণ ব্যস্ত হয়ে বললে, মীরা! আমি শুধু বলছিলুম, যে-কথাটা রাখতে পারবে না—সেটা লোককে না দেওয়াই সঙ্গত। যারা তোমাকে চেনে না তারা তোমাকে ছোট করবে।

মীরা চেঁচিয়ে উঠলো, কে বলেছে আমি রাখতে পারবো না? তুমি কি আমার মনের কথার খোঁজ করেছ কোনদিন! আমার হাত ধ'রে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছ কোনদিন? কখনো সাহায্য করেছ? কখনো কঠিন ক'রে হাত ধরেছ?

শান্তকণ্ঠে হিরণ বললে, না ধরিনি,—কিন্তু আজ তুমি শরীরের এমন অবস্থা ক'রে এলে কেন? লিভারের ব্যাথাটা যদি বাড়ে?

মীরার টসটসে চোখে জল এসেছিল। বললে, আমাকে বেঁধে রাখোনি কেন তুমি?

বেঁধে রাখবো? কী দিয়ে? বাঁধন মানবে কেন তুমি?

বাঁধন আল্‌গা হ'লে কি দিয়ে বাঁধে, তুমি কি জানো না ?

হিরণ চুপ ক'রে রইলো। মীরা কাঁপছিল তার উদ্বেলিত কান্নায়। কান্নাটা নিরুপায়ের, হিরণ জানে। বার বার উঠতে গিয়ে সে লুটিয়ে পড়ে, আত্মপ্রত্যয়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি যার নেই, বিশ্বাসকে যে হারায় পদে পদে—এ কান্না তার। ওই চোখের জলের মধ্যে আর একটা কথা আছে হিরণ মানুষ হয়নি, পুরুষ হয়নি, হিরণ হয়েছে কবি। হিরণের মধ্যে সে ব্যক্তি নেই, যে শাসন করে, আধিপত্য বিস্তার করে, ক্ষমতাকে প্রকাশ করে, সমস্যার প্রতিকার করে। হিরণের মধ্যে ব্যক্তিত্ব নেই, আছে অভিব্যক্তি। আত্মস্বাতন্ত্র্য তার নেই, আছে আত্মবিলোপ। অভিজ্ঞতা নেই, আছে অভিজ্ঞান। প্রবলতর প্রেমের দ্বারা সে আঘাত করে না, কাঁদায় না, দগ্ধ করে না, —কেননা তার জীবনে কোনো সম্ভোগ নেই, আছে শুধু উপভোগ। সে কবি—সান্ত্বনায় সুখী, ব্যঞ্জনায় খুশি।

হিরণ আস্তে আস্তে উঠে বাইরে এসে দাঁড়ালো। রাত কম হয়নি, ঠাণ্ডা পড়েছে বাইরে। শুক্লপক্ষের নূতন চাঁদ কখন আস্তে নেমে গেছে। অন্ধকার আকাশলোকে হিমকুয়াশার ভিতর দিয়ে তারাগুলি টিপটিপ করছে।

ঘরের ভিতরে মীরা জড়িত কম্পিতকণ্ঠে কি যেন নিজের মনে বলছিল। ভাষাটা দুর্বোধ্য, কিন্তু বক্তব্যটা অস্পষ্ট নয়। ও'র ভিতরে আছে প্রচণ্ড যন্ত্রণা, সেটা আগ্নেয়গিরির। মর্মের ভিতরে তার দহন অনেকদিনের, বাইরেটা ছিল শান্ত। আঘাত খায় সে অন্তরে, ছোবল মারে নিজেকে।

হিরণ কি যেন ভাবছিল, হঠাৎ ঘরের মধ্যে আওয়াজ হোলো। মীরা আলুথালু হয়ে ঘুরছে ঘরের মধ্যে। আড়ষ্ট পদক্ষেপে হিরণ ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো। বিছানাটা তুলে মীরা ছুঁড়ে ফেলে দিল। তোরঙ্গর ভিতর ছিল নানাবিধ সামগ্রী, সেগুলো নিয়ে ঘরময় ছড়ালো, আয়নাটা নিয়ে আছাড় মারলো ঘরের মেঝের উপর,—হাতের কাছে যা কিছু পেলো ছিন্নভিন্ন ক'রে দিল। এমনি করে উন্মাদিনীর মতো সমস্ত ঘরখানা তচনচ করতে আরম্ভ করলো।

ঘরের একটা মাত্র জানালা খোলা ছিল, হিরণ গিয়ে বন্ধ ক'রে দিল পাছে বাইরের থেকে কিছু দেখা যায়। তারপর কাছে এসে মীরার পিঠে হাত রেখে বললে, নিজেকে ভেঙ্গে গুঁড়ো করলে খুশী হও ?

অগ্নিশিখার মতো মীরা লকলক করছিল। বললে, হ্যাঁ, হই—

পাগলিনীর আর কাণ্ডজ্ঞান রইলো না। হাতের মধ্যে পেয়ে গেল বড় তেলের শিশিটা। সেইটে নিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে সে হিরণের কপালের কোণে

আঘাত করলো। দেখতে দেখতে দরোদরো ধারে হিরণের কপাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে এলো। হিরণ শান্ত হয়ে দাঁড়ালো হাসিমুখে।

কিন্তু থামবার উপায় মীরার ছিল না, কেন না অবিশ্রান্ত আঘাত তাকে করতে হবে। আজকে চাই তার একটা চরম নিষ্পত্তি। ভাঙা আয়নার ফ্রেমটা সে তুলে নিল হাতে, সেটা দিয়ে প্রাণপণে সে আবার আঘাত করলো হিরণের পিঠে। লোহার খোঁচায় পিঠের চামড়া কেটে গেল।

হাস্যমুখে হিরণ বললে, রাজকন্যা আর রাজত্বের লোভে রাজবাড়ীর অন্নে মানুষ হয়েছি, আজ রক্ত দিয়ে যদি তার দেনা শোধ করি, মন্দ কি?

সাবানদানি ছিল কুলুঙ্গির ওপর, সেটা তুলে নিয়ে মীরা তার মুখের উপর আঘাত করলো। হিরণের নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে এলো। তারপর আর কিছু মীরা পেলো না হাতের কাছে, তখন সে দুই হাত দিয়ে অন্ধের মতো চোখ বুজে হিরণকে আক্রমণ করলো। তার মাথার চুল ছিঁড়লো, জামা ছিঁড়লো অবশেষে দুই হাতের আঙুলের ম্যানিকিয়োর করা রক্তিম নখর দিয়ে হিরণের বুকের উপরকার চামড়ায় আঁচড়তে আঁচড়তে কেঁদে বললে, কেন—কেন তুই মানা করলিনে? কেন ভালো হ'তে দিলিনে? কেন—কেন তুই আমাকে নোংরায় নামতে দিতে গেলি?

কপালের রক্ত গালের উপর দিয়ে গড়িয়ে নেমে হিরণের ছেঁড়া জামা ভিজে গিযেছিলো! কিন্তু নির্বিকার মুখে হিরণ বললে, ছোটবেলায় তোকে একবার খুব মেরেছিলাম, তুই বুঝি আজ তার শোধ নিচ্ছিস? বুকের মাংস ছিঁড়ে কি ভেতরটা দেখে নিতে চাস।

করালবদনী একবার মুখ তুলে বললে, তোকে আমি মেরে ফেলতে চাই! তোর বেঁচে কাজ নেই,—তুই থাকলে আমার শান্তি নেই!

প্রসন্ন মুখে হিরণ বললে, বেশ, তার জন্য না হয় তোকে পিস্তল এনে দেবো। কিন্তু আপাতত হাসপাতালে গিয়ে কি বলবো, শিখিয়ে দে? বলবো কি যে, ঘরজামাই হবার জন্য আগাগোড়া লোভ করতে গিয়ে গরিব ব্রাহ্মণ সন্তানের ভাগ্যে এই পুরস্কার?

মীরা ঠকঠক ক'রে কাঁপছে, যেন দাউ দাউ ক'র জ্বলছে! হিরণ বললে, আমার এ-রক্ত দেখলে হাসনু এখনই কি করতো জানিস? এই রক্তে সে তোর কপালের ওই শাদা সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা টেনে দিত, আর নয়ত তোর পায়ে বিয়ের আলতা পরিয়ে দিত!

দেখতে দেখতে মীরার নখের আঁচড় শিথিল হয়ে এলো।

নিরুদ্বেগ নিষ্কম্প কণ্ঠে হিরণ বলতে লাগলো, হাসনু থাকলে বলতো, এ

রক্ত পুণ্যময়। এ রক্তটা মিলনের, বিচ্ছেদের নয়। এ ঝরুক, একে বাধা দেবো না। এ রক্ত আমাব নয়, এ সকলেব—এর কোনো জাত নেই। এব থেকে ফোঁটা তুলে নিয়ে তুই তাদেব কপালে তিলক দিয়ে আসতে পারিস—যারা ছুরি দিয়ে কেটেছে দেশকে, যারা দুঃখ দুর্গতি এনেছে, যারা লক্ষ লক্ষ নিবীহ মানুষকে স্বাধীনতা নামে ভুলিয়ে সর্বস্বান্ত করেছে, অপমানিত উৎপীড়িত মানবাত্মার বুকের উপব দিযে যাবা বিজয়রথেব চাকা চালিয়ে গেছে। এ রক্ত পড়লো শুধু তাদেরই জন্য। পারিস তুই একথা চেঁচিযে বলতে? পাবিস মাথা তুলে ডাক দিতে?

মীরা মুখ তুললো এবাব। হিবণের বক্ত সেও প্রায় মেখেছে সর্বাঙ্গে। প্রলাপে বিকৃতকণ্ঠে সে বললে, এমন কোনো জানোয়াবেব নাম জানিস তুই, যে নিজের বক্ত নিজে খায়?

হিবণ তার মাথাব উপর নিজেব আহত হাতখানা রেখে হাসলো। তাবপব শান্ত মধুব কণ্ঠে বললে, সে জানোয়ারেব নয বে, সে দেবী, সে দশ মহাবিদ্যা’র একটি অংশ,—তার নাম ছিন্নমস্তা। আমাকে তুই মারলি,—রক্তটা না হয় আমার, কিন্তু যন্ত্রণাটা যে তোর!

রক্তাক্ত অবস্থায় হিরণ শাড়িখানা তুলে মীরার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বললে, আয়, এবাব তোকে শান্ত ক’বে তুলি। কাঁদিসনে কেন না কান্নাটাই পরাজয়, ভয পাসনে—ভয হোলো অপমৃত্যু, বিদ্বেষ রাখিসনে,—বিদ্বেষই হোলো বিচ্ছেদ, অশ্রদ্ধা করিসনে, কেন না অশ্রদ্ধার থেকে জন্ম অশুচিতাব। সব আবর্জনা ঘুচিয়ে এবার তুই উঠে দাঁড়া।

হিরণের বুকেব মধ্যে মুখ বেখে আর্তকণ্ঠে মীরা বললে, আমাকে এমন ক’বে তুই কেন ক্ষমা কবলি?

কোনো অপরাধ তোব নেই, ক্ষমাব কথাও ওঠে না। এ জীবনে তোর কোনো অশুচিতা নেই, একথা আমার চেয়ে কে বেশি জানে?

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মীরা বললে, কাল সকালে তোর সামনে আমি কেমন ক’রে দাঁড়াবো?

হাসিমুখে হিরণ বললে, ঝডঝঞ্ঝা সমস্ত রাত্রে কেটে যায়,—তারপরে এসে দাঁড়ায় সুন্দর প্রভাত। নতুন ক’রে তার আবির্ভাব।

মীরার আর দাঁড়াবার শক্তি ছিল না। মেঝের উপর সে ব’সে পড়লো, তারপর হিরণের পায়ের উপর মুখ বেখে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো।

২২

হাজিপুর ছেড়ে চ'লে যাবার সময় হিরণ একদিন বলেছিল, এযুগে তুই বেমানান, হাসনু। আরো কিছুকাল পরে তোর জন্মানো উচিত ছিল। জাতিধর্ম তুই স্বীকার করলিনে, তাই কোনো জাতির আশ্রয়ে তোর ঠাঁই হোলো না। কোনো দলের ছাপ তোর পিঠে নেই ব'লে তোর সৈন্যদলও জুটল না। ঢাল-তরোয়াল ঘুরিয়ে তুই যুদ্ধে নামলি, কিন্তু তোর স্বপক্ষে তুই ছাড়া আর কেউ নেই। সবাই জানলো তুই চটুল, তোর মধ্যে বাসনার আগুন, তুই একটা বাঙ্ময় যন্ত্রবিশেষ। তোর বিদ্যাটা এলোমেলো, বুদ্ধি অগোছালো,—আর প্রতিভাটা হোলো জ্ঞান-অজ্ঞানের একটা জগাখিচুড়ি। তোর সত্য উপলব্ধি আছে, কিন্তু তার প্রকাশে শুধু ভাবোচ্ছ্বাসের জটিলতা। মানুষের উন্নতির পথটা না জেনে তুই সমাজব্যবস্থা ওলটাতে চাস। ভাঙনের জন্যে লড়াই করাটা বাঙালীর বহুকালের বদ অভ্যাস, তুইও সেই ফাঁদে পা দিয়েছিস। এককালে দেশনেতারা যে কৌশলে জনসাধারণকে ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত ক'রে তুলতো, তুই শিখেছিস সেই কায়দা। যেখানে ধোঁয়া দেখিস সেখানেই বাতাস দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে বেড়াস, যেখানে দেখিস মূঢ়তা সেখানে গিয়ে তুই আদিম বৃত্তি উসকে দিয়ে বাহাদুরী নিতে চাস। তুই দুঃখীর বন্ধু, কিন্তু দরিদ্রের আশ্রয় নোস—কেন না দারিদ্র্য ঘোচাবার সুস্পষ্ট অর্থনীতিক পরিকল্পনা তোর জানা নেই। তুই বিপ্লবের বিভীষিকার চেহারায় আনন্দ পাস, কেন-না ওটায় আছে এক প্রকার রসকল্পনা,—ওটার মধ্যে আছে মানুষের প্রকৃতিগত দানবীয় চেতনার একটা পরিতৃপ্তি। এক শ্রেণীর দুর্বৃত্তরা অগ্নিকাণ্ডে আনন্দ পায়, জলপ্লাবনে গ্রাম ভাসতে দেখলে নেচে ওঠে, রাজপথে সাম্প্রদায়িক লড়াইতে রক্তপাত হ'তে দেখলে রণরঙ্গে উৎফুল্ল হয়,—ঝড়ে, ভূমিকম্পে মানুষের সংস্থান ওলোটপালট হ'লে তারা মজা পেয়ে ঘোরে,—তুই হ'লি তাদেরই ভদ্রসংস্করণ। তুই কাঁদতে জানিস, তাই বাংলায় তোর খদ্দের জোটে, তুই রসরঙ্গের ঢেউ তুলিস তাই জোটে তোর ভক্তের দল, তুই তোর যৌবনচ্ছটায় মোহগ্রস্ত করিস,—তাই তোর চারিদিকে খড়ের আগুন দপ ক'রে জ্বলে ওঠে। তোর মধ্যে সত্য আছে, কিন্তু বস্তু নেই, প্রাণ আছে, কিন্তু প্রতিভা নেই, বিদ্যা আছে, কর্ম নেই, বিবেক আছে, বিচার নেই, ভাব আছে, চিন্তা নেই। তুই হ'লি বাংলার সত্য পরিচয়। তুই

বা'র বা'র ভেঙ্গে প'ড়িস, কিন্তু বারবার উঠে দাঁড়াস, কেন-না মন্ত্রটা তোর সত্য !

বছর খানেক আগেকার এই কথাগুলো মনে প'ড়ে গিয়ে হাসনু নিজের মনেই হাসছিল। সকালের কাঁচা রোদ এসে পড়েছে তার পায়ের কাছে। সামনের শিশুগাছের উপরে হেমন্তকালের আকাশ উজ্জ্বল নীল, মধুমতীর উপর দিয়ে একদল শ্বেত পারাবত অনেকক্ষণ থেকে ঘুরে চলেছে। এ দৃশ্যটা হিরণের চোখে পড়লে হ'ত তার চৈতন্যলোকে সূক্ষ্ম কবিচেতনার একটা ঝলক জ্ব'লে উঠতো। অরণিকাষ্ঠের দ্বিতীয় টুকরো হোলো হিরণ, তারই ঘর্ষণে হাসনুর মনে আগুন জ্বলে। হিরণ আজ উপস্থিত থাকলে, তার তিরস্কারের জবাবটা দেওয়া যেতো। হাসনু হাসছিল।

পিছন দিকের সিঁড়িতে কা'র যেন পায়ের শব্দ হোলো, তারপরেই এসে দাঁড়ালেন মুখোমুখি থানার দারোগা ইয়াসিন সাহেব। হাসনুর ইজিচেয়ারের সামনে খান দুই চেয়ার সকল সময়েই মজুত থাকে। তারই একখানা টেনে নিয়ে ইয়াসিন ব'সে বললেন, আমার ওপর হুকুম এসেছে আমি যেন নিজে সব সময় আপনার শরীর স্বাস্থ্যের তদারক করি, আজ কেমন আছেন ?

আলাপটা উর্দুভাষায় কিন্তু জবাবটা সম্পূর্ণ ইংরেজিতে। হাসনু বললে, যেমন রেখেছ তোমরা ! রাজবন্দিনী আছেন রাজবাড়ীর দোতালায়, বাবুর্চি আরদালী মিলিয়ে অন্তত পাঁচটি লোক তার সেবক। জরির সজ্জা আর কাশ্মীরি শাল জড়িয়ে ব'সে থাকি সারাদিন। তাছাড়া আমার চরিত্রের ওপর পাহারা দেবার জন্যে নিচে রয়েছে বন্দুকধারী বালুচী সেপাই। আমার কেমন থাকা উচিত বলো ত' ইয়াসিন ?

হাসিমুখে হাসনু ইয়াসিনের দিকে তাকালো।

ইয়াসিনের রসবোধের কথা ওঠে না। তাঁর বয়স অল্প হলেও গাম্ভীর্যটা অল্প নয়। তিনি বললেন, আমি একটি প্রস্তাব করতে এসেছি আপনার কাছে। আপনার শরীর এখন অসুস্থ, কিছুকাল পর্যন্ত আপনি নাচ-গান বন্ধ রাখুন। সেদিন আপনি বমি করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন—একথা আমি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলুম। আপনার শরীর এখন দুর্বল ব'লেই এ প্রস্তাব করছি।

হাসনু বললে, কিন্তু হামিদ সাহেব পীড়াপীড়ি করেন যে ! তাঁর অনুরোধ এড়ানো কঠিন আপনি ত' জানেন !

ইয়াসিনের মুখখানা হামিদের উল্লেখমাত্র বিরক্তিতে রক্তিম হয়ে এলো। হাসনু সেটি লক্ষ্য ক'রে খুশি হোলো। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে ইয়াসিন

বললেন, ও লোকটি এসেছে বিদেশে চাকরি করতে। ওর হয়ত এসব দরকার। কিন্তু আপনি ওর খেয়াল খুশির জন্যে শরীর নষ্ট করবেন কেন? বার বার বমি করা ভালো নয়।

ইয়াসিন হামিদের ওপর খুশি নন্। হামিদের চরিত্রের ভিতরে যে চটুলতা আছে সেটি ইয়াসিন পছন্দ করেন না। হামিদের লোভের চক্রান্তটা ধ'রে ফেলতে তার দেরি হয়নি। কিন্তু সরকারী লোক হামিদ, রাজবাড়ী ও সম্পত্তির তিনি অছিদার, প্রচুর টাকাকড়ি নিয়ে তাঁর লোফালুফি আছে,—সুতরাং তাঁর সঙ্গে কোনও প্রকার প্রকাশ্য সংঘর্ষ ইয়াসিনের কল্পনার অতীত। প্রথম দিকে হামিদ সাহেব চেষ্টা করেছিলেন হাস্নুবানুর প্রাত্যহিক জীবনধারার ওপর আধিপত্য ও অভিভাবকত্ব বিস্তার করতে,—কিন্তু ইয়াসিন কঠোর পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি এই হুকুম জারী করেছিলেন, একমাত্র তাঁর আদেশ ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি হাসনুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবেন না। হাসনুর আহারাদির সমস্ত দায়িত্ব থানার লোকের পরিচালনায় থাকবে এবং তারাই নিচের তলায় হাসনুর জন্য খাদ্য প্রস্তুত করবে। বলা বাহুল্য, এ প্রকার কড়াকড়িতে হামিদ সাহেবের মনে ক্ষোভ জমেছিল। কিন্তু হাসনু হোলো অন্তরীণ বন্দী, হামিদের এক্তিয়ারের বাইরে।

হাসনু বললে, নাচগানে শরীর নষ্ট হয় একথা তোমাকে কে বললে। বমি হবার কারণ ত' নাচ-গানে নেই!

ইয়াসিন প্রথমটা জবাব দিলেন না। পরে বললেন, পাকিস্তান সরকার এই চান যে, আপনি সুস্থ থাকলে, একদিন পাকিস্তানের অনেক সেবা করতে পারবেন।

হাসনু আবার হাসলো। একটু যেন পরিশ্রান্ত কণ্ঠে বললে, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ থাকলে, পাকিস্তানের অনেক অসুবিধাও হ'তে পারে, ইয়াসিন।

একটা চমক লাগলো ইয়াসিনের মুখে চোখে। কিন্তু তিনি যথাসম্ভব মুখভাবটি গোপন ক'রে বললেন, আপনার সঙ্গে পাকিস্তানের সংঘর্ষ অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কেন-না আপনিও মুসলমান। মুসলমান কখনো মুসলমানের দুষমন হতে পারে না, কারণ তারা হিন্দুদের মতন আত্মবিরোধী নয়। আপনি যদি একটু হুঁসিয়ার হতেন তাহলেই পাকিস্তানের সঙ্গে আপনার ঝগড়া মিটে যেতো।

বাঁকা চোখে তাকিয়ে হাসনু বললে, কি প্রকার হুঁসিয়ার, ইয়াসিন?

জবাব দেবার আগে ইয়াসিন একটু সময় নিলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সামান্য একটা বন্দোবস্ত, আর কিছু নয়। আপনি

নেত্রীত্ব করুন, চাষী-গরীবদের জন্যে যা ইচ্ছে তা করুন, বক্তৃতা দিন—কিন্তু তাব আগে একটা সামান্য বন্দোবস্ত ক'বে নিন। এতে আপনার সম্মান অক্ষুণ্ণই থাকবে।

হাসনু প্রশ্ন কবলো, বন্দোবস্তেব ব্যাখ্যাটা কিরূপ?

ইয়াসিন তৎক্ষণাৎ বললেন, পাকিস্তানেব অনেকেই জানে চাষী-গরীব আপনাকে জানবে নিজেব লোক, আর সরকাবও জানবে আপনি তাদেব আপন লোক।—আপনাব সঙ্গে আমাদেব সেই চুক্তি।

হাসনু কতক্ষণ চুপ ক'বে রইলো। তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ইয়াসিন যেন অনেকটা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, এবং হাসনুর মুখের জবাব শোনবার আগেই তিনি উদ্দীপ্তকণ্ঠে বললেন, আপনার সঙ্গে রফা করবার জন্যেই কর্তৃপক্ষ এক বছর আগে এখানে আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি যদি আপনার মনের পরিবর্তন ঘটাতে পাবি তবেই আমাব চাকুবিব উন্নতি হবে। জনাব হামিদ আপনাকে নাচগানে ডুবিয়ে বাখতে চায়, কিন্তু আমি চাই আপনি মুসলমান জাতিব সেবা করুন। আপনি বাজী হ'লে পাকিস্তান আরো শক্ত হবে।

হাসনু মুখ তুললো। বললে, অনেকবাব একথাটা তুমি আমার কানে তুলেছ, ইয়াসিন। তোমাব আসল প্রস্তাবটা কি, আজ বলো।

ইয়াসিন বললেন, সোজা প্রস্তাব। আপনি শুধু বলবেন যে, এটা ইসলাম-রাষ্ট্র। এখানে লাখ লাখ বেকুক আছে, তারা প্রশ্ন কবে, তর্ক করে, এমন কি সন্দেহও কবে, কিন্তু আপনি শুধু একটি কথাই বলবেন, এটা ইসলাম রাষ্ট্র। সবাই জানে পবিত্র কোবান হাঁতে নিয়ে মুসলমান ব'লে হাঁক দিলে ওবা জাহান্নমের ভয়ে চুপ ক'রে যাবে। ওবা জলে-কাদায় ডোবায় অন্ধকাবে প'ড়ে থাক, লেখাপড়া শিখতে ওদের মাথা গবম হবে হিন্দুবা কাছে থাকলে ওবা বাহানা ধরতে শিখবে, দুনিয়ার সঙ্গে যোগ বাখতে চাইবে,—তখন ওদেব বাগ মানানো যাবে না। আপনি শুধু বলবেন, ওরা যেন আল্লাব মাটি আব আল্লাব পানি নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকে।

হাসনু প্রশ্ন করলো, ইসলাম নিয়ে থাকলে ওদের দৈন্য আর দারিদ্র্য ঘুচবে ইয়াসিন?

দাবিদ্র?—ইয়াসিন হাসলেন, দারিদ্র্যের দিকে ওদের চোখ পডবে কেন? ওরা জানে ওইটেই ওদের নসিব। আপনি ত' জানেন, ভাত-নিমক-তামাক আর ইসলাম—ব্যস, পাকিস্তানে সবদিকে শান্তি। হিন্দুরা শুধু ওদেরকে ফুসলায়। লেখাপড়া জানা হিন্দুরা হোলো পাকিস্তানের দুষমন, তাদেরকে

ধীরে ধীরে সরাতে হবে। মাটি আর পানি তপশীলীরা শুধু থাকবে এখানে। কেন-না তাদের কোনো জাত নেই।

হাসনু বললে, এভাবে তোমরা কতদিন রাজত্ব চালাবে?

ইয়াসিন সহাস্যে বললেন, আল্লার রাজত্ব আল্লাই চালাবেন!

কিন্তু আল্লার এই প্রকার শাসনপদ্ধতি যাদের পছন্দ নয়, তাদের ঠাঁই হবে কোথায়?

ঈষৎ কঠিন কণ্ঠে ইয়াসিন জবাব দিলেন আল্লার কয়েদখানায়!

ইয়াসিনের বক্রদৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে হাসনু একটা কড়া জবাব দিতে যাচ্ছিল এমন সময় সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন হামিদ সাহেব। সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, সালাম আলেকম, জনাব ইয়াসিন! আপনি এখানে আছেন ব'লেই সাহস পেয়েছি। বেয়াদপি মাপ কববেন।

ইয়াসিন একটু চেষ্টাকৃত অভ্যর্থনা জানিযে বললেন, বৈঠিয়ে! পরোয়া নেহি। কেয়া ফরমাস, কহিয়ে?

হামিদ সাহেব হাসনুব দিকে চেয়ে একটু সাহস সঞ্চয় করবাব চেষ্টা ক'রে বললেন, বেগমের চিকিৎসার কিছু ভালো ব্যবস্থা হচ্ছে কি? আমি বড় চিন্তিত হয়েছি, জনাব।

ইয়াসিন বললেন, এটা রাজবন্দী আর সরকারের মধ্যেকার আলোচনার বিষয়। সরকারী ডাক্তার ওঁর চিকিৎসা করছেন।

হামিদ প্রশ্ন করলেন, কিন্তু অসুখটা কি, জনাব?

সেকথা ডাক্তার বলতে পারে।

হামিদ একেবারে চুপ। কিন্তু প্রশ্নোত্তরের মধ্যে উভয়ের চিত্তক্ষোভটা লক্ষ্য করবার বস্তু। গাম্ভীর্য ও নীরবতার অন্তরালে রয়েছে উভয়ের মন কষাকষি। ইয়াসিন আসবার পর থেকে হামিদের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে,— হিরণ এটা দেখে গেলে কৌতুক বোধ করতো। ফকিরের মা দেখলেও খুশি হোতো, কিন্তু সেও কয়েক মাস আগে ওলাউঠায় মারা গেছে। গত বর্ষায় মারা গেছে ভূতপূর্ব দারোগা হারুমিঞা, দুর্দিনে দুঃখে হাসনুর স্নেহের আশ্রয় লোপ পেয়েছে। বুড়ো মরেছে ভাঙ্গা বুক নিয়ে, কেন না পাকিস্তানের রীতিনীতির সঙ্গে নিজেকে সে মেলাতে পারেনি।

হঠাৎ অপরাজেয়া হাসনু হাসলো। বললে, ইয়াসিন, মুখ ফিরিয়ে একবার দেখে নাও, হামিদের মুখে-চোখে শিকারী বিড়ালের ছাপ। হামিদ হোলো জাত মুসলমান,—ওর মধ্যে রসবোধের কোনো ফাঁকি নেই। আগে আমার সঙ্গে ওর বনিবনা ছিল না, বুঝলে ইয়াসিন?

ইয়াসিন সহাস্তে হামিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, বনিবনা। কেমন ক'রে হোলো ?

হামিদ গম্ভীরভাবে বললেন, এসব বেকার তর্ক আমি করতে আসিনি, জনাব। আমি চাই বেগম সুস্থ হোন।

হাসনু বললে, সুস্থ হ'লে তোমার রসচর্চাটা দীর্ঘস্থায়ী হয়, কেমন হামিদ ? শোনো ইয়াসিন, আগে ওর সঙ্গে আমার বন্‌তো না, এখন বনে। কেন জানো ? ওর লোভটাকে খোঁচা দিলেই ওর ভিতর থেকে সুড়সুড় ক'রে পোষমানা জন্তু বেরিয়ে আসে। আমার নাচগানের সঙ্গে সেই জন্তুটা আবার তাল দিতে থাকে।

ইয়াসিন মুখ নিচু ক'রে হাসি গোপন করতে চাইলেন। হামিদ অবাক হ'য়ে এই বিশ্বাসঘাতিনীর দিকে চেয়ে রইলেন।

ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শিশুগাছটার দিকে চেয়ে ঈষৎ ক্লান্ত কণ্ঠে হাসনু বলতে লাগলো, বেশ লাগে! কোনো ভাবনা নেই, কোনো ভবিষ্যৎও নেই। একে একে চ'লে গেছে সবাই! কেউ বা আসবো ব'লেও পালিয়ে গেছে। বেশ লাগে। সাপ খেলা নিয়ে আরম্ভ, সাপ খেলায় শেষ!

হামিদ ইয়াসিনের দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে বলেন, কাল রাত্রে বেগম হঠাৎ চিৎকার আরম্ভ করেছিলেন,—আজ আমি তাই জানতে এসেছি ওঁর স্বাস্থ্যের কথা। ওঁর এরকম অবস্থা দাঁড়ালো কেন ?

ইয়াসিন বললেন, এটা অনেক কয়েদীই ক'রে থাকে, জনাব হামিদ।

কিন্তু এতে মাথার দোষ হ'তে পারে!

মাথার দোষ হ'লে চিকিৎসাও হ'তে পারবে!

লেকিন অসুখটা, জনাব ইয়াসিন ?

ইয়াসিন জবাব দিলেন,—সে কথা ডাক্তার জানে, জনাব হামিদ। আমি হাকিম নই!

হামিদ মুখখানা ভার ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর চেহারা দেখে সহসা হাসনু খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতেই বললে, ব্রহ্মচারী হামিদের প্রাণে বড়ই দুঃখ জমেছে, বুঝলে ইয়াসিন ? যদি বা একটু বনিবনা হয়েছে আমার সঙ্গে,—কিন্তু ভাগ্যে ওর সইলে হয়! ছোটরাণী সুমিত্রা দেবী না আসা পর্যন্ত বিদেশের চাকরি জীবনটা কোনো মতে কাটাতে হবে, এই ওর ভাবনা! তোমার সেই গুলজার বাগের তথাকথিত ভগ্নি কোথা গেলেন, হামিদ ?

ইয়াসিন সাহেব এবার কিছুতেই হাস্য সম্বরণ করতে পারলেন না। তাঁর

হাসিতে অপমানের আঘাত আরও বেশি হামিদের লাগলো। হামিদের সুর্মা লাগানো চোখ, খসখসে আতর-মাখানো তুলো-গোঁজা কান, রঙিন দাড়ি এবং সকালের দিককার ফিটফাট চেহারা,—সমস্তটাই যেন এই নারীর পরিহাসে নোংরা হয়ে উঠলো। কিন্তু আজ তিনি যেন একটু প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। দু'পা এগিয়ে তিনি আবার ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন, বেগম, দু'বছব হ'তে চললো এই বাংলা মুলুকের জল খাচ্ছি। এই জলে এমন জিনিস আছে যা বাইরের লোকের ধাত বদলে দেয়। তোমার তামাসায় ইজ্জৎ নষ্ট হয়, আমি জানি—। আমি ছোট মানুষ তাও আমি মানি। লেকিন তুমি আমাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে মজবুত করেছ। আল্লার কসম, আমি চাই তুমি সুস্থ হ'যে ওঠো, বেগম। তুমি যতই আঘাত কবো, আমি কোনো আঘাত ফিরিয়ে দেবো না।

হাসনু প্রসন্ন হাস্যে বললে, পোড়া কপাল আমার, হতভাগ্য হিরণটা এখানে নেই। থাকলে দস্যু রত্নাকরের রূপান্তরটা একবার দেখাতো!—তুমি এত চঞ্চল হচ্ছ কেন, হামিদ?

ইয়াসিনের দিকে একবার অলক্ষ্যে কঠিন চক্ষে তাকিয়ে হামিদ বললেন, তুমিই আমাকে চঞ্চল ক'র তুলেছ বেগম। কাল রাত্রে আমি কান পেতে শুনছিলুম, তুমি চিৎকার করছিলে। এই মস্ত প্রাসাদবাড়ীব দোতলায় ঘুরে-ঘুরে তোমার ভাঙ্গা গলার আওয়াজ শুনে আমার ভয় লাগছিল। আমি তোমার জীবনকে মনে মনে বিচার কবছিলুম।

হাসিমুখে হাসনু বললে, বিচারের সিদ্ধান্তটাও তবে ইয়াসিনকে জানিয়ে যাও?

আল্লাকে জানাবো, আদমীকে জানিয়ে কিছু হবে না, বেগম। হামি মুসলমান হয়ে বলছি, তুমি আল্লার প্রিয় সন্তান!—বলতে বলতে হামিদ এবার ইয়াসিনের দিকে তাকালেন, এবং পুনরায় বললেন, জনাব আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমি আর বেগমকে নাচগানের অনুরোধ জানাবো না! উনি একা থাকেন, নাচগানে ওঁব মন ভুলে থাকে—তাই আমি অনুরোধ করতুম। কিন্তু আপনার দরবারে আমার আর্জি,—যদি দিনের মধ্যে দু'একবার ওঁর খোঁজ-খবর করি, তবে আপনার আপত্তি আছে কি না!

ইয়াসিন বললেন, পরে আপনাকে জানাবো, জনাব।

কপালে একবার হাত ঠেকিয়ে হামিদ চ'লে যাবার উপক্রম করতেই হাসনু ডাকলো, দাঁড়াও হামিদ। আমার এই পোড়া চেহারাটার ওপর তোমার লোভের সীমা ছিল না এই সেদিন পর্যন্ত। আমি তোমার বিবি হলে তুমি খুশি হ'তে?

হামিদ বললেন, আমাকে আর কত শাস্তি দেবে, বেগম ?

তুমি ত' এই শাস্তিই চেয়েছিলে, হামিদ। লোভের বস্তু রুগ্ন হ'লে বুঝি তার দাম থাকে না ?

হাসনুর মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকিয়ে হামিদ হঠাৎ উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রে ফেললেন—যে-ব্যক্তি সারা মুলুকের প্রিয়, তাকে আমি বিবি বানিয়ে ঘরে বন্ধ করবো, এ রকম জানোয়ার আমি আগে হতে পারতুম, এখন আর পারিনে।

হামিদ তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

ইয়াসিন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন। তার দিকে তাকিয়ে কৌতুক ক'রে হাসনু প্রশ্ন করলো, লোকটাকে আজ কেমন লাগলো, ইয়াসিন ?

ইয়াসিন ফিরে তাকালেন। বললেন, বেকুব ছাড়া আর কি বলবো ? শুনুন, এখানে হিন্দু নেই তাই বলি। পাকিস্তানে এই সব লোকই বেশি। পাকিস্তানকে সভ্য জগৎ ঘৃণা করে এই সব কর্মচারীরই জন্যে। এরাই মুখে ইসলামের জিগির তোলে আর ভিতরে ভিতরে মেয়ে লুট করে। তবে কিনা সেই পুরনো কথাটাই সত্যি। লুটকরা মেয়ে নিয়েই এ দেশে মুসলমানের সংখ্যা বেড়েছে।

হাসনুর মনে দুষ্টবুদ্ধি ছিল। বললে, হামিদ আমাকে ভালো কথা বললে আমার রাগ হয় কেন, ইয়াসিন ?

ইয়াসিন একবার হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। পরে বললেন, জেনানার হাওয়া গায়ে লাগলে যে লোকের রং বদলায় তার ওপর রাগ করিনে, বেগম—তাকে ঘৃণা করি। আচ্ছা, আমি এখন উঠি। কিন্তু আপনি আমার প্রস্তাব মানতে কি রাজি নন্ ?

হাসনু হাসলো। বললে, তোমার চেষ্টা-চরিত্রের আমি তারিফ করি, ইয়াসিন। কিন্তু পুলিশের হাওয়া গায়ে লাগলে যার রং বদলায় তাকে তুমি ঘৃণা করো না ?

একথার মানে ?

হাসনু বললে, তুমি জ্যাঠামহাশয়ের মাটিতে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছ, ইয়াসিন,—এ মাটির জাত বড়ই কঠিন। তোমরা হ'লে মুসলমান আর আমি হলুম বাঙ্গালী মুসলমান,—আমার জাত আলাদা। ইসলাম রাষ্ট্র থাক্ না কেন পশ্চিম পাকিস্তানে, কিন্তু পূর্ববঙ্গে থাক্ বাঙ্গালীর সংস্কৃতি !

ইয়াসিন ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, আপনার এই প্রাদেশিক মনোবৃত্তিতে পাকিস্তানের কত বড় ক্ষতি হ'তে পারে, তা কি আপনি জানেন ?

হাসনু বললে, বাঙালার সংস্কৃতি রক্ষার জন্যে পাকিস্তানের যদি ক্ষতি হয়, তা বরখাস্ত করতে পারবো, বন্ধু!

বক্রকণ্ঠে ইয়াসিন প্রশ্ন করলেন, পূর্ববঙ্গটা কি পাকিস্তানের বাইরে?

তাই আমার বিশ্বাস। পাকিস্তান আমাদের জন্য হয়নি!

তবে কাদের জন্য হয়েছে?

হাসনু বললে, অসুস্থ শরীরে তোমার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামতে পারবো না ইয়াসিন। শুধু এই কথা মনে রেখো, বাঙ্গালীর মাথায় পা রেখে যারা পাকা ফল পাড়ছে—পাকিস্তান হোলো তাদের। যারা ধান-পাট কেড়ে নিচ্ছে, মুখের ভাষা কেড়ে নিচ্ছে, বন-জঙ্গলের কাঠ কেটে নিয়ে পালাচ্ছে, যারা পান্তাভাতের সঙ্গে মুনটুকু খেতে দিচ্ছে না,—পাকিস্তান তাদেরই।

উঠে দাঁড়িয়ে ইয়াসিন বললেন, আমরা কতদিন ধ'রে লড়াই ক'রে পাকিস্তান সৃষ্টি করেছি, তা কি আপনার জানা নেই?

হাসনু আবার হাসলো। বললে, জানি বৈ কি। বছর কুড়ি ধরে তোমরা অহিংসার পিঠে হিংস্র নখের আঁচড় টেনে রক্ত বা'র করেছ, সেই উৎপাত এড়াবার জন্যেই পাকিস্তান সৃষ্টি! কিন্তু আর নয়, ইয়াসিন,—তোমার অনেক বেলা হয়ে যাচ্ছে।

আপনার এই মনোভাবের জন্যে হিন্দুর চক্রান্তই দায়ী। এই ব'লে সিঁড়ির দিকে ইয়াসিন অগ্রসর হলেন। কিন্তু একথাটা ব'লেও তাঁর মনের দাহ কমলো না। পুনরায় বললেন, আপনি কারসাজি ক'রে আমার মনের কথা জেনে নিলেন। এর ফল আপনার পক্ষে ভালো হবে না।

হাসনু বললে, ফলাফলের একটু আভাস দিয়ে যাবে নাকি?

হাসনুর পরিহাসসরস কণ্ঠের জবাবে ইয়াসিন একবার রক্তিম চক্ষে তার দিকে তাকালেন, তারপর মসমস ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

নিচের তলায় বন্দুকধারী সেপাইরা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ইয়াসিনের পথ ক'রে দিল, কিন্তু ক্রুদ্ধ উত্তেজনাময় অন্যমনস্ক ইয়াসিন সেটি লক্ষ্য করলেন না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে একবার তিনি থমকে দাঁড়ালেন। রাজা জীবেন্দ্রনারায়ণের আমলের একটা শ্বেতপাথরের পুতুল দাঁড়িয়েছিল একপাশে, সেইদিকে পড়লো তাঁর রক্তদৃষ্টি। হাসনু ভাঙবে, কিন্তু নুইবে না,—এমনি একটা কথা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। হাসনু কম্যুনিস্টপন্থী এবং পাকিস্তানের দুষমন—এইটিই তাঁর সিদ্ধান্ত। যদি হাসনু তাঁর প্রস্তাবে রাজি হোতো, তবে একদিন এই নারী সম্ভবত মন্ত্রীত্বের গদী লাভ করতে পারতো—এবং অন্তর্বর্তীকালের মধ্যে তার অভাব অভিযোগও একটুকু থাকতো না।

ইংরেজ শাসনকালে একদা ইংল্যাণ্ডে এই কথাটা চালু ছিল যে, অকুস্থলে উপস্থিত ব্যক্তির কথা আগে বিশ্বাস করবে। ইয়াসিন হাজিপুরের দারোগা, সুতরাং তাঁর ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষ মানবেন, এ জানা কথা। ইংরেজ চ'লে গেলেও তাদের শাসনপদ্ধতিটা তেল-কাগজের উপর দাগা বুলিয়ে নকল করা রয়েছে এদেশে ইয়াসিন একথা জানেন। হাসনুর মতো নেত্রীকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে তাঁর একটুও বিলম্ব হবে না।

বাঁ হাতের তালুর উপরে ডান হাতের মুঠোটা ঠুকে ইয়াসিন হনহন ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

ইয়াসিনকে বিদায় ক'রে হাসনু আবার ফিরে এলো নিজের মধ্যে যেখানে তার নিঃসঙ্গ দিন কাটে। হিরণ কাছে থাকলে আজ বলতো, কই হাসনু তোর সেই শানানো তরবারিতে আজ মরচে ধরে কেন? গায়ের জোরে মোড়ল সাজতে গিয়েছিলি, কিন্তু সেই ফেনা যে শুকিয়ে এলো? পুলিশের হাতে নজরবন্দী থাকলেই যদি দেশের লোক তোকে ভুলে যায়,—তবে বুঝতে হবে তোর নেত্রীত্বে গণদেবতার কোনো স্বীকৃতি নেই।

হাসনু ফিরে তাকালো শিশুগাছের দিকে। হাসিমুখে মনে মনে বললে, কাঠবিড়ালী সাগর বাঁধতে চেয়েছিল, সেই কাহিনী কিন্তু লোকে আজো ভোলে নি, কমরেড।

শিশুগাছের শীর্ষ থেকে জবাব এলো, তুই নেত্রী নয়, পৃথিবীর নাট্যশালার সামান্য এক অভিনেত্রী! তোর জীবনটা হলো এক নির্বোধ কাহিনীকারের অক্ষম রচনা মাত্র,—ওর মধ্যে আছে শুধু আওয়াজ আর আক্রোশ,—যার কো.না অর্থ মেলে না! তোকে মনে ক'রেই শেক্‌সপীয়র এই কথা লিখেছিল।

হাসনু মুখ ফিরিয়ে কেমন যেন অবসাদের হাসি হাসলো! হাসিটি স্নেহের সমাদরের। যেমন ক'রে এতকাল ধ'রে সে হেসেছে হিরণের দিকে তাকিয়ে। আগুনের ফিন্‌কির থেকে হঠাৎ দাবানল জ্বলে না! সেটা যে কিছু সময়সাপেক্ষ একথা কাছে থাকলে হিরণকে বোঝানো যেতো। ভূমিকম্পের পূর্বে মাটির তলা নাকি অনেক আগের থেকে গরম হ'তে থাকে,—সে-ঘটনা ঘটে লোক-চক্ষুর অন্তরালে। উত্তরকালের বিরাট কর্মযজ্ঞের জন্য পূর্বকালের বহু নরনারীর কঙ্কাল একটির পর একটি জমা হ'তে থাকে। বি.দু বিন্দু জল বাষ্প হয়ে ওঠে, পরবর্তীকালে বিপুল বর্ষণ তার সাক্ষ্য দেয়।

শিশুগাছের হাওয়া এসে তার কানে কানে বললে, এ সান্ত্বনা নিয়েই কি তুই বাকি জীবন খরচ করবি?

হাসনু জবাব দিল, এটা সান্ত্বনা নয়, এটাই সার্থকতা। মৃতদেহ আগলে

ব'সে সারাদিন-রাত শৃগাল-কুকুরের সঙ্গে লড়াই করাটা কি তেজস্বিতা? তার চেয়ে ওই শবদেহের কানে কানে মন্ত্র উচ্চারণ করি—ওর মধ্যে প্রাণের উজ্জীবন ঘটুক।

তাতে ভূত হবে দানব!

হাসনু বললে, আমি তাকেই চাই। বিরাট অপমৃত্যু অপেক্ষা বিরাটতরো অপদেবতার দানবীয় শক্তি কাম্যবস্তু! সে এসে বাঙ্গালীর ঝুঁটি ধ'রে নাড়া দিক্।

অরাজকতা চাস?

দুর্জয় নবযৌবনের ভাঙ্গনকে অরাজকতা বলে না, কমরেড! বসন্ত কালের সর্বব্যাপী ধ্বংসের পর নতুন সৃষ্টি! ঋতুরাজের ফুৎকারে সব পাতা ঝ'রে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক্, জীর্ণতার অবসান ঘটুক!

পিছন দিকে খসখস ক'রে পায়ের শব্দ হোলো। আলোচনাটা বন্ধ রেখে হাসনু বলে, কে?

এক প্রৌঢ়া বিদেশিনী মুসলমানী মস্ত থালায় ক'রে খাদ্যসম্ভার নিয়ে এলো। সে কথা বলে না, কাজ করে। সামনের টি-পয় টেনে সে থালাখানা নামিয়ে রাখলো। কাঁচের ডিসে সবজির ঝোল থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছে। ভাতের সঙ্গে নানাবিধ ব্যঞ্জন, একপাশে মিষ্টান্ন।

হাসনু বলে, সবজির ঝোলের যেন আজ বড় বেশী বর্ণ-সমারোহ? কী দিয়ে রান্না হয়েছে, মতিয়া?

মতিয়া প্রতিদিনের মতো আজো যন্ত্রবৎ একটি কথা বললে, পহিলে সুপকো পি লিজিয়ে। বহুৎ তরি হায়।

যথা আজ্ঞা, দেবী!—পাত্রটা তুলে নিয়ে হাসনু ধীরে ধীরে চামচের সাহায্যে চুষে খেতে লাগলো। বস্তুটা সুস্বাদু ও সুগন্ধী। একটু একটু ক'রে সমস্ত সুপটুকু সে পান ক'রে নিল।

মতিয়া গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সিঁড়ির পাশে। যতক্ষণ না হাসনুর আহার শেষ হোলো ততক্ষণ অবধি সে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর এসে সে তার উর্দু ভাষায় জানালো, আপনাকে একবার ভিতরে আসতে হবে। আপনার গা দেখবো।

নিচে ডাক্তার এসেছেন বুঝি?

হাঁ। রিপোর্ট পেশ করনা হ্যায়!

ইজিচেয়ার থেকে হাসনু এবার অতি সন্তর্পণে ওঠবার চেষ্টা করলো। হাত-দু'খানার মতো পা-দু'খানাও যেন আজকাল কথা শুনতে চায় না। মাস

ছয়েক আগেও নিজের দিকে চোখ মেলে তাকালে তার মন সরস হয়ে উঠতো, —কিন্তু এ কী বিশ্রী কাণ্ড, তার সর্বাঙ্গ যেন দিন দিন শুকোচ্ছে! পা দু'খানার এই শীর্ণতা দেখলে মীরা চমকে উঠতো, এবং উপরতলাকার বিশুষ্ক স্বাস্থ্যবিকার নিয়ে আর যাই হোক, আয়নার সামনে দাঁড়ানো যায় না। এত দ্রুত অবসান হবার কথা নয় ত'! একদিন সে নিজের গায়ের ওপর আঁচল টেনে দিত নতমুখী লজ্জায়, আজ কেমন এক প্রকার অপমানে সে যেন নিজের শরীরটাকে গোপন করতে চায়। এ কি হোলো তার?

হাঁটতে গেলে দু'খানা শীর্ণ পা একসঙ্গে জড়িয়ে যায়। মতিয়া তাড়াতাড়ি এসে তাকে দুই হাতে ধরলো। তুষার রাজ্যে হঠাৎ গিয়ে দাঁড়ালে যেমন হাত-পা অসাড় হয়ে আসে, এও তেমনি। হাত-পায়ের আঙুলগুলো যেন দিন দিন কুঁকড়ে বেঁকে যাচ্ছে, ওদের মধ্যে রক্ত-চলাচলের সাড়া নেই। নিজের চেহারার বিকৃতি দেখলে হাসনুর ভিতর থেকে কেমন যেন হাসির স্রোত ফেনিয়ে উঠে।

হাতখানা পিঠের দিকে জড়িয়ে মতিয়া তাকে ধীরে ধীরে ভিতর দিকে নিয়ে গেল। তারপর সামনের দরজাটা একটুখানি ভেজিয়ে দিয়ে এসে মতিয়া তার গায়ের থেকে কাপড় সরাতে লাগলো। কতকগুলো জায়গায় একপ্রকার চাকা-চাকা ঘা ফুটেছে।

হাসিমুখে হাসনু বললে, তোমাদের হাতের মোগলাই রান্না খেলে বড় আনন্দ পাই, বুঝলে মতিয়া? কিন্তু খাবার পরেই যেন ঘুলিয়ে উঠতে থাকে। বমি-মমি ভাব থাকে অনেকক্ষণ, কেন বলো ত'?

আপন ভাষায় মতিয়া বললে, তোমার শরীরের ভিতর বেমার চলছে। শরীরে অসুখ থাকলে সন্দেশও ক্ষতি করে।

কিন্তু আমার কোনো অসুখ ত' নেই। আজ পর্যন্ত কখনও আমার জ্বর-সর্দি-কাসি হয়নি, মতিয়া।

মতিয়া তার দিকে তাকালো, কিন্তু কিছু বলল না। হাসনু এক-সময়ে বললে, বন্দীরা ইংরেজ আমলে নিজের হাতে নিজের সব কাজ করতো,—রান্নাবান্না, বিছানা করা, স্নানের ব্যাপার, খেলাধুলো, পড়া-শুনো,—কিন্তু আমার সে এক্তিয়ার নেই কেন?

মতিয়া জানালো, কোনো কথার জবাব দেবার অধিকার তার নেই

নিজের শরীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বেশিক্ষণ আলোচনা চালানো অত্যন্ত অরুচিকর ব'লেই হাসনু মনে করে,—সুতরাং সে চুপ ক'রে গেল। যে-পরিবারে সে মানুষ সেখানে অসুখ-বিসুখের ঠাঁই ছিল না। শারীরিক দুর্বলতা,

স্বাস্থ্যের বিকার, রোগশয্যার সেবা, ঔষধপত্রের আনাগোনো, অসুস্থ ব্যক্তির পথ্য, —এ সমস্ত ব্যাপার ছিল তাদের জীবনধারার বাইরে। হঠাৎ যদি আজ মীরা কিংবা হিরণ এসে সামনে দাঁড়ায়, তবে তারা হাসনুকে দেখে অবাক হয়ে যাবে। হিরণ হয়ত বলবে, তুই বহুরূপী, এও তোর এক নতুন রূপ, এও তোর আর একটা কৌতুক! তোর যাদুবিদ্যার এও এক বিচিত্র কৌশল, হাসনু।

কাপড়-চোপড় পুনরায় পরিয়ে দিয়ে মতিয়া তাকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় বসিয়ে দিল। হাসনু যেন অনেকটা নিরুপায়, অনেকটা পরমুখাপেক্ষী। সে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, এইটুকু পরিশ্রমে তার বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করছে। এ মাথাটা তার নয়, কেন-না এ মাথা যখন-তখন ঘোরে। এ দৃষ্টি তার নয়, কেন-না যখন-তখন বেগনি বাষ্পরেখার দৃশ্যে চোখ দুটো তার কাঁপে। কেন তার সমগ্র প্রাণশক্তিটা থরথর করে? জীবনটা কেন এমন বিড়ম্বিত মনে হয়? সমস্ত সত্তা, সমগ্র অস্তিত্বের মূল পর্যন্ত কেন এমন ক'রে নড়তে থাকে? কথাটা ভাবতে ভাবতে হাসুবানুর চোখ দুটো উদ্‌ভ্রান্ত রক্তিম হয়ে এলো। আগুনের আভা ফুটলো।

মতিয়া তার দিকে একবার তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হাতের দুই মুঠোয় বিছানটা শক্ত করে ধরে হাসনু সেই বিরাট শূন্য হলঘরের চারিদিকে একবার তাকালো। না, এটা সত্য নয়। শূন্যতা মিথ্যে, ভয়ানক মিথ্যে। এরই নাম দুর্বলতা। এই জরা, ব্যাধি, বিকার, এই মৃত্যুর চক্রান্ত, এই আতঙ্কের হাতছানি, এই পিশাচের বিদ্রূপ—এরই নাম পরাজয়। একে স্বীকার করতে গেলে তার চলবে না! তার প্রতিজ্ঞা ছিল, উলঙ্গ তরবারি হাতে নিয়ে ভয়হীন চিত্তে সে অগ্রসর হবে। বন্ধন-সংস্কার, মূঢ়তা, অসারতা,—এদেরকে ঘুচিয়ে সে যাবে এগিয়ে। থামলে চলবে না, কেন না থামাটাই মৃত্যু। হাত-পা কাঁপলে চলবে না, শরীরের সকল গ্রন্থি শিথিল দুর্বল হ'লে চলবে না—কেন-না তাকে ঝাঁপ দিতে হবে বর্তমান যুগের রণরঙ্গে এ বন্ধনদশার থেকে তার মুক্তি চাই, মুক্তি চাই অপমানের থেকে, অসৎ চক্রান্তের থেকে। চারিদিকে কোটি কোটি উলঙ্গ অর্ধনগ্ন জনতা ক্ষুধার্ত কণ্ঠে তাকে ডাক দিচ্ছে, বেদনার আর্তনাদ উঠেছে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে, দিগন্তে ফুটেছে রক্তের আভা। এবার তার সকল বন্ধন মোচনের ডাক এসেছে। মাথা ঠুকে এই দেওয়াল চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে তাকে ছুটে পালাতে হবে।

কী ভয়ানক বিকার, হাসনুর দেহের মধ্যে। দিন ও রাত্রে এই বিকার কোনোমতেই তাকে স্থির থাকতে দেয় না। বিছানাটা ছেড়ে সে প্রাণপণে

পা-দুখানাকে শক্ত ক'রে উঠে দাঁড়ালো। তাকে এখনই যেতে হবে। শূন্য প্রাসাদকক্ষে দিনের পর দিন নিরুপায় হয়ে ব'সে অশরীরী ছায়ামূর্তিদলের বিদ্রূপ-পরিহাস সে বরদাস্ত করবে না। তাকে যেতে হবে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, তাকে যেতে হবে মাঠে বন্দরে নদীতীর সাগরবেলায়, তাকে যেতে হবে মানুষের ঘরে ঘরে,—তাকে ডাক দিতে হবে, ঘুম ভাঙ্গাতে হবে ভয়ের আচ্ছন্নতার থেকে সবাইকে তুলে আনতে হবে। নিজের শরীরের মধ্যেই হাসনু প্রবল শক্তিতে একটা নাড়া দিল।

কে ?

বোবা দেওয়াল বললে, আমি তোর জ্যাঠামশাই।

কেন এসেছ তুমি ?

দেখতে এলুম পিঞ্জরাবদ্ধা বাঘিনী তাব ধারালো দাঁতে বন্দীশালার গরাদ কাটলো কিনা!

বোবা দেওয়াল স'রে দাঁড়ালো। হাসনু সেখান থেকে দৌড় দিল। পিছনে পিছনে ডাক দিল জ্যাঠামশাইকে!

*

*   *

নিচের থেকে হুড়হুড় ক'রে একটা আওয়াজ পাওয়া গিয়েছিল। সেই আওয়াজে সেপাইরা সজাগ হয়ে দাঁড়ালো বন্দুক উঁচিয়ে। উচ্চকণ্ঠে হাসনু চীৎকার করে উঠেছিল, সেই চীৎকারে নিচের তলার আপিসে ডাক্তার সাহেব পর্যন্ত চমকে উঠেছিল। মতিয়া তখন তার কাছে রোগিনীব বিবরণ দাখিল করছিল। সেই আওয়াজ পৌছেছিল সেরেস্তায়,—হামিদ সাহেব ছুটে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁর পিছনে পিছনে অন্যান্য কর্মচারী। ডাক্তারের ওপর ইয়াসিনের কিছু একটা নির্দেশ ছিল,—সুতরাং তিনি মতিয়াকে এবং আর একজন সহকর্মীকে নিয়ে উপরে উঠে এলেন।

বিছানার থেকে কিছু দূরে গিয়ে দেওয়ালের ধারে হাসনু কাৎ হয়ে পড়েছিল। বুঝতে পারা যায়, সে অজ্ঞান হয়ে পড়ার আগে বমি করেছে অনর্গল। সম্ভবত বমির বেগ ছিল বেশি। তাই গলা চিরে কতকটা রক্ত গড়িয়ে এসে পড়েছে বুকের আঁচলে। মতিয়া ছুটে গিয়ে হাসনুকে ধ'রে তুললো। সহকর্মীটি দ্রুতপদে নিচে নেমে গিয়ে নানাবিধ সরঞ্জাম নিয়ে এলো। ইয়াসিন সাহেবের কাছে খবর পাঠানো হালো।

খবর এমন কিছু চাঞ্চল্যকর অথবা নাটকীয় নয় যে, ইয়াসিন সাহেবকে চঞ্চল হ'তে হবে। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল, রাজবন্দিনী হাসনুবানুর পক্ষে

নির্জনবাসের প্রয়োজন। জীবেন্দ্রনারায়ণের রাজপ্রাসাদ তার প্রিয়, সুতরাং ওই প্রাসাদই তার পক্ষে উপযুক্ত স্থান। দুঃখী-দরিদ্রের তিনি নেত্রী, সুতরাং কোনো প্রকার বিলাস সামগ্রী, গৃহসজ্জা, আসবাবপত্র—তাঁর ত্রিসীমানায় থাকবে না। তিনি বন্ধন ভালোবাসেন না, অতএব ওই বিশাল দোতলায় সকল ঘর, দরজা, জানালা, ছাদ, বারান্দা, অলিন্দ—সমস্তই থাকবে অবারিত এবং উন্মুক্ত। মূঢ় নির্বোধ মানুষ তাঁর প্রিয় নয়, অতএব জনমানবের দেখা তিনি পাবেন না। উপরন্তু শ্রীমতী হাসবানু চিবদিনই আদরে ও ঐশ্বর্যে লালিত ব'লেই তাঁর জন্য দাসদাসী পাচক সেবক চিকিৎসক প্রভৃতিকে কর্তৃপক্ষ মোতায়েন ক'রে বেখেছেন। তারা সকলেই রাজবন্দীর দৃষ্টির অন্তরালে হাজিব থাকবে। ইয়াসিন সাহেব খবর পাওয়া সত্ত্বেও নিজেব কাজে ব্যস্ত রইলেন। বন্দিনীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন ত্রুটি না হয়—এই আদেশ তিনি পাঠালেন।

হাসনুর চৈতন্য লোপ পেয়েছিল! সমস্ত দিনমান ধ'বে তার জ্ঞান ফিরে এলো না। এব মধ্যে ডাক্তার বার তিনেক ইন্‌জেক্‌সন্ দিযেছিলেন। সন্ধ্যার দিকে বোগীব অবস্থার কতকটা উন্নতি দেখে ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন। মতিযা তাঁব দিকে একবার তাকালো। তাঁব সেই ঘোবালো কৃষ্ণকায় নির্বাক চেহারাটা সন্ধ্যাব আলোয় লক্ষ্য করলে গা ছমছম ক'রে ওঠে। ডাক্তাব মনে মনে কি যেন যুক্তি করলেন, তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। সহকর্মী গেল তাঁর পিছু পিছু।

আলোটা জ্বলছে। ছায়াটা কাঁপছে দেওয়ালে। মতিযা বাইরে গিয়ে চুপ ক'রে এক জাযগায় পাহাবায় ব'সে রইলো। হেমন্ত শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল বাবান্দার একধাবে। বাইবে হিমাচ্ছন্ন অস্পষ্ট হাসনু। আকাশ-ভরা জ্যোৎস্নাব দিকে নিমীলিত নিমেষনিহত একাগ্রতা নিয়ে সে তাকিয়ে বসেছিল।

হাসনু!

কানে কানে চাপা কণ্ঠে কে ডাকলো। চৈতন্যলোকেব রহস্যপথ দিযে হাসনু ফিবে আসছিল। সহসা পিছন ফিবে সে প্রশ্ন করলো, কে?

আমি! কোথা গিয়েছিলি তুই?

বাইরে! অনেক দূরে।

কেন?

হাসনু জবাব দিল, দেখতে গিয়েছিলুম দূর-দূরান্তের সেই বিরাট প্রাচীন ভারতকে!

ভারতকে? পাকিস্তানকে নয়?

হাসনুর মুখে হাসি দেখা ছিল। বললে, তুই মিলে এক অখণ্ড মহাভারত। দেখে এলুম সেই নিমীলিতনেত্র উদাসীন যোগাসীন মহাভারতকে। সর্বকাল-জয়ী মহিমায় সে অটল।

কী দেখলি?

পরস্বাপহরণে তার আসক্তি নেই, পররাষ্ট্রে তার লোভ নেই, কোনো কালের রাজনীতির বিতর্কে তার মোহ নেই। দেখে এলুম জন্মজরাব্যাধির অতীত সে তপস্বীকে—

তপস্বী?

হাসনু শান্তকণ্ঠে বললে, হ্যাঁ, তপস্বী। মাথায় তার হিমালয়ের জটা, শিরা-উপশিরায় গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী নর্মদা সিন্ধু কাবেরীর প্রাণ রক্তধারা, দেখে এলুম তাঁর পায়ের নিচে কন্যাকুমারী হাস্নবাস্নর অনন্ত-বিস্তার এলায়িত কেশের তরঙ্গভঙ্গ!

হাস্নবাস্ন!

হাসির শব্দে হাসনুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে সে তাকালো। ঘরের আলোটা এবার খুব উজ্জ্বল। সামনে কয়েকজন লোক ব'সে রয়েছে,—তাদের মধ্যে হামিদ, ইয়াসিন, ডাক্তার, সহকর্মী প্রভৃতি উপস্থিত। তাঁরা প্রায় সকলেই হাসছিলেন হাসনুর এতক্ষণকার প্রলাপ শুনে। কী কৌতুক জানে মেয়েটা।

হাসনু নিজের মুখখানা আঁচল দিয়ে মুছে বললে, ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, সেজন্য ক্ষমা চাই।—চক্ষে তার জলের আভাস ছিল।

ইয়াসিন বললেন, আপনি কোনো সময়েই ঘুমোন না বেগম।

তবে? হাসনু যেন চমকে উঠলো।

আপনি লোক খাড়া ক'রে এতক্ষণ ঝগড়া করছিলেন।

ঝগড়া? কার সঙ্গে?

ইয়াসিন বললেন, আপনার সেই হিন্দু কমরেডের সঙ্গে।—আচ্ছা বেগম হিন্দুরা যে পাকিস্তানের ধ্বংস চায়, এ কি সত্য?

সমস্ত দিনমান যাবৎ যে-রোগিনী এত অসুস্থ ছিল, তার প্রতি যে কতকটা বিবেচনার প্রয়োজন আছে, তার পক্ষে সম্পূর্ণ উত্তেজনাহীন বিশ্রামের দরকার রয়েছে,—এটুকু চিন্তা করবার মতো শুভবুদ্ধি উপস্থিত একজন মাত্র ব্যক্তির মুখে চোখে ছিল,—সে হামিদ। কিন্তু হামিদ সাহেব ইয়াসিনের দাপটে নতমুখে নীরব ছিলেন।

হাসনু গা ঝাড়া দিল। তার বমি-ভাব কেটে গেছে। এখন আর

নিজেকে সে অসুস্থ মনে করে না। রোগের জড়তা এবং ক্লান্তি পলকের মধ্যে ঘুচিয়ে সে বললে, এ যদি তারা চায়, তবে অস্বাভাবিক কিছু হবে না, ইয়াসিন।

ইয়াসিন বললেন, মুসলমান রাষ্ট্র কি তারা বরদাস্ত করতে চায় না ?

হাসনু বললে, সে তারা জানে, আমি নয়। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো ইয়াসিন,—ছয়শো বছর ধ'রে মুসলমান সম্রাটকে তারা স্বীকার ক'রে এসেছে, তবু তারা ভারতের সংহতিকে নষ্ট করেনি। অত বড় সম্রাট আওরঙ্গজেব—তিনিও চেয়েছিলেন ভারতকে, কিন্তু পাকিস্তান চেয়ে মুসলমানকে তিনি ছোট করেননি। তিনিও জানতেন ভারতবর্ষটা হোলো ভারতবাসীর! তুমি যদি ভারতবাসী হয়ে থাকতে চাও, থাকো এখানে আনন্দে—যেমন এখানে আছে পৃথিবীর বহু জাত। ধরো, আজ অনেক ইংরেজ গিয়ে ঢুকেছে পাকিস্তানের গুহাগহ্বরে—তারা যদি এক হয়ে এবার বলে ইংরেজস্তান দাও, তুমি কি বরদাস্ত করবে, ইয়াসিন ?

ইয়াসিন হঠাৎ চুপ ক'রে গেলেন। হাসনু ধীরে ধীরে বলতে লাগলো, কিন্তু তুমি ভারতবাসী হ'তে চাওনি, চেয়েছিলে শুধু মুসলমান হয়ে থাকতে। আমার ধারণা, তোমরা ইংরেজদেরই সমগোত্রীয়। ইংরেজ একদিন এসেছিল এদেশে লুট করতে, তারপর সে লুটকে কায়েমী করার জন্যে তারা সৈন্যদল নিয়ে শাসনকর্তা হয়ে থাকতে চেয়েছিল। তারা ভারতকে ভালোবাসেনি, ভালোবেসেছিল এদেশের দুধ আর রক্ত। দুধ খেয়েছে তারা অনেক, রক্ত খেয়েছে তার চেয়েও বেশি। কিন্তু ও দুটো খাদ্য যেদিন ফুরলো, সেদিন শাসনের কাজে তারা আর রস পেলে না ; চ'লে গেল মুখ ফিরিয়ে। শোনো, ইয়াসিন—

হাসনু অতি কষ্টে উঠে বসলো, তারপর বলতে লাগলো, এ দেশটা তোমাদের নয়, তাই কয়েক হাজার আদর্শবাদী মুসলমান ছাড়া এদেশে স্বাধীনতার জন্যে তোমাদের খুব মাথা ব্যথা ছিল না। ইতিহাস জানে, এ দেশের নাড়ীর সঙ্গে তোমাদের রক্তধারার যোগ বড়ই কম,—এটা তোমাদের দখল-করা সম্পত্তি। তাই তোমরা অত সহজে জননীর অঙ্গচ্ছেদন চেয়েছিলে। তোমরা মিলন চাওনি, চেয়েছিলে বোঝাপড়া ; ভালোবাসা চাওনি, চেয়েছিলে ভাগবাঁটোয়ারা। তোমরা পাকিস্তান পেয়ে আনন্দে গদ্গদ, কেননা যা পাও তাই তোমাদের কাছে লুটের মাল। কিন্তু অঙ্গচ্ছেদনের পর জননীর ক্ষতস্থান থেকে ঝরেছে রক্তধারা, তার সন্তানদের ব্যথা-বেদনা তুমি কতটুকু বুঝবে, ইয়াসিন ?

হাসনুর বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ইয়াসিন ব'লে উঠলেন, পাকিস্তানের জন্য মুসলমানদের আত্মত্যাগ কি আপনি একবারও স্বীকার করেন না?

আত্মত্যাগ!—হাসনু জ্ব'লে উঠলো, দাঙ্গাবাজ নির্বোধের অপমৃত্যুকে তুমি আত্মত্যাগ বলো? পাকিস্তান যারা চেয়েছিল তারা ওপরতলাকার লোক, তাদের গায়ে এতটুকু নখের আঁচড় লাগেনি, ইয়াসিন। তারা সামনের ভাগে রেখেছিল গুণ্ডাবাহিনী, আর পিছনে রেখেছিল ইসলাম। গুণ্ডারা যখন লুট আর অনাচার করেছে, তখন ইংরেজের পাশে দাঁড়িয়ে পিছন থেকে তোমরা দিয়েছ চাপা হাততালি। তোমাদের দৌরাত্ম্যে ইংরেজ খুব খুশি ছিল, কিন্তু তোমাদের নোংরামি আর একগুঁয়েমির মধ্যে বুদ্ধিবিবেচনা খুঁজে না পেয়ে যখন জনসাধারণ বাধা দিতে গিয়েছে, তখন তোমরা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছ, ইসলাম বিপন্ন! মিশর তুর্কি, ইরান, আফগান, সুদান—সবাই অবাক হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে দেখেছে, ইসলামের মুখে কেমন ক'রে তোমরা কলঙ্কের কালি মাখিয়েছ!

ইয়াসিন শাঁর উত্তেজনা দমন করতে জানেন। ঘাড় ফিরিয়ে তিনি একবার তাকালেন ডাক্তারের দিকে। দু'জনের দৃষ্টি বিনিময় হোলো। হামিদ সেই যে নতমুখে বসেছিলেন, এবার মুখ তুলে তাকালেন হাসনুর প্রতি। তাঁর মুখে দেখা গেল একপ্রকার আবেগের চিহ্ন,—তাঁর চোখ দুটো যেন প্রসন্ন আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। অতীতলোক থেকে তিনি যেন এতক্ষণ সম্রাটভগ্নী জাহানারার কণ্ঠস্বর শুনছিলেন।

ইয়াসিন সাহেব এই বায়ুব্যাধিগ্রস্ত সুলভ বক্তৃতা অসীম ধৈর্য ও বিরক্তির সঙ্গে শুনে যাচ্ছিলেন। তিনি হামিদ নন্—যারা প্রকাশ্যে মেয়েলিপনায় হাততালি দেয় এবং গোপনে লালাসিক্ত বাসনা নিয়ে স্ত্রীলোকের দরবারে আবেদন জানায়, তিনি তাদেরকে ঘৃণা করেন। এ মেয়েকে কোনোমতেই সংশোধন করা যায়নি—একথা গোপন রিপোর্টে কর্তৃপক্ষের কাছে ভবিষ্যতে তিনি জানাবেন বৈ কি।

রোগিনীর অবস্থার উন্নতি হয়েছে দেখে তাঁর দলবল নিয়ে এক সময়ে উঠে দাঁড়ালেন। হামিদ সাহেবেরও সান্ধ্য সাক্ষাতের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সকলেই একে একে বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন। কথা রইলো, মতিয়া থাকবে সিঁড়ির নিচেকার ঘরে।

আহারাদির সম্পর্কে হাসনুর মনে একটা আতঙ্ক ছিল। প্রচুর ঔষধপত্র ব্যবহার ক'রেও দেখা গেছে, খাদ্যবস্তু গলাধঃকরণের পর থেকেই শারীরিক বিকার দেখা দেয়। কিন্তু সে রাজবন্দিনী, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাম কম।

তার স্বাস্থ্য যদি খারাপ হয় তবে কর্তৃপক্ষের বদনাম হবে। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র নাকি তেরোশত বছর আগে করা হয়েছিল, তাতে নাকি এই কথাটা আছে, রাষ্ট্রবিরোধী যে কোনো ব্যক্তিকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং মতিয়া এসে সামনে দাঁড়িয়ে তাকে সযত্নে খাইয়ে বাসন নিয়ে চ'লে যাবার সময় আলোটা কমিয়ে দরজার বাইরে রেখে গেল।

এখন হাসনু অনেকটা সুস্থ। নিচেকার চাপা কথাবার্তা ধীরে ধীরে মিলিয়ে এলো। সমগ্র জনহীন প্রাসাদের দোতালাটা নিঃসাড়, কোনো কোনো দরজা ও জানলায় চন্দ্রালোকের আভা এসে পড়েছে। আজকের মতো তার ছুটি, আর কেউ উপরতলায় আসবে না।

এমন সময় অতি মৃদু লঘুপদসঞ্চারে একটি ছায়ামূর্তি পা টিপে টিপে দরজা পেরিয়ে হাসনুর বিছানার দিকে এগিয়ে এলো। একেবারে তার কোলের কাছে এসে বিছানায় ব'সে তাকে জড়িয়ে ধরলো।

শীর্ণ হাতখানা দিয়ে হাসনু তার গলাটা জড়িয়ে কানে কানে চাপা প্রশ্ন করলো, খাওয়া হয়েছে? ওরা তোকে যত্ন ক'রে খেতে দেয় ত'?

অত্রি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। হাসনুর সর্বাঙ্গে একপ্রকার কটু ওষুধের গন্ধ, তারই মধ্যে মুখখানা গুঁজে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অত্রি অবিশ্রান্ত কাঁদতে লাগলো। কিন্তু কান্নার এতটুকু আওয়াজ সিঁড়ির দিকে গেলে আর রক্ষা নেই, মতিয়া আসবে ছুটে। অত্রির এই গোপন আনাগোনাটা হামিদেরই বন্দোবস্ত। বুড়ো আলীমিঞার সাহায্যে জনৈক সেপাইকে উৎকোচ দিয়ে অত্রিকে তিনি রাত্রের দিকে দোতলায় পাঠিয়ে দেন হাসনুর সেবায়। বৃষ্টিজলের নল বেয়ে অত্রি উপরে উঠে আসে, আবার রাত শেষ হবার আগেই সেই পথে হামিদের মহলে ফিরে যায়। হামিদ সাহেবের কাছে হাসনুর এই ঋণ সামান্য নয়।

হাসনু সভয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে অত্রির কানে কানে বললে, চুপ, চুপ কর হতভাগা, অসুখ হ'লে অসুখ সারে না—এ বুদ্ধি তুই কোথায় পেলি? ভয় কি তোর?

অত্রি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে, হামিদ সাহেব কেন বললে যে, তুমি বাঁচবে না?

বাঁচবো,—হাসনু বললে, সাংঘাতিক বাঁচবো। দেখিস তুই! একশো পঁচিশ বছর বাঁচবো! সবাই ম'রে গেলেও আমি বাঁচবো দেখে নিস।

ওরা যে তোমাকে মেরে ফেলতে চায়, ছোড়দি?

হাসনু বললে, মিথ্যে কথা, ভয়ানক মিথ্যে! আমি নিজে যদি না মরি, তবে কে মারবে আমায় রে? তুই বড় হ' ভাই, তাহলেই আমি বাঁচবো।

তোরা যদি দুর্গতির থেকে উঠতে না পারিস, তবে সেই ত' আমার মৃত্যু, অত্রি?

অত্রি এ কথাটা কানে নিল না। বললে, হামিদ সায়েব এতদিন ধ'রে যে বলছে, ওরা তোমাকে বিষ খাইয়ে মারতে বসেছে।

হাসনু উৎফুল্ল হাসি হেসে উঠলো। বললে, কী বোকা তোর হামিদ সাহেব। যার ভেতরে এত বিষ, তাকে বিষ খাওয়াবে কোন মূর্খ? বিষে বিষক্ষয় হবে না? শোন্, কারো ওপর কোনো অশ্রদ্ধা রাখিসনে, কখনও ভয় আর সন্দেহ করিসনে।

ছোড়দি!

কেন, ভাই?

আমি জানি, ওরা তোমাকে বাঁচাতে চায় না।

হাসনু মিষ্টকণ্ঠে বললে, বেশ, আমিও তোকে কথা দিচ্ছি, কিছুতেই আমি মরবো না। গল্প শুনিসনি, দধীচি কখনো মরে না? যাবার আগে সে অস্থি রেখে যায়, তাই দিয়ে তৈরী হয় বজ্রদণ্ড। শুনিসনি সে-গল্প? শোন্, তোকে শুধু বলে রাখি, ভয় পেয়ে কখনো তোরা পালাবিনে। ভয় যে দেখায় সে কাপুরুষ, ভয় যে পায় সে তার চেয়েও কাপুরুষ।

কিছুক্ষণ পরে অত্রি আবার ডাকলো, ছোড়দি?

কেন রে?

এদেশের হাজার হাজার লোক বলেছিল, তারা তোমার জন্য প্রাণ দেবে। কই, আজ তারা কোথায় গেল? তাদের কি কান নেই, চোখ নেই, মন নেই? অত্রির গায়ের উপর হাত রেখে শান্তকণ্ঠে হাসনু জবাব দিল, তারা বেঁচে নেই, অত্রি।

ক্ষণস্থায়ী স্নেহের আশ্রয়ের মধ্যে ব্যর্থপ্রাণ বালক যেন রেখে-রেখে তার জীবনের একটিমাত্র আনন্দের ক্ষেত্রকে নিবিড় তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করতে লাগলো। এক সময়ে ছোড়দির গায়ের কম্বলখানা সে সযত্নে ঢাকা দিয়ে দিল। মাঝে মাঝে তার গলার ভিতর থেকে চাপা ঠোঁট দুখানা পেরিয়ে একপ্রকার আওয়াজ নির্গত হচ্ছিল। ঘন উন্মাদনার এক প্রকার আর্তস্বর— ভিন্ন ভাষায় তাকে কান্না বলা যেতে পারে; বলা যেতে পারে ক্ষুধার্ত জীবনের অবরুদ্ধ যন্ত্রণা। অপমানিত নিগৃহীত মানবাত্মার একপ্রকার নিগূঢ় উল্লাস।

হাসনু তাড়াতাড়ি অত্রির মুখে হাত চাপা দিল। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলো, প্রায় দেড় মাস হ'তে চললো, কই তোর বড়দা চিঠির জবাব দিল না ত'? চিঠি ফেলেছিলি, মনে আছে?

অত্রি বললে, হ্যাঁ, নিজের হাতে ফেলেছি, ছোড়দি।

নিজের মনে হাসনু বললে, চিঠিখানা মীরার হাতে পড়লেও জবাব পেতুম। এবার তুই ঘুমো অত্রি, আমি ঠিক সময়ে ডেকে দেবো।

কম্বলের ভিতর থেকে অস্থির হয়ে অত্রি আবার উঠে বসলো। বললে, ছোড়দি, তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে। তোমার জ্বর হয়নি ত' কোনদিন!

কোনদিন হয় নি।—হাসনু হাসলো, বেশ ত' আজ হোক। হ'লেই বা। অসুখ হবে, আর জ্বর হবে না? তোর এখনো একটুও বুদ্ধি হয়নি, তাই জ্বর দেখলেই আঁৎকে উঠিস।

অত্রি বললে, ছোড়দি, তুমি যে বলেছিলে পালাবো?

হাসনু বললে, না পালাবো না। লোকে ভয় পেয়ে পালায়। আমার ভয় কি? দাঁড়া না, আমি সব বাঁধন ভেঙ্গে দেবো, তখন আর আমায় ধরে রাখবে কে? তোর সঙ্গে চ'লে গেলে আমাকে খাওয়াতে পারবি ত'?

কবে তুমি যাবে বলো? আমিও সেদিন দেখে নেবো সবাইকে। কিচ্ছু আমি চাইনে, আমি শুধু তোমাকে নিয়ে চলে যাবো।

কোথায় নিয়ে যাবি?

সেই তোমার বুবুর দেশে, সেই যে বলেছিলে? সেখানে গিয়ে চাষ করবো আর তাঁত বুনবো!

হঠাৎ অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরিয়ে অস্বাভাবিক কণ্ঠে হাসনু সাড়া দিল, কে? কে ওখানে?

গলার আওয়াজটা তার প্রতিধ্বনিত হলো সমগ্র দোতলায়। সহসা ভয়ব্যাকুল হয়ে অত্রি তার মুখখানা কম্বল দিয়ে চেপে ধরলো। রুদ্ধ চাপা স্বরে বললে, চুপ—চুপ করো ছোড়দি। ও কেউ না। কিচ্ছু না। চুপ করো তুমি।

আহ্লাদিত কণ্ঠে হাসনু ব'লে উঠলো, তুই ঘুমো, আমাকে এখনই যেতে হবে, অত্রি। চেয়ে দেখ্, কমরেড এসে হাজির হয়েছে।

প্রবল জ্বর নিয়ে হাসনু ন'ড়ে বসলো। সভয় আর্তনাদ ক'রে অন্ধকারে উঠে এসে অত্রি বললে, কোথায় যাবে তুমি? চুপ করো, সর্বনাশ করো না, চুপ করো ছোড়দি।

হাসনু হঠাৎ একবার চুপ ক'রে গেল; সর্বাঙ্গ তার কাঁপছিল। কিন্তু তারপরেই আবার সে কলরব ক'রে উঠলো। ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারের দিকে অপলক চক্ষে তাকিয়ে সে ব'লে উঠলো, কথাটা তোর সত্যি নয় কমরেড। তুই, এদেশের কবি, এদেশের সঙ্গে তোর আত্মিক যোগ ছিল, কিন্তু কায়িক যোগ ছিল না।

ছোড়দি—ছোড়দি, চুপ করো—

অত্রির আলিঙ্গন ছেড়ে বিছানার থেকে হাসনু নামবার চেষ্টা ক'রে বললে, তোকে জানবার জন্যে অত উঁচুতে উঠতে পারবো না, তুই নেমে এসে দাঁড়া। আরো কাছে আয়।

নিচের তলায় গলার আওয়াজ পৌঁছে গেছে। অত্রি পলকের মধ্যে বিছানা ছেড়ে নেমে এলো, এবং আত্মরক্ষার ক্ষণ-উত্তেজনা মনে আসতেই সে ছুটে পালালো দরজার দিকে। কিন্তু একজন সেপাইকে সঙ্গে নিয়ে মতিয়া ততক্ষণে উঠে এসেছিল। চক্ষের নিমেষে অত্রি সেপাইয়ের হাতে ধরা পড়ে গেল।

উল্লসিত কণ্ঠে হাসনু হাসছিল.—কমরেড, বড় বড় কথা থাক। একটি জীবনের সম্পূর্ণ দুঃখ ঘোচানো, সেইটিই কি সার্থকতা নয়? একটি জীবনের চরম প্রকাশ রেখে যাওয়া, সেইটিই কি সত্য পবিচয় নয়? কবি তুই, আমার যথার্থ স্বপ্নকে তুই দেখে নে।

বিছানাটা ছেড়ে পরম পুলকের সঙ্গে হাসনু একদিকে অগ্রসর হোলো।

হাসিমুখে সে বলতে লাগলো, তরবারি হাতে নিয়ে ঝাঁপ দেবো বিপ্লবের মধ্যে, এই ছিল তোদের কাছে প্রতিজ্ঞা। কিন্তু চোখ মেলে দেখ কমরেড্—আমি নিজে সেই তরবাবি। আমি সেই উদ্যত উদ্ধত প্রশ্ন বিশ্ববিধাতার। আমি সেই শানিত ধাবালো শক্তি,—আমার ঝলক শুধু দেখলি তুই, কিন্তু আমাকে ব্যবহার করলিনে, কমরেড।

পায়ে-পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল—টলতে টলতে হাসনু অগ্রসর হচ্ছিল। মাতিয়া গিয়ে তাকে ধরলো। ইতিমধ্যে নিচের থেকে ছুটে এসেছিল অন্যান্য লোক। ডাক্তার এলেন, সঙ্গে তাঁদের সহকর্মী। অবস্থা বিচার ক'রে ইয়াসিন সাহেবের কাছে থানায় খবর পাঠানো হোলো, আজ রোগীর অবস্থার অবনতি দেখা যাচ্ছে। আপনি এখনই একবার আসুন।

একজন সেপাই ছুটে গিয়েছিল। আধঘণ্টার মধ্যেই জনাব ইয়াসিন ঘুম চোখে অত্যন্ত বিরক্তভাবে এসে উপস্থিত হলেন। উপরে উঠে এসে প্রথম তিনি জানতে পারলেন অত্রির ঘটনা। অত্রি তখন দরজার বাইরে অন্ধকারে সেপাইয়ের হাতের মধ্যে থর্‌থর্ ক'রে কাঁপছিল। ইয়াসিন জানতেন হামিদের মহলে এ ছেলেটা থাকে, সুতরাং উপস্থিত হামিদের ওপর তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। কিন্তু ক্রোধ প্রকাশের বেলায় হামিদ নয়, কারণ তিনি একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী,—অতএব ইয়াসিন ছুটে এসে অত্রির গালে একটা চড় মারলেন এবং লাথি মেরে তাকে নিচের দিকে ঠেলে দিলেন!

আক্রমণের আগে পর্যন্ত অত্রির হৃদকম্প হচ্ছিল, ভয়ার্ত চোখ দুটো ছিল সজল। কিন্তু মার খেয়ে অত্রি হঠাৎ শান্ত হোলো, এবং সব ভয় গেল ঘুচে। এলো কাঠিন্য তার মুখে চোখে, এলো প্রতিজ্ঞা তার দাঁতে দাঁতে। নিচে নেমে গিয়ে একটা কানের ভিতরে সুড়সুড় করে এলো। ঘুমের ঘোরে ও নিদ্রালু বিরক্তিতে ইয়াসিনের হাতের চড়ের ওজনটা মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, সেজন্য অত্রির কানের ভিতর থেকে রক্তের ধারা গড়িয়ে গাল বেয়ে নেমে এলো।

রাত যতই হোক, অত্রি নিজের মহলে না গিয়ে বাইরে গ্রামের পথের দিকে চলতে লাগলো এবং এক সময়ে জ্যোৎস্নার আলোছায়ায় মিলিয়ে গেল।

হাসনুর চেহারা আজকে ইয়াসিনের ভালো লাগলো না। বমির সঙ্গে তেমনই বেরিয়ে এসেছে রক্তের ঝলক। সাময়িক মস্তিষ্ক বিপর্যয়টা যেন আজ দিনে ও রাত্রে দীর্ঘস্থায়ী মনে হচ্ছে। প্রবল জ্বরের সংকেতটি উদ্বেগজনক। গতকাল পর্যন্ত রোগিনীর প্রলাপোক্তির ধারাবাহিকতা ছিল,—আজ সেটা সম্পূর্ণ অসংলগ্ন। ডাক্তার পর পর দুটি ইনজেকশন্ দিলেন,—কিন্তু তাতে ভিন্ন রংয়ের একটুখানি তরলসার কিছুক্ষণ পরে শরীর থেকে নির্গত হয়ে এলো। জ্বরের সঙ্গে প্রবল বিকার চলছে। রোগিনীকে এখনই হাসপাতালে স্থানান্তরিত করবার হুকুম দেওয়া হোলো। আকণ্ঠ বেদনা নিয়ে নিঃশব্দে একান্তে দাঁড়িয়েছিলেন হামিদ সাহেব। তিনি একবার ফিরে তাকালেন আলো পেরিয়ে অন্ধকারের দিকে। দেখলেন তাঁর অনুগত সেই বন্দুকধারী সেপাইটির চোখ বেয়ে দরদর ক'রে অশ্রু নেমে এসেছে।

হাসপাতাল গড়েছিলেন জীবেন্দ্রনারায়ণ। আটচালার ঘর, মেটে ছেঁচা-বাঁশের বেড়া। শয্যাসংখ্যা চার-পাঁচটি! তাঁর চেষ্টা ছিল, প্রত্যেকটি গ্রাম স্ব-সম্পূর্ণ হয়। উঁচুদরের হাসপাতাল গ'ড়ে ওঠার আগেই পাকিস্তান গ'ড়ে ওঠে। থানার পিছন দিকে ছিল ওর অস্তিত্ব। বছর দেড়েক আগে ভূতপূর্ব দারোগা হারুমিঞার আমলে কর্তৃপক্ষ উক্ত হাসপাতালের জন্য আড়াইশো টাকা বাৎসরিক বরাদ্দ করেন। এখন ওটা সরকারী প্রতিষ্ঠান।

পরদিন অপরাহ্নের দিকে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে হুকুমনামা এসে পৌঁছলো—"রাজবন্দিনী হাসনুবানু বেগম চৌধুরীর বর্তমান শারীরিক স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে কর্তৃপক্ষ এইপ্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, তাঁকে এখনই বিনাশর্তে মুক্তি দিলে রাষ্ট্রের পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে কোনও অসুবিধার কারণ ঘটবে না। উক্ত রাজবন্দিনী একজন জনপ্রিয় দেশকর্মী, সুতরাং জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সরকার এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, শ্রীমতীকে

অবিলম্বে মুক্তিদান করিলেই দেশবাসী তথা সরকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে"—নিচের দিকে নামসইটি দুর্বোধ্য।

খবরটা শুনে হামিদের মতো অনেকেই মনে করলো, এই হুকুমটি ইয়াসিনের পকেটে-পকেটে ঘুরতো। তাঁর কাছে ছিল একখানা নামসই-করা কাগজ, সেই কাগজে তিনি তারিখটি বসিয়ে দিয়েছেন মাত্র।

বাইরের থেকে জানা গেল পনেরো ঘণ্টা পরেও হাসন্নুর চৈতন্য এখনো ফেরেনি। হাসপাতালের চৌহদ্দির মধ্যে পাহারা মতায়েন আছে, সুতরাং হুকুম ছাড়া ভিতরে প্রবেশ নিষেধ। ভিতবে ডাক্তার ও তাঁর দলবল ছাড়া আছেন হামিদ সাহেব, এবং মুক্তিলাভের কাগজটি পকেটে নিয়ে উপস্থিত আছেন স্বয়ং ইয়াসিন। তাঁর এখন একমাত্র কাম্য, হাসনুকে কোনোমতে একটুখানি সুস্থ ক'রে বাইরে ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু সরকারী হাসপাতালের দায়িত্ব আছে বৈ কি। অজ্ঞান এবং অনড় অবস্থায় রোগীকে বাইরে ফেলে দিয়ে এলে পাকিস্তানের বদনাম হবে। গতকালকার মতো অবস্থার উন্নতি দেখা দিলে তিনি নিজে গিয়ে ডাক দেবেন গ্রামের লোককে। তারা এসে তাদের প্রিয় জননেত্রীকে সমাদরে নিযে যাবে। একথা সত্য, হাসুবানু এ অঞ্চলের অবিসম্বাদিত নেত্রী, সমগ্র জেলার সেই একমাত্র মুখপাত্রী। কোরানে আছে, ইসলামী গণতন্ত্রে যেন কখনো জননায়কের অবমাননা না ঘটে। পবিত্র কোবান গ্রন্থখানি সুবিধাজনক বাক্যে পবিপূর্ণ, এতে সন্দেহ কি।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হযে গেল। ইয়াসিন সাহেবের সঙ্গে পাশাপাশি বসে সকলে একাগ্র দৃষ্টিতে প্রহার গণনা করতে লাগলেন।

শীত পড়েছে। বাইরের থেকে ঠাণ্ডা আসছিল। ডাক্তারের সঙ্কেতে মতিয়া উঠে গিয়ে হাসপাতাল কক্ষের তিনটি দরজা বন্ধ করে দিয়ে এলো। পেট্রোমাক্স আলোটা উপরেব বাঁশের থেকে ঝুলছে। তার মধ্যে কেরোসিনের পরিমাণ বোধ হয় কম ছিল। মাঝে মাঝে সেটা এক-আধবার দপ ক'রে উঠছে। শৃগাল ডেকে গেল প্রথম প্রহরে। কাল মধ্যরাত থেকে এখন পর্যন্ত হাসন্নুর চেতনা ফেরেনি। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা হ'তে চললো।

হঠাৎ একটা আওয়াজ হোলো বাইরে, এবং সেই গুলির আওয়াজে ইয়াসিন সাহেব চমকে উঠলেন। তারপবে শোনা গেল চাপা কলরোল। থানার পাহারাদারদের চীৎকার শোনা গেল, আগুন লেগেছে! হাসপাতালের আটচালা জ্বলছে দাউ দাউ ক'রে। ইয়াসিন সাহেব কিছুক্ষণের জন্য হতচকিত হয়ে রইলেন। তারপরেই দ্রুতবেগে একদিকে ধাবমান হলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে উপর থেকে ঝোলানো পেট্রোমাক্স আলোটা মেঝের উপর প'ড়ে

চুরমার হয়ে গেল। এবার হাসপাতাল কক্ষটি অন্ধকার। অন্ধকারে দরজাটা খুঁজে পেয়ে তিনি বাইরে বেরোতে গেলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটি গুলির আওয়াজ।

ইয়াসিন আটচালার দরজার ধারে বসে পড়লেন। তাঁর শরীরে আঘাত লেগেছে। অকর্মণ্য হয়ে সেইখানে ব'সে ব'সে তিনি লক্ষ্য করলেন, অসংখ্য লোকের ছুটোছুটি। অপরিচিত একটা জনতা, আগুনের ধোঁয়ায় যাদের একজনকেও ঠাহর করা যায় না। চাঁদের আলোটাকে ডুবিয়ে তাঁর সামনে এবং হাসপাতালের চালায় আগুন জ্বলে উঠেছে। শুধু যে তাঁকেই এই আগুনে পুড়তে হবে তাই নয়, হাসুবানুও জীবন্ত দগ্ধ হ'তে চললো। তাকে বাঁচানো কোনমতেই আর সম্ভব হবে না।

তাঁর নান ধ'রে চীৎকার করছে থানার পাহারাদাররা। এমন সময় সম্মুখের লক্‌লকে অগ্নিশিখার থেকে তাঁকে বাঁচাবার জন্য একটি লোক ছুটে এগিয়ে এলো। হিন্দুরা সম্ভবতঃ একেই বলে অগ্নিপরীক্ষা! এর থেকে পাকিস্তানকে উত্তীর্ণ হতে হবে! লোকটা হিড়হিড় ক'রে ইয়াসিনকে টানতে টানতে নামিয়ে নিয়ে গেল; বকর-ঈদের দিনে নিহত গরুকে যেমন টানতে টানতে নিয়ে যায়। ইয়াসিন সাহেবের ডান হাত এবং একখানা পা সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে গিয়েছিল। রক্ত গড়িয়ে এসেছে তাঁর পায়ের তলা দিয়ে। তাঁকে নিয়ে গিয়ে ফেলা হোলো কিছুদূরে এক গাছতলায়। তিনি অবশ্যই একদিন বেঁচে উঠবেন এবং সেদিন এই ঘটনার প্রতিকারও করবেন। এই গুলিছোঁড়া এবং এই অগ্নিকাণ্ডের রহস্য তাঁকে জানতে হবে বৈ কি।

হাসনুর মুক্তিনামা কাগজখানি রক্তমাখা অবস্থায় তাঁর পকেটের মধ্যে ছিল। সেখানা পকেটে নিয়েই তিনি বিমূঢ় যন্ত্রণায় অনেকটা যেন আচ্ছন্নের মতো ব'সে রইলেন। তাঁর চোখের সামনে সমগ্র হাসপাতালটা এবং থানার একটা অংশ দাউ দাউ ক'রে জ্বললো প্রায় সমস্ত রাত। আটচালাটার সমস্ত প্রাণরস শীতের টানে শুকিয়ে ঝরঝরে হয়ে ছিল, সুতরাং দাহনের পরে অবশেষে যা রইলো, তার নাম ভস্মাবশেষ।

পরদিন ইয়াসিনের দেহের উপর যখন অস্ত্রোপচার করার আয়োজন চলছে, এমন সময় থানার এক সেপাই যে খবরটি নিয়ে এলো, সেটি চিত্তাকর্ষক। ঘাটের ধারে বাঁধা একখানা নৌকায় শ্রীমতী হাসুবানু নরম বিছানার উপর নিদ্রা যাচ্ছেন। তিনি খুবই অসুস্থ, তবে শেষরাত্রি থেকেই তাঁর জ্ঞান ফিরে এসেছে। উক্ত নৌকার মাঝি সভয়ে আপনার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করছে।

রক্তমাখা মুক্তিপত্রখানা ইয়াসিনের পকেট থেকে বা'র ক'রে সেপাইয়ের

হাতে দেওয়া হোলো। শ্রীমতী হাস্নুবান্থ মুক্তিলাভ করেছেন! তাঁর প্রতি সরকারের আর কোনও বিধিনিষেধ নেই।

পরম্পরায় ঘটনাটা জানা গেল। মানুষের দগ্ধ-অবশেষ কি থাকে কিছু? চিতার আগুনে একসময় কঙ্কালও ছাই হয়ে যায়। কিন্তু হামিদ সাহেবের কঙ্কাল ছাই হয়নি। তিনি অচেতন হাসনুকে একটা সময়ে টানতে টানতে বাইরে আনতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক সেইক্ষণে আটচালাটার একটা অংশ ভেঙে পড়ে তাঁর শরীরের ওপর। হাসনুকে তৎক্ষণাৎ তুলে নিয়ে কা'রা যেন চ'লে যায়, কিন্তু হঠাৎ আগুনের আঁচ লাগে হামিদের চোখে। চালাটার গোলকধাঁধার এবং অগ্নিকাণ্ডের ঘূর্ণাবর্তে প'ড়ে হামিদ আর উঠতে পারেন নি। তাঁর অর্ধদগ্ধ দেহ পাওয়া গেছে। হাসনুর প্রতি তাঁর নিষ্ক্রিয় এবং নিঃশব্দ অনুরাগের শেষ মহিমা পাকিস্তানের ওই মধুমতীর কলগানে মুখর হয়ে রইলো। ওর সঙ্গেই আরেকটি ছোট্ট খবর জানা গেল, একটা চরম মুহূর্তে অত্রি চীৎকার করতে করতে ঢুকেছিল হাসপাতালের দরজাটা ধাক্কা দিয়ে। সে-নাকি ওই সর্বগ্রাসী চিতার আগুনের লকলকে শিখাদলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তার ছোড়দিকে নিজের আয়ুষ্কাল অবধি খুঁজে বেড়িয়েছে।

কিন্তু এক সময়ে হতভাগ্য মূঢ় অন্ধ বালককে থেমে যেতে হয়েছিল। পরদিন তার প্রায়-দগ্ধ দেহের সঙ্গে মতিয়ার কঙ্কালও খুঁজে পাওয়া গেল। বুঝতে পারা যায় ছেলেটা তার ছোড়দিকে মনে করেই মতিয়াকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করেছিল। এই দৃশ্যের সামনে হিরণ উপস্থিত থাকলে বলতো, বাইরের আগুনটা অত্রির কাছে ছিল সামান্যই,—অত্রি নিজের বুকের আগুনে অনেকদিন আগেই পুড়ে মরেছে!

২৩

হাসনু বলতো, শ্রেণীহীন সমাজ! কিন্তু সেটা কোন্ সমাজ যেখানে শ্রেণী নেই? ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পেতে থাকলেই শ্রেণী গ'ড়ে ওঠে। পাণ্ডিত্য, মৌলিক কল্পনা, চিন্তাশীলতা,—এই নিয়ে শ্রেণী তৈরী, কে না জানে? মুনি-ঋষি, ধর্মপ্রচারক, দেশনেতা, চিকিৎসক, কবি—এরা হোলো শ্রেণী। হিরণের সঙ্গে হাসনুর তর্ক লেগে যেতো।

হাসনু বলতো, সকলের নিচে কা'দের বাসা? তাদের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে সকল শ্রেণী আর সকল স্তর?

মীরা বলতো, তাদের চিনিনে, তাদেরকে চোখেও দেখিনে।

হাসনু বলতো, আমি দেখেছি, তারা থাকে সকলের পায়ের তলায়। তারা মাটি, তারা বালুর দানা,—তারা চিরকাল বোবা, কোনদিন তারা কথা বলে না, কোনদিন মাথা তোলে না? পৃথিবীর সব দেশে তারা থাকে, তারা চিরকাল দরিদ্র। তারা সাগর বাঁধে, বন কাটে, নগর বসায়, একদিন মহাকালের কোলে তারা মিলিয়ে যায়। সম্পদের লোভ নেই, ক্ষমতার মোহ নেই, সঞ্চয়ের ওপর আসক্তি নেই। কাজ ক'রে যায় সকলের চোখের আড়ালে। তাদের নাম মহাজনতা, মহাসাগরের ঢেউ,—সংখ্যাগণনার বাইরে।

হিরণ বলতো, আমি তাদের কবি।

হাসনু হেসে উঠতো। মীরা বলতো, তাদের ভিতর থেকে না জন্মালে তাদের কবি হওয়া যায় না। তাদের ভাষা আলাদা, তাদের সুখ-দুঃখ আনন্দ বেদনার বোধ ভিন্ন রকমের।

হাসনু বলতো, সংস্কারের থেকে দূরে, শিক্ষিত মনোবৃত্তির বাইরে অভ্যাস-করা চিন্তাধারা আর কল্পনার থেকে অনেক দূরে,—যেখানে শুধু মাটির কণা আর বালুর দানা মহাজনতার গায়ে-গায়ে লেগে থাকে, সেই তাদের মধ্যে নেমে গিয়ে দাঁড়ানো। তাদের জাত নেই, ধর্ম নেই,—তারা শুধু কর্মী।

হিরণ বলতো, তারা ত' জীব মাত্র! জন্মবিবর্তনের দ্বারা তারা মানুষের নাম পেয়েছে, এ ছাড়া আর কিছু কি?

আরো কিছু, যার নাম মনুষ্যত্ব। সভ্যতার নৈতিক দায়িত্ব ছিল, তাদেরকে তুলে আনা? একদল উঠেছে আরেকদলের মাথার উপর দিয়ে। ক্ষমতার লোলুপতা, সম্পদের আসক্তি, প্রভুত্বের মোহ—এই নিয়ে শুধু দল ওঠে, সভ্যতার চরিত্রে এইটিই হোলো স্বার্থপরতা। সেইজন্য শ্রেণী মাত্রই স্বার্থপর, দল মানেই প্রবঞ্চক।

হিরণ প্রশ্ন করতো, তুই কি সভ্যতার চাকা পিছন দিকে ঘুরিয়ে বন্য যুগে নিয়ে যেতে চাস?

হাসনু জবাব দিত, না, হাজার-হাজার বছর ধরে যে অঙ্কটা কষেছি, সেটায় ভুল ধরা পড়েছে। সেই ভুলটা মুছে ফেলে নতুন ক'রে অঙ্কটা কষতে চাই। এইজন্য জনতার বিপ্লবকেই ডাক দেবো। সভ্যতার পুনর্জন্ম হোক,—নতুন ভগীরথ আসুক নবগঙ্গাকে সঙ্গে নিয়ে।

হাসনুর কথাগুলো ওদের মনে ছিল। সুতরাং এই প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল

ওরা নিচের তলায় গিয়ে নামবে। সকলের পিছনে, ওদেরই ভাষায় যাকে বলে, সকলের পায়ের তলায়। সেটা শ্রেণীর বাইরে, সমগ্র সমাজচেতনটার বাইরে। লৌকিক সংসার, সংসার-যাত্রার রীতি-নীতি, অভ্যস্ত মনোবৃত্তি এবং বুদ্ধি-বিবেচনার চলতি নির্দেশ যেখানে মনোবিজ্ঞানকে আচ্ছন্ন ক'রে নেই—সেখানে গিয়ে দাঁড়ানো। মন্দ কি! জীবন-ব্যাপারের এটা যদি আধুনিকতম পরীক্ষা হয়, তবে এটাকেই দেখে নিতেই হবে!

যাবার আগে মীরা বলেছিল, না, তা হবে না। তোকে সত্যাশ্রয়ী হ'তে হবে। নিজেকে নির্ভুল ক'রে না জানলে ওতে আনন্দ পাবিনে। সর্বত্যাগীর একমাত্র কাম্য হোক, সর্বোত্তম ঐশ্বর্যলাভ।

হাসনু আবার এসে বসেছে ওর কণ্ঠে। পুনরায় মীরা বললে, রাজ-সম্পদ দেখে এসেছি, এবার দেখতে চাইলুম দরিদ্রতম জনতার ঐশ্বর্য। এটার দরকার ছিল,— এই শ্রেণীবিলুপ্তির।

ওরা গিয়ে আশ্রম নিয়েছিল রেফুজীদের ক্যাম্পে। চারিদিকে জনসমুদ্র দেখে মীরা বলেছিল, এটা মহাজনতার তীর্থ, এর নাম মোহমুক্তি! এখানে আছে বিপুল সান্ত্বনা, বিশালতার সমাবেদনা।

হিরণ বলেছিল, এটা কি অপমৃত্যুর শ্মশানক্ষেত্র নয়?

না—মীরা জবাব দিয়েছিল, এখানে অসন্তোষের দাহনে জ্বলবে এক প্রকার ধাতু—যে পাথরের চেয়েও সহিষ্ণু, লোহার চেয়েও কঠিন। এটা আগামী যুগের গবেষণাগার। এই অগ্নিশালার থেকে অগ্নিবাসনা নিয়ে যারা উঠবে, তারাই হাসনুর মনের মানুষ। তারাই আনবে শান্তি, তারাই আনবে সত্যকার মুক্তি। এবার তুই যেতে পারিস।

হিরণ বললে, আমি যাবো? তুই একা থাকবি এখানে?

মীরা বললে, একা নয়, বহু লক্ষের ভীড়ে। বেদনা এখানে বড়, উৎপীড়ন তার চেয়েও বড়,—আমার সমস্ত পরিচয়ের থেকে মুক্তি নিয়ে এই মরুভূমির মধ্যে বালুর দানা হয়ে থাকতে চাই। তুই গেলে আর আমার কোনো দুঃখ নেই।

প্রখর রৌদ্রের আলোয় মীরার মুখখানা গৌরবোজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। হিরণ প্রশ্ন করলো, এখানে কি করবি?

মীরা বললে, ভিক্ষে করবো না, কাজ করবো।

কী কাজ?

যে কাজে আনন্দ! ব্যাধি, যন্ত্রণা, মৃত্যু, দারিদ্র্য আর নৈরাশ্যের থেকে ওদেরকে টেনে আনা! এই দুখানা হাতের যতদূর শক্তি!

হিরণ কিয়ৎক্ষণ থামলো। তারপর বললে, আমি যাবো কোথায় ?

মীরা এগিয়ে এসে হিরণের হাত ধরলো। বললে, তোর পথ পুরুষের। সমস্ত শক্তি দিয়ে হাসনুকে তুই ছাড়িয়ে নিয়ে আয়। তাকে তুই শান দিতে থাকবি, তার গায়ে যেন মর্চে না ধরে।

হিরণ বললে, কিন্তু তুই কি সত্যই আমার স্ত্রী নোস ?

মীরা তার পায়ের ধূলো মাথায় তুলে নিয়ে বললে, তোর চেয়ে আমি কতটুকু বেশি জানি। ছেলেমানুষের মতন আমার স্বীকৃতি আদায় করতে চাস কেন তুই ?

মীবার দুই চোখে জল এসেছিল। হিরণ চ'লে গেল।

কিছুদিন পরে আবার একদিন হিরণ এসে হাজির হোলো। হাতে তার একখানা সংবাদপত্র।

এই কয়দিনের মধ্যে তাদের চেহারাব কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। মীরাব চোখেব কোনে কালি, ধূলোবালি মাখা মাথার চুল, নানা দাগ-লাগা ময়লা একখানা কাপড পবনে। কাছে এসে দাঁড়িয়ে সে হাঁপাচ্ছিল। হিরণ তথৈবচ। সেই খাটো লালপেড়ে ধুতি আর ছেঁড়া তালিমারা হাফশার্ট। শীতকালে গায়ে একখানা সুতি চাদর জুটেছিল, শীতের শেষে সেখানা নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে বিদায় নিয়েছে। ছেঁড়া চটিব থেকে হাঁটু পর্যন্ত এক-পা ধূলো। পুরনো বন্ধুরা ওকে দেখলে আর চিনতে পারবে না।

সংবাদপত্রখানা নিয়ে হিরণ মীরার সামনে মেলে ধরলো।—

"মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের দায়রা জজের আদালতে সম্প্রতি সুমিত্রা নাম্নী এক স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে যে রোমাঞ্চকর হত্যাচেষ্টার মামলা চলিতেছিল তাহার রায় বাহির হইয়াছে। কলিকাতাব জনৈক বিশিষ্ট নাগরিক এবং ভূসম্পত্তির মালিক বেণীমাধব মল্লিক ওরফে বেণু মল্লিককে হত্যা করিবার চেষ্টাব অপরাধে সুমিত্রার প্রতি দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। প্রকাশ, পূর্ববঙ্গ হইতে আগত এই স্ত্রীলোকটি বেণু মল্লিকের সহায়তায় কোনও এক বস্তিতে বাস করিত এবং চরিত্রের অপযশ রটাইবার ভয় দেখাইয়া বেণু মল্লিকের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে থাকিত। ঘটনার তদন্তে প্রকাশ, সুমিত্রা তাহার পুত্রের সন্ধানে পূর্ববঙ্গে ফিরিয়া যাইতে চাহিয়া উক্ত মল্লিকের নিকট রাহাখরচ স্বরূপ কিছু টাকা দাবি করে। টাকা দিতে অক্ষমতা জানাইলে সুমিত্রা একখানা মাছ কুটিবার বঁটি লইয়া অতর্কিতে বেণু মল্লিককে হত্যা করিবার চেষ্টায় বার বার তাহার দেহের উপর আঘাত করিতে থাকে এবং বেণু মল্লিক অজ্ঞান হইয়া পড়িলে সুমিত্রা সেই ধারালো বঁটির সাহায্যে তাহার

দুই খানা কান কাটিয়া লয়। তদন্তের ফলে প্রকাশ পায়, সুমিত্রা পূর্ববঙ্গের জনৈক সম্রান্ত জমিদারের বিধবা পত্নী এবং মামলা চালাইবার কালে ইহা জানা যায়, তাহার একমাত্র পুত্র সম্প্রতি পূর্ববঙ্গের হাজিপুর গ্রামে এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে পুড়িয়া মারা গিয়াছে। বিনোদিনী নামক উক্ত বস্তির জনৈক স্ত্রীলোক সরকার পক্ষে সাক্ষ্যদান করে।"

জলভরা দুটো চোখ তুললো মীরা। হিরণ বললে, অত্রি বেঁচে গেছে, কিন্তু আঁশবঁটিখানা ছোটখুড়ি নিজের গলায় বসালো না, এই দুঃখ!

মীরা কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তারপর আঁচলো চোখ মুছে বললে, অত্রির মৃত্যুটা রহস্যজনক মনে হচ্ছে যেন?

হিরণের ক্লান্ত মুখে হাসি দেখা দিল। বললে, না, এর মধ্যে কোনো রহস্য নেই!

মীরা মুখ তুলে তাকালো।

হিরণ বললে, এটা প্রথম স্ফুলিঙ্গ, সম্ভবত হাসনুর প্রথম পরীক্ষা। বলতে বলতে সে পকেট থেকে একখানা চিঠি বার করে মীরার হাতে দিল।

হাসনুর জবানিতে কয়েক ছত্র চিঠি লিখেছে ফকিরুদ্দি।—কমরেড, আগের চিঠির জবাব কেন দিলিনে বুঝতে পারলুম না। ডাকার মত করে ডাকলে নাকি তোকে পাওয়া যায়। কাঁদলে কি তুই শুনতে পাস? আমি ছাড়া পেয়ে চ'লে যাচ্ছি বুবুর বাড়ি। মীরা আর ছোটখুড়িকে নিয়ে তোর যে আসবার কথা ছিল? অত্রি নেই, তাকে রাখতে পারলুম না। নিজেকে রাখাও যেন কঠিন হচ্ছে। যদি আসতে চাস্ তবে আসামের পথ দিয়ে আসবি, আগরতলা দিয়ে ঢুকবি। হামিদ বেঁচে থাকলে নিজের নাম সই করতুম—হামিদাবানু। এ তোরই উক্তি।

চিঠি পড়েই মীরা বললে, তোর সঙ্গে আমি যাবো।

হিরণ বললে, যাবার কি আর দরকার আছে? দু'মাস আগে চিঠিখানা লেখা। তালতলা পোস্টাপিসে চিঠিখানা খুঁজে পেলুম। শুধু ভাবছি, বুবুর বাড়ীতে প'ড়ে থাকার মেয়ে হাসনু নয়!

মীরা বললে, হাসনু একথা কেন লিখেছে, নিজেকে রাখাও কঠিন হচ্ছে? আমাকে নিয়ে চল্ তোর সঙ্গে। আমি না গেলে চলবে না।

মীরা চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। হঠাৎ জোয়ার দেখা দিল মরা নদীতে।

হিরণ বললে, যদি হাসনুকে খুঁজে না পাই সেখানে? তার চেয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করেই থাকি।

মীরা বললে, না, এক বছরেরও বেশি সে একা আছে। আসতে পারলে

সে চিঠি লিখতো না। চল্ যাই সেখানে। যদি খুঁজে না পাই তবে তাকে খুঁজে-খুঁজেই বেড়াবো। গ্রামে-গ্রামে ঘুরবো। চল্ তুই।—উদ্বিগ্ন মুখখানা নিয়ে মীরা আরো কাছে এগিয়ে এলো।

হিরণ বললে, এই চেহারা নিয়ে তুই তার সামনে কেমন করে গিয়ে দাঁড়াবি?

মীরা বললে, আগুনে পু'ড়ে আমার সকল পরিচয় ঘুচে গেছে, এ চেহারা নিয়ে এই কথাই তাকে বোঝাতে পারবো।

হিরণ বললে, বেশ, তবে চল। কিন্তু হাসনু যদি জিজ্ঞেস করে, তুই আর আমি আজো কেন মিলতে পারিনি,—তুই কি জবাব দিবি?

দু'পা এগিয়ে মীরা থমকে দাঁড়ালো। বললে, এর উল্টো কথাটাও উঠতে পারে। যদি সে জানতে চায়, কমরেড, নোংরায় যে-মেয়েটা একেবারে তলিয়ে গিয়েছিল, তাকে টানতে গিয়ে তোর জীবনের শুচিতাকে কেন হারালি?

এর জবাব আমি দিতে পারবো।—ব'লে হিরণ অগ্রসর হোলো।

রেফুজী ক্যাম্প থেকে ওরা দুজনে বেরিয়ে এলো। সকল পরিচয়ের থেকে ওরা মুক্ত। ওরা সব-হারানো দলের লোক। কথা উঠতে পারে, ওদের সেই আগেকার সাজানো ঘরকন্নাটা কই? কোথায় গেল সেই মোটা টাকার পুঁটলীটা? ওদের বাঁচবার মত সংস্থান ছিল, তবে কেন এই শৌখীন দারিদ্র্য-বিলাস? ওদের এই মূঢ় চিত্তবিভ্রম কেন?

এ প্রশ্নের জবাব আছে ওদের অনেকের মনে, ওই যারা সংখ্যায় আজ লক্ষ লক্ষ। মাটির থেকে যারা উন্মূলিত,—যারা বিশ্বাসের পরিচিত পথটাকে হারিয়েছে। বাঁচবার চেষ্টায় কোনোমতে যারা প্রাণ ধারণ ক'রে রয়েছে, তারা জানে—ক্লেদক্লিন্ন জানোয়ার ছাড়া তাদের আর কোনো পরিচয় অবশিষ্ট নেই। আর এই ধারণার বাইরে যারা—তাদের কাছে কী মিথ্যা ওই ঘরকন্না, কী অবাস্তব ওই টাকার পুঁটলী! ওরা তাই সমস্ত সামগ্রী বিলিয়ে দিয়ে এসেছে সর্বহারাদের হাতে, সমস্ত টাকা দান ক'রেছে পুনর্বসতির ভাণ্ডারে!

ওরা চেয়েছিল অহঙ্কার ঘুচুক, ভয় স'রে যাক, অশ্রদ্ধা দূর হোক। ওরা ভেবেছিল কর্মের দ্বারা সেবা করবে, সেবার দ্বারা জয় করবে। অন্ন ভিক্ষা করবে না, উচ্ছিষ্ট খুঁটে খাবে। ওরা নেমে যাবে সকলের নিচে, সকলের বোঝা বইবে। ওদের একজন আর একজনের থেকে দূরে থাকবে—স্নেহ-মোহ-চক্রান্তের বাইরে। দুইয়ের মিলনে পৃথিবী ক্ষুদ্র,—বিচ্ছেদের বেদনায় বিশ্বের বিস্তার!

মধুমতীর বিস্তৃত চর দেখা দিয়েছে ফাল্গুনের মাঝামাঝি। তারই এক শাখা চ'লে এসেছে পূর্বদিকে এঁকে-বেঁকে। ভরা বর্ষায় প্রচুর জল থাকে ভিতর দিকে ; কোনো বছরে চর-ময়নার ছাপিয়ে সেই জল গ্রাম পর্যন্ত ডুবিয়ে দেয়। কিন্তু শীতের শেষে সেই ধুকধুকে শীর্ণ ধারাটি কোথায় গিয়ে যেন বালুমাটির মধ্যে পথ হারায়। গরু বাছুর তখন জল না পেয়ে নদীর থেকে উঠে আসে চর-ময়নার ছোট বিলে। বিলের ধার ঘেঁষে সোজা দক্ষিণে এলেই ধলামাটি। এককালে ধলামাটিতে ছিল নীলকরের উৎপাত, তারা এখানে নীলের চাষ করতো। তাদের অতীত কীর্তির চিহ্নস্বরূপ আছে জঙ্গল সমাকীর্ণ একটা টিলাটিপি। সেই টিপির ওপর উঠলে দেখা যায়, বহুদূরে ত্রিপুরার দিকের পাহাড়ের শ্রেণী, এদিকে অবারিত শস্যরিক্ত প্রান্তর দিগন্তের সীমারেখা পর্যন্ত চ'লে গেছে। মধুমতীর বিস্তৃত চরের উপান্তে নৌকা বাঁধা রয়েছে। উত্তরাপথের হংস-বাহিনী আর আসে না, গ্রামের পাখীরা এখন জলের ধারে ব'সে স্নান করে। প্রখর রৌদ্র ধূ ধূ করছে চারিদিকে। তপ্ত হাওয়া হাহাকার ক'রে চলেছে।

ওরা আসছে ওই দূরের থেকে—হিরণ আর মীরা। নীলকরের টিলার ওপর দাঁড়ালে ওদেরকে মনে হয় দুই বিন্দু মানব-মানবী। ওরা যেন উত্তীর্ণ হয়েছে সৃষ্টির আদিতে,—মানুষের প্রথম পদচিহ্ন মুদ্রিত হচ্ছে ওই বালুচরে। কপাল বেয়ে ওদের ঘাম ঝরছে, বালুর উত্তাপে ওদের পা জ্বলছে। কিন্তু ওরা যেন চিরতীর্থপথিক ; ওদের লক্ষ্য হোলো দর্শন।

বুবুর বাড়ীর গল্প ওরা জানে। হাসনুর পিসি ছিল পিসতুতো, অর্থাৎ বাপের পিসির মেয়ে। পিসির দ্বিতীয়পক্ষের স্বামীর একটি ছোট মেয়ে ছিল এই গাঁয়ে, নাম তার আমিনা। সে নাকি এখানকার এক জোতদারের ঘরে দুবেলা গরুর জাব মেখে দেয়, আর দু'মুঠো খেতে পায়। সন্ধ্যার পরে বুড়ো চৌকিদারের চালাঘরের একপাশে গিয়ে পড়ে থাকে। হাসনুর দেখাশোনার ভার মেয়েটা নেবে, একথা ওরা জানতো।

ফকিরুদ্দি ওদের দেখতে পেয়েছিল দূর থেকে। কেন-না তার কাজ ছিল প্রতিদিন দূর পথের দিকে চেয়ে থাকা। কবে ওরা আসবে। সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বাঁশবাগানের তলা দিয়ে এগিয়ে অভ্যর্থনা করার জন্য এসে দাঁড়ালো।

ফকির, তোর মা কেমন আছে, ভাই ?– দূরের থেকে ছুটতে ছুটতে মীরা এসে তার হাত ধরলো।

ফকির পায়ের ধুলো নিল দুজনের, এবং মীরার চেহারার অদ্ভুত পরিবর্তন

দেখে প্রথমটা তার মুখ দিয়ে কথা সরলো না, পরে ধীরে ধীরে বললে, মা আর নেই বড়দি আজ ছ'মাস হোলো মাটি গেছে।

কথাটা হিরণ শুনলো, শুনে গম্ভীর হয়ে গেল। মীরার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এলো। বুড়ো হারুমিঞা মরেছে তাও ফকির শোনালো। যাদের সঙ্গে জীবনের নানা অবস্থার যোগ, তাদের অনেকেই বেঁচে নেই। কেউ সার্থক হয়ে চ'লে গেছে, কেউ বা অন্তিম নিমেষেও কোনও খুঁজে না পেয়ে বিদায় নিয়েছে।

মাটির ঘটে জল এনেছিল মীরা, সেই জল পান ক'রে মুখ ধুয়ে ঘটটা ফেলে দিল। তারপর প্রশ্ন করলো, ফকির, তোর ছোড়দি ছাড়া পেয়ে হাজিপুর থেকে চ'লে এলো কেন রে?

ফকির তার বিষণ্ণ মুখ তুললো হিরণের দিকে। মীরা উদ্বিগ্নকণ্ঠে ব'লে উঠলো, ফকির, জবাব দে ভাই?

এতক্ষণ পরে স্খলিতকণ্ঠে হিরণ বললে, কি রে ফকির, কি হয়েছে?

মায়ের কথায় ফকির শান্ত ছিল, কিন্তু হাসনুর কথা জানাতে গিয়ে তার বাঁধ ভেঙ্গে গেল। ভারাক্রান্তকণ্ঠে সে বললে, আমার যা করবার তা আমি করেছি জামাইবাবু—দু'মাস ধ'রে রেখেছি। তোমরা অনেক দেরি ক'বে ফেলেছ।

মীরা ছুট দিল একদিকে। ফকির কয়েক পা এগোলো তার পিছু পিছু। হিরণের দুই পায়েও এসেছিল বেগ,—যে-বেগে নক্ষত্র ঠিক্‌রে যায়, যে-বেগে কবিতার কথা ছিট্‌কে আসে মনে। কিন্তু হিরণ নিজের কানে কানে বললে, শান্ত হত, সংযম যেন না হারায় তোমার।

ভুল পথে ছুটেছিল মীরা। সে মনে করেছিল নন্দন কাননে ঘর বেঁধেছে হাসনু—যুথী-মালতী-মল্লিকায় তার অঙ্গন বুঝি ছাওয়া। মীরা ছুটেছিল সেই তপোবনের সন্ধানে। ফকির তাকে ডাক দিয়ে ফিরিয়ে আনলো। রুদ্ধশ্বাসে মীরা বললে, কোথায় রে?

এই যে ঘর।

থমকে দাঁড়িয়ে মীরা বললে, এখানে মানুষ থাকে?

কিন্তু প্রশ্নের জবাব শোনবার আগেই সে ভিতরে ঢুকলো। বেড়া কাৎ হয়ে পড়েছে, চালে নানাস্থলে ছন্ নেই। উঠোনের মাঝখানেই শষ্পাচ্ছন্ন ডোবা, এখানে ওখানে বড় বড় গর্ত। ভিতরে দরজা ও জানালার ফাঁক আছে, কিন্তু কপাট নেই। পা বাড়াতেই এক পাল কুকুর-ছানা একদিকে ছুটতে লাগলো। বাসের যোগ্য ঘর কোনোমতেই একে বলা চলে না। ভিতরটা ঝুপসি অন্ধকার।

হাসনু—খুব সম্ভব যে হাসনুই শুয়েছিল মাটির মেঝের উপর। বিছানাটার ব্যবস্থা ফকিরের হাতের। এখানে এসে সে ব'সে থাকেনি, ঘরামির কাজ ক'রে কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছে। তার চিহ্ন আছে ঘরের এখানে ওখানে। মীরার পিছনে পিছনে হিরণ এসে দাঁড়ালো ভিতরে। তার কণ্ঠরোধ হয়ে এলো।

হাসনু তাকিয়েছিল কোনো এক দিকে। ঠিক কোন্ দিকে বলা কঠিন। চোখের তারা দুটোয় এক প্রকার বিকৃতি দেখা দিয়েছে কিছুদিন থেকে—একটা আর একটার থেকে বিপরীত বাঁক নেয়। গালে, গলায়, হাতে, পায়ে—গলিত বীভৎস ক্ষত। হাত-পাগুলো ছোট হয়ে গেছে, অঙ্গুলগুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে বেঁকে পাক খেয়ে কিম্ভূতকিমাকার চেহারা নিয়েছে। একখানা কান কেমন যেন কুঁকড়ে এসেছে। হাসনুর ভিতর থেকে একপ্রকার আওয়াজ নির্গত হচ্ছিল।

ওরা দুজনে পাথর হয়ে গিয়েছিল। কে আগে কথা কইবে, কা'র এমন সাহস! মহাযোগিনী জপের মন্ত্র নিয়ে প'ড়ে রয়েছে, কে ভাঙবে ওর যোগনিদ্রা? হিরণ নিঃশব্দে তাকালো ফকিরের মুখের দিকে। ফকির চাপাকণ্ঠে বললে, সেদিন অবধি ছোড়দিকে তুলে বসাতে পারতুম, কিন্তু একাদশীর থেকে আর নড়বার অবস্থা নেই। সামনে আবার অমাবস্যে।

হাসনু তাকালো। চোখের তারা দুটো একত্র ক'রে কোনো একটা দিকে নিবদ্ধ করার চেষ্টা ক'রে ধীরে ধীরে বললে, কে রে ফকির?

ফকিরুদ্দি আকুল কণ্ঠে বললে, তোমার বুন গো, ছোড়দি। বড় রাজার মাইয়া জামাই আইছে। চাইয়া দেখো।

চোখের তারা দুটো অবাধ্য হয়ে নিজেদের জায়গা বেছে নিল। গলার আওয়াজটা চাপবার চেষ্টা ক'রে হাসনু ক্ষীণ হাসি হাসলো। তৎপর ধীর কণ্ঠে বললে, বিশ্বাস করিনে, ফকির।

হিরণের চোখ দুটো পলক ফেলতে না পেরে জ্ব'লে পুড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হোলো মীরা। চেঁচিয়ে বললে, আমিও বিশ্বাস করিনে, হাসনু আমি বিশ্বাস করবো না, করতে পারবো না! এ কথা ছিল না তোর সঙ্গে। তুই ফিরে যাবি বলেছিলি, তাই তোকে পাঠিয়েছিলুম। তুই বিশ্বাসঘাতক, তোর সব কথা মিথ্যে, তুই—

চক্ষের নিমেষে উঠে হিরণ মীরার মুখখানা চেপে ধ'রে চিৎকার বন্ধ করলো, তারপর তার হাত ধ'রে তুলে বাইরের দিকে এগিয়ে বললে, চুপ। রোগীর ক্ষতি ক'রো না।

এক কোণে কাঠের উনুনে ভাত ফুটছিল। ফকির সেই কালো হাঁড়িটা

নামিয়ে হাউহাউ ক'রে কেঁদে উঠেছিল, এমন সময় হিরণ গিয়ে তার পিঠে টোকা দিয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, ফকির, এত কাঁদিস কেন রে? তোর ছোড়দি মনে করবে কান্নাটা ছোঁয়াচে, শেষের দিকে বুঝি কাঁদতেই এলুম। মনে করবে, বাঙ্গালা শুধু কাঁদতেই জানে।

মৃদুস্বরে হাসনু হাঁপিয়ে ডাকলো, কমরেড।

হিরণ জবাব দিল, কমরেড ম'রে গেছে হাসনু।

হাসনুর চোখের তারা দুটো আবার ন'ড়ে বেড়াতে লাগলো। সম্ভবত কমরেডের মৃত্যুর দৃশ্যটা দেখবার আগ্রহ ছিল তার। হিরণ সেইদিকে একবার তাকিয়ে ফকিরকে নিয়ে বাইরে এলো। নিজের চাঞ্চল্যটা প্রকাশ পেলে চলবে না। গলার ভিতরে কেমন একটা অধীরতা ঠেলে উঠেছিল। সেটা গলার মধ্যেই ঠেলে দিয়ে সে বললে, ফকির, এখানে ডাক্তার, কোথায় ভাই?

ডাক্তার? ফকির বললে, পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে এখানে কোথাও ডাক্তার নেই, জামাইবাবু।

হঠাৎ একটা আর্তস্বর বেরিয়ে এলো হিরণের মুখ দিয়ে। সে বললে, ডাক্তার নেই, ওষুধ-পথ্যি নেই, বাঁচবার কোনও পথ নেই। তবে যে তোর ছোড়দি বলতো আমাদের তাড়িয়ে সে পাকিস্তানকে গ'ড়ে তুলবে? তোর ছোড়দি আর সব ভেবেছিল, কেবল কি নিজের মৃত্যুর কথাই ভাবেনি ফকির?

ফকির মাথা নিচু ক'রে রইলো।

হিরণ বললে, কী খেতে দিচ্ছিস?

মাথা তুলে ফকির বললে, চার দিন আগে পর্যন্ত ভাতের দানা দুটো খেতে দিতুম, এ-কদিন আর কিছু খায় না।

দুধ?

দুধ এক ফোঁটাও পেটে তলায় না।

'হিরণ প্রশ্ন করলো' এ অবস্থা কেন হোলো তুই জানিস, ফকির?

ফকির বললে, হাজিপুরের সবাই জানে, জামাইবাবু। কেবল ছোড়দি স্বীকার পায় না।

সাগ্রহে হিরণ বললে, কি বল্ তো?

ফকির ব'লে গেল হাজিপুরের গল্প। অগ্নিকাণ্ডের ইতিহাস, হাসনুকে বাঁচাবার জন্য হাঁমিদ আর অত্রির আত্মহত্যা। গুলীর আঘাতে আহত ইয়াসিনের কাহিনী। হাসনুর খাদ্যে দিনের পর দিন বিষপ্রয়োগ; হাসনুর শরীরের রক্তে পারা মিশ্রিত করে দেওয়া। আহত অত্রির কান্নায় গ্রামবাসীর উত্তেজনা, এবং রাত্রির অন্ধকারে থানায় অগ্নিসংযোগ। হতভাগ্য অত্রি

জানতো না, সেই রাত্রে হাসনুকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। অজ্ঞান অবস্থায় হাসনু সেই রাত্রেই মুক্তিলাভ করে। ছোড়দিই শুধু স্বীকার করে না, ইয়াসিন তাকে মারবার ষড়যন্ত্র করেছিল।

হিরণ বললে, বিশ্বাস করে না, কিন্তু কি বলে?

ফকির বলে, এসব কথা যেন বিশ্বাস করিসনে,—ওতে পাকিস্তানের দুর্নাম রটবে, ভাই। আল্লার কিরে জামাইবাবু—ছোড়দিকে ছ'মাস ধ'রে বিষ খাইয়েছে ওরা।—ফকিরের চোখে জল এলো।

ইতিমধ্যে মীরা কোমর বেঁধে ঘরের কাজে লেগে গিয়েছিল। হিরণের সেই সনাতন পুঁটলী থেকে বেরিয়েছে থান দুই ধুতি আর শাড়ি, একখানা চাদর, গোটা দুই-চার অঙ্গসজ্জা। জল গরম ক'রে মীরা হাসনুর মুখ মুছিয়ে দিয়েছে, খড়ের রাশির মতো চুলগুলি দিয়েছে গুছিয়ে। তারপর পরনের শাড়িখানা বদলে নিজের শাড়িখানা জড়িয়ে দিতে গিয়ে যে-দৃশ্য তার চোখে পড়েছে, তা ডাক্তার ছাড়া আর কা'রো কাছে বলবার উপায় নেই। নিজের হাতে মীরা সেই বিভীষিকা ...কে দিয়েছে। ঘরের মধ্যে মাছির উৎপাত ছিল প্রবল। বিছানাটা সযত্নে উলটিয়ে দিয়ে সে কতকটা মাছির উপদ্রবের প্রতিকার করেছে। হাসনু শুধু এক-একবার ভিন্ন দিকে তাকিয়ে এই সেবিকাকে চিনবার চেষ্টা করছিল। ওকে কোলে তুলে নিয়ে কোথাও উধাও শূন্যে পালাতে পারলে মীরা যেন কতকটা শান্ত হ'তে পারতো। তার মুখে আর কোনো শব্দ ছিল না, কেবল দুই চোখে জলের ধারা ছিল।

অপরাধ অনেকখানি তার, এ কি সত্যি নয়—? তার নিজের শিথিল প্রকৃতিই কি এই বিয়োগান্তের জন্যে অনেকাংশে দায়ী নয়? কেন সে যেতে দিয়েছিল হাসনুকে দেশভ্রমণে? কেন সে হাজিপুরে গিয়ে হাসনুর পাশে দাঁড়ালো না।

বেড়ার পিছন দিক দিয়ে হঠাৎ একটা ছোট মেয়ে এসে ঢুকলো ভিতরে কিন্তু নবাগতা মীরাকে দেখেই সে হতচকিতভাবে জড়োসড়ো হয়ে এক পাশে দাঁড়ালো। এই মেয়েটির নামই আমিনা, মীরা বুঝে নিল। মুখে বললে, একটু জল আনো ত' ভাই, তোমার দিদিকে খাওয়াবো।

মেয়েটা সাহস পেয়ে বেরিয়ে গেল এবং একটু পরেই টিনের বাটিতে জল এনে রাখলো। মীরা একটুখানি জল খাওয়ালো হাসনুকে, আমিনা বললে, ওর কান আছে বেশ—শুনতে পায় সব। শুধু গুছিয়ে কথা বলতে পারে না।

মীরা বললে, অনেকদিন ধ'রে অনেক কথা গুছিয়ে বলেছে, এখন কিছুদিন নাই বা বললে?

কিছুদিন! আমিনা বললে, ও কিন্তু আর বাঁচবে না—দেখো তুমি!

মীরা বললে, ও বাঁচবে, আমিনা—ও অনেকদিন বাঁচবে। কিন্তু আমাদেরই কোনো আশা নেই বাঁচবার। তুমি বুঝি বোনের কাছে রাত্তিরে থাকো?

আমিনা বললে, বারে, আমার বুঝি ভয় করে না? আমি থাকি জইলুদ্দির ঘরে। তোমরা বুঝি হিঁদু?

হাসনু এবার একটু হাসলো। মীরা বললে, তোমার দিদি ভালো হয়ে উঠুক, তার মুখেই শুনো আমরা কোন্ জাত। এসো আমিনা, তোমাকে আর ফকিরকে ভাত বেড়ে দিই।

আমিনা গিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে এক মুঠো নুন আর কলাপাতা নিয়ে এলো। এঘরে এবেলার মতন ভাত পাওয়াটা তার উপরি লাভ। বাইরে গিয়ে সে কলাপাতা পেতে দিল এবং ফকির গিয়ে যখন চোখ মুছে ব'সে গেল, সেও একখানা পাতা নিয়ে একটু এগিয়ে ব'সে পড়লো। মীরা হাঁড়িটা নিয়ে গিয়ে ভাত দিল দুজনের পাতে। ভাতের সঙ্গে আলু-সিদ্ধ দেখে আমিনা আত্মহারা হয়ে গিলতে লাগলো। মীরা হাত ধুয়ে আবার ঘরে এলো।

খেতে খেতে একসময় মুখ তুলে আমিনা বললে, নোংরা আছে কিছু ঘরে?

ফকির বললে, বড়দি এসেছে, তোকে আর কিছু করতে হবে না।

কালকার পাওনা পয়সা দিবি না?

দিমু। এখন থাম্—ফকির আড়ষ্ট হোলো মেয়েটার অসভ্যতায়।

আমিনা বললে, রুগী মরলে কাইন্দা ভাসাইবি, পয়সা দিবি কহন?

কোমরের কষির থেকে বাঁ হাতে চারটি পয়সা বা'র ক'রে ফকির আমিনার দিকে ছুঁড়ে দিল। মেয়েটার জন্য মানসম্ভ্রম বজায় রাখা দায়!

গ্রামের শেষ প্রান্ত ব'লেই গ্রামের মনোযোগ এদিকে ছিল না। তাছাড়া বসন্তকালের দিকে এ অংশটায় প্রথম মড়ক লাগে, সুতরাং এদিকে লোকজনের আসা-যাওয়া কম। হাসুবানু কে, কিই বা তার পরিচয়—এসব কথা জানবার কৌতূহল কা'রো নেই। চৌকিদারের ঘরের মেয়ে-পুরুষরা জানতো, ওই জাবমাখা আমিনা নামক মেয়েটার কোনো এক সম্পর্কের রুগ্ন মামাতো বোন নাকি এ গাঁয়ে মৃত্যুশয্যায় প'ড়ে আছে! সঙ্গে আছে এক ঘরামি এবং সে লোকটা ঘারামির কাজ করে মন্দ নয়। মাঝে মাঝে লোকটা আদাটুলির হাটে যায়—নুন, কেরোসিন, বার্লি, আর চাল কিনতে। হাটের দিন সে প্রায়ই আসে বদ্যি খুঁজতে। এ মুলুকে বদ্যি আবার কোথা?

কিন্তু আমিনার কানাকানিতে অপরাহ্নের দিকে দু'চারজন লোককে আনাগোনা করতে দেখা যাচ্ছে। নতুন মেয়ে-পুরুষ দু'জন—দু'জনেই হিন্দু—

তা'রা এসে উঠেছে ঘরামির ঘরে। আশ্চর্য বটে। তারও চেয়ে আশ্চর্য ওদের চেহারা, ওদের আকার-প্রকার এবং হাবভাব। মস্ত ঘরের মানুষ ওরা, সন্দেহ কি। ওরা যে ছাইচাপা আগুন, একথা বুঝতে বাকি থাকে না। কিন্তু ওরা হিন্দু, ওদের মতলব ঠাওরাতে দেরি লাগে। ওরা হিন্দু, ওদের চরিত্র দুর্জ্ঞেয়।

ধূসর গোধূলির বর্ণটা ধীরে ধীরে ছায়াচ্ছন্ন হয়ে আসছে। ওটা যেন দিবালোকের অন্তিমকাল। হিরণ চুপ করে বাইরে বসেছিল। সহসা পিছন থেকে হাসনুর গাঢ় মৃদু কণ্ঠস্বরে তার সমগ্র চেতনাটা যেন উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। এই কণ্ঠস্বর এই মুহূর্তের, কিংবা কতকাল আগেকার, কিংবা কবেকার স্মৃতির আলোড়ন—বলা কঠিন। কিন্তু তবু—ঠিক হিরণের কানের পাশে হাসনুর রুগ্ন মৃদুস্বর ধ্বনিত হোলো সঙ্গীতের সর্বশেষ মূর্ছনার মতো!

কবি?

কেন রে!—হিরণের জবাবটা যেন প্রাণের অতল তলেই তলিয়ে রয়েছে। বর্তমান ভবিষ্যৎ নেই, তুই বাসছাড়া, পথহারা,—তুই চলতি সংসারযাত্রা থেকে আমারই মতন খ'সে পড়েছিস। কিন্তু তবু তুই কবি, তোর হাতে বাঁশী আছে, বীণা আছে তোর হাতে! দুঃসহ দুঃখকে সুন্দর ক'রে তোলার দায়িত্ব তোর, বেদনাকে মহৎ ক'রে তোলার কাজ তোর। নিস্পৃহ, নিরাসক্ত নির্লিপ্ত—একটা মধুর জীবনের দরকার আছে তোর,—তুই সেইখানে ফিরে আয়, কবি।

হিরণ প্রশ্ন করলো, সে কোথায়?

হাসনু বললে, এদের সকলের মাঝখানে, কিন্তু সকলের চোখের আড়ালে। জীবন-সমুদ্রের মধ্যকেন্দ্রে ছোট একটি দ্বীপ, সেটি তপোবন। সংসারকে দেখবি সেই তপোবনের আসন থেকে। সেই তপোবনের থেকে উঠে আসবে আশ্বাস আর আশীর্বাদ, উঠে আসবে একটা বিরাটতরো চরিত্রের আইডিয়া, উঠে আসবে লোক-কল্যাণের মহত্তর স্বপ্ন। তোর কোনো জাত নেই, ধর্ম নেই, সমাজ কিংবা রাজনীতি নেই,—তোর মিলনের সুর সকল জীবনের স্তরে স্তরে কাজ ক'রে যাবে। তোর সেই ভালোবাসার সুর সঞ্চারিত হবে বাঙ্গলার এই মাটির তলায়, নদীর ঢেউয়ের দোলায়, তোর সেই প্রাণের মন্ত্র নতুন প্রাণ দেবে বীজের মধ্যে, হাওয়ায় ছড়াবে আনন্দের শ্বাস, নতুন মানুষের চেতনার মধ্যে জড়িয়ে থাকবে সেই মন্ত্র—সেই মন্ত্র থাকবে নতুন পাখির কলকণ্ঠে, নতুন জীবনের স্তবকে।

হঠাৎ হাসলো হিরণ। বললে, হাসনু—এ ত' কাব্য, এ ত' সত্য নয়!

ধরা গলায় হাসনু বললে, এ কাব্যের সত্য, উপলব্ধির সত্য! এ সত্য ছড়িয়ে থাক্ বাঙলার মাটিতে মাটিতে। এই সত্যের তেজে বীজ থেকে অঙ্কুর, তারপর ফুল থেকে ফল। এই সত্য সংশয় ঘুচিয়ে বিশ্বাস আনে, ভয় ঘুচিয়ে আনে শ্রদ্ধা, বিচ্ছেদ ঘুচিয়ে আনে মিলন, ঘৃণা ঘুচিয়ে আনে প্রেম। কবি, এই সত্যের সার্থকতার জন্যে বিপ্লব যদি ঘটে ঘটুক, সেই রক্ত আর আগুনের প্রচণ্ড প্রলয়-তাণ্ডবের বাইরে যেন এই সত্যের নির্ভয় প্রদীপ শিখা জ্বলতে থাকে। এই আলো যেন বিপ্লববাদের পরম লক্ষ্যকে সার্থক ক'রে তোলে, আমাদের কঙ্কালের ওপর দিয়ে তারা যেন জয়যাত্রার পথ দেখে নেয়, মহাজন-জীবনের সাফল্যকে ডেকে আনে।

লোকজনের আনাগোনা বেড়েই চলেছে। হিরণ বাইরে বসেই রইলো! অনেকেই এসে সামনে দাঁড়ালো এবং ফকিরকে ডাকলো। ফকির গিয়ে গল্পচ্ছলে সকলের পরিচয় দিল কতকগুলি সংবাদ ফকির চাপতে জানে, কিন্তু না চাপলেও পারতো। কে হাসনু, কেই বা মীরা আর হিরণ,—ওদের কাছে কারো কোন বৈশিষ্ট্য নেই। কিন্তু রোগিনীকে ওরা এবার চিনলো। অর্থাৎ হিন্দু স্বামী-স্ত্রী এসেছে পাকিস্তানে এক মুসলমানের রুগ্ন মেয়েকে দেখতে, সুতরাং রোগিনী যে সামান্য মেয়ে নয়, এইটি ওরা বিশ্বাস করলো। ওরা জানলো হাসনু অসামান্য, কেন না হিন্দু মেয়ে চোখের জল ফেলে বসে সেবা করে, হিন্দু পুরুষ বিষণ্ণ মুখে বসে থাকে দরজায়—হাসনু অসামান্য বৈ কি। সমাজের এইটুকু স্বীকৃতি—এর দাম কি কম। পোড়াকপালী হাসনু ধন্য হয়ে গেল।

হাসনু বলতো, পরিচয়টাই মানুষকে সীমানার গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখে। পরিচয়টাই বাধা, পরিচয়ই হোলো আত্মাভিমান। এদেশের মহৎ স্থাপত্য আর ভাস্কর্য শিল্পে কোনো শিল্পীর নাম-সই নেই। কীর্তি রেখে যাওয়া, নাম মুছে দেওয়া—এই এ দেশের সংস্কৃতি। খ্যাতি চাইনে, চাই কীর্তি! বীণাযন্ত্র কালক্রমে ক্ষয় হোক, কিন্তু সঙ্গীত অনুরণিত হোক সকলের মনে! ঈশ্বর হোলো একটা আইডিয়া, একটা সুন্দর কল্পনা—এতে বহু লোক রস পায়। কিন্তু এ আইডিয়া প্রথম যে ব্যক্তির মাথায় এসেছিল, সে নিজের কোন পরিচয় রেখে যায়নি। সে হোলো মহৎ শিল্পী!

হাসনু বলতো, জ্যাঠামশাই চোখ থাকলেই কি দেখা যায়? কান থাকলেই কি শোনা যায়? তুমি ইস্কুল, হাসপাতাল আর দানছত্তর খুলেও ওদের মন পেলে না কেন জানো? লেখাপড়া শেখালেই অজ্ঞান দূর হয় না,– চেয়ে

দেখো উচুস্তরের শিক্ষিত লোকেরাই দেশকে দু'খানা করে কাটতে রাজি হোলো! অজ্ঞান আর মূঢ়তাকে মোচন করাই কি সকলের বড় কাজ নয়? আজ কারা বার বার জগতের সর্বনাশ ডেকে আনছে? তারা কি এ যুগের শিক্ষায় আর পাণ্ডিত্যে মানুষ হয়নি? হাসনু ব'লে যেতো, বিরাট পুরুষকে চাই, তার সঙ্গে চাই বিরাটতরো আইডিয়া। তাকে দেখে অসন্তুষ্ট জনকোলাহল স্তব্ধ হবে, মুগ্ধ হবে—তাকে দেখে সবাই সক্রিয় হবে। আজকের শূন্য সিংহাসনের সেই যোগ্য অধিকারী!

হাসনু বলতো, চেয়ে দেখ্, কমরেড, বাঙালার উপর দিয়ে চলেছে যুদ্ধ বিপ্লব দুর্ভিক্ষ রাষ্ট্রচ্ছেদন আর জাতিবিরোধ—এর মূলে বসে রয়েছে কালচক্ষু কাপালিক। সেই তান্ত্রিক বসেচে শব-সাধনায়। জীবন-মৃত্যুর বিভীষিকার ভিতর দিয়ে সে আনবে সংহৃতি, যাকে বলে সিন্‌থেসিস্। যত কিছু আইডিয়া, তারই মহাসঙ্গম এই বাংলায়। বাঙালীর রসায়নে নতুন অমৃতের সন্ধান!

পড়ন্ত বেলা থাকতেও ফকিরকে ভিতরে আলো জ্বালতে হোলো। সেইদিকে একবার তাকিয়ে হিরণ শান্তভাবে ঘরে ঢুকে হাসনুর পাশে গিয়ে বসলো। ওপাশে স্তব্ধ হয়ে বসে মীরা রোগিনীর দিকে একাগ্র চোখে তাকিয়ে ছিল। কোন এক ব্যক্তির সঞ্চার হয়েছে বিছানার পাশে, এই আনন্দে হাসনুর মুখগহ্বরটা যেন কল্লোলিত হয়ে উঠলো। বললে, কে?

মীরা একটু ঝুঁকে বললে, তোর চিরকালের কমরেড, হাসনু!

হাসনু বললে, না, ও কবি! আমাদের জীবনের কবি।

পুরনো একটা আধপচা কমলালেবু ফকির সংগ্রহ করেছিল আদাটুলির হাট থেকে! হিরণ সেটা হাতে নিয়ে বললে, হাসনু, লেবুর রস খাবি?

হাসনু সহাস্যে সম্মতি জানালো। ভালো অংশটার থেকে এক কোওয়া নিয়ে হিরণ কয়েক ফোঁটা তার মুখে দিল। কী আনন্দ সেই রসে! কী অমৃত এলো সেই নীলকণ্ঠে। কিন্তু দেখতে দেখতে মুখের গহ্বর থেকে ফেনা হয়ে গড়িয়ে এলো সেই রস। মীরা আঁচল দিয়ে মুছে দিল। হিরণ পাথর হয়ে বসে রইলো। ফকির মুখ ফিরিয়ে সরে গেল।

হাসনু হাসলো, ভয় পেয়ে মীরা সেই হাসির উপর হাত বুলিয়ে দিল সস্নেহে। একপ্রকার উল্লসিত ভাষায় হাসনু বললে, আমি কিন্তু কথা বলতে পারি কবি।

হিরণ বললে, আরো কি কথা আছে তোর?

আছে!—হাসনু বললে, আসল কথাটা আজো বলা হয়নি, কবি। কিন্তু এবার তোদের ফিরিয়ে আনতে পেরেছি, এই আনন্দেই ভালো হয়ে উঠবো!

ভালো হয়ে উঠবি, কথা দিচ্ছিস ?

কথা দিচ্ছি। আমি মরবো না, কোনমতেই মরবো না—দেখে নিস। তোদের মাঝখানে আমি ঠিক দাঁড়িয়ে থাকবো।

হাসনু একটু হাঁপিয়ে গেল। গলা দিয়ে সেই স্বরটা অবিশ্রান্তই নির্গত হচ্ছে। তবু গলগলিয়ে সে যেন হাসলো। ঘরে আলো জ্বালাই ছিল, তবুও সে বললে, আলোটা জ্বেলে দে, তোদের দুজনকে দেখে দিই। কতদিন দেখিনি।

মীরা বললে, তুই উঠে আলো জ্বালবিনে, হাসনু।

হ্যাঁ, আমি উঠবো। বাঁচতে হবে বলেই উঠবো।

রুদ্ধশ্বাসটা হাসনুকে ক্লান্ত করছিল। হিরণ ওর কপালে হাত বুলিয়ে শান্ত করলো। আসন্ন মৃত্যুর শিয়রে এসে যারা কোনদিন বসেনি, তারাও হাসনুকে দেখে বলবে, ওর জীবনের কোনো আশা নেই। গলিত দেহ, স্খলিত কণ্ঠ, বিষজর্জর, মূর্তিমতী বীভৎসতা ওর মৃত্যু ঘটেছে অনেকদিন আগে। ও ছুটেছে মৃত্যু পেরিয়ে অমৃতলোকে।

হাতখানা হাসনু অনেক চেষ্টায় বাড়ালো। সম্ভবত ওই ভাবেই সে ফকিরকে ডাকছিল। ফকির কাছে এসে ঝুঁকলো। হাসনু ক্ষীণকণ্ঠে বললে, বের করে দে না ফকির ?

কথাটা বুঝতে পেরে ফকির গিয়ে ঘরের এক কোণের মাটি তুলে একটা টিনের বাক্স বের করে নিয়ে এলো। হাসনু ধীরে ধীরে বললে, এতে মীরাদির টাকা আছে, এ টাকাটা ফকিরের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলুম। অনেক টাকা রে কবি। এই টাকায় আমাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবিনে ?

হিরণ বললে, পোড়ারমুখি, তোকে যে প্রাণ দিয়ে বাঁচাবো। টাকা আমার কি হবে ? টাকায় কি কেউ বাঁচে ?

হাসনু বললে, আর একটা কথা দে ? আমি যেদিন উঠে দাঁড়াবো, সেদিন থেকে তোরা ওদেরকে মানুষ করে তুলবি ?

কাদের ?—মীরা ও হিরণ দুজনে একই প্রশ্ন করলো।

ওই আমিনা, ফকিরুদ্দি, ওই হাবু মোড়ল আর দাশু ওদের ?

মীরা নত হয়ে বললে, আমি কথা দিচ্ছি, হাসনু—আমি ওদের ভার নিলুম, ওদের ছেড়ে আর কোথাও যাবো না আমি।

হাসনু কিয়ৎক্ষণ থামলো। মুখে যেন তার জ্যোতির্ময় আনন্দ ? ধীরে ধীরে ডাকলো, কবি ?'

হিরণ বললে, এই যে আমি।

আমাকে সত্যি বাঁচাতে চাস ?

জবাব দিতে গিয়ে হিরণের গলা ভেঙ্গে গেল। তবু সে বললে, চিরদিনের মিথ্যাবাদী যে, সে কি একবারও সত্যি বলে না, হাসনু ?

হাসনু থেমে থেমে ভগ্ন স্বরে বলতে লাগলো, এই অশ্বত্থটাও আমার ছদ্মবেশ, কবি! এটা সত্যি নয়। এ নতুন রঙ্গ। অভিনেত্রী এক, বিভিন্ন তার ভূমিকা। তুই যদি একটা কথা দিস, তবেই আমি এ বিছানা ছাড়বো। বল্, কথা আমার রাখবি ?

হিরণ স্খলিত কণ্ঠে বললে, রাখবো।

মীরার পাশে থাকবি ? কোথাও যাবিনে? বল ?

কেন এমন প্রতিজ্ঞা করাচ্ছিস, হতভাগী—ভয় করে যে !—হিরণ বললে, তোর সঙ্গেও যাবো না ?

চাপা শুষ্ককণ্ঠে হাসনু চুপিচুপি বললে, কেউ আমার সঙ্গে যায় নি কোনদিন,—আমি একা ! আমার সঙ্গে কেউ কোনদিন ছিল না, কবি !

উত্তেজিত কণ্ঠে হিরণ বললে, রাজনর্তকীর নাচের দোলায় যেদিন সখারামপুরে হাজার-হাজার লোকের হাট ভেঙ্গে গিয়েছিল, সেদিন কে দাঁড়িয়ে দেখেছিল হাসনু ?

দুই চক্ষের জলধারা আঁচল দিয়ে মুছে মীরা বললে, আমি তো তোকে কথা দিচ্ছি, হাসনু—আমাকে ছেড়ে তোর কবিকে আব কোথাও যেতে দেবো না !

হাসনুর কানে কথা পৌছলো না। ভগ্ন চাপা স্বরে সে বললে, একা, একা আমি ! রাজহংস উড়ে চলেছে অনন্ত মহাশূন্যে ! আমি—আমি একা ! আলোটা জেলে দে' কবি, আলোটা—!

আলো জলছে, হাসনু।

জলতে দে',—অন্ধকারে জলুক। চাপাস্বরে হাসনু বলতে গেল, ওটা যেন না নেভে !

রাজহংসীর কণ্ঠস্বর দেখতে দেখতে অনন্তশূন্যে মিলিয়ে গেল। হাসনু যেন ডুব দিল নিজের মধ্যে। অতল পাথারে নিগূঢ় ঘন রহস্যের নিচে সে যেন তলিয়ে গেল।

অমাবস্যার সন্ধ্যা ঘনালো বাইরে। মধুমতীর বিস্তৃত বালুচড়ার ওপারে দিনান্তের শেষ আভা রক্তিম হয়ে তখনও ছিল। সন্ধ্যা নামছে চরময়নার বিলে, নীলকরের টিলাটিপির ওপারে। গ্রামের বহু লোক ঘরের বাইরে এসে জড়ো হয়েছিল। শুধু মৃত্যু নয়, মৃত্যুর চেয়েও কিছু বড় !

মীরা তাকিয়ে ছিল হিরণের মুখের দিকে। হিরণের অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল হাসনুর চোখের দিকে। হাসনু শান্ত নিশ্চল হয়ে রয়েছে।

পৃথিবী রুদ্ধশ্বাস, জীবজগতের চেতনা নেই কোথাও। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার গ্রাস করছে ভিতর ও বাহির। শুধু এই আলোটা জ্বলছে, অকম্প শিখা তার নড়ছে না!

*

* *

আলোটা জ্বলছে!

হাসনু বলতো, চারিদিকের সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত ঝড়ঝাপটা বাঁচিয়ে যদি মাটির প্রদীপ জ্বেলে চুপ করে বসে থাকতে পারি, তবে সেই ত পরম সার্থকতা! ওই আলোটাই হোলো সাহস আর সান্ত্বনা, ওটাই অন্ধকারে পথ দেখিয়ে দেয়।

ওই আলোটা রইলো মধুমতীর ধারে। ওর সামনে দিয়ে সারিগান গেয়ে মাঝিরা নৌকা বেয়ে যায়। ওই আলোটা দেখেই মহাজনী নৌকারা ঘাট খুঁজে পায়। ওই আলোটা এনে ফকির সমাধিস্তম্ভের ওপর তুলসীমঞ্চে রাখে, আমিনা আঁচল ভরে ফুল এনে দেয়।

মন্দ কি, নবজীবনের প্রদীপের ওপর প্রাণের শিখাটা এখানে জ্বলুক অকম্প, অনির্বাণ। এই শিখার থেকে যদি কেউ আপন ঘরের প্রদীপ জ্বেলে নিয়ে যায়, সেও আনন্দ। হাসনু বলতো, আমি সূর্যকন্যা—আমার দাহটা শুধু দেখবি, আলোটা দেখবিনে?

ওরা এই গ্রামে রয়েছে এই আলোটাকে সামনে রেখে। ওই আলোয় ওরা নিজেদের পথ দেখে নিল, নিজেদের বাসস্থান রচনা করলো, একটা কাজ গড়ে তুলতে বসে গেল। ফকির আর আমিনাকে ওরা তুলে নিল।

আলোটা জ্বলছে ওদের দুজনের মাঝখানে। সেই আলোটা তুলে হিরণ একদিন দেখলো, মীরার অশ্রুর ধারা আজও লুকোয়নি। আলোটা রেখে হিরণ তার পাশে এসে দাঁড়ায়। মীরা ওকে ধরে ফুঁপিয়ে ওঠে।

আলোটা আজও জ্বলছে।

বসন্ত বাহার

(উপন্যাস)

উৎসর্গ

শ্রীইন্দুভূষণ দাশগুপ্ত

প্রীতিভাজনেষু

॥ ১ ॥

শীতকালের এক অভিশপ্ত বর্ষণমুখর রাত্রে ছোট লাইনের গাড়িতে যাচ্ছিলুম এলাহাবাদের ওদিকে। আসছিলুম ছাপরা থেকে।

কলকাতা ছাড়বার সময় বাবা বলে দিয়েছিলেন, ফটিক, যখন বাণিজ্য করতে বেরোবি, তখন চড়বি থার্ড ক্লাসে। তোর দুই পকেটে প্রায় দু'লাখ টাকার মাল রইল। কিন্তু বাইরে দেখাবি, তোর ভাঁড়ে মা ভবানী! চানাচুর আর চিনেবাদাম চিবোবি ব'সে ব'সে। দেখবি সব দিকে নিরাপদ।

আমি হাসিমুখে বিদায় নিচ্ছিলুম। জুয়েলার্স নাগ কোম্পানীর মালিক আমার বাবা রামধন নাগ আশীর্বাদ ক'রে বললেন, তবে কিনা আমার আর ভয়-ভাবনা নেই! সাত-আট বছরে পেকে উঠেছিস তুই। ভেতরটা তোর যত চতুর বাইরেটা তেমনি অমায়িক। আমাকে যদি কখনও তুই ঠকাতে চাস, তোর ঠাকুর-দাদারও সাধ্য নেই যে, আমাকে বাঁচায়! যাই হোক, ছেলেমানুষ বৌমা! ছাপরায় রঘুশরণের ওখানে পৌঁছেই বৌমাকে চিঠি দিস।

কুমার রঘুশরণের ওখান থেকে স্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলুম বৈকি। বলা বাহুল্য, বাবার নির্দেশ বর্ণে-বর্ণে আমি পালন ক'রে থাকি। তবে অনেক সময় বাবার দিকে চেয়ে আমি দুর্ভাবনায় পড়ি! তাঁর এই পঞ্চান্ন বছর বয়স সত্ত্বেও যেরূপ মজবুত এবং পেশীবহুল স্বাস্থ্যের তিনি অধিকারী, তাতে আমার নিজের আশা-ভরসা বড়ই

কম। দুঃখের বিষয়, নাগবংশের লোকেরা বড়ই দীর্ঘজীবি হয়! যাক্—লোকে আমার মনের কথা বুঝবে না।

সেই রাত্রের প্রবল দুর্যোগ বাইরের কালিবর্ণ আকাশ ও পৃথিবীকে একাকার ক'রে দিয়েছিল। কাশী ছাড়বার পর থেকে বৃষ্টি নেমেছে—যেমন সাধারণত নামে শীতকালে। বাইরের মতো ভিতরেও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। থার্ড ক্লাসের বেঞ্চিতে জবুথবু হয়ে বসেছিলুম, কিন্তু গাড়ির ফুটো ছাদ দিয়ে নানাস্থলে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। রাত বারোটা বেজে গেছে। ছোট লাইনের গাড়ি তার স্বভাবগতিতেই ছুটছিল। আমার গরম কোটের গলা পর্যন্ত বোতাম লাগিয়ে তার ওপর গরম চাদর জড়িয়ে মাথা পর্যন্ত ঢেকে মাঝে মাঝে ঢুলছিলুম। টিমটিমে আলোয় লক্ষ্যই করিনি আমরা কত জন যাত্রী এই কামরায় আছি!

সেই ভয়ানক দুর্যোগের বীভৎস অন্ধকারে তন্দ্রার মধ্যে বসে যখন ভাবছিলুম, প্রয়াগে মৌনী অমাবস্যার স্নান সেরে আমাকে দ্রুতগতিতে যেতে হবে মানিকপুরের দিকে—সেই অশুভ লগ্নে যে আমার চরম সঙ্কট এবং অপমৃত্যুর মুহূর্তটি ঘনিয়ে এসেছিল, এটি কল্পনাও করিনি!.

রেলগাড়ির সঙ্গে রেলগাড়ির সংঘর্ষ কেমন, এটি শুধু কাগজেই প'ড়ে এসেছি এতকাল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটনাটা কী প্রকার দাঁড়ায়, মৃত্যু কী ভাবে ঘটে, অপঘাতের সঠিক দৃশ্য কেমন, মালপত্রাদির অবস্থা কী চেহারা নেয়, এক এক স্থলে লুটতরাজ কী ভাবে হয়, অথবা মানুষের ভিতর থেকে হিংস্র জন্তু কীভাবে বেরিয়ে আসে,—এগুলি স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

বোধহয় আমাদের গাড়ি মাধোসিং বা ঝুসি পার হয়ে গিয়েছিল, এমন সময় সহসা আকাশ বিদীর্ণ-করা বজ্রাঘাতের মতো এক প্রচণ্ড আওয়াজ। পর মুহূর্তে কিছু জানবার বা ভাববার

আগে গাড়িতে-গাড়িতে ঠোকাঠুকির কানফাটা শব্দের সঙ্গে আমাদের কামরার জানলা-দরজা-বেঞ্চি-বাঙ্ক্—সবগুলো যেন ময়দানবের অতিকায় হাতুড়ির দ্বারা পলকের মধ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিধ্বস্ত হয়ে গেল !

হঠাৎ চুপ। ঝড়, বৃষ্টি, অন্ধকার দুর্যোগ, পৃথিবীর অস্তিত্ব—সব চুপ! কতক্ষণ—সে কতক্ষণের অনন্তকাল—কিছু মনে নেই আমার !

যখন আমার জ্ঞান ফিরল, আমি নড়তে পারছিনে। জগদ্দল পাথর যেন উপর থেকে আমাকে চেপে ধরেছে। আমি শ্বাসরুদ্ধ হচ্ছিলুম। বাইরে থেকে চাপা কান্নার রোল শুনছিলুম। বৃষ্টির আওয়াজও কানে আসছে।

একখানা পা নাড়াতে পারছিনে, বোধহয় ভেঙ্গেছে! আমার বিশ্বাস, মাথাও ফেটেছে, -নৈলে সুড়সুড়িয়ে এমন তরল পদার্থ গড়ায় কেন? কামরার ভিতরে চীৎকার উঠেছে ঘোর অন্ধকারে এবং গাড়ির ভিতরেও বৃষ্টি হচ্ছিল! শ্বাসরোধকারী সেই অবস্থায় পলকের মধ্যে অনুভব করেছিলুম, আমার পা দুখানা উপর দিকে নড়ছে! আবার কখন যেন আবিল নিদ্রার অতল তলে তলিয়ে গেলুম!

কতক্ষণ পরে সেই ঘুম কী প্রকারে ভাঙ্গলো, আমার মনে নেই। কিন্তু ভিতরের মেয়ে-পুরুষের বুকফাটা আর্তনাদ বোধহয় আমার জ্ঞান ফিরিয়ে দিল। একথা এখন বলা অর্থহীন যে, আমি বলিষ্ঠকায় ব্যক্তি! সে যাই হোক, এক সময় মনের জোর ও দেহের জোর এক সঙ্গে জড়ো করে নিজের ঠ্যাং দুখানাকে আগে আয়ত্তে আনলুম, এবং একখানা হাত অকর্মণ্য হলেও আরেকখানা হাতে সামান্য চোট নিয়ে যেভাবে টাইটানিক্-সংগ্রামে লিপ্ত হলুম, ট্রেন-সংঘর্ষের ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না।

রক্তের ধারার সঙ্গে বৃষ্টির জল কতখানি মিলেছে, অন্ধকারে

কিছু জানা যাচ্ছে না। কিন্তু সেই অভিশপ্ত বৃষ্টি মুমূর্ষু কয়েকজন নরনারীর পক্ষে ওই সাংঘাতিক ঠাণ্ডাতেও যে স্বস্তির কারণ হয়েছে, এটি অনুমান করছিলুম। আমার উঠে দাঁড়াবার শক্তি ছিল না। তবুও এইটি অনুভব করতে পারছিলুম যে, আমার গলাবন্ধ মোটা গরম কোটের বোতামগুলো লাগানোই আছে এবং আমার জহুরী ও ব্যবসায়ী বাবা,—কী যেন তাঁর নামটা ভুলে যাচ্ছি,—তাঁর দরুন প্রায় পৌনে দু'লাখ টাকার জুয়েলারী ও কুমার রঘুশরণের ঘাড়ভাঙ্গা নগদ হাজার পনেরো টাকা আমার কোটের ভিতরের 'জিবটানা' পকেটে এখনও নিরাপদেই আছে। সুতরাং তৃতীয়বার অজ্ঞান হলেও ওগুলো চট ক'রে খোওয়া যাবে না!

হাঁ ক'রে শ্বাস টানবার চেষ্টা করেছিলুম কতক্ষণ অবধি, কিছুই মনে নেই। আমার বিশেষ উত্থানশক্তি ছিল না। চোখ বুজে শুধু ভাবছিলুম, বাবা কাগজ পড়েন না এবং তিনি হয়ত আমার মৃত্যু সংবাদও পাবেন না! কিন্তু সবই আমি একে একে ভুলে যাচ্ছিলুম! আমার সতীসাধ্বী স্ত্রীর মুখখানা একেবারে মনেই পড়ছে না!

কখন্ বৃষ্টি থামল এবং দিনের আলো ঈষৎ ফুটল, আমি জানিনে। আন্দাজে বুঝলুম, এখনও বেঁচেই আছি! এবার কানে শুনলুম হিন্দুস্থানী নারীকণ্ঠ: মহেন্দর, ও মহেন্দর! ইয়া, ভাগোয়ান তুহেকো লে লিয়া! মহেন্দর, সাড়া দো মহেন্দর!—একটি স্ত্রীলোক কাঁদছিল ডুকরিয়ে-ডুকরিয়ে।

সম্মিলিত আর্তরোলের মধ্যে আবার সেই কণ্ঠস্বর ডুবে গেল।

এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আমাদের বগিখানা লাইনচ্যুত হয়ে পাশের নালার মধ্যে ছিটকিয়ে পড়ে এবং এক মস্ত আমগাছে ধাক্কা খেয়ে কাৎ হয়ে যায়। প্রভাতকালে যখন একদল

লোক এসে কুড়ুল দিয়ে দরজা-জানলা কাটতে লাগল এবং ছাদের দিক থেকে উঠে আমাদের একে একে নামিয়ে জল-কাদায় শোয়ালো, তখন শুনলুম আমাদের কামরায় তেরোজনের মধ্যে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে!

আবার আমার চোখ বুজে এল। কিন্তু চোখ বুজবার আগে কাকে যেন বলতে পেরেছিলুম, হ্যাঁ, একটা প্লাস্টিকের হ্যাণ্ড্ব্যাগ, দুখানা কম্বল, গরম র‍্যাপার···বালিশ···ফিতে বাঁধা ডার্বি জুতো এক জোড়া··· ··

ধুতিখানার একটা অংশ বোধহয় আমার কোমরেই ছিল।

অনেক বেলায় যখন 'ঘুম' ভাঙ্গলো, চেয়ে দেখি একখানা ছোট ঘরে আমি। একখানা হাতে, মাথায় ও পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। কী যেন আমাকে খাইয়েছে, মুখে ভুর্‌ভুর্‌ করছে গন্ধ, ঘরের কড়ি-কাঠ যেন আনন্দে থরথর করছিল। মুখের দিকে ঝুঁকে পড়েছে এক শাদা পোশাক পরা মেয়েছেলে! প্রসন্ন এবং স্নেহসিক্ত কণ্ঠে শুধু সে বলল, অব থোড়া আচ্ছা লাগতা হ্যায়, ভাই সাব?

সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট, তবু বললুম, হাঁ······

ওই ছোট ঘরটিতেই অন্য চারপাইতে পড়ে রয়েছে একটি মেয়েছেলে, এবং তারও মাথায় ও হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সম্ভবত ওই মেয়েছেলেটারই আর্তকণ্ঠের কাতরোক্তিতে আমার আবিল চেতনাটা সজাগ হয়ে উঠেছিল,—মহেন্দর খতম হো গৈ! ভাগোয়ান মহেন্দর কো লে লিয়া! ম্যায় কেইসে ঘর লোটেঙ্গে, ভাগোয়ান!

সেই মেয়েছেলেটাই বটে! আমি চুপ ক'রে রইলুম।

নার্সের কাছে এই প্রথম জানতে পারা গেল, এখানে আজ আমাদের তৃতীয় দিন সকাল! অর্থাৎ গত তিন দিন আমার জ্ঞানগম্যি বিশেষ ছিল না। একটু চমকিয়ে চেয়ে দেখি, আমার

গরম কোটটা সযত্নেই আমার পাশে রাখা,—এবং ভিতরের জিবচেন্ ছটি টানাই আছে। এক সময় বাঁ-হাতে পকেট ছটো টিপে দেখলুম, না, সব ঠিকই রয়েছে। বাঁচলুম!

নার্স বোধহয় বুঝতে পারল আমার অস্বস্তি। সে আমার কাছে এসে সহাস্যে হিন্দিতে বলল, আপনার হ্যাণ্ডব্যাগ, ছখানা ভিজে কম্বল আর বালিশ—সব ঠিক আছে। তবে জুতো এক পাটি পাওয়া যায় নি—।

মনটা কেঁদে উঠল। জীবনটার বদলে জুতোটা গেল। অবশ্য এ বছর জামাইষষ্ঠীতে জুতো জোড়াটা পেয়েছিলুম!

আমাব এপাশের খাটিয়ায় প'ড়ে আছে এক বাবাজি। লোকটির বয়স বেশি নয়, কিন্তু পরনে গেরুয়া। গত বাত্রে বোধহয় ওরই বিকারগ্রস্ত প্রলাপ এক সময় আমার কানে ঢুকছিল। এবার আমার ইশারায় নার্স এগিয়ে এসে বলল, আপনারা তিনজন একই কামরায় ছিলেন। ওই মহারাজটির মস্তিষ্কবিকৃতির ভয় ছিল কাল অনেক রাত পর্যন্ত। এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না!

একটু পাশ ফিরে মহারাজের সৌম্য চেহারাটা দেখলুম। লোকটাকে অঘোরে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। মুখ ফিবিয়ে এবার আমি প্রশ্ন করলুম, কিন্তু আমার মস্তিষ্ক সম্বন্ধে আপনার ধারণা কিরূপ?

নার্স হেসে ফেলল। অতঃপর ইংরেজিতে বলল, আপনি খুব ভাল আছেন।

ওপাশের মেয়েছেলেটা তেমনিভাবেই তার মৃত মহেন্দরের জন্য ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে দেখে নার্স-মহিলা এবার তার কাছে গিয়ে গায়ে হাত রেখে প্রশ্ন করল, বহিনজি, মহেন্দর কে তোমার?

মেয়েছেলেটা জবাব দিল, আমার পুরনো বুড়ো চাকর! আজ

আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। আমি আজ সত্যিই যেন আমার বাবাকে হারালুম।

পুরনো চাকর! তারই জন্য তিন দিন ধরে অবিশ্রান্ত কান্না!

এবার আমি একটু অবাকই হলুম। পুরনো লোক, হোক না কেন বাপেরই মতন স্নেহশীল, কিন্তু চাকর ছাড়া ত' কিছু নয়। এ যেন একটু মাত্রাই ছাড়িয়ে যাচ্ছে। নার্সকে ডেকে বললুম, আচ্ছা, হাসপাতালে ত' মেয়েছেলেদের জন্য আলাদা ঘর থাকে।

নার্স বলল, এটা হাসপাতাল ঠিক নয়, এমারজেন্সি ক্যাম্প কবা হয়েছে। এই মেয়েটিকে শীঘ্রই ছেড়ে দেওয়া হবে।

আমি? আমাব ব্যবস্থা কী হচ্ছে?

আপনি হাঁটতে পারলেই ছাড়া পাবেন। আপনার কেসও বেশ উৎসাহব্যঞ্জক।—এই বলে নার্সটি মহারাজের দিকে এগিয়ে গেল, এবং তাঁর ওপব একটু ঝুঁকে প্রশ্ন কবল, কিছু বলবেন?

মহাবাজ ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, আমি মঠে ফিরব'

বুঝলুম লোকটা হিন্দুস্থানী। কিন্তু ওই তিনটি শব্দ মাত্র উচ্চারণ কবতে করতেই লোকটা আবাব ঘুমিয়ে পড়ল!

এ ঘরটিতে আমরা মোট এই তিনটি আহত প্রাণী। ঘটনাচক্রে অপরিসীম দুর্ভাগ্যেব মধ্যে আমরা একত্রিত হয়েছি মাত্র। কিন্তু একজনেব কাছে অন্যজন সম্পূর্ণ অজানা। আন্দাজে বুঝে নিয়েছি আমরা ওই হতভাগ্য ট্রেনের একই কামবার যাত্রী ছিলুম বটে, কিন্তু সেই কামরার স্বল্প আলোয় ওই ঠাণ্ডা রাত্রে কেউ কারোকে লক্ষ্যও করিনি!

নার্সটি কী কাজে বেরিয়ে যাবার পর আমি ওই বুকচাপা ঘরটার মাঝখানে বিছানাটার উপর কিছুক্ষণ উঠে বসবার চেষ্টা পেলুম। আমার ধারণা, দ্বিতীয়বার ট্রেন সংঘর্ষ ছাড়া আমার মৃত্যু সম্ভব নয়! এ ঘরে আমরা তিনটি রোগী, এবং তিনজনেরই মাথায়

ব্যাণ্ডেজ। সুতরাং তিনজনেই আমরা তিনজনের সঠিক চেহারাটা ঠাহর করতে পারছিনে। এক সময় ফিরে দেখি, বাবাজি চোখ খুলেছেন। কিন্তু সে যেন মাছের চোখ,—পলকও পড়ে না এবং তারাও নড়ে না। সম্ভবত সাধু-সন্ন্যাসীর দৃষ্টি এমনিই একাগ্র হয়। লোকটার চেহারাটা সুশ্রী এবং যদিও নাক মুখ থেঁৎলিয়ে গেছে দুর্ঘটনায়, তবুও মুখ ও চোখের অভিব্যক্তিটি শান্ত ও প্রসন্ন।

আমার স্ত্রী তরুলতার ধারণা, আমি পর নারীর দিকে সহসা চোখ তুলে তাকাইনে। ঠাকুমা আমার আজও জীবিত। তিনি বলেন, তাঁদের কালে পরপুরুষের দিকে সতীনারীর চোখ পড়লে সেই মেয়ে নিজের চোখের পল্লব ছিঁড়ে ফেলত। কিন্তু আমি স্ত্রীর বিশ্বাস অক্ষুন্ন রাখার জন্য আর কতকাল শুধু শূন্যের দিকে চেয়ে সময় কাটাব? অতএব এক সময় পাশের হিন্দুস্থানী মেয়েটার প্রতি সহসা চোখ পড়ল। হঠাৎ আমি যেন জড়োসড়ো হয়ে গেলুম। মেয়েটা বা স্ত্রীলোকটা কখন যেন তার কান্না থামিয়েছে খেয়াল করিনি, কিন্তু সে যে কতক্ষণ অবধি নিঃশব্দে আমার দিকে অপলক চক্ষে চেয়ে রয়েছে, এও আমি বুঝতে পারি নি।

চোখটা অন্যদিকে বুলিয়ে আমি আবার শুয়ে পড়লুম। গায়ে কাঁটা দিয়েছিল! নার্স এসে যদি শোনে পাশের বিছানার দিকে আমার কুদৃষ্টি পড়েছিল, তাহলে কে জানে, আমার দ্বিতীয় ঠ্যাংখানাতেও হয়ত ব্যাণ্ডেজ উঠবে! দুর্গা, শ্রীহরি,—আমি চোখ বুজে অসাড় হয়ে রইলুম।

কিন্তু সম্মুখে বজ্রাঘাত হলেও আমি এত চমকিয়ে উঠতুম না, যত উঠলুম এই নারীর চাপা ও মিষ্ট কণ্ঠস্বরে,—বাবু?

হ্যাঁ, আমাকেই ডাকছে! চোখ চেয়ে তাকালুম এবং ওর দিকেই মুখ ফেরালুম। হিন্দুস্থানী মুলুকে আমি মাল বেচাকেনা করি বহুদিন থেকে, সেজন্য কষ্ট করেই আমাকে কাজ-চালানো

হিন্দি শিখতে হয়েছে। মেয়েটা আমার দিকে তার সজল চোখ তুলে বলল, ওই বুড়ো চাকর ছাড়া আমার আর কেউ নেই!

আমার মুখে যেন কথা ফুটতে চাইছিল না। কিন্তু আমার সহানুভূতিসূচক ঘাড় নাড়া দেখে স্ত্রীলোকটি পুনরায় বলল, মহেন্দর আমাকে পাহারা দিয়েই রাখত। আমি বেরিয়েছিলুম তীর্থ করতে। কার্তিকী পূর্ণিমায় কাশী গিয়েছিলুম। ছিলুম দু'মাসেরও বেশি। মহেন্দর আমার রান্নাবান্না বাজার-হাট সব করত। আমার নাম মোতীবাই।

তা হবে। আমার ঔৎসুক্য বড়ই কম। মেয়েছেলে একবার তার আত্মকাহিনী ফেঁদে বসলে মাত্রাজ্ঞান হারায়! আমার স্ত্রী সতেরো বছরে বৌ হয়ে শ্বশুরবাড়ি আসে, সে আজ প্রায় সাত বছর হতে চলল। কিন্তু তার বাল্য ও কৈশোর কাহিনী আজও আমার শোনা শেষ হয় নি। সব চেয়ে বিপদ, স্বামীর ঘুমের আগে স্ত্রী যখন আত্মকথা ফেঁদে বসে! যাক্ সেসব ব্যক্তিগত কথা।

পুনরায় শুয়ে পড়ব কিনা ভাবছি এমন মুহূর্তে শ্রীমতী মোতীবাই আবার ডাকল। বলল, বাবু, আমার ভাগ্যে যত দুঃখই থাক্, কিন্তু রেলগাড়ির এই ঠোকাঠুকিতে আমার সকল বিপদ কেটে গেছে। মেরা দিল্ বহুত খুস হোগী।

অ্যাঁ? কী বললে? খুব খুশী?--স্তম্ভিত হয়ে একবার আমি ওর দিকে এবং একবার এপাশ ফিরে সাধুবাবাজির দিকে তাকালুম। আমার বাম ও দক্ষিণে দুজনের মধ্যে কা'র মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে, সেটি ভাববার কথা।

হ্যাঁ, আমি খুব খুশী।—মোতীবাই বলল, দুটো লোক আমাকে কী দুঃখ দিচ্ছিল তিন মাস ধ'রে বল ত'? সেই নাগপুর থেকে আমার পিছু ধাওয়া করেছিল! প্রথম দিকে ভেবেছিলুম, আমার গয়নাগাঁটি কি টাকাকড়ি ছিনিয়ে নিতে চায়! কিন্তু জবলপুরে

শঙ্করনাথজী দর্শন ক'রে আসবার পর থেকেই দেখছিলুম, ওরা আমাকেই ছিনিয়ে নিতে চায় মহেন্দরের কাছ থেকে!

এবার যেন আমি একটু ঔৎসুক্য বোধ করছিলুম। শুধু বললুম, তোমাব মা বাবা আত্মীয়-পরিজন—তাঁবা কোথায়?

প্রশ্নটা মোতীবাই যেন এড়িয়ে গেল। বলল, মহেন্দর বুড়ো হলে কি হবে, সেও ঝাঁসির লোক,—লড়াই করতে জানে। উচিতমতো শিক্ষা দিয়েছিল সেদিন।

কিন্তু রেল গাড়িব ঠোকাঠুকিতে তুমি আনন্দ পেলে কেন?

মোতীবাইয়ের গায়ের রংটা ঈষৎ শ্যামবর্ণ। মাথায় তার ফেট্টি বাঁধা, সেজন্য তাব মুখশ্রীব বর্ণনাটা আমাব ঠিক আসছে না। তবে তার দুখানা আনগ্ন বাহু এবং তার শবীরেব অন্যান্য অংশের কথা যদি কখনও স্ত্রীর কাছে সাজিয়ে-গুছিয়ে বলবার চেষ্টা পাই, তাহলে অন্তত একটি রাত্রি তিনি আমাব পাশে শোবেন না, এটি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি। সুতরাং আমার ঈষৎ পুলকিত মনের কথাটা আপাতত চাপাই থাক।

মোতীবাই তার নিজের ভাষায় বলল, হ্যা আনন্দ বৈকি। ওই লোকদুটোও যে ছিল আমাবই কামরায়। তোমরা সবাই বেহুঁস হয়েছিলে, লেকিন্ আমি স্বচক্ষে দেখেছি, আমার মহেন্দরের সঙ্গে ওই গুণ্ডা দুটোব কাটা-ছেঁড়া মুর্দাও গাদিব মধ্যে ছুড়ে ফেলা হ'ল।

এখন কি তুমি একদম একা?

বিলকুল।—এই ব'লে মোতীবাই তার হাত দুখানা তুলে মাথার ফেট্টিটা গুছিয়ে নিল—যে দৃশ্যটা লক্ষ্য ক'রে পলকের মধ্যে আমি সাধুবাবাজির দিকে মুখ ফেরালুম।

বাবাজি কোন্ দিকে যেন চেয়ে রয়েছেন অপলক দৃষ্টিতে। সেই মাছের চোখ। দৃষ্টি অনড় এবং অচপল। দাড়ি কামানোর

অভাবে আমারই মতো বাবাজির অবস্থা। গেরুয়াধারীর জাতি ও সম্প্রদায় চেনা যায় না, একথা জানি। বিশেষ ক'রে ন্যাড়া মাথায় পাগড়ি, দাড়ি-গোঁফ কামানো, পরনে রঙ্গীন বস্ত্র—এসব যদি হয়। লোকটি জেগে উঠেছে দেখে আমি মিষ্ট কণ্ঠে হিন্দীতে প্রশ্ন করলুম, স্বামীজি, আপনি কোন্ মঠের সাধু?

এবার সেই মাছের চোখ ফিরল আমার দিকে। মৃদু, স্নিগ্ধ কণ্ঠে তিনি শুধু জবাব দিলেন, নিরঞ্জনী!

সত্য বলতে কি, সৌম্যদর্শন সাধুর দুই দীর্ঘায়ত চক্ষুর প্রসন্নতা লক্ষ্য ক'রে আমি একটু মুগ্ধই হলুম। মোতীবাই আমার মনে ক্ষণকালের জন্য যে ইতর চিন্তাবিভ্রম ঘটিয়েছিল, এই মায়াবাদী বৈদান্তিক সন্ন্যাসী যেন একটানে সেখান থেকে তুলে পুনরায় আমাকে পতিগতপ্রাণা স্ত্রীর কাছে পৌঁছিয়ে দিল। মনে মনে এই শুচিশুদ্ধ সাধুর প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মোতীবাইয়ের দিক থেকে সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে সাধুর দিকে পাশ ফিরলুম।

এমন সময় নার্স-মহিলা খাদ্যসামগ্রী নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তিনি চেয়ে দেখলেন, স্বামীজি এখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ, এবং তাঁর অবস্থাটা আয়ত্তের মধ্যে এসেছে। সকলের আগে তিনি স্বামীজির কাছে গিয়ে পাশের ছোট টেবিলে তাঁর দুই হাতের দুই ডিস নামালেন। তা'র একটিতে গরম-গরম সুপ। অন্যটিতে সম্ভবত কমলালেবুর রস। এর পর আরও দুজন এই এমারজেন্সি ক্যাম্পের লোক আমাদের জন্য খাবার নিয়ে হাজির হ'ল। আমার বা মোতীবাইয়ের দাঁত-মুখ থেঁতো হয় নি, সুতরাং আমরা চিবিয়ে খাবার খেতে পারি। কিন্তু স্বামীজির কথা আলাদা। তাঁর জন্য সবই লিকুইড্—দুধ, বার্লি, রস, সুপ, প্রভৃতি।

স্বামীজি আহার্য বস্তু গ্রহণের আগে একবার চোখ বুজে তাঁর দেবতাকে স্মরণ করলেন, তারপর সুগন্ধা সুপের দিকে তাকিয়ে

তাঁর আহত মুখগহ্বর একটু চেপে হিন্দিতে বললেন, সুপে পেঁয়াজের কোনও ছোঁয়াচ নেই ত' ?

নার্স চমকিয়ে উঠল। বলল, আপনি কি মাংসের সুপ খান না ? আমার বিশ্বাস ওটায় বোধহয় পেঁয়াজের ছোঁয়াচ আছে !

স্বামীজির মুখখানা বিবর্ণ ও পাণ্ডুর হয়ে এল। আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, আমি সম্পূর্ণ শাকাহারী, এসব কখনও স্পর্শ করিনে।

বললুম, কিন্তু পেঁয়াজ কি সব্জী নয় ?

অনেক সব্জী আছে যা উত্তেজক, যা স্বভাবের মধ্যে উগ্রতা আনে। আপনারা এসব নিয়ে যান্।—স্বামীজি তাঁর হাতখানা গুটিয়ে নিলেন। নার্স-মহিলা অপ্রতিভ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

যেহেতু সুপের ছোঁওয়া লেগেছে কমলালেবুর বসে, সেই কারণে সবই স্বামীজি একে একে বরখাস্ত করলেন। তাঁর মুখে কোনও অপ্রসন্নতা নেই, বরং শান্ত ও শিষ্ট। লোকটা বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘকায়, সুপুরুষ বলতে বাধে না। অতঃপর এই ব্যক্তির সামনে আমিষ খাদ্য গ্রহণ করতে গিয়ে আমি যেন অত্যন্ত আড়ষ্ট ও অপরাধ বোধ করতে লাগলুম। কিন্তু আমি ত' আর বাবাজি হয়ে উঠিনি। সুতরাং আবার মোতীবাইয়ের দিকে ফিরে কোনওমতে ওরই মধ্যে একটু আড়াল ক'রে একে একে ওই রুচিকর সুখাদ্যগুলি ধীরে ধীরে গিলতে লাগলুম।

এর পর স্বামীজির জন্য এল টমাটো সুপ দুধ ইত্যাদি। নার্স শুধু জানিয়ে গেলেন, আপনাদেব তিনজনের শীঘ্রই ছুটি হয়ে যাবে !

॥ ২ ॥

হাতখানা সেরে এসেছে, একটু একটু হাটছি খুঁড়িয়ে, মাথার ব্যাণ্ডেজ এখন ছোট ক'রে বাঁধা। নিজকে সুস্থ বলতে এখনও বাধে। সেই বীভৎস দুর্যোগের রাতটার কথা ভাবলে এখনও ভয় করে। সে যাই হোক, গত দুই সপ্তাহে আহারাদির তালিকাটা ছিল ভাল। ভারত সরকারের বিবেক দংশনের ফলে আমার স্বাস্থ্যেরও বোধহয় উন্নতি ঘটেছে!

কিন্তু শারীরিক অবস্থাটা মানিকপুর যাবার পক্ষে এখনও অনুকূল নয়। বাড়ি ফেরা যাবে না, এবং ট্রেন অ্যাক্সিডেণ্টে আমিও যে জড়িত, একথা এখন জানাবারও দরকার নেই। যদি না বাঁচতুম, সে আলাদা কথা। গতকাল বাবাকে চিঠি দিয়ে আমার কর্মসাফল্যের কথা জানিয়েছি। আপাতত দু'চারদিন আমি এলাহাবাদেই বিশ্রাম নেবো।

এমারজেন্সী ক্যাম্পের ঘরটির বাইবে পা বাড়ালেই হু-হু করছে মাঠ-ময়দান। দূরে-দূরে রেল-কোয়ার্টার, খেলার মাঠ, তার ওদিকে এঞ্জিন শেড। চারদিক নিরিবিলি। ক'দিন থেকে একখানা খাটিয়ার প'ড়ে এখানেই রোদ পোয়াচ্ছিলুম। নার্স আমাকে দিয়েছে দুটো পাজামা এবং দুটো শার্ট। মহামান্য ভারত গভর্নমেণ্ট বিশেষ একটি বার্তাযোগে আমাকে জানিয়েছেন, তাঁরা আমাকে এক জোড়া জুতো দেবেন, এবং অতঃপর ক্ষতিপূরণস্বরূপ কিছু নগদ টাকা! তবে যেহেতু আমি থার্ড ক্লাসের তীর্থযাত্রী ছিলুম, সেইজন্য টাকার অঙ্কটা কিছু কম। যাবার আগেই টাকা, পোশাকপত্র, কম্বলাদি এবং তৃতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ির পাস পেয়ে

যাব। আমাদের আঘাত-অপঘাতের ক্ষতিপূরণ পাঁচশ' টাকার বেশি নয়। যাক্ আমার রাহা খরচটা উঠে যাবে।

গায়ের ওপর গরম কোটটা চড়িয়ে বিকেল বেলা বাইরে একটু বসেছিলুম, এমন সময় দেখি এই ক্যাম্পেরই এক ভূতুড়ে ঝির সঙ্গে শ্রীমতী মোতীবাই কোথা থেকে ধীর গতিতে ফিরছে! আজ প্রথম চোখে পড়ল, স্ত্রীলোকটি বোধহয় আমাব চেয়ে বয়সে কিছু ছোটই হবে! তবে হিন্দুস্থানী মেযের বাঁধন বড় মজবুত। ওকে স্নান করিয়ে নতুন পরিচ্ছদ পরানো হয়েছে। হাতের ব্যাণ্ডেজ খোলা। কপালের কোণে ফেট্টির বদলে ছোট একটা পটি দেখা যাচ্ছে। মুখখানার উপব থেকে রুগ্নতা এবং অপঘাতজনিত সেই ধূলিরুক্ষতা একদম মুছে গেছে। সমস্ত চেহারাটায় এসেছে সতেজ একটি ভাবের সঙ্গে সুশ্রী লাবণ্য। গায়েব রংটা যেন গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী সঙ্গমের সোনালি পলিমাটির মতো। আমি স্বভাবতই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলুম।

মেয়েটা ঘবে ঢুকল না। এল আমার কাছাকাছি। সপ্রতিভ কণ্ঠে বলল, একটা কথা বলছিলুম, ফটিকজি।

ফিরে তাকালুম। মোতীবাই পুনরায় বলল, তুমি ত' জানতে মৌনী অমাবস্যায় প্রয়াগে 'আস্নান' করব বলে এসেছিলুম, কিন্তু তা হয় নি। এদিকে এখন 'পৌর্ণমাসীর' আর দেরি নেই,—তুমি আমাকে একটু সাহায্য করবে?

গলা ঝেড়ে বললুল, আমি? আমি তোমার কোন্ কাজে লাগব?

এই সামান্য একটু দেখাশুনা,—হাজার হোক আমি মেয়েছেলে ত'। যদি একটু আমার সঙ্গে সঙ্গে তুমি থাকতে, আমার পুজো-পার্বণ সবই সহজে হয়ে যেতো।

কতকটা নারাজ হয়ে আমি বললুম, অনেক অসুবিধে আছে

বুঝতেই পার। তা ছাড়া এ আমার চেনা মুলুকও নয়। তার ওপর ধরো তুমি,—মানে, লোকে বলবে কী?

না না, সে আমি ভেবে দেখেছি—মোতীবাই বলল, প্রয়াগে আমাব সব চেনা। এখানে আমি পড়াশুনো করেছি অনেক বছর। বহু সম্ভ্রান্ত সমাজে আমার আনাগোনা ছিল। এখানকার রেডিওতে কত গান করেছি, কত সভা-সম্মেলন সাজিয়েছি—

ওরে বাবা, আমি একেবারে হতভম্ব! মোতীবাইয়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিলুম। হঠাৎ চাকরাণী যেন রাজরাণী হয়ে দেখা দিল! ছুঁড়িটা বলে কি? এ যেন একেবারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন! ভানুমতির খেল! ঠাকুমার কথা মনে পড়ছিল। আমি তাঁর একই নাতি। কিন্তু পাছে পথে-ঘাটে বা এদেশে-ওদেশে আমার চারত্রের শুচিতা নষ্ট হয় এজন্য তিনি প্রায়ই বলেন, বুঝলি ফটিক, ডাকিনী-মায়াবিনী কিছু গাছে ফলে না! মেয়েমানুষের ভাবভঙ্গী একেই ত' ধাবালো, তার ওপর আবার যদি লেখাপড়ার শান্-পালিশ পড়ে তবে আর রক্ষে নেই, ভাই! তুই ভাবছিস তুই যাচ্ছিস এগিয়ে, কিন্তু ও যে তোকে হিঁচড়ে টানছে—সেটা তুই বুঝতেও পারবিনে!

কতক্ষণ আমি চুপ করে রইলুম। কিন্তু সেও একভাবে দাঁড়িয়ে রইল আমার জবাবেব অপেক্ষায়। এই সময় আমিই আবার সেদিনকার মতো জিজ্ঞাসা করলুম, তোমাব মা-বাবা-ভাই-বোন-পরিজন—তাঁরা কোথায়?

মোতীবাই একটু থমকিয়ে দাঁড়াল। পরে বলল, তোমার কাছে সাহায্য পাব কিনা, আগে সেই কথা বলো?

কিন্তু এই যে তুমি বললে এখানে চারদিকে তোমার চেনা মহল?

আমার কথাটা ভাল ক'রে তা'র কানে গেল না, কারণ সহসা

সে ঘরের ভিতরে কী যেন লক্ষ্য করে পলকের মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল।

এমন সময় সেই ভূতুড়ে বুড়ো ঝিটা আমাদের বিকেলের চা ও জলখাবারের প্লেটগুলি নিয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল। মোতীবাই আরেকবার ঘরের মধ্যে তাকিয়ে একটু হাসল। পরে বলল, তুমি কি রাত্তিরে জেগে থাকো, ফটিকজি ?

রাত্তিরে ? কই না ?

নীল আলোটা সারারাত আমাদের মাথার দিকে জ্বলে, তুমি দেখোনি ?

বললুম, লক্ষ্য করিনি।

মোতীবাই হাসিমুখে থামল। পরে ঈষৎ চাপা গলায় বলল, তোমার ওই স্বামীজিকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছে ডাক্তার, ও কিন্তু ঘুমোয় না !

তুমি কেমন ক'রে জানলে ?

মোতীবাই তার অতি মিহি আসমানী রংঙের শাড়ির আঁচলে মুখের হাসি চেপে ঘরে গিয়ে ঢুকল !

আমার মাথার মধ্যে কী যেন একটা চন্ ক'রে উঠল। মোতীবাই কী বলতে গেল এবং কতটুকু চেপে রইল, কিছুই অনুমান করতে না পেরে আমি শূন্যের দিকে তাকালুম। সন্ধ্যার সেই শূন্য আকাশে তখন শুক্লপক্ষের নবমী কি দশমীর চাঁদ উঠেছে।

আমার ছুটি হয়ে গেল সেদিন মধ্যাহ্নভোজনের পর। যা কিছু আমার পাওনা আমি সেসব গ্রহণ করতে অস্বীকার করলুম। শুধু নিলুম টাকাটা,—ওটায় আমার দরকার ছিল। আল্‌গা পা-জামা ও শার্ট-কোট চড়িয়ে বেরিয়ে এলুম। পোশাকটা আর একটু শোভন হওয়া দরকার।

মাঠে বেরিয়ে কতকটা হেঁটে গেলে তবে হয়ত একখানা সাইকেল রিক্সা পেতে পারি—এই মনে ক'রে এগোতেই দেখি, মোতীবাই আসছে পিছনে-পিছনে। স্বামীজির ছুটি হয়েছে কিনা খবর নিই নি, এবং তার দরকারও হয় নি। আসবার সময় দেখে এলুম, তিনি চারপাইয়ের ওপর পড়েই আছেন।

আমার ব্যাগ আর কম্বল দু'খানা নিয়ে ক্যাম্পেরই একটি চাকর সঙ্গে-সঙ্গে আসছিল। কিন্তু পিছন থেকে হনহনিয়ে মোতীবাই এগিয়ে এল। বলল, ফটিকজি, তুমি ভেবোনা কিছু, আমি তোমার যা হয় একটা ব্যবস্থা করে দেবো। তবে আমি চাইছিলুম তুমি একটু আমার সহায়তা করবে। আমি একা মেয়েছেলে ত'!

মোতীবাই জানত, মানিকপুরের দিকে যাবার আগে আমি কয়েকদিন কোথাও বিশ্রাম নিতে চাই। পাখানা সম্পূর্ণ সারবে, মাথার ঘাটা মিলোবে এবং হাতখানাতেও আরো কতকটা জোর পেয়ে যাব। এখনও আমি খুবই দুর্বল এবং ক্লান্ত। কিন্তু মোতীবাইয়ের কথাটা শুনে আমি হাসব কি কাঁদব ঠিক বুঝলুম না। বললুম, তুমি ত' চাইছিলে সেদিন আমার সাহায্য। হঠাৎ আজ আবার একি বলছ? তুমি আমার কী ব্যবস্থা কববে? তা ছাড়া তুমি যাবে একদিকে, আমি যাব আরেক পথে।

মোতীবাই বলল, তুমি বুঝি ভয় পাচ্ছ আমার জন্যে?

বললুম, তুমি লেখাপড়া জানা মেয়ে,—বুঝতেই পারো, কেন ভয় পাচ্ছি! আমার ঠিক এ ধরণের অভ্যাস নেই। আর তাছাড়া সত্যি বলতে কি, তুমি এক দেশের, আমি অন্য দেশের। কেউ কারুকে চিনিনে, জানিও নে। এর ওপর আবার তুমি জোয়ান মেয়েছেলে! কোন্ দিক থেকে কোন্ বিপদ ঘটবে, কেউ কি জানি?

ক্যাম্পের চাকরটা হঠাৎ থমকিয়ে দাঁড়িয়ে জানাল, এইখানেই রিক্সা পাওয়া যাবে। সে আর যাবে না।

বলতে বলতেই লোকটা আমার বিছানা ও ব্যাগ একপাশে রেখে বিদায় নিয়ে চলে গেল। তার দায় ঘুচলো।

নিতান্ত মৌখিক সৌজন্য রক্ষার জন্য এবার বলতেই হ'ল, তোমার গাঁটবি কোথা গেল, মোতীবাই ?

মোতীবাই পিছন দিকে একবার তাকিয়ে ঈষৎ মলিন মুখে ব'লল, আসছে এখনই। আমি ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে এসেছি।

ভয় পেয়ে!—আমি সবিস্ময়ে বললুম, কিসেব ভয় ?

মোতীবাই সহসা জবাব দিল না, কিন্তু এক একবাব পিছন ফিবে বোধ করি তা'র গাঁটবিটাব জন্য উদ্বিগ্ন হচ্ছিল। মেয়েটার মুখখানাব দিকে লক্ষ্য ক'রে এবার আমি একটু দুঃখিতই হলুম। এখন বেলা আড়াইটে বাজে। আমি যাব শহরে, ভাল হোটেলে একখানা ঘর নেবো। কিন্তু যে মেয়েটাব সঙ্গে এতদিন একঘরে একাহত অবস্থায় বাস কবেছি, সে ত' আমাব দুর্ভাগ্য ও দুর্দশার সতীর্থ। সন্দেহ নেই, আমার এতদিনের আচবণের মধ্যে তা'র প্রতি প্রচ্ছন্ন একটি অবমাননাকর অবহেলা ছিল, এবং সে সেটি উপলব্ধি করেও আমার প্রতি অপ্রসন্ন হয় নি। সুতরাং আমি একটু অনুতপ্ত কণ্ঠেই বললুম, বাস্তাঘাটে একলা তোমাব বয়সী মেয়েছেলের ভয়-ডর ত' হওয়াই স্বাভাবিক। তোমার সঙ্গে মহেন্দব থাকলে ত' ভাবনাই ছিল না। তা ছাড়া গুণ্ডা দু'জন মরে তোমাকে বাঁচিয়েছে। তোমার এই আঁটসাঁট স্বাস্থ্যের জন্য, কে জানে,—আবার কোনও ধর্মের ষাঁড় পিছু নিতে পাবে!

আমার কথা শেষ হবার আগেই মোতীবাই ব'লে উঠল, ওই যে আমার বিছানার মোটটা আসছে!

তুমি টাকাকড়ি পাও নি ?—প্রশ্ন কব্‌লুম।

পেয়েছি বৈ কি। ওই পুঁটলির মধ্যেই আমার সব আছে।

—মোতীবাই আঁচল দিয়ে এবার নিজের চোখ দুটো মুছে নিল। মহেন্দরের উল্লেখমাত্রই সে আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়।

বিছানার পুঁটলি নিয়ে একটা লোক যখন এসে হাজির হ'ল, মোতীবাই তখন পেটকাপড়ে বাঁধা গেরোটি খুলে দুটি টাকা বের ক'রে লোকটার হাতে দিয়ে বলল, চন্দনভাই, এক রিক্সা ত' লানা হ্যায়।

মাঝপথে আমি বললুম, আচ্ছা মোতীবাই, তুমি যখন ধরেছ, তখন আমি তোমাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছিয়ে তোমার নিরাপদ ব্যবস্থা ক'রে তবে বিদায় নেবো, কেমন? তা হলে আমার জন্যেও অমনি আরেকখানা রিক্সা আনতে বলো?

লোকটা এদিক-ওদিক লক্ষ্য রেখে বড় সড়কের দিকে চলল। আমার পায়ের আঘাতের ব্যথাটা কমেছে অনেকটা, কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলে বা বেশিক্ষণ হাঁটলে এখনও অত্যন্ত কনকন করে। কোথাও বসতে পারলে বাঁচতুম। কিন্তু বিশ্রাম বা বসবার স্থল কোথাও দেখছি নে। মোতীবাই সেটি অনুমান করেই বোধহয় এদিকে-ওদিকে বার বার তাকাচ্ছিল। কিন্তু তার চোখে-মুখে এমন এক ধরনের উদ্বেগ লক্ষ্য করছি, যেটি ভিন্ন রকমের। মেয়েদের মূল প্রকৃতি দেবা ন জানন্তি—একথা না হয় সত্য। কিন্তু গত কয়েক-দিন থেকে তাকে যেন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, যদিও বুঝবার চেষ্টাও আমার নেই।

এমন সময় দূরে লোকটাকে দেখা গেল, একখানা টাঙ্গা নিয়ে ফিরছে। স্পষ্টত, দুখানা রিক্সা সে পায়নি। গাড়ি এসে কাছে দাঁড়াতেই মোতীবাই নিজেই আমাদের মালপত্র টপাটপ তুলে দিল, এবং আগেভাগে নিজেই পিছনের সীটে বসল। আমার পায়ের যা অবস্থা তা'তে ছোট পাদানির ওপর একখানা পা উঁচুতে তুলে নিজকে হ্যাঁচকা দিয়ে ড্রাইভারের পাশে উঠে বসা সম্ভব

ছিল না। সুতরাং বাধ্য হয়ে কোনও মতে মোতীবাইয়ের পাশে উঠে বসলুম।

মোতীবাই ঈষৎ ব্যস্ত হয়ে গাড়োয়ানকে বলল, জল্‌দিসে বঢ়া লো জী! প্রয়াগঘাটকো উধার চলো।

গাড়োয়ান ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

পথ নেহাৎ কম নয়। কিন্তু সোজা রাস্তায় না গিয়ে পাছে ঘুরতি পথে গাড়োয়ান নিয়ে যায়, এবং অবশেষে বেশি ভাড়ার দাবি করে এজন্য মোতীবাই সজাগ ছিল। শহরের ভিতর দিয়ে ব্রিজের তলাটা ছাড়িয়ে কোন্‌দিকে 'সাউথ মালাকা' সে জানে। সেখান থেকে বায়রানা কতদূর, মোতীবাইয়ের নখদর্পণে। সে ব'লে দিল জর্জটাউনের ব্রিজ বাঁ-দিকে, তুমি যাবে 'সিধা সড়ক'। পুব দিকে ঘাটের ধার পর্যন্ত চওড়া পথ গেছে,—ওরই কাছাকাছি।

গাড়োয়ানের পক্ষে টুঁ শব্দটি করার উপায় রইল না। একসময় মোতীবাই কোন্ এক পথের মোড়ে এসে বলল, ফটিকজি, তুমি গাড়িতেই থাকো, আমি আসব এখুনি।

মোতীবাই গাড়ি থেকে নেমে ঘোড়াটার সামনে দিয়ে ঠিক কোন্ দিকে গেল, ঠাহর করতে পারলুম না। আমি শ্রীমান্ ফটিকচন্দ্র নাগ, জহুরী রামধন নাগের একটিমাত্র সন্তান—আমি ব'সে ভাবতে লাগলুম, পথে নারী বিবর্জিতা—একথা এককালে সত্য ছিল, যখন মেয়েরা ছিল পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তির একটি অংশ মাত্র। এ-মেয়ে যে নিঃশব্দে আমার উপর তা'র জবর দখল নিয়েছে, এবং আমার ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি ওরফে এক অর্বাচীন বি-এ পাস করা স্বল্প বিত্তাবুদ্ধির নাকে দড়ি দিয়ে নিজের মর্জিমতো ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে—আমার ন্যায় আত্মভিমানী তৃতীয় শ্রেণীর জহুরী তিলমাত্রও বুঝতে পারছে না!

প্রায় আধ ঘণ্টার পর একটি লোককে সঙ্গে নিয়ে মোতীবাই ফিরে এল। অতঃপর গাড়োয়ানকে নির্দেশ দিয়ে বলল, ডান দিকের পথ ধরে আর দুই ফার্লং চলো,—বাসার ঠিক সামনে।

গাড়ি আবার চলল। সঙ্গের লোকটি ওঠে গাড়োয়ানের পাশে বসল।

দেখতে পাওয়া গেল আধ ঘণ্টার মধ্যে দুটি কাজ করেছে মোতীবাই। তেওয়ারি নামক এই সামনের লোকটিকে মোতায়েন করেছে দৈনিক তিন টাকায় এবং একটি কাঁচামাটির বাসস্থান ভাড়া নিয়েছে দৈনিক পাঁচ টাকায়। সে যাই হোক, এক সময়ে প্রয়াগ ঘাটের পথের মোড়ে এসে গাড়ি থামলো।

টাঙ্গা ভাড়া নিল চার টাকা। ওটা আমিই দিয়ে দিলুম। কিন্তু গাড়োয়ানকে বললুম, তুমি ঘণ্টাখানেক যদি অপেক্ষা করো আমি তোমার গাড়িতে শহরে যাব।

কী ভেবে লোকটা বাজি হ'ল এবং দুপা এগিয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ঘোড়াটা খুলে দিয়ে গাড়ির সীটের তলা থেকে কাঁচা ঘাস বার ক'রে আনল। আমি নেমে প'ড়ে মোতীবাইযের অনুসরণ করলুম।

সামনের শুক্‌নো নালা ডিঙ্গিয়ে মেটে উঠোন পেরিয়ে দেখি, সমস্ত চালাবাড়িটা বেশ বড়সড়ো। তিন চারখানা কাঁচা ঘর, দাওয়া, ভিতরে গাঁদা আর তুলসীর কতগুলো ঝোপঝাড়, পাশে শানবাঁধানো একটা স্থলে টিউব-ওয়েল্, এবং কয়েক হাত দূরে ত্রিশূল বসানো এক শিবস্থান। এটা বড় ধরণের এক যাত্রীশালা। দাওয়ার একধারে কয়েকখানা আধপোড়া কাঠ প'ড়ে রয়েছে এবং তার পাশেই মেঝের সঙ্গে মেলানো কালিঝুলিপড়া তিন-চারটে উনুন। উঠোনে কয়েকটা মেটে ভাঙ্গা হাঁড়ি ও ভাঁড় ছড়ানো রয়েছে। ঝুপসি ঘরগুলোর মধ্যে দু' তিনখানা দড়িছেঁড়া চারপাই,

—যেগুলিকে মড়ার খাট বলে,—দেওয়ালের ধারে দাঁড় করানো।

মোতীবাই ক'দিন এখানে কেবলমাত্র পুণ্যলাভের কামনায় প'ড়ে থাকবে, এবং ওই প্রবীণ বয়স্ক তেওয়ারি থাকবে ওর পাহারায়। এতবড় চালাবাড়িতে কেরোসিনের আলো জেলে একা বাস করা! মেয়েটার সাহসের তারিফ করছিলুম বৈ কি।

গাড়োয়ানকে ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করতে বলেছি, মোতীবাই জানে! সে জন্য সে এক সময় সামনে এসে সহাস্যে বলল, তা হ'লে ওই একঘণ্টা সময় আমাকেও দাও, ফটিকজি—আমি তেওয়ারিকে সঙ্গে নিয়ে কিছু কেনাকাটা ক'রে আসি?

আমি একটু ভয়ই পেলুম। কেউ জানে না আমার পকেটে নগদ প্রায় সাড়ে পনেরো হাজার টাকা, এবং প্রায় পৌনে দু' লাখ টাকার জুয়েলারি বজবজ করছে। আমি শুধু বললুম, একা এত বড় চালাবাড়িতে থাকব···তুমি তাড়াতাড়ি ফিরো। তা ছাড়া সন্ধ্যের আগে গিয়ে আমাকেও একটা যাহোক ডেরা খুঁজে নিতে হবে।

তেমনি হাসিমুখেই মোতীবাই বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চলল ভদ্রপ্রকৃতির তেওয়ারি। মোতীবাই যে-পথ ধরল, আমি দাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে সেই পথের অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলুম। আমি বিবাহিত ব্যক্তি। কিন্তু সমগ্র দেশের ভয়াবহ দুর্গতির কথা চিন্তা ক'রে স্বয়ং ঈশ্বর আমার কানে কানে ব'লে রেখেছেন, পঞ্চাশ কোটির পর দেশের জনসংখ্যা যেন আর না বাড়ে। সুতরাং আমার পাগলিনী অর্ধাঙ্গিনী আপাতত স্বকৃত-বন্ধ্যা। সে যাই হোক, আমার বক্তব্য এই, যুবতী নারীর শরীর-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট সচেতন। সুশ্রী স্ত্রীলোকের এপিঠ-ওপিঠ—দু'পিঠই অনবদ্য। মোতীবাইয়ের দেহের সামনের অংশটা দেখে

মুনি বিশ্বমিত্রের কথা মনে পড়েছিল, কেননা তাঁর তপোভঙ্গ যুক্তিহীন ছিল না। পিছন দিক থেকে মোতীবাইয়ের লীলায়িত তনুলতার দিকে চেয়ে ভাবছিলুম, এ যেন এক মহাসর্পিণী! সহস্রনাগ বাসুকীর সমস্ত বিষ এ-মেয়ে যেন আপন বঙ্কিম কটিতটে এবং শ্রোণীযুগলে ধারণ ক'রে সেই বিষসম্ভারে কিলবিল ক'রে চলেছে। পুরুষের বক্ষোরক্তের প্রতিটি বিন্দু ওর প্রতি পদক্ষেপের তালে-তালে যেন নেচে ওঠে!

মোতীবাই এক সময় চোখের আড়ালে মিলিয়ে যাবার পর আমার পরমারাধ্যা স্ত্রীর কথা মনে পড়ল বৈ কি। তুলনা ক'রে মনে মনে দেখলুম, না, আমি ঠকিনি!

চালাবাড়িটা পুবমুখো। শীতের অবেলায় এরই মধ্যে ভিতরটায় ছমছমে ছায়া নেমেছে। ঠাণ্ডায় হি হি করছে চারদিক। ওরই মধ্যে মিনিট পাঁচ-সাত পায়চারি ক'রে এক সময় আমি বেড়া পেরিয়ে পুনরায় নালা ডিঙ্গিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম। আর কিছু না হোক, দু'একটা লোকজন এদিকে চলাফেরা করছে। ঘোড়ার ঘাস খাওয়াটা দেখতে দেখতেও সময় কাটবে!

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে দেখি, আমাদের সেই ক্যাম্পের স্বামীজি,—শেষের দিকে যাঁর নাম জেনেছিলুম ব্রহ্মচারী দয়ানন্দ। উনি ঘোড়ার গাড়িখানার ওপাশে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিকে তাকাচ্ছিলেন। আমাকে দেখতে পাবামাত্রই উনি হাসিমুখে এগিয়ে এলেন।

আমরা একই দুর্ঘটনা ও দুর্ভাগ্যের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী, এবং ওঁর প্রতি আমি অনুরক্ত। সেই করণে ওঁকে দেখামাত্রই আমি এগিয়ে গেলুম হাসিমুখে। উনিও হাসিমুখে পুরনো বন্ধুর মতন হিন্দিতে বললেন, কোথায় উঠেছেন আপনারা? আমি আপনাদের খুঁজতে-খুঁজতে ঘুরছিলুম।

এই যে—এই চালাবাড়িতে। এবাড়ি ভাড়া নিয়েছেন ওই

যে আমাদের ক্যাম্পের সেই মেয়েছেলেটা,—আমি বললুম, তবে কিনা আমি এখনই চ'লে যাবো। ওঁকে আমি পৌঁছে দিতে এসেছি।

দয়ানন্দ্ বললেন, পূর্ণিমার ত' আর দেরি নেই। ক'টা দিন মাত্র।

বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাকে তাহলে ওরা ছেড়ে দিল? এই যে বলছিল, আপনার মস্তিষ্ক পর্যবেক্ষণের জন্য আরও কিছুদিন রাখবে?

দয়ানন্দ্ হাসলেন। বললেন, ওসব ডাক্তারি বিজ্ঞানেব হাস্যকর জটিলতা। সব রোগীই ওদের পরীক্ষার সামগ্রী! ওরা ছাডবে কেন সহজে? আমিই ওদেরকে না জানিয়ে কাঁটাতারের বেড়ার তলা দিয়ে এসেছি! এতক্ষণে বোধহয় খোঁজাখুঁজি করছে!

অর্থাৎ উনি পালিয়ে এসেছেন! হাসতে হাসতে আমি বললুম, কিন্তু আপনার মালপত্তর?

আমি সন্ন্যাসী!—দয়ানন্দ্ বললেন, নাই বা পেলুম দু'খান কম্বল আর টাকা! কী হবে টাকায়? সর্বত্যাগী মানে কী, ফটিকজি? টাকা ত' সন্ন্যাসীর বন্ধু নয়!

কিন্তু ডাল-রুটির কথাটা আছে যে।

স্বামীজি বললেন, আপনারা থাকতে ভাবনা কী? যদি আপনারা না দেন্ আর কেউ দেবে। পৃথিবী আজও অনেক বড়।

সে একশ'বার।—জবাব দিলুম।—সত্যই ত', একটা মানুষের আবার ভাবনা কিসের?

দয়ানন্দ্ বললেন, খাওয়া শুধু বাঁচবার জন্য! চারখানা রুটি আর এক হাতা ডাল। বাকি সময় ত' সাধন-ভজন। এ-ছাড়া মানুষের অন্য কাজ আমরা স্বীকার করিনে। আমরা যে সন্ন্যাসী!

ওঁর কণ্ঠস্বরের আন্তরিকতায় আমি অভিভূত হয়েছিলুম।

বললুম, আসুন, ভেতরে গিয়ে দাওয়ায় বসি। আপনার কথা-বার্তায় সত্যই আনন্দ পাই। আপনার মাথার সেই বিশ্রী ফুটোটা কি পুরে এসেছে?

ওটা এখনও ফেট্টিবাঁধা। ওর ওপরেই আমি পাগড়িটা বেঁধেছি,—দয়ানন্দ্ বললেন, কিন্তু এসব আমি বিশ্বাস করিনে, ফটিকজি। আপনার সঙ্গে যদি কখনও আবার দেখা হয়, তখন জানবেন স্রেফ গঙ্গাস্নান আর গঙ্গামৃত্তিকায় এই ঘা মিলিয়ে গেছে!

ভিতরে এসে মেটে দাওয়ার ধারে আমরা বসলুম। আমার কিছু ধর্মজিজ্ঞাসা ছিল। ভাবলুম মোতীবাই আসবার আগে এই সুযোগে সেটা সেরে নিই। জীবনে সৎসঙ্গের চান্স্ বেশি সংখ্যায় পাওয়া যায় না। তা ছাড়া এসব ব্যাপারে স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য অনেক সময় চিন্তাবিভ্রম ও বিচারবিভ্রাট ঘটায়। আমি বেশ গুছিয়ে বসে এক সময় প্রায় হাত জোড় ক'রে প্রশ্ন করলুম, আচ্ছা স্বামীজী, জীবনটা কী বস্তু বলতে পারেন?

দয়ানন্দ্ একবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'লেন কয়েক মুহূর্তের জন্য। পরে বললেন, অস্তিত্বের আশী লক্ষ বিবর্তন! কীটানুকীট থেকে মানুষ! মানুষ হ'ল বিবর্তন!

এর পর?

এর পর!—দয়ানন্দ্ শান্ত হাসি হাসলেন। পরে বললেন, এর পর দিব্যসত্তার দিকে তপস্বীর ধাবমান চৈতন্যের অভিযান! যে-পথ অস্তিত্বের থেকে বহুদূর,—যোগের লক্ষ্যই সেই—

দয়ানন্দের বাণীস্রোতে বিঘ্ন ঘটল। মোতীবাইয়ের সঙ্গে-সঙ্গে তেওয়ারি এবং জনৈক ঝাঁকামুটে মালপত্রাদি নিয়ে ভিতরে ঢুকল। দয়ানন্দকে দেখামাত্রই থমকিয়ে সহাস্যে মোতীবাই দাঁড়াল। সেই সুযোগে আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললুম, মোতীবাই, তুমি পুণ্যস্নানকর্মে এসেছ, পুণ্যসঙ্গলাভে তোমার প্রয়োজন আছে। সৎকর্মের সঙ্গে

সংভাবনা জড়িয়ে থাকে! সন্ন্যাসী হলেন সেই শ্রেষ্ঠসঙ্গ। দয়ানন্দ্‌জি তোমার এখানে আপাতত আশ্রয় নিলেন। তোমার সৌভাগ্যের প্রতি ঈর্ষা জানিয়ে এবার আমি বিদায় নিচ্ছি।

কেন জানিনে মোতীবাইয়ের মুখখানা অতিশয় বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমার দিকে চেয়ে সে শুধু বলল, তুমি ওঁকে ডেকে এনেছ, সেজন্য তোমারও ঝুঁকি আছে! আমি গৃহী,—স্ত্রীলোক, সন্ন্যাসী কি এখানে মানানসই হবে?

মোতীবাইয়ের কথায় আমি হেসে ফেললুম। বললুম, এ-বাড়ি মস্ত বড়। তোমার সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক শুধু চারখানা রুটি আব এক হাতা ডাল। আর, তা ছাড়া ধবো, তুমি দেখাশোনার লোক পেয়ে গেলে? বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী হ'লেন সর্বশ্রেষ্ঠ অভিভাবক।—আচ্ছা, আর নয়। এবাব আমি উঠি।

আমি এবাবেব মতো উঠে পড়লুম। পুনরায় বললুম, দয়া করে তেওয়ারিকে বলো ব্যাগ আব বিছানাটা গাড়িতে তুলে দিয়ে আসুক।

মোতীবাই সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।

দয়ানন্দ্‌কে হেঁট হয়ে নমস্কাব জানিয়ে বললুম, ক'দিন এখানে ভালই থাকবেন। অনেকগুলো ঘর রয়েছে, ওদেরই একখানায় থেকে যান্। ক'দিনই বা। নিজের হাতে ডাল রুটি বানিয়ে নেবেন।

প্রসন্ন হাস্যে দয়ানন্দ্‌ আমাকে বিদায় দিলেন।

ঘোড়াব গাড়ির কাছে এসে দেখি, মোতীবাই আগেভাগে এসে গাড়োয়ানের সঙ্গে কি একটা চুক্তি সম্পন্ন করেছে। গাড়োয়ান ঘোড়াটাকে গাড়ির সঙ্গে জুতে দিচ্ছে, এবং শাড়ির আঁচলের গেরো খুলে একখানা পাঁচ টাকার নোট নিয়ে মোতীবাই গাড়োয়ানের দিকে হাত বাড়াচ্ছে। মানে, একঘণ্টা অপেক্ষা করার জন্য এটা ক্ষতিপূরণ।

ঈষৎ কড়া কণ্ঠে বললুম, এসব ঝঞ্ঝাট-ঝামেলার মানে কী ?

মোতীবাই আর হাসল না। পিঠের আঁচল এবং মাথার ঘোমটা একটু টেনে শুধু বলল, তোমার হাতেই তোমার যাওয়া বন্ধ করেছ, ফটিকজি।

এসব কী বলছ তুমি ?

এবার যে শান্ত হাসিটুকু মোতীবাই হাসল, সেটুকুর মধ্যে যেন ঈষৎ জ্বালা ছিল। সে লেখাপড়া জানা মেয়ে, এবং তার সমস্ত ভাবভঙ্গীর মধ্যে কোথায় যেন একটা আভিজাত্য চাপা রয়েছে। অতঃপর গাড়িখানা চলে যাবার পর সে গম্ভীর মুখে বলল, কিছু মনে করো না, ফটিকজি—তুমি-আমি হয়তো সমান বয়সেরই হবো, কিন্তু তুমি বড়ই ছেলেমানুষ; তোমার বিদ্যেবুদ্ধি কতটুকু জানিনে, কিন্তু তুমি অনুকম্পার পাত্র। তুমি বুঝতেই পারনি, কি বুদ্ধু তুমি! আমার হুকুম, অন্য আর কোথাও তোমার যাওয়া হবে না। সোজা চালা-বাড়িতে উঠবে চল!—এই ব'লে সে হাত বাড়িয়ে আমাকে নির্দেশ দিল চালাবাড়ির দিকে।

আমি ছটফট করে উঠলুম, বললুম, মোতীবাই, বেশ—উঠছি গিয়ে চালাঘরে, তুমি যখন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য! কিন্তু মনে রেখো, আমি বিবাহিত। ঘরে আমার স্ত্রী, বাবা, মা, ঠাকুমা, মেসো, পিসে, —আমার সামাজিক সম্মান, আমার চরিত্রের শুচিতা, আমার—

আঃ থামো! মোতীবাই একটু তিরস্কারই করল। বলল, এখানে কেউ নেই, কিছু নেই তোমার! আছে শুধু একটা অজানা অচেনা মেয়েছেলে,—ত্রিবেণী সঙ্গমের ঘাট থেকে যে ডাকিনী তার নিজের গরজেই তোমার ঘাড় ধরে নিয়ে ঘরে উঠল! চলো, দেরি ক'রো না।

এবার মোতীবাই একটু যেন চেঁচিয়ে হেসে উঠল। এ-মেয়ে খুব সোজা নয়, মনে হচ্ছে।

বললুম, একটি সর্তে কিন্তু তোমার ওখানে উঠব।

বলো কি সর্ত ?

বাসাভাড়া আর তেওয়ারির দৈনিক ভাতা কিন্তু আমি দেবো। দ্বিতীয় সর্ত, আমার আলাদা একখানা ঘর চাই।

বেশ, তাই হবে।

বললুম, তাহলে এখন ঘণ্টা দুই তিন আমাকে ছুটি দাও। সন্ধ্যে আটটা সাড়ে আটটার মধ্যেই ফিরব। আমার সামান্য কিছু কেনাকাটা দরকার। একবারটি শহরে যাব।

মোতীবাই খুশী হয়ে চালাঘরের দিকে পা বাড়াল।

একখানা পা প্রচুর দুঃখ দিচ্ছে এখনও। বাঁ-হাতের কব্জি এখনও ফোলা, তার ওপর কালশিরার দাগ। মাথার ব্যাণ্ডেজ খুলে দিয়েছে বটে, কিন্তু একপাশে প্লাস্টার করা। পায়ের ঘা প্রায় সেরে এসেছে। সুতরাং একটু খুঁড়িয়ে হাঁটলেও এ অবস্থায় শহরে যাওয়া চলে।

কিন্তু মোতীবাইকে এবার যেন অনেকটা দুর্বোধ্য এবং শঙ্কাজনক মনে হচ্ছে। আমি যেন আমার দুর্বল শরীরে কেমন একটা নিরুপায় অবস্থা বোধ করছিলুম।

॥ ৩ ॥

হাতঘড়িটা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল, কিনতে হ'ল একটা যেমন-তেমন। একখানা গরম র‍্যাপার, ধুতি, শার্ট, এক জোড়া নিউ-কাট্ এলবার্ট জুতো, খান দুই রুমাল, মাথার তেল-সাবান ও মাজন, সবই কিনলুম। ফিরবার সময় বাজার থেকে নিলুম ডজন-খানেক কমলালেবু আর আপেল, এবং পথের ধারে এক মোগলাই রেস্তোরাঁ থেকে খান চারেক গরম গরম কাটলেট এবং কড়াইশুঁটির ঘুগ্‌নি কিনতেও ভুললুম না। এক ফাঁকে এক নাপিতের দোকানে ব'সে চুল ছাঁটালুম, এবং পোড়ার মুখখানা কামিয়েও নিলুম।

মালপত্র নিয়ে একখানা সাইকেল-রিকসায় চড়ে যখন প্রয়াগ-ঘাটের রাস্তার মোড়ে চালাঘরের সামনে এসে নামলুম, তখন সবে আটটা বাজল।

রিক্‌সাওলাই আমার জিনিসপত্র ভিতরে পৌঁছিয়ে দিয়ে গোটা দুই টাকা নিয়ে চলে গেল। তেওয়ারি ছিল কাছাকাছি, সে এসে আমার জিনিসপত্র সহ সামনের ঘরে আমাকে আনল।

ঘরের ভেতরটি দেখে আমি একটু অবাকই হলুম। পাছে মেঝের ঠাণ্ডা ওঠে এজন্য ঘরজোড়া শতরঞ্চি পাতা। টেবিল, টুল, চেয়ার, আলনা, র‍্যাক—সবই এসেছে। নেয়ারের খাটে পুরু বিছানা পাতা, পায়ের কাছে লেপ। এ যেন সব মিলিয়ে কেমন একটা—আবার বলি, ভানুমতীর খেল্। সমস্তটাই অবিশ্বাস্য। সামনের টেবিলের ওপর নতুন হারিকেন লণ্ঠন জ্বলছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়া পেরিয়ে মোতীবাইয়ের ঘরে ঢুকলুম। একখানা চারপাইয়ের উপর কম্বল বিছিয়ে সে চাদর জড়িয়ে ছুঁচ

সুতো নিয়ে কী যেন সেলাই করছিল। আমাকে দেখেই সে বলল, ফটিকজি, আজ কিন্তু বেশি কিছু হয় নি। গরম গরম রুটি, আলু কপির রসা আর রাবড়ি—এই রেখেছি তোমার জন্যে।

কিন্তু আমি যে একটু চা খাবো?

বেশ ত', তেওয়ারি—?

তেওয়ারি ছুটে এল, এবং দু' পেয়ালা চায়ের অর্ডার নিয়ে গেল। আমি বললুম, মোতীবাই, একবারটি আমার ঘরটায় এসো।

আমার ঘরে এসে শতরঞ্চির উপরেই মোতীবাইকে বসিয়ে কাটলেট আর কড়াইশুঁটির ঘুগনি বার করলুম। পরে বললুম, ভুলে যাও মোতীবাই তুমি মেয়ে, আমি পুরুষ। আমরা দু'জনে শুধু বন্ধু!

কাটলেটে কামড় দিয়ে হাসিমুখে মোতীবাই বলল, কিন্তু মেয়ে যে মেয়ে হয়ে ওঠে রাত্রের দিকে, ফটিকজি!

ওর কথার ধরনে খুব হেসে উঠলুম। কাটলেটের একটি টুকরো মুখে দিয়ে বললুম, ভয় দেখাচ্ছ, কেমন? কিন্তু একথা তোমার সত্যি নয়, মোতীবাই—বলতে বলতে আবার ঘুগ্‌নি মুখে দিয়ে পুনরায় বললুম, ক্যাম্পের ঘরে তিন সপ্তাহ আমরা ছিলুম পাশাপাশি বিছানায়! কই, তুমি ত' একদিনও মেয়ে হয়ে ওঠো নি?

কাঠের চামচে ঘুগ্‌নি মুখে তুলে মোতীবাই হাসল। বলল, এইজন্যই বলছিলুম তুমি নাবালক, একেবারে ছেলেমানুষ! তিন হপ্তার একটা রাত্তিরের ইতিহাসও তুমি জানো না। যদি জানতে—

কে? কৌন্ হ?

মোতীবাই হঠাৎ চুপ ক'রে জানলার বাইরে দাওয়ার দিকে তাকালো। আমি সচকিত হলুম। কিন্তু মোতীবাই স্থির হয়ে রইল না। কি যেন ভেবে ধড়মড়িয়ে উঠে আমার লণ্ঠনটা খপ্

ক'রে নিয়ে বাইরে এল। কাছাকাছি কেউ নেই। তেওয়ারি গেছে রাস্তার ওপারের চায়ের ঝোপড়া-দোকান থেকে চা তৈরি করিয়ে আনতে। দাওয়ার শেষ দিককার ঘরে স্বামীজি ডাল-রুটি খেয়ে কম্বলের তলায় ঢুকেছেন।

মোতীবাই ফিরে এসে বসবার পরেই তেওয়ারী চা এনে হাজির করল। মাটির ভাঁড়ে ফুটন্ত চা। তাই চমৎকার। কিন্তু মোতীবাই সহসা যেন তার রসবোধ হারিয়ে ফেলেছিল! মুখে তা'র কাঠিন্যের রেখা দেখা যাচ্ছিল। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মেয়েটা ক্ষণে ক্ষণে তা'র চেহারা পাল্‌টায়! কিছুই তেমন বুঝতে না পেরে আমি হাঁদার মতন চেয়ে রইলুম। এক সময় শান্তকণ্ঠে মোতীবাই বলল, এখন বুঝতে পারছ, কেন তোমাকে জোর ক'রে ধ'রে রেখেছি?

হাসিমুখে বললুম, রাত হলেই যে তোমার ভূতের ভয় ধরে কেমন করে জানব? ভয় পেয়ে যে পিছোয়, ভয় তাকে ছাড়ে না, মোতীবাই।

মোতীবাই বলল, তত্ত্বকথা এখন রাখো, ফটিকজি। আমার জানতে কিছু বাকি নেই। যাক্‌, তেওয়ারি একটু বাদেই খেতে দেবে তোমাকে। শোবার আগে এক কাজ করো, মাঝখানের এই দরজাটা খুলে রেখো। আমার ঘরের খিল ছিট্‌কিনি কিছু নেই। যদি আবার অন্ধকারে ভয় পাই, তোমার কাছেই ছুটে পালিয়ে আসব।

তেওয়ারি রাত্রে সব কাজ সেরে চলে যাবে নিজের ডেরায়, এই তার সঙ্গে চুক্তি। আমি সেদিকটা চিন্তা ক'রে বললুম, আবার এসব কী বলছ তুমি? তার চেয়ে তেওয়ারিকে থাকতেই বল না কেন? নাঃ এ যেন সবই এলোমেলো মনে হচ্ছে। ধরো, তুমি যদি মিথ্যে ভয় পাবার অছিলায় ছুটে আস আমার ঘরে?

মোতীবাই এবার সকৌতুকে হেসে উঠল। সেই হাসির আওয়াজে এই পুণ্যতীর্থের প্রান্তে ব'সে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—সবই যেন হাওয়ার ভেলায় ভাসিয়ে দিলুম! এ যেন এক ভরা যৌবনের ভাটিয়ারির ডাক। জীবনের উচ্ছলতায় মাটির ঘরখানায় যেন ভূমিকম্পের কাঁপন থরথরিয়ে উঠল!

হাসতে হাসতে মোতীবাই উঠে দাঁড়িয়ে তার নীলাম্বরীখানা সামলিয়ে নিল। তারপর বলল, ফটিকজি, নিষিদ্ধ ফল তুমি-আমি দুজনেই খেয়েছি! দুজনেরই সস্তা কৌতূহল মিটেছে বৈকি। কিন্তু তা'র বিষ যদি আজও আমি হজম করতে না পেরে থাকি, তবে মেয়েমানুষ হয়ে কোন্ লজ্জায় তোমার ঘরে ঢুকব?

মোতীবাই বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

দুজনের এই প্রকার বাক্‌চাতুরীর ফল এই দাঁড়াল যে, সেদিন সমস্ত রাত আমাকে জেগে থাকতে হ'ল, এবং দু'জনের মাঝখানের দরজাটা একপ্রকার খোলাই রইল। ঘরজোড়া শতবর্ষি পাতার জন্য আমার ঘরটির ঠাণ্ডা ক'মে গেছে বেশ বুঝতে পারা যায়। লেপের ভিতরে থাকার জন্য বিছানাটা কোমল মধুর উত্তাপে ভ'রে উঠেছে। আজ খেয়েছি ভাল। খাঁটি বনস্পতি ঘি-মাখানো রুটি, ফুলকপির তরকারি, রাবড়ি মালাই এবং দু'জনের শেষপাতে কমলা লেবু। মোতীবাই বলে রেখেছে, কাল সে প্রয়াগের সুপ্রসিদ্ধ কালাকন্দ্ খাওয়াবে।

আমি অত্যন্ত বেরসিক এবং অপদার্থ, নৈলে অনায়াসলভ্য যে-মেয়েটা আমার হাতের কাছে রয়েছে তা'র দেবভোগ্য দেহপ্রাচুর্য নিয়ে, তাকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে স্ত্রীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলুম! আমার বিশ্বাস, আমার মধ্যে পৌরুষের প্রকৃত অভাব আছে।

রাত্রিশেষ পর্যন্ত কাঁটা হয়ে রইলুম, এই বুঝি ছুঁড়িটা ভয় পেয়ে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! কেউ

এল না। হারিকেনটা নিবু-নিবু হয়ে জ্বলছিল। ওরই মধ্যে দু' একবার উসখুস আওয়াজ পেলুম পাশের জানলাটায়। বুঝতে বাকি রইল না, এটি শিকারী বিড়ালের আচরণ। কিন্তু এ ঘরে না আছে দুধের বাটি, না আছে ইলিশের পেটি! তবু নিঃশব্দে ভিতরে ঢোকার আগে ওর জানা দরকার আমি জেগে আছি কিনা। সে যাই হোক, ওঘরে মোতীবাই তখন অঘোর ঘুমে অচেতন।

আরামশয্যার মধ্যে কখন্ নিদ্রার গভীরে তলিয়ে গিয়েছিলুম, আমার মনে পড়ে না। কিন্তু বাইরে থেকে গলার শব্দে অনেক বেলায় হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গলো। শুনতে পেলুম তেওয়ারি আর মোতীবাই প্রাদেশিক ভাষায় উচ্চকণ্ঠে আলাপ করছে। সেই আলাপের সূত্রটার অন্য প্রান্তটা হ'ল ব্রহ্মচারী দয়ানন্দ্! তেওয়ারির বক্তব্য, সোয়ামিজির এ ধরনের আচরণ ঠিক নয়। দয়ানন্দের বক্তব্য, তীর্থ-স্থানে এসে পেঁয়াজ, আণ্ডা, মছলি—এসব গলাধঃকরণ করা কি যুক্তিযুক্ত? গতকাল সন্ধ্যায় স্বামীজি তাঁর ডালরুটি বানানো ফেলে রেখে নাকে কাপড় চেপে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মোতীবাইয়ের বক্তব্য, এই কথাটি বলবার জন্যই কি আপনি অত ভোর বেলায় কলতলার দিকে আড়ি পেতেছিলেন? হোন্ না কেন আপনি ব্রহ্মচারী—মেয়েদের আবরু মেনে চলবেন না কেন? এটা কি শরমের কথা নয়?

তেওয়ারি বলছিল, তমিজ নহি ছোড় না, সোয়ামি।

দয়ানন্দ্ বলছিলেন, ছি, এ বড় নোংরা! বহুতি ইল্লৎ! আমরা মায়াবাদী বৈদান্তিক। আমাদের চোখ যা দেখে, মন তা গ্রহণ করে না। আমাদের দৃষ্টি মানুষের সেই সত্তার দিকে,—সেখানে নর বা নারীদেহ একাকার! চোখ খুলে দেখি, প্রাণধারণের শুধু একটা আধার মাত্র! চোখ বুজে দেখি সর্বগ্রাসী মহাকালীর দুই

দেহ-গহ্বরে জন্ম-মৃত্যুর বিবর্তন! আমার সম্বন্ধে এসব কী বলছ, মোতীবাই? আমার সাধন-ভজনের সব পন্থা কি তোমার জানা আছে?

মোতীবাইয়ের কণ্ঠে অস্পষ্টতা নেই। সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, আপ্ মেরা মেহ্মান বন্ গিয়া জবরদস্তিসে! আমি আর রাজি নই। আমি ত' আপনার চেলি নই যে, রোজ একসের আটা, ডাল, সব্জি, মালাই—এসব জোগাবো?

হাসিমুখে দয়ানন্দ্ বললেন, চেলি বন্ যাও, মোতীবাই! আমি তোমাকে 'দিক্ষা' দেবার জন্য প্রস্তুত। আর আতিথ্য? কে কা'কে খাওয়াচ্ছে বল ত'? ভাগোয়ান তেরা হাতসে মুঝেকো খিলাতা কি নহি? ফটিকজি কো কোন্ খিলাতা? তুম্? কবভি নহি! খিলানেবালা যো হ্যায়, উ এক ভাগোয়ান!

পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি যখন দয়ানন্দর সুমিষ্ট কথাগুলি শুনে মুখস্থ করছিলুম, সেই সময় মোতীবাইয়ের এই অসামাজিক অসৌজন্য আমার মনকে বিরক্তিতেই ভরিয়ে তুলল। চুপ করে আমি বিছানার উপর ব'সে আমার ইতিকর্তব্য ভাবতে লাগলুম। পূর্ণিমার আর বিলম্ব নেই, দিন-দুই বাকি মাত্র। প্রতিপদে যাওয়াটা বেমানান। সুতরাং এ তিনটে দিন কোনওমতে এখানে কাটিয়ে পালাতে পারলে বাঁচি। আমি ঠিক এধরনের কুরুচিপূর্ণ পরিবেশের সঙ্গে অভ্যস্ত নই। আমার শরীর-স্বাস্থ্যের উন্নতি আপাতত না হলেও চলবে।

দয়ানন্দজি ত্রিবেণীর ওদিকে স্নানের জন্য রওনা হলেন। এবার উঠি-উঠি করছিলুম। ভাবছিলুম দেহলাবণ্য শব্দটির উৎপত্তি হ'ল কেমন করে? মেয়েদের দেহ বোধ করি তেঁতুলের মতো টক। কিন্তু ওই দেহে যদি সৌন্দর্যের লবণ মাখানো যায়—তবে হয় তেঁতুলে-নুন মাখানো! সুতরাং ওই বস্তু দেখে কা'র না জিভে

জল আসে? লাবণ্য মানেই ত এই। ধর্মের ষাঁড়ের আচরণে, নেড়ি কুকুরের ল্যাজ নাড়ায়, পায়রার বকবকমে, চড়াই পাখির চটুলতায়—ওই নুন-তেঁতুল মাখা লাবণ্যের আকর্ষণ!

মোতীবাই এবার এসে ঘরে ঢুকল। সদ্যস্নাত চেহারায় হাসিমুখে বলল, অনেক বেলায় উঠেছ আজ। তেওয়ারি তোমার গরম জল দিচ্ছে,—অব নাহা লো।

পরিষ্কার গলার আওয়াজে আমি বললুম, সকালবেলা অমন ক'রে তুমি নোংরা ঘুলিয়ে তুললে কেন, মোতীবাই?

মোতীবাই বলল, আমি? না, আমি নয় ফটিকজি।

তবে?—আমি মুখ তুললুম।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মোতীবাই বলল, আমার এই দেহ। উঠেছিলুম আজ অন্ধকার থাকতে। সবেমাত্র কলতলায় কাপড়খানা ছেড়েছি,—তখনও তেমন আলো ফোটেনি। হঠাৎ দেখি ওই ভণ্ডটার দুটো চোখ আমার দিকে দপ্‌দপ্‌ করছে! পুরুষের চোখের ভাষা কোন্ মেয়ে না চেনে?

আমি হাসলুম। বললুম, আচ্ছা ঠিক ক'রে বলো ত' আমার চোখ দুটো কি তুমি উত্তমরূপে পরীক্ষা করেছ?

মোতীবাই আমার কথায় কানই দিল না, অর্থাৎ সে আমাকে পুরুষ মনে করে না!

পুনরায় সে বলল, এবার তুমিই বল দেখি, কোন্ মেয়ের না বিরক্তি ধরে এই রকম অসভ্যতায়?

বললুম, একথা অবিশ্যি ঠিকই। সব মেয়েই রাগ করে যদি তা'র পুঁজি-পাটা কেউ আড়াল থেকে দেখে নেয়।

হেসে ফেলল মোতীবাই।

না, না, এসব যথার্থ কথা!—আমি অত্যন্ত রুষ্টকণ্ঠে বললুম, পুরুষের পুঁজি-পাটাও আছে,—তবে সেটা তা'র মনিব্যাগে।

আমি রাগ করি কেউ যদি আমার পকেট হাতড়ায়। কিন্তু শোনো মোতীবাই, আমর কথায় রাগ ক'রো না। তুমি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে একথা সহজেই বুঝবে যে, তোমার ওই সর্বনেশে বুকের গড়ন, কোমরের বাঁক আর পাছার লীলাভঙ্গী—তোমার এই কয়টি পুঁজি পাটার জন্য দুই ব্যক্তি ট্রেনসংঘর্ষে প্রাণ দিয়েছে; তোমার ওই কয়টি সামগ্রী পাহারা দিতে গিয়ে মহেন্দর মরেছে। আর—আমরা দু'জন তোমার কাছাকাছি থাকার জন্য ক্ষতবিক্ষত হয়েছি!

মোতীবাই হেসে আলুথালু হয়ে আমার বিছানাটার প্রান্তে ব'সে পড়ল।

তেওয়ারি এবার কেট্‌লি ভ'রে চা নিয়ে এল। আমি উঠে গিয়ে মুখ ধুয়ে এসে শতরঞ্চির উপরেই ব'সে পড়লুম। আজ ফুলকাটা কাঁচের পেয়ালায় গরম-গরম চা। মোতীবাই এক ফাঁকে ছুটে গিয়ে ক'খানা বিস্কুট নিয়ে এল। আগেভাগে সে নোটিশ দিয়ে রাখল, কাঠের আগুনে আমার জন্য গরম জল বসানো আছে।

দু'জনে চায়ে চুমুক দিয়ে বিস্কুটে কামড় দিলুম। এ কিন্তু মন্দ নয়। পরস্পরের সঙ্গে আমরা সম্পর্কলেশশূন্য। মোতীবাইয়ের কোনও পরিচয় আমি জানিনে। জানিনে কোন্ গাছের ফুল! বললুম, মোতিবাই, তোমার মরদ তোমাকে একলা ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁর ভয়-ডর নেই?

কিসের ভয়?

কেন, তোমার সতীত্ব নষ্ট হবার ভয়! পাশবিক অত্যাচারের ভয়!

মোতীবাই হেসে ফেলল। বলল, ওটাকে শুধু পাশবিক বলো কেন? ওর চেয়ে জৈবিক আর কী হতে পারে? আর তা ছাড়া

শুনবে একটা কথা? ওটার ব্যাপারে হিংসুটে পুরুষরাই জ্বলে'-পুড়ে মরে,—মেয়েরা চুপ ক'রে থাকে?—যাক্ শোনো, এখন তোমাকে মাখন-টোষ্ট আর ডিম ভাজা খাওয়াবো, তা'র সঙ্গে এক গেলাস দুধ আর কমলালেবু। কেমন?

উত্তম প্রস্তাব!—হাসিমুখে বললুম, কিন্তু এমন সুন্দর সকালে তুমি যে আবহাওয়াটা দূষিত করলে তা'র ক্ষতিপূরণ কী?

ক্ষতিপূরণ?—বেশ একটা গান শুনিয়ে দিই তোমাকে?

বললুম, হ্যাঁ, সত্যিই ত'! ভুলেই গেছি তুমি গান জানো। কিন্তু দোহাই, তোমার দেশের কালোয়াতি নয় ত? তোমার ওই 'মেরে সৈঁইয়া' এক সময় থামবে ত'?

মোতীবাই হেসে লুটোপুটি খেয়ে নিজের ঘরে পালাল।

মনে করেছিলুম মেয়েটা বুঝি লক্ষ্মৌই ঠুংরী বা অমনি একটা কিছু ধরবে। কিন্তু তার প্রথম চালেই বুঝলুম, আমার অনুমান মিথ্যে। শিবস্তোত্র কেমন আমি জানি। কিন্তু তার ভজনের প্রথম সুরসঞ্চার আমাকে সহসা যেন কোথায় ছিনিয়ে নিয়ে গেল! যেন এক রাজহংস আমাকে তুলে নিয়ে চলল অন্তহীন মহাকাশ পেরিয়ে কোন্ বৈকুণ্ঠলোকের দিকে। অস্তিত্বের কোন্ পারে কোথায় মোতীবাই আমাকে নিয়ে চলল,—আমার যেন সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটে গেল!

গানের মাঝখানে কখন্ যেন মাত্র একটি মুহূর্তের জন্য সংযম হারিয়েছিলুম। মনে হয়েছিল, ছুটে গিয়ে মোতীবাইয়ের গলা জড়িয়ে কেঁদে বলি, তোমার পায়ে চিরদিনের জন্য দাসখৎ লিখে দিচ্ছি! ওই একটি পলকের জন্যই আমার অনবদ্যযৌবনা স্ত্রীকে একেবারেই অপদার্থ মনে হয়েছিল।

বাইরের দিকে মিনিট পনেরোর জন্য নিমেষনিহত দৃষ্টিতে

চেয়েছিলুম। কী দেখছিলুম মনে নেই। সহসা চোখে পড়ল, প্রবীণবয়স্ক তেওয়ারি বসে রয়েছে দাওয়ার ধারে এবং তার দুই চোখের কোণ্ বেয়ে নেমেছে জলের ফোঁটা।

চমক ভাঙ্গলো মোতীবাইয়েরই কণ্ঠস্বরে,—তেওয়ারি, গরম জল নামিয়ে রেখে শহর-বাজারে যাও একবার। গোটা দুই ছোট সাইজের চিকেন্ কাটিয়ে-কুটিয়ে আনবে। রান্নার জন্য পেঁয়াজ-রসুন এনো। ওই সঙ্গে টমাটো কিছু। 'হারা'মটর আর ফুলগোবি মৎ ভুলো। এক পাউণ্ড ডবলরোটি।

ওদিককার দরজা দিয়ে বেরিয়ে মোতীবাই যখন তেওয়ারিকে টাকাকড়ি বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় দিল তখন ওপাশ থেকে দয়ানন্দ্ তাঁর আটা-শানা রেখে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। ইতিমধ্যে তিনি কখন্ ফিরেছেন টের পাইনি। তাঁর সে-দৃষ্টি মনে হয় আক্রোশের নয়,—সেই দপ্‌দপে চক্ষুর ভাষা অন্য রকমের। জানলার সামান্য ফাঁক দিয়ে স্বামীজির দিকে তাকিয়ে আমি যেন কতকটা বিমর্ষ বোধ করছিলুম। উনি সন্ন্যাসী ও সর্বত্যাগী,—এতে আর সন্দেহ কোথায়! কিন্তু মনে হচ্ছিল, উনি ওঁর তপস্যার আসনখানা পেতেছেন এক আগ্নেয়গিরির চূড়ায়,—যার ভিতরে-ভিতরে এক মহাপ্লাবী অগ্নিসমুদ্র টগবগ করছে বিদারণের যন্ত্রণায়। সেই রক্তরাঙ্গা চোখ তুলে একসময় শান্তকণ্ঠে তিনি বললেন, মোতীবাই, গোসা করো না যদি একটা কথা বলি—

দরজার বাইরে দেখলুম মোতীবাই এবার তার সুঠাম কটিদেশ ঈষৎ বাঁকিয়ে কূটকটাক্ষে দয়ানন্দর দিকে তাকাল।—

ক্যা? বলিয়ে?

রাঙ্গা চোখে হাসি মাখিয়ে দয়ানন্দ্ বললেন, সন্ন্যাসীর কোনও জাত নেই, জানো ত'? কিন্তু নিষেধ আছে কতকগুলো।

হো সক্‌তা।—মোতীবাই জবাব দিল।

আমাকে রুটি দিচ্ছ বলেই কি তুমি আমার তপশ্চারণকে এইভাবে নষ্ট করতে চাও ?

আমি নিজের থেকে রুটি দিচ্ছিনে, আপনি আদায় ক'রে নিচ্ছেন।

দয়ানন্দ্ আবার হাসলেন,—আচ্ছা, তাই না হয় হ'ল। তবে গৃহীরাই ত' সন্ন্যাসীর অন্নদাতা! দেশের সকল সম্প্রদায়ের সাধক ও সন্ন্যাসীরা গৃহীদের দয়াতেই জীবনধারণ করে—এও সত্য। কিন্তু সেই দয়ার ওপর বিষ ঢেলে দিচ্ছ কেন ? জীবনাদর্শের সঙ্গে মিলছে না, তাই বলেই কি তোমার চোখে ঘৃণ্য হবো ?

মোতীবাইয়ের চেহারা কঠোরতর হ'ল। সে বলল, সন্ন্যাসী-মাত্রই শ্রদ্ধেয়, ঘৃণ্য নয়! আপনার কথা স্বতন্ত্র।

আটা ঠাসতে-ঠাসতে দয়ানন্দ্ তাঁর উনুনে জ্বলন্ত দু'খানা কাঠ একটু নেড়ে দিলেন। পরে বললেন, আমার ত্রিসীমানার মধ্যে পেঁয়াজ-রসুন-মাংস-মুরগি যে আনা চলে না, একথা শিক্ষিত মেয়ে হয়ে কি তুমি শেখোনি ? তোমার এই আচরণ কেমন ক'রে আমি বরদাস্ত করব ?

মোতীবাই হাসল। বলল, যেমন ক'রে আমি আপনাকে বরদাস্ত করছি আমার ত্রিসীমানার মধ্যে ?

এবার আমি উঠে পড়লুম। বেলা হয়ে গেছে। আমার মুখে সম্ভবত বিরক্তির গাম্ভীর্য ছিল। আমার বিশ্বাস, আমি এখান থেকে চ'লে গেলে এই ধরনের বিতর্কের মীমাংসা হ'তে পারে। মোতীবাইয়ের জিদ এবং রেষারেষি আমার ভাল লাগছে না।

আমি কলতলার দিকে চলে গেলুম কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে। কিন্তু সেখানেও নিষ্কৃতি পাওয়া গেল না। গরম জলের মস্ত বালতিটা নিজেই দয়ানন্দর নাকের উপর দিয়ে এনে মোতীবাই একস্থলে রেখে আবার ফিরে গেল।

মেয়েমানুষের যুক্তিহীন পক্ষপাতিত্ব যখন প্রকাশ পায় তখন

থেকে তার শঠতা, চাতুরী, নষ্টামি এবং কূটনীতি কী প্রকার বিসদৃশ আকার ধারণ করে, মোতীবাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমার চোখ ছুটো ক্ষণকালের জন্য দয়ানন্দ্ অপেক্ষাও রাঙ্গা হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ আগে মনে করেছিলুম, ওর গলা জড়িয়ে ওর গানের তারিফ ক'রে আসব, এখন মনে হ'ল ছুটে গিয়ে ওর গলা টিপে একেবারে হত্যা ক'রে আসি।

৪ ॥

মাঘীপূর্ণিমার দিন ভোরবেলা থেকেই প্রবল ঠাণ্ডা বাতাস উঠেছিল। সঙ্গমক্ষেত্রে পৌঁছবার পথ একাধিক। কিন্তু আমাদের চালাবাড়ির সামনে দিয়ে শত শত স্নানার্থী অবিশ্রান্তভাবে ঘাটের দিকে চলেছে। এটা প্রধান একটা পথ।

আমি শীতকাতুরে মানুষ। তবুও কাশী থেকে আসবার সময় ভেবেছিলুম, হাতে এখনও দিনকয়েক সময় আছে, যদি এর মধ্যে মানিকপুরের ওদিক থেকে কাজ সেরে ফিরতে পারি, তখন মৌনী অমাবস্যায় প্রয়াগে স্নানের কথা ভাবা যাবে! সে আজ প্রায় চার সপ্তাহ হতে চলল। কিন্তু ট্রেনছুর্ঘটনা আমার সব প্ল্যান লণ্ডভণ্ড ক'রে দিয়েছে! কে জানত আগে, ভাগ্যবিধাতার এই কুটিল চক্রান্ত? কেই-বা কল্পনা করেছিল, এক মায়াবিনীর খপ্পরে প'ড়ে আমার নৈতিক চরিত্র বিপন্ন হবার সম্ভাবনা ঘটবে? আমি নিজের ছুর্ভাগ্যে ছুঃখিত বৈ কি। কিন্তু লজ্জা ও অপমানের বিষয় এই, আমার বয়সী কোনও পুরুষ আমার এই অবস্থাটাকে ছুর্ভাগ্য ব'লে মনেই করবে না! তারা বলতে পারে, মোতীবাইয়ের মতো সুলভা সুন্দরীর সান্নিধ্য পাবার জন্য ট্রেনছুর্ঘটনায় ক্ষতবিক্ষত হওয়াও

সৌভাগ্যের বিষয়। আমার স্পষ্ট জবাব এই, আগে তাই হও! হয়ে মজা দেখ।

ব্রহ্মচারী দয়ানন্দ্ একটু আগে রামনাম ও শিবনাম জপ করতে করতে বেরিয়ে গেছেন। যাবার সময় অবশ্য লক্ষ্য ক'রে গেছেন, আমরাও ঘাটের দিকে রওনা হবার জন্য তোড়জোড় করছি। এখান থেকে আন্দাজ ছয় ফার্লং গেলে তবে নদীর ধার। সেখান থেকে নৌকাযোগে সঙ্গমের কেন্দ্রে যাওয়া। তেওয়ারি থাকছে ঘরদোর আগলিয়ে।

স্থির করেছি আমি স্নান করব না। সুতরাং আমার আলগা পাজামার সঙ্গে যথারীতি ফ্লানেল শার্টের উপর গলাবন্ধ গরম কোটটা প'রে নিলুম। জামাটা ছিঁড়ে গিয়েছিল ট্রেন-দুর্ঘটনায়, মোতীবাই কালো সুতো জোগাড় ক'রে সেটা বেমালুম রিপু ক'রে দিয়েছে। ভিতরের পকেট দুটো সামলাবার জন্য আমি লক্ষ্য রেখেছিলুম। কে জানে, কী হয়। উট্‌কো মেয়েছেলেকে বিশ্বাস কী? মেয়ের মন, না মতিভ্রম!

যাবার আগে মোতীবাই এঘরে এসে বলল, জামা আর গায়ে দিলুম না। এটা রেখে দাও তোমার পকেটে।—এই ব'লে সে পাটকরা ফিকে সবুজবর্ণের একটি কাঁচুলি বেআইনীভাবে আমার পকেটে গুঁজে দিল। পরে আবার বলল, আর শোনো ফটিকজি, তোমার ওই বড় গরম র‍্যাপারখানা আমি জড়িয়ে নিচ্ছি। বড্ড হাওয়া, আমার ছোট স্কার্ফ কাজ দেবে না।

মোতীবাইয়ের পরনে সুন্দর একখানা সুপারফাইন ক্রীমরংয়ের জিরো ডিগ্রি শাড়ি। আমি বললুম, আরেকখানা শাড়ি নেবে না সঙ্গে?

না থাক্—মোতীবাই বলল, র‍্যাপারখানা জড়িয়ে এখানাই নিংড়ে নেবো। হোকগে ভিজে কাপড়! গায়ের গরমে শুকোবে।

আসবার সময় অত শীত করবে না,—এই বলে সে তাড়াতাড়ি ঘর-দরজা বন্ধ করতে লাগল।

আমি আর কথা বাড়ালুম না। হেঁটে যেতে হবে অনেকটা পথ। এদিকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার ঠাকুমা কাছে থাকলে শুধু এই কথাটি বলতেন, ছুঁড়ি কী বেহায়া! সায়া-সেমিজের তক্কাও রাখল না!

পথে নেমে ইতর-ভদ্র জনতার ভিড়ের মধ্যে আমরা দু'জন হারিয়ে গেলুম। আমরা দু'জন কে, কোথাকার, কী প্রকার সম্পর্ক আমাদের,—প্রবল জনস্রোতের আঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে আমাদের সকল পরিচয় তলিয়ে গেল! পুণ্যার্থিনী মোতীবাইয়ের পাশে পাশে হনহনিয়ে আমি এগিয়ে চললুম।

নদীর ধারে এসে পৌঁছে একস্থলে মোতীবাই থমকিয়ে দাঁড়িয়ে চারিদিকে একবার তাকালো। ওরই চোখ দিয়ে যেন আমিও দেখলুম, দিক্‌দিগন্তের দ্বার খুলে গেছে! মানুষের সমুদ্রে তরঙ্গ উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। এ যেন মহামানবের সাগরতীর! এ বাহির-বিশ্ব; দূর-দূরান্তরের পরিমাপে এ বিশ্ব অনন্ত। এখানে লৌকিক সম্পর্ক, সমাজ, গৃহপ্রশাসন, ক্ষুদ্র দুঃখ-সুখ,—সব মিলিয়ে গেছে ইন্‌সানিয়তে! আমার মুখে কোনও কথা ফুটল না।

একসময় মোতীবাই দূরবর্তী নৌকাদলের ভিড়ের দিকে লক্ষ্য রেখে শুধু বলল, নেমে চলো ফটিকজি—

মন্ত্রচালিতবৎ আমি ওর অনুসরণ করলুম কাঁচামাটির ধূলোর ওপর দিয়ে। বাতাসের ঝাপটায় সেই ধূলো মাঝে-মাঝে সকলকে আচ্ছন্ন ক'রে দিচ্ছে। আমরা তারই ভিতর দিয়ে ভিড় ঠেলে অগ্রসর হচ্ছিলুম।

নৌকার ভিড় এমন যে, কাছাকাছি গঙ্গার জল দেখা যায় না। অবশেষে এক মাল্লার সাহায্যে আমরা দু'জন ঠেলেঠুলে একখানা

নৌকায় হুমড়ি খেয়ে উঠলুম। সেই সুযোগে গঙ্গার উপর দাঁড়িয়ে সেই লোকটা কবুল করিয়ে নিল, নিরাপদে মাইজিকে সঙ্গমে 'আস্নান' করিয়ে ফিরিয়ে আনব,—শেঠজি পাঁচ টাকা দেবেন।

বলা বাহুল্য, আমরা রাজি হলুম। অতঃপর মাল্লা তার লগি দিয়ে বহু পরিশ্রমে চারদিকের অগণিত নৌকার বেড়াজাল ও জনসমাকীর্ণ গঙ্গাতট ভেদ ক'রে ধীরে-ধীরে আমাদের নৌকা নিয়ে এগোতে লাগল। সঙ্গম অনেকটা দূর।

অগাধ জলের দিকে যাবার প্রয়োজন ছিল না। যমুনার রেখা যেখানে মিলেছে নদীতট ঘেঁষে,—অনেকটা সেই স্থলে। সরস্বতী নদী অবলুপ্ত। সে যাই হোক, নৌকার ভিড় সেখানেও প্রবল। তারই জটিলতার মধ্যে আমরা গিয়ে নৌকাসুদ্ধ আটকিয়ে গেলুম। দুই নৌকার সামান্য ফাঁক পেয়ে মাল্লা ঝপাং ক'রে জলে নামল। বেশি নয়, কোমর পর্যন্ত জল! সেইখানে দাঁড়িয়ে মাল্লা হাত বাড়িয়ে বলল, আইয়ে মাইজি, হামারা হাত পাকাড়িয়ে।

মোতীবাই গায়ের র‍্যাপারখানা ছেড়ে বলল, ধরো ত' আমার হাতখানা—!

আমি ওর আরেকখানা হাত ধরলুম। মোতীবাই জলে ঝাঁপ দিল। মাল্লা ওর হেফাজতে রইল।

স্নানরতা বা সিক্তবস্ত্রা নারীর দিকে তাকাতে নেই। সুতরাং আমি এক পা পিছিয়ে স'রে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চোখ ফেরাতে লাগলুম। দূর ওপারে সম্রাট আকবরের সেই পুরনো ফোর্ট, এবং সেই অক্ষয়বটওয়ালা পুরনো ঘাট ও মন্দির। চোখ দুটো আমার ছাড়া ছিল সবখানে। কিন্তু সেই চোখ বুলোতে বুলোতেই সহসা দেখলুম, আন্দাজ তিরিশ গজ দূরে একখানা নৌকার উপর থেকে ব্রহ্মচারী দয়ানন্দ্ একদৃষ্টে আমাকে লক্ষ্য করছেন।

না, আমি ওঁকে দেখিনি জনসমুদ্রের মধ্যে! আমি তৎক্ষণাৎ

চোখ ফিরিয়ে নিলুম। মোতীবাই জলের থেকে মাথা তুলে বলল, পনেরো কুড়িটা ডুব দিয়েছি, আর নয়—এবার উঠব। দাঁড়াও, এখান থেকেই মাথাটা মুছে নিই।

আঁচলের একটা প্রান্ত নিংড়িয়ে মোতীবাই তাড়াতাড়ি চুলের গোছা পাকিয়ে জল ফেলল, তারপর যেমন-তেমন ক'রে মাথাটা মুছে নিয়ে বলল, এবার তোলো।

জলে নামানো সহজ ছিল, কিন্তু একটা মেয়েছেলেকে হিঁচড়িয়ে কেমন ক'রে নৌকার পাড়ে তুলব, সেইটিই সমস্যা। বললুম, দাঁড়াও, অত ছটফট করো না। একেই তোমার পেত্নীর মতন চেহারা, তা'র ওপর ওই ভিজে জবজবে শাড়ি,—একটু সামলিয়ে উঠো। আমি না হয় ফটিক নাগ, কিন্তু দয়ানন্দরা যে গিজগিজ করছে চারদিকে! তুমি বরং একটা পাজামা আর গলাবন্ধ কোট প'রে এলে ভালো করতে, মোতীবাই।

আঃ তোলো শিগগির, শীত করছে!—

আমি আর কী করি, পাশাপাশি দুই নৌকায় পা দিয়ে কোনও মতে টেনেটুনে মোতীবাইকে তুলে নিলুম। সে আমার র‍্যাপারখানা নিয়ে নিজের পিছন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে দুই প্রান্ত দাঁত দিয়ে চেপে ভিতর দিকে শাড়িখানা ছাড়ল, তারপর সেখানা তুলে নিয়ে বলল, একটু নিংড়ে দাও, লক্ষ্মীটি—হাত বার করতে পারছিনে। আঃ দাও শিগগির, আতুল গা শিরশির করছে!

আড়চোখে একবার দূরের দিকে দয়ানন্দর অবিচল মূর্তিটি দেখে নিলুম। মোতীবাইকে কিছু বললুম না। কিন্তু হতভাগ্য লোকটা বড়ই বঞ্চিত হ'ল।

আমার বিদায় নেবার দিনটা মোতীবাইয়ের জানা ছিল। কিন্তু সেজন্যে তা'র বিন্দুমাত্রও মনোবিকলন দেখছিনে। এবং আমিও

যে কাঠখোট্টা প্রকৃতির লোক, একথাও সে জানে হাড়েহাড়ে। অতএব সে-ব্যাপারে উভয়ের মনে কোনও খেলো ধরনের ভাবোচ্ছ্বাস নেই। আমাদের যাওয়া আসার তুই দিকেরই পথ খোলা। যখন চলে যাব, তখন নিঃশেষেই নিজের পায়ের চিহ্ন মুছে দিয়ে যাব। মোতীবাই কোথায় যাবে, কোন্ অজানা ঠিকানায় সে হারিয়ে যাবে, আমি কখনও তার খোঁজখবরও করব না। তুজনে শুধু রেখে যাব তুটো নাম, তুই জীবনের পাতে, ধর্মশালার দেওয়ালে কাঠকয়লায় নাম লেখার মতো অর্থহীন মিনতির চিহ্ন! কেউ মনে রাখে না সেই নাম।

মাঝখানে কালকের দিনটা শুধু আছি। বাড়িওলা এক যাদব, সে আমাদেরকে একসের ক'রে রোজ তুধ দিচ্ছে, তাকে বলা আছে এবাসা কবে ছাড়ব। তেওয়ারিও নোটিস পেয়েছে। আমি নিজেও পালাতে পারলে বাঁচি। প্রথমত, দয়ানন্দর জন্য জলটা যেন ঘুলিয়ে উঠেছে একটু নোংরায়। দ্বিতীয়ত, একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে—সে যতই স্বাধীন, আধুনিক বা উদারপন্থী হোক না কেন,—তা'র কাছাকাছি থাকাটা আমার পক্ষে খুব ন্যায়নীতি সঙ্গত মনে হয় না। সমাজনীতিকে রক্ষা করা পুরুষেরই দায়িত্ব, তার পক্ষে চিত্তদৌর্বল্য কোনও প্রকারেই মার্জনীয় নয়। আর মেয়ে?—ঠাকুমা বলেন, মেয়ে ত' মাটির ভাঁড়। একবার ভাঙ্গলে আর জোড়া লাগে না।

সর্বাপেক্ষা খুশী হতুম, ব্রহ্মচারী দয়ানন্দ যদি আমার আগে বিদায় নিতেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত অন্ন আর আশ্রয় পেলে সন্ন্যাসীও গৃহী হয়ে ওঠে। আমি এ লোকটার অদ্ভুত রকমের একটা জিদ লক্ষ্য ক'রে অবাক হয়েছি। মোতীবাই যেন অনেকটা নিরুপায় হয়ে ওঁকে দৈনিক খাদ্যসামগ্রী দিতে বাধ্য হচ্ছে! নিষ্ফল রাগে মোতীবাই মাঝে মাঝে ফুলছে, কিন্তু যথাসময়ে তেওয়ারি এসে

নিয়ে যাচ্ছে আটা, ডাল, ঘি, সজি, নুন-মসলা, মালাই বা মিষ্টান্ন—সবই। তেওয়ারি ওঁকে শ্রদ্ধাপূর্বক মহারাজ বলে ডাকে; এটা ওটা কাজে সাহায্য করে, বাসনপত্রাদি মেজে-ধুয়ে দেয়, এবং মাঝে মাঝে ধর্মতত্ত্বেরও আলাপাদি শুনে আসে। কিন্তু আমি নিজে খুব সতর্ক। এসব ব্যাপারে আমি নির্লিপ্ত ও উদাসীন থাকতে চাই। কেননা এই ধরনের পরিস্থিতিতে সাধারণত পক্ষপাতজনিত বিদ্বেষ ফেনিয়ে ওঠে। আমি দয়ানন্দর শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চাই নে। এসব সংসর্গ ত্যাগ করতে পারলেই আমি বাঁচি।

নিঃশব্দেই আমি চলে যেতে পারতুম, এবং মোতীবাই আমার পায়ের শব্দও শুনতে পেতো না। সঙ্গে আমার বিছানাটা একটু ভারি এই যা। দু'একটা জামা-কাপড়ও কিনেছি, অতএব হ্যাণ্ডব্যাগটাও একটু ভারি হবে। এর মানেই হ'ল, অন্তত সাইকেল রিক্‌সা একখানা দরকার। সুতরাং সম্পূর্ণ নিঃশব্দে চলে যাওয়া যায় না! আমার মানিকপুরের গাড়ি বেলা এগারোটার পর। অর্থাৎ দিনের বেলায় সকলের কাছে বিদায় নিয়ে দেনা-পাওনা চুকিয়ে তবে বেরোতে পারব। পিছনে প'ড়ে থাকবে অবশ্য মোতীবাই। কিন্তু ওর জন্য আমার উদ্বেগের কারণ কিছু নেই ত'? জাতি, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, পরিচিত—কোনটার মধ্যেই সে পড়ে না। সুতরাং আমার উদ্বেগের কোনও কথাই ওঠে না এখানে। আমি যদি দূরে গিয়ে মনে মনে কামনা করি, মোতীবাইয়ের স্বাস্থ্য, শরীর, রূপলাবণ্য, কৌমার্য বা সতীত্ব—সবই অক্ষুণ্ণ ও নিরাপদ থাকুক, সেটাও হবে অর্থহীন। মোতীবাইয়ের পূর্বোক্ত অব্যয় বিশেষ্যগুলি ক্ষুণ্ণ হলেই বা আমার কী যায়-অসে। কাঁচের গেলাস ত' স্বভাবতই ঠুন্‌কো, ভাঙবার জন্যই তার জন্ম। আর তা ছাড়া ওসব ব্যাপার নিয়ে স্বভাব-বিদ্বেষী পুরুষরাই মাথা ঘামায় এবং মেয়েরা ওসব কথায় মনে-মনে কৌতুক বোধ করে!

এই সব তর্ক নিয়ে যখন লেপটা পায়ের ওপর তুলে দিয়ে তোলাপাড়া করছি, সেই সময় সেজেগুজে মোতীবাই সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বলল, অনেক বিশ্রাম নিয়েছ কম্‌রেড, এবার ওঠো।

সাজসজ্জার গুণে মেয়েদের বয়স কমে যায় সবাই জানে। এমন কি দিদিমারাও দিদিমণি হয়ে ওঠেন প্রসাধন সাধনের চাতুরিতে।

এবার উঠতেই হ'ল। বললুম, কম্‌রেড বললে ঠিক কী বোঝায় বল ত'?

মোতীবাই গড়গড়িয়ে ব'লে গেল, আমিও ঠিক জানিনে। তবে ভাই, বন্ধু, সতীর্থ, পিতা, স্বামী, ভগ্নীপতি প্রণয়পাত্র,—সবগুলো মিশিয়ে একটা মধুর কেমিক্যাল্‌ শব্দ—কম্‌রেড! কিন্তু আর না ফটিকজি, দুপুর গড়িয়ে গেলে সব মাটি,—চল, শিগগির বেরিয়ে পড়ি।

দুজনে প্রস্তুত হয়ে দরজা বন্ধ ক'রে তেওয়ারিকে পাহারা রেখে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। দুপা এগোতেই দেখি, যাদব তার বড় গাভীটিকে একস্থলে খোঁটা পুঁতে বাঁধছে। মোতীবাইকে দেখেই বলল, মাইজি, আপনাদের পরশু যাওয়াই কি ঠিক?

হ্যাঁ যাদব, পরশুই যাব।—মোতীবাই বলল, তবে কাল সকালে তোমার সব হিসাবপত্র চুকিয়ে দিতে চাই। যাবার দিন বড্ড তাড়াতাড়ি।

যাদব বলল, আপনাদের কাছে আমার আবার হিসেব কি? কত বড় ঘরের মেয়ে আপনি! আমি সব জানি এই শহরে কে কোথায় আপনার নিজের লোক আছে! আপনি কেন যে আমার এই গরীবখানাই বেছে নিলেন, এ আমার কাছে তাজ্জব।

শোনো যাদব—ওসব কথা থাক্‌,—মোতীবাই আবার তাকে

হুঁশিয়ার করল, তোমার তৈজসপত্র আর সমস্ত আসবাপত্রের একটা তালিকা ক'রে কত ভাড়া হয়, কাল সকালে ওটা বোঝাপড়া ক'রে নিয়ো। আচ্ছা—

আমরা দুজনে অগ্রসর হলুম। কিছু দূর গিয়ে মোতীবাই বলল, হাঁটবে?

মন্দ কি? শুধু খাচ্ছি আর ঘুমোচ্ছি। চর্বির ব্যামো ধরবে যে? এই ত' বেশ—শীতের রোদ্দুরে নিরিবিলি হাঁটা—

কিন্তু তোমার পায়ে যদি আবার কনকনানি ধরে?

বলতে বলতেই মোতীবাই একখানা চলন্ত রিক্সাকে হাত বাড়িয়ে ডাকল। হেসে বলল, চাকার গাড়ি চোখে পড়লে আর পা চলে না,—এসো, উঠে পড়ি।

রিক্সায় উঠে ঠাসাঠাসি ব'সে আমিই বললুম, লক্ষ্য করেছি. রিক্সার প্রতি তোমার বড্ড পক্ষপাতিত্ব। কেন বল ত'?

খুব হাসল মোতীবাই। পরে বলল, কিচ্ছু বোঝ না তুমি, তাই তুমি এত মিষ্টি!

আমার গা কেঁপে উঠল। মাস তিনেক আগে কলকাতায় এক সিনেমার ছবিতে একটা মেয়ে এমনি গদগদ কথা বলেছিল। বলতে বলতে সেই ছুঁড়ি এক গাছতলায় আড় হয়ে প'ড়ে একটা ছোকরার সামনে ফুলপাতা চিবোতে লাগল। দুপুরবেলায় মোতীবাইয়ের মতলবটা ঠিক ঠাহর করতে না পেরে বললুম, আমার এখন মনে হচ্ছে রিক্সা আস্তে-আস্তে যায় বলেই অন্তরঙ্গতার সুবিধে মেলে।

তোমার মুণ্ডু!—মোতীবাই বলল, তোমার হ্যাংলামি নেই তাই তোমাকে কাছে টানি, বুঝেছ?

এবার আমি খুব হাসলুম, চিনেছ খুব যা হোক। শালুক চিন্‌লে গোপালঠাকুর! তা হলে উল্টোটা বলি। তুমি যেদিন নিজে

হ্যাংলা হয়ে উঠবে, সেদিন তাহ'লে এই কম্‌রেডের কপালে গলাধাক্কা!

মোতীবাইও হেসে উঠল। রিক্‌সা দূর পথে ধীরে ধীরে চলছিল। এক সময়ে ডান দিকে ঘোরবার মুখে একখানা কালো রংয়ের প্রাইভেট মোটর পাশ দিয়ে ঘুরে একেবারে আমাদের রিক্‌সাখানাকে রুখে দাঁড়াল। অতঃপর ভিতর থেকে একজন সুশ্রী ও বয়স্ক যুবক নেমে এসে মোতীবাইকে সহাস্যে সম্ভাষণ করল সোজা সাহেবী ইংরেজি ভাষায়। বলল, দূর থেকে দেখতে পেয়েছি! আ, পাঁচ বছর পরে দেখা! কেমন আছ, মুন্না? তুমি একদম সেই আছ!

মোতীবাই নেমে এসে সহাস্য সমাদরে যুবকটির হাত ধরল। বলল, আমি সেই আছি? কিন্তু তুমি নেই যে?

কেন, কেন?

তুমি একদম সাহেব ব'নে গেছ। বলো শুনি, এখন কোথায় পোস্টেড্?

ওঃ চাকরি?—খুব হাসল যুবকটি। বলল, উনাওতে ডি-এম্ হয়ে আছি। কিন্তু চাকরি বড় বিশ্রী! একালে বরং মুন্সিগিরি ভাল, কিন্তু জেলাশাসকের সম্মান নেই! যাক্ ওসব কথা। কবে তুমি এলাহাবাদ ছাড়লে বলো ত'? দেখতে পাইনে যে? এখন আছ কোথায়?

মোতীবাই বলল, আমি থাকি অমরাবতীর ওদিকে—

সে কি, দেশগাঁ ছাড়া? শ্বশুরবাড়িতে বুঝি?

বাঁকা চোখে হেসে মোতীবাই বলল, মেয়ে মানেই বুঝি শ্বশুরবাড়ি? তুমি বিয়ে করলে কোথায়?

যুবকটি বলল, আমার চেহারায় বিয়ের চিহ্ন কি খুঁজে পেলে? তবে হ্যাঁ, হবো-হবো হয়েছে!

দু'জনেই খুব হাসাহাসি করল। মোতীবাই বলল, তুমি ত' ছিলে হিউয়েট্ রোডে, এদিকে যাচ্ছ কোথায়?

ভদ্রলোক বলল, প্রাণের দায়ে যাচ্ছি ঠিক সেইখানে, যেখানে প্রাণ দিতে পারি হাসিমুখে!

অ্যাঁ?—মোতীবাই উল্লসিত হয়ে বলল, একি সত্যি? ঝা-বংশের সন্তান, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ,—তুমি করতে যাচ্ছ প্রণয়-বিবাহ?

দুইজনের হাসির চোটে রৌদ্রপথ মুখরিত হ'ল। ভদ্রলোকটি গিয়ে নিজের গাড়িতে উঠল, এবং স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় হাত তুলে অভিবাদন জানিয়ে গেল।

বললুম, ভারি চমৎকার হাসিখুশী ভদ্রলোক!

রিক্সাকে নির্দেশ দিয়ে মোতীবাই উঠে বসল আগের মতন। পরে বলল, ওর নাম দেওনন্দন ঝা, আমার ক্লাসমেট্। খুব ভাল ছেলে ছিল। একালে আর আই-সি-এস নেই, তাই এখান থেকে ও এম-এ পাশ ক'রে ডিগ্রি আনতে গেল লণ্ডনে। ছেলেটা আমাকে টেক্কা দিয়ে ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল।

খুশী মনে বললুম, তবে কি আমি এই ধারণা করব যে তুমি ইংরেজিতে এম-এ পাশ করেছিলে?

মোতীবাই আমার দিকে মুখ ফেরালো। দুই মুখের মাঝখানে ইঞ্চি চারেকের তফাৎ মাত্র। তারপরেই কুলকুলিয়ে সে হেসে অস্থির হ'ল।

আমার গায়ে ছিল যথারীতি গরম কোট, ওর গায়ে ছিল নতুন কেনা একখানি উৎকৃষ্ট পশমিনা স্কার্ফ। দুটো সামগ্রীই জন্তুর লোম দিয়ে তৈরি। কিন্তু আমার কোটের গন্ধে খুঁজে পাই জানোয়ারের গন্ধ, ওর গায়ের গন্ধে যেন বসন্ত-কামিনীর মধুর সৌরভ। তবে কেউ যেন না ভাবে আমার মনে লেগেছে রোমান্সের ছোঁয়াচ, অথবা বঙ্গভাষার রোমাঞ্চ—তা মোটেই নয়। ওই

রিক্সাওলাও যদি ওর কাঁধের পাশে এসে নাক রাখে, সেও ঠিক ফুলের বিছানায় মৌমাছির মতন তন্দ্রায় ঢুলবে!

আচ্ছা, কম্‌রেড মুন্না— ?

মুখ টিপে মোতীবাই আমার দিকে তাকালো, এবং আমি তৎক্ষণাৎ ওর বড় কালো চোখের কৃষ্ণসাগরে ডুবে গেলুম! বললুম, আমি একজন ভিন্‌দেশী পর্যটক, তুমি আমাকে এমন ক'রে ছট-ফটিয়ে তুলছ কেন বলো ত' ?

আমি তুলছি, না তুমিই ছটফট করছ ?

ধরো তাই না হয় হ'ল। কিন্তু কেন বলছ না তোমার আসল পরিচয় ? তুমি অসাধারণ মেয়ে, অথচ বলছ না তুমি কোন্ বোঁটার ফুল। তোমার সমাজ, তোমার স্বজন, তোমার চেনা মহল,— কোনোটা স্পষ্ট জানতে দিচ্ছ না!

কৌতুক বোধ ক'রে মোতীবাই বলল, তুমি ত' চলেই যাচ্ছ, তবে কেন তোমাব এত কৌতূহল ? নাই-বা আমার কিছু জানলে কম্‌রেড, যেমন তোমার পরিচয়ও আমার জানার দরকার নেই! থাক্ না শুধু এইটুকুই, মন্দ কি ? তুমি ছটফট করছো শুধু আমার পরিচয়ের জন্য ? আমার জন্য নয় ? মেয়ের পক্ষে এ যে মস্ত অপমান, এ কি তুমি জান না ? ছি, কম্‌রেড!

বললুম, তোমার সঠিক নাম কোন্‌টা ? মুন্না, না মোতীবাই ?

আবার মোতীবাই হেসে উঠল,—নাম শুধু নাম মাত্র। আমাকে জানবার শুধু একটা সিম্‌বল্! আমি তোমার কম্‌রেড; আমি মেয়ে কি ছেলে—একথা গত এক মাসে তুমিই ভুলিয়েছ! তোমাকে নিয়ে টানাটানি করছি বটে, কিন্তু তোমাকে সত্যিই টানছি কি ? টানছি আমার কম্‌রেডকে,—সে পুরুষ বা নারী কোনটাই নয়! তবু জানি তুমি মেয়ে হলে আমার ভাল লাগত না। মেয়ের সর্বাঙ্গে যে মদিরগন্ধ থাকে, আলুলায়িত মদিরেক্ষণারা

যখন বিহ্বল বাসনায় রসসিক্ত হয়,—সেই দৃশ্য মেয়ের চোখে পছন্দ নয়!

আমি মোতীবাইয়ের দিকে তাকালুম। সে হেসে বলল, তার চেয়ে তোমার এই অরুচিকর গলাবন্ধ গরম কোটে যে খুসো গন্ধ, এ আমার বেশি পছন্দ! ওর মধ্যেই রয়েছে পুরুষ-জানোয়ার—যে বলবান, উদগ্র, আক্রমণশীল, কিন্তু যে গুহাবাসী। সেই আমার কম্‌রেড! তুমি বলিষ্ঠ, অথচ লোভ নেই! তুমি প্রকৃত পুরুষ, স্বভাব-সংযত—তাই তোমাকে বাজিয়ে নেবার জন্য সেদিন নাচ দেখাবার অছিলায়—

থাক্—আমি বাধা দিলুম,—সেদিন ভাবলুম তোমার মতন অসভ্য বর্বর মেয়ে ভূ-ভাবতে নেই! সেই জন্য ভয় পেয়ে আলো নিবিয়ে লেপের তলায় ঢুকেছিলুম! ওকথা আর তুলো না।

ভয় পেলে কেন?—হাসছিল মোতীবাই।

বললুম, জলজ্যান্ত উর্বশীকে দেখলে ভদ্রলোকমাত্রই ভয় পায়!

এক নিরিবিলি প্রশস্ত পথের বাঁদিক ঘেঁষে রিক্‌সা যাচ্ছিল। দুধারে সারি সারি বৃহৎ বৃক্ষদল। শীতপ্রান্তকালের শুকনো হাওয়া সেই গাছগুলির ভিতর দিয়ে হু হু ক'রে বইছে। অলস অপরাহ্ণের সেই মধুর রৌদ্রে আমরা যেন গা ভাসিয়ে দিয়েছিলুম। বলাই বাহুল্য, নারীঘটিত ব্যাপারে প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলোও সাহায্য করে: বাঁ-হাতের ঘড়িতে মোতীবাই দেখল, বেলা প্রায় সাড়ে তিনটে। সে হাসিমুখে বলল, এখনও সময় আছে, কোথাও গাছতলায় নধর ঘাসের ওপর আমার কোলে মাথা রেখে তুমি একটু ঘুমিয়ে নিতে পার!

এই নির্লজ্জ স্পর্ধা মোতীবাইকেই মানায়! চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে আমি বললুম, মড়ার মাথা কোলে নিয়ে পথের ধারে প'ড়ে থাকার মতন! বেশ, আমার যদিই বা ঘুম আসে, তুমি কী করবে?

আমি ?—মোতীবাই আবার হাসল,—আমি তোমার ওপর ঝুঁকে প'ড়ে মাথার চুলের মধ্যে আঙ্গুল বুলোতে থাকব !

এবার আমার হাসি পেল। বললুম, জঙ্গলে যেমন সাপেরা কিলবিল করে! তোমার ওই আঙ্গুলেও বিষ আছে, কম্‌রেড !—না, এসব খেলো প্রস্তাব ! তার চেয়ে চলো কোনও কফি হাউসে, তোমাকে কাজু বাদামের সঙ্গে কফি খাওয়াব।

মোতীবাই বলল, না, এখানকার কফি হাউসের নোংরা কানা-কানি তোমার ভাল লাগবে না। তার চেয়ে চলো, যেখানে হয়ত তুমি আনন্দ পেতে পার !

কোথায় সে ?

চলই না !— এই রিক্‌সাবালা, ঘুমা লো।

রিক্‌সাখানা থমকিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে চলল, এবং আমাদের এই অপরাহ্ণকালীন পরিভ্রমণ সহসা স্থগিত রেখে মিনিট দশকের মধ্যে মোতীবাই ফিরে এল জনবহুল এক পল্লীর কাছাকাছি। সেখানে এক মস্ত বাগানবাড়ির ফটকের মধ্যে ঢুকে সোজা পর্চের তলায় এসে নিজেই রিক্‌সা থেকে নামল, এবং ওই সঙ্গে আমাকেও নামিয়ে নিল।

রিক্‌সাওলা অপ্রত্যাশিত পাঁচ টাকা পেয়ে গেল

আমি যেন মন্ত্রচালিত। মেয়ে জানে মেয়ের প্রভাব পুরুষের মনে কী কাজ করে। আশী বছরের বৃদ্ধানারীর এ ক্ষমতা নেই যে, কাঁচপোকা হয়ে তেলাপোকাকে টেনে নিয়ে যায়। সোজা কথা, যৌবনশ্রী ! শরীরের পেশীর কাঠিন্য বিশেষভাবে একটি বিশেষ আকারে পরিণত হয়। কুড়ি বছরের একটি স্থূলাঙ্গিনী মেয়ে যদি এক বিপুল অসম মাংসপিণ্ডে পরিণত হতে থাকে তবে সে আপন আকর্ষণ হারায়। শুধু বয়স নয়, যৌবনশ্রী ; মোতীবাই কাঁচ-পোকার মতন আমাকে টানছে, কেন না কলকাতার কুমারটুলির পটুয়ারা

যখন সরস্বতীর প্রতিমা গড়তে থাকে, তখন জাত-শিল্পী জানে, ওই কাঁচা মাটির আয়তনের মধ্যে কোথায় কতটুকু কমবেশী এঁটেলা মাটি ধরালে তবে ইস্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের মনে রং ধরবে। সৃষ্টি-কর্তা স্বয়ং ব্রহ্মা গোঁফে চাড়া দিচ্ছেন আপন কৌতুকরসে, যখন মোতীবাই তা'র নিটোল, সুঠাম ও লীলায়িত তনুলতার বিশেষ বিশেষ সন্ধিতে মোচড় দিয়ে আমাকে এই অট্টালিকার অবারিত অন্তঃপুরে নিয়ে চলল। আমার নিজের এই সজ্ঞান দুর্বলতা লক্ষ্য ক'রে নিজেই আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমি জুয়েলারের ছেলে, আমিও জহুরী। অহঙ্কার ছিল আমার যে, অতিশয় সচেতন মন নিয়ে আমি জীবনের সর্বক্ষেত্রেই চলাফেরা করি। সেই আমার প্রবল সচেতন মন মোতীবাইয়ের সর্বনাশা দেহবল্লরীর আশেপাশে যেন ছিনিমিনি খেলছিল। আমি জানি এ খেলা মাংসপেশীর,—যেটার শিরা-উপশিরা আপন বাঁধন দিয়ে নারীদেহকে মজবুত করে রাখে, এবং যার একমাত্র প্রাকৃতিক প্রয়োজন হ'ল পুরুষের অগ্নি-বাসনাকে উদ্দীপ্ত এবং উদগ্র ক'রে তোলা। সৃষ্টিকর্তা সেই পরম লগ্নটির জন্য প্রতীক্ষা করেন।

বুবুয়া—? মোতীবাই উপরতলায় উঠে এসে উচ্চকণ্ঠে ডাকল।

ভিতর থেকে হনহনিয়ে এল এক বুড়ো চাকর, এবং তাকে দেখামাত্র উল্লসিত হাসি হেসে মোতীবাই ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। বুড়োর গলার মধ্যে মুখ রেখে পুনরায় সে বলল, বিজ্‌মন, তুই ম'রে গেলে আমি বাঁচতুম। অব তক্‌ তুসি জিন্দা হ্যায়?

বিজ্‌মন ওরফে ব্রিজমোহন ধরা গলায় এবার বলল, তুই ফিরে এসেছিস, এবার আমাকে মেরে ফ্যাল্‌, মুন্না।

মোতীবাই বলল, বুবুর সঙ্গে আমার ভীষণ দরকার। ও কি ঘুমোচ্ছে অবেলায়? বুঝলে কম্‌রেড, এই হতভাগা বুড়োই আমাকে মানুষ করেছে—একেবারে সেই আঁতুড় থেকে।

বলতে বলতেই দ্রুত বেরিয়ে এলেন 'বুবুয়া', অর্থাৎ মোতীবাইর পিসি। পিসি বললে যে বয়সটা বোঝায়, তা একেবারেই নয়। এ যেন ভরানদীর মাঝামাঝি! হয়ত মোতীবাইর সমবয়সী,—বলা কঠিন, কে বয়োজ্যেষ্ঠ। আমি হাত তুলে নমস্কার জানালুম। মোতীবাই সে মহিলার গলা জড়িয়ে হৈ চৈ ক'রে সমাদর জানালো। আমি বাইরের লোক, কিন্তু পালাবার পথ পাচ্ছিলুম না।

বুড়ো বিজ্‌মন তার পিরানের হাতায় চোখ দুটো মুছে বলল, আসুন বাবু, এঘরে বসবেন। ও মেয়ে আমার পাগ্‌লি—

বড় একটি ঘরে এসে মখমলের গদি আঁটা একখানা আরামদায়ক কেদারায় বসে আমি হাসিমুখে বললুম, পাগ্‌লি কেন বলছ, বিজ্‌মন? ওঁর মাথা ত' খুবই পরিষ্কার!

না বাবু, না—বিজ্‌মন বলল, ওকে দেখলেও আমার কান্না পায়! ওকে মানুষ করেছি, আমারই সব দোষ। বাবুসাব, ওকে দেখার আগে আমার মৃত্যু হয় না কেন?

থাম্, অমনি মরলেই হ'ল—বলতে বলতে মোতীবাই তার সমবয়স্কা পিসিকে নিয়ে ঘরে ঢুকল,—এমনি তুই মরবি নাকি? আমাকে খেয়ে তবে তুই যাবি!

বিজ্‌মন বুড়ো হলে কি হবে, দশাসই তা'র জোরালো চেহারা। সুতরাং উভয়ের কারুরই মৃত্যু সম্ভাবনা বর্তমানে নেই! তবু পিসি ও মোতীবাই যখন হাসিমুখে সামনে এসে বসলেন, বুড়ো তখন আরেকবার জামার হাতায় চোখ মুছে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মোতীবাই পরিচয় করালো। ইনি ফটিক নাগ, জুয়েলার, এবং আমার কম্‌রেড, আর ইনি আমার আপন ছোটপিসি যমুনা কাউল। তবে পিসি হলে কি হয়, আমার শত্তুর!

এই ব'লে মোতীবাই ব'সে বসেই যেভাবে তার বুবুকে জড়িয়ে

ধরে আদর জানালো, সেটা যেন প্রিয় পুরুষকে আলিঙ্গন করারই সমতুল্য। পিসি আর পিসি নয়,—অন্তরঙ্গ বন্ধু।

হাসি-হাসি মুখে যমুনা বললেন, আপনি জহুরী শুনলুম। খুব ভাল সময়ে এসেছেন। বা'র করুন ত' আপনার কাছে কী আছে, একটু দেখি?

হকচকিয়ে আমি মোতীবাইয়ের দিকে তাকালুম। বিগত একমাসকালের মধ্যে ঘুণাক্ষরেও জানতে দিইনি, আমি কোনও জড়োয়া-জহরৎ বা টাকাকড়ি বহন করছি! এটা বিস্ময়ের কথা, সে কী প্রকারে আমার ভিতরের পকেটের ইতিহাস জানলো।

আমি যখন বিব্রত বোধ করছিলুম, তখন মোতীবাই বলল, পিসির কাছে সঙ্কোচ ক'রনা। ও কিছু কিনতে পারে বলেই তোমাকে এখানে এনেছি। গলার কাছে গোটা দুই বোতাম খোলো, তোমার বাঁদিকের ভিতরের পকেটে জুয়েলারিগুলো আছে!

বললুম, ডান দিকের পকেটে নয়?

না, আমি ওগুলো গুছিয়ে দিয়েছি। নাও, বা'র করো।

এমন বেয়াকুব আর কোনদিন হইনি। দেখা যাচ্ছে তাহলে আমার ডানদিকের পকেটের পনেরো হাজার টাকার কথাও মাগি জানে! মনে করেছিলুম এ পৃথিবীর কেউ জানে না, হীরেমুক্তো-পান্না-চুনীর বাণ্ডিল নিয়ে অবাধে ঘুরছি সর্বত্র। গোমেধ, পোকরাজ, মোতী, খাঁটি প্রবাল, আসল মুক্তোর মালা—কী নেই আমার সঙ্গে? আমি যেন গাড়োল ব'নে গিয়েছিলুম। আমার নারীসঙ্গের রোমাঞ্চ রসবোধ পলকের মধ্যে মিলিয়ে গেল, এবং আমার প্রখর বৈষয়িক বুদ্ধি উঠে দাঁড়াল। অতঃপর শান্তকণ্ঠে আমি বললুম, বড্ড দামী সামগ্রী এসব,—আপনারা কোন্‌টা দেখতে চান্ বলুন?

যমুনা দেবী বললেন, মুন্নার কাছে শুনলুম, আপনার কাছে আসল মুক্তোর একটি পাঁচনরী সেট্ আছে—

মোতীবাই বলল, তুমি ছাখো বুবু, ওর ওপর একটা নীলের আভা খেলে, ওটা আমি তোমার জন্যে ভেবে রেখেছি। আচ্ছা দাঁড়াও একটু, কম্‌রেড—।

বুড়ো বিজ্‌মন কফির ট্রে এবং এক প্লেট সল্‌টেড কাজু বাদাম এনে সামনে রাখল। যমুনা বললেন, ঠিক আছে বিজ্‌মন, পরে তোকে ডাকব।

বিজ্‌মন বাইরে গেল। যমুনা দরজাটা বন্ধ ক'রে ঘরের মধ্যে সব আলোগুলো জ্বেলে দিয়ে বললেন, আগে সবাই আমরা কফি খেয়ে নিই। তাড়া নেই ত' আপনার?

হাসিমুখে বললুম, আজ্ঞে না—

কফি পানের মাঝখানে মোতীবাই বলল, আমার কম্‌রেড ভারি মজার লোক, জানো বুবু? ওর ভেতরের শাঁস মিষ্টি, কিন্তু ওর বাইরেটা হ'ল 'নারিয়েল'! এক মাস ধ'রে আমি জ্বলে পুড়ে মরছি!

যমুনা বললেন, কই, ওঁর কথা তোর কাছে আগে শুনিনি ত'?

ট্রেন দুর্ঘটনার কথাটা মোতীবাই বেমালুম চেপে গিয়ে বলল, শুনলে যে নিন্দে হবে কম্‌রেডের, আমি ওকে ঢেকে রেখেছিলুম!

'ভাবীকে' একটা খবর পাঠাই, কেমন?

মোতীবাই বলল, মা'র কথা বলছ? না, এখন নয়। নিজেই আমি যাব কম্‌রেডকে সঙ্গে নিয়ে। আগে তুমি মালাটা দেখো ভাল ক'রে।

কফি খাওয়া শেষ ক'রে অগত্যা আমি কোটের বোতাম খুলে ভিতরের পকেট থেকে নীল কাগজের বড় মোড়কটা বা'র করলুম। এসব সামগ্রী সাধারণত সামন্ত রাজগোষ্ঠী বা শেঠ বণিকদের সমাজে

বিক্রি হয়—যারা তেমন দর-দস্তুর করে না। আমরা চার-পাঁচ পুরুষের জহুরী। ইদানীং নানা কড়াকড়ির জন্য কেনাবেচার রেকর্ড রাখতে হয়। আগে এসব ছিল না। সেই জন্যই বিশেষ মওকায় হাজার টাকার মাল দশ হাজারে বেচে বেরিয়ে যেতুম! পোকরাজের ছিলা কাটার দক্ষতায় হীরে বলে সেদিন চালানো কঠিন ছিল না। আসল মুক্তো চেনে ক'জন? চুনী-পান্না-নীলা—এসব আজকাল যেখানে-সেখানে তৈরী হচ্ছে।

দু'ছড়া মুক্তোর মালা বা'র করলুম। একনরীর একজোড়া ছিল আমার কাছে। তারই এক ছড়া নিয়ে গেছেন রানী এলিজাবেথ—সেই যেবার তিনি কলকাতায় এসেছিলেন! এই ছড়াটা তারই জুড়ি। এর নিচেকার বড় মুক্তোটাই এগারশ' টাকা! কি জানেন, রাজবাড়ি ছাড়া এসব বা'র করা চলে না! আর—এই যে দেখছেন পাঁচনরী ছড়াটা, এ বড় অদ্ভুত সামগ্রী! পলিনেশিয়ার নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই! ফরাসী নাবিকরা নেমে যায় কোরাল রীফে,—সেই পলিনেশিয়া দ্বীপের কোলে। তারা খুঁজে পায় এসব সামগ্রী একশ' ফুট জলের নিচে। অন্ধকার সমুদ্রের তলায় জীবন্ত মুক্তোরা আলোর টুকরোর মতন ঘোরে,—সে চিরকালের রহস্য—!

মুগ্ধ চক্ষে দুই নারী দুটি মালা পরীক্ষা করছিল। এক সময় যমুনা বললেন, আমার কিন্তু এই একনরীটাই বেশি পছন্দ, মুন্না।

আমি এবার খুব হেসে উঠলুম, আপনি ধরেছেন ঠিক। সত্যিকার চোখ আছে বলেই বেশি দামী মালাটা চিনেছেন।

এটার দাম কত? আমারও এটা বেশি পছন্দ।—মোতীবাই বলল।

আমি যেন কুণ্ঠায় নতমুখ হয়ে গেলুম। আমি যে এত বিনীত,

এত সৌজন্যশীল—নিজেও যেন বিশ্বাস করতে পারিনে। সেইজন্য মৃদুকণ্ঠে বললুম, ক্ষমা করবেন আমাকে। ওটা শুধু দেখাবার জন্য বা'র করেছিলুম!

মোতীবাই বলল, কেন? এটা তুমি বেচবে না, কম্রেড?

স্নিগ্ধ হাস্যে সবিনয়ে বললুম, ওটা আওয়াগড়ের বড়কুমারের স্ত্রী অর্ডার দিয়েছেন, তাই মধ্যপ্রদেশে যাচ্ছিলুম—। ওটা এখানে বেচলে আমার ক্ষতিই হবে। বুঝতেই পারেন আমরা ব্যবসায়ী—

আমার এই চেহারাটা—যেটা আমার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া—এটার সঙ্গে সম্ভবত মোতীবাইয়ের পরিচয় ছিল না। সে যেন ঈষৎ অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়েছিল। আমি যেন তার নতুন আবিষ্কার।

যমুনা বললেন, এ ত' 'সচ্চি বাৎ,' আপনি কারবারি মানুষ। যতই বন্ধুত্ব থাক্, আপনার প্রাপ্য থেকে কেন বঞ্চিত হবেন? তবে আমাদের দিক থেকেও একটা কথা ছিল, ফটিকজি—

এই বলে তিনি নিজেই হাসতে লাগলেন।

মোতীবাই সেই মুক্তোর মালাটা আরেকবার নাড়াচাড়া ক'রে বলল, না, এ হ'তে পারে না!

আমি মুখ তুললুম। আমার চোখের চাতুরী ঠিক কতটুকু প্রকাশ পাচ্ছে, এটি না জেনে আমি মৃদু অমায়িক একটু হাসি মুখের উপর মাখিয়ে রেখেছিলুম!

মোতীবাই আবার বলল, এ হ'তে পারে না। কে তোমার কোথাকার আওয়াগড়ের বড়কুমারের বউ,—তার পছন্দটাই বড়, আর এই যে আমরা দুজনে তোমাকে নিয়ে একান্তে ব'সে এটি তারিফ করছি, এটা কিছু নয়? তুমি পাকা ব্যবসায়ী, এ দেখতেই পাচ্ছি কমরেড, কিন্তু লাভ-লোকসানের খতিয়ানটাই কি মানুষের

জীবনে সকলের বড় প্রশ্ন ? আমার বুবুয়ার কাছে তুমি শ্রদ্ধালাভ করবে, এই জন্যেই তোমাকে এনেছি, কম্‌রেড !

মেয়েরা যখন প্রিয় পুরুষ বা প্রণয়ীর ওপর রাগ করে, তখন লক্ষ্য করেছি তা'রা প্রথমেই আঁচল টেনে তাদের দেহের প্রিয়দর্শন অংশগুলি ঢেকে দেয় ! মোতীবাইও তাই করল।

আমি আনত বিনয়ে শুধু ঈষৎ হাসলুম। পরে শান্ত ও নম্র কণ্ঠে বললুম, আমাকে ক্ষমা করবেন। লাভ-লোসকান ছাড়াও অন্য একটি কথা আছে। রাজবাড়ির সবাই চিঠি দিয়ে বললেন, হোক না কেন বারো হাজার টাকা, অমন সুন্দরী বৌরানীকে এই মালাটিই মানাবে ! তিনি নাকি ডাকসাইটে রূপসী।

তুমি দেখেছ তাঁকে ?

নতমুখে বললুম, দেখেছি বৈ কি। সেখানে গিয়ে তাঁর গলার মাপ আমাকে নিয়ে আসতে হয়েছে। ওঁরা আমার রাহাখরচও দিচ্ছেন হাজার টাকা।

কেমন একটা উৎকণ্ঠিত স্তব্ধতা দেখা গেল তিনজনেরই মধ্যে। সেটি সুদীর্ঘ মিনিট খানেকেরও বেশি ! এক সময় যমুনা বললেন, টাকার পরিমাণের কথাটা ঠিক ভাবছিনে। কিন্তু আপনি রাজ বাড়িতে কথা দিয়ে এসেছেন, সেইটিই সমস্যা।

আমার বুকের মধ্যে স্পন্দনের আওয়াজটা নিজেই শুনছিলুম। ওষুধ ধরেছে ! অদৃশ্য সুন্দরীর সম্বন্ধে অপর সুন্দরীর স্বভাবজাত যে বিদ্বেষ,—তার ওপর সুড়সুড়ি লেগেছে ! তবু এখনও হীরের অলঙ্কারগুলি বের করিনি !

এক সময় নিঃশব্দে নীল মোড়কের মধ্যে আমি একে একে মালাগুলি গুছিয়ে তুললুম।

আমার একটা সন্দেহবাতিক আছে। এ আমার ব্যাধি মনে হয়। কিন্তু ওরই মধ্যে হঠাৎ সন্দেহ হল, যমুনা তাঁর একটি

আঙুলে মোতীবাইয়ের হাঁটুর কাছে একটি সাংকেতিক টিপ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং দরজা টেনে বেরিয়ে যাবার আগে বললেন, আপনি আমার অতিথি, সামান্য মিষ্টিমুখ ক'রে যান্।

একটি পলকমাত্র, তারপরেই মোতীবাই উঠে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে অত্যন্ত অশোভনভাবে খিল এঁটে দিল। তার এইপ্রকার আচরণে আমি হকৃচকিয়ে গেলুম। দিনমানে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের এই অট্টালিকায় এক ধনীকন্যা আমার মতন একজন ক্যান্‌ভাসারকে নিয়ে ঘর বন্ধ করবে, এটা স্নীতিসম্মত নয়। তা ছাড়া ওই পিসি আব ওই বুড়ো-ঘুঘু চাকরটা রইল সাক্ষী। ভবিষ্যতে যদি এই বিদেশিনীকে নিয়ে ব্যভিচারের মামলা ওঠে, তবে কোন্ জজ বিশ্বাস করবেন যে, এই নাবী তার পিসির বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমার উপর হামলা করেছিল? চিরকেলে সমাজমন যে-কোনও নারীঘটিত মামলায় পুরুষকেই ত প্রথম সন্দেহের চোখে দেখে। পুরুষকেই আগে প্রমাণ করতে হয়, সে নির্দোষ!

দরজা বন্ধ ক'রে মোতীবাই এসে ছম্ ক'রে আমার গায়ে-গায়ে বসল। আমি মামলার কথা ভেবে আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে ওরই মধ্যে একটু ব্যবধান রেখে বসবার চেষ্টা পেলুম। এ-মেয়ে এক মাস আগেকার সে মেয়ে নয়! ছ'ঘণ্টা আগেও যে ছিল শুভঙ্করী, সে যেন হয়ে উঠল ভয়ঙ্করী।

ক্ষীণকণ্ঠে একসময়ে বললুম, আমার মনে হচ্ছে তুমি রাগ করোনি। কিন্তু—দরজাটা খুলে রাখলে হোত না?

কেন?

না, আর কিছু নয়। তবে সবাই ভাববে আমরা পেট ভ'রে খেয়ে নিচ্ছি অথচ আমরা উপবাসী! একথা আমি কোনমতেই বিশ্বাস করিনে যে, তুমি আমাকে ব্ল্যাক্‌মেইল্ করবে!

চমকিয়ে উঠল মোতীবাই। পরে বলল, এ কি বলছ তুমি? আমি···তোমাকে······?

নিজেই সে উঠে দাঁড়াল। তারপর ধরা গলায় বলল, আজ বিশ্বাস করছি তুমি ভালবাস টাকা! তোমার কাছে আর সব মিথ্যে। তোমাকে দেখছি এক মাসেরও বেশি, কিন্তু সেই দেখা আমার সত্যি হয়নি। সেইজন্যে তুমি যখন একদিন স্নানে গিয়েছিলে, দেখলুম তোমার আসল পরিচয় তোমার ওই দুই পকেটে! আমাকে কোনদিন তুমি বিশ্বাস করনি, কম্‌রেড।

মোতীবাইয়ের গলা বুজে এল। সে হাত বাড়িয়ে দরজাটা খুলে দিল। পরে বলল, দরজা বন্ধ করেছিলুম পাছে পিসির কাছে তুমি খেলো হয়ে যাও! আমার পরিচয় তোমার চেয়ে অনেক সামান্য, এমন কি হয়ত গৌরবেরও নয়! কিন্তু তুমি ছিলে আমার চোখে অনেক বড়,—ধনদৌলৎ, জড়োয়া-জহরৎ—এদের চেয়েও বড়—!

বলতে বলতে দরদরিয়ে মোতীবাইয়ের চোখ দিয়ে যখন জল নামল, তখন আমি পকেট থেকে সম্পূর্ণ মুক্তোর মালার সেটটি বা'র ক'রে তার সামনে রাখলুম। বললুম, মুন্না, এই রইল তোমার হাতে। তোমার যেমন ইচ্ছে তাই ক'রো! এর মধ্যে আছে মালা, আসল মুক্তোর আংটি, রিষ্টলেট্‌ এবং কানের মুক্তোর ঝাড়। আমার আর কিছু বলবার নেই। বৌরানীকে জানিয়ে দেবো, ট্রেনদুর্ঘটনার জন্য দেরি হয়ে গেল, কিছুদিন সময় নিচ্ছি।

এমন সময় পিসি এসে ঘরে ঢুকলেন এবং তাঁর পিছনে পিছনে মস্ত বড় দুখানা থালায় রাশি পরিমাণ গরম-গরম ঘৃতপক্ক খাদ্যসামগ্রী নিয়ে বিজ্‌মন হাজির হল। চেয়ে দেখলুম পিসির নবতন সাজসজ্জা করার ফলে অন্তত পাঁচ সাত বছর বয়স কমে গেছে।

মোতীবাই অলক্ষ্যে চোখ দুটো মুছে নিল। সে যখন হাসে, তখন সে রমণীয়; যখন কাঁদে তখন আরও আদরণীয়।

হাসিমুখে পিসি বললেন, আমরা একসঙ্গে বসে খাব,—কেমন ফটিকজি? আপনি এসেছেন, কী সৌভাগ্য আমাদের!

মোতীবাই বলল, উনি ফুল সেটটাই তোমাকে বিক্রি ক'রে দিচ্ছেন, পিসি,—এই নাও—আমি আসছি হাত ধুয়ে—

বিস্ময়বিমূঢ়া পিসির সামনে দিয়ে মোতীবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পিসির মুখে চোখে খুশীর আভা লক্ষ্য করলুম। তিনি বললেন, পাগ্‌লি নিশ্চয় আপনার ওপর চাপ দিয়েছিল?

বললুম, আজ্ঞে না, তবে দুজনেই আরেকবার বিবেচনা ক'রে দেখছিলুম। এ বোধ হয় ভালই হোলো—।

যমুনা হাসলেন। পরে বললেন, কি জানেন, এ আমি জানতুম —মুন্না সেই ছোটবেলা থেকেই বড্ড জেদি। জিদের জন্যেই বেপরোয়া হয়ে গেছে।

যমুনা খাবার সাজাতে বসলেন। মোতীবাই হাসিমুখে আবার এসে দাঁড়াল।

॥ ৫ ॥

কোনও মুহূর্তেই ভুলে যাওয়া সম্ভব নয় যে, আমাদের বিচ্ছিন্ন হবার সময় আসন্ন। মাঝখানে শুধু মাত্র একটা দিন, তারপর তুমি কার, কে তোমার। ঈশ্বরকে ডেকে বলতে ইচ্ছা করে, থ্যাঙ্ক ইউ, ভগবান—তুমি আমার মধ্যে ভাবোচ্ছ্বাস পুরে দাওনি। আমি মনোবিকলনের ইন্দ্রজালে জড়িয়ে পড়িনি। বিশ হাজার টাকার মাল বিনা রসিদে ছেড়ে দিয়ে এলুম, সেটা চোখের জলের জন্য নয়,—সেখানে আমার সহজাত দিব্যদৃষ্টি বা তৃতীয় চক্ষু কাজ করেছিল। নিশ্চিন্তভাবেই উপলব্ধি করেছি, এরা বিশ্বাসঘাতক নয়। টাকা আমি ঠিকই পাব।

আহারাদি প্রচুর পরিমাণেই হয়েছিল। মোতীবাঈ যখন নেমে এল আমার আগে-আগে, রাত তখন আটটা বেজে গেছে। রাস্তায় নেমে এসে আমিই বললুম, তোমাকে সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছে কেন, মুন্না? পিসির এখানে তুমি থাকলেই ত' পারতে?

মোতীবাই বলল, তোমাকে ছেড়ে?

বাঃ আমাকে ত' পরশু দিনই ছেড়ে দিতে হবে।

হাসল মোতীবাই,—পরশুর এখনো অনেক দেরি, কম্‌রেড। তা'র আগে আমার ওপর দিয়ে চলে যাবে যুগ-যুগান্ত, জন্ম-জন্মান্ত! তোমার সঙ্গে-সঙ্গে আছি একমাস,—কিন্তু সমস্ত জীবনের মধ্যে এই এক মাসের মতন আর কোনদিন এমন নিঃসঙ্গ বোধ করিনি!

মানে?—আমি অবাক হলুম,—আমি থাকাকালীনই নিঃসঙ্গ বলছ?

হ্যাঁ, ঠিক তাই।—একবারটি চুপ ক'রে গেল মোতীবাই, কী

যেন ভেবে নিল কতক্ষণ, পরে অন্যদিকে চেয়ে আবার আস্তে আস্তে বলল, আমি ত' থাকি লোকসমারোহের মাঝখানে। সে ত' জনতা। কিলবিল করছে মানুষ চারপাশে। কিন্তু তুমি যে একান্ত। তুমি ছাড়া ভূ-ভারতে আর যে কেউ নেই। কম্‌রেড, তাই তোমার সান্নিধ্যে এসে আমার এই প্রথম মনে হচ্ছে, কী নিঃসঙ্গ আমি।

পশুপক্ষী-জগতে স্ত্রীজাতি অনেকটা নিরীহ এবং পুরুষের মুখ-চাওয়া স্বল্পভাষিণী। আমার কপাল মন্দ, কেন না মানব জগতে এর বিপরীত দেখে আসছি। কুলি-কামিনী থেকে মোতীবাই—একই ছাঁচে ঢালা,—কথার ফুলঝুরি। তফাৎ শুধু ভাষাবিন্যাসে। একটিমাত্র বাক্য যেটি শুনতে চাই, আমার যাবার আগে পিসি টাকাটা কখন দেবে। আশ্চর্য, মোতীবাই সে কথার ধারে কাছে ঘেঁষছে না।

পূর্ণিমার চন্দ্র পূর্ব আকাশে উঠে এসেছে অনেক উঁচুতে। তবু চওড়া রাস্তার আলোটা বাঁচিয়ে দুজনে পাশাপাশি হাঁটছিলুম। ইতিমধ্যে মোতীবাই কখন যেন মাথার ঘোমটা তুলে দিয়েছে। মুখে বলছে, কম্‌রেড,—হাঁটছি যেন স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু হঠাৎ যদি আমার কলকাতার স্ত্রী এখনই 'বন থেকে বেরোলো ভূতী'-র মতন সামনে এসে দাঁড়ান্, তাহলে নিশ্চয় জানি মুন্নাকে তিনি সহসা কিছু বলতে ভরসা পাবেন না, তবে আমার কপালে নির্ঘাত সম্মার্জনী। দৃশ্যটা ভাবতে গিয়ে ভয়ে গা বমি-বমি ক'রে এল।

এক সময় বললুম, তুমি যে বললে তখন, তোমার মায়ের ওখানে যাবে? কই গেলে না?

মোতীবাই শান্তকণ্ঠে বলল, জানি আমাকে এড়াতে পারলেই তুমি বাঁচো। কিন্তু ওকথা এখন নাই বা তুললে, কম্‌রেড?

চুপ ক'রে গেলুম। কোথাও কোনো কথা, কোথাও-বা ব্যথা

আছে, সে ক্ষতস্থানে আমি হাত দিতে ইচ্ছুক নই। মা শুধু জননী মাত্র, নিত্য জীবনের সঙ্গিনী তিনি নন।

মোতীবাই এবার বিশুদ্ধ ইংরেজিতে যা বলল তা'র তাৎপর্য এই, তোমার বিষয়ী মন ভুলতে পারে না সাম্প্রতের পরিবেশ। তুমি সবটাই চাও প্রত্যক্ষ, যাকে বলে বাজিয়ে নেওয়া। চিত্তবৃত্তির ইতিহাস কিছু নয় তোমার কাছে, তুমি চাইছ সুস্পষ্ট পরিচয়। একথা কি এখনও বোঝনি কম্‌রেড, লক্ষ জননী একদিকে, আর তুমি একদিকে? তা'র চেয়ে এই ত' ভালো, এই তুমি আর এই আমি? তোমার আড়ালে যাক্ না বিশ্বজগৎ দেড়দিনের জন্য হারিয়ে? রং যদি আমার মনে ধ'রে থাকে, সে মন্দ কি? হোক না মাত্র দেড় দিন। আমার আকাশ জুড়ে থাক্ না কেন এই রামধনু। তারপর মিলিয়ে যাবে—যাক্। শুধু জানব, সমস্ত জীবনের অবিচ্ছিন্ন নিরানন্দের মাঝখানে একটিমাত্র মাস আনন্দে বেঁচেছিলুম—কূলহারা মহাসাগরের মাঝখানে রক্তিম প্রবালদ্বীপের মতন।

শুধু সন্দেহক্রমে এবার আমি সংযম হারালুম। ভাবলুম মোতীবাই বোধ হয় কাঁদছে। নৈলে মেয়েদের শরীর আমি কখনও স্পর্শ করিনে। অতি সন্তর্পণে ওর একখানা হাত ধ'রে আমি বললুম, মুন্না, আজ দুপুর থেকে জলভরা মেঘের ছায়া পড়ছে তোমার মনে। চলো, তোমাকে নিয়ে ফিরি আমাদের চালাঘরে।

না—মোতীবাই প্রতিবাদ জানাল,—এখন ফিরব না সেই নরককুণ্ডে। তোমার দয়ানন্দের নোংরা সন্ন্যাস সেখানকার আবহাওয়াকে দূষিত করেছে। যতক্ষণ বাইরে থাকি, ততক্ষণই স্বস্তি।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা পেরিয়ে গেছি অনেক দূর। পিছনে ফেলে এসেছি বায়রানার এলাকা। দূরে দেখতে পাচ্ছিলুম সেই আমাদের শ্যামবাগের ছোট স্টেশন। রাত কম হয়নি।

উৎসাহিত হয়ে এবার বললুম, তাহলে এক কাজ করা যাক্,

মুন্না। ওয়েটিং রুমে থাকি আজ রাতটা। কাল কোথাও এক জায়গায় থাকা যাবে। আপাতত তোমাকে স্টেশনে বসিয়ে আমি গিয়ে চুপি চুপি মালপত্রগুলো নিয়ে আসি। আমার ব্যাগ-বিছানা, আর তোমার সেই পুঁটলিটা,—আর ত' কিছু নেই।

মোতীবাই বলল, প্রস্তাবটা মন্দ নয়। পারবে সব গুছিয়ে আনতে? একখানা রিক্‌সা নিয়ে যাও। কিন্তু যাদবের পাওনা টাকা দিতে হবে যে বুঝিয়ে? আমার পুঁটলিতে ক্যাশ টাকা আছে অনেক।

ওকথা থাক্—আমি বললুম, যাদবের হিসেব আমি ক'রে রেখেছি। বিছানাপত্র আর ফার্নিচারের ভাড়া পঁচাত্তর, বারো দিনের বাড়িভাড়া ষাট, তেওয়ারির ছত্রিশ, দুধের দাম আঠারো—মোট প্রায় একশ' নব্বই হয়। আমি দিয়ে আসব শ' দুই টাকা।

কতক্ষণ লাগবে তোমার ফিরতে?

কতক্ষণ আর! যেতে-আসতে মিনিট কুড়ি, মাল-পত্র গুছিয়ে নিতে দশ মিনিট, মিনিট পাঁচেক যাদব আর তেওয়ারি, দয়ানন্দকে যদি পাই ধরো আরও পাঁচ মিনিট। বড় জোর মোট পঁয়তাল্লিশ মিনিট। রিক্‌সাখানা সঙ্গেই থাকবে, ভাববার কিছু নেই। ফিরে এসে দিব্যি রিটায়ারিং রুমে রাত কাটানো যাবে।

দুজনে আমরা এবার হনহনিয়ে এসে পৌঁছলুম স্টেশনে। এখন কোনও গাড়ি যাওয়া-আসা নেই। ছোট স্টেশন জনবিরল। এখানে-ওখানে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে কিছু কিছু লোক। ঠাণ্ডা ঘন চাঁদিনী রাত। কোথাও কোথাও আগুন জ্বেলে কিছু কিছু লোক ঘিরে বসেছে।

স্কার্ফখানা জড়িয়ে মোতীবাই ঘোমটা টেনে বসল একখানা বেঞ্চিতে। হাতঘড়িতে দেখা গেল পৌণে দশটা। আমি একখানা

রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। আমার এক পকেটে তখনও প্রায় দেড় লক্ষ টাকার মাল, অন্য পকেটে হার্ড ক্যাশ পনেরো হাজার টাকা। কিন্তু ভারতীয় চোর-ডাকাত-গুণ্ডা-পকেটমার বা রাজনীতিক স্বেচ্ছাসেবক—এরা চিরদিনই আমার শ্রদ্ধার পাত্র, কেননা কোনও দিনই আমি এদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইনি!

সাত আট মিনিটের মধ্যেই আমার রিক্সা এসে থামল যাদবের দরজায়। আমি নেমে গিয়ে তার ঘরের দরজায় উঁকি দিলুম। সে গৃহস্থ গোয়ালা। সন্ধ্যা বেলায় সম্ভবত সে ভাঙ খেয়েছে, এখন ঘুম আসার আগে যথারীতি সে তুলসীদাসের দোঁহা ধরেছে। মৃদুস্বরে আমি তাকে ডাকলুম। সে ধড়মড়িয়ে উঠে বাইরে এল।

বললুম, যাদবভাই, তোমার মোট কত পাওনা হয় পরশু সকাল পর্যন্ত?

যাদব তৎক্ষণাৎ হিসেব করে বলল, তেওয়ারিব টাকা, হারিকেনের আলো, আর অন্যান্য সব ধ'রে আপনি পৌণে দু'শ টাকা দিতে পারেন!

এই নাও, দু'শ টাকাই দিদিসাহেব পাঠিয়েছেন। যদি কিছু বাঁচে, তুমি দয়ানন্দজির খরচ দিয়ো,—বেচারি হয়ত ভিক্ষে ক'রে চালাচ্ছে···যে দিনকাল! আব শোনো, আমি আমাদের মালপত্র এখনই নিয়ে যাচ্ছি, বুঝেছ?

যাদব বলল, বেশ ত,' তেওয়ারি আছে ওখানে—গুছিয়ে দেবে সব। সামান্যই আপনাদের মালপত্র—

যাদবের পেটটা একটু বড়। তার ওপর সে আহারাদি সেরে নিয়েছে। পরনের ধুতির গেরোটা তার নাভিকুণ্ডলীর নিচেই থাকে। কিন্তু সেখানেই সে দু'খানা একশ' টাকার নোট উলটিয়ে গুঁজে নিয়ে আবার ঘরে ঢুকল।

রিক্সাওলা দাঁড়িয়ে আছে, সুতরাং আমার তাড়া ছিল। ভিতরে

ঢুকে আগে পেরিয়ে যেতে হয় দয়ানন্দর ঘর। সেখানে দেখি টিপ-টিপ করে জ্বলছে হারিকেন, আর তার পাশেই অগাধ নিদ্রায় অভিভূত প্রবীণ বয়স্ক ঈশ্বরবিশ্বাসী তেওয়ারি। এর আগে দেখেছি, দয়ানন্দর মুখনিঃসৃত সুগভীর বেদান্ততত্ত্ব চোখ দুটি বুজে পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে শুনতে-শুনতে তেওয়ারি তন্ময় হয়ে গেছে, এবং সেখানেই সে ঘুমিয়ে পড়েছে! যাদব সেদিন আমাকে ডেকে বলে-ছিল, তেওয়ারি আড়াই টাকা রোজ নিতে পারত, কিন্তু ওর আফিঙের খরচ আট আনা না পেলেই নয়। গাঁজা আফিঙের দর এখন আগুন।

মাটির উঠোন বা দাওয়ায় পায়ের শব্দ হয় না। তেওয়ারি না ওঠে না উঠুক, আমি আর ডাকব না। সুতরাং আমি এগিয়ে এসে অন্ধকারেই আমার ঘরের তালাটা খুললুম। কিন্তু ভিতরটা বড়ই অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। অতএব হাতড়িয়ে হারিকেনটা জ্বালতেই হ'ল। লেপ থাকার জন্য আমি আমার কম্বল দুখানা ব্যবহার করিনে। সেজন্য বিছানাটা আমার বাঁধাই থাকে। সুতী শার্টটা খপ ক'রে নিয়ে ব্যাগের মধ্যে পুরলুম, ওই সঙ্গে পাজামা আর ময়লা গেঞ্জি। না, আমার আর কিছু নেই। ও-হো, বাটা কোম্পানীর রবারের ছেড়া চটি জোড়াটা! হোক ছেঁড়া, ওটাও গুছিয়ে তুললুম ব্যাগে!

হঠাৎ কি যেন একটা আওয়াজ পেলুম বাসনের শব্দের মতো। বুঝলুম আওয়াজটা মোতীবাইয়ের ঘরের। আমার হাসি এল। সকালে সে মাংসের চপ পাকিয়ে রেখেছে, রাত্রে এসে ভেজে দেবে —এই ব্যবস্থা। ডিম সিদ্ধ করেছে। পেঁয়াজি রেখেছে কিছু। মাছের ফ্রাই ভোলে নি। কফির জন্য দুধ রেখেছে!

সেই পাঁশুটে রংয়ের হুলো বিড়ালটা ঢুকেছে সন্দেহ নেই। মোতীবাইয়ের দোষ, জানলা খুলে রাখা!

ধীরে সুস্থে সব গুছিয়ে আমি এবার মোতীবাইয়ের সেই পুঁটলিটা নেবার জন্য তার ঘরের শিকলটা খুললুম, কিন্তু পলকের মধ্যে অন্ধকারে নিঃশব্দে যে-বক্তি বেরিয়ে গেল ও-দরজাটা দিয়ে, সে চতুষ্পদ বা ক্ষুদ্রকায় জীব নয়। সে-ব্যক্তিকে সুস্পষ্ট চক্ষে আমি দেখলুম না। কিন্তু আলোটা বাড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে যা বিশ্বাস করতে বাধ্য হলুম, সংসারে তার চেয়ে অবিশ্বাস্য আমার পক্ষে আর কিছু ছিল না!

আমি থমকিয়ে দাঁড়ালুম। দেখলুম, সমস্ত পাত্র থেকে প্রত্যেকটি খাদ্যসামগ্রী অদৃশ্য হয়েছে। ঘরে তখনও পেঁয়াজ ও রসুনের গন্ধ মিলোয়নি। অপক্ব মাংসর চপ উধাও। মাছের ফ্রাইগুলি বোধহয় মাছের আকার পেয়ে যমুনায় গিয়ে ডুব দিয়েছে। দুধ ফিরে গিয়েছে আবার গোরুর বাঁটে!

মূঢ়ের মতো আমি দাঁড়িয়ে রইলুম কতক্ষণ। বোধহয় যেন বহুক্ষণ। তারপর ফিরে দেখি, মোতীবাইয়ের পুঁটলিটা যথাস্থানেই রয়েছে. শুনেছি ওটার মধ্যে আছে খান দুই সাদামাটা শাড়ি, গোটা দুই-তিন ছোট জামা আর সায়া, এটা ওটা টুকিটাকি কাপড়ের টুকরো, আর বুঝি প্রায় সাত-আটশ টাকা! পুঁটলিটা ছোট এবং হাল্‌কা। একুনে হ'ল মোট তিনটে লগেজ।

কম্বল ও পুঁটলি নিলুম এক হাতে, অন্য হাতে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে হ্যাণ্ডব্যাগটা নিয়ে যখন উঠোনে নেমেছি, তখন হঠাৎ পিছন থেকে পূর্ণিমার সেই ফিনফিনে চাঁদের আলোয় চিৎকার ক'রে উঠলেন ব্রহ্মচারী দয়ানন্দ এবং আমার মত ডাকাতকে একটি মধুর সম্ভাষণে ডেকে তিনি তাঁর হাতের চেলাকাঠ নিয়ে সহসা আমার মাথায় ও পিঠে সজোরে বসিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, পরমুহূর্তে আমাকে বাগিয়ে ধরবার জন্য তিনি উপুড় হয়ে আমার উপর

লাফিয়ে পড়লেন, এবং আমি তখনই ক্ষণকালের জন্য পেঁয়াজ ও রসুনের উগ্র মধুর গন্ধ উপভোগ ক'রে নিলুম।

আমি নিজেও বেদান্তবাদী, সুতরাং ওই মাটির উঠোনে প'ড়ে যোগতপস্যার মধ্য দিয়ে আমার মূলসত্তার চৈতন্যবিন্দু উপরের অনন্ত মহাকাশের নিবিড় জ্যোৎস্নালোকের ভিতর দিয়ে কোন্ বৈকুণ্ঠলোকের দিকে যাত্রা করল, সেটার আর যেন খেই ধরতে পারলুম না।

কখন্ যেন ঘোলাটে চেতনা ফিরে এলো।—

চোখ খুলে দেখলুম, সামনে জনৈকা অপরিচিত বর্ষীয়সী মহিলা দাঁড়িয়ে।

অব ক্যাযসা মালুম হোতা, বেটা?

প্রসন্ন মুখে জবাব দিলুম, আচ্ছা হ্যায়, মাতাজি।

মাতাজি তাঁর নিজ ভাষায় বললেন, এই গরম দুধটুকু খেয়ে নাও, বাবা। না না, তুমি উঠোনা, পিঠে লাগবে। আমি ফিডিং কাপে ক'রে মুখে ঢেলে দিচ্ছি।

মাতাজি আমাকে অনেকটা দুধ খাওয়ালেন পাশে ব'সে।

চেয়ে দেখলুম, না, এটা হাসপাতাল নয়। হাসপাতালের নার্সরা কখনও ধেড়ে পুরুষের সঙ্গে সন্তান-সম্পর্ক পাতায় না বা বাবা বলেও ডাকে না। চেলাকাঠের বেদম মার খেয়ে প'ড়ে আছি যেখানে, সেটা ঘর নয়,—মস্ত একটা হল। কড়িকাঠ অনেক উঁচুতে। তার নিচেকার দেওয়ালগুলোয় বড় বড় ছবি যেন ঝুঁকে আছে। তেলাপোকার পিঠের মতন ওগুলোও তেলা-তেলা চকচকে। আমার ব্যাণ্ডেজবাঁধা মাথার উপরে ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে মধ্যযুগীয় জমিদার বাড়ির মতন। দেওয়ালঘড়িটার ভিতরে একটা পুতুল-পাখি প্রতি সেকেণ্ডের তালে নড়ছে গাছের ডালে, এবং প্রতি পনেরো মিনিটে গলা উঁচু ক'রে টুং-টাং গান গেয়ে উঠছে।

হলঘরের অন্যান্য মোগলাই আসবাবপত্রের কথা তুলে নিজ চিত্ত-দারিদ্র্যের পরিচয় দিতে চাই নে।

মাতাজি আমার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে আশ্বাস দিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু যমুনা পিসি আমার বিশ হাজার টাকার মাল মেরে দিয়ে মাথায় হাত বুলোলেন কিনা এখনও জানতে পারি নি। দেখতে পাচ্ছি, দুর্ভাগ্যের সব চোট্ আমার মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে। ট্রেনের সেই সাংঘাতিক দুর্ঘটনায় আমার মাথা ফাটল, মোতীবাই সুযোগ পেয়ে আমার মাথাটা চিবিয়ে খেল, ব্রহ্মচারী দয়ানন্দ্ তাঁর চেলাকাঠে আমার মাথায় চোট মারলেন বৈদান্তিক পদ্ধতিতে,—আগাগোড়া সবটাই মাথা-কেন্দ্রিক।

আবার কে যেন এল সামনে। চেয়ে দেখি তারও মাথায় এক মস্ত ব্যাণ্ডেজ। না, ওটা পাগড়ি। পরনে চুড়িদার, লম্বা পিরান ও গরম জ্যাকেট। চোখে আতস কাঁচের চশমা। এক হাতে টিনের বাক্স ঝুলছে, অন্য হাতে টিনের ফুটো চোঙে আগুন ঝুলছে আংটায়। লোকটা হিন্দুস্থানী নাপ্‌তে। সে বলল, আপনি ওইভাবেই শুয়ে থাকুন, আমি আপনার দাড়ি কামিয়ে দিই।

ওর চেহারা দেখে সমীহ হ'ল, অর্থাৎ ভড়ং দেখিয়ে দু' আনার জায়গায় হয়ত চাইবে আটআনা। ক্ষীণকণ্ঠে বললুম, আমি ত' এখানে নতুন। তাই ফুটপাতে ব'সে নয়া দশ পয়সায় কামিয়ে নিই। কিন্তু শুয়ে কামাতে মোট কত খরচ পড়বে?

সহাস্যে সেই অভিজাত নাপিত বললেন, শোচ্‌না নহি সাব,—আমি এ-বাড়িতে মাসিক মাইনে পাই।

লোকটা নিজেই একখানা বড় টুল এনে তার বাক্স আর আগুনটা রেখে গরম জল সহ আমার মাথার পিছনে এসে কাজ আরম্ভ করল।

হিন্দুস্থানী নাপতেরা হাতে খোসবায় মেখে ক্ষৌরকার্য করে।

এ ব্যক্তিও তার ব্যতিক্রম নয়। আমার মুখ পুড়েছে প্রয়াগে এসে। কিন্তু ক্ষৌরকার্যের পর বিবিধপ্রকার সুগন্ধী মুখখানায় বুলিয়ে লোকটা যখন একখানা ছোট আয়না এনে আমার মুখের উপর ধরল, তখন নিজের চেহারা দেখে একটু পুলক রোমাঞ্চই হ'ল। মোতীবাই কি আর সাধেই বলেছে কম্‌রেড?

নাপ্‌তে চলে যাবার পর মাতাজি আবার এলেন—তাঁর সঙ্গে দুইজন সৌম্যকান্তি স্যুটপরা ভদ্রলোক। মাতাজি বললেন, এটি আমার বড় ছেলে, আর এটি মেজ জামাই। নরেন্দর আর জগ্‌দীশ। তোমার দেখাশোনা এরাই করছে পাঁচ দিন থেকে।

নরেন্দর কাছে এসে বললেন, আমাদের সকলের সৌভাগ্য আপনি আমাদের অতিথি। আপনার মাথায় আঘাত বেশি নয়, এই রবিবারেই আপনার ব্যাণ্ডেজ খুলে দেওয়া হবে। এই যে, ইনিই দেখছেন আপনাকে! ইনি আমার ভাগ্নিপতি, ডাঃ আগরওয়াল।

দু'জনকেই আমার নমস্কার জানিয়ে বললুম, আপনারা এত করছেন আমার জন্যে। কিন্তু আমি বেঁহুশ ছিলুম তাই—

ঠিক আছে, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না—শীঘ্রই আপনি সেরে উঠবেন।—এই বলে নরেন্দর আমার আরেকটু কাছে এলেন, পুনরায় বললেন, আপনাকে হাসপাতালে দিয়ে সন্ন্যাসী ব্যাটার বিরুদ্ধে পুলিশ কেস করা যেত, কিন্তু তা'তে আপনার ঝামেলাই বাড়ত। তা ছাড়া ওখানে আমাদের প্রজারা থাকে। সেই যাদবরাই ওই সাধু বেটাকে পিটেছে বেদম। একেবারে ধরাশায়ী করেছে।

ওঁদের কথার মাঝখানে হঠাৎ এসে যিনি ঘরে ঢুকলেন তিনি আমার সর্বনাশিনী! দেখলুম যেন কতকাল পরে, যেন কল্পকল্পান্তে! আর কিছু নয়, যেন চারিদিকের রুক্ষ কর্কশ প্রান্তরে সহসা প্রস্ফুটিত

হয়ে উঠল সূর্যমুখীর স্তবক। ওকে দেখে যেন সব এবার চিনলুম, —ঘরদোর, আত্মীয়-পরিজন, অট্টালিকা, দাসদাসী, দ্বারপাল—সব। মোতীবাই এল যেন আমার বুকের কাঁপনের মতো। আমার দুঃখ ঘৃণা, পুলক, রোমাঞ্চ—সব এল ওর সঙ্গে। কন্যার প্রতি মাতাজি একবারটি ফিরে তাকিয়ে বাইরে গেলেন।

নরেন্দর সহাস্যে বললেন, আপনি একটু উঠতে পারলেই আপনাকে তেতলার স্যুইট-এ দেবো। বেশ নিরিবিলি রোদ পোয়াবেন, দেখতে দেখতে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন।

ডাঃ আগরওয়াল শ্যালিকার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, দেখছ ত' মুন্না, আজ তোমার বন্ধু বেশ ভাল আছেন?

হাসল মোতীবাই। বলল, উনি বন্ধু নন্ জামাইবাবু, উনি জহুরী। বড্ড খুঁটিয়ে মানুষ চিনতে চান উনি।

আগরওয়াল ও নরেন্দর দু'জনেই হাসতে লাগলেন। মোতীবাই এবার কাছে এল। বলল, মিঃ নাগ, মানুষকে চেনার কাজ বড় কঠিন। ওই দেখুন, আপনার বন্ধু ব্রহ্মচারী দয়ানন্দ্ আমাদের বাড়ির ওপারের ফুটপাথে কম্বল ঢাকা দিয়ে ব'সে আছে। লক্ষ্য রেখেছে এ-বাড়িতে'।

অ্যাঁ,—আমি বিস্ময়ে হতবাক।

সে কি? এত সাহস?—ওঁরা বললেন।

মোতীবাই অলক্ষ্যে আমার দিকে চেয়ে বলল, লোকটা যেন ছিনে জোঁক। ও যা চায় তা ওর চাই, বুঝলেন জামাইবাবু? এমন নাছোড়বান্দা দেখিনি কখনও। ঘি দাও, আটা দাও, ডাল সব্জি দাও, মালাই-রাবড়ি দাও,—কিন্তু ওর মন পাবেন না! আরো দাও, আরো। ওকে সব দাও, সর্বস্ব দাও—তবেই ও খুশী। আমরা কেমন ক'রে ওর খাঁই মেটাবো? ও একেবারে সর্বভুক্, রাক্ষস!

এমন চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিকে দেখার সাধ কা'র না হয়? শ্যালক ও ভগ্নিপতি দু'জনেই বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলেন।

আরও কাছে এল মোতীবাই। গলা নামিয়ে শুধু বলল, কমরেড, এখানে আমাকে মুন্না ব'লে ডেকো!

ক্ষীণকণ্ঠে আমি বললুম, তোমার স্বামী তোমাকে কী ব'লে ডাকেন?

জ্ব'লে উঠল মুন্না। বলল, আমার ক'জন স্বামীকে তুমি দেখেছ? নন্‌সেন্স! আমি দয়ানন্দ হ'লে চেলাকাঠ আবার তোমার পিঠেই ভাঙ্গতুম।

আমি আর কথা বাড়ালুম না। কি জানি, এ ত' সেই ভয়ঙ্করী!

মোতীবাই এক সময় বলল, পিসি পাঠিয়ে দিয়েছে কাল সন্ধ্যেবেলা তোমার সেই ক্যাশ কুড়ি হাজার টাকা! সেই টাকা সুদ্ধ তোমার গরম কোট মায়ের দেরাজে তুলে রেখেছি।

কান পেতে আসল কথাটা শুনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম।

অতঃপর খুশী হয়ে বললুম, আজ ক'দিন বিছানায় পড়ে আছি বলো ত'?

আজ পাঁচ দিন হ'ল।—মোতীবাই গলা নামিয়ে বলল, দাদা যদি তোমাকে তেতলায় তুলে দ্যান্ তুমি আপত্তি ক'রো না, বুঝেছ?

আমি কতক্ষণ চুপ ক'রে রইলুম। পরে বললুম, একটু ভাল হয়ে এই ঘর থেকেই আমার চলে যাওয়া উচিত। অনেক দিন হয়ে গেল, অনেক ছুটোছুটি করতে হবে। আমার আর থাকা চলে না।

তা হলে তাই যেয়ো—বলে মোতীবাই বিষণ্ন মুখে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু সে পা বাড়াবার আগেই মাতাজি ঘরে ঢুকলেন। তাঁর হাতে

একটি গেলাসে রঙ্গীন পানীয়। মাতাজি কাছে এসে হেঁট হয়ে বললেন, সেও কা রস, পি লো বেটা!

মোতীবাই বুঝিয়ে দিল, মিঃ নাগ, এটা আপেলের রস।

মাতাজি ফিডিং কাপে একটু একটু ঢেলে আমাকে এক গেলাস মিষ্ট রস খাওয়ালেন।

তখন থেকে লক্ষ্য করছিলুম, মাতাজির মুখখানি যথেষ্ট প্রসন্ন নয়, এবং তিান কন্যার সহিত একটি কথাও বলেন নি। কন্যার ব্যাপারে কোথাও কোনও একটা বিরোধ রয়েছে, স্পষ্ট অনুমান করা যায়। মোতীবাই আমার দিকে একবার তাকালো, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বৃদ্ধা মাতাজি আমার কাছে ব'সে আমার মুখেব দিকে তাকালেন। পরে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন, বেটা, তুম বহুৎ বডা আদমিকো লড়কা হুঁ। আগব কহিয়ে ত' কিৎনা রোজসে মুন্নাকে তুম জানতে হুঁ।

প্রায় এই রকমই তাঁর হিন্দি। আমি পবিচ্ছন্ন কণ্ঠে সাবলীল ভাষায় অনর্গল মিথ্যা ব'লে চললুম!

বললুম, আজ নিয়ে এই সাত দিন হ'ল।

মুন্না কোথায় গিয়েছিল তুমি জান, বাবা?

কই, না ত'?

মাতাজি চুপ করে গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উনি বললেন, ওর পেছনে মন্দ লোক আছে কিনা তুমি কি খবর পেয়েছ?

আমি আকাশ থেকে পড়লুম! বললুম, একি বলছেন? আপনি ওঁর জননী, আপনি জানেন সব চেয়ে বেশি। আমি আপনার কন্যাকে দেখেছি পূজো-আর্চা জপতপ নিয়ে থাকতে! দেবদ্বিজে কী ভক্তি! উনি একজন মস্ত সাধিকা! এমন চরিত্রবতী মহিলা জীবনে কমই দেখেছি।

বৃদ্ধা এবার আমার দিকে তাকালেন। উনি বোধহয় ঠিক

বুঝতে পারেননি আমার বক্তব্য। অথবা উনি যা শুনেছেন তা ওঁর পক্ষে অবিশ্বাস্য। কিন্তু এবার উনি উঠে দাঁড়ালেন। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, হয় তুমি বোকা, নয়ত আমি একেবারে বুদ্ধু। সে যাই হোক, আমার মেয়ে যেমন আছে, তেমনিই থাকবে! কিন্তু তোমার মতন মহৎ প্রকৃতি আর হৃদয়বান ছেলে আমার বাড়িতে এসেছে আমাদের বহু পুণ্যফলে। আশীর্বাদ করি তুমি আরও বড় হও!

মাতাজি চলে গেলেন। নাপ্‌তের আয়নাটা থাকলে আরেকবার নিজের মুখখানা দেখে নিতুম! মাথা ও পিঠের ব্যথা কমে গেল যেন! উনি এসেছিলেন কন্যার নিন্দা ও অখ্যাতি শুনতে—একথাটা আমার মনে রয়েই গেল। শুধু ভাবছিলুম, একটি অতি সম্ভ্রান্ত ঘরের আদরিণী কন্যা বাঁধা-ছকের বাইরে ছিটকে গিয়েছে! সমাজ-মন তাই নাড়া খাচ্ছে কথায়-কথায়।

দিন-চারেক পরে নরেন্দর ও তাঁর এক ভাই দেবেন্দরের সহায়তায় বাড়ির দুজন ভৃত্য আমাকে তেতলার মস্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্যুইট এ তুলে দিয়ে এল। ডাঃ আগরওয়াল পরীক্ষা ক'রে বললেন, আজ আপনার ব্যাণ্ডেজ খুলে দিয়ে যাচ্ছি। এক সপ্তাহের মধ্যেই আপনি সুস্থ সহজ হবেন।

মুরগির মাংসের নির্যাস, খাঁটি দুধ, আপেল আর মুসম্বির রস, ডিম-কড়াইশুঁটি সিদ্ধ, বিশুদ্ধ ঘিয়ের পুরি, বাসমতি চা'লের ভাত, রুই মাছের ঝোল এবং রাত্রের দিকে মালাই ও সন্দেশ—এই সব আমার কপালে ছিল। দেখতে পাওয়া গেল, শ্রেষ্ঠ খাদ্য উত্তরোত্তর ক্ষুধারই উদ্রেক করে।

দু'জন চাকর সর্বদা আমার জন্য মোতায়েন আছে।

মাথার ফেট্টি খুলে দিল বটে কিন্তু পিঠের ব্যথাটা সারতে

এখনও সময় নেবে। কি ভাগ্যি চেলাকাঠখানার ঘা বেশি পড়েছিল মোটা গরম কোটপরা পিঠের ওপর, তাই রক্ষে। চাকর দুজন পালাক্রমে আমার পিঠে মালিশ ক'রে দেবার ফলে একটু স্বস্তি পাচ্ছিলুম।

মোতীবাই বলছিল, তোমাকে যখন এ-বাড়িতে আনলুম রাত তখন প্রায় দুটো। যাদব আর তেওয়ারি তোমাকে সেই অবস্থায় নিয়ে এল!

বললুম, তুমি ত' ছিলে স্টেশনে। জানলে কেমন করে?

বাঃ—মোতীবাই বলল, তোমার দেরি দেখে আমি গিয়ে পৌঁছই সাড়ে এগারোটায়। গিয়ে দেখি হৈ-চৈ, লোক জমেছে। চাঁদের আলোয় ফিন্ ফুটছে চারদিকে। দয়ানন্দ সবাইকে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা পাচ্ছে, ও তোমাকে ডাকু মনে করেছিল! তুমি নাকি মালপত্তর নিয়ে চুপি চুপি গা ঢাকা দিচ্ছিলে! কিন্তু আমি ত' জানি আক্রোশ আর বিদ্বেষের ইতিহাস। সেই জন্যে আমি গিয়ে দাঁড়িয়ে যখন হাঁক দিলুম, তখন সবাই মিলে দয়ানন্দ্‌কে টুঁটি টিপে বার করে আনল।

তারপর?

মোতীবাই খুব হাসল। বলল, তারপর একটা ষাঁড়কে আক্রমণ করল দশটা দাগা ষাঁড়। গুঁতিয়ে-গুঁতিয়ে একেবারে ধরাশায়ী করল দয়ানন্দ্‌কে।

আমিও হাসলুম,—গাভীটা কি দেখছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

হ্যাঁ—মোতীবাই বলল, ট্রয় যুদ্ধের সামনে যেমন হেলেন দাঁড়িয়ে ছিল আকুল হয়ে।

নিজের মনেই পুনরায় সে বলল, দয়ানন্দর উৎপাতের জন্যে কাশীতে গঙ্গাস্নানের সময় আমাকে বার বার ঘাট বদল করতে হয়েছে। কিন্তু তখন মহেন্দর আমাকে আগলিয়ে থাকত।

পাশেই বসেছিল সে। আমি নির্ভয়ে বললুম, আমি সামান্য জহুরী! মাল বেচা কেনা ক'রে খাই। তোমার এই সাংঘাতিক যৌবনশ্রীর ভয়াবহ প্রাচুর্যের কাছাকাছি থাকা আমার সইছে না! এবার পালাবো আমি।

নিচের তলাকার আয়া এসে দু'পেয়ালা কফি দিয়ে গেল। কফিতে চুমুক দিয়ে মোতীবাই শুধু একটু হাসল। পরে বলল, তুমি ত' যাবার পথেরই পথিক, কম্‌রেড। পথ তোমার খোলা। তুমি শুধু ভালবাস তোমার মাল বেচাকেনা,—এ ত' জানি। একদিন আমি তোমার সাহায্য চেয়েছিলুম, কিন্তু তা'র জন্যে তুমি এই শাস্তি পাবে, ভাবিনি।

এবার বললুম, সত্যি বলছ, দয়ানন্দ্‌ এ-বাড়ির আশেপাশে ঘুরছে?

ঘুরবে কেন? সর্বাঙ্গে কালশিরার দাগ নিয়ে প'ড়ে রয়েছে ওধারের ফুটপাথে। যাতায়াতের পথে সব সময় দেখতেই ত' পাচ্ছি। যেমন নির্লজ্জ, তেমনি একগুঁয়ে! কিন্তু উপায় নেই, কম্‌রেড। তোমার দেশের শাসনতন্ত্রের প্রথম কথা, মানুষের মৌল অধিকার—ফান্‌ডামেণ্টাল্‌ রাইট্‌! সব নোংরা চাপা পড়ছে ওর তলায়।

হাসলুম,—তোমার মৌল অধিকার কি এ-বাড়িতে তোমাকে থাকতে দেয়নি, মোতীবাই?

মোতীবাই উত্তর দেবার আগেই আমার মাথার দিকে হঠাৎ টেলিফোন বাজল। মোতীবাই উঠে গিয়ে ফোন ধরল। অতঃপর টুকরো কথাই আমার কানে আসতে লাগল: না না, কমবেনা, যা বলেছি তাই।......কোন্‌টা? হ্যাঁ, আমারও পছন্দ! ছোটটার কথা বল্‌ছ? না, ওটা নিচ্ছে আমার বড় ভাবী। আচ্ছা... আচ্ছা, কবে? শনিবার? সে যে অনেক দেরি? আজ

সবে রবিবার! স্থাখো, যদি তাড়াতাড়ি পারো। আচ্ছা, ছেড়ে দিচ্ছি—

মোতীবাই আবার এসে বসল, এবং বাকি কফিটুকু শেষ করল। ফোন ছেড়ে এসে দেখা গেল মুখখানা তার একটু গম্ভীর। শান্তকণ্ঠেই সে বলল, তুমি অসুস্থ হয়ে শুয়েছিলে, কিন্তু আমি ব'সে ছিলুম না—

অসুস্থ কে বললে?—আমি প্রতিবাদ জানালুম,—বলো যে চ্যালাকাঠের পিটুনি খেয়ে মুখ থুবড়িয়ে পড়েছিলুম—! এখন উঠতে পারছিনে বলেই পালাতে পাবছিনে।

হাসিমুখে এবার মোতীবাই বলল, তোমার পালাবার তারিখ আবার ত' পিছিযে গেল? শুনলে না শনিবারের কথা?

কী ব্যাপাব বলো ত'?

আমি ত' তোমার মালবিক্রির একজন ক্যান্‌ভাসার হয়ে উঠেছি।

সোৎসাহে বললুম, পারলে কিছু করতে?

মোতীবাই একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার সাময়িক উৎসাহটাকে লক্ষ্য করল। পরে শান্তকণ্ঠে বলল, আমি ভুল করেছিলুম। তুমি জাত-ব্যবসায়ী ছাড়া অন্য কিছু নয়, কম্‌রেড। টাকা তুমি সব চেয়ে বেশি চেনো।

ঈষৎ অস্বস্তির সঙ্গে বললুম, কথা ঘুরে যাচ্ছে, মোতীবাই। এবার কাজের কথা বলো, লক্ষ্মীটি।

কাজের কথাই বলতে এসেছি। আমার বড় বৌদি নিয়েছেন তোমার আরেকটা মুক্তোর সেট্‌ সাড়ে পাঁচ হাজার টাকায়। আর সেই যে আমার সহপাঠি দেওনন্দন ঝা,—ওর বিয়ের ঠিক হয়েছে আসছে মাসের সাতই তারিখে। তোমার তিন হাজার

টাকার ওই হীরের লকেটটা দেওনন্দন ওর নতুন বৌকে 'সোহাগ রাতে' উপহার দেবে ব'লে নিয়েছে।

টাকাগুলো পেয়েছ?

কাল সকালে পেয়ে যাবো। মোতীবাই জানালো।

অধীর আগ্রহ চেপে রেখে এবার বললুম, তাহলে আবার শনিবারের কথা তুলছ কেন?

মোতীবাই বলল, সেটা অন্য কথা। সেটা যদি হাসিল করতে পারি তবে আমাকে কমিশন্ দিয়ো!

কমিশন্?—তৎক্ষণাৎ আমি বললুম, বিলক্ষণ। এ যা তুমি করছ আমার জন্যে, এর সুদ-আসল সবই তোমার পাওনা। কমিশন্ কি বলছ, সবই তুমি নিয়ে নাও! ব্যবসাটা আমার নয় মোতীবাই, এ সমস্তই আমার পৈতৃক। যাক্ ওসব কথা, শনিবারের ব্যাপারটা কী প্রকাব? ছোটখাটো কিছু একটা?

ছুঁড়ি মুখ টিপে বলল, ছোটখাটো কেন ভাবছ?

বললুম, তুমিই ভাবালে, কম্‌রেড! কুড়ি থেকে নেমে একদম সাড়ে পাঁচ, তারপর তিন, এবার বোধহয় দেড়ই হবে!

আমার লোলুপ ও চতুর দৃষ্টি মোতীবাইয়ের চোখ এড়ালো না। সে একবার বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আবার তা'র চোখ অন্য দিকে ফেরালো। বলল, লক্ষ্ণৌতে আমাদের পরিবারের বিশেষ বন্ধু সৈয়দ আলী আছেন, ওঁরা পুরনো কালের নবাব গোষ্ঠী, এখন ওঁরা মস্ত কারবারি। ওঁদের অবস্থা দেখলে চোখ ঠিক্‌রিয়ে যায়—

মেয়েটা আবার ধানাই-পানাই আরম্ভ করছে দেখে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলুম, ওঁরা কিছু নিতে চান্?

হ্যাঁ, ট্রাঙ্ক্‌কলে দাদাকে দিয়ে কথা বলিয়েছি। ওঁরা তোমার হীরের ফুল্ সেটটা নিতে রাজি হয়েছেন—!

উৎকণ্ঠিত হয়ে বললুম, মানে? ওটার দাম কত জানো?

নিরুদ্বেগ কণ্ঠে মোতীবাই বলল, তোমার সব মোড়কেই ত' দাম লেখা আছে। ওটার দাম বাহান্ন হাজার টাকা।

আমি কিন্তু চেক্ মারফৎ পেমেন্ট্ নেবো না। সব ক্যাশ চাই!

মোতীবাই এবার হাসল। ছোট্ট কথায় বলল, তোমার মনের কথা জানি!

দুজনে অপলক ভাবে দুজনের দিকে চেয়ে ছিলুম। মোতীবাই কতক্ষণ চুপ ক'রে রইল। পরে নিজেই বলল, তোমার আংটির মোড়কে গোটা কয়েক হীরের আংটি দেখলুম। ওটার ব্যাপারেও দাদা কথা বলেছেন আলী সাহেবের সঙ্গে। ওঁদের বাড়িতে মোট পাঁচটি বৌ আছে, তা'রা সবাই একটি ক'রে আংটি নেবে!

বললুম, অর্থাৎ সাড়ে বারো হাজার টাকা। তাহলে তোমার সাহায্যে পাওয়া যাচ্ছে সর্বসাকুল্যে কুড়ি, সাড়ে আট, সাড়ে বারো, আর বাহান্ন—মোট তিরানব্বই হাজার টাকা।

মোতীবাই তেমনি ধীর কণ্ঠে বলল, আশা করছি, তোমার যাবার আগে এক লাখ পুরিয়ে দিতে পারব।

আনন্দ এবং উল্লাসের অধীর উত্তেজনায় আমি বলে উঠলুম, বলো কম্‌রেড, তুমি কত কমিশন চাও?

বোধহয় ক্ষণিক প্রণয়ের উত্তেজনায় সহসা আমি মোতীবাইয়ের একখানা হাত ধরতে গেলুম, কিন্তু সে পলকের মধ্যে হাতখানা সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। একবার হাসল আমার দিকে চেয়ে। পরে বলল, আজ তোমার চেহারাটা কেন ভাল লাগছে না বলতে পারো?

জবাবটা শোনবার জন্য মোতীবাই কিন্তু একটি মুহূর্তও আর অপেক্ষা করল না। পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সোজা সে নিচের সিঁড়িতে নেমে গেল।

হৃদয় নিয়ে খেলাধূলোর মতো মনের অবস্থা আমার নয়। আমি মনে-মনে টাকার অঙ্কটা নিয়েই অন্যমনস্ক হয়ে রইলুম।

॥ ৬ ॥

এই পরিবারের আভিজাত্য এবং ঐশ্বর্য-সম্পদের সঙ্গে কেন যে মোতীবাইয়ের মেলেনি, সেটির মূল রহস্য আমার নিকট অজানাই রয়ে গেছে। আমার অন্তরঙ্গতার সীমারেখা আমি মেনে চলি। কিন্তু এই বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে ব'সে প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে আভাসে-ইশারায় এটি জেনেছি, এ-বাড়ির সর্বাপেক্ষা প্রিয় কন্যা হ'ল মোতীবাই। এঁরা পুরনোকালের জায়গীরদার গোষ্ঠী। কিন্তু মোগল আমলের জমিদারি একালে টেঁকেনি বটে, তবে নগরের সম্পত্তি এবং নগদ অর্থের পরিমাণ যথেষ্টই। সর্বাধুনিককালে কন্যারাও পৈতৃক সম্পত্তি পায়, এই প্রকার একটি বিধানের ফলে শ্রীমতী মোতীবাই এই বৃহৎ সম্পত্তির একটি অংশের মালিক,— পরম্পরায় একথাটিও আমি শুনতে পেয়েছি।

আমার ধারণা আমি অতিশয় বস্তুবাদী, এবং আমার প্রকৃতির মধ্যে সম্ভবত রস অপেক্ষা কস বেশি। লোকসমাজে নৈতিক সংযম, স্বভাব-শুচিতা—এসব বস্তুর খুবই কদর আছে, কিন্তু সুরসিক, রসগ্রাহী, পরিহাসরসিক—এদের সমাদর বোধহয় আরও বেশি। এ-বাড়িতে আমার খ্যাতি রটেছিল এই, আমি নাকি স্বভাব সংযত, এবং আমার চতুঃসীমায় সৌজন্য ও শালীনতা ছাড়া নাকি অন্য কিছু নেই। সেই কারণে একথা যখন জানা গেল, মোতীবাই এই তেতলাতেই তা'র নিজস্ব মহলটিতে একা বাস করে, তখন এ নিয়ে কা'রও মনে কোনও প্রশ্ন আছে, এটি জানা যায়নি।

আমাদের উভয়ের মাঝখানে রয়েছে একটি বড় খোলা ছাদ, এবং দুদিকে দুই করিডরের দ্বারা দুটি সুইট্ সংযুক্ত। আমার সুইট-এর জন্য একটি চাকর মোতায়েন রয়েছে।

কিন্তু কথাটা থেকেই গিয়েছে, মোতীবাইয়ের সঙ্গে এ-বাড়ির চলমান সংসারযাত্রার দৈনন্দিন সম্পর্ক বড়ই কম। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের কথা এই, এ-বাড়িতে বিশেষ কেউ জানে না, মোতীবাইয়ের গতিবিধি। কাশীতে সে দুমাস ছিল, নাগপুর বা জবলপুর থেকে তার পিছনে গুণ্ডা লেগেছিল, ট্রেনদুর্ঘটনায় সে আহত অবস্থায় এই নগরেরই এক প্রান্তে ক্যাম্পে বাস করেছে প্রায় তিন সপ্তাহ,—এসব কেউ শোনে নি। পুরনো চাকর মহেন্দরের নিরুদ্দেশের খবরটাই সকলে জানে, কিন্তু তার নামটা কারুকে কখনো উল্লেখ করতে শুনিনি। এও লক্ষ্য করেছি, যে বাসস্থানে মোতীবাইয়ের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারসূত্র রয়েছে, সেখানে সে যেন কেমন অস্থায়ী অতিথির মতো বাস করে।

বাস্তবিকই মোতীবাই আমার মনে ঔৎসুক্য ও কৌতূহল জাগিয়ে রেখেছিল। কিন্তু এই কৌতূহল কথায়-কথায় প্রকাশ পাওয়া কেমন যেন আমাব শালীনতাবোধে বাধে। নরেন্দর আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, কিন্তু সেদিন মাতাজির সামনে আমার মুখের উপরেই সহাস্যে তিনি বললেন, আপনার ন্যায় সম্মানীয় অতিথি বহুদিন পরে আমরা বাড়িতে পেয়েছি। মুন্না বহেনের জন্যই আমরা এ গৌরব লাভ করেছি।

আমি সবিনয়ে বলেছিলুম, আপনারা এদিককার মস্ত এক বনেদী পরিবার। আপনাদের আভিজাত্য বা সৎশিক্ষা শ্রীমতী মুন্নার মিষ্ট ব্যবহারেই লক্ষ্য করেছি। আমার জন্য তিনি যেরূপ কষ্টস্বীকার করেছেন, সেজন্য আমি একান্তই কৃতজ্ঞ।

নরেন্দর সোৎসাহে বললেন, আপনি কি মুন্নার গান শুনেছেন? ও সত্যিই চমৎকার গায়। রেডিয়োতে ওর অনেকগুলো রেকর্ড আছে।

খুবই আনন্দের কথা—আমি বললুম।

নরেন্দর থামলেন না। সহোদরার সুখ্যাতিতে তিনি মুখর। বললেন, তামাসার কথা এই, মুন্না যে প্রকৃতই বিদুষী, ওর কথাবার্তা বা আচরণে আপনি বুঝতেই পারবেন না। ইউনিভার্সিটিতে ওর জুড়ি ছিল কম। এম-এতে পেয়েছিল ফার্স্ট ক্লাস। কিন্তু সকলের আদরের কিনা, তাই আমার বোন বরাবরই একটু ফ্রিডম্-লাভিং।

তিনি নিজেই হাসতে লাগলেন। কিন্তু মাতাজি গম্ভীর মুখে চলে যাবার সময় বললেন, সেইজন্যে নিজের পায়ে নিজেই 'কুঠার' মারল! 'আজাদী' একটু কম হ'লে সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচত!

আমি এসব পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে বিশেষ কথা বাড়াইনি। সেইজন্য আমি ওঁদের সকল কথাতেই হাসিমুখে সায় দিয়ে সেদিন চুপ ক'রে গিয়েছিলুম।

এ-বাড়িতে আতিথ্য নেবার পর থেকে আমি যে কথায়-কথায় মোতীবাইকে কাছাকাছি পাচ্ছিনে তার কারণ ছিল। আমি যে তা'র নিজস্ব অতিথি নই, আমি যে এ-বাড়ির সকলের মধ্যে ছড়ানো অতিথি—এটি তার পক্ষে জানানো দরকার ছিল। মেয়েটা খুবই চতুর, সন্দেহ নেই। এ-ছাড়া আরেকটা কারণ ছিল। চাহিদা নেই, তাই সরবরাহও কম। আমার মধ্যে প্রণয়েচ্ছা কম, নারীরসের প্রতি উন্মুখতা ওজন করা,—অর্থাৎ তাগিদ কম। মোতীবাই মেয়ে হয়ে একথা বোঝে বৈকি। যৌবনকালে কি-মেয়ে কি-ছেলে,—আপন সম্মানবোধ সম্বন্ধে অত্যুগ্রভাবে সচেতন। আমিও ত' ভরা যৌবনের অধিকারী, কিন্তু আমার ব্যবসায়িক বুদ্ধি সেই উগ্র সম্মানবোধের ধার ক্ষইয়ে দিয়েছে অল্পে অল্পে। এই ধরো, আমি যখন কোনও নগ্নবাহুর পেলব লাবণ্য, অথবা কোনও নারীর যুগল বক্ষের উন্নত শোভা লক্ষ্য করি,—আমি ভাবি, কী ধরনের জড়োয়ার 'বাউটি' মানাবে ওই সুন্দর হাতে, কেমন ভাবে

লোল দোলায় ছুলবে ইন্দ্রমণির মালা ছুই বক্ষের সন্ধিনালায়। মেয়েদের যৌবনকালের দেহশ্রী পৃথিবীর বৃহৎ একটি কারবারের মূলধন জোগায়। রামধন নাগের ছেলে আমি, এটি আমার অবাল্যের শিক্ষা।

পশ্চিমের দিকে তখনও বেশ শীত রয়েছে। সেদিন অপরাহ্ণের দিকে আবার সপসপিয়ে এক পশলা বৃষ্টি নেমে এল। একটু আগে চায়ের সঙ্গে কিছু জলযোগ সেরেছি। ভাবলুম, মোতীবাইকে দেখিনি তিন চার দিন—একটা খবর নিলে কেমন হয়। ছু'জনে একই তলায় ত' থাকি,—আর, সেটা ত' ওরই ইচ্ছায়। তা ছাড়া এ ধরনের অখণ্ড ঔদাসীন্য একটু গায়ে বাজে বৈ কি। হাজার হোক, এ-বাড়ির সঙ্গে আমার যোগ ওই মেয়েটাই ঘটিয়েছে। ওই আমাকে এনেছে এখানে।

ফ্লানেল্ শার্টের উপরে গরম র‍্যাপারখানা জড়িয়ে আমি বাইরে এলুম। এখন বেশ চলাফেরা করতে পারি। ছাদে এখন কেউ নেই। সেইজন্য বৃষ্টি বাঁচিয়ে করিডর ঘেঁষে ছাদ পেরিয়ে আমি এলুম এ-মহলে। এটি মোতীবাইয়ের নিজস্ব। তার প্রথম ঘরখানায় মুখ বাড়িয়ে দেখি, এটা পড়াশুনোর ঘর। চারদিকের আলমারি-গুলোয় ঠাসা গ্রন্থসম্ভার। এ যেন মস্ত এক লাইব্রেরী। মাঝখানে বড় একখানা টেবিল, নানাবিধ বই-কাগজ তা'র উপরে গোছানো, এবং ছুই পাশে খান-চারেক সুদৃশ্য চেয়ার।

ভিতরে ঢুকে দেখি, অন্য একটি ঘরে ঢোকবার জন্য মাঝখানে একটি দরজা,—যেমন ছিল আমাদের চালাবাড়িতে। স্পষ্টত, ওটা রাজকন্যার অন্তঃপুর এবং শয়নকক্ষ। কিন্তু আমি হলুম কম্‌রেড। না স্বামী, না প্রণয়ী, না মোসায়েব, এবং মোতীবাইয়ের কথাতেই বলি,—সে আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে পুরুষ ব'লে মনে করে না। অতএব আমার পথ অবারিত।

সামনের ঘর পেরিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে দেখি, মোতীবাই পুবদিকের জানলার একটি খড়খড়ি টেনে রাস্তার দিকে কী যেন দেখছে।

গলার সাড়া দিয়ে বললুম, আমি ফটিক নাগ—তোমার গায়ের আঁচলটা একটু সামলিয়ে নাও।

মোতীবাই গ্রাহ্যও করল না। শুধু আমার দিকে ফিরে হেসে বলল, একবারটি দেখে যাও, কম্‌রেড?

এগিয়ে গিয়ে ওরই মুখের পাশে মুখ রেখে খড়খড়ির ভিতর দিয়ে নিচে পথের দিকে তাকালুম। বাইরে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। মোতীবাই বলল, তোমার শুভাকাঙ্খী বন্ধু দয়ানন্দ্‌ আজও ওই ফুটপাথ থেকে এক পাও নড়েনি। দুই সপ্তাহ হ'ল।

বললুম, এই বৃষ্টিতে ব'সে আছে অমনি ক'রে? কীসের আশায়?

খিল খিল ক'রে হেসে উঠল মোতীবাই। বলল, তপস্যায় সিদ্ধিলাভের আশায়।

বললুম, হাসছ তুমি? ভণ্ড ব'লে উড়িয়ে দিতে চাইছ? কিন্তু মনে রেখো, এও এক প্রকারের কঠোর সাধনা।

জানলার কাছ থেকে মোতীবাই স'রে এল। বলল, ওর স্বাস্থ্য আর শক্তি কী যে সাংঘাতিক তুমি জানো না, কম্‌রেড। সেদিন রাত্রে ও-পাড়ার দশ-বারো জন লোক ওকে যেভাবে পিট্‌ছিল, আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবছিলুম, লোকটা বুঝি মরেই গেল! শেষ পর্যন্ত অতগুলো লোক মিলে ওকে পা দিয়ে থেঁৎলাতে লাগল। তুমি তখনও অজ্ঞান অবস্থায় মাটিতে পড়েছিলে—! রাত তখন একটা। চারিদিকে ফিন্‌ ফুটছিল জ্যোৎস্নায়—

বললুম, তারপর—?

তোমার দেরি দেখে ভাগ্যি আমি গিয়ে পড়েছিলুম! যাই

হোক, অত রাত্রে কী কষ্টে যে একখানা টাঙ্গা পাওয়া গেল—! বলতে বলতে মোতীবাই খুব হাসছিল।

এবার বললুম, আমার সেদিনের দুর্দশাটা মনে ক'রে তোমার হাসি আসছে, মোতীবাই ?

মোতীবাই বলল, না না তা নয়, হাসছি অন্য কারণে। ভাবছি আমার তৈরি সেই সব খাবারগুলোর কথা—

এবার আমিও উচ্চস্বরে হেসে উঠলুম। বললুম, মাংসের চপ, মাছের ফ্রাই, পেঁয়াজি—তার সঙ্গে রোশনাই সুগন্ধ, চিকেন্ স্টু, ডিমসিদ্ধ,—কা'র না লোভ হয় ?

কিন্তু ওগুলো ত' শুধু বানানো ছিল! রাত্তিরে তোমাকে ভেজে দেবো ব'লে গুছিয়ে রেখেছিলুম,—পুনরায় হাসতে হাসতে মোতীবাই বলল, তোমাকে তু'লে আনার সময় সেই রাত্রেই তেওয়ারি আর যাদব আমাকে বলছিল, মাইজি, সোয়ামিজির মুখে কী উৎকট পেঁয়াজ-রসুন আর কাঁচা মাছের গন্ধ! ও ব্যাটা আসলে ভণ্ড!—আমি সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। পরে তোমার মুখে শুনেছিলুম আগাগোড়া।

বেচারি দয়ানন্দর আলোচনাটা আপাতত ওখানেই চাপা প'ড়ে গেল।

মোতীবাইয়ের এ-ঘরখানা নিভৃত, তার ওপর তা'র বস্ত্রাদির অবস্থাটাও কিছু আল্‌গা। আমি একটু অস্বস্তিই বোধ করছিলুম। পাপ অন্য কোথাও নেই, আছে আমারই মনে! তা ছাড়া বরাবরই দেখছি, হাসির ধকলে তার সর্বাঙ্গে যে বিহ্বলতা দেখা যায়, সেটা আমার স্বভাবসংযত প্রকৃতির পক্ষে যথেষ্ট নিরাপদ নয়!

এক সময় বললুম, মুন্না, এসো তোমার ওই স্টাডিতে বসি।

মোতীবাই বলল, কেন, এই ত' বেশ। ওখানে সব কাটখোট্টা চেয়ার, এখানে বেশ বিছানার ওপর আরাম ক'রে বসো। আমার

ঘরে তুমি এই প্রথম এলে, তাই না? আমি না থাকলে আমার মহলে তালাচাবি পড়ে।

পালঙ্কের বিছানাটার এক কোণে বসতে বাধ্য হলুম। পরে বললুম, মাঝে মাঝে যাও কোথায় ঘরদোর ফেলে?

বাঃ আমি যাই যেখানে-সেখানে!—মোতীবাই বলল, কোথায় যাই ঠিক আছে কি? বন্ধুবান্ধব ছড়িয়ে আছে কত দেশে। কিন্তু এবার থেকে একটু অসহায় হলুম মহেন্দরের মৃত্যুতে!

ও কি এ-বাড়ির চাকর ছিল?

না—মোতীবাই বলল, ও থাকত আমার কাছে লক্ষ্ণৌয়ের ওদিকে।

সবিস্ময়ে বললুম, লক্ষ্ণৌর ওদিকে? মানে? তুমি কি সেদিকেও থাকো?

আমার বিস্ময় দেখে মোতীবাই তার গদি-আঁটা চেয়ারে ব'সে হেসে উঠল। বলল, তুমি কি বাপের বাড়ি আর শ্বশুরবাড়ি ছাড়া মেয়েদের আর কোনও বাড়ি ভাবতে পার না? তুমি বড্ড সেকেলে, কম্‌রেড!

সম্ভব—আমি বললুম, তবে আরেকটা বাড়ি আছে মেয়েদের,—সেটা যমের বাড়ি।

আঁচলের খুঁটটা আঙুলে জড়িয়ে মোতীবাই হেসে গ'লে পড়ল গদির গায়ে। সেই হাসির রসবিহ্বলতা যেন তেতলার ছাদ দিয়ে নেমে এ-বাড়ির দোতলায়, এবং হয়ত নিচের তলাতেও আপন প্রাণবন্যায় প্লাবিত ক'রে দিয়ে এল!

একটু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে আমি বললুম, প্রথম আলাপের সময় শুনলুম তুমি থাকো অমরাবতীর ওদিকে, এখন বলছ লক্ষ্ণৌ,—তোমার কোন্ কথাটা সত্যি!

মোতীবাই বলল, দুটোই যদি সত্যি হয়? আর তোমার পক্ষে

ছুটোই ত' সুবিধে, কম্‌রেড। যদি আওয়াগড়ের ওদিকে যাও, আমার সঙ্গে দেখা করতে পারো অমরাবতীতে? আর যদি যাও লক্ষ্ণৌ, তাহলে দেখে আসতে পারো এই অভাগী প'ড়ে আছে এক জঙ্গলে?

বললুম, অমরাবতীতেও কি তুমি বনবাসিনী?

হাসিমুখে মোতীবাই বলল,—না—তারপর দরজার দিকে একবার ফিরে ঈষৎ গলা নামিয়ে পুনরায় বলল, অমরাবতীর পুবদিকে ছোট্ট একটা টিলাটিবি আছে, ওটাকে অনেকে পাহাড়ও বলে। ওই টিবিটার ওপরেই আমি থাকি। নিচের দিকে সুন্দর এক সরোবর। নাম—বামঝরোকা।

ওর কথাগুলো আমি যখন একে একে অনুধাবন করছিলুম তখন মোতীবাই বলল, তুমি ত' বলছ লক্ষ্ণৌতে গিয়ে সৈয়দ আলীদের সঙ্গে আলাপ করবে। বেশ ত' অমনি চ'লে যেয়ো ছোট রেলগাড়িতে মাইল তিরিশেক দূরে হাজিগাঁওয়ে,—উঠবে গিয়ে আমার চালাঘরে! হয়ত তোমার পছন্দ হবে না, তবু এক-আধদিন থেকে আসবে আমার 'গরীবখানায়'—মন্দ কি, কম্‌রেড?

কতক্ষণ চুপ ক'রে রইলুম। দেখতে পাচ্ছি বৃষ্টি পড়ছে ঝুপ ঝুপ ক'রে, এবং নিচের রাস্তাতেও যেন দেখতে পাচ্ছি দয়ানন্দ্‌ সপসপে ভিজে কম্বল জড়িয়ে বসে আছে 'কঠোর তপস্যায়।' তা থাক্‌। আমি কিন্তু বেহিসাবী নই। এক সময় বললুম, তুমি ত' এখন রয়েছ এখানে। তোমার ওই ছুটো 'গরীবখানা' এখন কে দেখছে?

আমি ছাড়া কে আবার দেখবে?—মোতীবাই তাকালো।

না, না—এসব ছেলেমানুষি কথা নয়, মুন্না। এসব বিষয়-সম্পত্তির কথা! কোথায় অমরাবতী, আর কোথায় হাজিগাঁও,—

তুমি একা মেয়েছেলে। এসব তামাসার কথা নয়। এতদিন ধরে তোমাকে দেখছি। কিন্তু আসল কথাটা জিজ্ঞাসা করলেই তুমি অমনি হেসে উড়িয়ে দাও। ব্যাপারটা আমায় খুলে বল, মুন্না।

কোন্ ব্যাপারটা ?

আমি স্পষ্টকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার বিবাহিত জীবন কি আনন্দের নয় ?

মোতীবাই হেসে উঠল, নিরানন্দের হ'লে কি তুমি সুখী হতে ?

বিরক্ত হয়ে বললুম, ওই নাও, আবার সেই ত্যাড়াব্যাঁকা কথা। তোমার আনন্দেই ত' আমার আনন্দ !

হঠাৎ মোতীবাইয়ের মুখখানা গম্ভীর হয়ে এল। তার মুখের হাসি থেমে গেল। ধীরে ধীরে এতক্ষণ পরে সে গায়ের আঁচলটা টেনে হাত দুখানা ঢাকল। পরে শান্তকণ্ঠে বলল, এ তোমার সত্য কথা নয়, ফটিকজি। আমার আনন্দে তোমার আনন্দ হয়েছে, এ কখনো দেখিনি। আমার আনন্দ তোমাকে নিয়ে, তোমার আনন্দ জড়োয়া বিক্রি নিয়ে। সৈয়দ আলীর টাকাটা আসছে, আর দেরি নেই। আমি জানি সে-টাকা পেলেই তুমি সুস্থ শরীরে দেশে ফিরবে। বরং এই কথা বলো, হিসেব-নিকেশ বুঝে পেলেই তোমার আনন্দ !

বললুম, আমি বিবাহিত এবং সংসারী লোক, মোতীবাই !

আমি অজ্ঞান নই, ফটিকজি। জানি তোমার ঘরে বউ আছে।

তা হলে তুমি আমার কর্তব্যটাও নিশ্চয় জানো !

এক ঝলক হাসল মোতীবাই। পরে বলল, শুধু আমি কেন, সবাই জানে। তুমি আমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেখবার চেষ্টা পাচ্ছ, তাই বলছি। তুমি একদম নাবালক। শুধু নাবালক নয়, অজ্ঞান।

হিসেবটাই জানো, বেহিসেবী জীবন তোমার ভয়ের বস্তু। আমি মাঝে মাঝে একটু আবদার ধরি, এই ত' ? আমার কথায় নাই বা কান দিলে ?

বললুম, এ মন্দ নয়। আমি শুনতে চাইলুম এক কথা, তুমি এনে ফেললে আরেক কথায়। এ শুধু কথা দিয়ে কথা বাড়ানো। কথার ফুলঝুরি।

মোতীবাই বলল, তুমি ত' লাভ আর ক্ষতি নিয়ে থাকো। আমি বাইরের মেয়ে, ভিন্ন দেশের ভিন্ন সম্প্রদায়ের। আমি বিয়ে-থা করেছি কিনা, এ নিয়ে তোমার মাথাব্যথাই বা কেন ?

চটেছে মোতীবাই। বললুম, হবে না মাথাব্যথা ? তোমার জন্যে আমার মাথায় যে চ্যালাকাঠ পড়ল! তুমি সর্বনেশে মেয়েমানুষ! শুধু মানুষে-মানুষে নয়, তোমার জন্যে ট্রেনে-ট্রেনে ঠোকাঠুকি লাগে! তোমার জন্যে ঝড় ওঠে, বিদ্যুৎ চমকায়, যুদ্ধ বাধে। আমার মনে হচ্ছে তুমি নিশ্চয়ই আগুন জ্বালিয়েছে অমরাবতীতে! বান ডাকিয়েছে লক্ষ্ণৌতে।

আঃ থামো।—

কেন থামবো ?—গলা তুলে আমি বললুম, তোমার মতন মেয়ের বিয়ে-থা হলে তবেই একটা গেরস্থর মান রক্ষে হয়! পাঁচ-সাতটা ছেলেপুলে হয়ে পড়লে তবেই তোমরা ঠাণ্ডা!

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে মোতীবাই হেসেই খুন। কিন্তু আমার উত্তেজনা ওখানেই শেষ হ'ল না। চেঁচিয়ে আবার বললুম, নয়ত কি ? এই ত্যাখোনা আমার ঘরেও সেই বাঘিনী! সারাদিন খেটে-খুটে বাড়ি ফিরি, কিন্তু মাঝরাত্তিরে তরুলতার কাণ্ড কারখানা দেখে ভয়ে মরি! ছুঁড়ির স্বাস্থ্যও তেমনি। হলেই বা কম্‌রেড, তুমিও নানান্ ছুতোয় এক-আধবার তোমার গা-গতর আমাকে দেখিয়েছ বৈ কি। আমি তোমার সঙ্গে তরুলতারটাও

মিলিয়ে দেখেছি। সেও কম যায় না।—বিলক্ষণ! পৃথিবীসুদ্ধ বোকা! সবাই বলে, পুরুষ মানুষরাই হামলায়, পুরুষ মানুষরাই ওসব ব্যাপারে অসভ্য! ভুল ভুল—মস্ত ভুল! বুড়ো ঘুঘুরা রটিয়ে বেড়ায়, মেয়েছেলে অবলা, দুর্বলা, মেয়েছেলে 'উইকার সেক্স্',—এসব মূর্খের মিথ্যা রটনা! এসবই হোল ·মেয়েমানুষকে ঘরের খোঁটায় বেঁধে রাখার চক্রান্ত। ওই তুলতুলে শরীরে কী সাংঘাতিক শক্তি তোমাদের জমা আছে, এ তুমি নিশ্চয় জানো, কম্‌রেড। অকথ্য অমানুষিক দৈহিক পীড়নে কিচ্ছু তোমাদের হয় না! ধরো, আমার মতন বলবান একটা লোক বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে যদি লড়াই করি তোমার সঙ্গে,—হাসছ যে?

মোতীবাই আঁচলে আবার হাসি ঢাকল। বলল, বীরপুরুষের বীরত্বের আস্ফালন শুনলে মেয়েমানুষের হাসিই পায়!

না না, সত্যি কিনা বলো? আমি নিজের প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে বললুম, লড়াইয়ের ফলাফল তুমি ঠিকই জানো,—কি হবে! শেষ পর্যন্ত নির্বোধ ব'নে গিয়ে হয়রান হয়ে থেমে যাব।

এবার মোতীবাই উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে আলোটা জ্বাললো, এবং জানলার ধারে গিয়ে একবার ঘুরে এসে ঘরের কলিং বেল্‌টা টিপলো। পরে বলল, বাইরে বৃষ্টি আর ভেতরে তোমার কথার বৃষ্টি—দুই মিলিয়ে সন্ধ্যেটা মাঠে মারা যাচ্ছে! আচ্ছা কম্‌রেড, এতক্ষণ ধ'রে আমি কী ভাবছিলুম বলো ত?'

বাইরে পায়ের শব্দ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে জনৈক ভৃত্য এসে দাঁড়াল। মোতীবাই হুকুম করল, কেট্‌লি ভরকে চায় লাও, হরেরাম।

আচ্ছা, দিদিসাব।—হরেরাম চলে গেল।

আমার উদ্দীপনা জুড়িয়ে গিয়েছিল। আমি বাঙ্গালী—খড়ের আগুন! জ্বলতে-নিভতে কোনটাই দেরি লাগে না! মোতীবাইয়ের

সঙ্গে লড়াই বাধাচ্ছি কথায়-কথায়, কিন্তু সে-লড়াই তখনই-তখনই থামলে খুশী হই। ঝগড়া করি ক্ষণিক উত্তেজনায়, আবার ভাব করি তার সঙ্গে গলায়-গলায়।

আমার বিশ্বাস, মোতীবাই আমাকে চিনেছিল।

এবার সে মিষ্টকণ্ঠে বলল, তোমার সব ঝগড়াঝাঁটির পিছনে আমার মন বলছিল, এবার তুমি সত্যিই চ'লে যাবে, কম্‌রেড—!

বললুম, হ্যাঁ এ যাত্রায় পাততাড়ি গুটোতে হবে বৈ কি। তা ছাড়া তরুলতাকেও দেখিনি অনেকদিন। সোজা এবার কলকাতা-তেই ফিরব।

মধুর অনুযোগ জানিয়ে মোতীবাই বলল, আমার দিকে চেয়ে থাকলে কি তরুলতার কাছে যাবার ইচ্ছে হয় তোমার?

নিশ্চয়ই, একশ'বার।—আমি বললুম, এখানকার উত্তেজনাটুকু সেখানে গিয়ে শান্ত হবে। আমি যে পত্নীব্রতী। এখানকাব প্রবৃত্তি, সেখানে গিয়ে নিবৃত্তি। এখানে ঘনাবে শাঁওনের মেঘ, সেখানে গিয়ে অবিশ্রান্ত বর্ষণ। এখানে প্রশ্ন, সেখানে জবাব। এখানে হ'ল আয়োজন, সেখানে হবে উৎসব। এখানে আমার ছুরি শানাচ্ছি, সেখানে গিয়ে রক্তারক্তি।

হাসিমুখে মোতীবাই বলল, তা হ'লে স্বীকার করো, আমি আর তরুলতা—দু'জনের মধ্যে তফাৎ আছে।

একটুও না—আমি বললুম, তুমি এম-এ পাস করা মূর্খ মেয়ে। তফাৎটাই দেখছ,—কিন্তু দেখছ না, দুই মিলিয়ে একাকার। তারই ছায়া পড়ছে তোমার ওপর, আর তুমি মিলিয়ে যাচ্ছ তা'র মধ্যে। হারেমে থাকে অনেক মেয়ে, কিন্তু আসলে সব মিলিয়ে একটাই। ওটাই হ'ল স্ত্রৈচৈতন্য। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে যদি তুমি আর তরুলতা প'ড়ে থাকো পাশাপাশি—আমি চেয়ে দেখব তোমরা দুজনেই এক, দুই মিলিয়ে একাকার। সেই জন্যেই বলে, মেয়েদের

কোনও জাত নেই। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ,—সব জাতিতে ওই একই মেয়ে। মেয়ের পরিচয় এই, সে শুধু মেয়ে।

মোতীবাই বলল, তোমার কোনও কথাই আমার কানে ঢুকছে না, কম্‌রেড। আমার মতন মূর্খ মেয়ের কাছে তুমি যে একমাত্র পুংচৈতন্য! তোমার চ'লে যাবার কাল ঘনিয়ে এল যে! ঘর যে শূন্য হবে আমার!

কিন্তু তরুলতার ঘর পূর্ণ হবে, এই ভেবে আনন্দ পাও।

হেসে উঠল মোতীবাই! বলল, বড় ধূর্ত তুমি! যাবার আগে ঈর্ষা জাগিয়ে যেতে চাও—যাতে তরুলতার হিংসেতে আমি জ্বলে পুড়ে-মরি। তুমি ভাবছ আমি মূর্খ, কিন্তু আমি জানি তুমি বোকা! বিশ্বাস করো কম্‌রেড, তিলমাত্র হিংসে করিনে তাকে। বরং দুঃখ হয় তা'র জন্যে। সে কিছু পায়নি তোমার কাছ থেকে!

ভুরু কুঁচকিয়ে আমি বললুম, মানে? এ আবার কী বলছ? ভুলে যাচ্ছ রামধন নাগের একমাত্র সন্তান আমি! ট্রেনদুর্ঘটনায় কিংবা তোমার ওই দয়ানন্দর চ্যালাকাঠের ঘা খেয়ে যদি মরতুম, তবে তরুলতাই আখেরে হ'ত এত বড় কারবারের একমাত্র মালিক। আরে, দিনকাল যত মন্দই হোক, এসব বিজ্‌নেস্‌ হ'ল মরা হাতী লাখ টাকা!

আমি সোজা মোতীবাইয়ের দিকে তাকালুম। কিন্তু তার বড়-বড় চোখের চাহনি দেখে একটু বিমর্ষই হয়ে গেলুম। আমাকে এক মস্ত অর্বাচীন ও বেয়াকুব ছাড়া সে বোধহয় আর কিছু ভাবে না!

এমন সময় চায়ের বড় ট্রে হাতে নিয়ে হরেরাম বাইরে থেকে সাড়া দিয়ে ঘরে ঢুকল। তারপর সে নিজেই টিপাই নিয়ে এসে ওগুলো সাজিয়ে দিল।

মোতীবাই প্রশ্ন করল, তিনটে পেয়ালা কেন রে?

হরেরাম বলল, দাদাজি আসতে চান্ আপনার এখানে। সিঁড়ির নিচে উনি অপেক্ষা করছেন।

মোতীবাই ঘর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল। অতঃপর দুই মিনিটের মধ্যেই সে নরেন্দরকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল হাসি-খুশী মুখে।

নমস্কার বিনিময়ের পর নরেন্দর কাউচে ব'সে বললেন, ভাবলুম আপনার কাছে ব'সে আজ এক পেয়ালা চা খেয়ে যাই।

পালঙ্ক থেকে নেমে আমি নরেন্দরের মুখোমখি ব'সে বললুম, আপনিও ব্যস্ত থাকেন, আর আমিও বিছানায় প'ড়ে থাকি। গল্পগুজব করাই হয়ে ওঠে না।

মোতীবাই তিনটি পেয়ালায় চা ঢালছিল।

নরেন্দর বললেন, আর আমার এই পাগ্লি বোন। আপনি আছেন তাই ওর দর্শন পাচ্ছি, কিন্তু আপনি গেলে ওর চুলেব টিকিও দেখতে পাব না। কখন্ যে আসে আর কখন্ যে যায়—তা'র ঠিক পাইনে।

মোতীবাই বলল, দাদাজি. তুমি যাঁর কাছে বলছ তিনি বিশ্ব-নিন্দুক। তুমি যেই ঘরেব বাইরে পা দেবে, আর রক্ষে নেই—উনি আমাকে খোঁটা দিতে থাকবেন।

নরেন্দর চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে হেসে উঠলেন। বললেন, না মুন্না, তুমি ওঁর সম্বন্ধে যা বলেছ, তা'র সঙ্গে ওঁর মিষ্ট ব্যবহার বর্ণে বর্ণে মিলেছে।

হাসিমুখে এবার আমি বললুম, আমার পরিচয় আমি। ভাল-মন্দ সৎ অসৎ সব মিলিয়ে আমি!

হয়েছে, থামুন এবার, মিষ্টার নাগ,—মোতীবাই বলল, শোনো দাদাজি, বড্ড খুঁৎখুঁতে উনি। কোনমতেই ওঁর মন পাওয়া যায় না। সব সময় ওঁর চাই চুলচেরা হিসেব।

আমি হাসিমুখে বললুম, বেশ, সব সহ্য ক'রে যাই। ওই যে কথায় বলে, বেঁধে মারে, না সয় ভাল! দাদাজি, আপনি কিন্তু সব দিকে লক্ষ্য রাখুন, বিশেষ ক'রে এই ভয়ঙ্করী সহোদরার দিকে। দেখছেন ত', অতিথিকে অন্দরমহলে ডেকে এনে আগাগোড়া শুধু লাঞ্ছনা। আপনারা আমাকে দিচ্ছেন হাতির ভোগ, আর আমি ওঁর দিকে চেয়ে দেখছি বাঘের চোখ।

মোতীবাইয়ের সঙ্গে নরেন্দর হেসে অস্থির হলেন।

চায়ে চুমুক দিয়ে ব্যস্ত হয়ে সহাস্যে বললুম, না না, দাদাজি,—উনি আর আমাকে সইতে পারছেন না। হোক তেরোস্পর্শ, আমি এই সামনের শনিবার অশ্লেষা-মঘার দিনই যাত্রা করব।

মোতীবাই বলল, দেখলে দাদাজি, দ্যাখো। শুধু চেয়ে দ্যাখো। যাকে কম্‌রেড ব'লে ডাকতে-ডাকতে আমার গলা চিরে গেল,—তাঁর আচরণ একবার ভাল ক'রে চেয়ে দ্যাখো। উনি বাণিজ্য করতে বেরিয়েছিলেন, এখন কাজ হাসিল হয়েছে। কিন্তু তেরোস্পর্শযোগে অতিথি বিদায় নিলে যে গেরস্থর অমঙ্গল হয়, সেদিকে ওঁর ভ্রূক্ষেপ নেই।

নরেন্দর বললেন, মুন্নার একথাটা কিন্তু সত্যি, মিঃ নাগ। আর তা ছাড়া দেখুন, সৈয়দ আলী সাহেব আপনার টাকা নিয়ে আসছেন শনিবারে। সেইদিনই যদি আপনি যান্‌, মাতাজি একটু দুঃখবোধ করবেন। তবে হ্যাঁ, মুন্না যদি আপনাকে ধ'রে রাখতে পারে!

মোতীবাই বলল, আমি ধ'রে রাখব? বেশ, একগাছা দড়ি দিয়ো, দাদাজি—ওঁকে বেঁধে রাখব!

দাদাজি হাসছিলেন। এবার বললেন, তা কেন! শুনলুম উনি তোমার গান ভালবাসেন! ওইটেই হবে তোমার দড়ি! উনি যেতে চাইলেই তুমি দু'একটা গান গাইতে থাকবে। আমিও তোমার গান শুনিনি অনেকদিন, মুন্না,—ধরো। দেখি একটা—?

বললুম, হ্যাঁ, এ প্রস্তাবটা কিন্তু মন্দ নয়।

আমরা দুজনেই হাসছিলুম কিন্তু মোতীবাই পলকের মধ্যে আড়চোখে একবার তাকালো আমার দিকে। তারপর নিজের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে দাদাজির স্নেহসিক্ত সান্নিধ্যে ব'সে যে সুরটি সে ধরল, সেটি আমার পরিচিত। চালাবাড়ির সেই মাটির ঘরে ব'সে একান্তভাবে একদিন এটি সে আমাকে প্রথম শুনিয়ে দিশাহারা করেছিল!

গানটি হিন্দি, এবং ভজন। মোতীবাইয়ের কণ্ঠে শিবস্তোত্রের সেই নিবিড় পরমানুরাগ প্রকাশ পাচ্ছিল। আমি তন্ময় হয়ে তার গানটি শুনছিলুম, অথবা আমার মোটামুটি একলক্ষ টাকার বাণিজ্যের সাফল্যের কথা ভাবছিলুম,—এ ঠিক ক'রে বলা কঠিন। এ যেন ডুব সাঁতার! সুরসাগরের অতলতলে মাঝে মাঝে তলিয়ে যাচ্ছিলুম, আবার ভেসে উঠছিলুম বাস্তব পৃথিবীর বাণিজ্যলোকে। একথা ভুলতে পারছিনে, আজ বুধবার—আগামী শনিবারে ক্যাশ টাকা নিয়ে আসছেন সৈয়দ আলী সাহেব লক্ষ্ণৌ থেকে। মনে হচ্ছে ত্র্যহস্পর্শযোগে এঁরা আমাকে ছাড়তে চাইবেন না। অথচ মোতীবাইকে যত দেখছি, ততই তরুলতার কাছে যাবার জন্য ছটফট করছি। আমার যে-বয়স, এতে কামিনী-কাঞ্চন ছাড়া অন্য কোনও বিষয়বস্তুর কথা ভাবব,—এমন সময় এবং রুচি আমার নেই।

গান একসময় থামল। চেয়ে দেখলুম, নরেন্দরের চোখ দুটো চকচক করছে। আমি শুধু বললুম, সত্যিই এরকম চমৎকার গলা মানুষকে দড়ি দিয়েই বেঁধে রাখে।

নরেন্দর এবার উঠে দাঁড়িয়ে হাসলেন। বললেন, মুন্নার ওপর রাগ হলে ওরই কাছে ছুটে আসি! গান শুনে রাগ পড়ে যায়। আচ্ছা, আমি এবার যাই। নমস্তে—

নরেন্দের খুশী মুখে বিদায় নিলেন।

সেদিনকার মতো আজও লক্ষ্য করছি, ভজন গাইতে গাইতে মোতীবাইয়ের কেমন একটা আত্মবিস্মৃতির ভাব আসে। মানুষটা যেন কতকটা বদলিয়ে যায়! আমাদের সেই কীর্তনিয়া গোপাল গোঁসাইয়ের মতন। পালা গাইতে-গাইতে সে লোকটা হা-কৃষ্ণ হা-কৃষ্ণ বলে শ্রোতাদের ভিড়ের ভিতর দিয়ে হাঁটতে থাকে—সে যেন যাচ্ছে বৃন্দাবন থেকে মথুরায়! কী ভাগ্যি, মোতীবাইয়ের তেমন ভর্ হয় না তাই রক্ষে!

মিনিট দুই চুপ ক'রে থাকার পর মোতীবাই নিজকে সামলিয়ে নিয়ে হাসিমুখে বলল, গান যেটুকু শিখেছি এ দাদাজিরই জন্যে।

কেন, মায়ের উৎসাহ ছিল না?—প্রশ্ন করলুম।

মোতীবাই আমার দিকে তাকালো, তারপর মুখ ফিরিয়ে শুধু একটি কথাতেই জবাব দিল, না।

আমি আর কথা বাড়াতে চাইলুম না। এসব পারিবারিক ব্যাপার। বাইরের দিকে চেয়ে দেখলুম, বৃষ্টি যেন কখন্ ধ'রে গেছে।

॥ ৭ ॥

অনেকদিন পরে নিজকে বেশ সুস্থ মনে হচ্ছিল। পায়ের ব্যথা প্রায় সম্পূর্ণ সেরেছে, পিঠের ব্যথাটাও মিলিয়ে গেছে। ঔষধপত্র, মালিশ, পথ্য এবং আন্তরিক যত্ন—কোনটারই অভাব ছিল না। ডাঃ আগরওয়াল আমাকে চোখে-চোখে রেখেছিলেন। মোতীবাই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে একদিন হেসে বলেছিল, দেখছেন না জামাইবাবু, মিঃ নাগের ওজনও যেমন বেড়েছে, গায়ের রংও তেমনি ফর্সা হয়েছে?

নরেন্দর ভগ্নির কথায় হেসেই খুন। আমি বললুম, হবে না কেন, ডাঃ আগরওয়াল? অতগুলি মুরগি-শাবকের প্রাণবলি দেওয়া হয়েছে, গোয়ালের বাছুররা জননীর স্তন্যপান থেকে প্রতিদিন বঞ্চিত হ'চ্ছে, এলাহাবাদের বাঁদররা গাছের ফল খেতে পায়নি,—স্বাস্থ্য কেনই বা ফিরবে না? আব রং ফর্সা! ঘরেব মধ্যে বসে থাকা, আর সাহেবী বাথরুমে টার্কিশ বাথ,—কেন চকচকে হবে না?

ওঁরা সেদিন আমার কথায় খুব হাসাহাসি করেছিলেন।

মোতীবাই যেদিন প্রথম আমাকে নিয়ে বেরোলো, সেদিন আমি স্বচ্ছ আনন্দে ফুরফুর কবছিলুম। আনন্দের কারণ ছিল। আলীসাহেব সমস্ত টাকা নগদ দিয়ে গেছেন। এছাড়া অন্যত্র যত পাওনা যেখানে ছিল প্রায় সমস্তই নগদ হাতে পেয়েছি। সব মিলিয়ে এক লাখ দেড হাজার। এ ছাড়া আমার কাছে ছিল নগদ পনেরো। খুচরোও প্রায় সওয়া শ'। আমার বিশ্বাস, আমার স্বাস্থ্যশ্রীর উন্নতি এই কারণেও বটে। পুরুষমানুষ প্রকৃতভাবে প্রণয়াসক্ত হ'লে শীর্ণ হতে থাকে, এবং টাকা পয়সা পেতে থাকলে ফুলে কেঁপে ওঠে! যাক্ ওসব কথা। ভালয় ভালয় টাকাকড়ি-

গুলো এখন মদীয় পিতৃদেব রামধন নাগের হাতে উঠলে বাঁচি। এখন আমার ব্যাগভরা কাঁচা টাকা।

মোতীবাইয়ের নিজের একখানা আগের মডেলের অস্টিন্ গাড়ি এ-বাড়ির এক কোণের গ্যারাজে প'ড়ে থাকে, আমি জানতে পারিনি। শুধু তাই নয়, সে নিজেও ড্রাইভ্ করতে জানে, আর জানে তার নিজস্ব ভৃত্য হরেরাম ছোকরাটা।

আমাকে বাঁদিকে বসিয়ে সেদিন শ্রীমতী মুন্না গাড়ি নিয়ে চলল অনেকদূরে। এ পথটা আমার নিতান্ত অপরিচিত নয়। এটা বাস রুট। দু'একবার এদিক দিয়ে আমাকে আসতে-যেতে হয়েছে। কত মাইল যেন। তারপর আসে টন্স্ বা তমসা নদী। অতঃপর পাওয়া যায় বিন্ধ্যপ্রদেশ।

মাঠের পার দিয়ে যাবার সময় বললুম, তোমার আচরণ বুঝতে পারা যায় না। ট্রেন দুর্ঘটনা থেকে আজ পর্যন্ত তোমার গতিবিধি চালচলন সবই দুর্বোধ্য।

মোতীবাই সহাস্যে ফিরে তাকালো।

বললুম নয়ত কি ? তিন সপ্তাহ প'ড়ে রইলে সেই ক্যাম্পে ওই দুর্দশার মধ্যে, বারোদিন ওই মেটে চালাঘরে কাটালে, নিজের হাতে হাটবাজার ক'রে বেড়ালে, সাইকেল রিক্সায় দুনিয়াসুদ্ধ ঘুরলে। তা ছাড়া সব চেয়ে অবাক করলে, এত বড় ঘরের মেয়ে হয়ে শুধু একটা পুঁটলি সম্বল ক'রে যেখানে-সেখানে বেরিয়ে পড়েছিলে ! তোমার সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে জটিল, মোতীবাই।

হাসিমুখে মোতীবাই বলল, জটিল কেন, অতি পরিষ্কার। ভোগ-দুর্ভোগ দুই মানতে হয়, দুই মিলিয়ে জীবন !

তাই বলে জেনে-শুনে নিজের হাতে দুঃখ দুর্দশা আনব ? সব থাকতে নিজের ইচ্ছেয় নিজকে বঞ্চিত রাখব ? এ কেমন ধরনের চিত্তবিলাস, কমরেড ?

এবার হেসে উঠল মোতীবাই। পরে বলল, তোমার প্রশ্নটার মানেই হ'ল রক্ষণশীল সমাজের প্রতিবাদ। নাই বা কিছু জানলে? এই ত' বেশ—তুই কমরেড পাশাপাশি।

কতক্ষণের জন্য চুপ ক'রে গেলুম। এক সময় নিজেই হাসলুম। বললুম, যাকে তুমি এতদিন ধ'রে কম্‌রেড ব'লে ডাকছ, সে আজও তোমার বিশ্বাসের পাত্র হ'তে পারল না, এ কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা।

এবার মোতীবাই হাসল না। কিন্তু ব্রেক ক'ষে গাড়ি থামালো মাঠের পাশে। তারপর বলল, তুমি শুধু প্রশ্নই করছ, শুধু কেবল জানতেই চাইছ,—কিন্তু নিজের মন থেকে কি একটা জবাবও পাওনি?

আমার গায়ে যেন হঠাৎ কাঁটা দিল। নিজের মন! এ আবার কোন্ পথ ধরলো এই ভিন্‌দেশী মেয়ে? ভরদুপুরে আমি অনেকটা যেন অন্ধকার দেখলুম।

হোক না কেন আমার চেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু আমি যেন মোতীবাইয়ের কতকটা অনুকম্পার পাত্র। পুনরায় সে বলল, তুমি হয়ত আভাস পেয়েছ, আমি বাড়ির লোকের একটু অবাধ্য—!

একটু কেন,—বিশেষ রকম! ভয় করে তোমাকে সবাই, কিন্তু ভালোবাসে কে না? স্বচক্ষেই ত' দেখছি!—আমি গলা তুলে বললুম।

মোতীবাই বলল, যাক্, এখন দেখছি তোমার চোখের দেখাও মিথ্যে!

অ্যাঁ? কী বলছ?

ঠিকই বলছি। শোনো। সেবার রাগ ক'রে পুঁটলি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলুম। মহেন্দর সঙ্গে ছিল। ভেবেছিলুম আর বাড়ি ফিরব না। না না, কমরেড—মোতীবাই বলে চলল, এর বেশি

আর কিছু জানতে চেয়ো না। তবে ট্রেন-দুর্ঘটনার পর তোমার কি একবারও মনে হয়নি যে, তুমি আমার পথ জুড়ে বসেছ?

আঁৎকিয়ে উঠে বললুম, আমি! মানে—এই ফটিক নাগ? তোমার মতলবটা ঠিক বুঝতে পারছিনে, মোতীবাই। আমার ইচ্ছে, আজ রাত্রের ট্রেনেই আমি বাড়ি ফিরি নিরাপদে ব্যাগ-বিছানাটা সঙ্গে নিয়ে।

মোতীবাই অতিশয় গম্ভীর ও রুক্ষকণ্ঠে বলল, একটু বাড়াবাড়ি করছ তুমি, মিঃ নাগ। লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, ব্যাগে তোমার নাম লেখা নেই কোথাও, মনে রেখো।

অ্যাঁ? মানে?—আমি হাসবার চেষ্টা করলুম,—আমাকে বুঝি ভয় দেখাচ্ছ মাঠের মাঝখানে এনে?—বলতে বলতে আমি যেন ককিয়ে উঠলুম,—না, নাম লেখা নেই, কিচ্ছু নেই, কোনও প্রমাণই নেই! কিন্তু—কিন্তু আমি ত' নিজেই বলেছি, যত কমিশন্ তুমি চাও আমি দেবো! আমাকে ব্ল্যাক্‌মেইল্ করতে চাইছ কেন, মুন্নাজি?

মোতীবাই জবাব দিল না। কিন্তু তার এই আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে আমার গলা শুকিয়ে এল। মনে হচ্ছে, বিপদ আমার আসন্ন। অতঃপর সে দুখানা হাত দিয়ে স্টিয়ারিংটা ধরল, তারপর তারই ওপর একসময় মাথাটা ঝুঁকিয়ে রাখল। আমি নিজের বুকের মধ্যে ধকধক শব্দ শুনতে পাচ্ছিলুম। তবে কি আগাগোড়া সমস্তটাই সাজানো? তবে কি আমাকে এইভাবে প্রতারণা করার জন্য চারদিক থেকে এক বিরাট চক্রান্তজাল সৃষ্টি? না, না, পুলিশে খবর দেওয়া যায় না,—দিলে আমারই বেশি বিপদ। কারণ, থাক, সে অনেক কথা।

আমার কণ্ঠস্বরকে যথেষ্ট গদগদ করবার চেষ্টা ক'রে এবার

বললুম, আমি তোমার পথ জুড়ে বসেছি—এত বড় কথাটা তুমি বলতে পারলে, কমরেড ?

মোতীবাই জবাব দিচ্ছে না লক্ষ্য ক'রে আমি অধিকতরো আতঙ্কিত হলুম। মেয়েটা যেন এই মাইল পঁচিশেক পথ এসে হঠাৎ কেমন করে ডিগবাজি খেয়ে গেল। যে-মেয়েছেলেটাকে দেখছি দুমাস ধরে, এ সে নয়। এ যেন কুটিল, জটিল, নীতি-ধর্মভ্রষ্টা, আধুনিক যুগের সর্বপ্রকার ধূর্ততা আর চাতুরী নিয়ে এ যেন পিশাচসিদ্ধা শয়তানীর মতন আমার বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মতো বসে আমার গলা টিপে ধরল। আমার দম আট্‌কিয়ে এল ! আবার আর্তনাদ করে উঠলুম,—মোতীবাই, সাড়া দিচ্ছ না যে ? তবে কি জানব আমার ধ্যানধারণা বিশ্বাস বন্ধুত্ব ভালবাসা—সব মিথ্যে হতে বসল ?

ভালবাসা ! বন্ধুত্ব ?—মাথা তুলে মাগি আমার দিকে একবার তাকালো। পলকের মধ্যেই লক্ষ্য করলুম, ওর সুন্দর দুটো চোখ একটু রাঙা। কিন্তু একটি কথাও উচ্চারণ না করে আবার মাথাটা ঝুঁকিয়ে স্টিয়ারিংয়ের ওপর রাখল।

চিৎকার ক'রে ডাক ছেড়ে কাঁদব কিনা, ঠিক বুঝতে না পেরে আমি একসময় স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললুম, মোতীয়া, তুমি কি খুব রাগ করেছ আমার ওপর ? আমি যে কত কৃতজ্ঞ তোমার কাছে—

ডানহাতে ওর মাথায় একবারটি পরম সমাদরে হাত বুলোবার চেষ্টা করতেই বিরক্ত হয়ে মোতীবাই বলল, আঃ গায়ে হাত দিয়ো না—

গায়ে নয় মুন্নাজি, মাথায় হাত দিচ্ছিলুম। গায়ে কখনও হাত দিতে আছে একজন মহিলার ?

হাতখানা আমি খপ ক'রে সরিয়ে নিয়েছিলুম, কেননা ওটাতেই ব্ল্যাকমেইল্‌ড্‌ হবার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু এই সরীসৃপস্বভাবা

নারী যখন্ তা'র পাতানো কম্‌রেডের স্পর্শাদরটাও প্রত্যাখ্যান করল, তখন বুঝতে পারা যাচ্ছে এর শঠতা এবং ফন্দিবাজি কী গভীর। আমি কাঠ হয়ে গিয়েছিলুম। এরই নাম যে ত্র্যহস্পর্শ-যোগ,—কে জানত? সামনের দিকে রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়েছিলুম।

কণ্ঠস্বরে ক্লান্তির ভান ক'রে এক সময়ে মোতীবাই বলল, তুমি আজকের ট্রেনেই চ'লে যেতে চাইছিলে! চলো, তোমাকে স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে আসি!

এবার এক প্রকার কেঁদেই উঠলুম ককিয়ে,—কিন্তু আমাব ব্যাগটা? তুমি কি পথের ফকির ক'রে তাড়িয়ে দিচ্ছ? এর নামই কি ত্র্যহস্পর্শ?

মোতীবাইয়ের যেন স্মৃতিশক্তি ফিরে এল। নিতান্ত ঔদাসীন্যের সঙ্গে সে বলল, ওঃ হ্যাঁ, ব্যাগটা—!

আর আমার ঘাঁটাতে সাহস হ'ল না! কি জানি, ওর যে রকম মেজাজ-মর্জি,—কোন্ কথাটা কী ভাবে নেয়। আমি চুপ চাপ একটা নাটকীয় উৎকণ্ঠা নিয়ে ব'সে রইলুম।

একসময় মোতীবাই নিজেই বলল, বেলা চারটে বেজে গেছে। তুমি কি আরও বেশি দূরে যেতে চাও?

কেন? এই ত' বেশ হ'ল!—ওকে খুশী করবার জন্য বললুম, চমৎকার বেড়ানো গেল তোমার গাড়িতে! চারিদিকে কী সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য! সত্যি, তোমাদের এদেশে এলে আর ফিরে যেতে মন ওঠে না!

তোমাদের মন।—মোতীবাই ক্ষীণভাবে হাসল।

অর্থাৎ সে বলতে চাইল, আমার মন নামক কোনও পদার্থই নেই। চট ক'রে সায় দিয়ে বললুম, তা যা বলেছ! তোমার চোখ কিছু এড়ায়না! হপেনা, কত বড় সুশিক্ষিত

মেয়ে তুমি! ঠিকই বলেছ। পুরুষ জাতির মন,—পদ্মপত্রে নীর!

আমার চাটুবাক্য শুনেও মোতীবাই কথা বলল না। শুধু একসময় নিজের মাথাটা একবার হঠাৎ ঝাড়া দিয়ে গাড়িখানা ঘুরিয়ে ফিরে যাবার জন্য ষ্টার্ট দিল। বেশ বুঝলুম, আজকের পরিভ্রমণটা যেন দায়সারা। এ যেন কী একটা অসমাপ্ত রাখা হ'ল! গানের আসর বসিয়ে মাঝপথে যেন হঠাৎ আলো নিবিয়ে দেওয়া! আমি চুপ ক'রে গিয়ে আড়চোখে একবার ওর দিকে তাকালুম।

গাড়িখানা ঘুরিয়ে মোতীবাই ফিরে চলল। কথা সে কম বলছে, বলছেই না একরকম,—লক্ষ্য করছি তা'র মধ্যে এসেছে ক্লান্তি। তবু এক সময় ওইভাবেই সে ধীরে ধীরে বলল. তিন সপ্তাহ ধ'রে সেই ক্যাম্পে শুয়ে রইলুম তোমার পাশে! তুমি খোঁজ নিলে না সামান্য চোট নিয়ে কেন প'ড়ে রইলুম! কেন রইলুম চালাবাড়িতে, জানতেও চাইলে না।

মোতীবাই মলিন হাসি হাসল। বিপরীত দিক থেকে একখানা বাস এসে পড়ল, সে সাবধানে পাশ কাটিয়ে নিল।

আমি তার মন রাখার জন্য বললুম, আর কিছু নয় মুন্না, কিন্তু ওই একমাসে তোমার যে সংযম, সত্যনিষ্ঠা, নীতিবোধ এবং ধর্মের প্রতি অনুরাগ দেখেছিলুম—

মিছে কথা ব'লোনা মিষ্টার নাগ।—মোতীবাইয়ের কণ্ঠস্বরে বিরক্তি দেখা গেল,—আগাগোড়া ভেবে দেখো, অত্যন্ত অসংযত ভাবভঙ্গী ছিল আমার। এবং আমি জানি কিছুই তোমার চোখ এড়ায়নি! আর নীতিবোধ? উট্‌কো পুরুষের চোখের সামনে ভদ্রঘরের শিক্ষিত মেয়ে কখনও যা করে না, তাও করেছি! এর পর আবার বলছ, ধর্মের প্রতি অনুরাগ, যার প্রতি তিলমাত্র

আকর্ষণ নেই আমার! কিন্তু আমি দেখতে চেয়েছিলুম, বাইরে গিয়ে ওই সঙ্গম-স্নানের নানা অসুবিধার মধ্যে তোমার আচরণ। দেখতে চেয়েছিলুম তোমার কাল্‌চার, তোমার রুচি, তোমার দায়িত্ব-জ্ঞান। তোমাকে কম্‌রেড বলতে আরম্ভ করলুম কেন, ভেবেছ কি?

স্বীকার করলুম, না, ভাবিনি!

আবার হাসল মোতীবাই। স্টিয়ারিং হাতে ঠিক রেখে সে বলল, নিষিদ্ধ ফল খাবার আগে পর্যন্ত আদম আর ইভ্‌ ছিল কম্‌রেড! তোমার আশ্চর্য সংযম আর নির্লোভ মনের সঙ্গে তোমার সুশ্রী বলিষ্ঠ চেহারাটা মিলিয়ে একটা স্বপ্নজাল তৈরি করলুম! সব মেয়েই করে! তাই তোমাকে ডাকলুম কম্‌রেড! বন্ধুর চেয়েও যে আপন,—অথচ স্বামীও নয়, কিংবা সহবাসের সম্পর্কও তৈরি করা নয়! তুমি থাকবে চোখের সামনে চিরদিন,—যেমন মীরাবাইয়ের সামনে ছিল নন্দলালের মূর্তি! যেন আমার সমস্ত হতভাগ্য জীবনের একটা মানে খুঁজে পাচ্ছিলুম ওই রস-কল্পনায়! তুমি থাকবে কম্‌রেড হয়ে চিরদিন! দ্রৌপদীর যেমন কম্‌রেড ছিলেন বাসুদেব।

ঘৃত এবং অগ্নি পাশাপাশি থাকলে উভয়ের পক্ষে অক্ষুণ্ণ থাকা সম্ভব কিনা আমি তলিয়ে দেখার সুযোগ কখনও পাইনি। কিন্তু আদম এবং ইভ-এর কম্‌রেডশিপ স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মারও চক্ষুশূল হয়েছিল! সেই কারণে নিষিদ্ধ ফল ওদের খেতেই হ'ল এবং সেই থেকে ওরা দেহের উপর আবরণও টান্‌ল। মোতীবাইয়ের ভাষণে ভাবাবেগ এবং রসকল্পনা ছিল—যে দু'টোই অলীক ও অবাস্তব, কিন্তু আমি তার ভুল ধরাতে চাইলুম না। চুপ ক'রে রইলুম।

ফাঁকা রাস্তা পেয়ে গাড়িতে প্রচুর স্পীড্‌ দিয়েছিল মোতীবাই।

কিন্তু একসময় তেমনি মলিন ও বিষণ্ণ কণ্ঠে সে বলল, রাগ করো না যাবার আগে। তোমাকে খুঁজে পাবার জন্য তোমাকে নিয়েই পথে পথে আমি ঘুরছিলুম! বাড়িতে ঢুকিনি, পাছে তোমাকে হারাই। কিন্তু তোমাকে খোঁজা মিথ্যে হ'ল। টাকার জালে তুমি জড়িয়ে গেছ, তা'র থেকে উঠতে পারলে না তুমি! আমার দুঃখ-সুখের শেষ পরিণামের মতনই তুমি সামনে এসেছিলে! বাকি রইল আমার মৃত্যু!

এবার আর চুপ ক'রে থাকা গেল না। বললুম, কিন্তু আমি যে একজন বিবাহিত ব্যক্তি, একথা কি তুমি একবারও বিবেচনা করবে না?

কী এসে যায়, মিস্টার নাগ?—মোতীবাই বলল, স্বামী স্ত্রী বাঁধা থাকে গাঁটছড়ায়, কম্‌রেডরা চিরকাল নিঃসঙ্গ! তারা থাকে গায়ে গায়ে পাথরের টুক্‌রোর মতন, কিন্তু দুই মিলিয়ে এক হয় না কোনদিন!

আমার বাড়ি পৌঁছবার আর দেরি ছিল না। শহরের প্রান্তে এসে পড়েছি। সেই দিকে তাকিয়ে এবার স্পষ্টকণ্ঠেই বললুম, বেশ, মানলুম তোমার কথা। কিন্তু আদম আর ইভ যদি নিষিদ্ধ ফল খেতে থাকে, সেটা কি সামাজিক ব্যভিচার হয়ে ওঠে না?

ব্রেক্ ক'সে মোতীবাই সহসা গাড়ি থামালো মাঝপথে। তারপর চেঁচিয়ে বলল, তুমি বর্বর, বন্য, হীনচেতা,—আত্মঅবিশ্বাসী তুমি! আজই রাত্রের গাড়িতে তুমি ব্যাগ-বিছানা নিয়ে আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও!

মোতীবাই হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ফেললো। এমন চেহারা তা'র আগে দেখিনি। আমি হতবুদ্ধির মতো আড়ষ্ট হয়ে রইলুম।

কাঁদতে কাঁদতে সে আবার বলল, মানুষের সাধনা যে সকল দুর্নীতিকে ছাড়িয়ে ওঠে, একি তুমি শেখোনি? সব আবর্জনা, সব

প্রবৃত্তি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মানুষই ত' যোগাসনে বসতে জানে! তুমি যাচ্ছ যার কাছে, সেও কি কামজর্জরা এক কামিনী নয়? এমন ক'রে নিজকে কেন অপমান ক'রে যাচ্ছ?

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মোতীবাই কাঁদছিল।

অতঃপর চোখের জল মুছে কতক্ষণ বাদে পুনরায় আতুর কণ্ঠে সে বলল, তোমার জন্যেই পথে নেমেছিলুম! কিন্তু পথের মেয়েকে পথ দেখালে না তুমি—তাকে অকূলে ঠেলে দিয়ে গেলে—

শেষের দিকে তা'র কণ্ঠস্বর যেন শুকিয়ে এল। কিন্তু আমি তার কোনও কথারই জবাব দিতে পারলুম না।

মোতীবাই আবার গাড়িতে স্টার্ট দিল।

এসব ভাবাবেগের কান্না! মেয়েরা ত' চিরকালই কাঁদে পুরুষের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে! পুরুষের সঙ্গে প্রথম ভাব করবার সময় তাদের একপ্রকার চেহারা, কিন্তু ওদের বাঁধন কেটে পালাবার কালে ওরা আরেক চেহারায় দেখা দেয়। বেকার মোতীবাই তার ব্যতিক্রম নয়। সে যাই হোক, সমস্ত তর্ক-বিতর্ক ও ঝামেলার ভিতর দিয়ে এতক্ষণে আমি নিরাপদ বোধ করছিলুম। কে জানে, ভিন্‌দেশী মেয়ে ত'! সে যে আমাকে অসৎ অভিপ্রায়ে ফুসলিয়ে নিয়ে যায়নি, এই ত সর্বাপেক্ষা স্বস্তি! আমি তখন সত্যই ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলুম! খবরের কাগজে যে ধরনের খবর মাঝে মাঝে চোখে পড়ে, তার সঙ্গে এই পরিস্থিতির লক্ষণ মিলে যায় বৈ কি! আমাকে ব্ল্যাকমেইল্ ক'রে সর্বস্বান্ত করা মোতীবাইয়ের পক্ষে খুব কঠিন ছিল না! ঠাকুমা থাকলে বলতেন, আজ তোর মস্ত ফাঁড়া কেটে গেল রে!

কিন্তু আমি জানি ফাঁড়া কাটতে এখনও ঘণ্টা কয়েক দেরি আছে। সেদিন শুনে রেখেছি ত্র্যহস্পর্শের যোগ ছাড়বে আজ শেষ

রাত্রে। সেই কারণে আমার যাওয়া স্থির হয়েছে আগামীকাল মধ্যাহ্নের দিকে।

গাড়িখানা নিয়ে মোতীবাই ফটকের মধ্যে ঢুকলো।

ভিতর এসে মোতীবাই ক্লান্ত পায়ে উঠে গেল তিনতলায়। আমি রইলুম পিছনে। কেননা দাদাজি আমার জন্য চায়ের আয়োজন করেছিলেন। 'সম্মানিত' অতিথি আগামী কাল চ'লে যাবেন, এটি তাঁর মনে ছিল। তিনি তাঁর জনচারেক বন্ধুকে আমন্ত্রণ করেছেন। বুবুয়া যমুনা দেবী তাঁর স্বামীর সঙ্গে এসেছেন। ভগ্নী ও ভগ্নীপতিরা উপস্থিত হয়েছেন। অন্যান্য যাঁরা এখানে রয়েছেন তাঁদের মধ্যে মাতাজি, নরেন্দর ও দেবেন্দরের দুই সুন্দরী স্ত্রী, নরেন্দরের তরুণী কন্যা ইত্যাদি মোট ষোল আঠারো জন। এদের সকলের মাঝখানে শ্রীমতী মুন্না উপস্থিত নেই কেন—এ নিয়ে কেউ কোনও প্রশ্নও তোলে না। কেউ উল্লেখ করছে না ওই একটা নাম। মাঝখানে কেবল দাদাজি একবার সোৎসাহে ব'লে উঠেছিলেন, মিঃ নাগ যে আমাদের এই 'গরীবখানায়' কয়েকদিনের জন্য থেকে গেলেন, এজন্য আমরা মুন্নার কাছেই ঋণী।

আমি যে এক সন্ন্যাসীর হাতের চ্যালাকাঠের বাড়ি মার খেয়ে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় একদিন মাঝরাত্রে এ বাড়িতে ঢুকেছিলুম বা নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই মোতীবাই আমাকে এখানে এনে তুলতে বাধ্য হয়েছিল, অথবা আমার সঙ্গে মোতীবাইয়ের সম্পর্ক কী, এবং তা'র সঙ্গে আমার যোগাযোগের প্রকৃত ইতিহাস কী প্রকার,—এর কোনও খুঁটিনাটি কথা নিয়ে কেউ আলাপ করলেন না। এতে আমি বিশেষ স্বস্তিবোধ করলুম।

মাতাজি আমার পাশে বসেছিলেন। তাঁর ভাষা হ'ল পরিচ্ছন্ন উর্দু, অর্থাৎ হিন্দির চেয়েও এককাঠি। এ-ভাষা আমার কাছে একপ্রকার দুর্বোধ্য। তিনি আমার দিকে অর্থাৎ বাঙ্গালীর দিকে

মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছিলেন। বাঙ্গালী কী প্রকার বস্তু, তার চেহারা-চরিত্র, হাবভাব, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার,—এগুলি তাঁর খুঁটিয়ে জানা দরকার। দেখতে পাচ্ছি তিনি বৃদ্ধা, এবং আমার জননী অপেক্ষাও বয়োজ্যেষ্ঠা। তিনি প্রাচীনযুগের মানুষ। বাঙ্গালীকে তিনি অবশ্যই দেখেছেন, কিন্তু এত নিকটে পাননি। অন্যান্য মহিলারা মাতাজির কৌতূহল দেখে হেসেই খুন।

চায়ের আসরে প্রচুর আহার্য সামগ্রীর আয়োজন ছিল। বলা বাহুল্য, পশ্চিমের জল-হাওয়া আমার যকৃতে কাজ করেছে ভালো। অর্থাৎ ক্ষুধা বাড়ে কথায়-কথায়। সুতরাং আমি প্রত্যেকটি সামগ্রীর যথাযথ সদ্ব্যবহার করছিলুম। এর ফলে হ'ল এই, চায়ের এই আসরে চায়ের সমাদর ক'মে গেল। ভরা পেটে চা অরুচিকর।

মাতাজি আমার দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন। একসময় ঘাড় নেড়ে তিনি বললেন, সচ্ কহ্তে, বাংগালি জায়দা খাতা হ্যায়!

কলহাস্যে মুখর হয়ে উঠল চায়ের আসর।

যখন ছাড়া পেলুম, রাত তখন আটটা। এরপর ডিনার আছে। সেটার নাম বিদায়ী ভোজ। কিন্তু বা'র দুই উদ্গার তুলে মনে হ'ল, পেটের মধ্যে প্রোটিন্, ভিটামিন্ যথেষ্ট বোঝাই হয়েছে! আজ দুপুরে কারবো-হাইড্রেটও প্রচুর পরিমাণ খেয়েছি। আমার বিশ্বাস, সবসুদ্ধ দশ হাজারেরও বেশি ক্যালরি পেটে পুরেছি! সুতরাং আর নয়।

তেতলায় উঠে এসে বাঁচলুম। শান্ত ও নিরিবিলি পরিবেশ। দেখি, ফরমাস নেবার জন্য যথারীতি হরেরাম হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে। আমার পায়ের শব্দ পাবামাত্রই সে ছুটে গিয়ে আমার ঘরে আলো জ্বেলে দিল। ছোঁড়াটার 'অতিভক্তি' দেখে মাঝে মাঝে 'চোর' ব'লে মনে হ'ত! একবার গোটা দুই দশ নয়া পয়সা

বিছানার কোণে ফেলে রেখেও দিন তিনেক ওর সততার পরীক্ষা করেছি! না, আর যাই হোক, ছিঁচকে চোর নয়।

ফরমাসের অপেক্ষায় হরেরাম যখন দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো, আমি তখন এগিয়ে এসে বললুম, এই, তোর মনিব দিদিসায়েব কি করছেন রে?

ছেলেটা একবার হাঁ ক'রে আমার দিকে তাকালো। আমার হিন্দি কাঁচা। হিন্দির পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার আমার জানা নেই। জাহাজ, পুলিশ,—এরা নাকি স্ত্রীলিঙ্গ! মোতীবাইয়ের 'জেন্‌ডার' ঠিক কোন্‌টি,—এটি আমার যাবাব আগে জেনে যাওয়া দরকার।

হরেরাম নিজেই এবার বলল, উনি সেই আপনার সঙ্গে ফিরেছেন, আর ঘর থেকে বেরোননি!

একটু অবাক হলুম,—তাহলে আমার সন্দেহ সত্য! চায়ের আসর থেকে যমুনা দেবী একবার হাসিমুখে তেতলায় উঠে এসেছিলেন, লক্ষ্য করেছি। তিনি যখন ফিরে গিয়ে আবার আসরে বসলেন, দেখলুম তাঁর মুখ অপ্রসন্ন এবং গম্ভীর। তবে কি মোতীবাই ওঁর কাছে আমার হীরা মুক্তা জড়োয়ার 'আসল বা ঝুটো' নিয়ে কিছু নিরুৎসাহকর কথা বলেছে? আমার পেটের ভিতরকার প্রোটিন্-ভিটামিন্ পাক খেয়ে উঠল!

গলা পরিষ্কার ক'রে আমি বললুম, দিদিসাহেবকে জিজ্ঞেস ক'রে আয় ত' উনি চায়ের মজলিশে গেলেন না কেন?

হরেরাম ছুট্টে চলে গেল।—

মিনিট দুই পরে সে ফিরে এল কেমন যেন সঙ্কুচিত মুখে। আমি তাকে লক্ষ্য করতেই সে একটি চাবির গোছা আমার হাতে দিয়ে শুধু বলল, আলমারিতে আপনার হ্যাণ্ডব্যাগটি আছে। বা'র ক'রে নিন।

নিঃশব্দে মোতীবাই আমার প্রতি তা'র আক্রোশটুকু এইভাবেই প্রকাশ করল। একবার সে বলেছিল, আজই রাত্রে তোমার ব্যাগ-বিছানা নিয়ে দূর হয়ে যাও! তুমি বর্বর হীনচেতা।

কোথায় কে যেন বলেছিল, মেয়েছেলে তা'র আক্রোশের উত্তেজনায় যা বলে, শান্তমনে বলে তা'র বিপরীত! পুরুষ-মানুষ এর ঠিক উল্টো। শান্তমনে ভেবে চিন্তে তা'রা অনর্গল মিছা কথা বলে, এবং উত্তেজনার সময়,—না থাক্, এ নিয়ে ঘাঁটঘাঁটি করা নিরাপদ নয়!

হরেরামকে আমি শুধু বললুম, আচ্ছা ঠিক আছে, তুই এখন যা। আর শোন্, রাত্রে আমি কিছু খাবোনা, পেট ভরা আছে, বুঝলি?

জি, হুজুর।—ব'লে হরেরাম চলে গেল। ধনাঢ্য পরিবারের ভৃত্য,—যাবার সময় ছোঁড়াটাকে কি পরিমাণ বকশিস দিয়ে যেতে হবে, সেই দুর্ভাবনা আমাকে পেয়ে বসল।

ঘরে কেউ আসবেনা জানি, তবু দু'দিকের দুটো দরজাই আমি বন্ধ ক'রে দিলুম। ব্যাগটা বা'র করছি, এসময় মোতীবাইও ঘরে না ঢোকে, এই আমার কাম্য। চাবির গোছাটার বিশেষ নম্বরের চাবিটি আমি চিনে রেখেছিলুম। সুতরাং ষ্টীলের আলমারি খুলতে আমার অসুবিধে হল না। ব্যাগটা সামনেই ছিল,—প্রথমেই বা'র ক'রে নিলুম।

বলা বাহুল্য, আলমারির ভিতরকার সকল সামগ্রী মোতীবাইয়ের সম্পূর্ণ নিজস্ব। মূল্যবান বস্ত্রাদিই বেশি। কিন্তু বহুমুল্য ওই সব সামগ্রীর মধ্যে একটি কাগজের মোড়ক লক্ষ্য ক'রে একটু যেন আমার সন্দেহ হ'ল। মোড়কটি বা'র ক'রে খুলে দেখি, আমার সেই কাদামাখা ছেঁড়া রবারের চটিজোড়াটা—কয়েকদিন আগে যেটা ব্যাগ থেকে বার ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলুম! ওরই মাপে

মোতীবাই আমার জন্য বাজার থেকে একজোড়া পছন্দসই কানপুরি চটি এনে উপহার দিয়েছিল! ছুঁড়ি দেখছি একেবারে সতীসাধ্বী কম্‌রেড।

নিজের মনেই হাসলুম। এম-এ পাশ করা এক অবাঙ্গালী মেয়ের এই প্রকার খেলো ভাবোচ্ছ্বাস কতখানি হাস্যকর—এটি সে নিজেও বিচার ক'রে দেখেনি। মেয়েটার রুচির আভিজাত্য বড় কম।

চটির মোড়কটা আবার ঠিক তেমনিভাবে গুছিয়ে রেখে দিলুম।

ব্যাগেব মধ্যে থাকে-থাকে টাকার নোটের কেতাগুলি নির্ভুল-ভাবে গুণে গুছিয়ে রেখেছে মোতীবাই নিজের হাতে। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, আমি চিরদিনই সন্দেহবাদী। রামধন নাগের ছেলে যে ভাবেভাসা হবে, এমন আশা করা অন্যায়। আমাব কারবার হ'ল জড়োয়া-জহরতের,—হৃদয়-বিনিময়ের কাববার আমি করিনে।

পকেট থেকে কাগজ পেন্সিল্ ও নোটবইটি বা'র ক'রে আমি হিসাব নিয়ে বসলুম। কী কী মাল এনেছিলুম, কী কী বিক্রি হয়েছে কত টাকায়, কী কী স্টকে আছে—এই হ'ল হিসেব। এসবই আমার মুখস্থ, সুতরাং হিসেব নিয়ে বেগ পেতে হ'ল না। এরপর আগাগোড়া মেলাতে বসলুম টাকার অঙ্ক। মোতীবাই ব'লে রেখেছে, আলীসাহেব ও বুবুয়ার বাণ্ডিলগুলো সব হাজার টাকার। একশ' টাকার বাণ্ডিল অনেকগুলো। দশ টাকার আছে পনেরো হাজার টাকা! সব আলাদা আলাদা ভাগে রেখেছি।

টাট্‌কা নতুন নোটের পিন্‌সারা বাণ্ডিল না গুণলেও চলে। শুধু নম্বর মিলিয়ে নেওয়া মাত্র। আমার মোট আধঘণ্টা লাগল। হিসাব মিলিয়ে দেখলুম, কোথাও কোনও ভুল নেই। মনে মনে মোতীবাইয়ের হিসাববুদ্ধিকে তারিফ করতে হ'ল। অতঃপর

ব্যাগের মধ্যে আমার ছেঁড়া গেঞ্জি, ময়লা রুমাল, দাগলাগা গামছা—এইসব দিয়ে নোটের কেতাগুলি ঢেকে ব্যাগটি পুনরায় আলমারিতেই তুলে রাখলুম। আজকাল সওয়া-লাখ টাকার দামই বা কতটুকু? তার ওপর আবার কাগজের খরচ কমাবার জন্য জনপ্রিয় গভর্ণমেণ্ট নোটগুলোকে করেছেন হাল্‌কা ও ফুরফুরে। চাবির গোছটা রেখে দিলুম নিজের কাছে। একটা রাত থাকলই না হয় আমার পকেটে। বিছানার বাণ্ডিলটা এক কোণে সেই বাঁধাই পড়ে আছে। ওর মধ্যেই রয়েছে আমার গরম কোট আর সূতীবস্ত্রাদি। গায়ে থাকবে নতুন গলাবন্ধ সূতী কোট।

সব দিক ঠিক আছে দেখে শুনে আমি সামনের দরজাটা খুললুম। রাত ঠিক কত হিসাব করিনি। বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখি, হরেরাম কাছাকাছি নেই। আমার দরজা বন্ধ দেখে সম্ভবত আজকের মতো সে ছুটি নিয়েছে। দোতলা থেকে বিশেষ সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ছাদের উপরটা তেমনি ঘুটঘুট করছে। পশ্চিম আকাশের দিকে চোখ পড়তেই দেখি, চন্দ্র অস্ত যাচ্ছে। পূর্ণিমার পরে কবে পেরিয়ে গেছে অমাবস্যা, কবেই বা শুক্লপক্ষের মাঝামাঝি এসে পড়েছি,—কিছু মনে নেই।

ভাবলুম একবারটি মোতীবাইয়ের মেজাজ-মর্জিটা দেখে আসি। দু' পা এগিয়েই গেলাম ডাইনিং হল্ পর্যন্ত,—কিন্তু আবার ফিরলুম। থাক্, কাজ নেই এত রাত্রে। কিন্তু মুখ ফেরাতেই চোখে পড়ল, ডাইনিং টেবলে একটি গেলাস ঢাকা দেওয়া রয়েছে। আলো জ্বলছে। আজ রাত্রে আমি আর কিছু খাবো না বলা আছে। সুতরাং আমারই জন্য হয়ত কিছু একটা পানীয় রেখে গেছে। আমি গিয়ে ঢাকা খুলে দেখলুম, এক গ্লাস কমলালেবুর রস। কলকাতার ফিরিওলার সেই ঠ্যালাগাড়ির দোকানে আজকাল এক গ্লাস

কমলার রস বোধ হয় দেড় টাকা। আমি এগিয়ে গেলাসটা তুলে এক চুমুকে শেষ ক'রে দিলুম।

মোতীবাইয়ের ওদিকটায় চেয়ে দেখলুম একদম নিশুতি! যাবার আগে এইভাবে সে আমার সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটাবে, এটা ভাবিনি। সত্যি বলতে কি, আগাগোড়া ওর আচরণ মিলিয়ে দেখছি, ওর আন্তরিকতায় খাদ নেই কোথাও! অনেক করেছে মোতীবাই আমার জন্যে। আমাকে আনন্দে রাখার চেষ্টা করেছে প্রথম থেকে। সেই কৃতজ্ঞতা আমি জানিয়েওছি অনেকবার। ওর কথা আমি নিশ্চয় মনে রাখব।

চ'লে গেলুম আমি নিজের মহলের ঘরে। আলো নিবিয়ে দিয়ে সোজা নিজের পালঙ্কে উঠে ডান্‌লপ গদি ও বালিশের মধ্যে ডুবে গেলুম। গায়ের ওপর টেনে দিলুম নধর মিহি একখানা লালিম্‌লির কম্বল। কিন্তু ওই আরাম-শয্যায় শুয়ে ঘুমোবার আগে ভাবলুম, ভালই হয়েছে, এ ধরনের মনোমালিন্য আমার পক্ষে কল্যাণজনক। দাগ থাকবে না কিছু, আকর্ষণবোধ করবে না উভয়পক্ষ, যোগসূত্র থাকবে না কোনওদিকে, এবং কর্মজীবনে চিন্তাবিভ্রম ঘটাবে না কখনও। অন্ধকারে শুয়ে-শুয়ে আমি কেমন একটা বন্ধনমুক্তির স্বাদ যেন নিজে নিজেই বন্যজন্তুর মতো লেহন করছিলুম।

চোখ বুজে আমি নিজের মধ্যে তলিয়ে যাবার চেষ্টা পেলুম। সাধু-সন্ন্যাসীরা চোখ বুজে আত্মসমাহিত হয়, তারা যোগদৃষ্টিতে দেখতে পায় মহাজাগতিক অনন্ত বিশ্বলোকের আনন্দময় অখণ্ড সত্তা! আমিও ডুবে যাচ্ছিলুম গভীর থেকে গভীরতর অন্ধকারে—যেন কোন্ অজানা সাগরের অনাবিষ্কৃত এক প্রবালদ্বীপের তলায় অতল পাথারের নিচে। সেখানে নেমে যাচ্ছিল আমার প্রাণসত্তা মূঢ় অঁন্ধের মতো। চেয়ে দেখলুম জীবন্ত মণিমুক্তারা উগ্র আলোকের বিন্দুর মতো বিচরণ করছে ঘন গূঢ় জলরাশির নিচে।

দেখলুম ওদের মধ্যে একটি আলোকবিন্দু থমকিয়ে গেল আমার দিকে চেয়ে। সে যেন মোতীবাইয়ের জ্বলজ্বলে প্রাণবন্ত দৃষ্টি,—যে-চোখ দেখেছিলুম, আজ অপরাহ্ণে মোটরের মধ্যে ব'সে! প্রবালের রক্তিম আভা ছিল তার দুই চোখে।

না, আজ সহজে ঘুম আসবে না। আমার বিশ্বাস অসময়ে অতিভোজনের ফলে হজমের গোলমাল ঘটেছে। মাথাটা যেন একটু ধরেছে। রস চড়েছে মনে হচ্ছে। ঘুম যেন পালিয়ে গেছে আমার চতুঃসীমা থেকে।

কম্বল সরিয়ে পালঙ্ক থেকে নামলুম। আলো জ্বাললুম না। অন্ধকারেই বাথরুমে ঢুকে মাথায় ও মুখে বার বার ঠাণ্ডা জল দিলুম। পাদুখানা ভাল ক'রে ধুয়ে নিলুম। রাত কত ঠিক জানিনে। কতক্ষণ ধ'রে ঘুমোবার চেষ্টা করেছিলুম তাও হিসেব করিনি। তবে রাত একটা বা দেড়টার কম হবে না।

যাবার আগে মনোমালিন্য ঘটল, সামাজিক দিক থেকে এটা খুব বাঞ্ছনীয় নয়। তবে আমি যে স্বস্তিলাভ ক'রে যাচ্ছি, এটুকু জানিয়ে যেতে পারলে ভাল হ'ত। দু'পা এগিয়ে গেলুম। কিন্তু রাত দেড়টার সময় একাকিনী যুবতীর ঘরে ঢুকে তাকে জাগিয়ে তুলে স্বস্তিলাভের সংবাদ দেবো, এ যেন একটু বাড়াবাড়ি। সকালে উঠে মোতীবাইকে ধন্যবাদ দিলেই চল্‌ত। কিন্তু ওর ভাবগতিক ভাল নয়। আমার মুখদর্শন করার আগেই হয়ত সে বাড়ি ছেড়ে কোথাও বেরিয়ে পড়বে। ওর অসাধ্য কিছু নেই।

নিজের মধ্যেই এবার জোর পেলুম। আমার ত' কোনও মন্দ অভিপ্রায় নেই! মাঝরাত্রে মোতীবাইও ত' আমার সেই চালাবাড়ির ঘরে ঢুকেছে দু'একবার। কই, আমার ত' সম্ভ্রমহানি ঘটেনি! আর তাছাড়া আমার ওদিকটা চিরকালই একটু

ভোঁতা,—একথা তরুলতাও জানে। এসব ব্যাপারে আমি পাসিভ্, য়্যাক্টিভ্ নই।

ঘরের দরজা ভেজানো ছিল,—যেমন থাকে। ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা চললুম ওমহলের দিকে। ভয় কি, আমি ত' চুরি করতে যাচ্ছিনে! কিন্তু তবে যাচ্ছি কেন? যাচ্ছি শুধু আগেভাগে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে আসতে! কিন্তু তার জন্য রাত্রি দেড়টা কেন?—তার জবাব আছে বৈকি। আমার কাছে দিন বা রাত একই কথা। মোতীবাই যদি 'দিনকা বাঘিনী বা রাতকা মোহিনী' হয়—আমার কিছু যায় আসে না! বলেছি ত' ওসব ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত! আর এই নিরাসক্তিই ত' মনোমালিন্যের মূল কারণ।

কিন্তু বিকালের মতন যদি আবার মোতীবাইয়ের হিষ্টিরিয়া দেখা দেয়? যদি হাউমাউ ক'রে আবার এই রাত দেড়টায় চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে?

দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ ভয়ে থমকিয়ে গেলুম।

কে? হরেরাম?

ভিতর থেকে মোতীবাইয়ের শান্ত নম্রমধুর কণ্ঠের ডাক যেন এল! আমি তখনই ধীর কণ্ঠে জবাব দিলুম, না মুন্না, আমি।

একটি পলকের স্তব্ধতা। তারপরেই মোতীবাই বলল, ভেতরে এস।

অন্ধকারে ওর পালঙ্কের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। মোতীবাই বলল, একটু কাজ ক'রে দেবে? আমার উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না—

বললুম, কী বল, এখুনি ক'রে দিচ্ছি—

বড্ড তেষ্টা পেয়েছে! ওই ডাইনিং টেবলের ওপর হরেরাম কমলালেবুর রস রেখে গেছে, গেলাসটা একটু এনে দেবে?

আমার বক্ষোস্পন্দনের তাল ছিল দ্রুত, সুতরাং চট ক'রে কিছু

বুঝতে পারলুম না। শুধু অন্ধকারে ক্ষণকাল অটল শালপ্রাংশুর মতো দাঁড়িয়ে নিজের কদর্য লোভের জন্য অপমানিত মুখে নিজকে ধিক্কার দিচ্ছিলুম।

মোতীবাই কোমল কণ্ঠে বলল, দাঁড়িয়ে রইলে যে? আচ্ছা থাক্—

বললুম, ওটা আমি খেয়ে ফেলেছি মুন্না, ঠিক বুঝতে পারিনি—

মোতীবাই বলল, বেশ করেছ, ওতে লজ্জা কী? এক কাজ করো, তোমার ঘরের সোরাই থেকে একটু ঠাণ্ডা জল এনে দাও, লক্ষ্মীটি। আমি—আমি উঠতে পারছিনে—!

ছুটে বেরিয়ে গিয়ে এক মিনিটের মধ্যে আমি ঠাণ্ডা জল নিয়ে এলুম। গেলাসটা নিয়ে মাথা তুলে সে প্রায় সমস্ত জলটাই এক চুমুকে খেয়ে ফেলল। পরে শুধু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আঃ—

কী হয়েছে তোমার, মুন্না?

হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে মোতীবাই বলল, না, কিছু না—এ সামান্য—

পালঙ্কের ধারে ব'সে ওর কপালে হাত রেখে দেখি খুব গরম। বললুম, জ্বর হয়েছে যে তোমার!

ক্লান্তকণ্ঠে মোতীবাই বলল, কি জানি, বোধ হয় ফ্লু! ভীষণ ব্যথার মোচড় দিচ্ছে সর্বাঙ্গে।

কখন্ থেকে হ'ল?

তোমাকে নিয়ে বেরিয়েছিলুম দুপুরে, সেই থেকে। এখনও শীত করছে খুব। এত মাথার যন্ত্রণা—

দুপুর থেকে এতক্ষণ অবধি আনুপূর্বিক প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি মনে মনে অনুধাবন ক'রে এবার বললুম, তোমার আপত্তি না থাকলে আমি একটু মাথা টিপে দিতে পারি, মুন্না?

মুন্না চুপ ক'রে রইল কতক্ষণ। পরে বলল, কাল তুমি চলে যাবে, আজ রাত জাগলে শরীর খারাপ হ'তে পারে!

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রথম আক্রমণের যন্ত্রণা আমার জানা ছিল। মাংসপেশীর মধ্যে সেই প্রবল যন্ত্রণা পাক খেতে থাকে। মোতীবাইয়ের মাথাটা ধ'রে আমি গুছিয়ে বসলুম ওর পাশে। আজ ওকে অসহায় শিশুর মতো মনে হচ্ছে। যে-মেয়েটার দাপটে আমি একেবারে কুঁকড়ে গিয়েছি, এ সেই তেজোস্বতী নারী নয়,—এ যেন আত্মসমর্পিতা! যাকে বলে, কাদার ড্যালা! মাথার দিকের আলোটা জ্বালতে গেলুম, মোতীবাই বাধা দিল। আমি বললুম, এ খুব অন্যায়, মুন্না। তোমার জ্বর এসেছে, অন্তত মাতাজিকে বলা উচিত ছিল।

ধীরে কণ্ঠে মোতীবাই বলল, মাতাজি হলেন তোমাদের, কিন্তু উনি আমার মা নন্, কম্‌রেড।

মানে? কী বলছ?

মোতীবাই চুপ ক'রে গিয়েছিল জ্বরের ক্লান্তির মধ্যে। তবু একসময় আমার উন্মুখ কৌতূহলের জবাবটা সে দিল, উনি আমার সৎমা। বাবার প্রথম পক্ষ। আমি দ্বিতীয় পক্ষের একটিই সন্তান। আমার মা মারা গেছেন সেই আমার জন্মের কালে। বাবা গেছেন কুড়ি বছর আগে।

আমার হাতখানা থেমে গেল শান্ত হয়ে। এ যেন আমার সব হিসেবের বাইরে, সকল অঙ্কের উপরে হিজিবিজি কাটা! আমার ভিতরে হয়ত ছিল কিছু চাপা করুণা, সেটি যেন আমার ওই নিশ্চল হাতখানার মধ্যেই সমবেদনার কাঁপন ধরিয়ে দিল। আমার আবেগপ্রবণ বাঙ্গালী-প্রকৃতি ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যে দপ ক'রে উঠে ভাবল, আমার এই হীরা-মুক্তা-মণিমাণিক্যসমেত লক্ষাধিক টাকা চারিদিকে ছুঁড়ে ছড়িয়ে দিয়ে এই হতভাগিনী কম্‌রেডকে সঙ্গে নিয়ে চ'লে যাই কোনও দূর বন-বনান্তরে, কোনও অজানা লোকালয়ে, কোনও এক জীবনের নতুন ঘাটে—যেখানে

এ মেয়ে পাবে কিছু স্নেহের, কিছু মমতার, কিছু বা হৃদয়ের সুরের আস্বাদ। আমার এই ক্ষণিক শ্মশান-বৈরাগ্যের মধ্যে আমার সমস্ত কাজ-কারবার, হিসাবপত্র ও বিবাহিত জীবন—সমস্তই যেন মিথ্যা হয়ে গেল।

বোধহয় ওই অন্ধকারে আমার হাতখানার মধ্যেই মোতীবাই খুঁজে পেয়ে থাকবে আমার দয়াহীন হৃদয়ের ক্ষণিকের স্নেহস্পর্শ, সেই কারণে সে লেপের ভিতর থেকে তার গরম একখানা হাত বার ক'রে আমার হাতখানা লেপের ভিতরে টেনে নিল। সে বোধহয় জানে, এ হাত তার কম্‌রেডের—স্নেহস্পর্শের দ্বারা যে-হাত কখনও বশীভূত হয় না! সে হয়ত বিশ্বাস করে, তা'র কম্‌রেডের হাত যদি বা বঞ্চিত করে, কিন্তু প্রতারিত করে না! এই হাত তার দেহের পুলকে নেই, রোমাঞ্চে নেই, হর্ষে-কম্পে নেই, প্রবৃত্তির শৈথিল্যে নেই,—এই হাতের স্পর্শ আছে বেদনায়, যন্ত্রণায়, স্নেহ-মমতায়, মানবাত্মার নিগূঢ় করুণায়। সেই কারণেই সম্ভবত মোতীবাই নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে ও নির্ভাবনায় আমার হাতখানা নিয়ে আপন দেহের ব্যথা ও যন্ত্রণার পথ দেখিয়ে দিল! বোধহয় নিঃশব্দে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, নচেৎ তা'র সারাদেহ এমন ক্ষণে ক্ষণে তরঙ্গায়িত হচ্ছে কেন?

লেপের ভিতরে তার জ্বরের উত্তাপে যেন জ্বলছিল আমার হাত। এক সময় মৃদুকণ্ঠে মোতীবাই বলল, বিকেলে তোমাকে অনেক গালমন্দ করেছি, তুমি রাগ করোনি, কম্‌রেড?

রাগ করলে ত' তোমার তাড়নায় আজই রাত্রে চ'লে যেতুম, মুন্না।

জ্বর বেশি বাড়লে উত্তেজনা অপেক্ষা ভাবাবেগ দেখা দেয় বেশি। ওটা বোধ হয় ফ্লু-জ্বরেরই একটা লক্ষণ। চোখে জল নামে জ্বরেরই প্রভাবে। আমার কথায় মোতীবাই চুপ ক'রে রইল

কতক্ষণ। তারপর আমার হাতখানা চেপে ধ'রে সে নিজেই হঠাৎ কেঁদে ফেলল, বলল, কম্‌রেড, বিশ্বাস করো, এমন অভদ্র ভাষায় কারোকে কখনও গালমন্দও করিনি, এমন ক'রে কখনও কারোকে আপনও মনে করিনি!

ডান হাতখানা বাড়িয়ে সে আমার মাথায়, মুখে, কপালে, চিবুকে বুলিয়ে বলল, দুঃখের মধ্যে এসেছিলে তুমি। জানি, কেউ নয় তুমি আমার। তাই তোমাকে এত কাছে টেনে এনেছি, কম্‌রেড। মনে করেছিলুম, রোহিণীর মতন থাকব চন্দ্রের পায়ের কাছে-কাছে!

শান্ত কণ্ঠে বললুম, আচ্ছা বলো ত' মুন্না, কেন তুমি যাও লক্ষ্ণৌতে, কেনই বা যাও অমরাবতীতে? কে আছে সেখানে?

কে থাকবে?—মোতীবাই বলল, কে আছে আমাব, কম্‌রেড?

তা হ'লে সেখানে যাও কেন তুমি কথায়-কথায়?

মানুষের জন্ম যাইনে! যাই প্রাণের গরজে।—মোতীবাই বলল, নিজকে ছড়িয়ে রেখেছি ওই দু'জায়গায়! ইচ্ছে করে আরও ছড়াই।—আমার আগুন ছড়িয়ে যাক্ কাশী থেকে কাঞ্চী, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী। তাই বড় সাধ হয়েছিল, তোমার মতন নিরাসক্ত পুরুষের দোসর যেন হই।

ঈষৎ অনুপ্রাণিত কণ্ঠে আমি ব'লে ফেললুম, মুন্না, যতই বলো, নির্জন বনের নিচে গিয়েও থাকবে তোমার-আমার এই দুই দেহ, থাকবে মন, থাকবে আকর্ষণ,—সেই দুই সান্নিধ্যের ঘর্ষণে বাসনার আগুন কোনদিন জ্বলবে না বলতে চাও?

অত জ্বরে কাঁপতে কাঁপতেও মোতীবাই অন্ধকারে আলুথালু হয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করল। আমার হাতখানা শান্তভাবে সরিয়ে দিল। পরে বিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষায় বলল, জীবনটা ত' জীবনজোড়া সমীক্ষার ক্ষেত্র, কম্‌রেড! আশীলক্ষ ইভল্যুশনের ভিতর দিয়ে

চ'লে এসেছি শুধু একটিমাত্র তপস্যায় সিদ্ধিলাভের জন্য! কেন বিশ্বাস করবে না কম্‌রেড, এই নোংরা স্থূল কামরসজর্জর মাংসপিণ্ডের বাইরে দেহাতীত কিছু একটা লক্ষ্যের দিকে এগোবার জন্য আশী লক্ষবার ঘুরপাক খেয়েছি?

মোতীবাই ঠকঠক ক'রে কাঁপছিল। আমি ঝুঁকে প'ড়ে ওকে ধ'রে সযত্নে আবার শুইয়ে দিলুম। এবার সে ওপাশ ফিরল। কিন্তু আমার বাঁ হাতখানা সে নিজের বাহুর নিচে চেপে ধ'রে রইল।

বাঁ হাতেই অনুভব করতে পারছিলুম ভাবাবেগের বিহ্বলতায় তার বুকের মধ্যে ধড়ফড় করছিল,—বনের পাখি খাঁচার মধ্যে ধরা প'ড়ে যেমন ছটফট করে। ওকে আমি শান্ত রাখার চেষ্টা ক'রে বললুম, আর নয় মুন্না, এবার শান্ত হয়ে চোখ বুজে থাকো। একে জ্বর, তায় রাত জাগা। আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। এবার আমাকে ছাড়ো, নৈলে তোমার ঘুম আসবে না।

মোতীবাই আমার হাতখানা চেপেই ধ'রে রইল তার বুকের মধ্যে।

কতক্ষণ, কতকাল, কত যুগ,—আমার মনে নেই। নিশ্চল হয়ে রইল মোতীবাই। শুধু তার ছন্দিত গুরু নিঃশ্বাসের তাল আমার হাতের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছিল। এক সময় চেয়ে দেখলুম, জানালার বাইরে প্রভাতের আভা ফুটছে ধীরে ধীরে। এদেরই বাগানের বড় বড় গাছে পাখির মজলিশ ব'সে গেছে প্রভাতী ভৈরবীর আলাপে। ওদের ওই সম্মিলিত তারস্বরে আমি যেন শুনতে পাচ্ছিলুম, মোতীবাইয়ের ছিন্নভিন্ন হৃৎপিণ্ডের আর্তকণ্ঠের ডাক। আমি নিজকে ধীরে ধীরে দুর্বল ও অসংযত বোধ করছিলুম। গুপ্ত গূঢ় সরীসৃপ যেমন অন্ধ সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে অগোচরে উঠে আসে, তেমনি আমার ভিতর থেকে উঠে আসছিল একটা

আত্মনাশা বিহ্বলতা আগ্নেয়গিরির নিঃস্রাবিত গলিত অগ্নিপ্রবাহের মতো।

কিন্তু বাঁচিয়ে দিল মোতীবাই নিজে। তার নিরাবরণ বাহুলতার তল থেকে কোনও মতে আমার হাতখানা যখন ছাড়িয়ে নিলুম, তখন দেখি একসময় কখন্ যেন সে পরম নিশ্চিন্তে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমি নিঃশব্দে পালঙ্ক থেকে নেমে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলুম।

আজ আমার বিদায় নেবার দিন। আমি বাড়ি যাব। ত্র্যহস্পর্শ কেটে গেছে। আর কোনও বাধা নেই।

ব্যাগ-বিছানার সব খুঁটিনাটি গুছিয়ে রেখেছিল মোতীবাই নিজের হাতে। কিছুই হারাবার নেই, কিছু ভুলেও যাবো না। সকালের দিকের গাড়িতে যেতে পারলে ভালই হ'ত, কাল ভোরে পৌঁছতুম কলকাতায়। কিন্তু মোতীবাইয়ের ঘরে দু'একবার আনাগোনা ক'রে দেখলুম জ্বরে সে অঘোর অচৈতন্য। আমার লজ্জাশরম চিরদিনই কম, কিন্তু চক্ষুলজ্জা এখনও যায়নি। আমার সমগ্র অসুস্থতার কালে মোতীবাই আমাকে তার দুই ডানা দিয়ে ঢেকে রেখেছিল, আমি সেজন্য সকালের দিকে চলে যাওয়াটা পছন্দ করলুমনা। কিন্তু আজ সন্ধ্যার গাড়িতে আমাকে যেতেই হবে।

সকাল আটটা নাগাদ আমিই নিচে গিয়ে দাদাজিকে খবর দিলুম—দেখুন ত', আমার মনে হচ্ছে মুন্না দেবী বোধহয় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। হরেরাম বলছিল উনি চাও খান্নি—

নরেন্দর হন্তদন্ত হয়ে উপরে এসে মোতীবাইকে দেখলেন এবং ছুটোছুটি ক'রে ডাক্তার বদ্যি ঔষধপত্র—সব এসে গেল। অন্যান্য ভাই-বোনেরা, বৌদিদিরা, মাতাজী, টেলিফোনযোগে যমুনা দেবী,—সবাই এসে পড়লেন। একটু বেলায় ডাঃ আগরওয়াল এসে রোগিণীর

টেম্পারেচার দেখলেন, জ্বর ১০৪° ডিগ্রির ওপর সাত পয়েণ্ট। প্রাণশক্তি যত প্রবল, জ্বরের আক্রমণ তত বেশি। মোতীবাইয়ের শয়নকক্ষ দু'ঘণ্টার মধ্যে হাসপাতালের ক্যাবিনে পরিণত হ'ল। নরেন্দর ওকে মানুষ ক'রে তুলেছেন পিতৃস্নেহে। তিনি রোগিণীর শিয়রে ব'সে মাথায় হাত বুলোচ্ছেন। মোতীবাই একপ্রকার বেহুঁশ হয়ে প'ড়ে রয়েছে।

ওর সেবায় লাগল সবাই—আমি এতে আনন্দ পেলুম। মোতীবাই শীঘ্র নিরাময় হোক, সুখী হোক, ওর জীবন কল্যাণশ্রীতে পূর্ণ হোক। আমি বাইরের লোক, দূরের মানুষ, উড্ডীন পাখি, —ওর নীড়ে আশ্রয় নিয়েছিলুম দুর্যোগের রাত্রে। আমি অজ্ঞাত, অপরিচিত। আমি কেউ না।

সকালের দিকের ট্রেনে আমার যাওয়া হ'ল না, সেজন্য আমি সত্যই দুঃখিত। আমার কর্মজীবনে এত দীর্ঘকাল অহেতুক অন্য কোথাও কাটেনি। যাই হোক, অপরাহ্নের দিকে আমি যখন সকলের কাছ থেকে এবারের মতো বিদায় নেবার জন্য মোতী-বাইয়ের ঘরে গিয়ে দাঁড়ালুম, দেখলুম ওর জ্বর বুঝি নেমেছে একটু। দাই ওর মাথা ধুইয়ে দিচ্ছে!

বিদায় নিলুম সকলের কাছে। আমার গাড়ি সন্ধ্যার একটু পরে ডাউন্ দিল্লী মেইল্, কিন্তু আমি ঘণ্টা দুই আগেই বেরিয়ে পড়তে চাই। দাদাজি আমাকে সাদর নমস্কার জানিযে হরেরামকে বলে দিলেন, ওরে, বড় গাড়িখানা বা'র ক'রে 'মেহমান সাহেবকে স্টেশনে পৌঁছিয়ে দে।

আমি সকলের সামনে হাত জোড় ক'রে জানালুম, মুন্নাজির এই অসুস্থ অবস্থায় অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সঙ্গেই আমি বিদায় নিতে বাধ্য হচ্ছি। আপনারা নিজগুণে আমার ত্রুটি মার্জনা করবেন।

মুন্নার দিক থেকে কোনও সাড়া পাওয়া সম্ভব ছিল না। আমি

ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম এবং ডাঃ আগরওয়াল ও যমুনা দেবী আমার ব্যাগ-বিছানা সমেত সোজা নিচের তলায় গিয়ে আমাকে মোটরে তুলে দিলেন। আমি নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেবার আগে শ্রীমতী যমুনার হাতে মোতীবাইয়ের চাবির গোছাটা দিয়ে দিলুম।

বেলা পাঁচটা বাজে। ফটক দিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে চোখ পড়ল রাস্তার বিপরীত ফুটপাথে দয়ানন্দর ওপর। লোকটা আজও তেমনি ব'সে রয়েছে অচল অটল বকধার্মিকের মতো। বোধহয় যেন আমার সঙ্গে একবাব চোখাচোখিই হয়ে গেল।

আমার গাড়ি চলল হু হু ক'বে। প্রায় দুমাস পরে মুক্তি পেলুম, অনেকটা এই প্রকার একটা মনোভাব আমাকে পেয়ে বসেছিল। কাল রাত্রিকালের আমি, আজ দিবাভাগের আমি—এ দুই মিলিয়ে আমার একই সত্য। আমার বিশ্বাস মোতীবাইয়ের সঙ্গে আমি মিথ্যাচার করিনি। আমার কর্মজীবনের সঙ্গে আমার মর্মজীবনের হুবহু মিল ঘটবে, একথা একমাত্র সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের পক্ষেই বলা সম্ভব।

আমি মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলুম, একথা মিথ্যা নয়। এতদিন যেন একটা আচ্ছন্ন অবস্থাব মধ্যে ছিলুম, যেন মাদক সেধনেব তন্দ্রাতুরতা আমাকে মুহ্যমান রেখেছিল। মোতীবাইয়ের বাইরে জগৎ আছে, সমাজ সংসার আছে, জীবযাত্রার বহুধা কর্মধারা আছে,—এ ভুলেছিলুম। সে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সকল জ্ঞানাপথের বাইরে, একটা মায়াচ্ছন্ন লোকে—যেখানে অভ্যস্ত চিন্তা-ধারা পৌঁছয় না, যার ত্রিসীমানার মধ্যে বস্তুতান্ত্রিক বিচার-বিবেচনা প্রবেশাধিকার পায় না। আজ স্টেশনে এসে সবিস্ময়ে ভাবছি, ট্রেন-দুর্ঘটনার পর বিগত দু'মাসের মধ্যে আমি কেন বাড়ি ফিরতে পারিনি! কোন্ মায়ারহস্যডোরে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছিলুম?

মোতীবাইকে শ্রদ্ধা করি বলেই নিজকে আমি ধিক্কার দিতে পারলুম না। কিন্তু আমার অব্যবস্থিত চিত্তের কোনও যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ৎ খুঁজে না পেয়ে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলুম।

এমন সময় দিল্লী মেইল্ এসে পড়ল।

অনেককাল পরে এবার ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনতে হয়েছে, অন্য উপায় ছিল না। সঙ্গে অনেক টাকা, ভয়ও ছিল মনে। আমার কাম্‌রা পেয়ে গেলুম ঠিক সামনে—ছুটোছুটি করতে হ'ল না। ব্যাগটি আমার হাতেই ছিল,—ওটি সঙ্গের সাথী। ওর মধ্যে কাঁচা টাকার পরিমাণ কত--এ শুধু জানে আমার অন্তরের আমি, অর্থাৎ অন্তর্যামী।

আমি উঠে পড়লুম গাড়িতে। কুলি আমার বিছানাটার বাণ্ডিল এনে একটি শোয়ার বার্থে কম্বল বিছিয়ে দিয়ে গেল। বার্থের শিয়রেই জানলা পেয়ে মুখ বাড়ালুম। চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগলুম পুরনো স্টেশন ভেঙ্গে কেমন নতুন মডেলের স্টেশন তৈরি হয়েছে! এমন সময় আমার অসীম স্বস্তিলাভের মতো গার্ডের বাঁশি বাজল।

ঠিক ওই মুহূর্তটিতে চমকিয়ে শুনলুম হরেরামের উচ্চ কণ্ঠস্বর: ইয়া, মেহমানসাব ইধর বৈঠা, দিদিসাব—

আচম্বিতে ফিরে দেখি হরেরামের কাঁধে ভর দিয়ে হনহনিয়ে আসছে রুগ্না মোতীবাই, হাতে তার একটা পুটলি। চেঁচিয়ে বলল, কম্‌রেড, কই, বললে না ত' কবে আবার আসবে?

ও যেন কেঁদে উঠলো শেষবারের মতো।

আমিও আবেগে অভিভূত হয়ে চেঁচিয়ে বললুম, মুন্না, আবার আমি আসব। আমি ঠিক আসব।

কবে আসবে?—

ঘনায়মান সেই জনতার মধ্যে কম্পিতা, রোগাক্রান্তা ও আবেগবিহ্বলা নারীর সেই আর্তস্বর যেন গলার শিরছেঁড়া

ডাকপাখির মতো কঁকিয়ে আবার কেঁদে উঠল। আমার মধ্যে প্রবল চাঞ্চল্য দেখা দিল।

জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে মোতীবাই যখন তার হাতের পুঁটলিটি গলিয়ে আমার কোলের কাছে দিল, গাড়ি ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে! আমি ওর হাত ধরলুম। বললুম, মুন্না, তুমি ভাল হয়ে ওঠো, আমি মাসখানেক বাদেই আসব এদিকে—

গাড়ির ধীর গতির সঙ্গে মোতীবাইও এগোচ্ছিল। ওর দুই চোখের জলের সঙ্গে আমার,—কিন্তু না, আমি পুরুষ মানুষ, আমার পক্ষে ভেঙ্গে পড়া চলবে না!

মোতীবাই ব'লে দিল, অমরাবতী শহর ছাড়িয়ে পুবদিকে পাবে রামঝরোকা,—তারই পাশে টিলার ওপর,—মনে থাকবে ত?

থাকবে মুন্না, নিশ্চয় থাকবে। তুমি আর এগিয়ো না—

মুন্নার হাতখানা ছেড়ে দিলুম। সে পিছিয়ে গিয়ে গলা তুলে বলল, পুঁটলির মধ্যে তোমার খাবার দিয়ে দিলুম, কম্‌রেড—

হরেরামের কাঁধে হাত রেখে সে হাঁপাচ্ছিল। আমার অবাধ্য চোখ দুটোকে সেই দৃশ্য থেকে ফিরিয়ে নিলুম।

গাড়ির গতি দ্রুততর হচ্ছিল। এক সময় প্ল্যাটফরম ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সামনের বার্থে একজন তামিলবাসী ভদ্রলোক আমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এবার তিনি ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন, মনে হচ্ছে উনি অসুস্থ শরীরে এসেছিলেন?

বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ—

তিনি বললেন, কিন্তু ভারতীয় স্ত্রীরা স্বামীর প্রতি তাঁদের কর্তব্য কখনও ভোলেন না, খাবারের প্যাকেটটি ঠিকই দিয়ে গেলেন। ওঁর বোধহয় ইচ্ছে ছিল আপনার সঙ্গেই আসা!

বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ—

॥ ৮ ॥

অতঃপর জীবনস্রোতে ভেসে গিয়েছিলুম একখান থেকে অন্যখানে। সেই মনকে ধ'রে রাখতে পারিনি, সে মিলিয়ে গেছে আমার নানান্ ঘটনার উত্থান-পতনে।

উড়িষ্যায় গিয়েছি তিতলাগড় পেরিয়ে, খারসোয়ান ছাড়িয়ে গেছি মল্লবর্মণ রাজকে ধরবার জন্য, ভাগলপুর ছেড়ে গেছি মন্দারে, মোজাফরপুরে গেছি দেওয়ান-কোঠিতে, বর্ষার প্রাক্কালে ছুটে গেছি দার্জিলিঙে কুমার জগদীশ সিংদেওর পরিবারের পিছনে-পিছনে। ছুটি ছিল না আমার চার পাঁচ মাসে। জাল ফেলেছি, ফাঁদ পেতেছি এখানে ওখানে, ওৎ পেতেছি কোথাও কোথাও। সফল হয়েছি অনেকবার, বিফল হয়ে ফিরেছি কখনও কখনও।

আওয়াগড় থেকে রাজকীয় চিঠি এল শ্রাবণ মাসের শেষ প্রান্তে। সে-চিঠি উৎসাহজনক, তবে মালের অর্ডার বেশি পরিমাণ নয়। আজকাল সামন্ত রাজগোষ্ঠির দিনকাল মন্দা ; প্রিভি পার্সের টাকায় আগেকার সেই ঠাট বজায় রাখা যায় না। কথায়-কথায় জেলাশাসক বা ডেপুটি কমিশনারদের সঙ্গে বচসা বাধে। রাজনীতিকদের ভয়াবহ অপপ্রচার—ইত্যাদি বহুতর সমস্যা। ইংরেজ গেছে যাক্—কিন্তু সঙ্গে নিয়ে গেছে স্বর্ণযুগ। চিঠিতে আরও নানা খেদোক্তি। মোট কথাটা দাঁড়ায় এই, হাজার দশেক টাকার মাল তাঁরা নিতে পারেন।

মাত্র দশ হাজার টাকা! চিঠিখানা ফেলে রেখে আমি চ'লে গেলুম কোচবিহারে। সেখান থেকে মোটা টাকা নিয়ে ফিরলুম ভাদ্রের মাঝামাঝি।

আওয়াগড় অনেক দূর। যাতায়াতের রাহাখরচ আর

পারিশ্রমিক না পোষালে ব্যবসায়ীর পক্ষে চলবে কেন? সুতরাং হাজার পঁচিশেক টাকার মাল সঙ্গে থাকলে অন্তত রেবা নগরটাও হয়ে আসতে পারব। ওদিকে আমাদের বাঁধা খদ্দের আছে কয়েকজন।

কোথায় মির্জাপুর আর কোথায় বা জবলপুর, কোথায় সেই সরগুজা আর কোথায় রায়গড়—আমি এমন অঞ্চলে ভ্রমণ করছিলুম যেদিকে রেলপথ নেই। আওয়াগড়ে তিনদিন কাটিয়ে চ'লে গিয়েছিলুম ছোটনাগপুরের শেষ প্রান্তে। ওখান থেকে সুদূর দক্ষিণ পশ্চিমে রায়পুর ছাড়িয়ে গেলে নাগপুর।

সপ্তাহখানেক পরে নাগপুরে এসে ভাবলুম, এই পথ ধ'রে পশ্চিমে আরও কিছুদূর এগিয়ে গেলে অমরাবতী, অর্থাৎ সেই শ্রীমতী মোতীবাই! আমার হাসি পেয়ে গেল। এখন কি আর চিনবে আমাকে দেখলে? এখনও কি তার সেই পুরনো হিষ্টিরিয়া সারেনি?

হিসেব ক'রে দেখলুম, মার্চ মাসে তা'কে ছেড়েছি, এটা আগস্টের শেষ,—প্রায় ছ'মাস হ'তে চললো। এর মধ্যে দেখে বেড়িয়েছি কত রাজগোষ্ঠির অন্তঃপুর, প্রাচীন জমিদারদের পরিবার, একালের বহু ধনপতি—যারা ব্যাঙ্কে টাকা রাখতে ভয় পেয়ে জড়োয়া বা সোনা কিনে রাখে! কোন কোনও চিত্রাভিনেত্রী,—ঘরে মোটা টাকা লুকিয়ে রেখে স্লীপিং ট্যাবলেট্ গিলেও যাদের ঘুম আসতে চায় না! এরা কেউ আমার চোখে সামান্য নয়। দিনাজপুরের চৌধুরী পরিবারের সেই সোনা-বৌ, নূরনগরের ফুলকুমারী, রাজকন্যা লতামঞ্জরী,—এদের সঙ্গে দর কষাকষি করতে গিয়ে নাটকীয় বিপাকে পড়েছি কতবার। ওদের মধ্যে হারিয়ে গেছে মোতী-বাইয়ের মুখখানা,—এলাহাবাদ স্টেশনের প্ল্যাটফরমে চোখের জলে যে-মুখখানা বিদায় নিয়েছিল। কিন্তু ওই মুখখানার সঙ্গে মিলিয়ে

ছিল জীবনের প্রথম ট্রেন-দুর্ঘটনা, হাসপাতালের ক্যাম্প, প্রয়াগের চালাবাড়ি, দয়ানন্দর চ্যালাকাঠ, দাদাজির স্নেহপ্রীতি, এবং একটি রাত্রির শিথিল বিহ্বলতার ইতিহাস।

অমরাবতীতে এসে পৌঁছলুম এক মধ্যাহ্নকালে। আকাশে তখন মেঘ করেছে। একখানা টাঙ্গা নিয়ে আমি চললুম রাম-ঝরোকার দিকে। পথ কম নয়, প্রায় মাইল ছয়েক। কুড়ি বাইশ হাজার টাকার মাল বেচে এসেছি আওড়াগড় আর রেবায়। ব্যাঙ্কের মারফৎ ড্রাফ্‌ট্‌ পাঠিয়ে দিয়েছি কলকাতায়। তবু কিছু টাকা আর সামান্য কিছু মাল সঙ্গে থেকে গেছে। আজ কীভাবে মোতীবাই আমাকে অভ্যর্থনা করে, সেই কথা ভেবে মনে মনে পুলক বোধ করছিলুম।

ভুল ঠিকানা দেয়নি মোতীবাই। রামঝরোকা মানে একটি ছোট সরোবর, তার পাশেই মস্ত টিলাটিবির গা বেয়ে উঠেছে বড় বড় গাছ, উপরে উঠে গিয়ে সেই বৃক্ষদল একটি বাগানে পরিণত হয়েছে। বাগানের মাঝখানে ছোট একটি বাংলো। নিচের থেকে সেটির সামান্য অংশমাত্র দেখা যায়। আমি টাঙ্গাওলাকে পাঠালুম উপরে গিয়ে খোঁজ নিতে। ব্যাগ-বিছানা পাহারা দিয়ে আমি পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

টাঙ্গাওলা ফিরে এল অপর এক লোককে সঙ্গে নিয়ে। স্পষ্টত, সে ওই বাংলোরই খানসামা। প্রশ্ন ক'রে জানলুম, লোকটা মারাঠি। এখানে সপরিবারে থাকে, মালিকের সম্পত্তির পাহারা দেয়।

মালিক কোথায়? এখানে নেই?

আজ্ঞে না।—লোকটা সবিনয় হাত জোড় ক'রে জানালো, মালিক বাই এখান থেকে মাস দেড়েক আগে চ'লে গেছেন 'ইল্লাহ্‌বাদের' দিকে। কবে আবার আসবেন ব'লে যাননি।

একদা মোতীবাইকে কথা দিয়েছিলুম এক মাসের মধ্যে আবার আসব। সে আমার জন্ত চার মাস এই জনহীন বাংলোতে অপেক্ষা করেছিল।

টাঙ্গা নিয়ে আবার আমি ফিরে চললুম অমরাবতী স্টেশনের দিকে। বেলা অপরাহ্ণ। সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরবো। বলা বাহুল্য, মোতীবাইয়ের পিছনে ধাওয়া করতে গিয়ে আমার অনেকগুলো টাকা জলে গেল। নারীঘটিত ব্যাপারমাত্রই ব্যয়বহুল। সে যাই হোক, যেপথে এসেছি, সেই পথ দিয়ে ফেরা চলবে না। দুঃখের সঙ্গেই বলছি, এলাহাবাদ দিয়ে ফিরলেই আমার সুবিধা, কেননা পাটনা লাইনে ডুমরাঁও হয়ে যাব। খরচ এতে কম পড়বে না, তবে সব খরচ পুষিয়ে নেবো ডুমরাঁও গিয়ে। চুলোয় যাক্ মোতীবাই। চেয়ে দেখো, অমন হাজার হাজার মোতীবাই চারদিকে ছড়ানো! আজকের বালিকা, আগামীকাল যুবতী, পরশু প্রৌঢ়া, তা'র পরদিন থুরথুর করছে এক বুড়ি। মোতীবাইয়ের মতন ফুল সর্বত্র সর্বক্ষণ ফুটছে। আমি কাঁহাতক্ একটি ফুলের শোভা নিয়ে আতিশয্য করব? আমাকে ওর ভাল লেগেছিল, কম্‌রেড ব'লে আমার গায়ে দুধ তুলেছিল,—এইত? বেশ, ভাল কথা! আমিও দুটো মিষ্টি ক'রে কথা বলেছিলুম। ল্যাঠা চুকে গেছে। কিন্তু ছ'মাস ধ'রে সেই স্মৃতিটুকু নিয়ে ব'সে ব'সে কাঁদব—একজন জুয়েলারের পক্ষে এমন ছেলেমানুষী হাস্যকর।

বিশেষ বিরক্তির সঙ্গে আমি ট্রেনের কামরায় উঠে বসলুম।

কিন্তু ওই একটা মানসিক শৈথিল্য আমার থেকে যাচ্ছিল। এ যেন অনেকটা নিজের কাছেই নিজের চক্ষুলজ্জা। এলাহাবাদের পাড়ায় এসেঁ মোতীবাইকে একবারটি চোখের দেখা না দেখেই ফিরে যাব? তা ছাড়া আসল কথাটাই যে রয়ে গেছে। আমি

ব্যবসাবাণিজ্য করি। অত বড় একটা ধনী ফ্যামিলি, ওদের সঙ্গে বহু ধনীদের যোগাযোগ,—সুতরাং আমার প্রধান স্বার্থ সেইখানে। তা ছাড়া চেয়ে দেখেছি, মোতীবাইয়ের অনুরোধ ফেলতে পারে না কেউ। আর কিছু না হোক, মোতীবাই অন্তত এখানে আমার লোক্যাল্ এজেন্ট্ হয়েও থাকতে পারে? ধনী সমাজে এ-ধরনের অনেক মেয়ে-পুরুষ আছে। জীবনবীমার আপিসে গেলে ওদের অনেককেই দেখা যায়।

এক্‌স্‌প্রেস আর প্যাসেঞ্জার মিলিয়ে এলাহাবাদে পৌঁছতে আমার অনেক সময় লাগল। ভোরবেলায় গাড়ি এসে দাঁড়ালো স্টেশনে। আমি পাবলিক টেলিফোনে গিয়ে গাইড্ দেখে-দেখে অনেক কষ্টে খুঁজে বা'র করলুম, ডাঃ কে আগরওয়ালের নম্বর। তখন সকাল সাতটাও বাজেনি। অন্তত সাড়ে সাতটার আগে নাম-করা ডাক্তাররা বেরোয়না। দেখাই যাক্ না।

ফোন ধরতেই ডাঃ আগরওয়ালকে পাওয়া গেল। আমি হাসি-হাসি মুখে নমস্কার জানিয়ে বললুম, আমি আপনার সেই পুরনো রোগী ফটিক নাগ, জুয়েলার—আপনার শ্বশুরবাড়িতে গেস্ট্ ছিলুম।

ডাক্তার সাহেব তৎক্ষণাৎ চিনতে পেরে প্রতিনমস্কার জানালেন। আমি একে একে সকলের কুশলবার্তা জানতে গিয়ে তাঁর কথায় চমকিয়ে উঠলুম। ডাক্তার বললেন, আপনি যাবার অল্পদিনের মধ্যেই দাদাজি মারা গেছেন পর-পর দু'বার 'স্ট্রোকে'। মাতাজি পুত্রশোকে মারা যান্ তা'র দুই সপ্তাহের মধ্যে। ও বাড়ি আজও শোকে মুহ্যমান। দেবেন্দরের সামনে এখন মস্ত বৈষয়িক সমস্যা।

মুন্নাজি কেমন আছেন?

ওর কথা ঠিক আমি জানিনে, তবে বাড়িতে নেই। মাস খানেক আগে কে যেন বলছিল, মুন্না গেছে লক্ষ্ণৌর ওদিকে।—বলতে বলতে ডাক্তার যেন একটু থতিয়ে গেলেন।

আরেকবার নমস্কার জানিয়ে আমি ফোন ছেড়ে দিলুম।

যাত্রীশালায় ঢুকে চুপ ক'রে ব'সে রইলুম প্রায় আধঘণ্টা। ঠিক বুঝতে পারছিলুম না—এগিয়ে যাব, না পিছিয়ে ফিরব। ডুমরাঁও গেলে বাণিজ্যটা হবে নিশ্চিত, কিন্তু নিরুদ্দেশ মোতীবাইয়ের সন্ধানে যাওয়া মানে, বনহংসীর পিছনে পিছনে ছোটা! অর্থাৎ কোথায় গিয়ে তাকে ধরব, ঠিক-ঠিকানা নেই।

লক্ষ্ণৌয়ের দিকে যেতে গেলে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। হাতের কাছে না জৌনপুর, না রায়বেরিলী, না প্রতাপগড়। সুতরাং সোজা কানপুর গিয়ে ওখান থেকে ছোটলাইন। তাও নানা ভজকটো। আরেক কথা, আমার না আছে প্রাণের টান, না বা লাবণ্যের আকর্ষণ। অল্পক্ষণের জন্য শুধু চোখের দেখা, মুখের সৌজন্য, দাঁতের হাসি। বেশিক্ষণ থাকলে জ্বালা বাড়তে পারে,—কেননা তখন মন নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া! আমার ঘরের পাগ্‌লি তরুলতার এসব বালাই নেই। মনের কারবার করতে গেলে তা'র সময় নষ্ট হয়। সে সিঁদুরমাখা সতী নারী! মানে, অতশত সে বোঝে না! তুমি পুরুষ, আমি মেয়ে। তুমি স্বামী, আমি স্ত্রী—ব্যস, ওতেই হবে,—এসো!

কিন্তু এখানে অনেক ধানাই-পানাই! সোজা কথাটা সহজ ক'রে কখনও বলছে না উভয়পক্ষ! আসলে যে ওটা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সুকৌশল ফাঁদ পাতা,—স্বীকার করতে চায় না কোনও পক্ষ! মোতীবাই বললেই পারত, কম্‌রেড, আমার যৌবনের এইটিই জটিলতা! কিছু মনে করো না তুমি। তোমাকে বন্ধু বললুম, সাথী বললুম, কম্‌রেড বলেও ডাকলুম, মাঝরাত্রে জ্বরের ঘোরে বিছানায় তুলে হাতখানাও তোমার চেপে ধরলুম, কিন্তু তোমাকে প্রণয়ী বলতে গিয়ে ধর্ম ও দর্শনতত্ত্ব আউড়িয়ে কেঁদে ফেললুম! সে যাই হোক, এতদিন পরে আমার যেন বিশ্বাস হচ্ছে, মোতীবাই বিয়ে-থা

করেনি। করলে সেদিন দর্শনতত্ত্বে ডুবে যেতো না। কুমারী মেয়ের বাঁধন একটু কড়া। শিথিল হতে সময় নেয়।

স্নানাহার শেষ করলুম স্টেশনে।

শেষ পর্যন্ত কানপুরের গাড়িতেই উঠলুম সকাল সাড়ে নয়টায়। যদি মোতীবাইকে পাই ভাল, বেগতিক দেখলে শেষ পর্যন্ত মনিরাম প্যাটেলের বাড়ি—লক্ষ্ণৌয়ের মকবুলগঞ্জের কাছাকাছি। অবশ্য আমার পক্ষে এ-যাত্রাটা এখন প্রশস্ত সময় নয়।

জানিনে কেন, শেষ পর্যন্ত আমার নিয়তি হিঁচড়িয়ে টেনে আনল আমাকে একটি ছোট্ট হিন্দিনামওলা স্টেশনে। এটি কানপুর আর লক্ষ্ণৌয়ের মাঝখানে ছোট লাইনে পড়ে। বেলা অপরাহ্ণ। পড়ন্ত রৌদ্রে আর মেঘের চলাফেরায় নতুন শরৎকালের আকাশ যেন এলোমেলো হয়ে রয়েছে। আমাকে নামিয়ে গাড়িখানা যখন চলে গেল, দেখি চারদিকে হু হু করছে সবুজ শস্যক্ষেত্র। স্টেশন জনবিরল। স্টেশন ছাড়া আর কোথাও লোকালয় দেখছিনে!

পল্লীগ্রামের স্টেশন,—একটি লম্বা এস্‌বেস্টসের চালাবাড়ি মাত্র। কিন্তু ওরই মধ্যে সব ব্যবস্থা রয়েছে। খোঁজখবর নিয়ে শুনলুম, হাজিগাঁও বেশি দূর নয়, মাইল দেড়েক মাত্র। যান-বাহনের মধ্যে একখানা এক্কা পাওয়া যেতে পারে, তবে ঘোড়ায় যাওয়াই সুবিধা। কেননা বর্ষা গিয়েছে সম্প্রতি। কিন্তু মাঝপথে দু'তিনটে বাঁধ কাটা হয়েছে। এক্কা গাড়ি সেখান দিয়ে যাবে না। পায়ে হাঁটাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ।

বিছানার বাণ্ডিলটি আমি মাস্টার সাহেবের জিম্মায় রেখে একটি লোক নিলুম সঙ্গে। ব্যাগটি আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। এ লোকটি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, আবার ব্যাগটাও বইবে। দু'টাকা বকশিস কবুল করেছি। মাস্টার সাহেব শুধু নন্‌, এখানে সবাই চেনে কাউল পরিবারকে। মুন্না কাউল এখানে সুপরিচিত,

এও জেনে নিলুম। নরেন্দর সিং কাউল ছিলেন এখানে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। তবে ওঁদের তালুক এখন খুব ছোট। জমিদারি এখন আর নেই। ওই শুধু মুন্নাবহেনজি মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করেন। ক্যাবিন-ম্যানটি বলল, ঠিক বলতে পারিনে, বোধহয় তিনি এখন নেই। তবে কি জানেন, মাইল পাঁচেক দূরে বড় লাইনের যে স্টেশন রয়েছে, ওঁরা ওইটে দিয়েই আনাগোনা করেন। ওদিকে পাকা সড়ক আছে। মোটর গাড়িও আসে।

একটু বেগতিক দেখে আমি স্টেশনের ধারের দোকান থেকে কয়েকখানা জিলাপি ও ময়লা গরম চা খেয়ে নিলুম। বেলা তখন পাঁচটা বেজে গেছে। অসুবিধা হ'ল হেঁটে যাওয়াটা। নৈলে মোতীবাইকে যদি পাই, তাহলে বিছানার বাণ্ডিলটার জন্য দুর্ভাবনা নেই।

দুজনে হেঁটে চললুম পুব দিকে। জলাশয়গুলির ধারে ধারে বক ব'সে রয়েছে তখনও, বেলে হাঁসও জলে ঘোরাফেরা করছিল। আমি যাচ্ছিলুম লোকটার পিছনে-পিছনে। এক্-এক স্থলে বাঁধ কাটা রয়েছে দেখছি। তবে তার ওপর প্রশস্ত বাঁশের জালি দিয়ে সাঁকো বানানো রয়েছে। ঘোড়া হয়ত পেরোতে পারে, কিন্তু এক্কা অসম্ভব।

মনে হচ্ছিল উল্টো পথে এসেছি। এ যেন খিড়কি দরজা দিয়ে বাড়ির বারমহলে ঢোকা। বড় স্টেশন দিয়ে গেলে নাকি সাইকেল রিক্সাও পাওয়া যেতে পারত, সেটাই রাজপথ। তবে পোয়াটাক রাস্তা বেশি পড়ে। আমরা মস্ত একটা বিলের ধার পেরিয়ে এক মস্ত আখের ক্ষেতের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলুম। হাঁটতে হাঁটতে যখন আধঘণ্টারও বেশি কেটে গেল, তখন বললুম, আর কতদূর হে?

এই যে বাবু, আর 'দো রশি।'

দো-রশি কতটা রাস্তাকে বলে, আমার জানা নেই। তবে লোকটার কথায় কিছু আশ্বাস পেলুম যেন। বাঁদিকের আম-বাগানের নিচে তখন ছায়া ছম ছম করছে। ভিতর দিকে ছোট একটা শিবস্থানের পাশে চৌতারার ঠিক ধারেই দেখা যাচ্ছে নিমগাছের নিচে মস্ত ইঁদারা পাথর বাঁধানো। সেটাকে ছাড়িয়ে চললুম আমরা।

লোকটা বলল, বাবুসাব, 'পুরানা জমানেমে' ওটাকে বলত হাজিগাঁও, কিন্তু 'হিন্দুস্তানকা আজাদী' হবার পর এখন সবাই বলে, দানাবাজার! অব উহ দেখিয়ে। নজর আতি কি নহি? দেখিয়ে পিপল কি পেড়, উসিকা বাঁয়া বাজু—দেখিয়ে—!

সন্ধ্যা সমাগত। নজর ঠিক আসছে না বটে! তবে বটঅশ্বত্থের জটলার ভিতর দিয়ে কোঠাবাড়ির আভাস পাওয়া যাচ্ছিল।

ইয়া, দেখিয়ে রোশনি জ্বলা অব,—মালিক ত হোবেই হ।

অর্থাৎ ওই দেখুন আলো জ্বলে উঠল। মালিক ঠিকই আছেন। আমরা গাছতলার দিকে এসে বাঁ দিকে ঘুরে চললুম কতকটা। এ যেন একটু বেশি হয়রানি। খরচ পোষায় না। কিন্তু উত্তরদিকে ফিরতেই দেখি, সম্মুখভাগে এসে পড়েছি। এটা পাকা সড়কের ধার। পাশেই এক গোয়ালার চালাঘর। ক্যাবিন-ম্যান সাড়া দিয়ে ডাকল, বৈজুভাই?

একটি চাষী গোয়ালার কুটীর। তখনই ভিতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল। লোকটা বলল, আমি এখানে অপেক্ষা করছি, আপনি কাজ সেরে নিন্? আজই 'বাপস' যাবেন কি?

বললুম, তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি বলে পাঠাবো।

লোকটা বলল, আপনি বিন্ধেশ্বর ব'লে 'হাঁকোয়া' দেবেন।

কয়েক পা মাত্র এগিয়েছি পাকা সড়ক ধ'রে উত্তর থেকে পশ্চিমে, এমন সময় নারীকণ্ঠে উচ্চগ্রামের সঙ্গীতস্বর কানে এল।

এই সুমধুর কণ্ঠ আমার অতি পরিচিত; এ যেন আমার রক্তে রসে মিলিয়ে রয়েছে কতকাল থেকে! সেই চালাবাড়িতে ব'সে মোতীবাই একদিন হাসিমুখে বলেছিল, কম্‌রেড, তোমার মন নানা চাতুরীতে ঢাকা, তাই তা'র ধরা ছোঁওয়া পাইনে। কিন্তু আমার গান তোমার আসল চেহারাটাকে টেনে আনে! তখন বুঝি আমার গলাটা মন্দ নয়!

আমরা দুজনেই একথায় হাসাহাসি করেছিলুম।

এও শিবস্তোত্র, ভজনের সুর, কিন্তু বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। পশ্চিমে ঘুরে গিয়ে দেখি একেবারে অন্য চেহারা। মস্ত উঁচু পাঁচিল, চোখবন্ধ লোহার ফটক। আমি কোনও উদ্বেগ প্রকাশ না ক'রে একটি গাছের পাশে দাঁড়ালুম। গান থামলে তবে ভিতরে ঢুকব। পাঁচিলের ভিতর দিকে আন্দাজে পেলুম, ভিতরে বাগানটা বেশ প্রশস্ত। কিন্তু তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, বাংলোর আয়তনটা ঠিক বোঝা গেল না।

পথে জনমানব কারুকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু দূরের দিকে চেয়ে যখন বড় একটা স্টেশনের আলোর আভাস দেখে তা'র দূরত্বের অনুমান করছিলুম, সেই সময় দেখি একখানা মোটর আসছে এইদিকে তার হেডলাইট জ্বেলে। গাড়িখানা এসে দাঁড়াল ফটকের সামনে। তারপর তা'র ড্রাইভার নেমে গিয়ে ফটকটি ঠেলে পথ প্রসারিত করল, এবং তারপর এসে যখন গাড়িখানাকে ভিতরের দিকে চালালো, আমি সেই সুযোগে দেখে নিলুম ভিতরের অংশটা। শুধু তাই নয়, চেয়ে দেখলুম আরও খান দুই প্রাইভেট্ গাড়ি একধারে দাঁড়িয়ে।

আসল কথা, আমার সাহস হচ্ছিল না ভিতরে ঢুকতে। যে-ব্যক্তি খাতির এবং অভ্যর্থনা পেয়ে এসেছে অনাহূতভাবে, আজ সে নিজের থেকে এক নারীর অন্তঃপুরে এগিয়ে যাবে

অভ্যর্থনার লোভে—এটা আত্মাভিমানে লাগে। গলার মালা না চাইতেই গলায় উঠেছিল, এখন সেই মালা না পেলে গলা খুসখুস করবে বৈকি!

গান থেমে গিয়েছিল, কিন্তু মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই যখন আবার একটি গানের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠছিল, সেই সময় হঠাৎ দেখি কে যেন ভিতর থেকে গেটের দুই পাল্লা বন্ধ ক'রে দিচ্ছে। আমি হনহনিয়ে এগিয়ে গিয়ে গেটের ভিতরে ঢুকতেই এক চাপরাসি প্রশ্ন করল, ক্যা মাংতা সাব?

মেমসাব হ্যায়?

জি হাঁ।

বললুম, উন্‌কো সেলাম দো। কহো কি ফটিক সাব আয়া কলকাতাসে।

লোকটা সবিনয়ে বলল, আপনি ভেতরে গিয়ে বসবেন চলুন, গাহানা থামলে খবর দেবো।

আমি চললুম ওর সঙ্গে সঙ্গে। একতলা বাংলো বটে, কিন্তু অভিজাত একতলা। একালের বাড়িতে এধরনের বিশালতা নেই। সমস্তটাই প্রশস্ত এবং প্রসারিত। বারান্দায় উঠে দেখি, দুদিকে কূলকিনারা নেই। ইলেকট্রিক নেই, কিন্তু ঝলমল করছে গ্যাসের আলো। নবাবী আমলের ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে উঁচু সীলিং থেকে। ওদের মধ্যে অগণিত সংখ্যক মোমবাতি জ্বলছে। চারিদিকে মেহগনির আসবাব ঝলমল করছে।

লোকটা আমাকে সযত্নে বসিয়ে রেখে চলে গেল।

মাঝখানের দরজা বন্ধ। ওঘরে গান হচ্ছে শুনছিলুম। কিন্তু অভ্যাগতদের মধ্যে কেউ তবলচি নিশ্চয় থাকবেন, নৈলে তবলায় চাঁটি পড়ে কেন? এবারের গান ছিল দরবারি জাতের। ঘড়িতে দেখলুম, রাত সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। ওদিকে বিশ্বেশ্বর অপেক্ষা করছে।

গান থামবার সঙ্গে সঙ্গে মাঝখানের দরজাটা খুট্ ক'রে খুলল, এবং যে-নারী ঝুমঝুমিয়ে বেরিয়ে এল, সে আমার সেই মোতীবাই নয়, মুন্না নয়, কম্‌রেড নয়,—সব মিলিয়ে সে অন্য। আমি চমকিয়ে উঠেছিলুম তাকে দেখে, কিন্তু সে উচ্চকণ্ঠে খিলখিলিয়ে হেসে হাট বাধালো। পরনে তার সোনালি জরির চুমকি বসানো মিহি রেশমের কুঁচি দেওয়া ঘাগরা অনাবৃত নাভিগহ্বরের ঠিক নিচে—আর উপর দিকটা, না—আমার চোখে পড়ছে না। আমি দেখিনি, দেখতেও চাইনে। মুন্নার পায়ে দুই তোড়া ঘুঙুর।

বললুম, মুন্না, এত সুন্দর তুমি। এমন আশ্চর্য দেহ তোমার?

বলামাত্রই গলিত ললিত লাবণ্যরাশির মতো আমার গায়ের উপর প'ড়ে মুন্না আমাকে জড়িয়ে ধরল। বিলেতী মদ খেতেন আমার জ্যাঠামশাই, তা'র গন্ধ আজও ভুলিনি। সেই গন্ধ ভুরভুর করছে মোতীবাইয়ের আরক্ত ওষ্ঠাধরে, গ্রীবায়, বাহুতে, যুগল বক্ষের সন্ধিতে। আমি আগে কখনও দেখিনি, তার নিম্ননাভি, দেখিনি তা'র কটিতট, দেখিনি তার নগ্নবাহুর সন্ধিস্থল। জড়িত কণ্ঠের গদগদ উল্লাসে সে আমার গায়ের মধ্যে মাথা রগ্‌ড়িয়ে বলতে লাগল, তুমি—তুমি আমার কম্‌রেড, আমার পুরনো দিনের কত—কত অন্তরঙ্গ তুমি। কই, সাড়া দিচ্ছ না ত' ভাই কম্‌রেড? বুঝেছি, বুঝেছি, আগুনে পাথরও ফাটে, কিন্তু তুমি কখনও গরম হওনি! এসো, এসো ভেতরে, কম্‌রেড,—আজ তোমাকে এক পাত্র খেতেই হবে!

মোতীবাই আমাকে হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে গেল ভিতরে অনেকটা যেন ভাবোন্মাদিনীর মতো। আমি তার এই অসংযত লজ্জাচেতনাহীন মদমত্ততা দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হচ্ছিলুম, কিন্তু আমার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হ'ল যখন পাঁচ ছয় ব্যক্তির মাঝখানে হঠাৎ আবিষ্কার করলুম ব্রহ্মচারী দয়ানন্দকে। সৌম্যদর্শন, বলিষ্ঠ দীর্ঘকায়,

কিন্তু শান্ত ও সংযত। পরনে তাঁর চুড়িদার পায়জামা, গলাবন্ধ আচকান, মাথায় ঘন সুন্দর কালো চুল এবং স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তশ্রী। এক হাতে মদের গেলাসটি নিয়ে তিনি হাসিমুখে ব'সে আছেন।

যিনি বাঁয়াতবলা সামনে রেখে মোতীবাইকে লক্ষ্য করছিলেন তাঁর দিকে বিলোল চক্ষে তাকিয়ে মোতীবাই ঘোষণা করল, আবদুল মজিদ সাব, ইনি আমার কম্‌রেড, আমার অসময়ের বন্ধু…

একটি ঘনবর্ণের গেলাস তুলে মোতীবাই চুমুক দিয়ে শেষ করে বলল, ভয় পেয়ো না কম্‌রেড, এরা সব সার্কাসের বাঘ। এদের দাঁত আছে, হিংসা আছে, লোভ আছে। কিন্তু পোষমানা জন্তু…এই নাও, খাও একটু…একটুখানি! ও কি, আমার মতন সুন্দরীর অফার য়্যাক্‌সেপ্ট করবে না—?

আমি উঠছিলুম ব্যাগটা হাতে নিয়ে। হঠাৎ ভূতে পেলো মোতী-বাইকে। সে ওই ভরা গেলাসটা তুলে নিয়ে হঠাৎ ঢেলে দিল আমার মাথায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে হাসির হুল্লোড় প'ড়ে গেল সমগ্র আসরে। কিন্তু তার এই বর্বর এবং সভ্যতাবিগর্হিত আচরণে দয়ানন্দকে হেসে উঠতে দেখে অগ্নিশিখার মতো জ্ব'লে উঠল মোতীবাই। হাতের কাছে কিছু না পেয়ে সে তেড়ে গেল দয়ানন্দর দিকে এবং এক-প্রকার বন্য হিংস্রতায় উন্মত্ত হয়ে ঠাস-ঠাস ক'রে চড় মারল তার গালে অনেকগুলো।—অতঃপর গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলল, ভণ্ড, প্রতারক—কেন, কেন মেরেছিলে আমার কমরেডকে…… কেন গায়ে হাত তুলেছিলে নির্দোষীর? বদমায়েশ…লোভী—নেড়িকুকুর—

জুতোটা পায়ে দিয়ে মদে ভেজা জামার দুর্গন্ধ নিয়ে আমি বারান্দা পেরিয়ে চলে যাচ্ছিলুম, মোতীবাই ছুটে এসে ধরল

আমাকে। সে টলছিল, এবং তা'র দিকে আর চোখ ফেরানো যায় না। বলল, তুমি কেন চ'লে যাচ্ছ? চ'লে যাচ্ছ আমাকে ফেলে, কমরেড? আজও কি তোমার সময় হয়নি? তুলে ধরবে না আমাকে? নিচেই প'ড়ে থাকব শুধু? শুধু কাঁদব?···তোমার জন্যে যে খাবার করতে বলেছি আমি·· বলতে বলতে সে কেঁদে ফেলল।

এক পা এগিয়ে এসে এসে আমি বললুম, তুমি সুস্থ হও, আবার আমি একসময় আসব, মুন্না।

তবু যাবে? আচ্ছা, যাও তবে।—এই ব'লে মোতীবাই সহসা জলভরা রক্তচক্ষে আমার দিকে তাকালো। পুনরায় বলল, আর তবে মাসের পর মাস অপেক্ষায় থাকতে বলো না। তুমি ব্যবসায়ী, নীচ, ইতর, তুমি তোমার জীবনে কখনও ভালোবাসতে শেখোনি··· তুমি—তুমি কাপুরুষ···দূর হয়ে যাও···দারোয়ান···চাপরাসি···

প্রমত্তা অসম্বৃতা নারী দুই হাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ ক'রে আবার কেঁদে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এমন সময় চাপরাসি বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে ইশারায় ডেকে নিল আমাকে। নম্র কণ্ঠে শুধু বলল, অব চলিয়ে সাব। বড়া ঘরকা খানদানি লড়কি, য্যায়সা মাতোয়ালি বন যাতি হ্যায়। উনকা কসুর কুছ নহি···

ব্যাগটি হাতে নিয়ে দ্রুতপদে আমি ফটক পেরিয়ে চ'লে গেলুম।
